ন্যায়দর্শন

(গৌতমসূত্র)

বাৎস্যায়ন ভাষ্য

ও

বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত

প্রথম খণ্ড

মহামহোপাধ্যায়

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্ত্তৃক

অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত

মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

ভূমিকা

মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় প্রণীত ন্যায়দর্শন বহুদিন যাবৎ অপ্রকাশিত থাকায় ছাত্রছাত্রীরা খুবই অসুবিধে ভোগ করছিলেন। দর্শন বিভা সমিতির পরামর্শমত পর্ষদ ন্যায়দর্শন গ্রন্থটির সব কটি খণ্ড পুণর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। অন্যান্য খণ্ডগুলি যথাশীঘ্র সম্ভব প্রকাশিত হবে। বর্তমান পর্ষদ সংস্করণে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের (দ্বিতীয় মুদ্রণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬) পাঠ অনুসৃত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য এই খণ্ডে প্রথম সংস্করণের ভূমিকা সংযোজিত হ'ল। ন্যায়দর্শন প্রকাশনায় ক্ষেত্রে ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের পুত্র শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছে পর্ষদ একান্ত ভাবেই ঋণী। তাঁর পিতার ফটোগ্রাফের ব্লক, সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ইত্যাদি সংগ্রহ করে পর্ষদকে তিনি প্রভূত সাহায্য করেছেন। তাঁর মূল্যবান পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আন্তরিক দুঃখিত। গ্রন্থপাঠে শুদ্ধিপত্র দেখার বিড়ম্বনা থেকেই গেল।

দিব্যেন্দু হোতা
মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক

মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

১২৮২ বঙ্গাব্দের ১১ই মাঘ সোমবার রটন্তী চতুর্দ্দশী তিথিতে বঙ্গদেশান্তর্গত যশোহর জেলার তালখড়ি গ্রামে সুবিখ্যাত ভট্টাচার্যবংশে মহাতপা বিদ্বান্ সৃষ্টিধর ভট্টাচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র ফণিভূষণ জন্মগ্রহণ করেন। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি তাঁহার পিতৃদেবের উদাত্ত গুণাবলী, চরিত্রবল, সনাতন ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ও তেজস্বিতা অর্জন করেন।

বাল্যকাল হইতেই ফণিভূষণ মেধাবী, পরিশ্রমী এবং অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী হিসাবে সকলের প্রশংসাভাজন হন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য মনোরঞ্জন চূড়ামণি মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ, পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের নিকট কাব্য, অলঙ্কার ও স্মৃতি, এবং পণ্ডিত জানকীনাথ তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় ও প্রাচীন ন্যায়, সাংখ্য ও বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে ইনি কাব্য ও সাংখ্যতীর্থ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এই সময়েই ইনি প্রাচীন ও নব্যন্যায়ের মধ্য পরীক্ষা দুইটিতেও প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভাও ন্যায়শাস্ত্রে অসামান্য ব্যুৎপত্তি লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক তর্করত্ন মহাশয় তাঁহাকে তর্কবাগীশ উপাধি দ্বারা বিভূষিত করেন এবং স্বীয় পুত্র ও অপরাপর ছাত্রগণকে তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকটে অধ্যয়ন করিতে নির্দেশ দান করেন। ইতিমধ্যে তিনি নবদ্বীপে মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চাননের নিকটেও কিছুকাল ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

১৩১১ বঙ্গাব্দে ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় পাবনায় বিখ্যাত বিচারপতি স্যার আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতির পিতা দুর্গাদাস চৌধুরীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দুর্গাদাস দর্শন টোলে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া গমন করেন এবং ১৩ বৎসরকাল সেখানে অগণিত ছাত্র ও অধ্যাপকদিগকে নানা শাস্ত্রে অধ্যাপন দ্বারা অপরিমিত যশ অর্জন করেন। উপাধি পরীক্ষায় তাঁহার ছাত্রগণ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইবার ফলে তিনি বহুবার অধ্যাপকগণের সর্বোচ্চ পুরস্কার ২০০ টাকা করিয়া প্রাপ্ত হন। তর্কতীর্থ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করিয়া তাঁহার

বহু ছাত্র 'কেয়ূর' পুরস্কার অর্জন করেন। তাঁহার এই সময়কার বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে তারানাথ সপ্ততীর্থ, শিবকুমার তর্কতীর্থ, শরৎকমল ন্যায়স্মৃতিতীর্থ, শরচ্চন্দ্র ঘোষাল, হেমচন্দ্র রায়, নবদাস ন্যায়তীর্থ, যোগেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ, রাধাবিনোদ গোস্বামী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

'ব্রহ্মবিদ্যা', 'হিন্দুপত্রিকা' প্রভৃতি মাসিকপত্রে ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে তর্কবাগীশ মহাশয়ের কতিপয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার ফলে তার পাণ্ডিত্যখ্যাতি বিস্তৃত হয় এবং টাকীর বিদ্যোৎসাহী ভূম্যধিকারী রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতির অনুরোধে তিনি বাৎস্যায়ন ভাষ্যসহ ন্যায়দর্শনের গৌতমসূত্রের অনুবাদ, বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ টিপ্পনী রচনায় প্রবৃত্ত হন। সুবৃহৎ পাঁচ খণ্ডে ঐ পুস্তক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে ১২ বৎসরে প্রকাশিত হয়।

ইতিমধ্যে তর্কবাগীশ মহাশয় ১৯১৮ সালে বারাণসীতে টীকমানী সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া কাশীবাস করিতে থাকেন এবং অগণিত বিদ্যার্থীকে ন্যায়াদি দর্শনশাস্ত্র অধ্যাপন করিয়া প্রচুর যশ অর্জন করেন। তাঁহার এই সময়কার ছাত্রগণের মধ্যে আনন্দ ঝা ন্যায়াচার্য, আচার্য বদরীনাথ শুক্ল, মহামহোপাধ্যায় ডঃ উমেশ মিশ্র, শ্রীকৃষ্ণমাধব ঝা ন্যায়াচার্য, শ্রীচিমনলাল গোস্বামী, শ্রীরূপনাথ ঝা প্রভৃতি পরবর্তীকালে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন।

১৯২৬ সালের ১লা জানুয়ারী ইঁহাকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দ্বারা বিভূষিত করা হয়। সেই বৎসরই ইঁহাকে কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। সেখানে তাঁহার নিকটে বহু ছাত্র অধ্যয়ন করিয়া পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্বান রূপে খ্যাতিলাভ করেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী, আচার্য শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীযাদবেন্দ্র ন্যায়তর্কতীর্থ প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

১৯৩১ সালে তর্কবাগীশ মহাশয় অবসর গ্রহণ করিয়া বারাণসীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং স্বীয় আবাসে বিদ্যাদান করিতে থাকেন। তাঁহার এই সময়ের ছাত্রদের মধ্যে ডঃ সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য, শ্রীরামনারায়ণ ভট্টাচার্য, গোপালচন্দ্র ন্যায়াচার্য প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৫ সালে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে তর্কবাগীশ মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপকের পদ স্বীকার করিয়া পুনরায় কলিকাতা গমন করেন, এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইঁহার ছাত্রদের মধ্যে ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অনন্তলাল ঠাকুর, ডঃ নাথমল টাটিয়া, ডঃ দিনেশচন্দ্র গুহ, অধ্যক্ষ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তর্কবাগীশ মহাশয়ের অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত ন্যায়দর্শন দেশে বিদেশে বিশেষ সমাদৃত। মঃ মঃ পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন, মঃ মঃ পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, ডঃ আর্থার ভেনিস, জি. তুচ্চী, এইচ. এইচ. ইনজাল্‌স্‌, মঃ মঃ ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ, মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন, সুখলাল জৈন আদি অনেক মনীষী এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

ন্যায়দর্শন ছাড়াও বেদান্তদর্শন, বৌদ্ধদর্শন, জৈনদর্শন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন, স্মৃতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রেও তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রগাঢ় এবং ব্যাপক জ্ঞান ছিল। বাল্যবয়সেই তিনি দ্রুতকবি হিসাবে মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্নের দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বহু প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষ', 'মাসিক বসুমতী', 'প্রবাসী', 'উদ্বোধন', 'ব্রহ্মবিদ্যা', 'বিশ্বকোষ' (২য় সংস্করণ), 'বঙ্গীয় মহাকোষ' প্রভৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ প্রভৃতির সহিত দীর্ঘকাল সহ-সভাপতিরূপে যুক্ত ছিলেন।

তর্কবাগীশ মহাশয় প্রকৃত ভক্ত ছিলেন। অনঙ্গমোহন হরিসভা, বারাণসী হরিনাম প্রদায়িনী সভার সহিত তাঁহার নিবিড় যোগ ছিল। কীর্তনসঙ্গীতে এবং ভক্তিশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। শ্রীচৈতন্যের জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার গভীর গবেষণা ও জ্ঞান 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান সম্বন্ধে বক্তব্য" এই শিরোনামায় প্রকাশিত ১১টি প্রবন্ধে সম্যক্ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

যাদবপুর জাতীয় শিক্ষা পরিষদে প্রবোধ বসু মল্লিক ফেলোশিপ প্রাপ্ত হইয়া তর্কবাগীশ মহাশয় যে বক্তৃতামালা প্রদান করেন, তাহা 'ন্যায়পরিচয়' নামে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কর্তৃক উহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

১৩৩২ বঙ্গাব্দে বীরভূমে অনুষ্ঠিত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে তর্কবাগীশ মহাশয় দর্শনশাখার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

তাঁহার পুত্রগণ সকলেই কৃতবিদ্য হইয়া বিদ্যাচর্চ্চার ক্ষেত্রে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন।

১৯৪২ সালের ২৭এ জানুয়ারী, মাঘ মাস ভৈমী একাদশী তিথিতে তর্কবাগীশ মহাশয় বারাণসীধামে শিবসাযুজ্য লাভ করেন।

ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের পুত্র গণেশমহল্লা, বারাণসী-নিবাসী শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্যের সৌজন্যে সংগৃহীত।

প্রথম সংস্করণের

ভূমিকা

ন্যায়দর্শনের পরিচয় ও প্রয়োজনাদি

যে ষড়্দর্শন পুণ্যতীর্থ ভারতের অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম-জ্ঞানগৌরবের গৌরবময়, বিস্ময়ময় বিজয়পতাকারূপে আজিও দীর্ঘদর্শীকে বিশ্বস্রষ্টার বিচিত্র লীলা দর্শন করাইতেছে, ন্যায়দর্শন তাহারই অন্যতম দর্শনশাস্ত্র। জীবের পরমপুরুষার্থ মোক্ষলাভে আত্মাদি পদার্থের যে দর্শন বা তত্ত্বসাক্ষাৎকার চরম কর্ত্তব্য ও পরম কর্ত্তব্যরূপে বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, যাহার জন্য প্রথমে শাস্ত্রদ্বারা আত্মাদি পদার্থের শ্রবণরূপ উপাসনা, তাহার পরে হেতুর দ্বারা মনন অর্থাৎ যথার্থ অনুমানরূপ উপাসনা, তাহার পরে নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যানাদিরূপ উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে[1], ন্যায়শাস্ত্র ঐ আত্মাদি দর্শনের সাধন-মননরূপ দ্বিতীয় উপাসনা নির্ব্বাহরূপ মুখ্য উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হওয়ায় দর্শনশাস্ত্র নামেও অভিহিত হইয়াছে। আত্মাদি পদার্থের শ্রবণের পরে যুক্তির দ্বারা তাহার যে 'ঈক্ষা' বা মনন অর্থাৎ শাস্ত্রসম্মতরূপে অনুমান, তাহাকে 'অন্বীক্ষা' বলে। এই অন্বীক্ষা নির্ব্বাহের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া ইহা 'আন্বীক্ষিকী' নামে অভিহিত হইয়াছে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরোধী অনুমানকে 'অন্বীক্ষা' বলে, 'ন্যায়'ও বলে। ঐ অন্বীক্ষা বা ন্যায়ের জন্য অর্থাৎ উহাতে যে সকল পদার্থ-তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক, তাহা সম্পাদন করিয়া উহা নির্ব্বাহের জন্য যে বিদ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকে ঐ জন্য আন্বীক্ষিকী বলে, ন্যায়-বিদ্যা বলে, ন্যায়শাস্ত্র বলে; এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা উপনিষদের ন্যায় কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা না হইলেও অধ্যাত্ম-বিদ্যা। এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা তর্কের নিরূপণ করিয়াছে, তর্কশাস্ত্রের সকল তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছে; এ জন্য ইহাকে তর্কবিদ্যা ও তর্কশাস্ত্রও বলে। ইহা 'ন্যায়' ও 'তর্ক' নামেও উল্লিখিত হইয়াছে।

ভগবান্ অক্ষপাদ মহর্ষি-সূত্রগ্রন্থের দ্বারা এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যার প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি ইহার স্রষ্টা নহেন। আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বেদাদি বিদ্যার ন্যায়

১। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্।—বৃহদারণ্যক।২।৪।৫। শ্রোতব্যঃ পূর্ব্বমাচার্য্যত আগমতশ্চ। পশ্চান্মন্তব্যস্তর্কতঃ—শঙ্করভাষ্য।

বিশ্বস্রষ্টার অনুগ্রহ-দান। মহাভারতে পাওয়া যায়, নীতি, ধর্ম্ম ও সদাচারের প্রতিষ্ঠার জন্য দেবগণের প্রার্থনায় স্বয়ম্ভু ভগবান্ শত সহস্র অধ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি বহু বিষয় এবং ত্রয়ী, আন্বীক্ষিকী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি—এই চতুর্ব্বিধ বিপুল বিদ্যা দর্শিত হইয়াছে[১]। ভাষ্যকার ভগবান্ বাৎস্যায়নও বলিয়াছেন যে, প্রাণিগণ বা মানবগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য (ত্রয়ী প্রভৃতি) এই চারিটি বিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে, যাহাদিগের মধ্যে চতুর্থী এই আন্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা। শ্রীমদ্‌ভাগবতে পাওয়া যায়, আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি—এই চতুর্ব্বিধ বিদ্যা এবং ব্যাহৃতি ও প্রণব বিশ্বস্রষ্টার হৃদয়াকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে[২]। তাই বলিয়াছি, আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বিশ্বস্রষ্টার অনুগ্রহ-দান। ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে পাওয়া যায়, কোন সময়ে নারদ ভগবান্ সনৎকুমারের নিকটে উপস্থিত হইয়া বিদ্যাপ্রার্থী হইলে, সনৎকুমার বলিলেন, "তুমি কি কি বিদ্যা জান, তাহা অগ্রে বল ; তাহার পরে তোমার অজ্ঞাত বিষয়ে উপদেশ করিব।" তদুত্তরে নারদ বলিলেন,—"আমি ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও চতুর্থ অথর্ব্ববেদ জানি, পঞ্চম বেদ ইতিহাস, পুরাণও জানি এবং ঐ সমস্ত বেদের বেদ অর্থাৎ ব্যাকরণশাস্ত্রও জানি। পিত্র্য (শ্রাদ্ধকল্প), রাশি (গণিত), দৈব (উৎপাতবিদ্যা), নিধি (মহাকালাদি নিধিশাস্ত্র), বাকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র), একায়ন (নীতিশাস্ত্র), দেববিদ্যা (নিরুক্ত), ব্রহ্মবিদ্যা (বেদাঙ্গ শিক্ষাকল্পাদি), ভূতবিদ্যা (ভূততন্ত্র), ক্ষত্রবিদ্যা (ধনুর্ব্বেদ), নক্ষত্রবিদ্যা (জ্যোতিষ), সর্পবিদ্যা (গারুড়), দেবজনবিদ্যা অর্থাৎ গন্ধযুক্তি নৃত্য-গীত, বাদ্যশিল্পাদি-বিজ্ঞান, এই সমস্তও জানি[৩]। নারদের অধিগত কথিত বিদ্যার মধ্যে যে 'বাকোবাক্য' আছে, ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাহার ব্যাখ্যায়

১। ত্রয়ী চান্বীক্ষিকী চৈব বার্ত্তা চ ভরতর্ষভ। দণ্ডনীতিশ্চ বিপুলা বিদ্যাস্তত্র নিদর্শিতাঃ ॥
—শান্তিপর্ব্ব।৫৯।৩৩।

২। আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিস্তথৈব চ।
এবং ব্যাহৃতয়শ্চাসন্ প্রণবো হ্যস্য দহ্রতঃ ॥—তৃতীয় স্কন্ধ।১২।৪৪।

ন্যায়াদীনাং পূর্ব্বাদিক্রমেণোৎপত্তিমাহ আন্বীক্ষিকীতি। আন্বীক্ষিক্যাদ্যা মোক্ষ-ধর্ম্মকামার্থ-বিদ্যাঃ। দহ্রতঃ হৃদয়াকাশাৎ।—স্বামিটীকা।

৩। ঋগ্‌বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থম্, ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং, বেদানাং বেদং, পিত্র্যং, রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যামেতদ্‌ভগবোঽধ্যেমি" ।৭।১।২।

বলিয়াছেন,—"বাকোবাক্যং তর্কশাস্ত্রম্"। সংহিতাকার মহর্ষি কাত্যায়ন প্রত্যহ বাকোবাক্য পাঠের ফল কীর্ত্তন করিয়াছেন[১]। সংহিতাকার গৌতম বহুশ্রুত ব্রাহ্মণের লক্ষণ বলিতে বেদাদি শাস্ত্রের সহিত বাকোবাক্যে অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন[২]। কোষকার অমরসিংহ আন্বীক্ষিকী শব্দের অর্থ বলিয়াছেন —'তর্কবিদ্যা'[৩]। আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যানুসারে আন্বীক্ষিকী বিদ্যাকেই বাকোবাক্য বলিয়া বুঝা যায়। মহাভারতের সভাপর্ব্বে বহুশ্রুত নারদের বিদ্যার বর্ণনায় নারদকে পঞ্চাবয়ব ন্যায়বাক্যের গুণ-দোষবেত্তা বলা হইয়াছে[৪]। গৌতম ন্যায়শাস্ত্রোক্ত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বযুক্ত ন্যায়বাক্যের অনুকূল তর্করূপ গুণ এবং হেত্বাভাস প্রভৃতি দোষ নারদ জানিতেন। টীকাকার নীলকণ্ঠও সেখানে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহাভারতে নারদের পঞ্চাবয়ব ন্যায়বিদ্যায় পাণ্ডিত্য বর্ণিত হওয়ায় ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত নারদের অধিগত তর্কশাস্ত্রকে পঞ্চাবয়ব ন্যায়বিদ্যা বলিয়া বুঝা যাইতে পারে। কারণ, ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যে বেদার্থ নির্ণয় করিবে, ইহা মহাভারতই বলিয়াছেন[৫]। অন্য উপনিষদেও বেদাদি বিদ্যার সহিত ন্যায়বিদ্যারও উল্লেখ দেখা যায়[৬]। ন্যায়সূত্র-বৃত্তিকার মহামনীষী বিশ্বনাথ "ন্যায়ো মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি" এই বাক্যটি শ্রুতি বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। স্মৃতি ও পুরাণে ন্যায়বিদ্যা চতুর্দ্দশবিদ্যার মধ্যে পরিগণিত[৭] হইয়াছে।

১। মাংসক্ষীরৌদনমধুকুল্যাভিস্তর্পয়েৎ পঠন্। বাকোবাক্যং পুরাণানি ইতিহাসানি চান্বহং ॥ ১৪শ খণ্ড।১১।

২। স এব বহুশ্রুতো ভবতি লোকবেদবেদাঙ্গবিদ্ বাকোবাক্যেতিহাসপুরাণকুশলঃ। ইত্যাদি। অষ্টম অঃ।

৩। আন্বীক্ষিকী দণ্ডনীতিস্তর্কবিদ্যার্থশাস্ত্রয়োঃ।—অমরকোষ ; স্বর্গবর্গ।১৫৫।

৪। পঞ্চাবয়বযুক্তস্য বাক্যস্য গুণদোষবিৎ।—সভাপর্ব্ব।৫।৫।

৫। ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ। বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি ॥ আদিপর্ব্ব, ১ম অঃ।২৬৭।

৬। তস্যৈতস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেবৈতদৃগ্ বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষাময়নং ন্যায়ো মীমাংসাধর্ম্মশাস্ত্রাণি ইত্যাদি। সুবালোপনিষৎ। ২য় খণ্ড।

৭। পুরাণন্যায়মীমাংসা-ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ। বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ ॥ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ॥১।৩

অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যাশ্চেতাশ্চতুর্দ্দশ ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থন্তু বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তু ॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৩ অংশ, ৬ অঃ

বিষ্ণুপুরাণে চতুর্দ্দশ বিদ্যার পরিগণনায় যে 'ন্যায়বিস্তর' বলা হইয়াছে, তাহা ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি সমস্ত ন্যায়তন্ত্র, ইহা অনেকে বলিয়াছেন। ন্যায়মঞ্জরীকার মহামনীষী জয়ন্ত ভট্ট ইহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে গৌতমীয় ন্যায়বিদ্যাই ঐ ন্যায়বিস্তর শব্দের দ্বারা পরিগৃহীত, উহাই আন্বীক্ষিকী। বৈশেষিক ঐ ন্যায়শাস্ত্রের সমান তন্ত্র, সুতরাং বৈশেষিকের আর পৃথক্ উল্লেখ হয় নাই। কিন্তু ন্যায় না বলিয়া 'ন্যায়বিস্তর' কেন বলা হইয়াছে, ইহা চিন্তা করা আবশ্যক। পরন্তু মহাভারত বলিয়াছেন,—'ন্যায়তন্ত্র অনেক'।[১] মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ ঐ ন্যায়তন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি। সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞান ভিক্ষুও সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্যের ভূমিকায় মহাভারতের ঐ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ন্যায়-বৈশেষিকাদির সহিত ব্রহ্মমীমাংসাও যে অংশবিশেষে ন্যায়তন্ত্র, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্তু গৌতমীয় ন্যায়বিদ্যা ভিন্ন কেবল অধ্যাত্মবিদ্যাবিশেষেরও আন্বীক্ষিকী নামে উল্লেখ দেখা যায়। ভগবানের ষষ্ঠ অবতার দত্তাত্রেয় অলর্ক ও প্রহ্লাদ প্রভৃতিকে 'আন্বীক্ষিকী' বলিয়াছিলেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে[২]। দত্তাত্রেয়-প্রোক্ত ঐ আন্বীক্ষিকী যে কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা, উহা গৌতমীয়, ন্যায়বিদ্যা নহে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি টীকাকারগণও উহাকে অধ্যাত্মবিদ্যা বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'প্রাণতোষিণী' নামক তন্ত্র-সংগ্রহকার, নব্য বাঙ্গালী রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার দত্তাত্রেয়-প্রোক্ত আন্বীক্ষিকী ও গৌতম-প্রকাশিত আন্বীক্ষিকী এই উভয়কেই আন্বীক্ষিকী বলিয়া, তন্মধ্যে গৌতম ন্যায়শাস্ত্রের নিন্দা বিষয়ে গন্ধর্ব্বতন্ত্রের বচনাবলম্বনে অবতারিত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন এবং মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের যে শ্লোকের দ্বারা আন্বীক্ষিকীর নিন্দা সমর্থন করা হয়, তাহারও উল্লেখ করিয়া অন্যরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার মীমাংসায় বহু

১। ন্যায়-তন্ত্রাণ্যনেকানি তৈস্তৈরুক্তানি বাদিভিঃ।
হেত্বাগম-সদাচারৈর্যদ্যুক্তং তদুপাস্যতাং ॥—শান্তিপর্ব্ব।২১০,২২।
ন্যায়তন্ত্রাণি তার্কিক-বৈশেষিক-কাপিল-পাতঞ্জলাদীনি। হেতুর্যুক্তিঃ, আগমো বেদঃ, সদাচারঃ প্রত্যক্ষং, তৈঃ প্রমাণৈঃ কৃত্বা এতৈর্মুনিভির্যদ্ব্রহ্ম উক্তং তদুপাস্যতাং।
—নীলকণ্ঠ ॥

২। ষষ্ঠমত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোহনসূয়য়া।
আন্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য উচিবান্ ॥ ভাগবত।১।৩।১১। আন্বীক্ষিকীং আত্মবিদ্যাং।—শ্রীধরস্বামী।

বক্তব্য থাকিলেও তিনি গৌতমীয় ন্যায়বিদ্যা ও তাহার অধ্যয়ন নিন্দিত, ইহা সিদ্ধান্ত করেন নাই ; পরন্তু তাঁহার প্রতিবাদই করিয়াছেন, এই মাত্রই এই প্রসঙ্গে এখানে বক্তব্য। অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য সাংখ্যকেও আন্বীক্ষিকীর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার কথা পরে আলোচনা করিব। শান্তিপুরের মহামনীষী, স্মৃতি ও ন্যায় গ্রন্থের বহু টীকাকার রাধামোহন গোস্বামি ভট্টাচার্য্য ন্যায়সূত্রবিবরণ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, শ্রবণের পরে ঈক্ষা অর্থাৎ বেদোপদিষ্ট আত্মমননকে অন্বীক্ষা বলে। তাহার নির্ব্বাহক শাস্ত্র আন্বীক্ষিকী, ইহা আন্বীক্ষিকী শব্দের যৌগিক অর্থ। এই অর্থে অন্য শাস্ত্রও আন্বীক্ষিকী হইতে পারে, কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রে ন্যায়ের বলবত্তাবশতঃ এবং উহাতেই আন্বীক্ষিকী শব্দের ভূরি ভূরি প্রয়োগ থাকায় গৌতমীয় ন্যায়বিদ্যাতেই আন্বীক্ষিকী শব্দের রূঢ়ি কল্পনা করিতে হইবে। অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্র-বোধক আন্বীক্ষিকী শব্দটি যোগরূঢ়। তাহা হইলে কোন যৌগিক অর্থগ্রহণ করিয়াই কোন কোন অধ্যাত্মবিদ্যা বা মনন-শাস্ত্রও আন্বীক্ষিকী নামে কথিত হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন আন্বীক্ষিকী শব্দের যে ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রথমেই বলিয়াছি, তদনুসারে গৌতম-প্রকাশিত ন্যায়বিদ্যাই আন্বীক্ষিকী। বাৎস্যায়নও ন্যায়বিদ্যা ও ন্যায়শাস্ত্র বলিয়া তাহা বিশদ করিয়া বলিয়াছেন। এবং প্রমাণ ও প্রমেয় বলিলেই সকল পদার্থ বলা হয়, আবার পৃথক করিয়া সংশয় প্রভৃতি চতুর্দ্দশ পদার্থ কেন বলা হইয়াছে, এই প্রশ্নের উত্তরে বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে, সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থ এই চতুর্থী আন্বীক্ষিকী বিদ্যার পৃথক্ প্রস্থান অর্থাৎ অসাধারণ প্রতিপাদ্য। প্রস্থানের ভেদেই বিদ্যার ভেদ হইয়াছে। ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি ও আন্বীক্ষিকী, এই চতুর্ব্বিধ বিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থান আছে। তন্মধ্যে আন্বীক্ষিকীর প্রস্থান সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থ। উহা আর কোন বিদ্যায় বর্ণিত হয় নাই। উহারা ন্যায়বিদ্যার পৃথক্ প্রস্থান কেন? উহাদিগের তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন কি? তাহা প্রথম সূত্র-ভাষ্যে বাৎস্যায়ন বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছেন। ন্যায়বার্ত্তিকে উদ্যোতকর ভাষ্যকারের বক্তব্য সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, যদি ন্যায়বিদ্যার সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থের উল্লেখ না থাকিত, তাহা হইলে ইহা চতুর্থী বিদ্যা হইত না। তাহা হইলে ইহা কেবল মাত্র অধ্যাত্মবিদ্যা হইয়া ত্রয়ীর অন্তর্গত হইত। ফলকথা, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি হইতে চতুর্থী যে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার উল্লেখ শাস্ত্রে পাওয়া যায়, ঐ চতুর্থী আন্বীক্ষিকী বিদ্যা গৌতম-প্রকাশিত ন্যায়বিদ্যা। ঐ বিদ্যা অক্ষপাদের পূর্ব্ব হইতেই আছে।

অক্ষপাদ সূত্রগ্রন্থের দ্বারা উহা বিস্তৃত ও প্রণালীবদ্ধরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি উহার কর্ত্তা নহেন। ইহাই বাৎস্যায়ন, উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি ন্যায়াচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত বুঝা যায়।

আমরাও দেখিতেছি, মন্বাদি সংহিতাকার ঋষিগণ বিচার দ্বারা রাজ্য রক্ষার জন্য রাজাকে ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতির সহিত চতুর্থী বিদ্যা আন্বীক্ষিকী শিক্ষা করিতে উপদেশ করিয়াছেন[১]।

মন্বাদি ঋষিগণ যে উদ্দেশ্যে রাজাকে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার আলোচনা করিতে বলিয়াছেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে উহা যে ন্যায়বিদ্যা, তাহা বুঝা যায়। কুল্লুকভট্টও মনুবচনোক্ত আন্বীক্ষিকীর অন্যরূপ কোন অর্থ ব্যাখ্যা করেন নাই। ন্যায়সূত্রবৃত্তিকার মহামনীষী বিশ্বনাথও মনূক্ত আন্বীক্ষিকীকে ন্যায়শাস্ত্রই বলিয়াছেন। মেধাতিথি প্রথমে তর্কবিদ্যা ও অর্থশাস্ত্র প্রভৃতিকে আন্বীক্ষিকী বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, মনু-বচনে 'আত্মবিদ্যা' আন্বীক্ষিকীর বিশেষণ। রাজা আত্মহিতকরী তর্কাশ্রয়া আন্বীক্ষিকী শিক্ষা করিবেন। নাস্তিক তর্কবিদ্যা শিক্ষা করিবেন না। বস্তুতঃ মন্বাদি ঋষিগণ বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্রকে অসৎশাস্ত্র বলিয়া তাহার অধ্যয়নাদিকে উপপাতকের মধ্যে গণ্য করায়[২] রাজার শিক্ষণীয়রূপে তাঁহাদিগের কথিত আন্বীক্ষিকীকে নাস্তিক তর্কবিদ্যা বলিয়া বুঝিবার সম্ভাবনাই নাই। কিন্তু নাস্তিক গ্রন্থে 'শাস্ত্র' শব্দের ন্যায় নাস্তিক তর্কবিদ্যাতে আন্বীক্ষিকী শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইতে পারে এবং কোন কোন স্থলে তাহা হইয়াছে, ইহা আমরা মেধাতিথির কথার দ্বারাও বুঝিতে পারি এবং মন্বাদি সংহিতায় বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্রের নিন্দা দেখিয়া তদনুসারে মহাভারতেও নাস্তিক তর্ক-বিদ্যারই নিন্দা বুঝিতে পারি। মূলকথা, মনু-বচনে আত্মবিদ্যা আন্বীক্ষিকীর বিশেষণ

১। ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাদ্দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীং।
আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ ।।—মনুসংহিতা।৭।৪৩।
স্বরন্ধ্রগোপ্তান্বীক্ষিক্যাং দণ্ডনীত্যাং তথৈব চ।
বিনীতস্ত্বথ বার্ত্তায়াং ত্রয্যাঞ্চৈব নরাধিপঃ ।।—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা। ১।৩১১।
রাজা সর্ব্বস্যেষ্টে ব্রাহ্মণবর্জ্জং সাধুকারী
স্যাৎ সাধুবাদী, ত্রয্যাং আন্বীক্ষিক্যাঞ্চাভিবিনীতঃ।—গৌতমসংহিতা।১১ অঃ।

২। অসচ্ছাস্ত্রাধিগমনং কৌশীলব্যস্য চ ক্রিয়া।—মনুসংহিতা।১১।৬৬
অসচ্ছাস্ত্রাণি চার্ব্বাকনির্গ্রন্থাঃ। যত্র ন প্রমাণং বেদঃ, কর্ম্ম ন ফলসম্বন্ধমাপদ্যতে।
—মেধাতিথি। শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ-শাস্ত্রশিক্ষণং। কুল্লুকভট্ট।
অসচ্ছাস্ত্রাধিগমনমাকরেষ্বধিকারিতা।—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।৩।২৪১।

হইলেও ঐ আন্বীক্ষিকী, ন্যায়বিদ্যা হইতে পারে। কারণ, ন্যায়বিদ্যা উপনিষদের ন্যায় কেবল আত্মবিদ্যা না হইলেও আত্মবিদ্যা। কেবল আত্মবিদ্যারূপ কোন আন্বীক্ষিকী আন্বীক্ষিকী শব্দের দ্বারা রাজার শিক্ষণীয়রূপে কথিত হয় নাই, ইহা যাজ্ঞবল্ক্য ও গৌতমের বচনের দ্বারাও বুঝা যায়। বিচারের জন্য, বাদ-প্রতিবাদের জন্য, যুক্তির দ্বারা তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য ন্যায়বিদ্যায় অভিজ্ঞতা রাজার বিশেষ আবশ্যক। মহাভারতও রাজ-ধর্ম্মবর্ণনায় রাজাকে শব্দ-শাস্ত্রাদির সহিত যুক্তি-শাস্ত্রও জানিতে বলিয়াছেন[১]। শ্রীরামচন্দ্র উত্তরোত্তর যুক্তিতে বৃহস্পতির ন্যায় বক্তা ছিলেন, ইহা বাল্মীকি বর্ণন করিয়াছেন[২]। সেখানে বাল্মীকি ন্যায়-শাস্ত্রোক্ত পারিভাষিক 'কথা' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা রামানুজের ব্যাখ্যার দ্বারাও বুঝা যায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ধনুর্ব্বেদ ও রাজনীতির সহিত আন্বীক্ষিকী বিদ্যারও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে[৩]।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে দেখিতে পাই, যাজ্ঞবল্ক্য জনক রাজাকে বলিয়াছিলেন যে,[৪] বেদান্ত-জ্ঞান-কোবিদ বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্ব

১। প্রজাপালনযুক্তশ্চ ন ক্ষতিং লভতে কচিৎ।
যুক্তিশাস্ত্রঞ্চ তে জ্ঞেয়ং শব্দশাস্ত্রঞ্চ ভারত ।।—অনুশাসন পর্ব্ব, ১০৪।১৪৮।

২। ···· ন বিগৃহ্য কথারুচিঃ। উত্তরোত্তরযুক্তৌ চ বক্তা বাচস্পতির্যথা ।।
—অযোধ্যাকাণ্ড ।২।৬২।৪৩।

৩। সরহস্যং ধনুর্ব্বেদং ধর্ম্মান্ ন্যায়পথাংস্তথা।
তথা চান্বীক্ষিকীং বিদ্যাং রাজনীতিঞ্চ ষড়্বিধাং ।।—১০।৪৫।৩৪।
ন্যায়পথান্ মীমাংসাদীন্। আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যাং।—শ্রীধরস্বামী।

৪। বিশ্বাবসুস্ততো রাজন্ বেদান্তজ্ঞানকোবিদঃ।
চতুর্ব্বিংশাংস্ততোঽপৃচ্ছৎ প্রশ্নান্ বেদস্য পার্থিব ।।
পঞ্চবিংশতিমং প্রশ্নং পপ্রচ্ছান্বীক্ষিকীং তদা। ২৭ ২৮।
তত্রোপনিষদঞ্চৈব পরিশেষঞ্চ পার্থিব।
মথ্নামি মনসা তাত দৃষ্ট্বা চান্বীক্ষিকীং পরাং ।।৩৪।
চতুর্থী রাজশার্দ্দূল বিদ্যৈষা সাম্পরায়িকী ।।
উদীরিতা ময়া তুভ্যং পঞ্চবিংশাদধিষ্ঠিতা ।।
এষা তেঽন্বীক্ষিকী বিদ্যা চতুর্থী সাম্পরায়িকী ।।৪৭।।
বিদ্যোপেতং ধনং কৃত্বা ইত্যাদি।৪৮।
অক্ষয়ত্বাৎ প্রজননে ইত্যাদি। ।।৪৬।। শান্তিপর্ব্ব।৩১৮ অ০।
শ্রবণমনু ঈক্ষা যুক্ত্যা আলোচনমন্বীক্ষা তৎপ্রধানামান্বীক্ষিকীং।২৮।
চতুর্থী ত্রয়ীং বার্ত্তাং দণ্ডনীতিঞ্চাপেক্ষ্য। সাম্পরায়িকী—মোক্ষায় হিতা।৩৫।
বিদ্যোপেতং ধনং আন্বীক্ষিক্যা বিদ্যয়া সহিতং ধনং···বেদবিদ্যা ধনং, তাং সোপপত্তিকাং সম্পাদ্য শ্রবণমননে কৃত্বেতি ভাবঃ।৪৮। প্রজননে অনিত্যস্বর্গে অক্ষয়ত্বং পরোক্তং শ্রুত্বা অক্ষপাদাদয় আচার্য্যা অত্র ব্যবহারে যজ্ঞমাকাশাদি তদেবাব্যয়মিত্যাহঃ।৪৬।—নীলকণ্ঠ।

আমার নিকটে বেদ বিষয়ে চতুর্ব্বিংশতি প্রশ্ন এবং আন্বীক্ষিকী বিষয়ে একটি প্রশ্ন করেন। আমি তাহার উত্তর দিবার জন্য চিন্তা করিতে একটু সময় লইয়া, সরস্বতী দেবীকে ধ্যান করিয়া পরা অন্বীক্ষিকীর সাহায্যে উপনিষৎ ও তাহার বাক্যশেষ অর্থাৎ উপসংহার-বাক্যকে মনের দ্বারা মন্থন করি। হে রাজশ্রেষ্ঠ! এই চতুর্থী অর্থাৎ ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি হইতে চতুর্থী বিদ্যা আন্বীক্ষিকী মোক্ষের নিমিত্ত হিতকরী। এই বিদ্যা তোমাকে বলিয়াছি। বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্ব আন্বীক্ষিকী বিষয়ে যে পঞ্চবিংশ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য তাহার উত্তরে গৌতম মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠও সেই শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং বিশ্বাবসুর প্রশ্ন যে অন্য কোন আন্বীক্ষিকী বিষয়ে নহে, ইহা নীলকণ্ঠেরও স্বীকৃত। তাহার পরে যাজ্ঞবল্ক্য যে চতুর্থী বিদ্যা আন্বীক্ষিকীর সাহায্যে মনের দ্বারা উপনিষদের মন্থন করিয়াছিলেন, তাহাও যে বিচার দ্বারা, তর্কের দ্বারা শাস্ত্রার্থ নির্ণয়ের অনুকূল কোন তর্কবিদ্যা, ইহাও বুঝা যায়। মহাভারতের পূর্ব্বোক্ত স্থলে ঐ আন্বীক্ষিকীকে চতুর্থী বিদ্যা ও মোক্ষের নিমিত্ত হিতকরী বলিয়া বেদবিদ্যাকে ঐ আন্বীক্ষিকী বিদ্যাযুক্ত করিবে অর্থাৎ বেদবিদ্যার দ্বারা শ্রবণ ও আন্বীক্ষিকী বিদ্যার দ্বারা মনন করিবে, ইহাও বলা হইয়াছে। এবং পরে সাঙ্গোপাঙ্গ সমগ্র বেদ পড়িয়াও বেদবেদ্য না বুঝিলে সে ব্যক্তি 'বেদভারহর' এই কথা বলিয়া বেদবাক্য বিচারের আবশ্যকতাও সূচিত হইয়াছে। এবং ন্যায়শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবল বেদবাদের আশ্রয়ে মোক্ষলাভ হয় না; মোক্ষ আছে, এই মাত্র বলা যায়। অর্থাৎ বিচার দ্বারা বেদার্থের শ্রবণ আবশ্যক, তর্কের দ্বারা মনন আবশ্যক; নচেৎ কেবল বেদ পড়িলেই মুক্তি হয় না, এই কথাও শান্তিপর্ব্বে পাওয়া যায়[১]। সুতরাং মহাভারতোক্ত ঐ আন্বীক্ষিকী—ন্যায়বিদ্যা, যাজ্ঞবল্ক্য উহার সাহায্যে বেদার্থ বিচার করিয়াছেন এবং ঐ বিদ্যার পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, ইহা বুঝা যাইতে পারে। ন্যায়সূত্র-বৃত্তিকার মহামনীষী বিশ্বনাথও মহাভারতের পূর্ব্বোক্ত 'তত্রোপনিষদঞ্চৈব' ইত্যাদি শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া নিজ বক্তব্য সমর্থন করিয়াছেন। বাৎস্যায়ন, উদ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্য—চতুর্থী আন্বীক্ষিকী বিদ্যাকে ন্যায়বিদ্যাই বলিয়াছেন। বৈদান্তিক-চূড়ামণি শ্রীহর্ষও নৈষধীয় চরিতে গৌতম-প্রকাশিত ন্যায়বিদ্যাকে

১। বেদবাদং ব্যপাশ্রিত্য মোক্ষোঽস্তীতি প্রভাষিতুং।
অপেতন্যায়শাস্ত্রেণ সর্ব্বলোকবিগর্হিণা॥—শান্তিপর্ব্ব, ২৬৮ অঃ। ৬৪।

আন্বীক্ষিকী বলিয়া মোক্ষোপযোগী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন[১]। তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ উপাধ্যায় গৌতম-প্রণীত ন্যায়শাস্ত্রকে আন্বীক্ষিকী নামে উল্লেখ করিয়া সর্ব্ববিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বাচার্য্যগণের কথার দ্বারাও মহাভারতোক্ত ঐ চতুর্থী বিদ্যা আন্বীক্ষিকীকে যে তাঁহারা গৌতম-প্রকাশিত ন্যায়বিদ্যাই বুঝিয়াছিলেন, ইহা বুঝা যায়। তাহা হইলে এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিতে পারি যে, মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ইন্দ্রকাশ্যপ-সংবাদে যে আন্বীক্ষিকীকে 'নিরর্থিকা' বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা নাস্তিক তর্কবিদ্যা। তাহাকে গৌতম-প্রকাশিত বেদানুগত আন্বীক্ষিকী বলিয়া পূর্ব্বোক্ত আচার্য্যগণ বুঝেন নাই। মন্বাদি সংহিতা ও মহাভারতে যেরূপে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার উল্লেখ আছে এবং মহাভারত সভাপর্ব্বে যে ন্যায়বিদ্যায় নারদ মুনির পাণ্ডিত্য বর্ণন করিয়াছেন এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু বিশ্বাবসু যে আন্বীক্ষিকী বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট প্রশ্ন করিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্য তাহার উত্তর দিয়াছেন, ইহাও মহাভারত বর্ণন করিয়াছেন, সেই আন্বীক্ষিকী বিদ্যাকে মহাভারত 'নিরর্থিকা' বলিয়া নিন্দা করিতে পারেন না, ইহাও প্রণিধান করা আবশ্যক।

বস্তুতঃ মহাভারত শান্তিপর্ব্বে ইন্দ্রকাশ্যপ-সংবাদে বেদনিন্দক, নাস্তিক, সর্ব্বশঙ্কী, বেদবাক্য বিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের আক্রমণকারী, কটুভাষী, মূর্খ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ঐরূপ ব্যক্তিরই নিন্দা করিয়া, তদ্দ্বারা বৈদিক মত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নাস্তিক-মতাবলম্বী হইবে না, বৈদিক মার্গেই অবস্থান করিবে, এই উপদেশ করিয়াছেন। ঐ স্থলে যে তর্কবিদ্যায় অনুরক্ত হইলে বেদপ্রামাণ্য, পরলোকাদি কিছুই মানে না, নাস্তিত্ববাদী ও সংশয়বাদী হয়, বেদনিন্দাদি তথাকথিত কার্য্য করে, সেই তর্কবিদ্যায় অনুরক্ত হইবে না, অর্থাৎ তাহার মত গ্রহণ করিবে না—ইহাও উপদেশ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে নিরর্থক তর্কবিদ্যা বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে[২]। মহাভারতের ঐ নিন্দার উদ্দেশ্য বুঝিলে এবং

১। উদ্দেশপর্ব্বণ্যপি লক্ষণেঽপি দ্বিধোদিতৈঃ ষোড়শভিঃ পদার্থৈঃ।
আন্বীক্ষিকীং যদ্দশনব্রিমালীং তাং মুক্তিকামা কলিতাং প্রতীমঃ ১০ সর্গ।৮১

২। অহমাসং পণ্ডিতকো হৈতুকো বেদনিন্দকঃ।
আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাং ।।
হেতুবাদান্ প্রবদিতা বক্তা সৎসু চ হেতুমৎ।
আক্রোষ্টা চাভিবক্তা চ ব্রহ্মবাক্যেষু চ দ্বিজান্ ।।
নাস্তিকঃ সর্ব্বশঙ্কী চ মূর্খঃ পণ্ডিতমানিকঃ।
তস্যেয়ং ফলনির্ব্বৃত্তিঃ শৃগালত্বং মম দ্বিজ ।।—শান্তিপর্ব্ব।১৮০।৪৭।৪৮।৪৯।

সমস্ত কথাগুলি চিন্তা করিলে ঐ তর্কবিদ্যা যে বার্হস্পত্য সূত্রাদি নাস্তিক তর্কবিদ্যা এবং তর্কবিদ্যাত্ব নিবন্ধন তাহাতে আন্বীক্ষিকী শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। বেদনিন্দক, নাস্তিক, বেদবিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের আক্রমণকারী, কটুভাষী ইত্যাদি কথার দ্বারা মহাভারত ঐরূপ ব্যক্তিকে কোন্ তর্কবিদ্যায় অনুরক্ত বলিয়াছেন, তাহা সুধীগণ চিন্তা করিবেন। শেষে অনুশাসন পর্ব্বে ঐ কথা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে[১] এবং অনুশাসনপর্ব্বে অন্যত্র যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তরে ভীষ্মদেব প্রত্যক্ষমাত্র-প্রামাণ্যবাদী নাস্তিকদিগকে হৈতুক বলিয়া নাস্তিত্ববাদী ও সংশয়বাদী এবং অজ্ঞ হইয়াও পণ্ডিতাভিমানী ইত্যাদিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন[২]। ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন যে, হেতুশাস্ত্র আশ্রয় করিয়া যে ব্রাহ্মণ মূলশাস্ত্রদ্বয় শ্রুতি ও স্মৃতিকে অবজ্ঞা করিবে, সেই বেদনিন্দক নাস্তিককে সাধুগণ বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন[৩]। ভাষ্যকার মেধাতিথি, টীকাকার গোবিন্দরাজ ও নারায়ণ মনুবচনোক্ত ঐ হেতুশাস্ত্রকে নাস্তিক-তর্কশাস্ত্র বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবশ্য যে কোন তর্কশাস্ত্র আশ্রয় করিয়া, নাস্তিক হইয়া বেদনিন্দা করিলেও সাধুগণ তাহার শাসন করিবেন, ইহাও বেদনিন্দক ও নাস্তিক শব্দের দ্বারা হেতু সূচনা করিয়া মনু প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্তু মনুসংহিতায় নাস্তিক ও আস্তিক দ্বিবিধ হৈতুক ব্রাহ্মণের কথা পাওয়া যায়। যাহারা শাস্ত্র না মানিয়া শাস্ত্রের বিরুদ্ধে হেতুবাদবক্তা, তাহারা নাস্তিক হৈতুক। মনু এই হৈতুককেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—"হৈতুকান্

১। অপ্রামাণ্যঞ্চ বেদানাং শাস্ত্রাণাঞ্চাভিলঙ্ঘনং ॥
অব্যবস্থা চ সর্ব্বত্র এতন্নাশনমাত্মনঃ ॥১১।
ভবেৎ পণ্ডিতমানী যো ব্রাহ্মণো বেদনিন্দকঃ।
আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাং ॥ ১২।
হেতুবাদান্ ব্রুবন্ সৎসু বিজেতাহহেতুবাদিকঃ।
আক্রোষ্টা চাতিবক্তা চ ব্রাহ্মণানাং সদৈব হি ॥১৩।
সর্ব্বাভিশঙ্কী মূঢ়শ্চ বালঃ কটুকবাগপি।
বোদ্ধব্যস্তাদৃশস্তাত নরং শ্বানং হি তং বিদুঃ ॥১৪।—অনুশাসনপর্ব্ব, ৩৭ অঃ।

২। প্রত্যক্ষং কারণং দৃষ্ট্বা হৈতুকাঃ প্রাজ্ঞমানিনঃ।
নাস্তীত্যেবং ব্যবস্যন্তি সত্যং সংশয়মেব চ ॥
তদযুক্তং ব্যবস্যন্তি বালাঃ পাণ্ডিতমানিনঃ। ইত্যাদি। অনুশাসন, ১৬২।৫।৬।

৩। যোহবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্ দ্বিজঃ।
স সাধুভির্ব্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ ॥—মনুসংহিতা, ২।১১।

বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্‌মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ"। ৪।৩০। এখানে পাষণ্ডী, বকবৃত্তি প্রভৃতি নিন্দিত ব্যক্তিগণের সাহচর্য্যবশতঃ হৈতুক শব্দের দ্বারা নাস্তিক হৈতুকদিগকেই বুঝা যায়। ভাষ্যকার মেধাতিথি প্রভৃতিও সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তাহার পরে ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য, শাস্ত্রার্থ নির্ণয়ের জন্য মনু প্রথমে যে মহাপরিষদের বর্ণন করিয়াছেন, তন্মধ্যে মনু—বেদজ্ঞ, মীমাংসা-তর্কজ্ঞ, নিরুক্তজ্ঞ ও ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত হৈতুক পণ্ডিতেরও উল্লেখ করিয়াছেন[১] এবং ঐ হৈতুক পণ্ডিতকে বেদত্রয়জ্ঞ পণ্ডিতের পরেই দ্বিতীয় স্থান প্রদান করিয়াছেন। এখানে মেধাতিথি অনুমানাদি-কুশল পণ্ডিতকে এবং কুল্লুক ভট্ট শ্রুতিস্মৃতির অবিরুদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে হৈতুক বলিয়াছেন। মনু কেবল তর্কী বলিলেও মীমাংসাতর্কজ্ঞ পণ্ডিতের ন্যায় ন্যায়তর্কজ্ঞ পণ্ডিতও বুঝা যাইত। তথাপি বিশেষ করিয়া তর্কীর পূর্ব্বে হৈতুক পণ্ডিতের উল্লেখ করিয়াছেন।[২] তাহা হইলে শ্রুতি-স্মৃতির অবিরুদ্ধ ন্যায়শাস্ত্র সুচিরকাল হইতেই আছে এবং ঐ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন আস্তিক হৈতুক পণ্ডিতও ধর্ম্মতত্ত্বনির্ণয়-পরিষদের অন্যতমরূপে পরিগণিত হইয়াছেন, মনুর কথার দ্বারাই বুঝা যাইতেছে এবং মনু পূর্ব্বে যে হৈতুকদিগকে অসম্মান্য বলিয়াছেন তাহারা নাস্তিক হৈতুক, ইহাও বুঝা যাইতেছে। তাহা হইলে মনুসংহিতা ও মহাভারতের পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বচনগুলির সমন্বয়ের দ্বারা মহাভারতে বেদপ্রামাণ্য পরলোকাদি-সমর্থক সর্ব্বশাস্ত্রপ্রদীপ গোতম ন্যায়শাস্ত্রের নিন্দা নাই, নাস্তিক তর্কশাস্ত্রেরই নিন্দা আছে, ইহা আমরা বুঝিতে পারি।

বাল্মীকি রামায়ণে পাওয়া যায়, শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে বলিয়াছিলেন যে,[৩]

১। ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ।
ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্ব্বে পরিষৎ স্যাৎ দশাবরা ।।—মনুসংহিতা ।১২।১১১।
(হৈতুকঃ) অনুমানাদিকুশলঃ। তর্কী অয়মূহাপোহবুদ্ধিযুক্তঃ। মেধাতিথি। (হৈতুকঃ) শ্রুতি-স্মৃত্য-বিরুদ্ধন্যায়শাস্ত্রজ্ঞঃ। (তর্কী) মীমাংসাত্মকতর্কবিৎ। কুল্লুকভট্ট।

২। শঙ্খ ও লিখিত মুনিও নৈয়ায়িক পণ্ডিতকে ধর্ম্মনির্ণয় পরিষদের অন্যতমরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্টের কথায় পাওয়া যায়। "শঙ্খলিখিতৌ চ ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্ববিদঃ ষড়ঙ্গবিদ্‌, ধর্ম্মবিদ্‌-বাক্যবিদ্‌, নৈয়ায়িকো নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী পঞ্চাগ্নিরিতি দশাবরা পরিষদিত্যূচতুঃ"।—ন্যায়মঞ্জরী, ২৫৫ পৃষ্ঠা।

৩। কচ্চিন্ন লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণাংস্তাত সেবসে।
অনর্থকুশলা হ্যেতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ।।
ধর্ম্মশাস্ত্রেষু মুখ্যেষু বিদ্যমানেষু দুর্ব্বুধাঃ।
বুদ্ধিমান্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থং প্রবদন্তি তে ।।—অযোধ্যাকাণ্ড ।১০০।৩৮।৩৯।

বৎস! তুমি ত লোকায়তিক ব্রাহ্মণদিগকে সেবা কর না? পরে কেন তাহাদিগের সেবা করা রামচন্দ্রের অনভিপ্রেত, তাহা বলিতে রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, যেহেতু তাহারা অনর্থ-কুশল এবং অজ্ঞ হইয়াও পণ্ডিতাভিমানী। মুখ্য ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ বেদ এবং তন্মূলক ধর্ম্মশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সেই দুর্ব্বুধগণ আন্বীক্ষিকী বুদ্ধি লাভ করিয়া অনর্থক প্রবাদ করে। এখানে লোকায়তিক ব্রাহ্মণমাত্রকেই অনর্থকুশল দুর্ব্বুধ প্রভৃতি বলিয়া যে নিন্দা করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নাস্তিক মতাবলম্বী ব্রাহ্মণগণেরই নিন্দা বুঝা যায়। সুতরাং এখানে আন্বীক্ষিকী বুদ্ধি বলিতে নাস্তিক-তর্কবিদ্যায় অনুরাগাদি-মূলক নাস্তিকের বুদ্ধি বা মতবিশেষই বুঝা যায়। টীকাকার রামানুজ এখানে চার্ব্বাক-মতাবলম্বীদিগকে প্রথম প্রকার লোকায়তিক বলিয়া ন্যায় মতাবলম্বীদিগকে দ্বিতীয় প্রকার লোকায়তিক বলিয়াছেন। রামানুজের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা গ্রহণ করা না গেলেও পূর্ব্বকালে ন্যায়শাস্ত্রও যে লোকায়ত নামে অভিহিত হইত, ইহা রামানুজের কথায় বুঝা যায়। সুতরাং নৈয়ায়িকদিগকেও রামানুজ লোকায়তিক শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু রামায়ণে প্রথম শ্লোকে যে লোকায়তিকগণ নিন্দনীয়রূপে বুদ্ধিস্থ, দ্বতীয় শ্লোকেও তাহারাই 'তৎ'শব্দের দ্বারা বুদ্ধিস্থ, ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক। আস্তিক হৈতুক মাত্রকেই বাল্মীকি ঐরূপে বর্ণন করিতে পারেন না। নাস্তিক হৈতুক সম্প্রদায় গৌতম ন্যায়শাস্ত্র হইতে তর্ক শিক্ষা করিয়া তাহার সাহায্যে নাস্তিক-মতের সমর্থন করিতে পারেন। বাল্মীকি তাহা বলিলেও ন্যায়শাস্ত্রের নিন্দা হয় না। তাহা হইলে অন্য শাস্ত্রেরও নিন্দা হইতে পারে। বেদপ্রামাণ্য-সমর্থক ন্যায়-বৈশেষিকের আর্য সিদ্ধান্তের ঐরূপে নিন্দা শ্রীরামচন্দ্র করিয়াছেন, ইহাও বাল্মীকি বর্ণন করিতে পারেন না। পরন্তু শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভায় হেতুবাদকুশল হৈতুক পণ্ডিতগণেরও অন্যান্য আস্তিক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত সসম্মানে নিমন্ত্রণ দেখিতে পাই[১]। মূল কথা, লোকায়তিকশব্দের প্রয়োগ করিয়া রামায়ণে হৈতুক পণ্ডিত মাত্রেরই নিন্দা হয় নাই। মনুসংহিতায় যেমন হৈতুক শব্দের প্রয়োগ করিয়াই নাস্তিক হৈতুকদিগকে অসম্মান্য বলা হইয়াছে, তদ্রূপ রামায়ণেও লোকায়তিক শব্দের প্রয়োগ করিয়া নাস্তিক হৈতুকদিগকেই অসম্মান্য বলা হইয়াছে। তবে প্রাচীন

১। হেতুপচারকুশলান্ হৈতুকাংশ্চ বহুশ্রুতান্।—রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ১০৭-৮। হৈতুকান্ তার্কিকান্।—রামানুজ।

কালে ন্যায়শাস্ত্রও লোকায়ত নামে অভিহিত হইত, ইহা বহুশ্রুত প্রাচীনের নিকটে শুনিয়াছি। রামানুজের কথাতেও তাহা বুঝা যায়। পরন্তু অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য তাঁহার সম্মত আন্বীক্ষিকী বিদ্যার মধ্যে লোকায়ত বলিয়াছেন[১]। কৌটিল্য ন্যায়শাস্ত্র না বলিয়া লোকায়ত শব্দের দ্বারা বার্হস্পত্য সূত্রাদি নাস্তিক তর্কবিদ্যাকেই গ্রহণ করিলে তিনি 'বিদ্যা' ও 'আন্বীক্ষকী' শব্দের যে ব্যুৎপত্তি সূচনা করিয়াছেন এবং আন্বীক্ষিকী বিদ্যার যে সকল ফল কীর্ত্তনপূর্ব্বক প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা সুসংগত হয় না। সর্ব্ববিদ্যার প্রদীপ, সর্ব্ব কর্ম্মের উপায়, সর্ব্ব ধর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া শেষে যে প্রশংসা বলিয়াছেন, তাহার দ্বারাও তিনি যে ন্যায়শাস্ত্রকেও আন্বীক্ষিকীর মধ্যে বলিয়াছেন, তাহা বুঝা যায়। বাৎস্যায়ন ভাষ্যেও 'প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানাং' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ন্যায়শাস্ত্রের ঐরূপ প্রশংসা দেখা যায়। সুতরাং কৌটিল্য লোকায়ত শব্দের দ্বারা ন্যায়-শাস্ত্রেরই উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারি। বার্হস্পত্য সূত্রের মত লোকসম্মত—লোকবিস্তৃত। অধিকাংশ লোকই দেহকে আত্মা মনে করে, পরলোকে বিশ্বাস করে না, প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা ঐ মত লোকসিদ্ধ, ইত্যাদি প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে ঐ মত ও ঐ মত-প্রতিপাদক গ্রন্থ সুচিরকাল হইতে 'লোকায়ত' নামে উল্লিখিত দেখা যায়। বাৎস্যায়নের কামসূত্রেও (১।২ অঃ, ২৪ সূত্রে) পরলোকে অবিশ্বাসী সংশয়বাদীর 'লোকায়তিক' নামে উল্লেখ দেখা যায়। এইরূপ বহু গ্রন্থেই লৌকায়তিক ও কোন কোন স্থলে লোকায়তিক শব্দেরও প্রয়োগ পূর্ব্বোক্ত অর্থে দেখা যায়।[২] কিন্তু ন্যায়দর্শনের অনেক মত

১। চতস্র এবং বিদ্যা ইতি কৌটিল্যঃ। তাভির্ধর্ম্মার্থৌ যদ্‌বিদ্যাৎ তদ্‌বিদ্যায়া বিদ্যাত্বং। সাংখ্যং যোগং লোকায়তঞ্চ ইত্যান্বীক্ষকী। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ত্রয্যাং। অর্থানর্থৌ বার্ত্তায়াং। নয়ানয়ৌ দণ্ডনীত্যাং। বলাবলে চৈতাসাং হেতুভিরন্বীক্ষমাণা লোকস্যোপকরোতি ব্যসনেঽভ্যুদয়ে চ বুদ্ধিমবস্থাপয়তি, প্রজ্ঞাবাক্য-ক্রিয়া-বৈশারদ্যঞ্চ করোতি—

> প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানাং উপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং
> আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং শশ্বদান্বীক্ষকী মতা ।।—অর্থশাস্ত্র।

২। লোকায়ত শব্দের পরে তদ্ধিতপ্রত্যয়ে "লৌকায়তিক" প্রয়োগের ন্যায় "লোকায়তিক" এইরূপ প্রয়োগও হয়, ইহা রামানুজ ও নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যানুসারে তাঁহাদিগের সম্মত বুঝা যায়। রামায়ণ ও হরিবংশে "লৌকায়তিক" এইরূপ পাঠও প্রকৃত হইতে পারে। কোন বহুশ্রুত উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে শুনিয়াছি, "লোকায়তি" শব্দের উত্তরে তদ্ধিত প্রত্যয়েই কোন কোন স্থলে লোকায়তিক শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ইহ লোকেই যাহাদিগের আয়তি, (উত্তরকাল) অর্থাৎ যাহাদিগের মতে উত্তরকালীন পরলোক নাই, এইরূপ অর্থে লোকায়তিক বলিতে নাস্তিক। রামায়ণে তাহারাই নিন্দিত।

লোকসিদ্ধ। আত্মার কর্ত্তৃত্বাদি সর্ব্বলোকসিদ্ধ এবং সকল লোকই তর্ক করে, অনুমান করে, অনুমানের দ্বারা লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করে; সুতরাং ন্যায়শাস্ত্রের অনেক সিদ্ধান্ত লোকসিদ্ধ, উহা লোকযাত্রা-নির্ব্বাহক বলিয়া লোকে বিস্তৃত, এইরূপ কোন ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রাচীন কালে ন্যায়শাস্ত্রও 'লোকায়ত' নামে অভিহিত হওয়া অসম্ভব নহে। নাস্তিক শাস্ত্রবিশেষেই লোকায়ত শব্দের ভূরি প্রয়োগে লোকায়ত শব্দের ঐ অর্থই প্রসিদ্ধ হওয়ায় পরিবর্ত্তী কালে ন্যায়শাস্ত্র বলিতে লোকায়ত শব্দের প্রয়োগ পরিত্যক্ত হইয়াছে, ইহাও অসম্ভব নহে। প্রাচীনগণের প্রযুক্ত অনেক শব্দ পরবর্ত্তিগণ সেই অর্থে ব্যবহার করেন নাই, ইহার প্রচুর প্রমাণ আছে। ভাষাপ্রয়োগের পরিবর্ত্তন সুচিরকাল হইতেই হইতেছে। প্রাচীন কালে বৈশেষিক অর্থে যোগ শব্দেরও প্রয়োগ হইত। হেমচন্দ্র সূরি যোগ শব্দের অন্যতম অর্থ বলিয়াছেন—'নৈয়ায়িক' (বাচস্পত্য অভিধানে যোগ শব্দ দ্রষ্টব্য)। প্রাচীন কালে নৈয়ায়িকগণ যৌগ নামেও অভিহিত হইতেন। পরন্তু হরিবংশের কোন শ্লোকে[২] 'লোকায়তিকমুখ্য' শব্দ দেখিতে পাই। সেখানে টীকাকার নীলকণ্ঠ প্রসিদ্ধ অর্থে অনুপপত্তি দেখিয়া লক্ষণা অবলম্বনে অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ লোকায়তিকমুখ্য বলিতে ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ বুঝিলে সেখানে কোন অনুপপত্তি থাকে না এবং সেখানে তাহাই বিবক্ষিত বলিয়া বুঝা যায়। মূল কথা, রামানুজের কথা, কৌটিল্যের কথা এবং হরিবংশের শ্লোক চিন্তা করিলে প্রাচীনকালে ন্যায়শাস্ত্র "লোকায়ত" নামেও অভিহিত হইত, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। লোকায়ত-শাস্ত্র দ্বিবিধ হইলে, আস্তিক ও নাস্তিক দ্বিবিধ লোকায়তিক হইতে পারে। হরিবংশে লোকায়তিক-মুখ্য বলিয়া আস্তিক লোকায়তিকেরই উল্লেখ হইয়াছে এবং রামায়ণে অনর্থকুশল, অজ্ঞ, দুর্ব্বুধ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা নিন্দা করিয়া কথিত লোকায়তিকদিগকে নাস্তিক বলিয়াই পরিস্ফুট করা হইয়াছে। মহাভারতে বেদনিন্দক, নাস্তিক প্রভৃতি বহু বাক্যের দ্বারা উহা সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট করিয়া বলা হইয়াছে। পরন্তু যদি লোকায়তিক শব্দের দ্বারা চার্ব্বাক-মতাবলম্বী ভিন্ন আর কাহাকে বুঝাই না যায়, ন্যায়শাস্ত্রের 'লোকায়ত' নামে উল্লেখ কোন কালে হয় নাই বলিয়া নির্ণীত হয়, অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য, বার্হস্পত্য সূত্রাদিকেই যদি 'লোকায়ত' বলিয়া আন্বীক্ষিকীর মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে রামায়ণে লোকায়তিক

২। ঐক্যনানাত্বসংযোগ-সমবায়-বিশারদৈঃ।
লোকায়তিক-মুখ্যৈশ্চ শুশ্রুবুঃ স্বনমীরিতং।—হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব্ব, ৬৭ অঃ, ৩০।

শব্দের দ্বারা নৈয়ায়িকের গ্রহণ অসম্ভব। সুতরাং রামানুজের ব্যাখ্যা কল্পনা-প্রসূত, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এ পক্ষেও অর্থশাস্ত্রে আন্বীক্ষিকীর মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের উল্লেখ নাই, এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করা যায় না। কারণ, কৌটিল্যের শেষ কথাগুলি পর্য্যালোচনা করিলে তিনি ন্যায়শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা না বুঝিয়া পারা যায় না। সুতরাং অর্থশাস্ত্রে যোগ শব্দের দ্বারা ন্যায় অথবা ন্যায়বৈশেষিক উভয়ই আন্বীক্ষিকীর মধ্যে কথিত হইয়াছে, ইহাই এ পক্ষে বুঝিতে হইবে। এবং অর্থশাস্ত্রে 'যোগং' এইরূপ পাঠই প্রকৃত বুঝিতে হইবে। ক্লীবলিঙ্গ 'যোগ' শব্দের যে প্রাচীন কালে ঐরূপ অর্থে প্রয়োগ হইত, তাহা ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের প্রয়োগের দ্বারা বুঝা যায়। হেমচন্দ্র সূরির কথা এবং আরও অনেক জৈন ন্যায়ের গ্রন্থের দ্বারা ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাৎস্যায়নের 'যোগানাং' এই কথার ব্যাখ্যায় তাহা দেখাইয়াছি। বাৎস্যায়নের 'সাংখ্যানাং যোগানাং' এই প্রয়োগ দেখিয়া কৌটিল্যের 'সাংখ্যং যোগং' এই প্রয়োগের প্রতিপাদ্য বুঝা যায়। অর্থশাস্ত্রে লোকায়ত বলিতে ন্যায়শাস্ত্র বুঝিলে, যোগ বলিতে কেবল বৈশেষিক অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে। আন্বীক্ষিকীর মধ্যে যোগশাস্ত্রও কৌটিল্যের বক্তব্য হইলে সাংখ্য শব্দের দ্বারাও সাংখ্য-প্রবচন উভয় দর্শনকেই তিনি গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু কৌটিল্যের ন্যায়শাস্ত্রকে আন্বীক্ষিকী না বলিলে হেতুর দ্বারা ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতির বলাবল পরীক্ষা করতঃ লোকের উপকার করিতে কৌটিল্যের কথিত কোন্ আন্বীক্ষিকী সম্পূর্ণ সমর্থ, ইহা চিন্তা করা আবশ্যক। মতান্তরে বিদ্যা ত্রিবিধ, ইহাও কৌটিল্য বলিয়াছেন। রামায়ণেও ত্রিবিধ বিদ্যার উল্লেখ আছে। তবে সে কথার দ্বারা আর বিদ্যা নাই, ইহা বুঝা যায় না। সেখানে বিদ্যার পরিগণনা উদ্দেশ্য নহে। মহাভারতেও কোন স্থলে ঐরূপ প্রসঙ্গে ত্রিবিধ বিদ্যারই উল্লেখ দেখা যায়। সে যাহা হউক, কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে ন্যায়শাস্ত্রকে কোন বিদ্যার মধ্যে গণ্য করেন নাই, সুতরাং তাঁহার সময়ে ন্যায়শাস্ত্র ছিল না বা তাহার আলোচনা ছিল না, এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।

পরন্তু যে দিন হইতে শাস্ত্রার্থবিচারের আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতেই যে ব্যাকরণশাস্ত্রের ন্যায় ন্যায়শাস্ত্র বিশেষরূপে আলোচিত হইতেছে, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, কিরূপে বিচার করিতে হইবে, বাদবিচার কাহাকে বলে, সদুত্তর কাহাকে বলে, অসদুত্তর কাহাকে বলে, ইত্যাদি বিচারকের জ্ঞাতব্য

সমস্ত বিষয় ন্যায়শাস্ত্রেই বর্ণিত হইয়াছে। বিচারোপযোগী সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থ ন্যায়শাস্ত্রেরই প্রস্থান। অনুমান-প্রমাণের বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধ হেতু বা হেত্বাভাসের নিরূপণপূর্ব্বক তাহার সর্ব্বাঙ্গ এই ন্যায়শাস্ত্রেই সম্যক্‌রূপে নিরূপিত হইয়াছে। শাস্ত্রার্থ-নির্ণয়ে অনুমান-প্রমাণের সম্যক্ জ্ঞানও যে নিতান্ত আবশ্যক ইহা সর্ব্বসম্মত। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম প্রপাঠকের তৃতীয় অনুবাকে প্রত্যক্ষ ও স্মৃতি-পুরাণাদি শব্দপ্রমাণের সহিত অনুমান-প্রমাণেরও উল্লেখ আছে।[১] ভগবান্ মনুও পূর্ব্বোক্ত পরিষদ্‌বর্ণনের পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মতত্ত্ব-নির্ণীষু ব্যক্তি প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্ররূপ শব্দ-প্রমাণের সহিত অনুমান-প্রমাণকেও সম্যক্‌রূপে বুঝিবেন এবং তাহার পরশ্লোকেই আবার বলিয়াছেন যে, যিনি বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের দ্বারা শাস্ত্র-বিচার করেন, তিনিই ধর্ম্ম জানেন, যিনি ঐরূপ তর্কের দ্বারা শাস্ত্র বিচার করেন না, তিনি শাস্ত্রগম্য ধর্ম্ম জানিতে পারেন না।[২] এখানে মনু-বচনের 'তর্ক' শব্দের দ্বারা অনেকে তর্কশাস্ত্র বুঝিয়াছেন। ন্যায়সূত্র-বৃত্তিকার বিশ্বনাথ যে জন্য এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে তাঁহারও উহাই অভিপ্রেত বুঝা যাইতে পারে। অনেকে ঐ 'তর্ক' শব্দের দ্বারা অনুমান-প্রমাণ বুঝিয়াছেন।[৩] ভাষ্যকার মেধাতিথি প্রথমে ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়া মীমাংসা-শাস্ত্রোক্ত তর্কের কথাও বলিয়াছেন। কুল্লুক ভট্ট 'মীমাংসাদিন্যায়' বলিয়া প্রমাণ-সহকারী সর্ব্বপ্রকার তর্কই গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য "তর্ক" শব্দ পূর্ব্বোক্ত অনেক অর্থেই প্রযুক্ত দেখা যায়। অনুমান-প্রমাণ অর্থেও তর্ক শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। শারীরক-ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করও কোন কোন স্থলে ঐরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু মনু পূর্ব্বশ্লোকে প্রমাণত্রয়ের কথা বলিয়া পরশ্লোকে ঐ প্রমাণের সহকারী তর্কের কথাই বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। ঐ তর্ক

১। স্মৃতিঃ প্রত্যক্ষং ঐতিহ্যং অনুমানচতুষ্টয়ং। এতৈরাদিত্যমণ্ডলং সর্ব্বৈরেব বিধাস্যতে।। ১, ২।

২। প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমং।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা।।
আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।। ১২, ১০৫-৬।

৩। ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্ট মনুবচনোক্ত 'তর্ক' শব্দের অর্থ 'অনুমান'ই বলিয়াছেন। তর্কশব্দং কেচিদনুমানে প্রযুঞ্জতে যথা স্মৃতিকারাঃ আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ ইত্যাদি—ন্যায়মঞ্জরী, ৮৮ পৃষ্ঠা।

ন্যায়দর্শনোক্ত ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত তর্ক পদার্থ। উহা কেবল অনুমান-প্রমাণেরই সহকারী নহে, উহা সকল প্রমাণেরই সহকারী। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ও তার্কিকরক্ষাকার বরদরাজ ন্যায়দর্শনোক্ত তর্ক পদার্থের ব্যাখ্যায় তাহা বুঝাইয়াছেন এবং মীমাংসাশাস্ত্রোক্ত তর্কও যে ন্যায়দর্শনোক্ত তর্কপদার্থ অর্থাৎ যে তর্কের নাম "মীমাংসা", তাহাও ন্যায়দর্শনের ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত তর্ক পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা বুঝাইতে সেখানে মীমাংসাচার্য্যের কারিকাও উদ্ধৃত করিয়াছেন। বরদরাজ ন্যায়দর্শনোক্ত তর্ক পদার্থের ব্যাখ্যায় পূর্ব্বোক্ত মনু-বচন উদ্ধৃত করায় তিনি মনু-বচনের ঐ তর্ক শব্দের দ্বারা প্রমাণ-সহকারী ন্যায়দর্শনোক্ত উহবিশেষরূপ তর্কই বুঝিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। বেদান্তসূত্রে বেদব্যাস[১] "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি" এই কথা বলিয়া পরেই আবার ঐ সূত্রেই বলিয়াছেন যে, যদি বল—অন্য প্রকারে অনুমান করিব, তাহা হইলেও অর্থাৎ অনুমান করিতে পারিলেও সেই অনুমান-জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ শাস্ত্রনিরপেক্ষ কেবল তর্কজন্য জ্ঞান মোক্ষ-সাধন নহে। বেদব্যাস তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, এই কথা বলিয়া শেষে আবার ঐ কথা কেন বলিয়াছেন, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, তর্কমাত্রেরই প্রতিষ্ঠা নাই, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে লোকযাত্রার উচ্ছেদ হয়। পরন্তু যদি তর্কমাত্রই অপ্রতিষ্ঠ হয়, অনুমানমাত্রেরই প্রামাণ্য সন্দিগ্ধ হয়, তাহা হইলে তর্কমাত্রই যে অপ্রতিষ্ঠ, ইহা কোন্ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইবে? কতকগুলি তর্কের অপ্রতিষ্ঠা দেখিয়া তদ্দৃষ্টান্তে তর্কের দ্বারাই অর্থাৎ অনুমানের দ্বারাই তর্কমাত্রের অপ্রতিষ্ঠা সাধন করিতে হইবে। কিন্তু তর্কমাত্রই যদি অপ্রতিষ্ঠ বা সন্দিগ্ধ-প্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে তর্কমাত্রের অপ্রতিষ্ঠাও তর্কের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। শঙ্কর এইরূপ অনেক কথা বলিয়া তর্কমাত্রই অপ্রতিষ্ঠ বলা যায় না, ইহা বুঝাইয়াছেন। শেষে বেদার্থ নির্ণয়ের জন্য প্রমাণসহকারী অনেক তর্কবিশেষও আবশ্যক, সুতরাং তর্কমাত্রই অপ্রতিষ্ঠ বলা যায় না, ইহাও বলিয়াছেন। উহা সমর্থন করিতে সেখানে পূর্ব্বোক্ত 'প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ' ইত্যাদি মনু-বচন দুইটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেখানে আনন্দগিরি মনু-বচনের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, মনু-বচনে ধর্ম্ম শব্দের দ্বারা ব্রহ্মও পরিগৃহীত। অর্থাৎ বিচারের দ্বারা ধর্ম্মনির্ণয়ের ন্যায় ব্রহ্ম-নির্ণয়েও

১। সম্পূর্ণ বেদান্ত-সূত্রটি এই—তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষ-প্রসঙ্গঃ। ২, ১, ১১।

বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক আবশ্যক। তাহা হইলে আমরা বুঝিলাম, বেদান্তদর্শন বা শারীরক ভাষ্যে তর্কমাত্রকেই অপ্রতিষ্ঠ বলা হয় নাই। পরন্তু শাস্ত্রার্থনির্ণয়ে অনুমান-প্রমাণ ও প্রমাণ-সহকারী তর্কবিশেষ আবশ্যক, ইহা আচার্য্য শঙ্কর সমর্থনই করিয়াছেন। ঐ বিষয়ে মনুর কথা তিনিও স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তর্ককে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া কেহই শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে পারে না। বিচার দ্বারা যাঁহারাই শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তর্ক অবলম্বন করিয়াছেন। বেদব্যাসের বেদান্তবাক্য-মীমাংসাও তর্কই। তাহার অবিরোধী যে সকল তর্ক পূর্ব্বমীমাংসা ও ন্যায়দর্শনে কথিত হইয়াছে, সেগুলি ঐ বেদান্ত-বাক্য-মীমাংসার উপকরণ, ইহা ভাষ্যকার শঙ্কর ও ভামতী টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের কথাতেই ব্যক্ত আছে।[১] বেদান্তদর্শনে ভগবান্ বেদব্যাস সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে শব্দপ্রমাণের ন্যায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও যুক্তি অর্থাৎ অনুমান-প্রমাণকেও আশ্রয় করিয়াছেন। ("যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ। ২।১।১৮ সূত্র দ্রষ্টব্য)। বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর আত্মার নিত্যত্ব সাধন করিতে শেষে "ন্যায়াচ্চ" (৩।৪) ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা তর্কও প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থনের এবং শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যার জন্য সকল আচার্য্যই বহুবিধ তর্ক অবলম্বন করিয়াছেন। বিচারশাস্ত্রে, দর্শনশাস্ত্রে তর্ক সকলেরই অপরিহার্য্য অবলম্বন। সকলেই হেতু উল্লেখ করিয়া স্বপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন। হেতুবাদ পরিত্যাগ করিলে কেহই স্বপক্ষের সমর্থন ও বিজ্ঞাপন করিতেই পারেন না,—তাহা অসম্ভব। "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ," "তত্তু সমন্বয়াৎ", "ঈক্ষতের্নাশব্দং" ইত্যাদি বেদান্তসূত্রেও হেতু উল্লেখ করিয়া সিদ্ধান্ত সমর্থিত ও বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। গীতায় ভগবান্ও বলিয়াছেন,— "ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ" (১৩।৫), সেখানে ভাষ্যকার শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"হেতুমদ্ভির্যুক্তিযুক্তৈঃ।" শ্রীধরস্বামী "ঈক্ষতের্নাশব্দং" ইত্যাদি বেদান্তসূত্রের উল্লেখ করিয়াই ঐগুলি হেতুবিশিষ্ট, ইহা দেখাইয়াছেন। এখন যদি হেতুর দ্বারাই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে হয়, শব্দপ্রমাণেরও সহকারিরূপে হেতু বা যুক্তি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে হেতু কাহাকে বলে, কোন্ হেতুর দ্বারা

১। তস্মাদ্ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপন্যাসমুখেন বেদান্তবাক্য-মীমাংসা-তদবিরোধি-তর্কোপকরণা প্রস্তূয়তে—শারীরক ভাষ্য, ১ম সূত্রভাষ্যের শেষ। সূত্রতাৎপর্য্যমুপসংহরতি তস্মাদিতি। বেদান্ত-মীমাংসা-তাবৎ তর্ক এব, তদবিরোধিনশ্চ যেঽধ্বরেঽপি তর্কা অধ্বরমীমাংসায়াং ন্যায়ে চ বেদপ্রত্যক্ষাদি প্রামাণ্য-পরিশোধনাদিযুক্তাস্তে উপকরণং যস্যাঃ সা তথোক্তা। ভামতী।

কোন্ সাধ্য সিদ্ধ হইতে পারে, কোন্ হেতুর দ্বারা তাহা পারে না, হেতুর দোষ কি, গুণ কি, ইত্যাদি বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিতে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য কি, শাস্ত্রে কোথায় কোন্ শব্দ কোন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাও সকলকেই বুঝিতে হইবে। উপক্রম, উপসংহার প্রভৃতি ষড়্‌বিধ লিঙ্গের দ্বারা বেদের যে তাৎপর্য্য নির্ণয়ের কথা বলা হইয়াছে, সেও ত তর্কের দ্বারাই তাৎপর্য্য নির্ণয়। ফলকথা, হেতু ও হেত্বাভাসের তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত বিচার দ্বারা শাস্ত্রার্থ নির্ণয় হইতে পারে না। তাই ভগবান্ মনু ধর্ম্মনির্ণয়-পরিষদে হৈতুক পণ্ডিতকে দ্বিতীয় স্থান প্রদান করিয়াছেন। হেতু ও হেত্বাভাসের তত্ত্ব, অনুমান-প্রমাণের তত্ত্ব, তর্কের তত্ত্ব ন্যায়শাস্ত্রেই সম্যক্‌রূপে—সম্পূর্ণরূপে নিরূপিত হইয়াছে, ঐগুলি ন্যায়বিদ্যারই প্রস্থান। সুতরাং হেতুর দ্বারা কিছু বুঝিতে বা বুঝাইতে হইলেই ন্যায়শাস্ত্র অপরিহার্য্য অবলম্বন। তাই পুরাণে এবং বেদের চরণব্যূহে ন্যায়শাস্ত্র "ন্যায়তর্ক" নামে বেদের উপাঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে[১]। আচার্য্য শঙ্করও বেদান্তদর্শনের তৃতীয় সূত্রভাষ্যে বেদপ্রামাণ্য সমর্থন করিতে বেদকে বলিয়াছেন—"অনেক-বিদ্যাস্থানোপবৃংহিত"। অনেক অঙ্গ ও উপাঙ্গ বেদের উপকরণ। পুরাণ, ন্যায়মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র এবং শিক্ষাকল্পাদি ষড়ঙ্গ, এই দশটি বিদ্যাস্থান অর্থাৎ বেদার্থবোধে হেতু। বেদ ঐ দশটি বিদ্যাস্থানের দ্বারা উপকৃত। বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি টীকাকার শঙ্করের ঐ কথার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং বেদার্থ-বোধের জন্য সুপ্রাচীন কালেও বেদাঙ্গ ব্যাকরণশাস্ত্রের ন্যায় বেদের উপাঙ্গ ন্যায়শাস্ত্রও আলোচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই এবং যে আকারেই হউক, ন্যায়শাস্ত্র সুপ্রাচীন কালেও ছিল, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। সকল বিদ্যারই পরমাত্মা হইতে প্রবৃত্তি, ইহা উপনিষদে বর্ণিত আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে তন্মধ্যে "সূত্রাণি" এই কথাও পাওয়া যায় (২।৪।১০)। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় "সূত্রাণি ভাষ্যাণি" এই কথার দ্বারা সূত্রের ন্যায় ভাষ্যেরও উল্লেখ দেখা যায় (৩ অ০, ১৮৯)। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও ন্যায়ভাষ্যের শেষে অক্ষপাদ ঋষির সম্বন্ধে ন্যায়শাস্ত্র প্রতিভাত হইয়াছিল, এই কথা বলিয়াছেন; অক্ষপাদ ঋষিকে ন্যায়শাস্ত্রকর্ত্তা বলেন নাই। ন্যায়বার্ত্তিকারম্ভে উদ্দ্যোতকরও অক্ষপাদ মুনিকে ন্যায়শাস্ত্রের বক্তা বলিয়াছেন, কর্ত্তা বলেন নাই।

১। মীমাংসা-ন্যায়তর্কশ্চ উপাঙ্গঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।।—ন্যায়সূত্রবৃত্তিকারের উদ্ধৃত পুরাণ-বচন। তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্য ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। তথা প্রতিপদমনুপদং ছন্দো ভাষা ধর্ম্মো মীমাংসা ন্যায়তর্কা ইত্যুপাঙ্গানি।—চরণব্যূহ।

পরন্তু বিচারপূর্ব্বক বেদার্থবোধে যেমন ন্যায়শাস্ত্র আবশ্যক, তদ্রূপ মুমুক্ষুর শ্রবণের পর কর্ত্তব্য মননে ন্যায়শাস্ত্র বিশেষ আবশ্যক। কারণ, শাস্ত্র দ্বারা যে তত্ত্বের শ্রবণ অর্থাৎ শাব্দ বোধ করিবে, অনুমান-প্রমাণের দ্বারা ঐ নির্ণীত তত্ত্বের পুনর্জ্ঞানই মনন। শ্রুত তত্ত্বে দৃঢ়শ্রদ্ধ হইবার জন্যই বহু হেতুর দ্বারা ঐ জ্ঞাত বিষয়েও পুনঃ পুনঃ অনুমানরূপ মননের বিধি শাস্ত্রে উপদিষ্ট। (মন্তব্যশ্চোপ-পত্তিভিঃ)। শ্রবণের পরে মনের দ্বারা ধ্যানাদিই মনন নহে। ধ্যানাদি (নিদিধ্যাসন) মননের পরে বিহিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক শ্রুতির "মন্তব্যঃ" এই কথার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার শঙ্করও বলিয়াছেন—"পশ্চান্মন্তব্যস্তর্কতঃ"। অর্থাৎ শ্রবণের পরে তর্কের দ্বারা মনন করিবে, উপনিষদুক্ত যোগাঙ্গবিশেষ উহরূপ তর্ককেই মনন বলেন নাই। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় সূত্র-ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, বেদান্তবাক্যের অবিরোধি অনুমান প্রমাণও শ্রুত বেদার্থজ্ঞানের দৃঢ়তার জন্য অবলম্বনীয়। কারণ, শ্রুতিই তর্ককে সহায়রূপে স্বীকার করিয়াছেন। এই বলিয়া শেষে "শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" এই শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন। ভামতী টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র সেখানে ঐ মননের ব্যাখ্যা করিতে যুক্তিবিশেষের দ্বারা বিবেচনকে মনন বলিয়াছেন এবং ঐ যুক্তিকে বলিয়াছেন—অর্থাপত্তি অথবা অনুমান। মীমাংসক-মতে অর্থাপত্তি অনুমান-প্রমাণ হইতে ভিন্ন প্রমাণ; সুতরাং বাচস্পতি মিশ্র তাহারও প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন। ন্যায়মতে অর্থাপত্তি অনুমানবিশেষ। মূলকথা, শ্রবণের পরে অনুমানরূপ মনন সর্ব্বসম্মত। আচার্য্য শঙ্করও তর্কের দ্বারা মনন কর্ত্তব্য বলিয়া তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আত্মবিষয়ে কুতর্কেরই নিষেধ করিয়াছেন, তর্কমাত্রের নিষেধ করেন নাই। পরন্তু শ্রুতিই যে ঐ বিষয়ে তর্ককে অবলম্বনীয় বলিয়াছেন, ইহাও শঙ্কর বলিয়াছেন। কঠোপনিষৎ যেখানে আত্মাকে "অতর্ক্য" বলিয়াছেন এবং বলিয়াছেন,—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া," সেখানে ভাষ্যকার শঙ্কর ঐ তর্ক শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—শাস্ত্র-নিরপেক্ষ স্বাধীন বুদ্ধির দ্বারা উহরূপ কুতর্ক[১]।

শাস্ত্রদ্বারা আত্মার শ্রবণ (শাব্দ বোধ) করিয়াই পরে সেই শাস্ত্র-সম্মতরূপে অনুমানরূপ মনন করিতে হইবে। শাস্ত্রকে অপেক্ষা না করিয়া স্বাধীন বুদ্ধিবলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না। এবং বেদশাস্ত্র-বিরোধি তর্ক—কুতর্ক। এই

১। অতর্ক্যমতর্ক্যঃ স্ববুদ্ধ্যাভ্যূহেন কেবলেন তর্কেণ। নহি কুতর্কস্য প্রতিষ্ঠা কচিদ্-বিদ্যতে। নৈষা তর্কেণ স্ববুদ্ধ্যভ্যূহমাত্রেণ।—কঠ, ১অ, ২ বল্লী। ৮-৯। শঙ্করভাষ্য।

সকল সিদ্ধান্ত বেদপ্রামাণ্যবাদী সকল সম্প্রদায়েরই সম্মত। ন্যায়শাস্ত্রেও উহার বিপরীত বাদ নাই। বেদপ্রামাণ্য-সমর্থক গৌতম মতে শাস্ত্রবিরুদ্ধ অনুমান ন্যায়ই নহে, উহা ন্যায়াভাস নামে কথিত; উহা অপ্রমাণ। ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গোতম কোন স্থানে কোন বিরুদ্ধ অনুমানের চিন্তা করিয়া "শ্রুতি-প্রামাণ্যাচ্চ" (৩।১।২৯) এই সূত্রের দ্বারা ঐ অনুমানের বেদবিরুদ্ধতা সূচনা করত: উহার অপ্রামাণ্য সূচনা করিয়া গিয়াছেন। গৌতম মতে শ্রুতি অপেক্ষায় যুক্তিই প্রধান, অনুমানের অবিরোধ শ্রুতির প্রামাণ্য, ইহা একেবারেই অসত্য কথা। শ্রুতিসেবক ঋষির ঐরূপ মত হইতেই পারে না। প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরুদ্ধ অনুমানই অন্বীক্ষা। সেই অন্বীক্ষা নির্ব্বাহের জন্যই আন্বীক্ষিকী বিদ্যার প্রকাশ। সুতরাং ন্যায়দর্শনে মীমাংসা-দর্শনের ন্যায় বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বাক্যার্থ বিচার হয় নাই। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রবক্তা গোতম যে বেদকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল অনুমানের দ্বারাই আত্মাদি তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, ইহাও মনে করা যায় না। বেদপ্রতিপাদিত পদার্থকে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ ন্যায়ের দ্বারা পরীক্ষা করিলে ঐ পদার্থে কাহারও সংশয় বা আপত্তি থাকে না। কারণ, ঐ পঞ্চাবয়বের মূলে সর্ব্বপ্রমাণ থাকায় ঐ ন্যায়নির্ণীত পদার্থ সর্ব্বপ্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হয়। এই জন্য ঐ ন্যায়কে পরমন্যায় বলা হইয়াছে; উহাই প্রকৃত ন্যায়। ঐ প্রকৃত ন্যায়ের অন্তর্গত প্রতিজ্ঞার মূলে সর্ব্বত্রই আগম-প্রমাণ থাকিবে। বেদার্থ বিষয়ে বিবাদ হইলে ঐ পরমন্যায় অবলম্বনে বেদার্থের পরীক্ষা আবশ্যক হয়। গৌতমের পঞ্চাবয়বরূপ ন্যায় নিরূপণের ইহা মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্যাখ্যাত বেদার্থের সমর্থন করিতে দার্শনিক আচার্য্যগণ সকলেই অনুমানেরও অনেক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। বেদান্তসূত্রেও তাহা পাওয়া যাইবে। কেবল অনুমানের দ্বারাও অনেক স্থলে আচার্য্যগণ সকলেই অনেক তত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু যে অনুমান বেদবিরুদ্ধ বলিয়া নির্ণীত হইবে, তাহা বৈদিক সম্প্রদায়ের সকলের মতেই অপ্রমাণ। কোন্ অনুমান বেদবিরুদ্ধ, তাহা নির্ণয় করিতেও পূর্ব্বে বেদান্ত নির্ণয় আবশ্যক। বেদে বহু প্রকারে বহু দুর্ব্বোধ তত্ত্বের বর্ণন আছে। সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর বেদে সকল সিদ্ধান্তই বর্ণিত আছে। পূর্ব্বপক্ষরূপে সমস্ত নাস্তিক মতেরও উল্লেখ আছে। বেদের সর্ব্বাংশই মহর্ষিগণের অধিগত ছিল। যে সকল সিদ্ধান্ত জ্ঞাতব্যরূপে বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যার দ্বারা জ্ঞাপন আবশ্যক। সকল বেদজ্ঞ মহর্ষিগণ স্মৃতির দ্বারা তাহার জ্ঞাপন ও

সমর্থন না করিলে আর কেহ তাহা করিতে পারে না। বেদার্থ স্মরণপূর্ব্বক পুরাণশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, মীমাংসাশাস্ত্র প্রভৃতির প্রণেতা মহর্ষিগণ শিষ্ট, তাঁহারা সকলেই বেদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই সকল বিদ্যাস্থানের দ্বারা বেদ উপকৃত, ইহা আচার্য্য শঙ্করের বক্তব্যবিশেষ বুঝাইতে শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন[১]। মূলকথা, তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ জীবের সকল দুঃখের নিদান মিথ্যাজ্ঞান-নিবৃত্তিরূপ মুখ্য উদ্দেশ্যে কৃপা করিয়া নানাপ্রকারে বেদবর্ণিত নানা সিদ্ধান্তেরই ব্যাখ্যা ও সমর্থন করিয়াছেন। অধিকারানুসারে গুরু ও শাস্ত্র-সাহায্যে বিচার দ্বারা শ্রবণ ও মনন করিলে গুরূপদিষ্ট তত্ত্বের পরোক্ষ জ্ঞানই জন্মিয়া থাকে। পরোক্ষ জ্ঞান না জন্মিলে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভে অধিকার জন্মে না; সুতরাং পরোক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য বিবিধ তত্ত্বের বিচারাদি আবশ্যক হইয়া থাকে। শাস্ত্রোক্ত উপায়ে কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন পূর্ব্বক ধ্যান-ধারণাদির ফলেই চরমজ্ঞেয় তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়। সেজন্য মুমুক্ষু মাত্রকেই যোগশাস্ত্রোক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গোতমও শেষে এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলেই সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করিবার জন্য, বিচারের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভের সহায়তা করিবার জন্য দার্শনিক ঋষিগণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বর্ণনা করিলেও তাঁহাদিগের মতভেদ দেখিয়া প্রকৃত অধিকারীর শ্রবণ-মননাদি সাধনা আজও উঠিয়া যায় নাই। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বহু মহাজনের আবির্ভাব হইয়াছে। বিভিন্ন সিদ্ধান্তগুলির বিচার ও সমালোচনা হইয়াছে। তাহার ফলে যে জ্ঞানরাজ্যের কোনই উন্নতি হয় নাই, তদ্দ্বারা তত্ত্বনির্ণয়ের পথে আজ পর্য্যন্ত কোন লোকই যে অগ্রসর হন নাই, ইহা বলিলে পরম সত্যের অপলাপ করা হইবে। ঋষিগণ হইতে যে সকল মহাপুরুষগণ, আচার্য্যগণ সুচির কাল হইতে বহু প্রকারে জ্ঞানরাজ্যের বিপুল বিস্তার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদিগের গুরু। সকলের সিদ্ধান্তই তত্ত্বনির্ণীষুর জ্ঞাতব্য। সিদ্ধান্তের ভেদ না থাকিলে বিচার প্রবৃত্ত হয় না; এজন্য মহর্ষি গৌতম ষোড়শ পদার্থের মধ্যে সিদ্ধান্তের বিশেষ উল্লেখপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত চতুর্ব্বিধ বলিয়া সিদ্ধান্তের

১। "অনেকবিদ্যাস্থানোপবৃংহিতস্য"। পুরাণ-ন্যায়মীমাংসাদয়ো দশ বিদ্যাস্থানানি তৈস্তয়া তয়া দ্বারা উপকৃতস্য। তদনেন সমস্ত শিষ্টজনপরিগ্রহেণাপ্রামাণ্যশঙ্কাপ্যপাকৃতা। পুরাণাদি-প্রণেতারো হি মহর্ষয়ঃ শিষ্টাস্তৈস্তয়া তয়া দ্বারা বেদান্ ব্যাচক্ষাণৈস্তদর্থঞ্চাদরেণানুতিষ্ঠদ্ভিঃ পরিগৃহীতো বেদ ইতি।—ভামতী, ৩ সূত্র।

ভেদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। গৌতম অন্য দর্শনের সিদ্ধান্তকেও সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। সকল সিদ্ধান্তবাদীই বিভিন্ন প্রকার তর্কের দ্বারা শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়া ঐ সিদ্ধান্তকে শ্রৌত বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। বিচারদ্বারা তত্ত্বনির্ণীযুর সে সমস্ত ব্যাখ্যাও আলোচ্য। ন্যায়াচার্য্যগণ যেরূপে শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে যথাস্থানে পাওয়া যাইবে। এখন প্রকৃত কথা এই যে, মুমুক্ষুর তত্ত্ব শ্রবণের পরে বহু হেতুর দ্বারা ঐ তত্ত্বের যে মনন করিতে হইবে, তাহাতে ন্যায়দর্শন সকল সম্প্রদায়েরই পরম সহায়। কারণ, ন্যায়দর্শনে আত্মার দেহাদি-ভিন্নত্ব, নিত্যত্ব প্রভৃতি সে সকল সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তের মননের হেতু বলা হইয়াছে, তাহা সকল সাধকেরই গ্রাহ্য। আত্মা নিত্য, আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন, এইরূপে বহু হেতুর দ্বারা দীর্ঘকাল মনন করিলে পরলোক, জন্মান্তর, কর্ম্মফল প্রভৃতি সিদ্ধান্তে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। ঐ সকল সিদ্ধান্তে দৃঢ় বিশ্বাস সকল সাধকেরই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। এইরূপ আরও অনেক সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তের সমর্থন ন্যায়দর্শনে আছে। ন্যায়দর্শন যে ঐ সকল মননের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, তাহা নির্ব্বিবাদ। পরন্তু যে সম্প্রদায় গুরূপদেশ অনুসারে যেরূপেই যে তত্ত্বের মনন করিবেন, ঐ মননের হেতুজ্ঞান এবং ঐ হেতুতে ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রভৃতি তাঁহার নিতান্তই আবশ্যক। অনুমানরূপ মনন নির্ব্বাহ করিতে হইলে তাহাতে যে সকল জ্ঞান আবশ্যক, তাহা ন্যায়শাস্ত্রের সাহায্যেই সম্যক্ লাভ করা যায়। হেতু ও হেত্বাভাসের তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত যথার্থরূপে মনন হইতেই পারে না। সুতরাং বেদের আদেশানুসারে সকল সম্প্রদায়ের সাধকেরই যখন অনুমানরূপ মনন করিতেই হইবে, তখন সেই মনন নির্ব্বাহের জন্য ন্যায়শাস্ত্র সকলেরই আবশ্যক। শ্রবণ-মননের কোনই প্রয়োজন নাই, পরন্তু শাস্ত্র-বিচার ও তর্ক, ভক্তির পরিপন্থী ; সুতরাং উহা বর্জ্জনীয়, ইহা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত নহে। শাস্ত্রানুসারী কোন সম্প্রদায়ই ইহা বলেন নাই ও বলিতে পারেন না। শ্রবণ ও মনন ব্যতীত কেহ উত্তমাধিকারী হইতে পারে না। যে কোন জন্মে শ্রবণ ও মনন করিয়া মহাত্মগণ সকলেই উত্তমাধিকারী হইয়াছেন এবং সকলকেই তাহা করিয়া উত্তমাধিকারী হইতে হইবে। শ্রীচৈতন্যদেবও শাস্ত্রযুক্তি-সুনিপুণ ব্যক্তিকেই উত্তমাধিকারী[১] বলিয়া কৃতশ্রবণ কৃতমনন ব্যক্তিকেই উত্তমাধিকারী বলিয়াছেন এবং তিনি জিজ্ঞাসু সন্ন্যাসিগণকে তাঁহার অবলম্বিত ঈশ্বর-পরিণাম-সিদ্ধান্ত

১। শাস্ত্রযুক্তি-সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
উত্তমাধিকারী তিঁহো তারয়ে সংসার॥—চৈ° চ°, মধ্য, ২২।

শ্রবণ করাইয়া হেতু ও দৃষ্টান্ত অবলম্বনে ঐ সিদ্ধান্তে আপত্তি খণ্ডন পূর্ব্বক তর্কদ্বারা নির্ব্বিকারস্বরূপে ঈশ্বরের মনন-পদ্ধতিও প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি জিগীষাবশতঃই সেখানে বহু বিচার ও তর্ক করেন নাই, ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক[২]।

এ পর্য্যন্ত শাস্ত্র ও শাস্ত্র-ব্যাখ্যার আচার্য্যগণের বাক্য অবলম্বনে অনেক কথার আলোচনা করা গেল। এই গ্রন্থের প্রথম হইতে ১১৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পড়িলে ন্যায়দর্শনের প্রতিপাদ্য ও প্রয়োজন সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যাইবে। পুনরুক্তি অকর্ত্তব্য বলিয়া এখানে আর সে সকল কথা বলা গেল না।

ন্যায়দর্শনের অধ্যায়াদি-সংখ্যা

ন্যায়দর্শনে পাঁচটি অধ্যায় আছে। প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি করিয়া আহ্নিক আছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, এক দিবসে যতগুলি রচিত হইয়াছিল, তাহাই একটি আহ্নিক নামে কথিত হইয়াছে। দশ দিনে সমস্ত ন্যায়সূত্র রচিত হওয়ায় দশটি আহ্নিক হইয়াছে। কিন্তু ন্যায়-সূত্রকার মহর্ষি সর্ব্বপ্রথমে এক দিবসে যতগুলি সূত্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, তাহাই আহ্নিক নামে কথিত হইয়াছে, ইহাও বুঝা যায়। বাচস্পত্য অভিধানে পণ্ডিতপ্রবর তারানাথ তর্কবাচস্পতি আহ্নিক শব্দের অন্যতম অর্থ লিখিয়াছেন সূত্রগ্রন্থের ভাষ্যের পাদাংশ ব্যাখ্যাবিশেষ। এবং এক দিবসে পাঠ্য, ইহাই ঐ আহ্নিক শব্দের যৌগিক অর্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু সূত্রগ্রন্থের অংশবিশেষও আহ্নিক নামে কথিত হইয়াছে। তদনুসারেই তাহার ভাষ্যেরও অংশবিশেষ আহ্নিক নামে কথিত বলিয়া বুঝা যায়। পরে যে দেবীপুরাণের বচন প্রদর্শন করিব, তাহাতে ন্যায়সূত্রকার গৌতম দশ দিনে প্রথমে শিষ্যগণকে ন্যায়সূত্র পড়াইয়াছিলেন, ইহা পাওয়া যাইবে।

পঞ্চাধ্যায়ী ন্যায়সূত্রই যে মহর্ষি অক্ষপাদের প্রণীত, ইহা ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি আচার্য্যগণ নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছেন। তাঁহারা এ বিষয়ে কোন সংশয়েরও

২। অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্। স্বেচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম ॥
তথাপি অচিন্ত্য শক্ত্যে হয় অবিকারী। প্রকৃত মণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি ॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে। তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে ॥
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য শক্তি হয়। ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি ইথে কি বিস্ময় ॥
—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ৭ম প০ ।

সূচনা করেন নাই। কিন্তু এখন কোন কোন ঐতিহাসিক মনীষীর সমালোচনায় ইহাও পাইয়াছি যে, প্রচলিত ন্যায়দর্শনের অধিকাংশ সূত্রই পরে অন্য কর্ত্তৃক রচিত। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় পরে রচনা করিয়া সংযোজিত করা হইয়াছে। ঐ সকল অধ্যায়ে বৌদ্ধ মতের আলোচনা থাকায়, উহা বৌদ্ধ-যুগে রচিত এবং মূল ন্যায়শাস্ত্র কেবল হেতুবিদ্যা ; উহাতে অধ্যাত্ম-বিদ্যার কোন কথাই ছিল না। এই গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই নবীন মতের আলোচনা পাওয়া যাইবে এবং গ্রন্থ-শেষে সমালোচনা দ্বারা সকল কথা বুঝা যাইবে।

পঞ্চাধ্যায় ন্যায়দর্শনই মহর্ষি অক্ষপাদের প্রণীত, এ বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণের মধ্যে কোনরূপ মতভেদের চিহ্ন না থাকিলেও ন্যায়সূত্রের সংখ্যা ও অনেক সূত্রে পাঠে পূর্ব্বাচার্য্যগণের মধ্যে বহু মতভেদ দেখা যায়। বাৎস্যায়নের পূর্ব্ব হইতেই নানা কারণে ন্যায়সূত্র বিকৃত ও কল্পিত হইয়াছিল। বাৎস্যায়ন ন্যায়সূত্রের উদ্ধার করিয়া ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। বাৎস্যায়নের পূর্ব্বেও যে ন্যায়সূত্রের সংখ্যা ও পাঠ লইয়া বিবাদ ছিল, তাহা বাৎস্যায়নের কথার দ্বারাও অনেক স্থানে মনে আসে। যথাস্থানে সে কথার আলোচনা করিয়াছি। বাৎস্যায়ন ন্যায়ভাষ্যে ভাষ্যলক্ষণানুসারে প্রথমতঃ সূত্রের ন্যায় সংক্ষিপ্ত বাক্য রচনা করিয়া পরে নিজেই ঐ নিজ বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাকেই বলে "স্বপদ বর্ণন"। পরে বাৎস্যায়নের ঐ সংক্ষিপ্ত বাক্যগুলির মধ্যে অনেক বাক্যকে অনেকে ন্যায়সূত্র-রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। আবার প্রকৃত ন্যায়সূত্রকেও অনেকে বাৎস্যায়নের ভাষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন কালে হস্ত-লিখিত পুথিতে সূত্র ও ভাষ্য কোন চিহ্নাদি যোগ ব্যতীত লিপিবদ্ধ থাকায় অনেকের ঐরূপ ভ্রম হইয়াছে। সেই ভ্রমের ফলেও ন্যায়সূত্র বিষয়ে কতকগুলি মত-ভেদ হইয়া পড়িয়াছে। আবার অনেকে স্বমত সমর্থনের জন্যও ন্যায়সূত্রের কল্পনা করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যায়। ন্যায়সূত্রবিবরণকার রাধামোহন গোস্বামি-ভট্টাচার্য্য চতুর্থাধ্যায়ের সর্ব্বশেষে "তত্ত্বন্তু বাদরায়ণাৎ" এইরূপ একটি সূত্রের উল্লেখ করিয়া তাহারও বিবরণ করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন হইতে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পর্য্যন্ত কোন আচার্য্যই ঐরূপ সূত্রের উল্লেখ করেন নাই ; ঐ ভাবের কথাই কেহ বলেন নাই। নবীন গোস্বামিভট্টাচার্য্য যে ঐ সূত্রটি রচনা করিয়াছেন, ইহা বলা যায় না। তিনি ঐ সূত্রটি কোন পুস্তকে পাইয়া, উহা ন্যায়সূত্র হওয়াই সম্ভব ও আবশ্যক মনে করিয়া উহার উল্লেখ করিয়াছেন মনে হয়। কিন্তু ঐ সূত্রটি যে পরে কোন পণ্ডিতের রচিত, ইহা চিন্তা

করিলেই বুঝা যায়। মহর্ষি অক্ষপাদ ন্যায়দর্শনে বলিবেন যে, "যাহা বলিলাম, তাহা তত্ত্ব নহে। তত্ত্ব কিন্তু বাদরায়ণ হইতে অর্থাৎ বেদব্যাস-প্রণীত শাস্ত্র হইতে জানিবে", ইহা কি সম্ভব? কোন দর্শনকার ঋষি কি এইরূপ কথা বলিয়াছেন বা বলিতে পারেন? গোস্বামিভট্টাচার্য্যও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া শেষে উহা সংগত বোধ না হওয়ায় কষ্ট-কল্পনা করিয়া অন্য প্রকারে ব্যাখ্যা করিতে গিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও ঐরূপ ভাব একেবারে যায় নাই। ফলকথা. বহু কারণেই ন্যায়সূত্রের সংখ্যা ও পাঠ বিষয়ে বহু মত-ভেদ হইয়াছে। প্রাচীন উদ্দ্যোতকরের সময়েও ন্যায়সূত্র-পাঠে মতভেদ ছিল, ইহা তাঁহার বার্ত্তিকে প্রকটিত আছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ অতিরিক্ত কয়েকটি সূত্রের উল্লেখ পূর্ব্বক তাহার বৃত্তি করিয়াছেন। ভাষ্যকারের সংক্ষিপ্ত বাক্যমধ্যেও তাঁহার কোন কোন সূত্র দেখা যায়। বিশ্বনাথের পূর্ব্বে উদয়নাচার্য্য বোধসিদ্ধি বা ন্যায়পরিশিষ্ট নামে এবং গঙ্গেশের পুত্র বর্দ্ধমান উপাধ্যায় "অন্বীক্ষানয়তত্ত্ববোধ" নামে ন্যায়সূত্রবৃত্তি রচনা করিয়াছেন। মিথিলেশ্বরসূরি নবীন বাচস্পতিমিশ্র ন্যায়তত্ত্বালোক নামে ন্যায়সূত্রবৃত্তি রচনা করিয়া ন্যায়সূত্র-পাঠ নির্ণয়ের জন্য ন্যায়সূত্রোদ্ধার নামে গ্রন্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ফলকথা, ন্যায়সূত্র পাঠাদি বিষয়ে সুচিরকাল হইতেই যে নানা মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নানা গ্রন্থের দ্বারাই বুঝা যায়। এবং তাহার দ্বারা পূর্ব্বকালে ন্যায়সূত্র যে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে নানাভাবে আলোচিত হইয়া বিকৃত ও কল্পিত হইয়াছিল, ইহাও বুঝা যায়। তাহাতেই সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকা নির্ম্মাণ করিয়াও ন্যায়সূত্রের সংখ্যা ও পাঠাদি বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া যাইবার জন্য "ন্যায়সূচীনিবন্ধ" রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র ঐ গ্রন্থে ন্যায়দর্শনের পাঁচ অধ্যায়ে যে যে সূত্রের দ্বারা যে নামে যে প্রকরণ আছে, তাহাও সেই স্থানেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বশেষে আবার সমস্ত সূত্রাদির গণনার দ্বারা ইহাও লিখিয়া গিয়াছেন যে, "এই ন্যায়শাস্ত্রে অধ্যায় ৫। আহ্নিক ১০। প্রকরণ ৮৪। সূত্র ৫২৮। পদ ১৯৬। অক্ষর ৮৩৮৫। বাচস্পতি মিশ্র এইরূপে সমস্ত ন্যায়সূত্রের অক্ষর-সংখ্যা পর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করিয়া কেন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ইহা সুধীগণ চিন্তা করিয়া দেখুন। ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকাকার সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রই যে "ন্যায়সূচীনিবন্ধ" রচনা করিয়াছেন, ইহাই পণ্ডিত-সমাজের সিদ্ধান্ত। কারণ, ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকার দ্বিতীয় মঙ্গলাচরণ-

শ্লোকটি ন্যায়সূচীনিবন্ধের প্রারম্ভেও দেখা যায় এবং ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকার প্রারম্ভে "ইচ্ছামঃ কিমপি পুণ্যং" ইত্যাদি যে চতুর্থ শ্লোকটি আছে, উহা (চতুর্থ চরণ "উদ্যোতকরগবীনাং" এই স্থলে "শ্রীগোতমসুগবীনাং" এইরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া) "ন্যায়সূচীনিবন্ধে"র শেষে উল্লিখিত দেখা যায় এবং ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকার শেষে কথিত "সংসারজলধিসেতৌ" ইত্যাদি শ্লোকটিও ন্যায়সূচী-নিবন্ধের শেষে দেখা যায়। গ্রন্থারম্ভেও "শ্রীবাচস্পতিমিশ্রেণ" এইরূপ কথা রহিয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র নামে অন্য কোন পণ্ডিত ঐ গ্রন্থ রচনা করিলে তিনি সুবিখ্যাত বাচস্পতি মিশ্রের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকাদি লিপিবদ্ধ করিয়া নিজের পরিচয়-বোধের বিরোধি কার্য্য কেন করিবেন? ঐ সব শ্লোক তাঁহার নিবদ্ধ করিবার কারণই বা কি আছে? অন্য কোন একজন পণ্ডিত "ন্যায়সূচীনিবন্ধ" রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে শেষে অপর কেহ তাৎপর্য্যটীকাকারের শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন, এইরূপ কল্পনারও কোন কারণ নাই। নিষ্কারণে ঐরূপ কল্পনা করিলে নানা গ্রন্থেই ঐরূপ কল্পনা করা যায়। পরন্তু বাচস্পতি মিশ্র ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকায় যেরূপ সূত্রপাঠের উল্লেখ করিয়াছেন, ন্যায়সূচী-নিবন্ধের সূত্রপাঠের সহিত তাহার সাম্য দেখা যায়। দুই এক স্থানে যে একটু বৈষম্য দেখা যায়, তাহা লেখক বা মুদ্রাকরের প্রমাদ-জন্য, ইহা বুঝিবার কোন বাধা নাই। মুদ্রিত তাৎপর্য্যটীকা গ্রন্থে অনেক স্থলে ন্যায়সূত্র পাঠের উল্লেখ দেখাও যায় না (দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রারম্ভ দ্রষ্টব্য)। আবার মুদ্রিত তাৎপর্য্যটীকায় লেখক বা মুদ্রাকরের প্রমাদবশতঃ কোন কোন স্থলে অনেক অংশ মুদ্রিতও হয় নাই; ইহাও এক স্থলে ভাষ্য-ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছি। ফলকথা, তাৎপর্য্যটীকা গ্রন্থের সহিত ন্যায়সূচীনিবন্ধের কোন বিরোধ নির্ণয় করা যায় না। পরন্তু ন্যায়সূচীনিবন্ধের সূত্রপাঠের সহিত তাৎপর্য্যটীকার সূত্রপাঠের যে সাম্য দেখা যায়, তাহার দ্বারা তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রই যে ন্যায়সূচীনিবন্ধকার, ইহা বুঝা যায়। এই গ্রন্থের টিপ্পনীতে যথাস্থানে তাহা দেখাইয়াছি এবং ন্যায়সূত্রপাঠে মতভেদের আলোচনাও করিয়াছি। উদ্যোতকর ন্যায়বার্ত্তিকে ন্যায়সূত্রগুলির উদ্ধার করিয়াই পরে তাঁহার নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও সর্ব্বত্র তাঁহার সম্মত সূত্রপাঠ নির্ণয় করা যায় না। মুদ্রিত বার্ত্তিক গ্রন্থে সূত্রপাঠের বৈষম্যও দেখা যায়। উদ্যোতকর বার্ত্তিকনিবন্ধে অনেক স্থলে "ইহা সূত্র" ইত্যাদি প্রকারে সূত্রের পরিচয় দিলেও অনেক স্থলে ঐরূপ পরিচয় প্রকাশ করেন নাই। পরন্তু কোন

স্থলে সূত্রপাঠে বিবাদেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাই বাচস্পতি মিশ্র উদ্দ্যোতকরের বার্ত্তিকের টীকা করিয়াও শেষে স্বতন্ত্রভাবে ন্যায়সূত্রের পাঠাদি নির্ণয়ের জন্য ন্যায়সূচীনিবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাতে সমস্ত ন্যায়সূত্রের অক্ষর-সংখ্যা পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে পরবর্ত্তী বাচস্পতি মিশ্র ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি হইতে প্রাচীন বিশ্ববিখ্যাত বহুশ্রুত মহামনীষী তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায়সূচীনিবন্ধই সর্ব্বাপেক্ষা মান্য। তাই ন্যায়সূচীনিবন্ধানুসারেই সূত্রপাঠাদি গ্রহণ করিয়াছি। কোন কোন স্থলে ন্যায়সূচীনিবন্ধের সূত্রপাঠেরও সমালোচনা করিয়াছি। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে ন্যায়সূচীনিবন্ধানুসারেই সেই অধ্যায়ের প্রকরণগুলির নাম ও সূত্রসংখ্যা প্রকাশ করিয়াছি। প্রথমাধ্যায়ের প্রকরণাদি-সংখ্যা এই খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ন্যায়সূত্রকার মহর্ষির নামাদি

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন, উদ্দ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি বহু আচার্য্য ন্যায়সূত্রকার মহর্ষিকে অক্ষপাদ নামে উল্লেখ করিয়াছেন এবং ন্যায়সূত্র যে মহর্ষি গৌতম বা গোতম মুনির প্রণীত, ইহাও চিরপ্রসিদ্ধ আছে ; বহু গ্রন্থকারও তাহা লিখিয়াছেন। ন্যায়সূত্রকার মহর্ষির অক্ষপাদ নামবিষয়ে কোন বিবাদ নাই ; কিন্তু তিনি যে গৌতম বা গোতম, এ বিষয়ে বিবাদ আছে। কেহ বলেন গৌতম, কেহ বলেন গোতম। গোতম মুনি বলিলে অন্য গোতম মুনিকেও বুঝা যাইতে পারে, এই জন্যই মনে হয়, ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি দূরদর্শী আচার্য্যগণ অক্ষপাদ নামের উল্লেখ করিয়াছেন। এখন অক্ষপাদ কোন্ মুনির নামান্তর, ইহা জানিতে পারিলেই ন্যায়সূত্রকার মহর্ষির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। অনুসন্ধানের ফলে স্কন্দপুরাণে পাইয়াছি[1], অহল্যাপতি গৌতম মুনির নামান্তর অক্ষপাদ। অহল্যাপতি ঋষি যে গৌতম, ইহা রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বহু গ্রন্থে পাওয়া যায় এবং তিনি গৌতম নামেই সুপ্রসিদ্ধ। রামায়ণ, মহাভারতাদি বহু গ্রন্থের গৌতম পাঠ অশুদ্ধ বলা এবং ঐ সুপ্রসিদ্ধিকে উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু দার্শনিক মহাকবি শ্রীহর্ষ নৈষধীয়চরিতে ইন্দ্রের নিকটে

১। অক্ষপাদো মহাযোগী গৌতমাখ্যোঽভবন্মুনিঃ।
গোদাবরীসমানেতা অহল্যায়াঃ পতিঃ প্রভুঃ।।—মাহেশ্বরখণ্ড, কুমারিকাখণ্ড, ৫৫ অঃ, ৫ শ্লোক।

চার্ব্বাকের কথা বর্ণন করিতে ন্যায়শাস্ত্রবক্তা মুনিকে গোতম নামে উল্লেখ করিয়াছেন[১]। চার্ব্বাক ন্যায়শাস্ত্রবক্তা মুনিকে গোতম অর্থাৎ গোশ্রেষ্ঠ বা মহাবৃষভ বলিয়া উপহাস করিয়াছেন, ইহা শ্রীহর্ষ ঐ শ্লোকের দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীহর্ষ গৌতম বলিয়াও ঐ উপহাস বর্ণন করিতে পারিতেন। কারণ, গৌতম অর্থাৎ গোশ্রেষ্ঠের বংশধর, এই অর্থেও গৌতম বলিয়া চার্ব্বাক ঐ ভাবে উপহাস করিতে পারেন। কিন্তু শ্রীহর্ষ যখন গোতম নামের উল্লেখ করিয়াই চার্ব্বাকের উপহাস বর্ণন করিয়াছেন এবং "গোতমং তং অবেত্যৈব যথা বিথ্‌থ তথৈব সঃ" অর্থাৎ তোমরা বিচার করিয়াই তাহাকে গোতম বলিয়া যেমন জান, তিনি তাহাই, এইরূপ কথা বলিয়া ঐ উপহাস বর্ণন করিয়াছেন, তখন শ্রীহর্ষ যে ন্যায়শাস্ত্রবক্তা মুনিকে গোতমই বলিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নৈষধীয় চরিতের টীকাকারগণও ঐ শ্লোকের ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গোতমের বহু অপত্য বুঝাইলেই পাণিনি সূত্রানুসারে গোতম পদ সিদ্ধ হয়। সুতরাং "গোতমং" এই প্রয়োগে গোতমের অপত্য বুঝাও যায় না।

রামায়ণাদি বহু গ্রন্থে আমরা অহল্যাপতি ঋষির গৌতম নামে উল্লেখ দেখিলেও এবং এ দেশে ঐরূপ সুপ্রসিদ্ধি থাকিলেও মিথিলায় তিনি গোতম নামে প্রসিদ্ধ, ইহাও জানা যায়। বর্ত্তমান দারভাঙ্গা ষ্টেশনের ৭ ক্রোশ উত্তরে কামতৌল ষ্টেশন। সেখান হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূরে গোতমের আশ্রম নামে সুপ্রসিদ্ধ একটি স্থান আছে। তত্রত্য বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের কথায় জানা যায়, ঐ আশ্রমেই গোতম মুনি তপস্যা করিয়া গোতমী গঙ্গা আনয়ন করেন। তন্মধ্যে যে কূপ আছে, তাহা দেবদত্ত কূপ। এক সময়ে গোতম মুনি পিপাসায় পীড়িত হইয়া দেবগণের নিকটে জলপ্রার্থী হইলে দেবগণ অদূরস্থ কূপকে উদ্ধৃত করিয়া যে দিকে গোতম ঋষি অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দিক্ দিয়া বক্রভাবে প্রেরণ করেন। এইরূপে কূপ লইয়া দেবগণ জলের দ্বারা গোতম ঋষিকে

১। মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে সচেতসাং।
গোতমং তমবেত্যৈব যথা বিথ্‌থ তথৈব সঃ ॥ ১৭, ৭৫ ॥

যঃ সচেতসাং চৈতন্যবতাং সুখদুঃখানুভবাভাবাৎ শিলাত্বায় পাষাণাবস্থারূপায়ৈ মুক্তয়ে মুক্তিং প্রতিপাদয়িতুং শাস্ত্রমূচে, ন্যায়দর্শনং নির্ম্মমে, যূয়ং তং স্বয়মেব অবেত্য বিচার্য্যৈব গোতমং এতন্নামানং যথা বিথ্‌থ জানীত স এব তথা নাস্ত ইত্যর্থঃ। স গোতমো যথা যুষ্মাকং সম্মতস্তথা সমাপীত্যর্থঃ। নায়ং পরং নাম্না গোতমঃ, কিন্তু প্রকৃষ্টো গৌঃ গোতমো মহাবৃষভঃ পশুরেব। টীকাকারাঃ।

পরিতৃপ্ত করেন। ঋগ্বেদসংহিতায় এইরূপ বর্ণন আছে। পূর্ব্বোক্ত গোতমের আশ্রমের দুই ক্রোশ দূরে "আহিরিয়া" নামে প্রসিদ্ধ অহল্যাস্থান আছে। বর্ত্তমান ছাপরা নগরীর সন্নিহিত গঙ্গাতীরেও অহল্যাপতি গোতমের অপর আশ্রম ছিল। কিছু দিন পূর্ব্বে মহর্ষি গোতমের স্মরণার্থ ঐ স্থানে "গোতম পাঠশালা" নামে একটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট ঐ পাঠশালায় মাসিক ৫০৲ টাকা সাহায্য প্রদান করিতেছেন। কিন্তু মিথিলার আশ্রমেই ন্যায়সূত্র রচিত হইয়াছে, মিথিলাতেই ন্যায়সূত্রের প্রথম চর্চ্চা, ইহা মৈথিল পণ্ডিতগণের নানা কারণে বিশ্বাস। (পূর্ব্বোক্ত গোতমের আশ্রম সম্বন্ধে মৈথিলবার্ত্তা "ভারতবর্ষ" পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য)। বস্তুতঃ ঋগ্বেদসংহিতায়[১] গোতম ঋষির কূপ লাভের কথা আমরা দেখিতেছি। ঐ মন্ত্রের পূর্ব্বমন্ত্রের ব্যাখ্যায় সায়ণাচার্য্য পূর্ব্বোক্তরূপ আখ্যায়িকার বর্ণন করিয়াছেন। রাহূগণ গোতম ঐ সূক্তের ঋষি। কাশী সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়াধ্যক্ষ বহুদর্শী ঐতিহাসিক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয় প্রথমে ন্যায়কন্দলীর ভূমিকায়, মৎস্যপুরাণের ৪৮ অধ্যায়ে বর্ণিত উশিজ মহর্ষির পুত্র দীর্ঘতমা নামে অন্ধ গোতমকে ন্যায়সূত্রকার বলিয়াছিলেন। পরে ন্যায়বার্ত্তিক-ভূমিকায় তাঁহার ঐ সিদ্ধান্ত অজ্ঞাতমূলক বলিয়া নানা কল্পনার আশ্রয়ে রাহূগণ গোতমকেই ন্যায়সূত্রকার বলিয়াছেন। তিনি সূক্তদ্রষ্টা ও পুরোহিত বলিয়া তাঁহার শাস্ত্রকর্ত্তৃত্ব সম্ভব। দীর্ঘতমা গোতম অন্ধ, তাঁহার শাস্ত্রকর্ত্তৃত্ব সম্ভব নহে। পরন্তু অন্ধের অক্ষপাদত্ব প্রমাণ সহস্রেও হয় না। রাহূগণ (রাহূগণপুত্র) গোতম বিদেঘরাজের পুরোহিত ছিলেন, ইহা শতপথব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে[২]। অহল্যার পুত্র শতানন্দ জনকরাজার

১। জিহ্মং নুনুদ্রেঽবতং তয়া দিশাঽ-
সিঞ্চন্নুৎসং গোতমায় তৃষ্ণজে।
আগচ্ছন্তীমবসা চিত্রভানবঃ
কামং বিপ্রস্য তর্পয়ন্ত ধামভিঃ ॥ ১ ম; ১৪অ; ৮৫সূক্ত। ১১।

সায়ণভাষ্য।—মরুতো "অবতং" উদ্ধৃতং কূপং যস্যাং দিশি ঋষির্ব্বসতি "তয়া দিশা" "জিহ্মং" বক্রং তির্য্যঞ্চং "নুনুদ্রে" প্রেরিতবন্তঃ। এবং কূপং নীত্বা ঋষ্যাশ্রমেঽবস্থাপ্য "তৃষ্ণজে" তৃষিতায় "গোতমায়" তদর্থং "উৎসং" জলপ্রবাহং কূপাদুদ্ধৃত্য "অসিঞ্চন্" আহাবেঽবানয়ন্। এবং কৃত্বা "ঈম্" এনং স্তোতারং ঋষিং "চিত্রভানবো" বিচিত্রদীপ্তয়স্তে মরুতো "অবসা" ঈদৃশেন রক্ষণেন সহ "আগচ্ছন্তি" তৎসমীপং প্রাপ্নুবন্তি। প্রাপ্য চ "বিপ্রস্য" মেধাবিনো গোতমস্য "কামং" অভিলাষং "ধামভিঃ" আয়ুষো ধারকৈরুদকৈ "স্তর্পয়ন্ত" অতর্পয়ন্।

২। বিদেঘো হ মাথবোঽগ্নিং বৈশ্বানরং মুখে বভার। তস্য গোতমো রাহূগণঋষিঃ পুরোহিত আস। ৪অ০। ১ব্রা০।

পুরোহিত ছিলেন, ইহা বাল্মীকি রামায়ণেও বর্ণিত আছে। সুতরাং রাহূগণ গোতমই অহল্যাপতি। তাঁহারই পুত্র শতানন্দ। তিনি গৌতম নহেন। শ্রীহর্ষও ন্যায়সূত্রকারকে গোতম বলিয়াছেন। দ্বিবেদী মহাশয়ের এই সকল কথা ও শেষ সিদ্ধান্ত "ন্যায়বার্ত্তিক ভূমিকা" পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

দ্বিবেদী মহাশয়ের যুক্তির বিচার না করিয়া এখন এই সিদ্ধান্তে বক্তব্য এই যে, যদি ঋগ্বেদাদি-বর্ণিত রাহূগণ গোতমকেই অহল্যাপতি ও ন্যায়সূত্রকার বলিয়া গ্রহণ করা যায়, বিদেহ-রাজবংশে তাঁহার পৌরোহিত্য নিবন্ধন জনক রাজার পুরোহিত শতানন্দকে তাঁহারই পুত্র বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহা হইলেও তিনি গোতমবংশীয় বলিয়া তাঁহাকে গৌতম বলিতে হয়। কারণ, বৌধায়ন, গোত্রপ্রবর্ত্তক সপ্তর্ষির মধ্যে যে গোতমের নাম (পাঠান্তরে গৌতম) বলিয়াছেন, তাঁহারই দশটি শাখার মধ্যে রাহূগণ সপ্তম শাখা। বৌধায়ন গৌতমকাণ্ডে (২ অঃ) রাহূগণ ঋষিকেও গৌতমগণের মধ্যে বলিয়াছেন। সুতরাং রাহূগণ ঋষি গোত্রপ্রবর্ত্তক মূল পুরুষ গোতমের অপত্য হওয়ায় তিনি গৌতম। ফলকথা রাহূগণ যে গোত্রকারী মূল পুরুষ গোতম নহেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই ("নির্ণয়সিন্ধু" গ্রন্থের গোত্রপ্রবর-নির্ণয় প্রকরণ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং তিনি সূক্তদ্রষ্টা ও পুরোহিত বলিয়া গোতম-বংশে তাঁহার প্রাধান্য নিবন্ধন বেদে মূল পুরুষ গোতম নামে উল্লিখিত হইয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হয়। পূর্ব্বকালে মূল পুরুষের নামেও প্রধান ব্যক্তির নাম ব্যবহার ছিল। জনক রাজার পূর্ব্ব-পুরুষ নিমিরাজার পৌত্র জনক প্রথম জনক রাজা ছিলেন, তাঁহার নামানুসারেই রাজর্ষি জনক জনক নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, ইহা বাল্মীকি রামায়ণের কথায় বুঝা যায় (আদিকাণ্ড, ৭১ সর্গ দ্রষ্টব্য)। গোত্রকারী সপ্তর্ষি বসিষ্ঠাদিও পূর্ব্ববর্ত্তী বসিষ্ঠাদির অপত্য বলিয়া গোত্র হইয়াছেন অর্থাৎ বসিষ্ঠাদির অপত্যও বসিষ্ঠাদি নামে গোত্র হইয়াছেন, ইহাও "নির্ণয়সিন্ধু" গ্রন্থে কথিত হইয়াছে[১]। এখন যদি রাহূগণ, গোতমবংশীয় হইয়াও পূর্ব্বোক্ত কারণে বেদে গোতম নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শ্রীহর্ষও ঐ প্রসিদ্ধি অনুসারে এবং বৈদিক প্রয়োগানুসারে তাঁহাকে গোতম বলিয়া উল্লেখ করিতে পারেন। নচেৎ গোত্রকারী মূল পুরুষ গোতম মুনি অথবা অন্য কোন গোতম মুনি ন্যায়শাস্ত্রবক্তা

১। যদ্যপি বসিষ্ঠাদীনাং ন গোত্রত্বং যুক্তং তেষাং সপ্তর্ষিত্বেন অপত্যত্বাভাবাৎ তথাপি তৎপূর্ব্বভাবি-বসিষ্ঠাদ্যপত্যত্বেন গোত্রত্বং যুক্তং।—অতএব পূর্ব্বেষাং পরেষাঞ্চ এতদ্‌গোত্রং। নির্ণয়সিন্ধু, ২০২ পৃষ্ঠা।

এ বিষয়ে অন্য কোন প্রমাণ না থাকায় শ্রীহর্ষ তাহা কিরূপে বলিবেন? স্কন্দপুরাণে যখন অহল্যাপতি গৌতম মুনিরই অক্ষপাদ নাম পাওয়া যাইতেছে এবং মিথিলা প্রদেশে অহল্যাপতি মুনিই ন্যায়সূত্র রচনা করেন, এইরূপ পরম্পরাগত সংস্কারও তদ্দেশীয় এবং এতদ্দেশীয় বহু পণ্ডিতের আছে, তখন অন্য বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত অন্য কোন গোতম বা গৌতম মুনিকে ন্যায়সূত্রকার বলা যাইতে পারে না। মহামনীষী তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় বাচস্পত্য অভিধানে অহল্যাপতি মুনিকে গৌতমই বলিয়াছেন। তিনি স্কন্দপুরাণের বচনের উল্লেখ করেন নাই। তিনি শ্বেতবারাহ কল্পে ব্রহ্মার মানস পুত্র গোতমের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া তাঁহাকেই ন্যায়সূত্রকার বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অক্ষপাদ নামের বা ন্যায়সূত্র-কর্ত্তৃত্বের কোন প্রমাণ দেন নাই। পরে পূর্ব্বোক্ত শ্রীহর্ষের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি শ্রীহর্ষের শ্লোকানুসারেই ন্যায়সূত্রকারকে অহল্যাপতি গৌতম বলেন নাই, ইহা বুঝা যায়। বিশ্বকোষেও তাঁহারই কথার অনুবাদ করা হইয়াছে। শ্রীহর্ষের শ্লোকে আরও অনেকেই নির্ভর করিয়াছেন। আমিও তদনুসারে এই গ্রন্থে ন্যায়-সূত্রকারকে বহু স্থলে গোতম নামে উল্লেখ করিয়াছি। যে কারণেই হউক, শ্রীহর্ষ যখন ন্যায়সূত্রকারকে গোতম বলিয়াছেন, তখন তদনুসারে ন্যায়সূত্রকারকে গোতম বলা যাইতে পারে। তবে শ্রীহর্ষের ঐরূপ উল্লেখের পূর্ব্বোক্ত প্রকার কারণ বুঝিলে সামঞ্জস্য হয়; অহল্যাপতি মহর্ষির গৌতম নামেরও অপলাপ করিতে হয় না, লোকপ্রসিদ্ধিকেও উপেক্ষা করিতে হয় না। যাহাতে সর্ব্বসামঞ্জস্য হয়, সেইরূপ চিন্তা না করিয়া স্বপক্ষ সমর্থনের চিন্তাই কর্ত্তব্য নহে।*

গৌতমের অক্ষপাদ নাম সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, গৌতমের শিষ্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এক সময়ে গৌতমের মতের নিন্দা করায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, আর এ চক্ষুর দ্বারা উহার মুখ দর্শন করিব না।

---

* পরে দেবীপুরাণের কোন বচনে পাইয়াছি, "গবা বাচা তমুয়তি খেদয়তি" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে ন্যায়সূত্রকার অক্ষপাদ "গোতম" নামে এবং গোতমের বংশজাত বলিয়া "গৌতম" নামেও অভিহিত হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত অর্থে অক্ষপাদ "গোতম" নামে অভিহিত হইলেও কোন অসামঞ্জস্য থাকে না। সে বচনটি এই—

গৌর্ব্বাক্ তয়ৈব তমসন্ নয়ান্ গোতম উচ্যতে।
গোতমান্বয়জন্মেতি গৌতমোহপি স চাক্ষপাৎ॥

—শুম্ভনিশুম্ভমথনপাদ, ১৩ অঃ

শেষে বেদব্যাস স্তুতির দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিলে তিনি পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করতঃ যোগবলে নিজ চরণে চক্ষুঃ সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা বেদব্যাসকে দর্শন করেন। তখন বেদব্যাস অক্ষপাদ নামোল্লেখে তাঁহার স্তুতি করায় তিনি তখন হইতে অক্ষপাদ নামে অভিহিত হন। এই প্রবাদের মূলে ঐরূপ ঘটনা আছে কি না বা থাকিতে পারে কি না, তাহা বুঝিতে পারি নাই। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও 'বাচস্পত্য' অভিধানে (অক্ষপাদ শব্দে) পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রবাদের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, ইহা পৌরাণিক কথা। কিন্তু অশেষ-শাস্ত্রদর্শী তর্কবাচস্পতি মহাশয় অন্যান্য স্থলে পুরাণাদি গ্রন্থের নামাদি উল্লেখ করিয়াও ঐ স্থলে ঐ কথা কোন্ পুরাণে আছে, তাহার কোনই উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ তিনিও পূর্ব্বোক্ত প্রবাদানুসারে ঐ কথা কোন পুরাণে আছে, ইহা বিশ্বাস করিয়াই ঐ কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু কোন প্রবাদই একেবারে নির্ম্মূল হয় না। ঐতিহ্য বা জনশ্রুতির নিরপেক্ষ প্রামাণ্য না থাকিলেও উহার মূল একটা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। জিজ্ঞাসার ফলে জানিতে পারিয়াছি যে, দেবীপুরাণের শুম্ভ-নিশুম্ভ-মথন-পাদে গৌতমের অক্ষপাদ নাম ও ন্যায়দর্শন রচনার কারণাদি বর্ণিত আছে। সেখানে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাজপুত্রগণের মোহনের জন্য এক সময়ে নাস্তিক্য মতের প্রচার হয়; তাহার ফলে যাগযজ্ঞাদি বিলুপ্ত হইতে থাকে। তখন দেবগণ শিবের আরাধনা করিয়া তাঁহার আদেশে গৌতমের শরণাপন্ন হন। গৌতম তখন নাস্তিক্য মত নিরাসের জন্য যাত্রা করিলে, শিব শিশুরূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নাস্তিক্য মতের অনুকূল তর্ক করিতে থাকেন। সপ্তাহ কাল বিচারে কাহারও পরাজয় না হওয়ায় গৌতম চিন্তিত হইয়া মৌন ভাব অবলম্বন করিলেন। তখন শিব গৌতমকে উপহাস করিয়া বলেন যে,[১] হে বেদধর্ম্মজ্ঞ মুনে! মেধাবিন্! তুমি এই ক্ষুদ্র নাস্তিক বালক আমাকে পরাজিত না করিয়া কেন মৌনাবলম্বন করিয়াছ? তুমি কিরূপে সেই বৃদ্ধ, লোকসম্মত, বিদ্বান্ নাস্তিকগণকে মহাযুদ্ধে নিরস্ত করিবে? অতএব শীঘ্র পলায়ন কর। তখন গৌতম মুনি তাঁহাকে শিব বলিয়া বুঝিয়া তাঁহার স্তব করিলে শিব তাঁহার প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে

১। ভো মুনে বেদধর্ম্মজ্ঞ কিং তূষ্ণীমাস্যতে চিরং।
মামনির্জ্জিত্য মেধাবিন্ ক্ষুদ্রনাস্তিকবালকং॥
কথন্তু বিদুষো বৃদ্ধান্ নাস্তিকান্ লোকসম্মতান্।
বিজেষ্যসি মহাযুদ্ধে তৎ পলায়স্ব মাচিরং॥

বৃষবাহনরূপ দর্শন করাইলেন এবং সাধুবাদ করিয়া[1] বলিলেন যে, তুমি তর্কে কুশল, তুমি ভিন্ন বাদ-যুদ্ধের দ্বারা আর কে আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে? আমি তোমার এই বাদের জন্য সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি তোমার নাম ধারণ করিব, তুমি ত্রিনেত্র হইবে। শিব যখন এই সকল কথা বলেন,[2] তখন তাঁহার বাহন বৃষ, নিজ দন্ত-লিখিত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থকে প্রদর্শন করতঃ জৃম্ভণ করেন। পশ্চাৎ শিবের কৃপা লাভ করিয়া গৌতম মুনি ঐ ষোড়শ পদার্থের ঈক্ষা অর্থাৎ দর্শন করায় তিনি "আন্বীক্ষিকী" নামে বিদ্যা পৃথিবীতে প্রকাশ করেন, এবং শিবের আদেশবশতঃ তিনি নাস্তিক্য-মত-নাশিনী ঐ বিদ্যাকে দশ দিনে শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করান। তাহার কিছু কাল পরে[3] বেদব্যাস গুরু গৌতমের

১। সাধু গৌতম! ত্বমত্রস্তে তর্কেষু কুশলো হ্যসি।
ত্বামৃতে বাদযুদ্ধেন কো মাং তোষয়িতুং ক্ষমঃ॥
অনেন তব বাদেন তোষিতোঽহং মহামুনে।
ত্বন্নাম ধারয়িষ্যামি ত্বং ত্রিনেত্রো ভবিষ্যসি॥

২। ইত্যেবং ব্রুবতঃ শম্ভোর্জজৃম্ভে বাহনো বৃষঃ।
দর্শয়ন্ দন্তলিখিতান্ প্রমাণাদীংশ্চ ষোড়শ॥
শম্ভোঃ কৃপামনুপ্রাপ্য যদীক্ষামকরোন্মুনিঃ।
তেন চান্বীক্ষিকীসংজ্ঞাং বিদ্যাং প্রাবর্ত্তয়ৎ ক্ষিতৌ॥
আদেশেন শিবস্যৈব স শিষ্যান দশভির্দিনৈঃ।
পাঠয়ামাস তাং বিদ্যাং নাস্তিক্যমতনাশিনীং॥

৩। ততঃ কালেন কিয়তা ব্যাসো গুরুনিদেশতঃ।
সমাবৃত্তো গৃহস্থোঽভূদ্বেদব্যাখ্যানকোবিদঃ॥
স তর্কং নিন্দয়ামাস ব্রহ্মসূত্রোপদেশকঃ।
তচ্ছ্রুত্বা গৌতমং ক্রুদ্ধো বেদব্যাসং প্রতি স্থিতঃ॥
প্রতিজজ্ঞে চ নৈতাভ্যাং দৃগ্‌ভ্যাং পশ্যামি তন্মুখং।
যঃ শিষ্যো বেত্তি বৈ তর্কং চিরায় গুরুসম্মতং॥
ব্যাসোঽপি ভগবাংস্তস্য গুরোঃ কোপং বিমৃশ্য চ।
আযযৌ ত্বরিতস্তত্র যত্রাভূদ্‌গৌতমো মুনিঃ॥
অসকৃদ্দণ্ডবদ্ভূত্বা পাদয়োঃ প্রণিপত্য চ।
প্রসাদয়ামাস গুরুং কুতর্কো নিন্দিতো ময়া॥
প্রসন্নো গৌতমো ব্যাসে প্রতিজ্ঞাং স্বাঞ্চ সংস্মরন্।
পাদেঽক্ষি স্ফোটয়ামাস সোঽক্ষপাদস্ততোঽভবৎ।"

—দেবীপুরাণ, শুম্ভনিশুম্ভমথনপাদ, ১৬ অঃ।

দেবীপুরাণের এই অংশ মুদ্রিত হয় নাই। নিখিল-শাস্ত্রদর্শী, নানা শাস্ত্রগ্রন্থকার অক্ষপাদ-গৌতমবংশধর, স্বনামখ্যাত পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়কে আমি গৌতমের অক্ষপাদ নামের প্রবাদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রাচীন পুস্তক হইতে এই বচনগুলি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি ইহা তাঁহার নিকটেই পাইয়াছি, অন্যত্র পাই নাই। এজন্য তাঁহার নিকটে চিরকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তাঁহার মতেও ন্যায়-সূত্রকার অহল্যাপতি গৌতম।

আজ্ঞানুসারে সমাবর্তনের পরে গৃহস্থ হইয়া ব্রহ্মসূত্রে তর্কের নিন্দা করেন। তাহা শ্রবণ করিয়া গৌতম, বেদব্যাসের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া এই চক্ষুর দ্বারা তাহার মুখ দেখিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। বেদব্যাসও গুরু গৌতমের ক্রোধবার্ত্তা পাইয়া শীঘ্র গৌতমের নিকটে আসিয়া তাঁহার পাদদ্বয়ে পতিত হইয়া বলেন যে, আমি কুতর্কের নিন্দা করিয়াছি। তখন গৌতম মুনি প্রসন্ন হইয়া পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করতঃ নিজ চরণে চক্ষু স্ফুটিত করেন, তজ্জন্য তিনি অক্ষপাদ নামে অভিহিত হইয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত বচনগুলির প্রামাণ্য বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও উহাই যে গৌতমের অক্ষপাদ নামাদি সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রবাদের মূল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। সুতরাং ঐ প্রাচীন প্রবাদের মূল পূর্ব্বোক্ত বচনগুলি যে আধুনিক নহে, ইহা বুঝা যায়।* ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শিববাক্যে পাওয়া যায়,[১] "সপ্তবিংশ দ্বাপরে জাতুকর্ণ্য যে সময়ে ব্যাস হইবেন, সে সময়েও আমি প্রভাসতীর্থ প্রাপ্ত হইয়া লোকবিশ্রুত যোগাত্মা দ্বিজশ্রেষ্ঠ সোমশর্ম্মা হইব। সেখানেও আমার সেই তপোবন পুত্রগণ (চারি শিষ্য) হইবে"। (১) অক্ষপাদ, (২) কণাদ বা কুমার, (৩) উলূক, (৪) বৎস। বায়ুপুরাণেও (পূর্ব্বখণ্ড ২৩ অঃ) ঐ কথা আছে। ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ুপুরাণে অক্ষপাদ প্রভৃতি চারি শিষ্যকেই পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, লিঙ্গপুরাণে (২৪ অঃ) অক্ষপাদ প্রভৃতিকে সোমশর্ম্মার শিষ্য বলিয়াই উল্লেখ দেখা যায়। তবে লিঙ্গপুরাণে "কণাদ" স্থলে "কুমার" আছে। অনেকে ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ুপুরাণেও "অক্ষপাদঃ কুমারশ্চ" ইহাই প্রকৃত পাঠ বলেন। সে যাহা হউক, অক্ষপাদনামা তপোধন যে সপ্তবিংশ দ্বাপর যুগের শেষে প্রভাস তীর্থে শিবাবতার সোমশর্ম্মার শিষ্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা আমরা ব্রহ্মাণ্ড, বায়ু ও লিঙ্গপুরাণের দ্বারা জানিতে পারি। পুরাণবিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন যে, চতুর্দ্দশ দ্বাপর বা

---

* গঙ্গেশের পূর্ব্ববর্ত্তী জয়ন্তভট্টও ন্যায়মঞ্জরীর শেষে অক্ষপাদ যে বাদে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা লিখিয়াছেন।

১। সপ্তবিংশতিমে প্রাপ্তে পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে।
জাতূকর্ণ্যো যদা ব্যাসো ভবিষ্যতি তপোধনঃ ॥ ১৪৯ ॥
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি সোমশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ।
প্রভাসতীর্থমাসাদ্য যোগাত্মা লোকবিশ্রুতঃ ॥ ১৫০ ॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপোধনাঃ।
অক্ষপাদঃ কণাদশ্চ উলূকো বৎস এব চ ॥ ১৫১ ॥
—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, অনুষঙ্গপাদ ২৩ অঃ।

কলিতে[২] সুরক্ষণ ব্যাসের আবির্ভাব হইলে যে গৌতম শিবের অবতাররূপে যোগের উপদেশ করেন, তিনিই আবার সপ্তবিংশ দ্বাপরের শেষে অক্ষপাদ নামে শিবাবতার সোমশর্ম্মার শিষ্যরূপে জগতে জ্ঞান প্রচার করেন। বস্তুতঃ স্কন্দপুরাণে অহল্যাপতি গৌতম মুনিই অক্ষপাদ ও মহাযোগী বলিয়া কথিত। কূর্ম্মপুরাণে তিনি শিবের অবতার বলিয়া কথিত। স্কন্দপুরাণে বহু স্থলে তাঁহার পরম মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। মহাভারতে অহল্যাপতি গৌতমের বহু সহস্র শিষ্যের কথা, প্রিয়তম শিষ্য উত্তঙ্কের উপাখ্যান ও অহল্যার কুণ্ডলানয়ন-বার্ত্তা বর্ণিত আছে (অশ্বমেধপর্ব্ব, ৫৬ অঃ দ্রষ্টব্য)। সোমশর্ম্মার শিষ্যরূপে অক্ষপাদ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের বহু পূর্ব্বে আবির্ভূত, ইহা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণাদির দ্বারা বলা যায়। তবে তিনি কোন্ সময়ে ন্যায়সূত্র রচনা করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি সোমশর্ম্মার শিষ্য হইয়া প্রভাস তীর্থেই ন্যায়সূত্র রচনা করেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পাই নাই। অক্ষপাদ গৌতম দীর্ঘতপা, সুদীর্ঘজীবী, মহাযোগী। স্কন্দপুরাণে তাঁহার নানা স্থানে ভ্রমণাদি ও গৌতমেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার কথা পাওয়া যায়। তবে মিথিলাতেই সর্ব্বাগ্রে ন্যায়শাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চারম্ভ ও নানা ন্যায়গ্রন্থ নির্ম্মাণ হইয়াছে। মিথিলাবাসী গৌতম মিথিলার আশ্রমেই ন্যায়সূত্র রচনা করেন, ইহা পণ্ডিত-সমাজের ধারণা। মৈথিল পণ্ডিতগণও তাহাই বলেন। কিন্তু যেখানে গৌতম পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানেই ন্যায়সূত্রের রচনা হইয়াছে, ইহাও অনেকের ধারণা। এ সকল বিষয়ে যে এখন প্রকৃত তত্ত্বে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে, তাহা মনে হয় না।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ও বার্ত্তিককার উদ্যোতকর

ন্যায়দর্শন-ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের প্রকৃত পরিচয় সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করা এখন অতি দুঃসাধ্য বা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। প্রাচীন পণ্ডিত-সমাজে ন্যায়দর্শন-ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন, মুনি, এইরূপ পরম্পরাগত সংস্কার ছিল, ইহা বুঝিতে পারা যায়। *যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের* বৈরাগ্য-প্রকরণের শেষে বর্ণিত মুনিগণের মধ্যে বাৎস্যায়ন নামে মুনিবিশেষেরও উল্লেখ দেখা যায়। শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র

২। যদা ব্যাসঃ সুরক্ষণঃ পর্য্যায়ে তু চতুর্দ্দশে। তত্রাপি পুনরেবাহং ভবিষ্যামি যুগান্তিকে।।
বনে ত্বঙ্গিরসঃ শ্রেষ্ঠো গৌতমো নাম যোগবিৎ। তস্মাদ্ভবিষ্যতে পুণ্যং গৌতমং নাম তদ্বনং।।
—ব্রহ্মাণ্ড, অনুষঙ্গ, ২৩ অঃ।

প্রভৃতি অনেকে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নকে পক্ষিল স্বামী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তার্কিকরক্ষার প্রারম্ভে বরদরাজের কথা ও টীকাকার মল্লিনাথের ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায়, ন্যায়দর্শন-ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের অপর নাম পক্ষিল এবং তিনিও ন্যায়সূত্রকার অক্ষপাদের ন্যায় মুনি[১]। বাচস্পত্য অভিধানে মহামনীষী তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও "পক্ষিল" শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,—গৌতম সূত্রভাষ্যকার মুনিবিশেষ। তাঁহার প্রকাশিত বাৎস্যায়ন ভাষ্যকেও তিনি "বাৎস্যায়ন মুনিকৃত ভাষ্য" বলিয়া লিখিয়াছেন। দয়ানন্দ স্বামী তাঁহার "ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকা" গ্রন্থে ন্যায়দর্শন-ভাষ্যকারকে বাৎস্যায়ন মুনি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (১৬ পৃষ্ঠা)। প্রাচীন ন্যায়াচার্য্য উদ্দ্যোতকর ন্যায়বার্ত্তিকের শেষে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নকে "অক্ষপাদপ্রতিম" বলিয়াছেন[২]। ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকায় শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র উপমানসূত্র (১।৬) ভাষ্যব্যাখ্যায় এবং তার্কিকরক্ষাকার বরদরাজ উপমান ব্যাখ্যায় নিজের ব্যাখ্যা সমর্থনের জন্য ভগবান ভাষ্যকার বলিয়া বাৎস্যায়নের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তার্কিকরক্ষার টীকায় মহামনীষী মল্লিনাথ সেখানে লিখিয়াছেন যে, বরদরাজ ভাষ্যকারের প্রামাণ্য সূচনার জন্য তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ সূত্রকারেরও ইহাই অভিপ্রেত বলিয়া বুঝা যায়। ফলকথা, উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের কথায় ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন, অক্ষপাদপ্রতিম ভগবান্ পক্ষিল মুনি ও পক্ষিল স্বামী, ইহা আমরা পাইতেছি। এখন বিশেষ বক্তব্য এই যে, বহুশ্রুত প্রাচীন মহামনীষী শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র যাঁহাকে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন, তিনি যে বিশেষ তপঃপ্রভাবসম্পন্ন বলিয়া খ্যাত ছিলেন ইহা স্বীকার্য্য। উদ্দ্যোতকর ও কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত আস্তিক-শিরোমণি মহামনীষিগণকে বাচস্পতি মিশ্র ভগবান্ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ঋষি বা আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতির ন্যায় ভাষ্যকার বাৎস্যায়নকে ভগবান্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক। শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র যাঁহাকে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিতে পারেন না, এমন কোন ব্যক্তিকে কেহ ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে যে সিদ্ধান্ত বিশ্বাস করিতে পারি না। শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্রের ঐ কথাকে উপেক্ষা করা যায় না।

১। অক্ষচরণপক্ষিলমুনি প্রভৃতয়ো বর্ণয়ন্তি।—তার্কিকরক্ষা।
অক্ষচরণ-পক্ষিলৌ সূত্রভাষ্যকারৌ।—মল্লিনাথ টীকা।

২। যদক্ষপাদপ্রতিমো ভাষ্যং বাৎস্যায়নো জগৌ।
অকারি মহতস্তস্য ভারদ্বাজেন বার্ত্তিকং॥

এতদ্দেশীয় অনেক বিজ্ঞতম ব্যক্তি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্যই ন্যায়দর্শন-ভাষ্যকার। তাঁহারই অপর নাম বাৎস্যায়ন ও পক্ষিলস্বামী। এই সিদ্ধান্ত সমর্থনে প্রথম কথা এই যে, হেমচন্দ্রসূরি অভিধানচিন্তামণি গ্রন্থে[১] বাৎস্যায়নের যে আটটি নাম বলিয়াছেন, তন্মধ্যে কৌটিল্য, চণকাত্মজ, পক্ষিলস্বামী ও বিষ্ণুগুপ্ত, এই চারিটি নামের দ্বারা বুঝা যায়, কৌটিল্যই পক্ষিলস্বামী ও বাৎস্যায়ন। পক্ষিলস্বামীই যে ন্যায়দর্শন-ভাষ্যকার ইহা বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি অনেক আচার্য্যই লিখিয়াছেন। পক্ষিলস্বামী ও বাৎস্যায়ন, কৌটিল্য বা চাণক্য পণ্ডিতের নামান্তর হইলে তিনিই ন্যায়দর্শন-ভাষ্যকার ইহা বুঝা যায়। দ্বিতীয় কথা এই যে, কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে "বিদ্যাসমুদ্দেশ" প্রকরণে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার প্রশংসা করিতে শেষ যে শ্লোকটি[২] বলিয়াছেন, ঐ শ্লোকের প্রথম চরণত্রয় ন্যায়দর্শনভাষ্যেও দেখা যায়। তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, কৌটিল্যই ন্যায়ভাষ্যে তাহার অর্থশাস্ত্রোক্ত শ্লোকের চতুর্থ চরণ পরিবর্ত্তন করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ন্যায়ভাষ্যে ঐ শ্লোকের চতুর্থ চরণ বলা হইয়াছে, "বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা"। ঐ চতুর্থ চরণের দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে,—কৌটিল্য ন্যায়ভাষ্যে বলিয়াছেন,—আমি "বিদ্যোদ্দেশে" অর্থাৎ আমার কৃত অর্থশাস্ত্র গ্রন্থের বিদ্যাসমুদ্দেশপ্রকরণে এই আন্বীক্ষিকীকে এইরূপে কীর্ত্তন করিয়াছি। তৃতীয় কথা এই যে, অর্থশাস্ত্রের শেষে কৌটিল্য শাস্ত্রোদ্ধার করিয়াছেন ইহা বর্ণিত আছে[৩]। তাহার দ্বারা তিনি ন্যায়সূত্রের উদ্ধার করিয়াছেন, ভাষ্য রচনা করিয়া তাহার প্রকৃতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়।

এই সিদ্ধান্তে বক্তব্য এই যে হেমচন্দ্রসূরির শ্লোকের দ্বারা কৌটিল্যই ন্যায়ভাষ্যকার, ইহা নির্ণয় করা যায় না। কারণ, নামের ঐক্যে ব্যক্তির ঐক্য সিদ্ধ হয় না। ন্যায়ভাষ্যকারের ন্যায় কৌটিল্যেরও বাৎস্যায়ন ও পক্ষিলস্বামী, এই নামদ্বয় থাকিতে পারে। পরন্তু তার্কিকরক্ষায় বরদরাজের কথা ও মল্লিনাথের ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায়, ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের নামান্তর পক্ষিল। সুতরাং "স্বামী"

১। বাৎস্যায়নে মল্লনাগঃ কৌটিল্যশ্চণকাত্মজঃ।
দ্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোঽঙ্গুলশ্চ সঃ ।।— মর্ত্ত্যকাণ্ড। ৫১৮

২। প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং শশ্বদান্বীক্ষিকী মতা।। অর্থশাস্ত্র।

৩। যেন শাস্ত্রঞ্চ শস্ত্রঞ্চ নন্দরাজগতা চ ভূঃ।
অমর্ষেণোদ্ধৃতান্যাশু তেন শাস্ত্রমিদং কৃতং ।।—অর্থশাস্ত্রের শেষ।

তাঁহার উপনাম ছিল, ইহা মনে করা যাইতে পারে। ন্যায়কন্দলীর প্রারম্ভে "পক্ষিল-শবরস্বামিনৌ" এই প্রয়োগের দ্বারাও তাহা মনে হয়। তাহা হইলে বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি 'পক্ষিল' এই নামের পরে স্বামী এই উপনামের যোগে বাৎস্যায়নকে পক্ষিলস্বামী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাও মনে করা যাইতে পারে। ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন পক্ষিলস্বামী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, ইহা বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতির কথায় বুঝা যায়। কিন্তু যদি কৌটিল্যের নামান্তর "পক্ষিলস্বামী" এবং ন্যায়ভাষ্যকারের নামান্তর "পক্ষিল," ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে ঐ নামের দ্বারা ন্যায়ভাষ্যকারের কৌটিল্য বলিয়া গ্রহণ করাও যায় না। বাৎস্যায়ন নামের দ্বারাও কৌটিল্যকে ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়া নির্ণয় করা যায় না। কারণ, বাৎস্যায়ন এই নাম যদি গোত্রনিমিত্তক নাম হয়, তাহা হইলে অন্যেরও ঐ নাম হইতে পারে। এ সব কথা যাহাই হউক, কৌটিল্যই ন্যায়-ভাষ্যকার, এই সিদ্ধান্তে পূর্ব্বোক্ত হেমচন্দ্র সূরির শ্লোক অথবা ত্রিকাণ্ডশেষে পুরুষোত্তমদেবের শ্লোক প্রমাণ হইতে পারে না, ইহা স্বীকার্য।

"প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানাং" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারাও ন্যায়ভাষ্যকার ও অর্থ-শাস্ত্রকার অভিন্ন ব্যক্তি, ইহা নিশ্চয় করা যায় না। কারণ, মঙ্গলাচরণ-শ্লোক প্রভৃতি কোন কোন শ্লোকবিশেষ ব্যতীত ঐরূপ শ্লোকের দ্বারা গ্রন্থকারের অভেদ সিদ্ধ হয় না। এক গ্রন্থকার কোন উদ্দেশ্যে অপর গ্রন্থকারের শ্লোকের আংশিক উল্লেখও করিতে পারেন। পরন্তু কৌটিল্য ন্যায়ভাষ্য রচনা করিয়া যদি তিনি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের দ্বারা অর্থশাস্ত্রে আন্বীক্ষিকীর কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহা বলা নিতান্ত আবশ্যক মনে করিতেন, তাহা হইলে ঐ শ্লোকের চতুর্থ চরণে "অর্থশাস্ত্রে প্রকীর্ত্তিতা" এইরূপ কথাই বলিতেন। অর্থশাস্ত্রের "বিদ্যাসমুদ্দেশ" নামক প্রকরণকে বিদ্যোদ্দেশ শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়া, অতি অস্পষ্টভাবে নিজ বক্তব্য কেন বলিবেন ? আর যদি "বিদ্যোদ্দেশ" বলিলেই অর্থশাস্ত্রের ঐ প্রকরণটি বুঝা যায়, তাহা হইলে কৌটিল্য হইতে ভিন্ন ব্যক্তিও ন্যায়ভাষ্যে ঐ কথার দ্বারা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এইরূপে এই আন্বীক্ষিকীর প্রশংসা হইয়াছে, এই কথা বলিতে পারেন। বস্তুতঃ ন্যায়ভাষ্যকার প্রথমে "সেয়মান্বীক্ষিকী" এই কথা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের চতুর্থ চরণে যে "বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা" এই কথা বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, "বিদ্যোদ্দেশে" অর্থাৎ শাস্ত্রে ত্রয়ী প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ বিদ্যার যেখানে উদ্দেশ্য অর্থাৎ নামকথন হইয়াছে, সেখানে এই আন্বীক্ষিকীর কীর্ত্তন হইয়াছে। অর্থাৎ এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যাই শাস্ত্রোক্ত

চতুর্ব্বিধ বিদ্যার অন্তর্গত চতুর্থী বিদ্যা, ইহাই ভাষ্যকারের বক্তব্য বুঝা যায়। ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্টের কথাতেও এই ভাব পাওয়া যায়। জয়ন্তভট্ট ভাষ্যকারের উক্তি বলিয়া পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের উল্লেখ করিয়া স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত শ্লোকের চতুর্থ চরণ "বিদ্যোদ্দেশে পরীক্ষিতা"। জয়ন্তভট্টের উল্লিখিত পাঠে ভাষ্যকারের বক্তব্য বুঝা যায় যে, শাস্ত্রে চতুর্ব্বিধ বিদ্যার পরিগণনাস্থলে এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা, পরীক্ষিত বা অবধারিত হইয়াছে। অর্থাৎ এই ন্যায়বিদ্যাই যে চতুর্থী আন্বীক্ষিকী বিদ্যা, ইহা নিশ্চিত। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও পূর্ব্বে ন্যায়বিদ্যাকে চতুর্থী আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফলকথা, ভাষ্যকার যে, কোন একটি বিশেষ বক্তব্য প্রকাশ করিতেই পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের চতুর্থ চরণ ঐরূপ বলিয়াছেন, ইহা স্বীকার্য্য। অর্থশাস্ত্রের শেষে কৌটিল্যের যে শাস্ত্রের উদ্ধার, শস্ত্রের উদ্ধার ও নন্দরাজ্যের উদ্ধারের কথা আছে, তদ্দ্বারা তিনি যে ন্যায়সূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। তিনি নানা শাস্ত্র হইতে যে রাজনীতিসমুচ্চয়ের উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাই শস্ত্রের উদ্ধার ও নন্দরাজ্যের উদ্ধারের সহিত ঐ শ্লোকে বলা হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। পরন্তু ঐ শ্লোকের দ্বারা কৌটিল্য শাস্ত্রোদ্ধারাদির পরে অর্থশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং তিনি অর্থশাস্ত্র রচনার পূর্ব্বে ন্যায়ভাষ্যে "বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা" এই কথা কোন্ অর্থে বলিতে পারেন, তাহাও চিন্তা করা উচিত। অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য নামের উল্লেখ আছে এবং বিষ্ণুগুপ্ত নামে গ্রন্থকারের পরিচয় আছে[১]। বিষ্ণুগুপ্তই কৌটিল্যের মুখ্য নাম ছিল, ইহা অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি অনেক গ্রন্থের দ্বারা বুঝা যায়। মুদ্রারাক্ষস নাটকে কবি বিশাখদত্তের রচনার দ্বারাও তাহা বুঝা যায় (৭ম অঙ্ক দ্রষ্টব্য)। কৌটিল্য ন্যায়ভাষ্য রচনা করিলে তিনি অর্থশাস্ত্রের ন্যায় বিষ্ণুগুপ্ত নামে অথবা সুপ্রসিদ্ধ কৌটিল্য বা চাণক্য নামে কেন গ্রন্থকার-পরিচয় দিবেন না এবং উদ্দ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণ কেহই তাঁহার প্রসিদ্ধ কোন নামের কেন উল্লেখ করিবেন না, ইহাও বুঝি না। ন্যায়ভাষ্যের শেষে বাৎস্যায়ন নামে গ্রন্থকার-পরিচয় আছে[২]। কামসূত্র গ্রন্থেও বাৎস্যায়ন নামে

১। দৃষ্ট্বা বিপ্রতিপত্তিং বহুধা শাস্ত্রেষু ভাষ্যকারাণাং।
স্বয়মেব বিষ্ণুগুপ্তশ্চকার সূত্রঞ্চ ভাষ্যঞ্চ।—অর্থশাস্ত্রের শেষ।

২। যোঽক্ষপাদমৃষিং ন্যায়ঃ প্রত্যভাদ্ বদতাং বরং।
তস্য বাৎস্যায়ন ইদং ভাষ্যজাতমবর্ত্তয়ৎ॥

গ্রন্থকার-পরিচয় পাওয়া যায়। কামসূত্রের টীকাকার যশোধর, কামসূত্রকার বাৎস্যায়নের বাৎস্যায়ন ও মল্লনাগ, এই দুইটি নাম বলিয়াছেন। বাৎস্যায়ন তাঁহার গোত্রনিমিত্তক নাম, মল্লনাগ তাঁহার সাংস্কারিক নাম[৩]। কৌটিল্যই কামসূত্রকার বাৎস্যায়ন, ইহা অনেকে বলিয়াছেন। কিন্তু কামসূত্রের টীকাকার যশোধর, বিষ্ণুগুপ্ত নামের উল্লেখ না করিয়া মল্লনাগ নামকেই কামসূত্রকার বাৎস্যায়নের সাংস্কারিক নাম বলিয়াছেন; তিনি তাঁহাকে পক্ষিলস্বামী বলিয়াও উল্লেখ করেন নাই। অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য স্বমতের উল্লেখ করিতে কৌটিল্য নামের উল্লেখ করিয়াছেন। কামসূত্রে গ্রন্থকারের স্বমতের উল্লেখ করিতে বাৎস্যায়ন নামের উল্লেখ দেখা যায়। অর্থশাস্ত্র ও কামসূত্রের ভাষারও অনেক বৈষম্য বুঝা যায়। ন্যায়ভাষ্য ও কামসূত্রের ভাষা ও গ্রন্থারম্ভপ্রণালীও একরূপ নহে। কামসূত্রের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ আছে, ন্যায়ভাষ্যের প্রারম্ভে তাহা নাই। ফলকথা, কামসূত্রকার বাৎস্যায়নই ন্যায়ভাষ্যকার, এই সিদ্ধান্তও সত্য বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। কৌটিল্যই ন্যায়ভাষ্যকার, এই সিদ্ধান্তে বিশেষ বক্তব্য এই যে, ন্যায়ভাষ্যকার সাংখ্য-শাস্ত্রকেও যে চতুর্থী বিদ্যা আন্বীক্ষিকী বলিতেন, ইহা বুঝিতে পারি না। অর্থশাস্ত্রে সাংখ্যশাস্ত্রও চতুর্থী বিদ্যা আন্বীক্ষিকীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু ন্যায়ভাষ্যে আন্বীক্ষিকী শব্দের বিশেষ ব্যুৎপত্তির ব্যাখ্যা করিয়া তদনুসারে ন্যায়বিদ্যা ও ন্যায়শাস্ত্র বলিয়া আন্বীক্ষিকী শব্দের অর্থ বিবরণ করা হইয়াছে এবং সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থকে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার প্রস্থান বলা হইয়াছে। উদ্যোতকর ঐ প্রস্থানভেদ-বর্ণনায় "সংশয়াদিভেদানুবিধায়িনী আন্বীক্ষিকী" এই কথা বলিয়া আন্বীক্ষিকী বিদ্যার স্বরূপও বলিয়াছেন। ন্যায়ভাষ্যকারও প্রথমে ন্যায়বিদ্যাকেই চতুর্থী আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বলিয়া, শেষে "সেয়মান্বীক্ষিকী" ইত্যাদি কথা বলিয়া, "বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা" এই কথার দ্বারা ন্যায়বিদ্যাই শাস্ত্রোক্ত চতুর্ব্বিধ বিদ্যার মধ্যে পরিগণিত, চতুর্থী আন্বীক্ষিকী বিদ্যা, এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার সকল কথার পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়। ফলকথা, ন্যায়ভাষ্য ও অর্থশাস্ত্র, এই উভয় গ্রন্থে আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বিষয়ে মতবৈষম্য নাই, ইহা কোনরূপেই বুঝিতে পারি নাই। বাৎস্যায়ন, উদ্যোতকর, জয়ন্তভট্ট প্রভৃতি ন্যায়াচার্য্যগণ যে ন্যায়বিদ্যা ভিন্ন সাংখ্যাদি শাস্ত্রকেও চতুর্থী

৩। বাৎস্যায়ন ইতি গোত্রনিমিত্তা সংজ্ঞা, মল্লনাগ ইতি সাংস্কারিকী।

১ অধি, ২ অঃ, ১৯ সূত্র টীকা।

বিদ্যা আন্বীক্ষিকী বলিতেন, তাহা তাঁহাদিগের গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে কিছুতেই মনে হয় না। এখন যদি ন্যায়ভাষ্য ও অর্থশাস্ত্র, এই উভয় গ্রন্থে আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বিষয়েই মতবৈষম্য থাকে, তাহা হইলে অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্যই ন্যায়ভাষ্যকার, এই সিদ্ধান্ত বিশ্বাস করা যায় না। ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে হইলে উভয় গ্রন্থে আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বিষয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ মতবৈষম্য আছে কি না, তাহাই সর্ব্বাগ্রে বুঝা আবশ্যক। সুধীগণ উভয় গ্রন্থের কথাগুলি দেখিয়া ইহার বিচার করিবেন। অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্যের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কৌটিল্য যে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের উল্লেখই করেন নাই, এই এই মতও স্বীকার করিতে পারি নাই। অর্থশাস্ত্রে "আন্বীক্ষকী" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। ঐ পাঠ প্রকৃত হইলে কৌটিল্য চিরপ্রসিদ্ধ "আন্বীক্ষিকী" শব্দের প্রয়োগ কেন করেন নাই এবং বাৎস্যায়ন প্রভৃতি ন্যায়াচার্য্যগণ কৌটিল্যের ন্যায় "আন্বীক্ষকী" শব্দের প্রয়োগ কেন করেন নাই, ইহাও চিন্তনীয়। কৌটিল্য পূর্ব্বাচার্য্যগণের মত বর্ণন করিতেও বলিয়াছেন—"আন্বীক্ষকী"।

প্রতীচ্য ও প্রাচ্য ঐতিহাসিকগণের মধ্যে যাঁহারা খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী এবং অনেকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের সময় বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতে খৃষ্টপূর্ব্ববর্ত্তী কৌটিল্য যে ন্যায়ভাষ্যকার হইতেই পারেন না, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন খৃষ্টপূর্ব্ববর্ত্তী অতিপ্রাচীন, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। বাৎস্যায়ন ভাষ্যের ভাষা পর্য্যালোচনা করিলেও উহা যে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর বহু পূর্ব্ববর্ত্তী অতি প্রাচীন, ইহা মনে হয়। বৌদ্ধগ্রন্থ লঙ্কাবতারসূত্র ও মাধ্যমিকসূত্রের পরে বাৎস্যায়ন ভাষ্য রচিত হইয়াছে, ইহা বুঝিবার কোন প্রমাণ পাই নাই। উদ্যোতকরের বার্ত্তিকের ন্যায় বাৎস্যায়ন ভাষ্যে কোন বৌদ্ধগ্রন্থের উল্লেখ নাই। যে সকল বৌদ্ধমতের আলোচনা আছে, তাহা অতি প্রাচীন কাল হইতেই আলোচিত হইতেছে। উপনিষদেও পূর্ব্বপক্ষ-রূপে ঐ সকল মতের সূচনা আছে। ন্যায়সূত্রেও ঐ সকল মতের আলোচনা ও খণ্ডন আছে। ঐ সকল মত বা কোন শব্দবিশেষ দেখিয়া ঐ সমস্ত ন্যায়সূত্র অনেক পরে রচিত হইয়াছে, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি না। কারণ, কোন মতবিশেষের আলোচনা দেখিয়া ঐরূপ তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না। ঐ সকল মত যে শাক্য বুদ্ধের পূর্ব্বে কখনও কেহ উদ্ভাবন করিতে পারেন না, ইহা নিশ্চয় করিবার কি প্রমাণ আছে, জানি না। দর্শনকার ঋষিগণ উপনিষদে পূর্ব্বপক্ষরূপে সূচিত নাস্তিক-মতের বিচারপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়া ঐরূপে উপনিষদের পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা

করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের দর্শন শাস্ত্র রচনার ইহাও একটি মহান্ উদ্দেশ্য। তাঁহারা অনেক পূর্ব্বপক্ষের উদ্‌ভাবন করিয়াও তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী বৌদ্ধসম্প্রদায় ঐ সকল পূর্ব্বপক্ষের অনেক পূর্ব্বপক্ষকেও সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করায় উহা বৌদ্ধ মত বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের সমর্থিত মত মাত্রকেই তাঁহাদিগেরই আবিষ্কৃত মত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না। ন্যায়সূত্রে আলোচিত বৌদ্ধ মত যে উপনিষদেও আছে, তাহা যথাস্থানে দেখাইব। মূলকথা, বাৎস্যায়ন ভাষ্যে এমন কোন কথা নাই, যদ্দ্বারা উহা লঙ্কাবতারসূত্র ও মাধ্যমিকসূত্রের পরে রচিত বলিয়া নিশ্চয় করা যাইতে পারে। যে সাধ্য-সাধনে যে হেতু সন্দিগ্ধ বা হেতুই হয় না, তদ্দ্বারা কোন সাধ্যের যথার্থ অনুমান হইতে পারে না। হেতুর দ্বারা কোন সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিতে হইলে, তাহা সেই স্থলে প্রকৃত হেতু বা হেত্বাভাস, তাহা সর্ব্বাগ্রে বিচার করা সকলেরই কর্ত্তব্য। পরন্তু বাৎস্যায়ন লঙ্কাবতারসূত্র ও মাধ্যমিকসূত্রের পরে ন্যায়ভাষ্য রচনা করিয়া বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিলে ন্যায়ভাষ্যে ঐ সমস্ত বৌদ্ধগ্রন্থের অসাধারণ পারিভাষিক শব্দ (প্রতীত্যসমুৎপাদ প্রভৃতি) অবশ্যই পাওয়া যাইত এবং মাধ্যমিক সূত্রে সমর্থিত বৌদ্ধ মতের বিশেষরূপ সমালোচনা পাওয়া যাইত। বাৎস্যায়নভাষ্যে বৌদ্ধ মতের আলোচনায় পরবর্ত্তীকালের প্রধান বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের সূক্ষ্ম বিচারাদির কোনই আলোচনা পাওয়া যায় না। সংক্ষেপেই বৌদ্ধ মতের নিরাস পাওয়া যায় এবং বাৎস্যায়নভাষ্যে পরবর্ত্তী বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের সমর্থিত প্রধান বৌদ্ধ সিদ্ধান্তের বিশেষরূপ আলোচনাও পাওয়া যায় না। বাৎস্যায়ন প্রাচীন বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের অভ্যুদয়ের সময়ে ন্যায়ভাষ্য রচনা করিয়াছেন এবং প্রাচীন বৌদ্ধ দার্শনিকদিগকেই লক্ষ্য করিয়া "নাস্তিক", "অনাত্মবাদী", "ক্ষণিকবাদী" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ ও তাঁহাদিগের মতের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। যদিও মহামহোপাধ্যায় বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয় ইহাও স্বীকার করেন নাই; তিনি বাৎস্যায়নকে বৌদ্ধ-যুগেরও পূর্ব্ববর্ত্তী মহর্ষি বলিয়াছেন এবং বিশ্বকোষেও লিখিত হইয়াছে যে, বাৎস্যায়নভাষ্যে কোথাও বৌদ্ধ-প্রসঙ্গ নাই; কিন্তু ইহাও স্বীকার করা যায় না। বাৎস্যায়ন ও বাচস্পতি মিশ্রের কথার দ্বারা বৌদ্ধ দার্শনিকগণের অভ্যুদয়ের পরে বাৎস্যায়ন ন্যায়সূত্রের উদ্ধার ও ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়।

প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের নবম সূত্র-ভাষ্য-ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্য-

টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের কথায় স্পষ্টই পাওয়া যায় যে, ভাষ্যকারের পূর্ব্বেও ন্যায়সূত্রের ব্যাখ্যা হইয়াছে। ভাষ্যকার এক ভাষার দ্বারাই স্বমত ও পরমতে কালাতীত নামক হেত্বাভাসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া পরমতেই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং কোন বৌদ্ধবিশেষ অন্যরূপ সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন ভাষ্যকার সেই সূত্রার্থ প্রকৃতার্থ নহে বলিয়া সেই দোষের নিরাস করিয়াছেন। এইরূপ আরও অনেক কথার দ্বারা ন্যায়ভাষ্য বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের অভ্যুদয় হইলে রচিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। সর্ব্বত্রই বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্য-ব্যাখ্যায় বৌদ্ধমতের কথা বলিয়া ব্যাখ্যা-কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায় না।

শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য্যটীকার প্রারম্ভে উদ্দ্যোতকরের বার্ত্তিক রচনার প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, যদিও ভাষ্যকার ন্যায়শাস্ত্র বুঝাইয়া গিয়াছেন, তথাপি অর্ব্বাচীন দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি কুতর্কান্ধকারের দ্বারা ন্যায়শাস্ত্র আচ্ছাদিত করায়, এই শাস্ত্র-তত্ত্বনির্ণয়ে অসমর্থ হইয়াছিল, তাই ঐ অন্ধকার অপনয়ন করিতে উদ্দ্যোতকরের বার্ত্তিক রচনা। বাচস্পতি মিশ্র "অর্ব্বাচীন" শব্দ প্রয়োগ করিয়া দিঙ্‌নাগ প্রভৃতিকে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে নব্য সম্প্রদায় বলিয়াছেন, ইহাই আমরা বুঝি। খৃষ্টপূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধ রাজা অশোকেরও বহু পূর্ব্ব হইতে বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের অভ্যুদয় হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু দিঙ্‌নাগের কিছু পূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা, প্রমাণকাণ্ডে বিশেষ আলোচনা ও বৌদ্ধ ন্যায়ের নানা গ্রন্থ নির্ম্মাণ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে যেমন প্রাচীন ও নব্য সম্প্রদায়ের অনেক কাল ব্যবধান এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতিই প্রমাণকাণ্ডে বিশেষরূপে নূতন ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তদ্রূপ বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের মধ্যেও প্রাচীন ও নব্য সম্প্রদায় এবং তাঁহাদিগের অনেক কাল ব্যবধান বুঝা যায়। অল্প কাল ব্যবধানে প্রাচীন ও নব্য, এইরূপ সংজ্ঞাভেদ হয় না। বাচস্পতি মিশ্র দিঙ্‌নাগ প্রভৃতিকে অর্ব্বাচীন বলায় এবং তাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রকে কুতর্কান্ধকারে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন, এই জন্যই উদ্দ্যোতকরের বার্ত্তিক-রচনা, নচেৎ ভাষ্যকার ন্যায়শাস্ত্রের ব্যুৎপাদন করায় আর কিছু কর্ত্তব্য অবশিষ্ট ছিল না, এই কথা প্রকাশ করায়, বুঝিতে পারি যে, প্রাচীন বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের সময়ে ন্যায়দর্শনের প্রকৃতার্থ বুঝাইতে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বাৎস্যায়ন করিয়াছিলেন; তখন আর কিছু কর্ত্তব্য ছিল না; কিন্তু পরবর্ত্তী কালে নব্য বৌদ্ধ দিঙ্‌নাগ

প্রভৃতি প্রমাণকাণ্ডে বিশেষ আলোচনা ও তর্কের ভূরি চর্চ্চা করিয়া প্রমাণ-সমুচ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থের দ্বারা ন্যায়সূত্র ও ভাষ্যের প্রচুর প্রতিবাদ করেন। তাঁহাদিগের কুতর্কান্ধকারে ন্যায়শাস্ত্র আচ্ছাদিত হইয়া যায়; তাই উদ্যোতকরের বার্ত্তিক রচনা কর্ত্তব্য হইয়াছিল। বাৎস্যায়ন ভাষ্যে প্রমাণকাণ্ডে বৌদ্ধ মতের বিশেষ আলোচনা নাই। বাৎস্যায়ন দিঙ্‌নাগের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে তাঁহার ভাষ্যে প্রমাণকাণ্ডে বৌদ্ধ মতের বিশেষ আলোচনা থাকা খুব সম্ভব ছিল। ফলকথা, বাৎস্যায়ন দিঙ্‌নাগের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। বাৎস্যায়ন পাণিনিসূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন (২।২।১৬ সূত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। পাণিনি গৌতম বুদ্ধেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহাও আমাদিগের বিশ্বাস। কথাসরিৎসাগরের উপাখ্যান প্রমাণ নহে। বাৎস্যায়ন (৫।২।১০ সূত্র-ভাষ্যে) মহাভাষ্যের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত নহে। কারণ, এমন অনেক বাক্য আছে, যাহা সুচির কাল হইতে উদাহরণ প্রদর্শনের জন্য বহু গ্রন্থকারই উল্লেখ করিতেছেন। ঐ বাক্যের প্রথম বক্তা কে, তাহা সর্ব্বত্র নিশ্চয় করা যায় না। পরন্তু বাৎস্যায়নভাষ্যে মহাভাষ্যের ঐ বাক্যও যথাযথ দেখা যায় না। উভয় গ্রন্থে কোন অংশে পাঠভেদ থাকায় বাৎস্যায়ন, মহাভাষ্যের বাক্যই উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহা বলা যায় না। ("বৃদ্ধিরাদৈচ্" এই সূত্রের মহাভাষ্য দ্রষ্টব্য)। বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগ প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থে বাৎস্যায়ন ভাষ্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন, ইহা নির্ব্বিবাদে নিশ্চিত। কিন্তু দিঙ্‌নাগের সময় নির্ব্বিবাদে নিশ্চিত নহে। বিশ্বকোষে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দী দিঙ্‌নাগের সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু বহুদর্শী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় "বৌদ্ধন্যায়" প্রবন্ধে[১] প্রমাণসমুচ্চয়কার দিঙ্‌নাগকে কালিদাসের সমসাময়িক এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষবর্ত্তী বলিয়াছেন এবং উদ্যোতকর ন্যায়বার্ত্তিকে বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্ম্মকীর্ত্তি ও বিনীতদেবের গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, এই কথা বলিয়া উদ্যোতকরকে ধর্ম্মকীর্ত্তি ও বিনীতদেবের সমসাময়িক খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষবর্ত্তী বলিয়াছেন। বিশ্বকোষে উদ্যোতকরকে আরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বলা হইয়াছে। জর্ম্মান পণ্ডিত জেকবির প্রবন্ধে বাৎস্যায়নের সময় খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী এবং উদ্যোতকরের সময় ষষ্ঠ শতাব্দী নির্দ্ধারিত হইয়াছে জানিয়াছি।* বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকগণ ঐ সকল

১। ১৩২১ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

* বাৎস্যায়ন সম্বন্ধে জার্ম্মান্ পণ্ডিত জেকবির মত—The results of our

মতভেদের বিচার করিবেন। আমাদিগের বিশ্বাস, উদ্দ্যোতকর খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীরও পূর্ব্ববর্ত্তী, তিনি দিঙ্‌নাগের বেশী পরবর্ত্তী নহেন। এই বিশ্বাসের প্রধান কারণ এই যে, শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য্যটীকার প্রারম্ভে "অতিজরতীনাং" এই কথার দ্বারা উদ্দ্যোতকরের বার্ত্তিককে প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন[১]। ন্যায়-বার্ত্তিকা-তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধিতে উদয়নাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্রের কথাগুলির প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিতে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে পাওয়া যায়[২], উদ্দ্যোতকরের বার্ত্তিক বাচস্পতি মিশ্রের সময়েও প্রাচীন গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থের বহু টীকা হইয়াছিল। কিন্তু কালবশে উদ্দ্যোতকরের সম্প্রদায় বিলুপ্তপ্রায় হওয়ায় সেই সকল টীকা বা নিবন্ধ 'কুনিবন্ধ হইয়াছিল। অর্থাৎ উদ্দ্যোতকরের বার্ত্তিকের সে সমস্ত টীকা যথার্থ টীকা হইতে পারিয়াছিল না। বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার ত্রিলোচননামা অধ্যাপকের নিকটে উদ্দ্যোতকরের বার্ত্তিকের রহস্যবোধক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা নামে টীকা করিয়া, ঐ বার্ত্তিক গ্রন্থের উদ্ধার করেন। বাচস্পতি মিশ্র যে ত্রিলোচন গুরুর উপদেশ পাইয়া,

---

researches into the age of the Philosophical Sutras may be summarised as follows :—"Nayadarsan" and "Brahma Sutra" were composed between 200 and 450 A. D. During that period lived the old commentators :—Vatsyayana, Upavarsa, the Vrittikara (Bodha Yana ?) and probablv Sabaraswamin.

উদ্দ্যোতকর সম্বন্ধে—He (Uddyotakara) may therefore have flourished in the early part of the Sixth century or still earlier (The dates of the Philosophical Sutras of the Brahmans by Herman Jacobi.

/ 1911 Vol. 31, Journal of the American Oriental Society).

১। ইচ্ছামঃ কিমপি পুণ্যং দুস্তরকুনিবন্ধ পঙ্কমগ্নানাং।
উদ্দ্যোতকর-গবীনামতিজরতীনাং সমুদ্ধরণাৎ ॥

২। নমু চিরন্তনেঽস্মিন্ নিবন্ধে মহাজন পরিগৃহীতে বহবো নিবন্ধাঃ সন্তীতি কৃতমনেনেত্যত আহ ইচ্ছাম ইতি। নমু যদি গ্রন্থকারসম্প্রদায়বিচ্ছেদেন তে নিবন্ধাঃ কথং কুনিবন্ধাঃ? অথ সম্প্রদায়ো বিচ্ছিন্নঃ? কথং তবাপীয়ং বিচ্ছিন্নসম্প্রদায়া তাৎপর্য্যটীকা সুনিবন্ধ ইত্যত আহ অতিজরতীনামিতি। উদ্দ্যোতকর-সম্প্রদায়ো হমৃষাং যৌবনং তচ্চ কালবশাদ্‌গলিতমিব, কিন্নামাত্র ত্রিলোচনগুরোঃ সকাশাদুপদেশ-রসায়নমাসাদিতমমূষাং পুনর্নবীভাবায় দীয়ত ইতি যুজ্যতে। ন চ কুনিবন্ধ-পঙ্কমগ্নানাং তদদাতুমুচিতমিতি তস্মাদুৎকৃষ্য স্বনিবন্ধস্থলে সন্নিবেশনরূপ-সমুদ্ধরণমেব সাম্প্রতমিত্যর্থঃ।—তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি, ৯ পৃষ্ঠা।

তদনুসারে ভাষ্য ও বার্ত্তিকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা তাৎপর্য্যটীকায় (প্রত্যক্ষ সূত্রে) তাঁহার নিজের কথাতেও পাওয়া যায়। বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায়সূচী-নিবন্ধের শেষোক্ত শ্লোকে[1] পাওয়া যায় যে তিনি ৮৯৮ বৎসরে ঐ গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ "বৎসর" শব্দের দ্বারা বৈক্রম সংবৎ বুঝিলে ৮৪১ খৃষ্টাব্দে এবং শকাব্দ বুঝিলে ৯৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, বুঝা যায়। শেষোক্ত পক্ষই বহুসম্মত। মনে হয় বাচস্পতি মিশ্র সর্ব্বশেষে ন্যায়সূচী-নিবন্ধ রচনা করায়, ঐ গ্রন্থের শেষে তাঁহার সময়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উদয়নাচার্য্যও লক্ষণাবলী গ্রন্থের শেষে তাঁহার সময়ের (৯০৬ শকাব্দ) উল্লেখ করিয়াছেন[2]। উদয়নের কিরণাবলী গ্রন্থের প্রথম শ্লোকটি লক্ষণাবলীর শেষেও দেখা যায়। বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্য, শ্রীহর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহাও খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য পাঠে জানা যায়। এখন বক্তব্য এই যে, উদ্যোতকর খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষবর্ত্তী হইলে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর গ্রন্থকার বাচস্পতি মিশ্র, উদ্যোতকরের বার্ত্তিককে "অতিজরতীনাং" এই কথার দ্বারা প্রাচীন গ্রন্থ বলিবেন এবং উদয়নাচার্য্য উদ্যোতকরের সম্প্রদায় লোপ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত প্রকার কথা বলিবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব মনে হয় না। এখনও রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতির ন্যায়গ্রন্থ প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া কথিত হয় না। উদ্যোতকরের বার্ত্তিকের আলোচনায় মনে হয়, তিনি ভট্ট কুমারিল ও ভর্ত্তৃহরিরও পূর্ব্ববর্ত্তী। ন্যায়বার্ত্তিকে ভর্ত্তৃহরির মতের কোন আলোচনা বা ভর্ত্তৃহরির কোন কথা এবং মীমাংসক মতের আলোচনায় ভট্ট কুমারিলের কথা বা মতের আলোচনা আছে বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। উদ্যোতকরের উত্থাপিত মীমাংসক মতকে তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র জরন্মীমাংসক মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু শ্লোক-বার্ত্তিকে অনুমান-প্রমাণের প্রমেয় বিষয়ে কুমারিল নিজ মতের সমর্থনপূর্ব্বক অন্যের মত বলিয়া ঐ বিষয়ে উদ্যোতকরের সমর্থিত মতটিরও উল্লেখ করিয়াছেন (শ্লোকবার্ত্তিক, অনুমান পরিচ্ছেদ, ৪৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। সেখানে টীকাকার পার্থসারথি মিশ্র ঐ মতকে নৈয়ায়িকের মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কুমারিল কোন অপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মতের উল্লেখ ও সমর্থন করিতে পারেন না।

১। ন্যায়সূচীনিবন্ধোঽসাবকারি সুধিয়াং মুদে।
শ্রীবাচস্পতিমিশ্রেণ বস্বঙ্কবসু (৮৯৮) বৎসরে॥

২। তর্কাম্বরাঙ্ক (৯০৬) প্রমিতেষ্বতীতেষু শকান্ততঃ।
বর্ষেষূদয়নশ্চক্রে সুবোধাং লক্ষণাবলীং॥

ঐ মতটি কুমারিলের পূর্ব্ব হইতেই সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল, ইহা বুঝা যায়। বাৎস্যায়ন যে ঐ মতাবলম্বী নহেন, তাহা বহু স্থলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। উদ্যোতকরই অনুমান-প্রমাণের প্রমেয় বিষয়ে অন্যান্য মত ও দিঙ্‌নাগের মত খণ্ডন পূর্ব্বক ঐ নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি (১৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ভট্ট কুমারিল শ্লোকবার্ত্তিকে অনুমান পরিচ্ছেদে দিঙ্‌নাগের মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। পরন্তু কবি বাণভট্ট খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে হর্ষচরিতে প্রথমে যে বাসবদত্তা কাব্যের অতি প্রশংসা করিয়াছেন, উহা কবি সুবন্ধু-রচিত প্রসিদ্ধ বাসবদত্তা কাব্য, ইহাই পণ্ডিত-সমাজে প্রসিদ্ধ আছে। ঐ বাসবদত্তা কাব্য বাণভট্টের পূর্ব্বেই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, ইহা স্বীকার্য্য। সুবন্ধু ঐ বাসবদত্তা কাব্যে উদ্যোতকরের নামোল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়[1]। তাহা হইলে উদ্যোতকর যে সুবন্ধুর পূর্ব্ব হইতেই দেশে ন্যায়মত-প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহাও সুবন্ধুর কথায় বুঝিতে পারা যায়। এ সব কথা উপেক্ষা করিলেও বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্যের কথা কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। তাঁহারা উদ্যোতকরের বার্ত্তিককে যেরূপ প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে উদ্যোতকর যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীরও পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা আমাদিগের বিশ্বাস।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র "অতিজরতীনাং" এই কথা বলিয়া যে বার্ত্তিকের প্রাচীনত্বের ঘোষণা ও তাহার উদ্ধারের প্রয়োজন সূচনা করিয়াছেন এবং যাহার উদ্ধারের জন্য তিনি ত্রিলোচন গুরুর উপাসনা করিয়াছেন, সেই সুপ্রসিদ্ধ বার্ত্তিক গ্রন্থের প্রাচীনত্ব বিষয়ে বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্য ভ্রান্ত ছিলেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব নহে।

উদ্যোতকর প্রতিজ্ঞা-সূত্রবার্ত্তিকে "বাদবিধি" ও "বাদবিধানটীকা" নামে বৌদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে ধর্ম্মকীর্ত্তির "বাদন্যায়" নামক গ্রন্থকেই "বাদবিধি" নামে এবং বিনীতদেবের "বাদন্যায়ব্যাখ্যা" নামক গ্রন্থকেই "বাদবিধানটীকা" নামে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই। ঐ সকল মূল গ্রন্থ পাওয়া যায় না। গ্রন্থের প্রকৃত নাম ত্যাগ করিয়া কল্পিত নামে উল্লেখেরও কোন কারণ বুঝি না। উদ্যোতকর ধর্ম্মকীর্ত্তি ও বিনীতদেবের সমসাময়িক হইলে তাঁহার ঐরূপ নাম-ভ্রমেরও কোন কারণ বুঝি না। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রচুর

১। ন্যায়স্থিতিমিবোদ্দ্যোতকরস্বরূপাং।—বাসবদত্তা, ২৩৫ পৃষ্ঠা।

মূল গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই সদৃশ নামেও অনেক গ্রন্থ ছিল ও আছে। বিভিন্ন গ্রন্থকারের বিভিন্ন গ্রন্থে বিষয়বিশেষের বিচারে সদৃশ ভাষারও প্রয়োগ হইয়াছে ও হইয়া থাকে। উদ্যোতকরের উদ্ধৃত বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থ-সন্দর্ভ দেখিলেও ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্য্য-টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের কথায় উদ্যোতকর, দিঙ্‌নাগ ও সুবন্ধুর গ্রন্থের বিশেষ উল্লেখ ও প্রতিবাদ করিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট পাওয়া যায়। উদ্যোতকরের কথিত "বাদবিধানটীকা" সুবন্ধুরচিত কোন গ্রন্থের টীকা, ইহা মনে হয়। বাচস্পতি মিশ্র ঐ স্থলে পূর্ব্বে উদ্যোতকরের উল্লিখিত কোন লক্ষণকে সুবন্ধুর লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি ঐ মত সমর্থন করিয়া তাঁহার "ন্যায়বিন্দু" গ্রন্থে উদ্যোতকরের কথার প্রতিবাদ করিতে পারেন। কিন্তু উদ্যোতকর যে ধর্ম্মকীর্ত্তির কোন গ্রন্থের উল্লেখাদি করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারি নাই। মূল গ্রন্থ না পাইলে অথবা কোন প্রামাণিক প্রাচীন সংবাদ না পাইলে তাহা বুঝা যায় না। বাচস্পতি মিশ্র পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সম্বন্ধে কোন পরিচয় দিয়া যান নাই। উদ্যোতকর আরও বহু স্থলে বৌদ্ধ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে "সর্ব্বাভিসময়সূত্র" নামে কোন প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র ঐ সকল গ্রন্থের কোন পরিচয় দিয়া যান নাই। বহু স্থলে কোন কোন বৌদ্ধ গ্রন্থের পরিচয়ও দিয়াছেন। ধর্ম্মকীর্ত্তির গ্রন্থ যে তাঁহার বিশেষ অধিগত ছিল, তাহার পরিচয় ভামতী ও তাৎপর্য্যটীকা প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। দিঙ্‌নাগের সমসাময়িক বসুবন্ধু নামে যে প্রধান বৌদ্ধ নৈয়ায়িকের বার্ত্তা পাওয়া যায়, বাচস্পতি মিশ্র তাঁহাকেই সুবন্ধু নামে বহু স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন কিনা, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। সে যাহাই হউক, মূল কথা, উদ্যোতকর খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর বহু পূর্ব্ববর্তী এবং ভগবান্ বাৎস্যায়ন খৃষ্ট-পূর্ব্ববর্তী, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। এখানে নিজের বিশ্বাসানুসারেই এ সকল বিষয়ে কিছু আলোচনা করিলাম। প্রধান ঐতিহাসিকগণের কথা এবং অনুসন্ধান দ্বারা ফলে কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহা গ্রন্থশেষে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এ পর্য্যন্ত এই সকল বিষয়ে যে সমস্ত প্রবন্ধাদি পাঠ ও অনুসন্ধানাদি করিয়াছি, তাহাতে নানা মতভেদই পাইয়াছি; কোন নির্ব্বিবাদ সিদ্ধান্ত পাই নাই। মতভেদ অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থের টিপ্পনীর মধ্যেও কোন কোন কথা বলিয়াছি।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন কোন্ দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এ বিষয়েও

বাহায়

কোন নির্ব্বিবাদ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। বাৎস্যায়ন দাক্ষিণাত্য, ইহা অনেকে সমর্থন করেন। বাৎস্যায়ন ও উদ্যোতকর উভয়েই মৈথিল, ইহাও অনেকে বলেন। ভাষ্য ও বার্ত্তিকের দ্বারা এ বিষয়ে কিছু নিশ্চয় করা যায় না। কোন কোন কথার দ্বারা যাহা কল্পনা করা যায় এবং কেহ কেহ যেরূপ কল্পনা করিয়াছেন, যথাস্থানে তাহার আলোচনা পাওয়া যাইবে এবং গ্রন্থশেষেও পুনরায় এ সকল বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যাইবে।

দ্বিতীয় সংস্করণের

ভূমিকা

করুণাময় শ্রীভগবানের অব্যর্থ ইচ্ছায় মুদ্রাঙ্কনের বহু বাধা অতিক্রম করিয়া এতদিন পরে সভাষ্য ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। এবার পূর্ব্বমুদ্রিত গ্রন্থই পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। কিন্তু ইহাতে সর্ব্বত্র ভাষ্যার্থব্যাখ্যার যথাশক্তি বিশদীকরণের জন্য এবং অনেক স্থলে অবশ্যজ্ঞাতব্য বহু অতিরিক্ত বিষয়-সন্নিবেশের জন্য প্রায় সর্ব্বত্রই অনুবাদ প্রভৃতি আবার নূতন করিয়াই লিখিত হইয়াছে। আর ভাষ্যের প্রকৃত পাঠ গ্রহণের জন্য এবার আরও বহু অনুসন্ধান ও চিন্তা করিয়া অনেক স্থলে যথামতি অনেক ভাষ্যপাঠের পরিবর্ত্তন বা সংশোধনও করা হইয়াছে। কিন্তু লিখিত সমস্ত বিষয়েই বিচার-সমর্থ সুধী পাঠকগণই সদসদ্-বোদ্ধা। সে বিষয়ে আমি কিছু বলিতে পারি না। মহাকবি কালিদাসও বলিয়া গিয়াছেন,—"বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ ॥"

ন্যায়দর্শন ও ন্যায়সূত্রকারের পরিচয়

ন্যায়দর্শন ভারতের পরম গৌরব সুপ্রসিদ্ধ ষড়্দর্শনের অন্যতম দর্শন। মহর্ষি অক্ষপাদ এই দর্শনের বক্তা। তাই "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন, "**অক্ষপাদদর্শন**"। কিন্তু তাঁহার অনেক পূর্ব্বে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য তৎকৃত "আত্মতত্ত্ববিবেক" গ্রন্থের শেষে "**ন্যায়দর্শন**"ই বলিয়াছেন। অক্ষপাদ মহর্ষিই যে, পঞ্চাধ্যায় ন্যায়সূত্রাকার, ইহা সমস্ত পূর্ব্বাচার্য্যই বলিয়াছেন। ন্যায়দর্শনের কোন অংশ গৌতম এবং কোন অংশ পরে অক্ষপাদ রচনা করিয়াছেন, এইরূপ অনুমানের প্রকৃত হেতুও নাই। আর তাহা হইলে ন্যায়দর্শনে প্রমাণাদি পদার্থের উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা, এই ত্রিবিধ ব্যাপার সংগত হয় না। পরে এই গ্রন্থ পাঠে ইহা বুঝা যাইবে।

পরন্তু গৌতম মুনিরই নামান্তর অক্ষপাদ এবং তাঁহারই অপর নাম মেধাতিথি।* তাই সুপ্রাচীন ভাসকবি তৎকৃত 'প্রতিমা' নাটকের পঞ্চম

* স্কন্দপুরাণে অহল্যাপতি গৌতম মুনিকেই অক্ষপাদ বলা হইয়াছে। যথা—"অক্ষপাদো মহাযোগী গৌতমাখ্যোহভবন্মুনিঃ। গোদাবরী-সমানেতা অহল্যায়াঃ পতিঃ প্রভুঃ ॥" (মাহেশ্বর খণ্ডে কুমারিকাখণ্ড, ৫৫ অঃ, ৫ম শ্লোক)। আর মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের (২৬৫ অঃ) "মেধাতিথির্মহাপ্রাজ্ঞো গৌতমস্তপসি স্থিতঃ" (৪৫) ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহাকে মেধাতিথিও বলা হইয়াছে।

অঙ্কে বলিয়াছেন,—"মেধাতিথের্ন্যায়শাস্ত্রম্"।" অতএব ভাস কবির বহু পূর্ব্ব হইতেই যে, তাঁহার দেশে গৌতমের ন্যায়সূত্র মেধাতিথির ন্যায়শাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, ইহাও বুঝা যায়। কিন্তু উক্ত গৌতম মুনির আদি পুরুষ গোত্র-প্রবর্ত্তক গোতম মুনি। "ঋগ্‌বেদসংহিতা"র প্রথম মণ্ডলে (১৪ অঃ, ৮৫ সূক্তে) উক্ত গোতম মুনির উল্লেখ ও তাঁহার সম্বন্ধে দেবগণের বিশিষ্ট অনুগ্রহের বর্ণন আছে। তাই ন্যায়সূত্রকার গৌতম তাঁহার সেই সুপ্রসিদ্ধ আদিপুরুষের নামানুসারে অনেক গ্রন্থে গোতম নামেও কথিত হইয়াছেন।*

প্রাচীন কাল হইতেই ভারতের পণ্ডিতসমাজে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, গোতম বা গৌতম মুনি, কোন সময়ে মনুষ্যদেহ ধারণপূর্ব্বক উপস্থিত মহাদেব শিবকে শাস্ত্রবিচার দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকটে বর প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চাধ্যায় দশাহ্নিক ন্যায়সূত্র রচনা করেন। বেদব্যাসের ভিক্ষুসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র রচনার অনেক পূর্ব্বেই যে, ন্যায়সূত্র রচিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চিত। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীরবাসী বহুশ্রুত মহামনীষী জয়ন্ত ভট্টও "ন্যায়মঞ্জরী"র শেষে অক্ষপাদ মুনির গৌরীপতি শিবের নিকটে বরপ্রাপ্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন।† প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও গ্রন্থশেষে আবার কণাদ মুনিকে নমস্কার

* এ বিষয়ে প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় আমি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। অবশ্য তাহা সর্ব্বসম্মত হইবে না। কিন্তু ইহাও বলা আবশ্যক যে, উক্ত 'অক্ষপাদ' শব্দে 'অক্ষ' শব্দের অর্থ জন্মান্ধ এবং পরে 'পাদ' শব্দ মান্যার্থ অর্থাৎ অক্ষপাদ শব্দের অর্থ জন্মান্ধপাদ, ইহা বুঝিয়া জন্মান্ধ দীর্ঘতমা গৌতম মুনিই ন্যায়সূত্রকার, ইহা কোন পূর্ব্বাচার্য্যই বুঝেন নাই। কিন্তু গোতম বা গৌতম মুনি কোন সময়ে যোগবলে নিজ চরণে চক্ষুরিন্দ্রিয় সৃষ্টি করায় 'অক্ষযুক্তঃ পাদো যস্য' এই অর্থে অক্ষপাদ নামে কথিত হন, এইরূপ চিরপ্রসিদ্ধি অনুসারেই পূর্ব্বাচার্য্যগণ উক্ত নামের উক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াই তাঁহাকে 'অক্ষচরণ'ও বলিয়াছেন। পরন্তু 'সংক্ষেপশঙ্করজয়' গ্রন্থে (১৬শ অঃ) মাধবাচার্য্য কোন শ্লোকে বলিয়াছেন—"কণাদপক্ষাচ্চরণাক্ষপক্ষে" (৬৮); 'বেদান্তকল্পতরুপরিমলে'র প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের শেষে অপ্পয় দীক্ষিতের 'কণভক্ষ-পদাক্ষক' ইত্যাদি শ্লোকও দ্রষ্টব্য। "মানমেয়োদয়" গ্রন্থে নারায়ণ ভট্টও বলিয়াছেন, 'অক্ষপাৎপক্ষিলাদয়ঃ'। কিন্তু তাঁহারা 'অক্ষপাদ' শব্দে পাদ শব্দ মান্যার্থ বুঝিলে 'চরণাক্ষ', 'পদাক্ষক' ও 'অক্ষপাৎ' এইরূপ প্রয়োগ করিতে পারেন না, ইহা বুঝা আবশ্যক। এই বিষয়ে মৎপ্রণীত 'ন্যায়পরিচয়' গ্রন্থের ভূমিকায় (৪১-৪২ পৃঃ) অন্য কথা দ্রষ্টব্য।

† "ন্যায়োদ্‌গারগভীরনির্ম্মলগিরা গৌরীপতিস্তোষিতো
বাদে যেন কিরীটিনেব সমরে দেবঃ কিরাতাকৃতিঃ।
প্রাপ্তোদারবরস্ততঃ স জয়তি জ্ঞানামৃতপ্রার্থনা-
নামাহনেকমহর্ষিমস্তকমলৎপাদোঽক্ষপাদো মুনিঃ ॥"

করিতে বলিয়াছেন,—"যোগাচারবিভূত্যা যস্তোষয়িত্বা মহেশ্বরং। চক্রে বৈশেষিকং শাস্ত্রং তস্মৈ কণভুজে নমঃ ॥"

বস্তুতঃ অক্ষপাদ ও কণাদ মুনি যে, শিবসাধনার দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছিলেন,—ইহা পুরাণ-প্রসিদ্ধ। স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ডেও বর্ণিত হইয়াছে,—"তত্র পাশুপতঃ সিদ্ধস্ত্বক্ষপাদো মহামুনে। অনেনৈব শরীরেণ শাশ্বতীং সিদ্ধিমাগতঃ ॥" (৯৭ অঃ, ৬১ শ্লোক)। কাশীধামে **অক্ষপাদেশ** এবং **কণাদেশ** নামে শিবলিঙ্গও প্রতিষ্ঠিত আছেন। পরে কাশীখণ্ডেও বর্ণিত হইয়াছে, "তদ্দক্ষিণেঽক্ষপাদেশো মহাজ্ঞানপ্রবর্ত্তকঃ ॥ তদগ্রে চ কণাদেশস্তত্র পুণ্যোদকঃ প্রহিঃ। স্নাত্বা কণাদকূপে যঃ কণাদেশং সমর্চ্চয়েৎ ॥" (ঐ, ৯৭ অঃ, ১৭৪-৭৫ শ্লোক)। পূর্ব্বকালে ভারতের নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ ও অধ্যাপকগণ কাশীধামে পরমভক্তি সহকারে 'অক্ষপাদেশ' শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিতেন এবং পূর্ব্বোক্ত কারণে নৈয়ায়িক অধ্যাপক ও ছাত্রগণ বিশেষ করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শিবের আরাধনা করিতেন। 'ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ে'র টীকায় (নৈয়ায়িকমত-ব্যাখ্যারম্ভে) বহুবিজ্ঞ জৈন পণ্ডিত গুণরত্ন সূরিও লিখিয়া গিয়াছেন,—"পরং শাস্ত্রেষু নৈয়ায়িকাঃ সদা শিবভক্তত্বাৎ শৈবা ইত্যুচ্যন্তে, বৈশেষিকাস্তু পাশুপতা ইতি। তেন নৈয়ায়িক-শাসনং শৈবমাখ্যায়তে, বৈশেষিকদর্শনঞ্চ পাশুপতমিতি।"* কিন্তু শিবেরই অপর নাম পশুপতি। অতএব উক্ত মতে বৈশেষিকসম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতাও বস্তুতঃ শিব। 'ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়'কার হরিভদ্র সূরিও পূর্ব্বে বৈশেষিকমত-ব্যাখ্যারম্ভে বলিয়াছেন,—"দেবতাবিষয়ে ভেদো নাস্তি নৈয়ায়িকৈঃ সহ।"

---

* এখানে বলা আবশ্যক যে, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক সম্প্রদায়কে মাহেশ্বর সম্প্রদায়ের অন্তর্গত শৈব ও পাশুপত বলা যায় না। কারণ, তাঁহাদিগের মত অন্যরূপ। শারীরক ভাষ্যে (২।২।৩৭) "মাহেশ্বরাস্তু মন্যন্তে" ইত্যাদি সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য। কিন্তু গুণরত্ন সূরি প্রথমে নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের অপর নাম 'যৌগ' বলিয়া তাঁহাদিগের বেশ বর্ণন করিতে লিখিয়াছেন, "তে চ দণ্ডধরাঃ প্রৌঢ়কৌপীনপরিধানাঃ কম্বলিকাপ্রাবৃতা জটাধারিণো ভস্মোদ্ধূলনপরা যজ্ঞোপবীতিনো জলাধারপাত্রকরাঃ" ইত্যাদি। পরে তিনি নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক, উভয় সম্প্রদায়কেই তপস্বী যোগী বলিয়া তাঁহাদিগের শৈব, পাশুপত, মহাব্রতধর ও কালমুখ, এই চতুর্ব্বিধ ভেদ বলিয়াছেন এবং তাঁহাদিগেরও অনেক প্রকার ভেদ বর্ণন করিয়াছেন। যদিও ন্যায়বৈশেষিকসম্প্রদায়ের কোন গ্রন্থেই আমরা ঐরূপ কথা পাই না, তথাপি গুণরত্ন সূরির ঐ সমস্ত কথাও অমূলক বলা যায় না। তাঁহার নৈয়ায়িকমত ব্যাখ্যার শেষ ভাগও দ্রষ্টব্য।

ন্যায়শাস্ত্রের প্রাচীনত্ব ও প্রশংসা

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ভাষ্যশেষে বলিয়াছেন,—"যোঽক্ষপাদমৃষিং ন্যায়ঃ প্রত্যভাদ্ বদতাং বরং। তস্য বাৎস্যায়ন ইদং ভাষ্যজাতমবর্ত্তয়ৎ ॥" অর্থাৎ যে ন্যায়শাস্ত্র বাগ্মিবর অক্ষপাদ ঋষির সম্বন্ধে প্রতিভাত হইয়াছিল, সেই ন্যায়শাস্ত্রের ভাষ্য তিনি রচনা করিয়াছেন। ইহার দ্বারা বাৎস্যায়নের মতেও বুঝা যায় যে, অক্ষপাদ ঋষি ন্যায়শাস্ত্রের স্রষ্টা নহেন। কিন্তু তিনি পূর্ব্ববিদ্যমান সেই ন্যায়শাস্ত্রকে লাভ করিয়া সুসম্বদ্ধ সূত্রসমূহ-রচনার দ্বারা বিস্তৃতরূপে তাহার প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাই ঐ তাৎপর্য্যেই তাঁহাকে ন্যায়শাস্ত্রকার বলা হয়। পরে 'ন্যায়মঞ্জরী'কার বহুবিজ্ঞ মহামনীষী জয়ন্ত ভট্টও সমাধান করিয়াছেন যে, অক্ষপাদের পূর্ব্বেও সংক্ষিপ্তরূপে ন্যায়শাস্ত্র বিদ্যমান ছিল। ঐরূপ বেদের ন্যায় সৃষ্টির প্রথম হইতে অন্যান্য বিদ্যাও সংক্ষিপ্তরূপে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু পরে যাঁহারা বিস্তৃতরূপে সেই সমস্ত শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সেই সেই শাস্ত্রের কর্ত্তা বলা হয়। "আদিসর্গাৎ প্রভৃতি বেদবদিমা বিদ্যাঃ প্রবৃত্তাঃ। সংক্ষেপবিস্তরবিবক্ষয়া তু তাংস্তান্ তত্র তত্র কর্ত্তৄনাচক্ষতে।" ('ন্যায়মঞ্জরী', ৫ম পৃঃ)।

বস্তুতঃ সুপ্রাচীনকালেও যে, ন্যায়শাস্ত্র ঋষিগণের অধিগত ছিল, এ বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না। কারণ, ন্যায়শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত শ্রুতিসিদ্ধ আত্মার মনন এবং অন্যান্য কোন বিষয়েই বিচার করা যায় না। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম প্রপাঠকের তৃতীয় অনুবাকে "স্মৃতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ং" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও, যে অনুমানপ্রমাণের উল্লেখ হইয়াছে এবং যে কোন বিচার করিতে হইলে, যে অনুমানপ্রমাণকে কোন বিষয়ে আশ্রয় করিতেই হইবে, তাহার সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানে ন্যায়শাস্ত্রই পরম সহায়। পরন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে 'নারদসনৎকুমারসংবাদে' বর্ণিত নারদের অধীত বিদ্যাসমূহের মধ্যে যে 'বাকোবাক্যে'র উল্লেখ হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—"বাকোবাক্যং তর্কশাস্ত্রম্।" উক্ত মতে বেদানুগত তর্কশাস্ত্রই 'বাকোবাক্য' এবং উহাই মুখ্য ন্যায়শাস্ত্র। এই সুবালোপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ডেও বেদাদি নানা বিদ্যার বর্ণনায় কথিত হইয়াছে,—"ন্যায়ো মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি।" মহাভারতের সভাপর্ব্বের পঞ্চম অধ্যায়ে বহুশ্রুত নারদের নানা বিদ্যার বর্ণনায় কথিত

হইয়াছে, “পঞ্চাবয়বযুক্তস্য বাক্যস্য গুণদোষবিৎ।” অর্থাৎ নারদ মুনি পঞ্চাবয়ব ন্যায়বিদ্যাতেও পরম পণ্ডিত ছিলেন। মহর্ষি গোতম-প্রকাশিত ন্যায়বিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্রই পঞ্চাবয়ব ন্যায়বিদ্যা। অতএব মহাভারতের উক্তরূপ বর্ণনের দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত নারদের অধীত যে ‘বাকোবাক্য’, তাহা পঞ্চাবয়ব ন্যায়শাস্ত্র। অবশ্য ‘বাকোবাক্য’ শব্দের অন্যত্র অন্যরূপ অর্থব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। কিন্তু আচার্য্য শঙ্করের প্রাচীন ব্যাখ্যা অমূলক হইতে পারে না।

পরন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মতে মহর্ষি গোতম-প্রকাশিত পঞ্চাবয়ব ন্যায়শাস্ত্রই প্রাচীন ‘আন্বীক্ষিকী’ বিদ্যা। ন্যায়মতের খণ্ডনকার অদ্বৈতবাদী শ্রীহর্ষও ‘নৈষধীয়চরিতের’ দশম সর্গে (৮১ শ্লোকে) মহর্ষি গোতম-প্রকাশিত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থ-প্রতিপাদক ন্যায়শাস্ত্রকেই মুমুক্ষুর অনুকূল আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বলিয়া প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে (৩১৮ অঃ) জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ পাঠ করিলে তাহাতে উক্তরূপ আন্বীক্ষিকী বিদ্যার কিরূপ প্রশংসা হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইবে। যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন যে, আমি এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যার সাহায্যে উপনিষদের মন্থন করি। এই চতুর্থী আন্বীক্ষিকী বিদ্যা মোক্ষের নিমিত্ত হিতকরী। ‘মনুসংহিতা’য়ও (৭।৪৩) এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যার উল্লেখ হইয়াছে। ‘যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা’র প্রথমেও “পুরাণ-ন্যায় মীমাংসা” ইত্যাদি শ্লোকে চতুর্দ্দশ বিদ্যার পরিগণনায় ‘ন্যায়’ শব্দের দ্বারা উক্ত আন্বীক্ষিকী বিদ্যারই উল্লেখ হইয়াছে।

প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ অনুমানই ‘অন্বীক্ষা’ শব্দের ফলিতার্থ। সেই ‘অন্বীক্ষা’য় সম্যক্ অধিকার লাভের জন্য উক্ত বিদ্যার প্রকাশ হওয়ায় উহার নাম ‘আন্বীক্ষিকী’। উক্ত বিদ্যার সাহায্যে যাঁহারা যথার্থ অনুমানের প্রকৃত হেতুর তত্ত্ববেত্তা ও ন্যায়প্রয়োগকুশল, সেই সমস্ত নৈয়ায়িকগণের প্রাচীন নাম হৈতুক।* তাই ভগবান্ মনু ধর্ম্মনির্ণয়-পরিষদের বর্ণনায় ত্রিবেদজ্ঞ পণ্ডিতের

* কিন্তু যাঁহারা বেদাদিশাস্ত্রকে অমান্য করিয়া সর্ব্ব বিষয়েই হেতুর প্রশ্ন করিতেন এবং নাস্তিক মত সমর্থন করিতে শাস্ত্রবিরুদ্ধ নানা হেতু বলিতেন, তাঁহারাও উক্তরূপ অর্থে ‘হৈতুক’ নামে কথিত হইয়াছে। মনু তাদৃশ হৈতুকদিগের সম্বন্ধেই পূর্ব্বে বলিয়াছেন, “হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্‌মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ।।” (৪।৩)। মহাভারতেও উক্তরূপ নাস্তিক কুতার্কিক-দিগেরই নিন্দা হইয়াছে। কিন্তু বেদানুগত আন্বীক্ষিকী বিদ্যার নানা প্রকারে প্রশংসাই হইয়াছে। এ বিষয়ে আমি প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় সপ্রমাণ বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

পরেই উক্ত হৈতুক পণ্ডিতকে গ্রহণ করিয়াছেন। মনুসংহিতার শেষে "ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী" ইত্যাদি (১২।১১১) বচন দ্রষ্টব্য। মনুর উপদেশ এই যে, শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা শাস্ত্রগম্য ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয়েও শাস্ত্রতাৎপর্য্যের অনুমানকুশল শাস্ত্রবিশ্বাসী নৈয়ায়িক পণ্ডিত আবশ্যক। অতএব দশাবরা পরিষদে নৈয়ায়িকের স্থান দ্বিতীয়। তাহা হইলে সুপ্রাচীন কালেও যে, ভারতে তাদৃশ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন, ইহা বুঝা যায়। বাল্মীকি রামায়ণেও দেখা যায়, "হেতুপচারকুশলান্ হৈতুকাংশ্চ বহুশ্রুতান্।" (উত্তরকাণ্ড, ১০৭।৮)। ইহার দ্বারা বুঝা যায়, শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভায় অনুমান-কুশল বহুশ্রুত নৈয়ায়িকগণেরও সাদরে নিমন্ত্রণ হইয়াছে।

পরন্তু মনু, রাজ্যরক্ষার জন্য রাজারও যে, আন্বীক্ষিকী বিদ্যা জ্ঞাতব্য বলিয়াছেন, (৭।৪৩) তাহা কোন অধ্যাত্মবিদ্যামাত্র নহে। কিন্তু তাহা অধ্যাত্মবিদ্যা হইলেও অনেক অংশে তর্কবিদ্যা। তাই প্রাচীন কোষকার অমরসিংহ 'আন্বীক্ষিকী' শব্দের অর্থ বলিয়াছেন,—তর্কবিদ্যা। অনুমানপ্রমাণ ও তাহার সহকারী প্রকৃত তর্কের দ্বারা অনেক অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের নির্ণয়ের জন্য রাজ্যরক্ষক রাজারও উক্তরূপ আন্বীক্ষিকী বিদ্যা অবশ্য জ্ঞাতব্য। মহর্ষি গোতম ন্যায়সূত্রের দ্বারা উক্ত প্রাচীন 'আন্বীক্ষিকী' বিদ্যারই প্রকাশ করিয়াছেন।

অবশ্য ন্যায়দর্শনের অধ্যাত্ম অংশে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত কথিত ও বিচারপূর্ব্বক সমর্থিত হইয়াছে, তাহার অনেক সিদ্ধান্ত সর্ব্বসম্মত নহে। কিন্তু সাংখ্যাদি দর্শনের অনেক মতও সর্ব্বসম্মত নহে। প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে বিভিন্ন দর্শনের বিভিন্ন মতবিশেষ ও তাহার সম্প্রদায়ভেদ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং সম্প্রদায়ভেদে নানা বিরুদ্ধ মতের খণ্ডনমণ্ডনও হইতেছে। ভগবদিচ্ছায় যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহার নিবৃত্তি কেবল বিচার বা তর্কের দ্বারা সম্ভব নহে। কিন্তু ন্যায়দর্শনের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা নহে। ইহা অধ্যাত্মবিদ্যা হইলেও সর্ব্বশাস্ত্র-প্রদীপ, সর্ব্বকর্ম্মে উপায় ও সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয় তর্কবিদ্যা। তাই ইহার নাম 'আন্বীক্ষিকী' বিদ্যা। 'অর্থশাস্ত্র'গ্রন্থে কৌটিল্যও ইহারই প্রশংসা করিতে বলিয়াছেন, "প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং। আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং।" অতএব ন্যায়দর্শনে যে তর্কবিদ্যার সুপ্রকাশ হইয়াছে, তাহা কাহারই পরিহার্য্য নহে। রাজধর্ম্মাধিকরণে বিবাদ বিষয়ে বাদী ও প্রতিবাদীর পক্ষসমর্থন এবং বিচারকের সত্যনির্দ্ধারণেও তর্কবিদ্যা অপরিহার্য্য অবলম্বন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের 'ব্যবহারতত্ত্ব' গ্রন্থ পাঠ করিলে ইহা সম্যক্ বুঝা যাইবে। অতএব সর্ব্বত্রই এই তর্কবিদ্যার সম্যক্ অনুশীলন দ্বারা ইহার রক্ষা অবশ্যকর্ত্তব্য।

বিদ্যারক্ষার উপায় ও আধুনিক অন্তরায়

এখানে এই মহাসত্যও বলা আবশ্যক যে, প্রকৃত অধিকারী বিদ্যার্থী বিদ্যাগুরুর নিকটে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যথাবিধি অধ্যয়ন করিলে এবং গুরুমুখে গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত অবশ্য জ্ঞাতব্য নানা উপদেশ শ্রবণ করিলেই অতি দুরূহ সংস্কৃত দর্শনাদি শাস্ত্রে প্রকৃত ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারেন। নচেৎ তাহা সম্ভব নহে। তাই পূর্ব্বকালে এ দেশে অধিকারী বিদ্যার্থিগণ বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া, অতি দূরদেশে যাইয়াও বিদ্যাগুরুর উপসন্ন হইতেন এবং তাঁহার 'অন্তেবাসী' হইয়া বিদ্যা লাভ করিয়া, পরে তাঁহাদিগের শিষ্যগণকে সেই বিদ্যা দান করিতেন। তাহার ফলেই প্রাচীন কাল হইতে এ দেশে নানা বিদ্যার সম্প্রদায় রক্ষা হইয়াছে। কিন্তু 'তে হি নো দিবসা গতাঃ।' এখন নানা কারণে বঙ্গদেশে প্রকৃত বিদ্যার্থীও সুদুর্লভ। শাস্ত্র সাধনার সেই চিরন্তন পদ্ধতিও বিলুপ্তপ্রায়। তবে কিরূপে এ দেশে শাস্ত্রবিদ্যার রক্ষা হইবে? শ্রুতি বলিয়াছেন,—"বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম।"* বিদ্যা দেবী কোন অধ্যাপক ব্রাহ্মণের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! আমি তোমার রত্ন, তুমি আমাকে রক্ষা কর। কিন্তু এখন যে, নানা কারণে এ দেশে প্রায় সর্ব্বত্র ন্যায়াদি শাস্ত্রবিদ্যার রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণও শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন না। বিদ্যারক্ষক ব্রাহ্মণগণের রক্ষকগণও অনেক দিন পূর্ব্বে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। তবে আর কি উপায়ে এখন এ দেশে আমাদিগের সর্ব্বোচ্চ গৌরব ন্যায়াদি বিদ্যারত্নরাজির রক্ষা হইবে? বহু পুস্তকালয়ে বহু সংস্কৃত পুস্তক সুসজ্জিত করিয়া রাখিলেই ত তাহার রক্ষা হয় না।

অবশ্য কিছু দিন হইতে এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে অনুরাগবশতঃ তাহার চর্চ্চা করিতেছেন

---

* 'বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় মে শেবধিষ্টেঽহমস্মি। অসূয়কায়ানৃজবেঽযতায় ন মা ব্রূয়া বীর্য্যবতী তথা স্যাং॥' (নিরুক্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উদ্ধৃত শ্রুতি)। সামবেদের 'সংহিতোপনিষদ্ ব্রাহ্মণ' (ছন্দোগ ব্রাহ্মণ) দ্রষ্টব্য। H. G. Burnell, Mangalor, 1877. পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি অনুসারে মনুও বলিয়াছেন,—'বিদ্যা ব্রাহ্মণমেত্যাহ শেবধিষ্টেঽস্মি রক্ষ মাং। অসূয়কায় মাং মাদাস্তথা স্যাং বীর্য্যবত্তমা।' (মনুসংহিতা—২।১১৪)। কিন্তু উত্তরবঙ্গীয় টীকাকার কুল্লুক ভট্ট উক্ত মনুবচনের মূলশ্রুতির উল্লেখ করিতে পরে বলিয়াছেন,—'তথাচ ছন্দোগব্রাহ্মণং, 'বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম, তবাহমস্মি, ত্বং মাং পালয়, অনর্হতে মানিনে নৈব মাদা গোপায় মাং শ্রেয়সী তথাহমস্মি।"

এবং অনেক ধীমান্ ব্যক্তি ন্যায়াদি দর্শনের মূল সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠেও বিশেষ অনুরাগী হইয়া অনেক গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। কিন্তু এখন নানা কারণে অনেকের পক্ষেই অধ্যাপক গুরুর লাভ ও তাঁহার অন্তেবাসী হইয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করা সম্ভব হয় না। অতএব কি উপায়ে এখন তাঁহাদিগের ন্যায়াদি শাস্ত্রের প্রকৃত সিদ্ধান্ত বোধ এবং নানা গ্রন্থের বহু সূক্ষ্ম বিচার বোধ সম্ভব হইতে পারে, ইহা সকলেরই চিন্তা করা আবশ্যক এবং অধ্যাপক গুরুর লক্ষণ কি, তিনি কিরূপে শিষ্যদিগকে দুরূহ শাস্ত্রার্থ বুঝাইবেন, ইহাও জানা আবশ্যক।

অধ্যাপক গুরুর লক্ষণ এবং দেশভাষায় অধ্যাপনার প্রমাণ

প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গমাতার নব বিদ্যাপীঠ নবদ্বীপে অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ত্বপ্রণেতা বন্দ্যঘটীয় স্মার্ত্তশিরোমণি **রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য** তৎকৃত "ব্যবহারতত্ত্বে" "ভাষাপাদে"র ব্যাখ্যা করিতে রাজধর্ম্মাধিকরণে বিবাদ বিষয়ে কিরূপ **ভাষা** বক্তব্য ও লেখ্য, ইহা ব্যক্ত করিতে পরে বলিয়াছেন,—

"এতচ্চ সংস্কৃত-দেশভাষান্যতরেণ যথাবোধং বক্তব্যং লেখ্যং বা, মূর্খাণামপি বাদিপ্রতিবাদিতাদর্শনাৎ। অতএব অধ্যাপনেঽপি, তথোক্তং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

"সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈর্ব্বাক্যৈর্যঃ শিষ্যমনুরূপতঃ।
দেশভাষাদ্যুপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ স গুরুঃ স্মৃতঃ॥"*

এখানে বুঝা আবশ্যক যে, এখন যাহাকে **মাতৃভাষা** বলা হইতেছে, তাহাই বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত বচনে **দেশভাষা** শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে।† বিদ্যার্থীর

* স্মার্ত্ত রঘুনন্দন 'জ্যোতিস্তত্ত্বে' বিদ্যারম্ভ প্রকরণে উক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"আদিগ্র্রন্থকরণাদিঃ"। অর্থাৎ উক্ত বচনে 'দেশভাষা' শব্দের পরে প্রযুক্ত 'আদি' শব্দের দ্বারা গ্রন্থ রচনাদি বুঝিতে হইবে। রঘুনন্দন পরে ইহা সমর্থন করিতে লিখিয়াছেন,—"অধীতস্য অর্থিভ্যো দানমাবশ্যকং।" তথাচ শ্রুতিঃ, "যোঽধীত্যার্থিভ্যো বিদ্যাং ন প্রযচ্ছেৎ, স কার্য্যহা স্যাৎ, শ্রেয়সো দ্বারমাবৃণুয়া"দিতি। তদ্দানঞ্চ অধ্যাপনেন ব্যাখ্যয়া বিলিখ্য অর্পণেন চ সম্ভবতীত্যতো ধীমদ্ভির্নিবন্ধঃ ক্রিয়তে।" ইত্যাদি।

† আরও অনেক শাস্ত্রবচনে 'দেশভাষা' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশজ ভাষাই উক্ত 'দেশভাষা' শব্দের অর্থ। বঙ্গদেশে বঙ্গভাষাই 'দেশভাষা'। তাই বঙ্গকবি উহাকে 'দেশী ভাষা' ও 'স্বদেশী ভাষা' বলিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ছুটিখাঁর মহাভারত রচনা করিতে শ্রীকর নন্দী লিখিয়াছেন,—"দেশী ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার।" পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বঙ্গের ত্রিবেণীর নিধুবাবু তাঁহার প্রসিদ্ধ কোন সংগীতে বলিয়াছেন,—"নানান্ দেশের নানান্ ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা, পূরে কী আশা।" প্রাচীন কালে পূর্ব্বোক্ত দেশভাষা অর্থে কেবল 'ভাষা' শব্দেরও প্রয়োগ হওয়ায় পণ্ডিতগণ দেশভাষা-রচিত গ্রন্থকে 'ভাষাগ্রন্থ' বলিতেন। বেদান্তের "সিদ্ধান্তলেশ" গ্রন্থে অপ্পয় দীক্ষিতও উহাকে বলিয়াছেন,—'ভাষাপ্রবন্ধ'।

বাল্যকাল হইতেই অধিগত স্বদেশভাষা বা মাতৃভাষাই দেশভাষা। গুরু সেই দেশভাষার দ্বারাও বিদ্যার্থীকে বুঝাইবেন, ইহা উক্ত পুরাণবচনে উপদিষ্ট হওয়ায় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন পরে বলিয়াছেন,—"অতএব অধ্যাপনেঽপি।" অর্থাৎ অধ্যাপনা কার্য্যেও স্বদেশভাষার দ্বারা শাস্ত্রার্থ বক্তব্য। রঘুনন্দনের এই কথার দ্বারা ইহাও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তৎকালপ্রচলিত বাঙ্গালা গদ্যভাষার দ্বারা অধ্যাপনা করিতেন। বস্তুতঃ অনেক বিষয়ে অনেক বিদ্যার্থীর পক্ষেই সংস্কৃত ভাষার দ্বারা অধ্যাপনা সফল হয় না। আর অজ্ঞাত অন্যদেশীয় ভাষার প্রয়োগ একেবারেই ব্যর্থ হয়। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিথিলার মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যও 'ন্যায়পরিশিষ্ট' গ্রন্থে (৯৭ পৃঃ) বলিয়াছেন,—"দাক্ষিণাত্যস্য স্বদেশভাষয়া প্রত্যবতিষ্ঠমানস্য কিং বক্তব্যং পাশ্চাত্যৈরিত্যজ্ঞানমেবোত্তরবাদিনঃ সর্ব্বত্রেতি।" অতএব পূর্ব্বকালেও যে, সর্ব্বদেশেই অধ্যাপক গুরুগণ অনেক বিদ্যার্থীকে স্বদেশভাষার দ্বারাই অধ্যাপনা করিতেন, ইহা নিশ্চিত।

দেশভাষায় পুরাণব্যাখ্যার প্রমাণ

পরন্তু পূর্ব্বকালেও সর্ব্বদেশে পুরাণব্যাখ্যাতা ব্রাহ্মণগণ "শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্" এই শাস্ত্রবিধি অনুসারে চতুর্ব্বর্ণের নিকটে স্বদেশভাষার দ্বারাই ইতিহাস ও পুরাণের ব্যাখ্যা করিতেন। শারীরক ভাষ্যে (১।৩।৩৮) ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও বলিয়া গিয়াছেন,—"শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্ ইতি চ ইতিহাসপুরাণাধিগমে চাতুর্ব্বর্ণ্যস্যাধিকারস্মরণাৎ।" অবশ্য যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত পুবাণশ্রবণের বিধি অনুসারে শাস্ত্রোক্ত সেই বিশিষ্ট ফললাভের জন্য সংকল্পপূর্ব্বক পুরাণ শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা মূল সংস্কৃত পুরাণই শ্রবণ করিবেন। নচেৎ সেই বিশিষ্ট ফললাভ হইবে না। তাই ঐ তাৎপর্য্যেই পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে কথিত হইয়াছে,—"ন দেশভাষারচিতং গ্রন্থং শ্রুত্বা ফলং লভেৎ।" কিন্তু পুরাণপাঠক চতুর্ব্বর্ণের নিকটে পুরাণের যে ব্যাখ্যা করিবেন, তাহা ত দেশভেদে বিভিন্ন দেশভাষার দ্বারাই তাঁহার কর্ত্তব্য। নচেৎ সকলেই সেই পুরাণার্থ কিরূপে বুঝিবেন? তাই পদ্মপুরাণে উক্ত বচনের পরার্দ্ধে কথিত হইয়াছে,—"ব্যাখ্যা যা কাপি কাকুৎস্থ! পুরাণস্য হিতা হি সা।" আর উক্ত বচনের অব্যবহিত পূর্ব্বে স্পষ্টই কথিত হইয়াছে,—"পুরাণস্থং পঠেদ্ গ্রন্থং ব্যাখ্যায়াচ্চ বিচারয়ন্। যয়া কয়াপি বা রাম! ভাষয়া দেশভেদতঃ॥" অর্থাৎ শিবরাঘব-সংবাদে

শিব রামকে বলিয়াছেন যে, পৌরাণিক, দেশভেদে যে কোনও ভাষার দ্বারা বিচার করতঃ পঠিত পুরাণ গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিবেন। তাহা হইলে পূর্ব্বকালে বঙ্গের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ যে, বঙ্গভাষায় রামায়ণ ও পুরাণ শ্রবণ করিতেন না, তাঁহারা উহা রৌরবনরক-জনক বলিয়া বঙ্গভাষার প্রতি অত্যন্ত ঘৃণাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ইহা কখনই সত্য হইতে পারে না।*

দেশভাষায় গ্রন্থরচনাও অকর্ত্তব্য নহে

মনে রাখিতে হইবে,—**দেশভাষাদ্যুপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ স গুরুঃ স্মৃতঃ॥** এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, উক্ত পুরাণবচনে 'দেশভাষা' শব্দের পরে প্রযুক্ত 'আদি' শব্দের দ্বারা স্মার্ত্ত রঘুনন্দন প্রথমে গ্রন্থ-রচনা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সেই গ্রন্থ রচনা যে, দেশভাষার দ্বারা অকর্ত্তব্য, ইহা তিনিও বলেন নাই। বস্তুতঃ তিনি যে উদ্দেশ্যে দেশভাষার দ্বারা অধ্যাপনার কর্ত্তব্যতা সমর্থন করিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্যে কেহ দেশভাষায় গ্রন্থ রচনা করিলে তাহা তিনি অকর্ত্তব্য বলিতে পারেন না। আর সে বিষয়ে কোন নিষেধবচনও নাই। পরন্তু উক্ত পুরাণবচনে 'দেশভাষা' শব্দের পরেই 'আদি' শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় তদ্দ্বারা দেশভাষায় গ্রন্থ রচনাও বুঝা যায়। অতএব বুঝা যায় যে, স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মতেও প্রয়োজন হইলে এদেশে বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনাও কর্ত্তব্য।†

* ব্রাহ্মণদিগকে তিরস্কার করিবার জন্য আধুনিক অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিকও এইরূপ একটি অমূলক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥" কিন্তু উহা কোন্ গ্রন্থের বচন, ইহা আমরা জানি না। পদ্মপুরাণে ঐরূপ বচন নাই। পরন্তু পদ্মপুরাণে দেশভাষার দ্বারাই পুরাণ ব্যাখ্যার বিধি আছে। তদনুসারেই প্রাচীন শাস্ত্রব্যবস্থা ও ব্যবহার বুঝিতে হইবে। পদ্মপুরাণ—পাতাল খণ্ড, ১০৩ম অধ্যায় (বঙ্গবাসী সং—৬৭৯ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

† বস্তুতঃ পূর্ব্বকালে বঙ্গের ব্রহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলী যে, বঙ্গভাষায় যে কোন গ্রন্থ রচনাকে দুষ্কার্য্য বলিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতির পরিপন্থী শত্রু ছিলেন, ইহা নিষ্প্রমাণ। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের পূর্ব্বেই ফুলিয়ার রাঢ়ীয় মহাকুলীন ব্রাহ্মণ কৃত্তিবাস পণ্ডিত বঙ্গভাষায় অপূর্ব্ব রামায়ণ রচনা করিয়া বঙ্গের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজেও অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ (সমস্ত কবিরই অসাধারণ গুণগ্রাহী ও অকপটভাবে সর্ব্বত্র যশোগায়ক হইলেও) কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে 'সর্ব্বনেশে' বলিয়া তিরস্কার করিতেন এবং 'কাশীদাসকে শাপ দিয়াছিলেন', ইত্যাদি মন্তব্য সত্য হইতে পারে না। কোন নিষ্প্রমাণ প্রবাদমাত্র বা ব্যক্তিবিশেষের উক্তিমাত্র গ্রহণ করিয়া সাগ্রহে ঐরূপ নিন্দা প্রচার সত্যনির্দ্ধারক ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য নহে।

ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণেরও বঙ্গভাষায় নানা গ্রন্থরচনা ও তাহার কারণ

প্রকৃত কথা এই যে, প্রাচীন কালে এদেশে ন্যায়াদি শাস্ত্রের বঙ্গভাষায় অনুবাদ বা ব্যাখ্যা-পুস্তকের কোন প্রয়োজন ছিল না। পরন্তু তৎকালে ঐরূপ গ্রন্থরচনার কেহ প্রবর্ত্তকও ছিলেন না। তৎকালে লেখ্য বাঙ্গলা গদ্য ভাষার দ্বারা দুরূহ শাস্ত্রার্থ ব্যক্তও হইত না। আর ঐরূপ দুর্ব্বোধ ভাষাগ্রন্থের প্রচারও তখন সম্ভব হইত না। পরে এদেশে মুদ্রাযন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে বহু প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও বহুভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" পুস্তকের সাহিত্য বিভাগে দৃষ্টিপাত করিলে সে বিষয়ে অনেক সংবাদ জানা যাইবে।

আরও জানা আবশ্যক যে, কলিকাতায় প্রথমে 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হইলে ইং ১৮০১ সালে পাদরী উইলিয়ম **কেরী** সাহেব ঐ কলেজের বাঙ্গলা বিভাগের অধ্যক্ষ হইয়া নানা শাস্ত্রাধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কেই প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করেন এবং তিনি আরও অনেক পণ্ডিতকে সহকারিরূপে নিযুক্ত করিয়া এদেশে বঙ্গ-সাহিত্যের নবীন অভ্যুদয়ে অগ্রণী হন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারই এদেশে অভিনব বাঙ্গলা গদ্যের প্রথম স্রষ্টা। তাঁহার জন্মস্থান মেদিনীপুর। কলিকাতায় তাঁহার চতুষ্পাঠী ছিল। তিনি ইং ১৮০২ সালে বাঙ্গলা গদ্যে **'বত্রিশ সিংহাসন'** এবং পরে (১৮০৮) **'হিতোপদেশ'** ও **'রাজাবলি'** পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৮১৭ সালে তাঁহার **বেদান্ত-চন্দ্রিকা** প্রকাশিত হয়। অনেক দিন পরে কলিকাতায় (রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস্ হইতে) 'মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী' সাদরে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা পাঠ করিলেই মৃত্যুঞ্জয়ের অমরত্ব ও তাঁহার জীবনের অন্যান্য বার্ত্তা জানা যাইবে। আর তাঁহার **'বেদান্ত-চন্দ্রিকা'** পাঠ করিলে তৎকালে এদেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রীয় বিষয়ে কিরূপ বাঙ্গলা গদ্য লিখিতেন এবং তৎকালে অদ্বৈত বেদান্তেও উক্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের কিরূপ বিদ্যা ছিল, ইহাও বুঝা যাইবে।

শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে নব্য ন্যায় গ্রন্থেরও বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যা হইয়াছে। **কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন** মহাশয় নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথকৃত সুপ্রসিদ্ধ **ভাষা-পরিচ্ছেদ** গ্রন্থের বাঙ্গলা গদ্যে বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া ইং ১৮২১ সালে ঐ গ্রন্থ

প্রকাশ করেন।* তিনি ঐ পুস্তক মুদ্রণের সাহায্যের জন্য ফোর্ট্ উইলিয়ম কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে যে প্রার্থনাপত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার ঐ গ্রন্থের পরিচয় এবং রচনার কারণও বুঝা যায়। আবশ্যকবোধে নিম্নে সেই প্রার্থনা-পত্রখানি যথাযথ উদ্ধৃত হইল।† কিন্তু কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের অনেক পূর্ব্বেও যে, অজ্ঞাতনামা কোন পণ্ডিত বঙ্গভাষায় 'ভাষা-পরিচ্ছেদে'র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, ইহাও জানিতে পারিয়াছি। ঐ অমুদ্রিত পুথির লিপিকাল ১১৮১ বঙ্গাব্দ। ঐ পুস্তকের প্রথমে লিখিত হইয়াছে :—

'গোতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন আমারদিগের মুক্তি কি

---

* উক্ত কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের বঙ্গভাষায় অন্যান্য গ্রন্থের সংবাদ ও তাঁহার আবেদনপত্রের প্রতিলিপি আমি বহুদর্শী গবেষক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ মহাশয়ের সুলিখিত প্রবন্ধে পাইয়াছি, ইহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার্য্য। (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ১৩৪৫ চতুর্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, ব্রজেন্দ্রবাবুর লিখিত যে কাশীনাথ ১৮০১ সালে কেরী সাহেব কর্ত্তৃক সহকারী পণ্ডিত নিযুক্ত হন, তিনি 'ভাষাপরিচ্ছেদে'র ব্যাখ্যাকার নহেন। ভাষাপরিচ্ছেদ-ব্যাখ্যাকার 'আড়িয়াদহ' নিবাসি শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, ইহা সেই পুস্তকের পরিচয়পত্রেই লিখিত আছে। আর তাহাতে পরে 'গ্রন্থ নাম পদার্থকৌমুদী' ইহা লিখিত হইলেও প্রথম 'ন্যায়দর্শন' এই নামই লিখিত হইয়াছে এবং তখন উহা ঐ নামেই কথিত ও বিজ্ঞাপিত হয়। "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে ৪৭১-৭২ পৃষ্ঠায় উক্ত পুস্তকের বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য। কিন্তু ঐ পুস্তকের প্রথমে পৃথক্ভাবে ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্রটি ও তাহার পদ্যানুবাদমাত্র মুদ্রিত হইলেও মূল পুস্তক ন্যায়দর্শন নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পুস্তকালয়ে ঐ পুস্তক দ্রষ্টব্য।

† মহামহিম শ্রীযুত কালেজ কৌন্সলের সাহেবান্ বরাবরেষু—

কালেজের পণ্ডিত শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের নিবেদনমিদং আমি ন্যায়দর্শনের ভাষা-পরিচ্ছেদ পুস্তকের গৌড় দেশীয় সাধুভাষাতে সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী প্রভৃতি টীকার অনুসারে স্পষ্টরূপে অর্থ প্রকাশ করিতেছি যে শাস্ত্রের অতি কাঠিন্য প্রযুক্ত অর্থ প্রকাশ করণে অদ্যাপি কোন পণ্ডিত প্রবৃত্ত হয়েন নাই—মেস্তর পিয়র্স সাহেবের মুদ্রাগৃহে এই পুস্তকের মূল সহিত মুদ্রাকরণে পঞ্চ শত মুদ্রা ব্যয় হইবেক পুস্তকের মূল্যে শ্রীযুতেরদিগের বিবেচনায় নির্ভর করিয়া দৃষ্টি করিবার নিমিত্তে পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ সমর্পণ করিতেছি এইরূপ বিংশতিভাগ হইবেক তাহাতে শ্রীযুতেরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক একশত পুস্তক গ্রহণ করিলে পুস্তক মুদ্রিত হইতে পারে ও আমার পরিশ্রম সফল হয় এবং কালেজের পাঠার্থি সাহেবদিগের অনায়াসে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে বিদ্যা ও বাঙ্গলা ভাষাতে নৈপুণ্য হইতে পারে অতএব নিবেদন যে অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই প্রতিপাল্য ব্যক্তির প্রতি সফলা আজ্ঞা হয় ইতি সন ১৮২০ সাল তারিখ ৭ দিসম্বর। শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণঃ

প্রকারে হয় তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গোতম উত্তর করিতেছেন তাবৎ পদার্থ জানিলেই মুক্তি হয়। তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন পদার্থ কতো। তাহাতে গোতম কহিতেছেন পদার্থ সাত প্রকার। দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায় অভাব। তাহার মধ্যে দ্রব্য নয় প্রকার।' ইত্যাদি।

উদ্ধৃত গদ্য পাঠে তৎকালে এদেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কিরূপ সরলভাবে এবং কিরূপ ভাষায় অধ্যাপনা করিতেন, তাহারও আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাও বুঝা যায় যে, উক্ত ব্যাখ্যাকার ন্যায়দর্শন দেখেন নাই। মহর্ষি গোতম ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্রে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত মুক্তি লাভ হয়, ইহাই বলিয়া, পরে সেই ষোড়শ পদার্থের নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু নবদ্বীপের কাশীনাথ বিদ্যানিবাসের পুত্র নব নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন দ্রব্য গুণ প্রভৃতি সপ্ত পদার্থ গ্রহণ করিয়া 'ভাষাপরিচ্ছেদ' নামে ন্যায়শাস্ত্রের সংগ্রহগ্রন্থ ও তাহার 'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী' নামে সরল টীকা করিয়াছেন। তিনি পরে বৃন্দাবনে "রসবাণতিথৌ শকেন্দ্রকালে" অর্থাৎ ১৫৫৬ শকাব্দে (১৬৩৪ খৃঃ) মহর্ষি গোতম-প্রণীত ন্যায়সূত্রেরও বৃত্তি রচনা করেন। তিনি তাহাতে ন্যায়দর্শনের ভাষ্য বার্ত্তিকাদি প্রাচীন গ্রন্থেরও অনেক কথা লিখিয়াছেন এবং তাহার কোন কোন কথার সমালোচনা করিয়া নিজে নূতন ব্যাখ্যাদিও করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে এবং পরে বহু দেশে বহু নৈয়ায়িক ন্যায়সূত্রের স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যাদি করিলেও বিশ্বনাথের ন্যায়সূত্রবৃত্তিই নিজ গৌরবে সর্ব্বদেশে প্রচলিত হইয়াছে।

প্রাচীন ন্যায়গ্রন্থের পঠন-পাঠনার বিলোপ ও তাহার কারণ

পরে কালবশে ক্রমশঃ অধ্যেতা ও অধ্যাপকগণের শক্তির হ্রাস এবং রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতির নব্য ন্যায়গ্রন্থের বহুল চর্চ্চা ও প্রবল প্রভাবে ক্রমে ন্যায়ভাষ্যাদি প্রাচীন ন্যায়গ্রন্থের পঠনপাঠনা বিলুপ্ত হয়। খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে শান্তিপুরের মহানৈয়ায়িক ও স্মার্ত্তপ্রবর রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য বিশ্বনাথের ন্যায়সূত্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই 'ন্যায়সূত্রবিবরণ' রচনা করেন। কিন্তু তিনিও ন্যায়ভাষ্যাদি প্রাচীন ন্যায়গ্রন্থের অধ্যয়ন করেন নাই, ইহা কাশীধামে মুদ্রিত তাঁহার সেই গ্রন্থ পাঠ করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। পরন্তু তিনি ন্যায়দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের সর্ব্বশেষে "তত্ত্বন্তু বাদরায়ণাৎ" এইরূপ একটি

সূত্র উদ্ধৃত করিয়া তাহারও নানারূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার হইতে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পর্য্যন্ত আর কোন ব্যাখ্যাকারই উক্তরূপ সূত্রের উল্লেখ করেন নাই। বস্তুতঃ মহর্ষি গোতম ন্যায়দর্শনে "তত্রস্তু বাদরায়ণাৎ" এইরূপ সূত্র বলিতেই পারেন না। গোস্বামী ভট্টাচার্য্য উক্তরূপ সূত্র কোথায় পাইলেন, ইহাও তিনি বলেন নাই। তৎকালে ৺নবদ্বীপের অতিপ্রখ্যাত সর্ব্বমান্য নৈয়ায়িক শঙ্কর তর্কবাগীশ এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি প্রভৃতিও বিশ্বনাথের ন্যায়সূত্রবৃত্তিই পাঠ করিয়াছেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতির পরলোক গমন হইলে তৎকালে নবদ্বীপেও ঐরূপ বহুবিজ্ঞ নৈয়ায়িকের অভাব হয়।* কিন্তু তৎকালে পূর্ব্ববঙ্গে চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন উদীয়মান অসাধারণ নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি ৺কাশীধামে যাইয়া প্রাচীন ন্যায়গ্রন্থেরও অনেক অনুসন্ধান করেন। কিন্তু অনেক পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বত্র ন্যায়ভাষ্যাদি প্রাচীন গ্রন্থের বিশুদ্ধ পুথির অভাব হয়। পরে ১৮৪০ খৃঃ আগষ্ট মাসে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ন্যায়-শাস্ত্রাধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া নানাশাস্ত্রবিজ্ঞ প্রখ্যাত পণ্ডিত ৺জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির নিয়োগানুসারে "রসাষ্টাচলভূমানে শকাব্দে সৌরচৈত্রকে" অর্থাৎ ১৭৮৬ শকাব্দে (১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে) সভাষ্য ন্যায়দর্শন সম্পাদন করেন। উহাই প্রথম মুদ্রিত সভাষ্য ন্যায়দর্শন। কিন্তু তখন বহুদর্শী তর্কপঞ্চানন মহাশয়ও ন্যায়ভাষ্যের অবিকৃত বিশুদ্ধ পুথি না পাওয়ায় বহু স্থলেই প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। ঐ পুস্তকের প্রারম্ভে তিনিও লিখিয়া গিয়াছেন,—"ন্যায়ভাষ্যমিদং পূর্ব্বং বিরলং লুপ্তবৎ স্থিতং। মুদ্রণা-শোধনেঽস্যেয়ং সা সভা মাং ন্যযোজয়ৎ॥"

বস্তুতঃ ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের পরে দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ

* শঙ্কর তর্কবাগীশ ও শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতির কথা "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" পুস্তকের প্রথম খণ্ডে দ্রষ্টব্য। ৺চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন ফরিদপুর জেলার ধামুকা গ্রামনিবাসী কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কাশীধামে যাইয়া নৈয়ায়িক পণ্ডিতসভায় নিজের অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন এবং অনেক রাজার নিকটেও প্রভূত সম্মান লাভ করেন। তিনি পরে বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া কাশীর সংস্কৃতকলেজে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক-পদ গ্রহণ করেন। বাঙ্গালী চন্দ্রনারায়ণই কাশী কলেজের প্রথম ন্যায়াধ্যাপক। তিনি অনেক গ্রন্থের টিপ্পনী ও ক্রোড়পত্রাদি রচনা করেন। অনেক সাহেবের লিখিত ক্যাটালগেও ন্যায়গ্রন্থ-বিভাগে চন্দ্রনারায়ণের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এ দেশে এখন তাঁহার অনেক গ্রন্থ দেখা যায় না।

ন্যায়সূত্র ও ন্যায়ভাষ্যের বহু প্রতিবাদ করিলে তাঁহাদিগের অতিপ্রবল প্রতিবাদী ভারদ্বাজ উদ্দ্যোতকর গৌতম ন্যায়মতের প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যায়ভাষ্যের যে 'বার্ত্তিক' রচনা করেন, সেই **ন্যায়বার্ত্তিক** এবং তাহার অনেক পরে (নবম শতাব্দীতে) বাচস্পতি মিশ্র সেই অতিপ্রাচীন বার্ত্তিক নিবন্ধের উদ্ধারের জন্য তাহার যে টীকা করেন, সেই **ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা** এবং পরে (দশম শতাব্দীতে) মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য সেই টীকার যে টীকা করেন, সেই **ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি** বা **ন্যায়নিবন্ধ** এবং তাহার বর্দ্ধমান উপাধ্যায়কৃত **প্রকাশ** টীকা প্রভৃতি অনেক গ্রন্থের বিশেষ চর্চ্চা ব্যতীত বাৎস্যায়নের ন্যায়ভাষ্যের প্রকৃত পাঠ নির্ণয় ও পঠন-পাঠনা সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু কালবশে সম্প্রদায়লোপে ন্যায়বর্ত্তিকাদি ঐ সমস্ত গ্রন্থও দুর্লভ হওয়ায় উক্ত কারণেও ন্যায়ভাষ্যের পঠন-পাঠনা বিলুপ্ত হয়। আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ পরে নবদ্বীপস্থ বহু ন্যায়গ্রন্থও কোন্ সময়ে কোন্ দ্বীপে অন্তর্হিত হইয়াছে, ইহাও আমরা জানি না। পরে ক্রমে নানা স্থানে অনেকের বহু অনুসন্ধানের ফলে **ন্যায়বার্ত্তিক** প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইলেও বিশুদ্ধ আদর্শের অভাবে এবং সংশোধকের অনবধানতাবশতঃ বহু স্থলে প্রকৃত পাঠ মুদ্রিত হয় নাই। পরে কলিকাতা এসিয়াটিক্ সোসাইটী হইতে বর্দ্ধমানকৃত 'প্রকাশ' টীকা সহিত 'তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি'র মুদ্রণারম্ভ হইলেও কিয়দংশ মাত্রই প্রকাশিত হইয়াছে। 'তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি'র প্রকাশ টীকার টীকা পদ্মনাভ মিশ্রকৃত **'বর্দ্ধমানেন্দু'** এবং তাহার টীকা শঙ্কর মিশ্রকৃত **ন্যায়তাৎপর্য্যমণ্ডন** এখনও অনেকের অজ্ঞাত। পূর্ব্বোক্ত ন্যায়বার্ত্তিকাদি গ্রন্থ এবং অনেক বৌদ্ধগ্রন্থের সাহায্য ব্যতীত অনেক স্থলে বাৎস্যায়নের ন্যায়ভাষ্যের প্রকৃত পাঠ নির্ণয় এবং অতি গূঢ় তাৎপর্য্যবোধ সম্ভব হইতে পারে না। তাই এই গ্রন্থের টিপ্পনীতে যথাসম্ভব ও যথামতি ন্যায়বার্ত্তিকাদি অনেক গ্রন্থের কথাও লিখিত হইয়াছে এবং সে জন্যও গ্রন্থবিস্তর হইয়াছে। পরন্তু বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর যে সমস্ত স্থলে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা ও মতের প্রতিবাদ করিয়া অন্যরূপ ব্যাখ্যা ও মতের সমর্থন করিয়াছেন, সেই সমস্ত স্থলে ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য কি, তাহাও যথামতি বিচারপূর্ব্বক লিখিত হইয়াছে। ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককারের সম্প্রদায়ভেদ ব্যক্ত করাও সেই আলোচনার উদ্দেশ্য।

ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার সম্বন্ধে নানামতে বক্তব্য

প্রাচীন বাৎস্যায়ন ঋষিই ন্যায়ভাষ্যকার, এই মতের কোন প্রমাণ নাই। 'ন্যায়বার্ত্তিকে'র শেষে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন,—'যদক্ষপাদপ্রতিভো ভাষ্যং বাৎস্যায়নো জগৌ। অকারি মহতস্তস্য ভারদ্বাজেন বার্ত্তিকং॥' এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, প্রাচীন নৈয়ায়িক ভারদ্বাজ উদ্দ্যোতকর ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়নকে 'অক্ষপাদ-প্রতিভ' বলিয়া এবং তাঁহার রচিত ভাষ্যকে মহাভাষ্য বলিয়া তাঁহার প্রতি অসামান্য সম্মান প্রদর্শন করিলেও তিনিও তাঁহাকে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির ন্যায় ঋষি বা মুনি বলেন নাই। সুতরাং তাঁহার সময়েও ঐরূপ কোন প্রসিদ্ধিও ছিল না। পরন্তু উদ্দ্যোতকর অনেক স্থলে বাৎস্যায়নের ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়া স্বাধীনভাবে অন্যরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। তিনিও বাৎস্যায়নের মতকে ঋষিমত বলিয়া জানিতেন না। কিন্তু তিনি বাৎস্যায়নের আর কোন পরিচয়ও বলেন নাই। 'তাৎপর্য্যটীকা'র প্রারম্ভে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন,—"ভগবতা পক্ষিলস্বামিনা।" বাচস্পতি মিশ্রের ঐ কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, ভগবান্ পক্ষিল স্বামীই ন্যায়ভাষ্যকার, ইহাই তৎকালে প্রসিদ্ধ ছিল। অনেক গ্রন্থকার ন্যায়ভাষ্যকারকে 'পক্ষিল' নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। ফলকথা, বাচস্পতি মিশ্রের মতেও ন্যায়ভাষ্যকার পক্ষিল স্বামী ঋষিকল্প হইলেও ঋষি নহেন। জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্র সূরি 'অভিধানচিন্তামণি' গ্রন্থে সুপ্রসিদ্ধ বিষ্ণুগুপ্ত বা চাণক্য পণ্ডিতেরই অপর নাম বলিয়াছেন—'পক্ষিল স্বামী'। আরও কোন কোন কারণে অনেক প্রাচীন পণ্ডিত বলিতেন যে, অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্যই ন্যায়ভাষ্যকার। তাঁহার বাৎস্য গোত্র নিমিত্তক নাম বাৎস্যায়ন।

অবশ্য বাৎস্যায়নের কামসূত্রের টীকায় যশোধরও লিখিয়াছেন,—"বাৎস্যায়ন ইতি গোত্রনিমিত্তা সংজ্ঞা। মল্লনাগ ইতি সাংস্কারিকী।" কিন্তু অর্থশাস্ত্র, ন্যায়ভাষ্য ও কামসূত্রের ভাষাগত বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা আবশ্যক। অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য বা কৌটল্য এবং তাঁহার গোত্র বিষয়েও মতভেদ আছে। কামসূত্রকার বাৎস্যায়ন গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন এবং তিনি আন্বীক্ষিকী বিদ্যার বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে কৌটিল্য 'বিদ্যাসমুদ্দেশ' প্রকরণে সাংখ্য শাস্ত্রকেও আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বলিয়াছেন। কিন্তু ন্যায়দর্শনের প্রথমসূত্র-ভাষ্যে বাৎস্যায়ন 'আন্বীক্ষিকী' শব্দের ব্যুৎপত্তির ব্যাখ্যার দ্বারা কেবল

ন্যায়শাস্ত্রকেই 'আন্বীক্ষিকী' বিদ্যা বলিয়াছেন। (পরে ২৯শ ও ৬০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং অর্থশাস্ত্র ও ন্যায়ভাষ্যে 'আন্বীক্ষিকী' বিদ্যা সম্বন্ধেই উক্তরূপ মতভেদ থাকায় অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্যই যে, ন্যায়ভাষ্যকার—ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকগণও উক্ত মত গ্রহণ করেন নাই। পরন্তু তাঁহাদিগের মতে ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। কিন্তু আমার ধারণা এই যে, বাৎস্যায়ন শূন্যবাদী বৌদ্ধ নাগার্জ্জুনেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। এই সমস্ত বিষয়ে আমি প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় আলোচনা করিয়াছি।

প্রাচীন কালে অনেকে নিজ বংশের গৌরব-খ্যাপনের জন্য নিজের গোত্রনিমিত্তক নামের উল্লেখ করিতেন। ন্যায়ভাষ্যকার তাহাই করিয়াছেন এবং তদনুসারে উদ্দ্যোতকরও বার্ত্তিকশেষে বলিয়াছেন,—"ভারদ্বাজেন বার্ত্তিকং।" কিন্তু ভারদ্বাজ মুনিই যে ন্যায়বার্ত্তিককার, ইহা কল্পনামাত্র। বস্তুতঃ সুপ্রসিদ্ধ ভরদ্বাজ মুনির বংশসম্ভূত বলিয়া উদ্দ্যোতকর তাঁহার ভারদ্বাজ নামেরই ব্যবহার করিয়াছেন এবং তৎকালে তিনি ঐ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।* তাৎপর্য্যটীকার প্রথমে এবং অন্যত্রও বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যানুসারে বুঝা যায় যে, উদ্দ্যোতকরের বার্ত্তিকরচনা-কালে বৌদ্ধাচার্য্য দিঙ্‌নাগও জীবিত ছিলেন। নচেৎ তিনি বার্ত্তিক রচনার দ্বারা কুতার্কিক দিঙ্‌নাগের অজ্ঞাননিবৃত্তির আশা করিতে পারেন না। এই গ্রন্থের শেষ খণ্ডের সর্ব্বশেষে উক্ত বিষয়ে এবং ভাস কবির প্রাচীনত্ব বিষয়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

সে যাহাই হউক, বস্তুতঃ বাচস্পতি মিশ্র নবম শতাব্দীতে যে উদ্দ্যোতকরের 'বার্ত্তিক'কে অতি প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া গিয়াছেন, তিনি যে সপ্তম শতাব্দীর

---

* কণাদসূত্রের যে 'ভারদ্বাজবৃত্তি'র সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা উদ্দ্যোতকরের কৃতও হইতে পারে। কারণ, প্রশস্তপাদের পূর্ব্বে উদ্দ্যোতকর যে, কণাদসূত্রের বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, ইহা ন্যায়বার্ত্তিকে (৯৯ পৃঃ ও ৩৪৩ পৃঃ) উদ্দ্যোতকরের কণাদসূত্র ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। মনে হয়—উদ্দ্যোতকর প্রথমে কণাদসূত্রের বৃত্তি রচনা করিয়া বৈশেষিক পাশুপত সম্প্রদায়ের আচার্য্য হওয়ায় পাশুপতাচার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাই ন্যায়বার্ত্তিকের শেষে তাঁহার নামের পূর্ব্বে 'পাশুপতাচার্য্য' এইরূপ লিখিত হইয়াছে। পরে প্রশস্তপাদ, সংশয়ের কারণ বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী উদ্দ্যোতকরের মতের খণ্ডন করিয়াছেন। (পরে ৩২১-২২ ও ৪৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কলিকাতা সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত প্রশস্তপাদভাষ্যের ভূমিকায় (৯ম পৃঃ) লিখিত হইয়াছে,—"খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দ্যাং বর্ত্তমানস্য উদ্দ্যোতকরস্য গ্রন্থে প্রশস্তপাদস্য নামোল্লেখো দৃশ্যতে, ততস্তস্মাদয়ং প্রাচীন ইতি স্থিতে।". কিন্তু ইহা নিষ্প্রমাণ উক্তি।

অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা নিশ্চিত। উদ্দ্যোতকর সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তির সমসাময়িক ছিলেন, এই মত কোনরূপেই গ্রহণ করা যায় না। তিনি ন্যায়বার্ত্তিকে ধর্ম্মকীর্ত্তির কোন কথারই উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ধর্ম্মকীর্ত্তি বাদন্যায় গ্রন্থে পরে 'নিগ্রহস্থান' বিষয়ে ন্যায়মতখণ্ডনারম্ভে বলিয়াছেন,—"অত্র ভাষ্যকারমতং দূষয়িত্বা বার্ত্তিককারো যং স্থিতপক্ষমাহ, তত্রৈবং ক্রমঃ।" পরন্তু হর্ষচরিতে বাণভট্টও যে 'বাসবদত্তা' কাব্যের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কবি সুবন্ধু বলিয়াছেন—"ন্যায়স্থিতিমিব উদ্দ্যোতকরস্বরূপাং।" সুতরাং সুবন্ধুরও পূর্ব্ব হইতেই উদ্দ্যোতকর যে, ন্যায়মত-সংস্থাপক আচার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, ইহা নিশ্চিত। অতএব উদ্দ্যোতকর যে হর্ষবর্দ্ধনের পিতা প্রভাকরবর্দ্ধনের সভাপণ্ডিত ছিলেন, ইহাও সম্ভব বুঝি না। পরন্তু তাহা হইলে উদ্দ্যোতকর সে বিষয়ে কোন উল্লেখ অবশ্য করিতেন।

কালবশে কোন সময়ে 'বার্ত্তিক'কার উদ্দ্যোতকরের সম্প্রদায়ও বিলুপ্ত হওয়ায় তাঁহার 'বার্ত্তিকে'র তৎকালীন সমস্ত টীকানিবন্ধও কুনিবন্ধ হয়। সুতরাং তৎকালে উদ্দ্যোতকরের বার্ত্তিকের অনেক পাঠও বিকৃত হয়। তাই পরে বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার গুরু ত্রিলোচনের নিকটে অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাহার সাহায্যে ঐ অতিপ্রাচীন 'বার্ত্তিক' নিবন্ধের 'তাৎপর্য্যটীকা' রচনা করিয়া উহার উদ্ধার করেন। দুস্তরপঙ্কমগ্ন অতিপ্রাচীন গোবৃন্দের সমুদ্ধারে বিশিষ্ট পুণ্যলাভ হয়। তাই বাচস্পতি মিশ্র 'তাৎপর্য্যটীকা'র প্রারম্ভে বলিয়াছেন,—"ইচ্ছামি কিমপি পুণ্যং দুস্তরকুনিবন্ধপঙ্কমগ্নানাং। উদ্দ্যোতকর-গবীনামতিজরতীনাং সমুদ্ধরণাৎ॥" উক্ত শ্লোকে 'উদ্দ্যোতকরগবীনাং' এই পদে 'গো' শব্দের দ্বারা প্রথম পক্ষে বার্ত্তিকনিবন্ধরূপ বাক্য এবং অপর পক্ষে গো বুঝিতে হইবে। 'অতিজরতীনাং' এই বিশেষণ পদের দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, বাচস্পতি মিশ্রের সময়েও উদ্দ্যোতকরের বার্ত্তিক অতি প্রাচীন গ্রন্থ এবং অতিপ্রাচীনত্ববশতঃ কালবশে উহার সম্প্রদায় লোপ হইয়াছিল। উদয়নাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্রের উক্ত শ্লোকে শ্লিষ্টরূপকের বিশ্লেষণ করিয়া সুন্দরভাবে যেরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝিলে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথা বুঝা যাইবে।*

* নমু চিরন্তনেঽস্মিন্ নিবন্ধে মহাজনপরিগৃহীতে বহবো? নিবন্ধাঃ সন্তীতি কৃতমনেন, ইত্যত আহ, 'ইচ্ছামী'তি। নমু যদি গ্রন্থকারসম্প্রদায়াবিচ্ছেদেন তে নিবন্ধাঃ কথং

পরন্তু তৎকালে ন্যায়সূত্রের পাঠাদি বিষয়েও যে, অনেক বিবাদ ও মতভেদ ছিল, ইহাও বুঝা যায়। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বিবাদের ফলেও অনেক ন্যায়সূত্র বিকৃত হয়। তাই বাচস্পতি মিশ্র নিজমতানুসারে বিচারপূর্ব্বক 'বস্বঙ্কবসুবৎসরে' অর্থাৎ ৮৯৮ বৈক্রম সংবতে (৮৪১ খৃঃ) **ন্যায়সূচীনিবন্ধ** রচনা করেন। উহাতে যথাক্রমে সমস্ত ন্যায়সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে এবং সর্ব্বশেষে লিখিত হইয়াছে,—এই ন্যায়দর্শনে অধ্যায়—৫। আহ্নিক—১০। প্রকরণ—৮৪। সূত্র—৫২৮। পদ—১৭৯৬। অক্ষর—৮৩৮৫। প্রথম হইতে সমস্ত ন্যায়সূত্রের অক্ষরসংখ্যা পর্য্যন্ত গণনা করিয়া তাহাও কেন লিখিত হইয়াছে, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। কিন্তু উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি অনেকের গৃহীত সূত্রপাঠেও কোন কোন স্থলে পাঠভেদাদি লক্ষ্য করা যায়। পরে আবার মিথিলেশ্বর সূরি নব্য বাচস্পতি মিশ্রও ন্যায়সূত্রপাঠের বিচার করিয়া **ন্যায়সূত্রোদ্ধার** রচনা করেন। তাঁহার মতে সূত্রসংখ্যা—৫৩১। নানা কারণে প্রাচীন বাচস্পতি মিশ্রের 'ন্যায়সূচীনিবন্ধা'নুসারেই এই গ্রন্থে সূত্রপাঠ গৃহীত হইয়াছে।

বাচস্পতি মিশ্রের পরে সম্ভবতঃ নবম শতাব্দীর শেষে* শঙ্করবর্ম্মার সময়ে কাশ্মীরবাসী ভরদ্বাজগোত্র গৌড়ব্রাহ্মণ জয়ন্ত ভট্ট **ন্যায়মঞ্জরী** গ্রন্থে অনাবশ্যকবোধে সমস্ত ন্যায়সূত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি নিজেই বলিয়াছেন,—"অস্মাভিস্তু লক্ষণসূত্রাণ্যেব ব্যাখ্যাস্যন্তে" ইত্যাদি (১২ পৃঃ)।

কুনিবন্ধাঃ ? অথ সম্প্রদায়ো বিচ্ছিন্নঃ কথং তবাপীয়ং বিচ্ছিন্নসম্প্রদায়া তাৎপর্য্যটীকা সুনিবন্ধ ইত্যত আহ, 'অতিজরতীনা'মিতি। উদ্দ্যোতকরসম্প্রদায়ো হ্যমূষাং যৌবনং, তচ্চ কালবশাদ্ গলিতমিব, কিয়ন্মাত্র ত্রিলোচনগুরোঃ সকাশাদুপদেশরসায়নমাসাদিতমমূষাং পুনর্নবীভাবায় দীয়ত ইতি যুজ্যতে। নচ কুনিবন্ধপঙ্কমগ্নানাং তদ্দাতুমুচিতমিতি তস্মাদুৎকৃষ্য স্বনিবন্ধস্থলে সন্নিবেশরূপসমুদ্ধরণমেব সাম্প্রতমিত্যর্থঃ।' ('তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি' ৯ম পৃঃ)।

* অনেকের মতে কাশ্মীরপতি শঙ্কর বর্ম্মার রাজ্যকাল ৮৮৩—৯০২ খৃঃ। জয়ন্ত ভট্ট 'ন্যায়মঞ্জরী'তে (৮৪ পৃঃ) মাঘকবির নাম করিয়া তাহার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং পরে (১০৯ পৃঃ) ঈশ্বর কৃষ্ণের প্রত্যক্ষলক্ষণ খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন,—"যত্তু রাজা ব্যাখ্যাতবান্" ইত্যাদি। অনেকের মতে অষ্টম শতাব্দীতে যোগসূত্রবৃত্তিকার রণরঙ্গমল্ল ভোজরাজই সাংখ্যকারিকার বার্ত্তিককার। যাহা হউক, জয়ন্ত ভট্ট উক্ত স্থলে রাজার ব্যাখ্যানুসারে ঈশ্বরকৃষ্ণের প্রত্যক্ষলক্ষণের অনুমানাদিতে অতিব্যাপ্তি দোষ বলিলেও "মাঠরবৃত্তি" বা বাচস্পতি মিশ্রের 'তত্ত্বকৌমুদী'র ব্যাখ্যানুসারে ঐ দোষ হয় না। অতএব বুঝা যায় যে, জয়ন্ত ভট্ট বাচস্পতি মিশ্রের বহুপরবর্ত্তী নহেন। মিথিলার বাচস্পতি মিশ্রের গ্রন্থ নবম শতাব্দীর শেষে কাশ্মীর পর্য্যন্ত প্রচারিত হয় নাই। এ বিষয়ে অন্যান্য কথা পরে ১২৩ ও ১৩৭ পৃষ্ঠায় অবশ্য দ্রষ্টব্য।

কিন্তু তিনি সমস্ত ন্যায়সূত্রের **ন্যায়কলিকা** নামে লঘু বৃত্তিও রচনা করেন। ঐ বৃত্তির প্রাপ্ত অংশ কাশীর সরস্বতী-ভবন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। পরে মিথিলার গঙ্গেশপুত্র বর্দ্ধমান উপাধ্যায় ও তাহার পরবর্ত্তী বাচস্পতি মিশ্র এবং নবদ্বীপের রামভদ্র সার্ব্বভৌম প্রভৃতি অনেক বঙ্গীয় নব্য নৈয়ায়িকও স্বতন্ত্রভাবে ন্যায়সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ১৭৪০ শকাব্দে কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশও **'গৌতমসূত্র-সন্দীপনী'** নামে অভিনব ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রকাশ হয় নাই। সঙ্ক্ষেপের অনুরোধে এই খণ্ডে ভূমিকায় আর অধিক লেখা সম্ভব হইল না। মিথিলা ও বঙ্গের প্রসিদ্ধ নব্যনৈয়ায়িক গ্রন্থকারদিগের সময়াদি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য পূর্ব্বে যথামতি **ন্যায়-পরিচয়** গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে।

সূত্র ও ভাষ্যোক্ত বিষয়ের
সূচী

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

দ্বিতীয় আহ্নিকে

টিপ্পনী ও পাদটীকায় লিখিত কতিপয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সূচী

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

———

ন্যায়দর্শন

বাৎস্যায়ন ভাষ্য

ভাষ্য। প্রমাণতোঽর্থ-প্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণং।*

প্রমাণমন্তরেণ নার্থ-প্রতিপত্তিঃ, নার্থ-প্রতিপত্তিমন্তরেণ প্রবৃত্তি-সামর্থ্যং। প্রমাণেন খল্বয়ং জ্ঞাতাঽর্থমুপলভ্য তমর্থম-ভীপ্সতি জিহাসতি বা। তস্যেপ্সা-জিহাসা-প্রযুক্তস্য সমীহা প্রবৃত্তিরিত্যুচ্যতে। সামর্থ্যং পুনরস্যাঃ ফলেনাভিসম্বন্ধঃ। সমীহমানস্তমর্থমভীপ্সন্ জিহাসন্ বা তমর্থমাপ্নোতি জহাতি বা। অর্থস্তু সুখং সুখহেতুশ্চ, দুঃখং দুঃখহেতুশ্চ। সোঽয়ং প্রমাণার্থোঽপরিসংখ্যেয়ঃ, প্রাণভৃদ্‌ভেদস্যাপরিসংখ্যেয়ত্বাৎ।

অনুবাদ—প্রমাণের দ্বারা অর্থের প্রতিপত্তি হইলে অর্থাৎ গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য পদার্থের বোধ হইলে প্রবৃত্তির সাফল্য হয় অর্থাৎ যেহেতু প্রমাণ সফল প্রবৃত্তির জনক, অতএব প্রমাণ "অর্থবৎ", অর্থাৎ সেই সমস্ত প্রমেয় পদার্থের অব্যভিচারী, প্রমাণ দ্বারা যে পদার্থ যেরূপে ও যে প্রকারে প্রতিপন্ন হয়, সেই পদার্থ তদ্রূপ ও সেই প্রকারই হয়।

বিশদার্থ—প্রমাণ ব্যতীত অর্থের যথার্থ বোধ হয় না, অর্থের যথার্থ বোধ ব্যতীত প্রবৃত্তির সাফল্য হয় না। এই জ্ঞাতা অর্থাৎ জ্ঞানকর্ত্তা জীব প্রমাণ দ্বারাই অর্থকে উপলব্ধি করিয়া, সেই অর্থকে (গ্রাহ্য বা ত্যাজ্য পদার্থকে) প্রাপ্তির নিমিত্ত ইচ্ছা করে, অথবা ত্যাগ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করে। ঈপ্সা

---

* কোন কোন পুস্তকে ভাষ্যারম্ভে "ওঁ নমঃ প্রমাণায়" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু উহা যে ভাষ্যকারের নিজের উক্তি, সে বিষয়ে কোন প্রমাণই নাই। পরন্তু খৃঃ দশম শতাব্দীতে "ন্যায়কন্দলী"র প্রারম্ভে শ্রীধরভট্ট লিখিয়া গিয়াছেন যে, ন্যায়ভাষ্যকার পক্ষিলস্বামী ও মীমাংসাভাষ্যকার শবর স্বামী নমস্কার করিলেও ভাষ্যারম্ভে তাহা লিপিবদ্ধ করেন নাই।

ও জিহাসা অর্থাৎ প্রাপ্তির নিমিত্ত ইচ্ছা ও ত্যাগের নিমিত্ত ইচ্ছাজন্য "প্রযুক্ত" অর্থাৎ কৃতযত্ন সেই জ্ঞাতার "সমীহা" অর্থাৎ কায়িক, বাচিক ও মানসিক ব্যাপার "প্রবৃত্তি",—এই শব্দের দ্বারা উক্ত হয়। এই প্রবৃত্তির "সামর্থ্য" কিন্তু ফলের সহিত সম্বন্ধ অর্থাৎ সার্থকতা বা সাফল্য। "সমীহমান" অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা কোন পদার্থকে উপলব্ধি করিয়া প্রবর্ত্তমান জ্ঞাতা সেই অর্থকে প্রাপ্তির নিমিত্ত ইচ্ছা করতঃ অথবা ত্যাগ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করতঃ সেই অর্থকে প্রাপ্ত হয় অথবা ত্যাগ করে। "অর্থ" কিন্তু সুখ, সুখের কারণ এবং দুঃখ ও দুঃখের কারণ। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যে "অর্থ" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে—গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য পদার্থ।

সেই এই প্রমাণার্থ অর্থাৎ প্রমাণের প্রয়োজন সুখদুঃখাদি অপরিসংখ্যেয় (অনিয়ম্য), যেহেতু প্রাণিগণের ভেদ বা বিশেষ অনিয়ম্য। [অর্থাৎ যাহা এক জীবনের সুখ বা দুঃখের কারণ, তাহা যে সকল জীবেরই সুখ বা দুঃখের কারণ হইবে, এমন নিয়ম নাই। অনেক জীবের পক্ষে উহার বিপরীত দেখা যায়]।

টিপ্পনী—ন্যায়দর্শনের বক্তা মহর্ষি গোতম প্রথম সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্ব-জ্ঞানপ্রযুক্ত নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে শূন্যবাদী ও সংশয়বাদী বিরোধী সম্প্রদায় ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন যে, প্রমাণ-পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই যখন কোনরূপেই সম্ভব হইতে পারে না, তখন তদ্দ্বারা অন্য পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের কথা বলাই যায় না। গোতমের মতে যথার্থ অনুভূতির সাধনই প্রমাণ। কিন্তু কোন বিষয়ে অনুভূতি জন্মিলে সেই জ্ঞান যে যথার্থ, ইহা নিশ্চয় করিবার কোন উপায় নাই। সুতরাং প্রমাণের তত্ত্ব যে প্রামাণ্য, তাহার নিশ্চয় অসম্ভব। অতএব যাহা অসম্ভব, তাহার বক্তা গোতমের এই ন্যায়শাস্ত্র ব্যর্থ, উহা উন্মত্তপ্রলাপ। তাই গৌতমমত-রক্ষক ভগবান্ বাৎস্যায়ন ভাষ্যারম্ভে বলিয়াছেন,—"প্রমাণতোঽর্থ-প্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণং।"

ভাষ্যকারের মূল কথা এই যে, প্রমাণের প্রামাণ্যনিশ্চয় অসম্ভব নহে। অনুমান-প্রমাণের দ্বারাই তাহা নিশ্চয় করা যায়। তাই ভাষ্যকার প্রথমে সেই অনুমানপ্রমাণ প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন,—"প্রমাণং অর্থবৎ"। "অর্থ" শব্দের উত্তর নিত্যযোগ অর্থে মতুপ্ প্রত্যয়ে উক্ত "অর্থবৎ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থের নিত্যযোগ এখানে অব্যভিচারিতা। তাহা হইলে

উক্ত "অর্থবৎ" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, অর্থের অব্যাভিচারী।* প্রমাণ যে পদার্থকে যে রূপে ও যে প্রকারে প্রতিপন্ন করে, সেই পদার্থ তদ্রূপ ও তৎপ্রকারই হয়, কখনই তাহার অন্যথা হয় না, ইহাই প্রমাণে অর্থের অব্যভিচারিত্ব। তৎ প্রমাণের প্রমেয়ভূত তৎপদার্থের ব্যাপ্যত্বও উহার ফলিতার্থ বলা যায়। তাহা হইলে সর্ব্বত্র প্রমাণত্বরূপে অভিমত সেই সেই পদার্থবিশেষকে পক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতে প্রমেয়ভূত সেই পদার্থের ব্যাপ্যত্বই বিশেষানুমানের সাধ্য হইবে। যথার্থ জ্ঞানের বিশেষ্যভূত পদার্থে ঐ জ্ঞানের বিশেষণীভূত পদার্থ অবশ্যই থাকে। কিন্তু কোন জ্ঞান যে অংশে ভ্রমাত্মক হইবে, সেই অংশে তাহাতে বিশেষ্য পদার্থে অবর্ত্তমান পদার্থই বিশেষণ হইয়া থাকে। যেমন রজ্জুতে সর্পত্বের জ্ঞান হইলে উহা ভ্রম। কারণ, ঐ জ্ঞানের বিশেষ্যভূত রজ্জুতে বিশেষণীভূত সর্পত্ব নাই। তাই উক্তরূপ জ্ঞানকেই ভ্রম জ্ঞান বলে। সুতরাং যথার্থ জ্ঞানকেই বিশেষ্যতা সম্বন্ধে উহার বিশেষ্য ও বিশেষণীভূত পদার্থের ব্যাপ্য বলা যায়। যেমন জলত্বরূপে জলের যথার্থ জ্ঞান বিশেষ্যতা সম্বন্ধে যে জলে থাকে, তাহাতে অভেদ সম্বন্ধে সেই জল ও সমবায় সম্বন্ধে বিশেষণীভূত জলত্ব অবশ্য থাকে। তাহা হইলে স্বজন্য জ্ঞানের বিশেষ্যতা সম্বন্ধে সেই প্রমাণ পদার্থও উহার প্রমেয়ভূত সেই পদার্থের অব্যভিচারী অর্থাৎ ব্যাপ্য হইবে। সর্ব্বত্র বিশেষণীভূত সেই পদার্থ স্বগত বিশেষণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সেখানে সেই বিশেষ্য-ভূত পদার্থে থাকায় উহা সেই সম্বন্ধে সেই প্রমাণ পদার্থের ব্যাপক হইবে। মূল কথা, পূর্ব্বোক্তরূপে প্রমাণ পদার্থে উক্তরূপ অর্থাব্যভিচারিত্বই ভাষ্যকারের সাধ্য ধর্ম্ম। ভাষ্যকার উহার সাধক হেতু প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন—"প্রবৃত্তি-সামর্থ্যাৎ"। "তাৎপর্য্যটীকা"কার বাচস্পতি মিশ্র উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, —"সমর্থপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ"।

অর্থাৎ যেহেতু প্রমাণ পদার্থ সমর্থপ্রবৃত্তির জনক, অতএব উহা তাহার প্রমেয়ভূত সেই অর্থের অব্যভিচারী। প্রবৃত্তির সামর্থ্য বলিতে ফলের সহিত সম্বন্ধ অর্থাৎ সাফল্য। তাহা হইলে সমর্থপ্রবৃত্তি বলিতে ফলিতার্থ বুঝা যায়,

---

* "অর্থবদিতি নিত্যযোগে মতুপ্। নিত্যতা চাব্যভিচারিতা, তেনার্থাব্যভিচারীত্যর্থঃ। ইয়মেব চার্থাব্যভিচারিতা প্রমাণস্য. যদ্দেশকালান্তরাবস্থান্তরাবিসংবাদোঽর্থস্বরূপপ্রকারয়োস্তদ্রূপ-দর্শিতয়োঃ। অত্র হেতুঃ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাৎ সমর্থপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ। যদি পুনরেতদর্থবন্নাভবিষ্যন্ন সমর্থাং প্রবৃত্তিমকরিষ্যৎ যথা প্রমাণাভাস ইতি ব্যতিরেকী হেতুঃ, অন্বয়ব্যতিরেকী বা, অনুমানস্য স্বতঃপ্রমাণতয়াঽন্বয়স্যাপি সম্ভবাৎ"।—ন্যায়বার্ত্তিক,—তাৎপর্য্যটীকা।

সফল প্রবৃত্তি। কিন্তু প্রমাণ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধেই সফলপ্রবৃত্তির জনক হয় না। তাই তৎপূর্ব্বে বলিয়াছেন,—"প্রমাণতোঽর্থ-প্রতিপত্তৌ"।

অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা অর্থের যে প্রতিপত্তি বা বোধ, তাহা যথার্থ জ্ঞান। সুতরাং সেই পদার্থের যথার্থ বোধের পরে তাহার প্রাপ্তি অথবা পরিত্যাগে ইচ্ছুক হইলে সেই পদার্থের প্রাপ্তি অথবা পরিত্যাগে যে প্রবৃত্তি, তাহা সফল হয়। কারণ, সেই স্থলে সেই প্রমাণ-বোধিত পদার্থটি বস্তুতঃই তদ্রূপে থাকে। কিন্তু যাহা প্রমাণ নহে, কিন্তু প্রমাণের ন্যায় প্রতীত হওয়ায় যাহাকে বলে "প্রমাণাভাস", তদ্দ্বারা ভ্রমাত্মক জ্ঞানই উৎপন্ন হওয়ায় সেই জ্ঞানের বিষয় পদার্থ সেখানে থাকে না। যেমন রজ্জুকে সর্প বলিয়া প্রত্যক্ষ করিলে সেখানে সেই ভ্রমজ্ঞানের বিষয় সর্প বস্তুতঃ না থাকায় তাহার প্রাপ্তি বা পরিহারের জন্য যে প্রবৃত্তি, তাহা সফল হয় না। কূপের জলকে গঙ্গাজল বুঝিয়া পান করিলেও পিপাসার নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু গঙ্গাজল বুঝিয়া গঙ্গাজল লাভের জন্য যে প্রবৃত্তি, তাহা সফল হয় না। *

ফলকথা, প্রমাণদ্বারা কোন পদার্থের বোধ হইলেই সেখানে তদ্বিষয়ে উক্তরূপ প্রবৃত্তি সফল হয়। সুতরাং পরে উক্তরূপ অনুমানপ্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, প্রমাণ অর্থের অব্যভিচারী। যদি উহা অর্থের ব্যভিচারী হইত, তাহা হইলে সফল প্রবৃত্তি জন্মাইত না,—যেমন প্রমাণাভাস। এইরূপে উক্ত ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তের সাহায্যে উক্ত ব্যতিরেকী হেতুর দ্বারা প্রমাণে অর্থবত্ত্ব সিদ্ধ হয়। ঐ "অর্থবত্ত্ব" অর্থাৎ প্রমাণস্থ পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থের অব্যভিচারিত্ব প্রমাণের অসাধারণধর্ম্মরূপ প্রামাণ্য। "ন্যায়মঞ্জরী" গ্রন্থে (১৬০ পৃঃ) জয়ন্তভট্টও বলিয়াছেন,—"তস্য স্বপ্রমেয়াব্যভিচারিত্বং নাম প্রামাণ্যম্"।

* অবশ্য দূর হইতে মণির প্রভা দেখিয়া তাহাতে মণিভ্রমে মণিলাভের জন্য অগ্রসর হইলে সেখানে মণিলাভ হয়। এইরূপ ভ্রমকে সংবাদি ভ্রম বলে। বৌদ্ধ সম্প্রদায় "মনিপ্রদীপপ্রভয়োঃ", ইত্যাদি কারিকার দ্বারা ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত হেতুতে দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তদনুসারে চিৎসুখ মুনিও ঐ দোষ বলিয়াছেন (চিৎসুখী, ২য় পঃ, ২২২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ভাষ্যকারের মতে ঐরূপ মণিলাভ সেখানে ঐ প্রবৃত্তির ফল নহে। কারণ, মণিপ্রভাকে মণিত্বরূপে বুঝিলে তাহাতে ঐরূপ ভ্রম জ্ঞানজন্য মণিত্বরূপে সেই প্রভাবিষয়েই প্রযত্নরূপ প্রবৃত্তি জন্মে, উহাও বিসংবাদি প্রবৃত্তি। কারণ, মণিত্ববিশিষ্ট প্রভার লাভ অসম্ভব। জ্ঞানের মুখ্য বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্যভূত বস্তুর প্রাপ্তি হইলে সেই প্রবৃত্তির সামর্থ্য বুঝা যায়। ভ্রমস্থলে তাহা সম্ভবই নহে। "তত্ত্বচিন্তামণি"র প্রত্যক্ষ খণ্ডে গঙ্গেশ অন্যরূপ সমাধান বলিয়াছেন। "প্রামাণ্যবাদ", ২৬৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অবশ্যই প্রশ্ন হইবে যে, ভাষ্যকার যে অনুমানপ্রমাণের দ্বারা প্রমাণের প্রামাণ্য সিদ্ধ করিয়াছেন, সেই অনুমানের প্রামাণ্যনিশ্চয় কিরূপে সম্ভব হইবে? তাহার জন্য আবার অন্য অনুমানপ্রমাণ প্রদর্শন করিলে তাহারই বা প্রামাণ্য-নিশ্চয় কিরূপে সম্ভব হইবে? এইরূপে সমস্ত অনুমানেই প্রামাণ্যসংশয়বশতঃ প্রমাণের প্রামাণ্যনিশ্চয় কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, সর্ব্বত্রই অনুমান বা অনুমিতিরূপ জ্ঞানে প্রামাণ্যসংশয় হয় না। এই যে, এখন ঘড়ি দেখিয়া সময়ের অনুমান করিয়া, তদনুসারে সর্ব্বদেশে অসংখ্য কার্য্য হইতেছে, গণিতের দ্বারা কত কত দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের অনুমান করিয়া, তদনুসারে কত কত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে এবং প্রাচীন লিপিপাঠে অনুমানের দ্বারা কত কত পুরাতন বার্ত্তার নির্ণয় হইতেছে, ঐ সমস্ত স্থানে সর্ব্বত্রই কি সেই সমস্ত অনুমানে প্রামাণ্য-সংশয় হইতেছে? আর এই যে, তুলাদণ্ডের সাহায্যে তণ্ডুলাদি দ্রব্যের গুরুত্ববিশেষের অনুমানের দ্বারা সর্ব্বদেশে সুচিরকাল হইতে ক্রয়বিক্রয়-ব্যবহার চলিতেছে, তাহাতেও কি সর্ব্বত্রই সেই সমস্ত অনুমানে প্রামাণ্য সংশয় হইতেছে? সত্যের অপলাপ করিয়া সংশয়বাদী নাস্তিকও কিন্তু ইহা বলিতে পারিবেন না।*

পরন্তু সর্ব্বত্রই সংশয় বলিলে সেই সংশয়ের কারণও বলিতে হইবে। কেবল "সংশয় সংশয়" বলিয়া সহস্র চীৎকার করিলেও সেই সংশয় সিদ্ধ হইবে না।

* বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণ প্রমাণজন্য প্রমাজ্ঞানের যথার্থত্বরূপ প্রমাত্ব সিদ্ধ করিতেই নানা বিচার করিয়াছেন। কারণ, প্রমাজ্ঞানের যথার্থত্বরূপ প্রামাণ্য বা প্রমাত্ব সিদ্ধ না হইলে সেই জ্ঞানের করণ প্রমাণ পদার্থের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং ঐ সমর্থপ্রবৃত্তিজনকত্বরূপ হেতুর দ্বারাই প্রমাজ্ঞানের প্রমাত্ব সিদ্ধ হয়, ইহাও এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। ঐ হেতুর কোন দোষ না থাকায় উহার দ্বারা এবং ঐরূপ অন্য হেতুর দ্বারা যে সমস্ত অনুমিতি জন্মে, তাহাতে প্রামাণ্য সংশয় জন্মে না। এই তাৎপর্য্যেই টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ন্যায়মতের ব্যাখ্যা করিতেও বলিয়াছেন,—"অনুমানস্য স্বতঃপ্রমাণতয়া"। পরেও বলিয়াছেন,—"অনুমানস্য তু…স্বত এব প্রামাণ্যং" ইত্যাদি। জ্ঞানের প্রমাত্বসাধক পূর্ব্বোক্ত হেতুর সাধক সেই মানস প্রত্যক্ষে কোনরূপ সংশয় সম্ভব না হওয়ায় অনবস্থা দোষের আশঙ্কা নাই। তাই বলিয়াছেন,—"স্বতঃ প্রামাণ্যমিতি নানবস্থা"। তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে (প্রামাণ্যবাদ, ২৮৩ পৃঃ) পরতঃ প্রামাণ্যবাদ সমর্থন করিতে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ বিষয়ে জয়ন্তভট্টও বহু সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন। সমস্ত কথা সম্যক্ বুঝিতে হইলে এবং নৈয়ায়িকসম্প্রদায় মীমাংসকসম্প্রদায়ের সম্মত স্বতঃ-প্রামাণ্যবাদ কিরূপ সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা জানিতে হইলে ঐ সমস্ত মূলগ্রন্থ পাঠ করা নিতান্ত আবশ্যক।

কিন্তু সংশয়ের সাধক যুক্তি প্রকাশ করিতে গেলেই তাঁহাকে কোন অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই হইবে। তাঁহার কথিত সংশয়ের কারণও কোন প্রমাণসিদ্ধ না হইলে তাহা অলীক হইবে। অতএব ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, যে অনুমানে প্রামাণ্য-সংশয় জন্মে না, এমন অনুমানও অসংখ্য আছে, যদ্দ্বারা লোকব্যবহার চলিতেছে। নচেৎ সংসারে নিশ্চয়মূলক প্রবৃত্তি বা লোকব্যবহার চলিতেই পারে না। সর্ব্বত্রই যে, সম্ভাবনাত্মক জ্ঞানজন্যই প্রবৃত্তি ও লোকব্যবহার চলিতেছে, সংসারে কুত্রাপি কাহারও নিশ্চয়মূলক কোন প্রবৃত্তি জন্মে না, ইহা অতি অসত্য। সংশয়বাদী নিজেও কত বিষয়ে পূর্ব্বে নিশ্চয় করিয়াই প্রবৃত্ত হইতেছেন। অনেক স্থলে ভ্রান্ত জীবের সেই নিশ্চয় ভ্রমাত্মক হইলেও তাহা কিন্তু সংশয়াত্মক জ্ঞান নহে।

পরন্তু ভাষ্যকারোক্ত সমর্থপ্রবৃত্তি-জনকত্বরূপ হেতুতে কাহারও সাধ্য ধর্ম্ম অর্থবত্ত্বের ব্যভিচার সংশয় হইলে অনুকূল তর্কের দ্বারাই তাহা নিবৃত্ত হয়। "সমর্থপ্রবৃত্তিজনকত্বং যদি অর্থবত্ত্ব-ব্যভিচারি স্যাৎ, তদা প্রমাণাভাসবৃত্তি স্যাৎ"? —অর্থাৎ সফলপ্রবৃত্তিজনকত্ব যদি অর্থবত্ত্বের ব্যভিচারী হয় অর্থাৎ যাহা অর্থের অব্যভিচারী নহে, কিন্তু অর্থের ব্যভিচারী, তাহাতেও যদি সফলপ্রবৃত্তিজনকত্ব থাকে, তাহা হইলে প্রমাণাভাসেও থাকুক? অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানের জনক যে প্রমাণাভাস, তাহাও সফলপ্রবৃত্তিজনক হউক? এই প্রকার আপত্তিরূপ তর্কের সাহায্যে প্রতিপন্ন হয় যে, সফলপ্রবৃত্তিজনকত্ব হেতু অর্থবত্ত্বের ব্যাপ্য। সুতরাং ঐ হেতুর দ্বারা প্রমাণ-পদার্থ যে অর্থের অব্যভিচারী, ইহা সিদ্ধ হয়। কারণ, যাহা প্রমাণাভাস, তাহা সফলপ্রবৃত্তির জনক নহে, ইহা নিশ্চিত। সুতরাং প্রমাণাভাস হইতে প্রমাণের যে বিশেষ আছে, ইহা স্বীকার্য্য। প্রমাণের অর্থাব্যভিচারিত্বই সেই বিশেষ, সুতরাং উহাকে তাহার প্রামাণ্য বলা যায়। ভাষ্যকার প্রমাণাভাস হইতে প্রমাণের উক্তরূপ বিশেষ সিদ্ধ করিয়া তাহার প্রামাণ্যই সমর্থন করিয়াছেন।

সর্ব্বশূন্যতাবাদী বলিয়াছেন যে, প্রমাণ বলিয়া কোন বাস্তব পদার্থ নাই। প্রমাণ-প্রমেয়-ব্যবহার কাল্পনিক। জগতে সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম। সুতরাং যে সমস্তকে প্রমাণ বলা হয়, তাহাও প্রমাণাভাস। কিন্তু ইহাতেও ভাষ্যকারের কথা এই যে, কোন জ্ঞান যথার্থ না হইলে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি সফল হইতে পারে না। জলকে জল বলিয়া যে বোধ এবং তৈল বলিয়া যে বোধ, এই উভয় জ্ঞানই ভ্রম হইলে, প্রথমোক্ত জলজ্ঞান জলবিষয়ে প্রবৃত্তি সফল করে কেন?

সুতরাং "ইদং জ্ঞানং যথার্থং, সফলপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ"—এইরূপে অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, সেই জলজ্ঞান যথার্থ। সুতরাং ভ্রমজ্ঞান হইতে উহা ভিন্ন। তাহা হইলে সেই যথার্থ জ্ঞানের করণ যে প্রমাণ, তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত হেতুর দ্বারা অর্থবত্ত্ব বা অর্থের অব্যভিচারিত্ব সিদ্ধ হয়। বাচস্পতিমিশ্রও পরে বলিয়াছেন,—"সংবেদনস্য চার্থাব্যভিচারিতাকথনেন তৎকরণানামিন্দ্রিয়াদীনামপি প্রমাণত্বমুক্তং বেদিতব্যং" ইত্যাদি। তাৎপর্য্যটীকা।

পরন্তু জগতে যথার্থজ্ঞান একেবারেই না থাকিলে ভ্রমজ্ঞান বলাই যায় না। ভ্রমজ্ঞান বলিতে গেলেই তাহার যথার্থজ্ঞান মানিতেই হইবে। পরন্তু রজ্জুতে "অয়ং সর্পঃ" এইরূপে যে ভ্রমজ্ঞান জন্মে, তাহাও ত "অয়ং" এই অংশে ভ্রম নহে। সেই দৃশ্যমান পদার্থে "অয়ং" অর্থাৎ ইদম্বরূপে যে জ্ঞান, তাহাকে ভ্রম বলা যায় না। ভাষ্যকার পরে চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে বিচার করিয়া সর্ব্ব-শূন্যতাবাদীর মতও খণ্ডন করিয়াছেন। যথাস্থানে তাহা পাওয়া যাইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রমাণ দ্বারা কোন পদার্থের বোধ হইলে, পরে যখন তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি সফল হয়, তখন তাহাতে সফলপ্রবৃত্তিজনকত্বনিশ্চয় হওয়ায় উক্ত হেতুর দ্বারা তাহাতে অর্থবত্ত্বরূপ প্রামাণ্য-নিশ্চয় হইতে পারে। কিন্তু প্রবৃত্তির সফলতার পূর্ব্বে সেই প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয় কিরূপে হইবে? সেই প্রামাণ্য-নিশ্চয় না হইলেও ত পূর্ব্বে সে বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রবৃত্তির প্রতি পদার্থের নিশ্চয় নিয়ত কারণ নহে। অনেক স্থলে তদ্বিষয়ে সম্ভাবনাজন্যও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ অনেক স্থলে সেই প্রমাণে প্রামাণ্য-সংশয় হইলেও তজ্জন্য পদার্থবোধের পরে সে বিষয়ে প্রবৃত্তি হওয়ায় পদার্থবোধ ও তন্মূলক প্রবৃত্তির প্রতি প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয়ও নিয়ত কারণ নহে।

বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি ইহা ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, পারলৌকিক ফলের জন্য যে কর্ম্মপ্রবৃত্তি, তাহাতে পূর্ব্বে সেই সমস্ত কর্ম্মবোধক শাস্ত্রের প্রামাণ্য-নিশ্চয় আবশ্যক। কিন্তু ঐহিক ফলের জন্য যে সমস্ত প্রবৃত্তি, তাহাতে পূর্ব্বে প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয় অনাবশ্যক। প্রমাণবিষয়ে কোনরূপ জ্ঞান না থাকিলেও কত জীবের কত বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতেছে। ইহা স্বীকার না করিলে যাঁহারা জয়লাভের ইচ্ছায় প্রমাণের প্রামাণ্য খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই প্রবৃত্তি কিরূপে হইবে? তাঁহাদিগের সেই জয়লাভও ত পূর্ব্বে নিশ্চিত নহে।

বস্তুতঃ যাহাদিগের একজাতীয় প্রমাণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ পদার্থ নিশ্চয়ের পরে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি সফল হইতেছে, তাহাদিগের সেই সমস্ত প্রমাণে প্রামাণ্য-নিশ্চয় হওয়ায় পরে তজ্জাতীয় অন্য প্রমাণেও তজ্জাতীয়ত্ব হেতুর দ্বারা পূর্ব্বেই প্রামাণ্য-নিশ্চয় হয়। অর্থাৎ ইহা যখন সেই সফলপ্রবৃত্তির জনক প্রমাণের সজাতীয়, তখন ইহাও অর্থের অব্যভিচারী, এইরূপে অনুমানপ্রমাণ দ্বারা সেই সমস্ত প্রমাণেও অর্থবত্ত্ব সিদ্ধ হয়। উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্রমাণের দ্বারা অর্থের যথার্থ বোধ হইতেছে এবং সেই যথার্থবোধপ্রযুক্ত প্রবৃত্তি সফল হইতেছে। জীবের সংসার অনাদি। সুতরাং অনাদি কাল হইতেই জীবের ঐরূপ জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি হইতেছে। অতএব উহাদিগের পরম্পরাপেক্ষায় কোন দোষের আশঙ্কা নাই।

প্রমাণের দ্বারা প্রমাণেরও প্রতিপত্তি বা জ্ঞান জন্মে। কিন্তু তাহা প্রবৃত্তির জনক হয় না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"অর্থপ্রতিপত্তৌ"। প্রমাণাভাসের দ্বারাও ভ্রমাত্মক প্রতিপত্তি হয়, তাহা সফল প্রবৃত্তির জনক হয় না। তাই পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—"প্রমাণতঃ"। *

বস্তুতঃ প্রমাণাভাসের দ্বারা ভ্রমজ্ঞান স্থলে সেখানে সেই জ্ঞানের বিষয় অর্থ না থাকায় ভাষ্যকারের মতে তাহা অর্থ-প্রতিপত্তি নহে। "অর্থ্যতেঽসৌ" এইরূপ বুৎপত্তি অনুসারে গ্রহণ অথবা ত্যাগের যোগ্য পদার্থই "অর্থ" শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। প্রমাণ দ্বারাই সেই অর্থের প্রতিপত্তি বা জ্ঞান জন্মে, ইহাই ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন,—"প্রমাণতঃ"। সূত্রকার মহর্ষিও পরে বলিয়াছেন,—"প্রমাণতশ্চার্থ-প্রতিপত্তেঃ"। ৪।২।২৯। তদনুসারেই পরে ভাষ্যকার তাঁহার প্রথমোক্ত ভাষ্যসন্দর্ভের স্বপদবর্ণন** করিতে বলিয়াছেন,—"প্রমাণমন্তরেণ নার্থপ্রতিপত্তিঃ" অর্থাৎ প্রমাণ ব্যতীত অর্থের বোধ হয় না।

---

* ভাষ্যকার "প্রমাণেন" অথবা "প্রমাণাৎ" এইরূপ প্রয়োগ না করিয়া "প্রমাণতঃ" এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন,—"প্রমাণত ইতি তসির্ব্বচন-বিভক্তিব্যাপ্তি-প্রদর্শনার্থঃ"। অর্থাৎ "প্রমাণতঃ" এই প্রয়োগে "তসি" প্রত্যয়ের দ্বারা তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তির সমস্ত বচন প্রদর্শনই উদ্দেশ্য। উহার দ্বারা প্রমাণেন, প্রমাণাভ্যাং, প্রমাণৈঃ, এবং প্রমাণাৎ, প্রমাণাভ্যাং, প্রমাণেভ্যঃ, এই ষট্ পদের অর্থই বিবক্ষিত। পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা প্রমাণের হেতুত্ব সুব্যক্ত করাও উদ্দেশ্য। এবং উক্তরূপ প্রয়োগ দ্বারা এক বিষয়ে অনেক প্রমাণের সংকরও বিবক্ষিত। তৃতীয় সূত্রভাষ্যে ইহা বুঝা যাইবে।

** নিজের উক্ত বাক্যের নিজে ব্যাখ্যা করাই স্বপদবর্ণন। উহা ভাষ্যগ্রন্থের একটি লক্ষণ। পরাশরোপপুরাণে ১৮শ অধ্যায়ে ভাষ্যলক্ষণ কথিত হইয়াছে, "সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ। স্বপদানিচ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ"॥ সূত্রভাষ্য ভিন্ন অন্য ভাষ্যে কেবল স্বপদবর্ণনরূপ ভাষ্যলক্ষণই থাকে। বাচস্পতি মিশ্রও ভাষ্যকারোক্ত প্রথম বাক্যকে আদিভাষ্য বলিয়াছেন।

ভাষ্যকার পরে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত অর্থ কি, তাহা সুব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—"অর্থস্তু সুখং সুখহেতুর্দ্দুঃখং দুঃখহেতুশ্চ"। অর্থাৎ সুখ ও সুখহেতু পদার্থই জীবের গ্রাহ্য পদার্থ এবং দুঃখ ও দুঃখহেতু পদার্থই জীবের ত্যাজ্য পদার্থ। যাহা গ্রাহ্যও নহে, ত্যাজ্যও নহে, এমন পদার্থকে বলে উপেক্ষণীয় পদার্থ। সেই উপেক্ষণীয় পদার্থে গ্রহণেচ্ছাও জন্মে না, ত্যাগেচ্ছাও জন্মে না। সুতরাং তাহাতে প্রবৃত্তিসামর্থ্যের কথা বলা যায় না। তাই ভাষ্যকার গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য পদার্থকেই অর্থ বলিয়াছেন। সেই অর্থের উপলব্ধি বা জ্ঞান জন্মিলে তাহার প্রাপ্তি অথবা ত্যাগের নিমিত্ত ইচ্ছা জন্মে। সেই ইচ্ছাজন্য তদ্বিষয়ে সেই জ্ঞাতা জীবাত্মার প্রযত্ন জন্মে। এই তাৎপর্য্যেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"তস্যেপ্সাজিহাসা-প্রযুক্তস্য"।

ভাষ্যকার পরে সপ্তম সূত্র-ভাষ্যেও এইরূপ "প্রযুক্ত" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সেখানে বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"প্রযুক্ত উৎপাদিতপ্রযত্নঃ"। তাহা হইলে ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত "প্রবৃত্তি" শব্দের অর্থ—সেই প্রযত্নজন্য ব্যাপার, ইহা বুঝা যায়। ভাষ্যকারও পরে এখানে "সমীহা"কে প্রবৃত্তি বলিয়াছেন। চেষ্টার্থ "ঈহ" ধাতুনিষ্পন্ন "সমীহা" শব্দের দ্বারা চেষ্টা বুঝা যায়। কিন্তু এখানে কেবল শারীরিক ক্রিয়ারূপ চেষ্টাই "প্রবৃত্তি" শব্দের অর্থ নহে। বাচিক ও মানসিক ব্যাপারও ঐ "প্রবৃত্তি" শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। "ভাষ্যচন্দ্র" টীকায় রঘূত্তম পণ্ডিতও ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।*

সেই ত্রিবিধ সমীহারূপ প্রবৃত্তির ফলসম্বন্ধ বা সাফল্যকেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"প্রবৃত্তিসামর্থ্য"। "অর্থ" শব্দের প্রয়োজনও একটি অর্থ। যে প্রবৃত্তির প্রয়োজন বা ফল সিদ্ধ হয় না, তাহাকে বলে ব্যর্থা প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে প্রাচীনগণ তাহাকে বলিতেন—সমর্থা প্রবৃত্তি। প্রমাণ দ্বারা অর্থপ্রতিপত্তি হইলে তদ্দ্বারা প্রবৃত্তি সমর্থা হয়, সুতরাং সেখানে

---

* জীবের ইচ্ছাজন্য প্রযত্নরূপ প্রবৃত্তি অর্থেই "প্রবৃত্তি" শব্দের বহু প্রয়োগ হইয়াছে। "কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে (২।১) উদয়নাচার্য্যও সমর্থ প্রবৃত্তির ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—"ইচ্ছাচ প্রবৃত্তেঃ কারণং"। কিন্তু ভাষ্যকার নিজে এখানে সমীহাকেই তাঁহার কথিত প্রবৃত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করায় তাহার উক্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝা যায়। বৈদান্তিক চিৎসুখমুনিও উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"প্রবৃত্তির্নাম পুংসঃ সমীহা চেষ্টা" ইত্যাদি (চিৎসুখী, ২য় পঃ, ২২১ পৃঃ)। ভাষাপরিচ্ছেদে বিশ্বনাথও লিখিয়াছেন,—"প্রবৃত্ত্যাদ্যনুমেয়োঽয়ং"॥ প্রবৃত্তিরত্র চেষ্টা।—"মুক্তাবলী"।

সেই অর্থপ্রতিপত্তিও সমর্থা হয়। সুতরাং তাহাতেও তখন সামর্থ্য থাকে। উহা সার্থকত্ব বা সাফল্যরূপ সামর্থ্য। সমর্থায়া ভাবঃ সামর্থ্যং।

বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর ভাষ্যকারের আদিবাক্যের অন্য ভাবেও কয়েক প্রকার উদ্দেশ্য বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমে অনুমানপ্রমাণের দ্বারা প্রমাণ-পদার্থের প্রামাণ্যসিদ্ধি যে, ভাষ্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহাই সরল ভাবে বুঝা যায়। পরন্তু শূন্যবাদী বৌদ্ধ মাধ্যমক সম্প্রদায় স্বতঃপ্রামাণ্য ও পরতঃপ্রামাণ্য, এই উভয় পক্ষেরই প্রতিবাদ করিয়া প্রমাণ-পদার্থই খণ্ডন করায় মহর্ষি গোতমের মতানুসারে প্রথমে পরতঃপ্রামাণ্য পক্ষ সমর্থন করাও আবশ্যক। "তত্ত্বচিন্তামণি"কার নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও সেই উদ্দেশ্যে "প্রামাণ্যবাদে"র প্রারম্ভে মাধ্যমক সম্প্রদায়ের পূর্ব্বপক্ষই প্রকাশ করিয়াছেন।

ভাষ্যকার অনুমান-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ-পদার্থের প্রামাণ্য সিদ্ধি করিতে যে অর্থবত্ত্বকে সাধ্য ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অর্থের অব্যভিচারিত্ব,—ইহাই বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন। কিন্তু "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" টীকায় পরে (৯৫ পৃঃ) উদয়নাচার্য্য উহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"অর্থাব্যভিচার্য্যনুভবজনকত্বমিত্যর্থঃ"। অর্থাৎ প্রমাণজন্য যে অনুভবরূপ জ্ঞান, তাহা অর্থাব্যভিচারী। সেই জ্ঞানের যে প্রমাত্ব বা যথার্থত্ব, তাহাই অর্থাব্যভিচারিত্ব। উক্তরূপ অনুভবের করণই প্রমাণ-পদার্থ। সুতরাং তাহাতে যে, সেই অনুভবের করণত্বরূপ জনকত্ব থাকে, তাহাই সেখানে সেই প্রমাণপদার্থের অর্থবত্ত্বরূপ প্রামাণ্য। উদয়নাচার্য্য পরেও (১০১ পৃঃ) ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"তত্ত্বং প্রমাণত্বং, অর্থাব্যভিচারি প্রমাসাধনত্বমিতি যাবৎ"। এখানে "প্রমা" শব্দের অর্থ অনুভবরূপ জ্ঞান মাত্র। প্রকাশ টীকাকার বর্দ্ধমানও ইহাই বলিয়াছেন।

ফলকথা, উদয়নাচার্য্যের মতে প্রথমে প্রামাণজন্য সেই জ্ঞানবিশেষে যে অর্থবত্ত্বের অনুমান হইবে, তাহা অর্থাব্যভিচারিত্ব বা যথার্থত্বরূপ প্রমাত্ব। পরে সেই জ্ঞানের করণ সেই পদার্থবিশেষে যে অর্থবত্ত্বের অনুমান হইবে, তাহা সেই অর্থাব্যভিচারী (যথার্থ) অনুভবের করণত্বরূপ জনকত্ব। সেই জ্ঞানবিশেষে অর্থবত্ত্বের অনুমানে হেতু হইবে—সমর্থপ্রবৃত্তিজনকজ্ঞানত্ব এবং অনেক স্থলে তজ্জাতীয়ত্ব। উদয়নাচার্য্য পরে বিচারপূর্ব্বক উক্ত তজ্জাতীয়ত্ব হেতুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অদৃষ্টার্থ বেদবাক্যরূপ শব্দপ্রমাণে উক্তরূপ প্রামাণ্যের অনুমানেও তজ্জাতীয়ত্ব অর্থাৎ দৃষ্টফলমন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি

শাস্ত্রের সজাতীয়ত্বই হেতু হইবে। সেখানে তজ্জাতীয়ত্বের ফলিতার্থ,—আপ্তপুরুষ-প্রণীতত্ব। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের শেষ সূত্রে বেদের প্রামাণ্যানুমানে মহর্ষি গৌতম নিজেই উক্তরূপ হেতুর সূচনা করিয়াছেন। তদ্দ্বারাও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি পরতঃপ্রামাণ্যবাদী। তাঁহার মতে বেদ স্বতঃপ্রমাণ নহে। কিন্তু বেদের প্রামাণ্য অনুমান-প্রমাণসিদ্ধ। পরে প্রমাণ-পদার্থের ব্যাখ্যায় এবং বেদের প্রামাণ্য বিচারে অন্যান্য কথা পাওয়া যাইবে এবং সকল কথা পরিস্ফুট হইবে।

আশঙ্কা হইতে পারে যে, ভাষ্যকারোক্ত সুখ-দুঃখাদিরূপ অর্থ যদি জীবের স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে সকল জীবের পক্ষেই উহা তুল্য হয়। উহা স্বাভাবিক না হইলে কাল্পনিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এ জন্য ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—"সোহয়ং প্রমাণার্থঃ" ইত্যাদি। এখানে "অর্থ" শব্দের অর্থ প্রয়োজন। ব্যাখ্যান্তর খণ্ডন করিয়া বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর নিজ মতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রমাণের প্রয়োজন সুখদুঃখাদি পরিসংখ্যেয় নহে অর্থাৎ উহার নিয়ম করা যায় না। যাহা একের সুখহেতু, তাহা সকল জীবেরই সুখহেতু, ইহা বলা যায় না। যাহা কাহারও সুখহেতু, তাহা অপরের দুঃখহেতু হয়। সুখদুঃখাদি স্বাভাবিক না হইলেও কাল্পনিক নহে, কিন্তু উহা নৈমিত্তিক। জীবের অনাদিকাল-সঞ্চিত সংস্কাররূপ নিমিত্তের ভেদ বা বৈচিত্র্যবশতঃই সুখ-দুঃখাদির বৈচিত্র্য হয়। যাহা অনিয়ত কারণজন্য, তাহা অনিয়ত, অর্থাৎ তাহার কোন নিয়ম নাই, ইহা অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ।

বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের "প্রমাণং অর্থবৎ"—এই বাক্যকে দ্ব্যর্থ বলিয়া, দ্বিতীয় পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—প্রমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনবিশিষ্ট। তাই মহর্ষি সর্ব্বাগ্রে প্রমাণেরই উল্লেখ করিয়াছেন। এই পক্ষে প্রয়োজন-বোধক অর্থ শব্দের উত্তর অতিশায়ন অর্থে মতুপ্ প্রত্যয়ে "অর্থবৎ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত হেতুর দ্বারা প্রমাণপদার্থের তাদৃশ প্রয়োজনবত্তাও সিদ্ধ হয়।

ভাষ্য। অর্থবতি চ প্রমাণে প্রমাতা-প্রমেয়ং-প্রমিতিরিত্যর্থ-বন্তি ভবন্তি। কস্মাৎ? অন্যতমাপায়েঽর্থস্যানুপপত্তেঃ। তত্র যস্যেপ্সাজিহাসাপ্রযুক্তস্য প্রবৃত্তিঃ, স প্রমাতা। স যেনার্থং প্রমিণোতি, তৎ প্রমাণং। যোঽর্থঃ প্রমীয়তে, তৎ প্রমেয়ম্।

যদর্থবিজ্ঞানং, সা প্রমিতিঃ। চতসৃষ্বেবম্বিধাসু তত্ত্বং পরিসমাপ্যতে।*

অনুবাদ—প্রমাণ অর্থের অব্যভিচারী হওয়াতেই প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমিতি, ইহারা সমীচীনার্থ হয় অর্থাৎ অর্থের অব্যভিচারী হয়। পক্ষান্তরে প্রমাণ সমধিক প্রয়োজনবিশিষ্ট হওয়াতে "প্রমাতা", "প্রমেয়", "প্রমিতি" ইহারা সেইরূপ প্রয়োজনবিশিষ্ট হয়। [প্রশ্ন] কেন? [উত্তর] যে হেতু অন্যতমের অর্থাৎ প্রমাণের অভাবে অর্থের যথার্থ বোধ হয় না। তন্মধ্যে প্রাপ্তির ইচ্ছা ও ত্যাগের ইচ্ছায় "প্রযুক্ত" অর্থাৎ কৃতযত্ন যে পুরুষের প্রবৃত্তি হয়, সেই পুরুষ বা জীব "প্রমাতা"। সেই প্রমাতা যাহার দ্বারা পদার্থকে যথার্থরূপে জানে, তাহা "প্রমাণ"। যে পদার্থ যথার্থ জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা "প্রমেয়"। পদার্থবিষয়ক যে যথার্থ জ্ঞান, তাহা "প্রমিতি"। এইরূপ অর্থাৎ পদার্থের অব্যভিচারী চারিটি প্রকার [প্রমাণ, প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমিতি] থাকাতে তত্ত্ব পরিসমাপ্ত হইতেছে, [অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা তত্ত্ব বুঝিয়া, তাহা গ্রাহ্য মনে হইলে গ্রহণ করিতেছে, ত্যাজ্য মনে হইলে ত্যাগ করিতেছে, উপেক্ষণীয় মনে হইলে উপেক্ষা করিতেছে। গ্রহণ, ত্যাগ ও উপেক্ষার দ্বারাই তত্ত্বের পর্য্যবসান হইতেছে]।

টিপ্পনী—ভাষ্যকার আদিভাষ্যে প্রমাণকেই অর্থের অব্যভিচারী বলিয়াছেন। ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে, ভাষ্যকারের যুক্তি অনুসারে "প্রমাতা", "প্রমেয়" এবং "প্রমিতি" এই তিনটিও ত অর্থের অব্যভিচারী, ভাষ্যকার তাহা বলেন নাই কেন? এই আশঙ্কা নিরাসের জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"অর্থবতি চ প্রমাণে" ইত্যাদি। উক্ত বাক্যে "চ" শব্দের অর্থ অবধারণ। "অর্থবতি চ" অর্থবত্যেব। ভাষ্যকারের কথা এই যে, প্রমাণ অর্থের অব্যভিচারী বলিয়াই প্রমাতা, প্রমেয় এবং প্রমিতি, ইহারাও অর্থের অব্যভিচারী হয়; কেন না, প্রমাণ ব্যতিরেকে পদার্থের যথার্থ বোধ হয় না। প্রমাণ দ্বারা যথার্থ বোধ হইলেই সেখানে "প্রমাতা", "প্রমেয়" এবং "প্রমিতি" থাকে। এজন্য তাহারাও অর্থের অব্যভিচারী হয়। সুতরাং উহাদিগের মধ্যে প্রমাণই প্রধান, তাই তাহাকেই আদিভাষ্যে অর্থের অব্যভিচারী বলিয়াছি এবং তাহাতেই "প্রমাতা",

---

* অনেক ভাষ্যপুস্তকেই এখানে "অর্থতত্ত্বং পরিসমাপ্যতে" এইরূপ পাঠই আছে। কিন্তু পরে ভাষ্যকারের "কিং পুনস্তত্ত্বং?" এই প্রশ্নভাষ্য দেখিলে বুঝা যায়, ভাষ্যকার পূর্ব্বে কেবল "তত্ত্বং পরিসমাপ্যতে" এইরূপ সন্দর্ভই বলিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টের "ন্যায়মঞ্জরী"তেও উক্তরূপ সন্দর্ভই দেখা যায়। কোন ভাষ্যপুস্তকেও উক্তরূপ পাঠই আছে।

"প্রমেয়" ও "প্রমিতি"কে প্রমাণের ন্যায় অর্থের অব্যভিচারী বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ভাষ্যে "অর্থবত্তি" এই স্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় নিত্যযোগ অর্থে মতুপ্ প্রত্যয় বুঝিতে হইবে। কেহ বলেন, ঐ স্থলে প্রাশস্ত্যার্থে "মতুপ্" প্রত্যয় বিহিত। প্রমাতা প্রভৃতি অর্থবান্ হয়, কি না—সমীচীনার্থ হয়। ইহাতেও ফলে অর্থের অব্যভিচারী হয়, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ হইবে। আদিভাষ্যে পক্ষান্তরে প্রমাণ সমধিক প্রয়োজনবিশিষ্ট, ইহা বলা হইলে, সে পক্ষেও এখানে "অর্থবত্তি" এই স্থলেও "অর্থ" শব্দের প্রয়োজনার্থ বুঝিতে হইবে এবং অতিশায়নার্থে মতুপ্ প্রত্যয় বুঝিতে হইবে। "পক্ষান্তরে" বলিয়া অনুবাদে সেই অর্থও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রমাণ, তত্ত্বজ্ঞানাদি সম্পাদন দ্বারা জীবের প্রয়োজন বিষয়ে সমর্থ বলিয়া সমধিক প্রয়োজনবিশিষ্ট হওয়াতেই প্রমাতা প্রভৃতিও ঐরূপ প্রয়োজনবিশিষ্ট হয়।

ভাষ্যে "অন্যতমাপায়ে" এই স্থলে "অন্যতম" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রমাণাদি চারিটিকেই বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্রকরণানুসারে এখানে উহার দ্বারা প্রথমোক্ত "অন্যতম" প্রমাণকেই বুঝিতে হইবে। কারণ, প্রমাতা প্রভৃতি হইতে প্রমাণের বিশেষ প্রদর্শনই এখানে ভাষ্যকারের উদ্দেশ্য। প্রমাণের প্রাধান্য সমর্থনের জন্যই ভাষ্যকার ঐ হেতু বলিয়াছেন। সুতরাং "অন্যতম" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত "প্রমাণ"রূপ বিশেষ অর্থই এখানে ভাষ্যকারের বুদ্ধিস্থ।

প্রমাণের দ্বারা তত্ত্ব বুঝিয়া, তাহা যদি সুখসাধন বলিয়া বুঝে, তবে গ্রহণ করে; কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ গ্রহণ করিতে না পারিলেও গ্রহণের যোগ্যতা থাকে। দুঃখসাধন বলিয়া মনে হইলে তাহা ত্যাগ করে, কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ ত্যাগ করিতে না পারিলেও তাহাতে ত্যাগের যোগ্যতা থাকে এবং সুখসাধনও নহে, দুঃখসাধনও নহে, ইহা বুঝিলে তাহা উপেক্ষা করে। প্রমাণের দ্বারা তত্ত্ব বুঝিয়া তত্ত্বের এই পর্য্যন্তই হয়। সুতরাং গ্রহণ বা গ্রহণযোগ্যতা এবং ত্যাগ বা ত্যাগযোগ্যতা এবং উপেক্ষাই তত্ত্বের পরিসমাপ্তি, উহাই তত্ত্বের পর্য্যবসান। প্রমাণাভাসের দ্বারা ভ্রম বোধ হইলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গ্রহণাদি হয় বটে, কিন্তু সে গ্রহণাদি তত্ত্বের পর্য্যবসান নহে। কারণ, প্রমাণাভাসের দ্বারা তত্ত্বের বোধ হয় না; সুতরাং সেখানে তত্ত্বের গ্রহণাদি হয় না। তত্ত্বের গ্রহণাদিতে প্রমাণ, প্রমাতা, প্রমেয়

এবং প্রমিতি, এই চতুর্ব্বর্গ আবশ্যক। ঐ চারিটি থাকাতেই পূর্ব্বোক্ত প্রকার তত্ত্বপরিসমাপ্তি হইতেছে।

ভাষ্য। কিং পুনস্তত্ত্বং ? সতশ্চ সদ্ভাবোঽসতশ্চাসদ্ভাবঃ। সৎ সদিতি গৃহ্যমাণং যথাভূতমবিপরীতং তত্ত্বং ভবতি। অসচ্চাসদিতি গৃহ্যমাণং যথাভূতমবিপরীতং তত্ত্বং ভবতি।

অনুবাদ—(প্রশ্ন) তত্ত্ব কি? অর্থাৎ পূর্ব্বে যে তত্ত্বের পরিসমাপ্তির কথা বলা হইল, সে তত্ত্বটি কি? (উত্তর) সৎ পদার্থের সদ্ভাব এবং অসৎ পদার্থের অসদ্ভাব। বিশদার্থ এই যে, "সৎ" অর্থাৎ ভাব পদার্থ "সৎ" এইরূপে অর্থাৎ "ভাব" এইরূপে, যথাভূত, কি না—অবিপরীতভাবে জ্ঞায়মান হইয়া তত্ত্ব হয়। এবং 'অসৎ' অর্থাৎ অভাব পদার্থ অসৎ এইরূপে অর্থাৎ অভাব এইরূপে, যথাভূত, কি না—অবিপরীতভাবে জ্ঞায়মান হইয়া তত্ত্ব হয়।

টিপ্পনী—শ্রোতৃবর্গের অবধান এবং বিশদবোধের জন্য স্বয়ং প্রশ্নপূর্ব্বক উত্তর দেওয়াই প্রাচীনদিগের রীতি ছিল। তাই ভাষ্যকার তাঁহার পূর্ব্বকথিত তত্ত্ব কি, ইহা বলিবার জন্য নিজেই এখানে প্রশ্ন করিয়াছেন,—কিং পুনস্তত্ত্বং ?—

"তস্য ভাবঃ" এই অর্থে "তত্ত্ব" শব্দটি নিষ্পন্ন। ঐ "তত্ত্ব" শব্দের অন্তর্গত "তৎ" শব্দটির প্রতিপাদ্য "সৎ" ও "অসৎ" পদার্থ। "সৎ" বলিতে ভাব পদার্থ, "অসৎ" বলিতে সৎ ভিন্ন অর্থাৎ ভাব ভিন্ন পদার্থ। ভাব পদার্থ ভিন্ন পদার্থকেই অভাব পদার্থ বলে। "নাস্তি" এইরূপে বোধের বিষয় হয় বলিয়াই অভাব পদার্থকে "অসৎ" পদার্থ বলা হয়। "অসৎ" বলিতে এখানে অলীক নহে। যাহার কোন সত্তাই নাই, যাহা অলীক, তাহা পদার্থ হইতে পারে না। যাহা প্রমাণসিদ্ধ, তাহাই পদার্থ। তাহা "ভাব" ও "অভাব" এই দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রমাণ যাহাকে ভাব পদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করে, তাহাই ভাব পদার্থ। যাহাকে অভাব বলিয়া প্রতিপন্ন করে, তাহা অভাব পদার্থ। ভাব পদার্থে যে ভাবসাধক প্রমাণের বিষয়ত্ব আছে, তাহাই উহার "সদ্ভাব" বা ভাবত্ব। অভাব পদার্থে যে অভাবসাধক প্রমাণের বিষয়ত্ব আছে, তাহাই উহার "অসদ্ভাব" বা অভাবত্ব। ঐ "সদ্ভাব"ই সৎপদার্থের তত্ত্ব এবং ঐ "অসদ্ভাব"ই অসৎ পদার্থের তত্ত্ব এবং উহাই যথাক্রমে ভাব ও অভাব পদার্থের স্বরূপ। উহার বিপরীতরূপে ভাব ও অভাব বুঝিলে সেখানে ভাব ও অভাবের তত্ত্ব বুঝা হয় না। ভাষ্যে "সৎ ইতি" এবং "অসৎ ইতি" এই দুই স্থলে "ইতি"

শব্দের প্রকার অর্থ। অর্থাৎ সৎ পদার্থকে "সৎ" এই প্রকারে এবং অসৎ পদার্থকে "অসৎ" এই প্রকারে বুঝিলেই তত্ত্ব বুঝা হয়।

ফল কথা, যে পদার্থের যেটি প্রকৃত ধর্ম্ম, তাহাই তাহার তত্ত্ব, সেইরূপে সেই পদার্থ জ্ঞায়মান হইলে সেই পদার্থকেও তত্ত্ব বলা হয়; প্রাচীনগণ তাহাও বলিয়াছেন। এখানে ভাষ্যকারও প্রথমতঃ ভাব ও অভাব পদার্থের প্রমাণসিদ্ধ ভাবত্ব ও অভাবত্বকে তত্ত্ব বলিয়া, শেষে ঐ ভাব ও অভাব পদার্থকেও "তত্ত্ব" বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ভাবত্ব ও অভাবত্ব রূপ প্রকৃত ধর্ম্মরূপে জ্ঞায়মান হইলেই ভাব ও অভাব সেখানে তত্ত্ব হইবে। অভাবত্বরূপে ভাব পদার্থ জ্ঞায়মান হইলে অথবা ভাবত্বরূপে অভাব পদার্থ জ্ঞায়মান হইলে সেখানে উহা তত্ত্ব হইবে না, এই কথা বলিবার জন্যই প্রথমতঃ ভাষ্যকার ভাব ও অভাবের প্রকৃত ধর্ম্মরূপ তত্ত্বটি বলিয়াছেন। ঐরূপ অন্যান্য বিশেষ বিশেষ ভাব পদার্থ এবং বিশেষ বিশেষ অভাব পদার্থেরও যাহার যেটি প্রমাণসিদ্ধ প্রকৃত ধর্ম্ম, সেইরূপে তাহারা জ্ঞায়মান হইলেই তত্ত্ব হইবে, ইহা ভাষ্যকারের মূল বক্তব্য। ভাষ্যে "সতশ্চ" এবং "অসতশ্চ" এই দুই স্থলে দুইটি "চ" শব্দের দ্বারা পদার্থত্বরূপে ভাব ও অভাব, এই দ্বিবিধ পদার্থই প্রধান, ইহা সূচিত হইয়াছে। উহাদিগের মধ্যে কেহ অপ্রধান নহে। ভাব পদার্থের ন্যায় অভাবও স্বতন্ত্র পদার্থ। পরে ইহা প্রতিপন্ন হইবে।

ভাষ্যে "যথাভূতমবিপরীতং" এই স্থলে "অবিপরীতং" এই পদটি "যথাভূতং" এই পূর্ব্ব-পদেরই ব্যাখ্যা। প্রাচীন ভাষ্যাদি গ্রন্থে এইরূপ স্বপদবর্ণন এবং অনুব্যাখ্যা হইয়াছে। স্বপদবর্ণন ভাষ্যের একটি লক্ষণ, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

ভাষ্য। কথমুত্তরস্য প্রমাণেনোপলব্ধিরিতি? সত্যুপলভ্যমানে তদনুপলব্ধেঃ প্রদীপবৎ। যথা দর্শকেন দীপেন দৃশ্যে গৃহ্যমাণে তদিব যন্ন গৃহ্যতে তন্নাস্তি, যদ্যভবিষ্যদিদমিব ব্যজ্ঞাস্যত, বিজ্ঞানাভাবান্নাস্তীতি।

এবং প্রমাণেন সতি গৃহ্যমাণে তদিব যন্ন গৃহ্যতে তন্নাস্তি, যদ্যভবিষ্যদিদমিব ব্যজ্ঞাস্যত, বিজ্ঞানাভাবান্নাস্তীতি। তদেবং সতঃ প্রকাশকং প্রমাণমসদপি প্রকাশয়তীতি। সচ্চ খলু ষোড়শধা ব্যূঢ়মুপদেক্ষ্যতে।

অনুবাদ—(প্রশ্ন) উত্তরটির অর্থাৎ ভাব ও অভাব নামে যে দ্বিবিধ তত্ত্ব বলা হইল, তন্মধ্যে শেষোক্ত অভাবের প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয় কিরূপে ? (উত্তর) যে হেতু যেমন প্রদীপের দ্বারা সৎ পদার্থ উপলভ্যমান হইলে তাহার অর্থাৎ যে পদার্থটি সেখানে নাই, সেই পদার্থটির উপলব্ধি হয় না। বিশদার্থ এই যে—যেমন কোন দর্শক কর্তৃক প্রদীপের দ্বারা দৃশ্য পদার্থ জ্ঞায়মান হইলে, তখন তাহার ন্যায় যাহা জ্ঞায়মান হয় না, তাহা নাই, যদি থাকিত, (তাহা হইলে) ইহার ন্যায় অর্থাৎ এই দৃশ্যমান পদার্থের ন্যায় জ্ঞানের বিষয় হইত, তদ্বিষয়ে জ্ঞান না হওয়াতে (তাহা) নাই, অর্থাৎ দর্শক ব্যক্তি প্রদীপের সাহায্যে এইরূপে অভাবের উপলব্ধি করে।

এইরূপ প্রমাণের দ্বারা কোন ভাব পদার্থ জ্ঞায়মান হইলে, তখন তাহার ন্যায় যাহা জ্ঞানের বিষয় হয় না, তাহা নাই। যদি থাকিত, (তাহা হইলে) ইহার ন্যায় অর্থাৎ সেই জ্ঞায়মান ভাব পদার্থটির ন্যায় জ্ঞানের বিষয় হইত, জ্ঞান না হওয়াতে (তাহা) নাই, অর্থাৎ এইরূপে প্রমাণের দ্বারা অভাবেরও উপলব্ধি করে। অতএব এইরূপে (প্রদীপের ন্যায়) ভাব পদার্থের প্রকাশক প্রমাণ অভাব পদার্থকেও প্রকাশ করে। ভাবপদার্থও (প্রথম সূত্রে) ষোড়শ প্রকারেই সংক্ষেপে বলিবেন।

টিপ্পনী—যাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে, তাহাকে পদার্থ বা তত্ত্ব বলা যায় না। অভাবকে তত্ত্ব বলিলে তাহা প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া বুঝাইতে হইবে। কিন্তু অভাবের প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হইবে কিরূপে ? যাহা অভাব, তাহার কি কোন প্রমাণ থাকিতে পারে ? অনেক সম্প্রদায় তাহা মানেন নাই। এজন্য ভাষ্যকার নিজেই প্রশ্নপূর্ব্বক প্রমাণের দ্বারা যে অভাবেরও উপলব্ধি হয়, তাহা বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যকারের কথা এই যে, অভাব প্রমাণসিদ্ধ। যে প্রমাণ ভাব পদার্থকে প্রকাশ করিতেছে, সেই প্রমাণ বা তজ্জাতীয় প্রমাণই অভাব পদার্থকেও প্রকাশ করিতেছে। অভাব বুঝিতে আর কোন প্রমাণ আবশ্যক হয় না। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে প্রদীপকে প্রমাণের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, প্রদীপ সর্ব্বলোকসিদ্ধ। সাধারণ লোকেও প্রদীপের দ্বারা ভাবের ন্যায় অভাবেরও নির্ণয় করে। গৃহ হইতে তস্কর বহির্গত হইলে বালকও প্রদীপের সাহায্যে কোন্‌টি আছে এবং কোন্‌টি নাই, ইহা বুঝিয়া থাকে। যাহা থাকে, তাহাই দেখে ; যাহা থাকে না, তাহা দেখে না ; তখন তাহা "নাই" বলিয়াই বুঝে। এই "নাই" বলিয়া যে বুঝা, ইহাই অভাবের

বোধ। এ বোধ সকলেরই হইতেছে। সুতরাং এই বোধের অবশ্য বিষয় আছে। ঐ বোধের যাহা বিষয়, তাহারই নাম অভাব পদার্থ। যাহা যথার্থ বোধের বিষয়, তাহাকে পদার্থ বলিতেই হইবে, কোন প্রমাণসিদ্ধ বলিতেই হইবে। "নাই" বলিয়া যত বোধ হয়, সবগুলিই ভ্রম বলা যাইবে না। বস্তুতঃ ভাবের ন্যায় অভাবেরও যথার্থ বোধ হইতেছে। তবে অভাব ভাবপরতন্ত্র, সুতরাং ভাষ্যোক্ত প্রকার ভিন্ন অন্য প্রকারে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। আমরা ঘটাদি ভাব পদার্থ দেখিয়া সেখানে তজ্জাতীয় অর্থাৎ আমাদিগের ঐরূপ পরিচিত অন্য পদার্থ না দেখিলেই বুঝি, এখানে তাহা নাই, থাকিলে অবশ্যই দেখিতাম। কারণ, দেখিবার অন্য কোন কারণের এখানে অভাব নাই। ফলকথা, প্রদীপের ন্যায় ভাব পদার্থের প্রকাশক প্রমাণই সেখানে অভাব পদার্থকেও প্রকাশ করে।—অভাব প্রমাণসিদ্ধ; সুতরাং অভাবকে "তত্ত্ব" বলিতেই হইবে।

অভাব প্রমাণসিদ্ধ তত্ত্ব হইলে মহর্ষি গোতম কেন তাহার উল্লেখ করেন নাই, তাঁহার প্রথম সূত্রোক্ত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে ত "অভাব" নাই? এই আশঙ্কা হইতে পারে। এ জন্য ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন,—"সচ্চ খলু ষোড়শধা ব্যূঢ়মুপদেক্ষ্যতে"। বার্ত্তিককার প্রথম কল্পে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে অভাব পদার্থের স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ ভাব পদার্থ ব্যতিরেকে জ্ঞান হয় না, এ জন্য মহর্ষি অভাব পদার্থের পৃথক উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ভাব পদার্থ বলাতেই অভাব পদার্থও বুঝা যায়। এ পক্ষে ভাষ্যে "সচ্চ খলু" এই সন্দর্ভে "চ" শব্দ ও "খলু" শব্দের দ্বারা সৎ পদার্থেরই স্পষ্ট অবধারণ করা হইয়াছে। "সচ্চ খলু" সদেব খলু অর্থাৎ ভাব পদার্থই সংক্ষেপে ষোড়শ প্রকারে উক্ত হইবে, ইহাই ভাষ্যার্থ। ভাষ্যে "ব্যূঢ়ং" এই পদের ব্যাখ্যা সংক্ষেপতঃ। "ব্যূহঃ সংক্ষেপঃ"—বার্ত্তিক।

কিন্তু বার্ত্তিককার পরেই আবার দ্বিতীয় কল্পে বলিয়াছেন যে, অথবা অভাব পদার্থও উক্ত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র ঐ কথার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "অথবা কথিতা এব যেষাং তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সোপযোগি, যেতু ন তথা, ন তেষাং প্রপঞ্চোঽনুপযুক্তভাবপ্রপঞ্চ ইব বক্তব্যঃ"। অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ মোক্ষোপযোগী, সেই সমস্ত পদার্থই কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অভাব পদার্থও আছে। মোক্ষের অনুপযোগী অনেক ভাব পদার্থ যেমন কথিত হয় নাই, তদ্রূপ সেই সমস্ত অভাব পদার্থও কথিত হয় নাই।

বাচস্পতি মিশ্রের মতেও বার্ত্তিককারের দ্বিতীয় পক্ষই প্রকৃতার্থ। এ পক্ষে পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যসন্দর্ভে "চ" শব্দের অর্থ সমুচ্চয়। "খলু" শব্দের অর্থ অবধারণ। "সচ্চ" সদপি, "ষোড়শধা খলু" ষোড়শধৈব—এইরূপে ভাষ্য ব্যাখ্যা করিলে বুঝা যায়, সৎপদার্থও অর্থাৎ ভাবপদার্থও সংক্ষেপে ষোড়শ প্রকারেই বলিয়াছেন। অর্থাৎ "সচ্চ" এই স্থলে "চ" শব্দের দ্বারা অভাবেরও সমুচ্চয় হইয়াছে। তাহা হইলে বুঝা যায়, মহর্ষি ভাবপদার্থ বলিতে যাইয়া অভাব পদার্থও বলিয়াছেন। ভাবপদার্থও সেই সেই ব্যক্তিস্বরূপে বলা অসম্ভব, সবগুলি মোক্ষোপযোগীও নহে,—এ জন্য ষোড়শ প্রকারে সংক্ষেপে বলিয়াছেন। সেই ষোড়শ পদার্থের বিশেষ বিভাগে নিঃশ্রেয়সের উপযোগী অভাব পদার্থগুলিও তিনি বলিয়াছেন। যেমন প্রমেয়ের মধ্যে "অপবর্গ" অভাবপদার্থ। প্রয়োজনের মধ্যে দুঃখাভাব অভাব পদার্থ। এইরূপ আরও অনেক অভাব পদার্থ তিনি বলিয়াছেন। "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" টীকায় উদয়নাচার্য্য তাহা বিশদরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

বস্তুতঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় আহ্নিকে মহর্ষি গোতম নিজেই অভাব পদার্থও যে প্রমাণসিদ্ধ তত্ত্ব, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। আব কণাদোক্ত দ্রব্যাদি পদার্থও যে. তাঁহার সম্মত, ইহাও পরে (নবমসূত্রভাষ্যে) ভাষ্যকার বলিয়াছেন। ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গোতম প্রথম সূত্রে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থেরই উল্লেখ করায় তিনি যে ষোড়শপদার্থমাত্রবাদী, অর্থাৎ তাঁহার মতে জগতে আর কোন পদার্থ নাই, ইহা কিন্তু সত্য নহে। মহর্ষি গোতম নিঃশ্রেয়সের উপযোগী ষোড়শ পদার্থই সংক্ষেপে বলিয়াছেন। কারণ, উক্ত ষোড়শ পদার্থই তাঁহার ন্যায়দর্শনের প্রতিপাদ্য। তিনি প্রথম সূত্রে পদার্থের কোন সংখ্যা-নিয়মও প্রকাশ করেন নাই। যাহা প্রমাণসিদ্ধ হইবে, তাহাই তাঁহার মতে পদার্থ। তাই গোতমমত ব্যাখ্যাতা নৈয়ায়িকসম্প্রদায়কে "অনিয়তপদার্থবাদী" বলা হইয়াছে। "ন্যায়লীলাবতী"কার বৈশেষিক বল্লভাচার্য্যও বলিয়া গিয়াছেন,—"নৈয়ায়িকানামনিয়তপদার্থবাদিত্বেন বিরোধাভাবাৎ।"—৭২২ পৃঃ।

ভাষ্য। তাসাং খল্বাসাং সদ্বিধানাং

সূত্র। প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-
-দৃষ্টান্ত - সিদ্ধান্তাবয়ব - তর্ক - নির্ণয়-বাদ-জল্প-

বিতণ্ডা-হেত্বাভাসচ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—সেই অর্থাৎ মোক্ষোপযোগী এই ভাব পদার্থেরই প্রকার—(১) প্রমাণ, (২) প্রমেয়, (৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) অবয়ব, (৮) তর্ক, (৯) নির্ণয়, (১০) বাদ, (১১) জল্প, (১২) বিতণ্ডা, (১৩) হেত্বাভাস, (১৪) ছল, (১৫) জাতি ও (১৬) নিগ্রহস্থানের অর্থাৎ এই ষোল প্রকার পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত নিঃশ্রেয়স লাভ হয়।

টিপ্পনী—যে সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় নিঃশ্রেয়সের উপযোগী, সেই ভাবপদার্থের ষোলটি প্রকার মহর্ষি প্রথম সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। ভাষ্যকারও পূর্ব্বভাষ্যে এই ষোড়শ প্রকার ভাবপদার্থের উপদেশের কথাই বলিয়াছেন। এখন মহর্ষিসূত্রের উল্লেখপূর্ব্বক তাহা দেখাইবার জন্য "তাসাং খল্বাসাং সদ্বিধানাং"—এই সন্দর্ভের দ্বারা প্রথম সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ঐ সন্দর্ভের সহিত সূত্রস্থ ষষ্ঠীবিভক্ত্যন্ত বাক্যের যোজনা ভাষ্যকারের অভিপ্রেত। স্ত্রীলিঙ্গ "বিধা" শব্দের অর্থ এখানে প্রকার। সূত্রস্থ প্রমাণাদি নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত ষোড়শ পদার্থ "সদ্‌বিধা" অর্থাৎ ভাবপদার্থের প্রকার। এবং ঐ প্রকারগুলি সকলেই সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় মোক্ষোপযোগী। ভাষ্যকার "তাসাং খলু" এই কথার দ্বারা ইহাই সূচনা করিয়াছেন। "তাসাং খলু"—তাসামেব। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে মোক্ষোপযোগী ভাবপদার্থ ষোড়শ প্রকারে সংক্ষেপে বলিবেন, ইহা বলিয়াছি, সেই মোক্ষোপযোগী ভাবপদার্থের প্রকারগুলিই এই। এখানেই সূত্রের উল্লেখপূর্ব্বক সেইগুলি দেখাইয়াছেন, তাই আবার বলিয়াছেন,—"আসাং"। "আসাং সদ্বিধানাং"।

ভাষ্য। নির্দ্দেশে যথাবচনং বিগ্রহঃ। সর্ব্বপদার্থপ্রধানো দ্বন্দ্ব সমাসঃ।* প্রমাণাদীনাং তত্ত্বমিতি শৈষিকী ষষ্ঠী। তত্ত্বস্য জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সস্যাধিগম ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠ্যৌ। ত এতাবন্তো

* বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর এখানে "সর্ব্বপদার্থ" ইত্যাদি পাঠেরই উল্লেখপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করায় এবং টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও ঐ পাঠই গ্রহণ করায় উহাই প্রাচীন বা প্রকৃত পাঠ বলিয়া গ্রাহ্য। কিন্তু পরে মুদ্রিত অনেক ভাষ্যপুস্তকেও এখানে "চার্থে দ্বন্দ্বঃ সমাস" এই পাঠান্তরই গৃহীত হইয়াছে।

বিদ্যমানার্থাঃ। এষামবিপরীতজ্ঞানার্থমিহোপদেশঃ। সোহয়মনবয়বেন তন্ত্রার্থ উদ্দিষ্টো বেদিতব্যঃ।

অনুবাদ—"নির্দ্দেশে" অর্থাৎ পরবর্ত্তী প্রমাণাদি পদার্থের লক্ষণসূত্র ও বিভাগ-সূত্রে যেরূপ বচন (একবচন, বহুবচন) আছে, তদনুসারে (এই সূত্রে) বিগ্রহ অর্থাৎ দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যাসবাক্য করিতে হইবে। সর্ব্বপদার্থপ্রধান দ্বন্দ্ব সমাস। প্রমাণাদির তত্ত্ব, এই স্থলে শৈষিকী ষষ্ঠী অর্থাৎ সম্বন্ধে ষষ্ঠী। তত্ত্বের জ্ঞান, নিঃশ্রেয়সের অধিগম এই দুই স্থলে (বিগ্রহবাক্যে) দুই ষষ্ঠী কর্ম্মে বিহিত। সেই এতগুলি অর্থাৎ ষোড়শ প্রকার সৎপদার্থ। ইহাদিগের যথার্থ জ্ঞানের জন্য এই সূত্রে উপদেশ হইয়াছে। সেই এই "তন্ত্রার্থ" অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য পদার্থগুলি এই সূত্রে সম্পূর্ণরূপে উদ্দিষ্ট অর্থাৎ নামোল্লেখে কীর্ত্তিত জানিবে। (ভাষ্যে "অনবয়বেন" অনংশেন সাকল্যেন ইত্যর্থঃ)।

টিপ্পনী—প্রথম সূত্রের অর্থ বুঝিতে প্রথমতঃ কি সমাস, তাহা বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"সর্ব্বপদার্থপ্রধানো দ্বন্দ্বঃ সমাসঃ। দ্বন্দ্ব সমাস স্থলে সকল পদার্থই প্রধান থাকে। অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সবগুলি পদার্থই প্রধানরূপে বুদ্ধির বিষয় হয়। এখানে বহুব্রীহি বা কর্ম্মধারয় হইলে অর্থসিদ্ধিও হয় না। ষষ্ঠীতৎপুরুষ হইলেও হয় না। পরন্তু তাহাতে সর্ব্বশেষবর্ত্তী "নিগ্রহস্থানে"রই প্রাধান্য হয়; সুতরাং দ্বন্দ্বসমাসই এখানে বুঝিতে হইবে। দ্বন্দ্ব সমাস হইলে তাহার ব্যাসবাক্য কিরূপ হইবে? "প্রমাণানি চ প্রমেয়াণি চ" ইত্যাদি প্রকারে হইবে, অথবা "প্রমাণঞ্চ প্রমেয়ঞ্চ" ইত্যাদি প্রকারে হইবে, এতদুত্তরে ভাষ্যকার পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, প্রমাণাদি পদার্থের নির্দ্দেশসূত্রে অর্থাৎ পরে যে সকল সূত্রের দ্বারা প্রমাণাদি পদার্থের লক্ষণ অথবা বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল সূত্রে যেরূপ বচন প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার প্রয়োগ করিয়াই ব্যাসবাক্য করিতে হইবে। প্রমাণ-বিভাগসূত্রে (তৃতীয় সূত্রে) "প্রমাণানি" এইরূপ প্রয়োগ আছে, সুতরাং এই সূত্রে দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যাসবাক্যে "প্রমাণানি" এইরূপই প্রয়োগ করিতে হইবে। এবং প্রমেয়-বিভাগসূত্রে (নবম সূত্রে) "প্রমেয়ং" এইরূপ প্রয়োগ থাকায়, ব্যাসবাক্যে ঐরূপই প্রয়োগ করিতে হইবে। এইরূপ সংশয়সূত্র প্রভৃতি লক্ষণসূত্রে যেখানে একবচন আছে, ব্যাসবাক্যে সেই সব স্থলে একবচনেরই প্রয়োগ করিতে হইবে। অন্যত্রও ঐরূপ সূত্রনির্দ্দিষ্ট বচনই প্রয়োগ করিতে হইবে। জয়ন্ত ভট্টও ঐরূপই

বলিয়াছেন। প্রাচীন মতে ঐরূপই যে ভাষ্যার্থ, ইহা প্রকাশ টীকাকার বর্দ্ধমানও শেষে বলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু "তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি" টীকায় উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, "নির্দ্দেশ" বলিতে পদার্থের বিভাগ। অর্থাৎ কোন্ পদার্থ কত প্রকার, ইহার নির্দ্দেশ। কোন সূত্রে তাহা সংখ্যাবোধক শব্দের দ্বারা বলা হইয়াছে। কোন সূত্রে তাহা না বলিলেও অর্থ পর্য্যালোচনার দ্বারা ঐ বিভাগ বুঝা গিয়াছে। সেইগুলি "আর্থনির্দ্দেশ"। তদনুসারেই সেখানে বচন গ্রহণপূর্ব্বক ব্যাসবাক্যে সেই বচনেরই প্রয়োগ করিতে হইবে। যেমন সংশয়সূত্রের অর্থ পর্য্যালোচনা করিয়া, সংশয় ত্রিবিধ বা পঞ্চবিধ, ইহা বুঝা গিয়াছে, সুতরাং সেখানে সূত্রে "সংশয়ঃ" এইরূপ একবচনান্ত প্রয়োগ থাকিলেও ব্যাসবাক্যে "সংশয়াঃ" এইরূপ বহুবচনান্ত প্রয়োগই করিতে হইবে। এবং দৃষ্টান্ত-লক্ষণসূত্রে "দৃষ্টান্তঃ" এইরূপ প্রয়োগ থাকিলেও, দৃষ্টান্ত দ্বিবিধ বলিয়া ব্যাসবাক্যে "দৃষ্টান্তৌ" এইরূপ প্রয়োগ করিতে হইবে। যেখানে ঐ নির্দ্দেশ নাই, সেখানে লক্ষণসূত্রে যে বচন প্রযুক্ত আছে, তদনুসারেই ব্যাসবাক্য করিতে হইবে। উদয়নাচার্য্য উক্তরূপ ব্যাখ্যার যুক্তিও বলিয়াছেন। কিন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ শেষে উক্ত সূত্রে সর্ব্বত্র প্রথম উপস্থিত একবচন দ্বারাই বিগ্রহবাক্য হইবে, ইহা নব্যমত বলিয়া সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

সূত্রে "প্রমাণ··· নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানাৎ" এই বাক্যে যে ষষ্ঠী বিভক্তি, উহা "শৈষিকী" ষষ্ঠী। "শেষঃ সম্বন্ধ উচ্যতে"। অর্থাৎ কর্তৃত্ব ও কর্ম্মত্বাদি ষট্কারক ভিন্ন সম্বন্ধমাত্রের নাম "শেষ"। সেই সম্বন্ধবোধক ষষ্ঠীকে বলে "শৈষিকী" ষষ্ঠী। প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থ-সম্বন্ধী যে তত্ত্ব, তাহার জ্ঞানই প্রমাণাদিতত্ত্ব-জ্ঞান। সুতরাং "তত্ত্বজ্ঞানাৎ" এই সমাসাত্মক বাক্যের একদেশার্থ যে তত্ত্ব, তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ সম্বন্ধের অন্বয় হইবে ও তাহা হইতে পারে। কারণ, কারক বিভক্তির ন্যায় সম্বন্ধার্থ ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থেরও একদেশান্বয় সর্ব্বসম্মত বহু প্রয়োগানুসারে স্বীকৃত হইয়াছে। যেমন "দেবদত্তস্য গুরু-কুলং", "রামস্য নাম-মহিমা" ইত্যাদি। সুতরাং "প্রমাণ··· নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানাৎ"—এইরূপ প্রয়োগে "তত্ত্ব" শব্দটি প্রমাণাদি শব্দ-সাপেক্ষ হইলেও "তত্ত্বস্য জ্ঞানম্"—এই বিগ্রহে তৎপুরুষ সমাসেরও বাধা নাই।

প্রাচীন কালে কোন ব্যাখ্যাকার সম্প্রদায় "সাপেক্ষমসমর্থং ভবতি" এই বৈয়াকরণ অনুশাসনবশতঃ উক্তরূপ সমাসের প্রতিবাদ করিয়া, উক্ত "তত্ত্ব-জ্ঞান"

শব্দে কর্ম্মধারয় সমাস ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, ইহা "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্টের কথায় পাওয়া যায়। তাঁহাদিগের মতে উক্ত "তত্ত্ব" শব্দের অর্থ যথার্থ। তত্ত্ব অর্থাৎ যথার্থ যে জ্ঞান, তাহাই তত্ত্ব-জ্ঞান। কিন্তু জয়ন্ত ভট্ট ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই সমর্থন করিতে উক্তরূপ অপব্যাখ্যার খণ্ডন করিয়া, পরে ইহাও বলিয়াছেন যে, বৈয়াকরণগণও উক্তরূপ সমাস স্বীকার করিয়াছেন। তিনি মহাভাষ্যের প্রারম্ভে "অথ শব্দানুশাসনং" এই বাক্যে "শব্দানামনুশাসনং" এইরূপ বিগ্রহবাক্য প্রদর্শন করিয়া, কৃৎপ্রত্যয় যোগে কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হইলেও যে, উক্তরূপ স্থলে তৎপুরুষ সমাস হইতে পারে, ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ভাষ্যকারও "তত্ত্বস্য জ্ঞানং" এবং "নিঃশ্রেয়সস্যাধিগমঃ" এই দুইটি বিগ্রহবাক্যে দুইটি ষষ্ঠী বিভক্তিকে কর্ম্মে ষষ্ঠীই বলিয়াছেন। কারণ, জ্ঞানের কর্ম্মকারক তত্ত্ব এবং অধিগম বা লাভের কর্ম্মকারক নিঃশ্রেয়স। কোন পুস্তকে ঐ কথার পরেই "গমকতয়া সমাসঃ" এইরূপ অতিরিক্ত ভাষ্যপাঠ দেখা যায়। বার্ত্তিকাদি গ্রন্থে ঐরূপ কোন কথা না থাকিলেও উক্ত পাঠের সার্থকতা আছে। বস্তুতঃ সাপেক্ষ শব্দ হইলেও তাহার গমকত্ব অর্থাৎ উক্তরূপ স্থলে তাদৃশ অন্বয় বোধের জনকত্ব থাকায় উক্তরূপ সমাস হইতে পারে। মহাকাব্যের টীকায় উক্তরূপ প্রয়োগ স্থলে মল্লিনাথও লিখিয়া গিয়াছেন,—"সাপেক্ষত্বেঽপি গমকত্বাৎ সমাসঃ।"

ভাষ্য। আত্মাদেঃ খলু প্রমেয়স্য তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ। তচ্চৈতদুত্তরসূত্রেণানূদ্যত ইতি। হেয়ং তস্য নির্ব্বর্ত্তকং, হানমাত্যন্তিকং, তস্যোপায়োঽধিগন্তব্য ইত্যেতানি চত্বার্য্যর্থপদানি সম্যক্ বুদ্ধ্বা নিঃশ্রেয়সমধিগচ্ছতি।

অনুবাদ—আত্মা প্রভৃতি প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞানজন্যই মোক্ষ লাভ হয় [অর্থাৎ মহর্ষি গোতম আত্মাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত যে দ্বাদশ প্রকার পদার্থকে "প্রমেয়" পদার্থ বলিয়াছেন, সেই সমস্ত প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকারই তদ্বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া, তদ্দ্বারা মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ হয়], সেই ইহাও উত্তরসূত্রের দ্বারা অনূদিত হইতেছে। হেয় (দুঃখ) ও তাহার নির্ব্বর্ত্তক (উৎপাদক) অর্থাৎ (১) দুঃখ ও দুঃখের হেতু, (২) আত্যন্তিক হান অর্থাৎ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষের কারণ তত্ত্বজ্ঞান, (৩) তাহার উপায় অর্থাৎ শাস্ত্র এবং (৪) "অধিগন্তব্য" অর্থাৎ লভ্য মোক্ষ—এই চারটি "অর্থপদ"কে (পুরুষার্থস্থানকে) সম্যক্ বুঝিয়া মোক্ষ লাভ করে।

টিপ্পনী—মহর্ষি প্রথম সূত্রে যে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে মুক্তির কারণ বলিয়াছেন, তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে? ঐ সমস্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হইতেই পারে না। তাই ভাষ্যকার এখানেই মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, উক্ত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে আত্মা প্রভৃতি প্রমেয় পদার্থের তত্ত্ব-সাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ। কিরূপে মহর্ষির ঐরূপ তাৎপর্য্য বুঝা যায়? প্রথম সূত্রের দ্বারা ত তাহা বুঝা যায় না। এ জন্য ভাষ্যকার পরেই বলিয়াছেন যে, পরবর্ত্তী দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা মহর্ষি তাহার অনুবাদ করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, আত্মাদি প্রমেয়তত্ত্বজ্ঞানের কি কোন অদৃষ্ট শক্তি আছে, যাহার দ্বারা তাহা মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ হইবে? এইরূপ প্রশ্ন নিরাসের জন্যই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—"তচ্চৈতদুত্তরসূত্রেণানূদ্যতে"। "অনূদ্যতে পশ্চাদুচ্যতে"। অর্থাৎ আত্মা প্রভৃতি প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান কিরূপে মোক্ষের কারণ হয়, তাহা দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা পশ্চাৎ বলিয়াছেন।

বস্তুতঃ সপ্রয়োজন পুনরুক্তিকেই 'অনুবাদ' বলে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের শেষে বেদপ্রামাণ্য-পরীক্ষায় মহর্ষি নিজেও ইহা বলিয়াছেন। সপ্রয়োজন শব্দপুনরুক্তি ও অর্থপুনরুক্তি, এই উভয়ই 'অনুবাদ'। মহর্ষি প্রথম সূত্রের দ্বারা প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের সহিত "প্রমেয়" পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকেও মোক্ষের কারণ বলিয়া, আবার দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা সেই প্রমেয়তত্ত্বজ্ঞানকে মুক্তির কারণ বলিলে অর্থপুনরুক্তি হয়। কিন্তু মহর্ষি প্রয়োজনবশতঃই সেই পুনরুক্তি করায় উহা "অনুবাদ"। সুতরাং উহাতে পুনরুক্তি-দোষ হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে প্রমেয়পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, ইহা ব্যক্ত করাই উক্ত অনুবাদের প্রয়োজন।

মহর্ষি দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা মোক্ষবাদী সমস্ত আচার্য্যেরই সম্মত, উহা কেবল গোতমের নিজমত নহে, ইহাই প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—"হেয়ং" ইত্যাদি। "হেয়" বলিতে দুঃখ। যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলিও বলিয়াছেন,—"হেয়ং দুঃখমনাগতং"। অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ দুঃখের নিবৃত্তি সকল জীবেরই কাম্য, সুতরাং উহা হেয়। সুতরাং ঐ দুঃখের যে সমস্ত হেতু অবিদ্যা, তৃষ্ণা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম প্রভৃতি, সে সমস্তও হেয়। অন্যত্র "হেয়" শব্দের দ্বারাই দুঃখ ও দুঃখের হেতু, এই উভয়ই গৃহীত হইয়াছে। সেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ যে মোক্ষ,

তাহা সর্ব্বশেষে "অধিগন্তব্য" শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত "হানমাত্যন্তিকং" এই কথার দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখহান বা মোক্ষ, এইরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ, তাহা বলিলে উহার পুনরুক্তি হয়। তাই বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—মোক্ষের কারণ তত্ত্বজ্ঞান। অর্থাৎ "হীয়তেঽনেন" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে ত্যাগার্থক "হা" ধাতুর উত্তর করণার্থ অনট্ প্রত্যয়সিদ্ধ উক্ত 'হান' শব্দের দ্বারা বুঝা যায়,— যদ্দ্বারা দুঃখের ত্যাগ বা নিবৃত্তি হয়। তন্মধ্যে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির কারণ যে তত্ত্বজ্ঞান, ইহাই ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"হানমাত্যন্তিকং"।

তাহার উপায়ই তৃতীয় "অর্থপদ"। বার্ত্তিককার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,— "উপায়ঃ শাস্ত্রং"। অর্থাৎ শাস্ত্র ব্যতীত যখন সেই তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব নহে, তখন শাস্ত্র তাহার উপায়। সেই তত্ত্বজ্ঞানের ফল নিঃশ্রেয়সই অধিগন্তব্য অর্থাৎ লভ্য। তাই মহর্ষি গোতমও প্রথম সূত্রে "নিঃশ্রেয়সং" এইমাত্র না বলিয়া বলিয়াছেন,—"নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ"। সুতরাং তদনুসারে ভাষ্যকারও সর্ব্বশেষে "অধিগন্তব্য" শব্দের দ্বারাই চতুর্থ অর্থপদ মোক্ষকে প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্তু "অধিগন্তব্য" শব্দটিকে পূর্ব্বোক্ত উপায়ের বিশেষণবোধকরূপে প্রয়োগ করা এখানে ব্যর্থ। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত কারণেই বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি এখানে ভাষ্যকারোক্ত "হান" শব্দের উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রারম্ভেও ভাষ্যকার আবার ঐ সমস্ত কথা বলিয়াছেন। সেখানে ভাষ্য-টিপ্পনীতে উক্ত বিষয়ে অন্যান্য কথা অবশ্য দ্রষ্টব্য।

হেয়, হান, উপায় ও অধিগন্তব্য, এই চারিটীকে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,— "অর্থপদ"। বাচস্পতি মিশ্র উদ্দ্যোতকরোক্ত "অর্থপদ" শব্দের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া, ভাষ্যকারোক্ত "অর্থপদ" শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"অর্থপদানি পুরুষার্থস্থানানি"। "অর্থ" বলিতে এখানে মুখ্য প্রয়োজন পরমপুরুষার্থ অপবর্গ। "পদ" শব্দের অর্থ স্থান। উক্ত চারিটীতেই অপবর্গ অধিষ্ঠিত অর্থাৎ উহাদিগের সম্যক্ জ্ঞান ব্যতীত অপবর্গ লাভ হইতে পারে না। তাই উহাদিগকে বলে "অর্থপদ"। মোক্ষবাদী সমস্ত আচার্য্যেরই ইহা সম্মত। সুতরাং গোতমোক্ত আত্মা প্রভৃতি অপবর্গ পর্য্যন্ত দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকার যে, মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। দ্বিতীয় সূত্রে ইহা ব্যক্ত হইবে।

এখন বুঝিতে হইবে, মহর্ষির প্রথম সূত্রে "নিঃশ্রেয়স" শব্দের অর্থ কি? পাণিনীয় ব্যাকরণের পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে অচতুরাদি সূত্রে নিঃশ্রেয়স শব্দটি ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। "নিশ্চিতং শ্রেয়ো নিঃশ্রেয়সং।" মুক্তিই নিশ্চিত শ্রেয়ঃ,—এ জন্য মুক্তি অর্থে "নিঃশ্রেয়স" শব্দের বহু প্রয়োগ হইলেও কল্যাণ বা ইষ্টমাত্র অর্থেও "নিঃশ্রেয়স" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।* ভাষ্যকারও পরে ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যায় ভিন্ন ভিন্ন নিঃশ্রেয়স বলিয়া মুক্তি ভিন্ন অভীষ্টও যে নিঃশ্রেয়স, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ নিঃশ্রেয়স দ্বিবিধ—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরও ইহা বলিয়াছেন। তাহা হইলে মহর্ষি গোতমের প্রথম সূত্রে "নিঃশ্রেয়স" শব্দের দ্বারা মোক্ষ পর্য্যন্ত সমস্ত নিঃশ্রেয়সই আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র কেবল মোক্ষই বুঝিয়াছেন। এ বিষয়ে অন্যান্য কথা এই সূত্রের ভাষ্য-শেষে পাওয়া যাইবে।

ভাষ্য। তত্র সংশয়াদীনাং পৃথগ্ বচনমনর্থকং? সংশয়াদয়ো হি যথাসম্ভবং প্রমাণেষু প্রমেয়েষু চান্তর্ভবন্তো ন ব্যতিরিচ্যন্ত ইতি। সত্যমেতৎ, ইমাস্তু চতস্রো বিদ্যাঃ পৃথক্‌প্রস্থানাঃ প্রাণভৃতামনুগ্রহায়োপদিশ্যন্তে, যাসাং চতুর্থীয়মান্বীক্ষিকী বিদ্যা, তস্যাঃ পৃথক্‌প্রস্থানাঃ সংশয়াদয়ঃ পদার্থাঃ, তেষাং পৃথগ্ বচনমন্তরেণাধ্যাত্মবিদ্যামাত্রমিয়ং স্যাৎ যথোপনিষদঃ। তস্মাৎ সংশয়াদিভিঃ পদার্থৈঃ পৃথক্ প্রস্থাপ্যতে।

অনুবাদ—(পূর্ব্বপক্ষ) সেই পূর্ব্বোক্ত সূত্রে সংশয় প্রভৃতি পদার্থের পৃথক্ উল্লেখ নিরর্থক। কারণ, সংশয় প্রভৃতি পদার্থ যথাসম্ভব "প্রমাণ"সমূহ এবং "প্রমেয়"সমূহে অন্তর্ভূত হওয়ায় (প্রমাণ ও প্রমেয় হইতে) অতিরিক্ত পদার্থ নহে। (উত্তর) ইহা সত্য, কিন্তু পৃথক্‌প্রস্থানবিশিষ্ট অর্থাৎ বিভিন্ন প্রতিপাদ্যবিশিষ্ট এই চারিটি বিদ্যা (ত্রয়ী, দণ্ডনীতি, বার্ত্তা, আন্বীক্ষিকী) মানবগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে, যে চারিটী বিদ্যার মধ্যে এই আন্বীক্ষিকী (ন্যায়বিদ্যা) চতুর্থী। সংশয় প্রভৃতি অর্থাৎ প্রথম সূত্রোক্ত "সংশয়" প্রভৃতি "নিগ্রহস্থান" পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ পদার্থ সেই ন্যায়বিদ্যার "পৃথক্ প্রস্থান" অর্থাৎ অসাধারণ প্রতিপাদ্য। তাহাদিগের পৃথক উল্লেখ ব্যতীত এই

* 'কচ্চিৎ সহস্রৈর্মূর্খাণামেকং ক্রীণাসি পণ্ডিতং।
পণ্ডিতোহর্থকৃচ্ছ্রেষু কুর্য্যান্নিঃশ্রেয়সং পরং"। —মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ৫।৩৫

ন্যায়বিদ্যা উপনিষদের ন্যায় কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা হইয়া পড়ে। সেই জন্ত (মহর্ষি গোতম) সংশয় প্রভৃতি পদার্থবর্গের দ্বারা (এই ন্যায়বিদ্যাকে) পৃথক প্রস্থাপিত অর্থাৎ অন্য বিদ্যা হইতে বিভিন্ন ব্যাপারবিশিষ্ট করিয়াছেন।

টিপ্পনী—পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য এই যে, "প্রমেয়" পদার্থের মধ্যে "প্রমাণ" পদার্থ থাকিলেও প্রমাণত্বরূপে প্রমাণের বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। কারণ, প্রমাণতত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত প্রমেয়তত্ত্বজ্ঞান হইতেই পারে না, এজন্য প্রমাণের পৃথক উল্লেখ আবশ্যক। কিন্তু প্রথম সূত্রোক্ত সংশয় প্রভৃতি নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ পদার্থ যথাসম্ভব প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থেই অন্তর্ভূত হওয়ায় প্রমাণ ও প্রমেয় বলিলেই ঐ সমস্ত পদার্থ বলা হয়। সুতরাং ঐ সমস্ত পদার্থের পৃথক্ উল্লেখ অনর্থক। ভাষ্যকার এখানে এক সঙ্গে সংশয়াদি সকল পদার্থের অন্তর্ভাবের কথা বলিতে যাইয়া প্রমাণে অন্তর্ভাবের কথাও বলিয়াছেন। কারণ, উহাদিগের মধ্যে কোন পদার্থ যদি প্রমাণেও অন্তর্ভূত হয়, তবে তাহা না বলিলে নিজ বাক্যের ন্যূনতা হয়। উহার মধ্যে "নির্ণয়" পদার্থ প্রমাণেও অন্তর্ভূত হয়। পরে ইহা বুঝা যাইবে।

উত্তরপক্ষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ঐ সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থ প্রমাণ ও প্রমেয় হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে, ইহা সত্য; কিন্তু ত্রয়ী, দণ্ডনীতি, বার্ত্তা ও আন্বীক্ষিকী, এই চারিটি বিদ্যা মানবগণের হিতার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে।* উক্ত চারিটি বিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থান আছে। প্রস্থান বলিতে অসাধারণ প্রতিপাদ্য। উক্ত সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থ এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যারই পৃথক্ প্রস্থান। সুতরাং এই বিদ্যায় ঐ সমস্ত পদার্থের বিশেষরূপে প্রতিপাদন কর্ত্তব্য, এজন্য উহাদিগের পৃথক উল্লেখ হইয়াছে। কারণ, পৃথক উল্লেখ ব্যতীত উহাদিগের বিশেষরূপে প্রতিপাদন করা যায় না। এবং তাহা হইলে এই বিদ্যা চতুর্থী বিদ্যা হইতে পারে না। উহা প্রথমোক্ত "ত্রয়ী" বিদ্যার মধ্যেই গণ্য করিতে হয়। তাহা হইলে উহা উপনিষদের ন্যায় কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা মাত্র, ইহাই বলিতে হয়। কিন্তু তাহা কখনই বলা যায় না।

তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এখানে লিখিয়াছেন,—"প্রস্থানং ব্যাপারঃ"। "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" টীকায় উদয়নাচার্য্য উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রপূর্ব্বক স্থা ধাতুর অর্থ যে প্রস্থান, তাহা ব্যাপার। প্রকাশ-

---

* ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাদ্ দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীং।
আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ ।। মনুসং—৭।৪৩।

টীকাকার বর্দ্ধমান উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"ব্যাপারো ব্যুৎপাদনং তজ্জ ধাত্বর্থতা, তদ্বিষয়ত্বং প্রত্যয়ার্থঃ"। তাহা হইলে "প্রস্থান" শব্দের অন্তর্গত ধাতু ও কর্ম্মবাচ্য প্রত্যয়ের দ্বারা উহার অর্থ বুঝা যায়, যে সমস্ত পদার্থ প্রতিপাদনরূপ ব্যাপারের বিষয় অর্থাৎ বিদ্যা বা শাস্ত্রের অসাধারণ প্রতিপাদ্য। সেই প্রস্থান-ভেদেই বিদ্যার ভেদ হইয়াছে। তন্মধ্যে ত্রয়ী বিদ্যার প্রস্থান—অগ্নিহোত্র হোমাদি। কৃষ্যাদিশাস্ত্ররূপ "বার্ত্তা"বিদ্যার প্রস্থান—হলশকটাদি। "দণ্ডনীতির" প্রস্থান-রাজা ও অমাত্য প্রভৃতি। "আন্বীক্ষিকী"র প্রস্থান—সংশয়াদি পদার্থ।

ফলকথা, "ত্রয়ী" প্রভৃতি অন্য বিদ্যার প্রস্থান হইতে ন্যায়বিদ্যার প্রস্থান-ভেদ থাকায় ইহা ঐ সমস্ত বিদ্যা হইতে ভিন্ন, ইহা ত্রয়ী নহে, ইহা চতুর্থী বিদ্যা, ইহা জানাইবার জন্য এবং ঐ সংশয়াদি পৃথক্ প্রস্থানগুলির বিশেষরূপে বোধ সম্পাদনের জন্য মহর্ষি উহাদিগের পৃথক উল্লেখ করিয়াছেন। সংশয়াদি পদার্থগুলির পৃথক্ উল্লেখ না করিলে তাহার পৃথক্‌ভাবে ব্যুৎপাদন করা যায় না। ন্যায়াঙ্গ সংশয়াদি পদার্থের ব্যুৎপাদন ন্যায়বিদ্যারই ব্যাপার, এই ব্যাপারভেদেও ন্যায়বিদ্যার অন্য বিদ্যা হইতে ভেদ হইয়াছে এবং ভেদ বুঝা গিয়াছে। সুতরাং মহর্ষি সংশয়াদি পদার্থবর্গের দ্বারা ন্যায়বিদ্যাকে পৃথক্ ব্যাপারবিশিষ্ট করায় উহাদিগের পৃথক্ উল্লেখ সার্থক হইয়াছে, উহা অনর্থক হয় নাই। পরে ইহা আরও ব্যক্ত হইবে।

ভাষ্য। তত্র—নানুপলব্ধে ন নির্ণীতেহর্থে ন্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে, কিং তর্হি ? সংশয়িতেহর্থে। যথোক্তং "বিমৃশ্য পক্ষপ্রতি-পক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়" ইতি। বিমর্শঃ সংশয়ঃ, পক্ষ-প্রতিপক্ষৌ ন্যায়প্রবৃত্তিঃ, অর্থাবধারণং নির্ণয়স্তত্ত্বজ্ঞানমিতি। স চায়ং কি স্বিদিতি বস্তুবিমর্শমাত্রমনবধারণং জ্ঞানং সংশয়ঃ প্রমেয়েহন্তর্ভবন্নেবমর্থং পৃথগুচ্যতে।

অনুবাদ—তন্মধ্যে—অজ্ঞাত পদার্থে ন্যায় প্রবৃত্ত হয় না, নিশ্চিত পদার্থে ন্যায় প্রবৃত্ত হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) সন্দিগ্ধ পদার্থেই ন্যায় প্রবৃত্ত হয়। যথা (মহর্ষি গোতম) বলিয়াছেন,—"বিমর্শের পরে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা অর্থাবধারণ নির্ণয়"। (১ অঃ, ৪১ সূত্র)। "বিমর্শ" বলিতে সংশয়, "পক্ষ" ও "প্রতিপক্ষ" বলিতে ন্যায়প্রবৃত্তি। "অর্থাবধারণ"রূপ

নির্ণয়, তত্ত্বজ্ঞান। সুতরাং ইহাই কি ? অথবা ইহা নহে ? এইরূপে পদার্থের বিমর্শ মাত্র কি না—অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞানরূপ সেই (ন্যায়াঙ্গ) সংশয় "প্রমেয়ে" অর্থাৎ প্রমেয় পদার্থের অন্তর্গত জ্ঞানপদার্থে অন্তর্ভূত হইয়াও এই জন্য অর্থাৎ ন্যায়প্রবৃত্তির মূল বলিয়া পৃথক্ উক্ত হইয়াছে।

টিপ্পনী—ভাষ্যকার এখন হইতে ঐ সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থের যথাক্রমে প্রত্যেকটিকে গ্রহণ করিয়া এবং প্রকৃত বক্তব্য সমর্থনের জন্য উহাদিগের অনেকের স্বরূপ বর্ণন করিয়া, ন্যায়বিদ্যায় উহাদিগের পৃথক উল্লেখের কারণ সমর্থন করিয়াছেন। তন্মধ্যে সংশয়ের কথাই প্রথম বক্তব্য। কারণ, সংশয়ই উহাদিগের মধ্যে প্রথম। ভাষ্যে "তত্র" (তেষু মধ্যে) "সংশয়ঃ" এইরূপ যোজনা বুঝিতে হইবে। যে পদার্থ একেবারে অজ্ঞাত, তাহাতেও ন্যায়প্রবৃত্তি হয় না ; যাহা নির্ণীত, তাহাতেও ন্যায়প্রবৃত্তি হয় না। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে, যাহা সামান্যতঃ জ্ঞাত, কিন্তু বিশেষরূপে অনির্ণীত, তাহাতেই ন্যায়প্রবৃত্তি হয়। পর্ব্বতকে জানি, কিন্তু তাহাতে বহ্নি আছে কি না, এইরূপ সংশয় হইতেছে ; সুতরাং সামান্যতঃ নির্ণীত হইলেও বিশেষরূপে অনির্ণীত হইতে পারে। যেরূপে যাহা অনির্ণীত, সেইরূপেই তাহাতে সংশয় হয়। সেইরূপে সন্দিগ্ধ সেই পদার্থেই ন্যায়প্রবৃত্তি হয়, সংশয় না হইলে তাহা হয় না ; সুতরাং সংশয় ন্যায়ের অঙ্গ। এ কথা যে মহর্ষি নিজেই বলিয়াছেন, ইহা দেখাইবার জন্যই ভাষ্যকার পরে মহর্ষির নির্ণয়লক্ষণ-সূত্রটিকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই সূত্রে "বিমৃশ্য" এই পদের দ্বারা সংশয় কথিত হইয়াছে। কারণ, পূর্ব্বে মহর্ষি বলিয়াছেন,—"বিমর্শঃ সংশয়ঃ।" এবং ঐ সূত্রে যে "পক্ষ" ও "প্রতিপক্ষ" শব্দ আছে, উহার দ্বারা সেখানে ন্যায় প্রবৃত্তিই বুঝিতে হইবে, উহাই সেখানে "পক্ষ" ও "প্রতিপক্ষ" শব্দের লাক্ষণিক অর্থ (নির্ণয়সূত্র দ্রষ্টব্য)। ফলকথা, মহর্ষির নির্ণয়লক্ষণ-সূত্রের দ্বারাও সংশয় ন্যায়প্রবৃত্তির মূল, ইহা প্রকটিত হইয়াছে।

ভাষ্য। অথ প্রয়োজনং, যেন প্রযুক্তঃ প্রবর্ত্ততে, তৎ প্রয়োজনং, যমর্থমভীপ্সন্ জিহাসন্ বা কর্ম্মারভতে। তেনানেন সর্ব্বে প্রাণিনঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সর্ব্বাশ্চ বিদ্যা ব্যাপ্তাঃ। তদাশ্রয়শ্চ ন্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে।

কঃ পুনরয়ং ন্যায়ঃ ? প্রমাণৈরর্থ-পরীক্ষণং ন্যায়ঃ, প্রত্যক্ষাগমাশ্রিতমনুমানং, সাঽন্বীক্ষা, প্রত্যক্ষাগমাভ্যামীক্ষিতস্যান্বীক্ষণ-

মন্বীক্ষা। তয়া প্রবর্ত্তত ইত্যান্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্রং। যৎ পুনরনুমানং প্রত্যক্ষাগমবিরুদ্ধং, ন্যায়াভাসঃ স ইতি।

অনুবাদ—অনন্তর "প্রয়োজন" পৃথক্ উক্ত হইয়াছে। যদ্দ্বারা "প্রযুক্ত" অর্থাৎ প্রযত্নবান্ হইয়া (জীব) প্রবৃত্ত হয়, তাহা প্রয়োজন। বিশদার্থ এই যে, যে পদার্থকে পাইতে ইচ্ছা করতঃ অথবা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করতঃ কর্ম্ম আরম্ভ করে। সেই এই প্রয়োজন কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রাণী, সর্ব্ব কর্ম্ম ও সর্ব্ববিদ্যা ব্যাপ্ত, অর্থাৎ ঐ সমস্তই সপ্রয়োজন। এবং "তদাশ্রয়" হইয়া অর্থাৎ সেই প্রয়োজন পদার্থকে আশ্রয় করিয়াই "ন্যায়" প্রবৃত্ত হয়।

(প্রশ্ন) এই "ন্যায়" কি? (উত্তর) সমস্ত প্রমাণের দ্বারা অর্থাৎ সর্ব্বপ্রমাণমূলক "প্রতিজ্ঞাদি" পঞ্চাবয়বের দ্বারা অর্থের পরীক্ষা "ন্যায়", প্রত্যক্ষ ও আগমের আশ্রিত অর্থাৎ অবিরোধী অনুমান, তাহা "অন্বীক্ষা" অর্থাৎ উক্ত অনুমানরূপ ন্যায়কেই "অন্বীক্ষা" বলে। প্রত্যক্ষ ও আগমের দ্বারা 'ঈক্ষিত' বা জ্ঞাত পদার্থের 'অন্বীক্ষণ' বা পরীক্ষা "অন্বীক্ষা" (অর্থাৎ "ন্যায়", "পরীক্ষা" ও "অন্বীক্ষা", এই নামত্রয় সমানার্থ), সেই "অন্বীক্ষার" নিমিত্ত প্রবৃত্ত অর্থাৎ প্রকাশিত এই অর্থে "আন্বীক্ষিকী" ন্যায়বিদ্যা ন্যায়শাস্ত্র (অর্থাৎ উক্তরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে "আন্বীক্ষিকী" শব্দের দ্বারা ন্যায়বিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্রই বুঝা যায়), কিন্তু যে অনুমান প্রত্যক্ষ ও আগমের বিরুদ্ধ, তাহা 'ন্যায়াভাস'।

টিপ্পনী—প্রথম সূত্রে সংশয়ের পরেই প্রয়োজনের উল্লেখ হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"অথ প্রয়োজনং"। অব্যবহিত পূর্ব্বোক্ত "পৃথগুচ্যতে" এই বাক্যের অনুষঙ্গই এখানে ভাষ্যকারের অভিপ্রেত। "প্রযুজ্যতেঽনেন" অর্থাৎ যদ্দ্বারা প্রযুক্ত হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে "প্রয়োজন" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—যাহা জীবের কর্ম্মের প্রযোজক। প্রয়োজনবশতঃই জীব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে। ভাষ্যকার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "প্রবর্ত্ততে" এই পদেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"কর্ম্ম আরভতে"। সুতরাং তৎপূর্ব্বে "প্রযুক্ত" শব্দের দ্বারাই ইচ্ছাজন্য প্রযত্নরূপ প্রবৃত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। জীবের জ্ঞানবিশেষজন্য ইচ্ছা জন্মে, সেই ইচ্ছাবিশেষজন্য প্রযত্নরূপ প্রবৃত্তি জন্মে, তজ্জন্য চেষ্টারূপ প্রবৃত্তি জন্মে। আদিভাষ্যে "প্রবৃত্তি" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার যে, "সমীহা"কে প্রবৃত্তি বলিয়াছেন এবং তৎপূর্ব্বে "প্রযুক্ত" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা এখানে স্মরণ করা আবশ্যক। প্রাচীন কালে অনেকে

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গকেই প্রয়োজন পদার্থ বলিতেন। কিন্তু বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর বিচারপূর্ব্বক নিজ মত বলিয়াছেন যে, সুখ-প্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তিই জীবের মুখ্য প্রয়োজন। কারণ, উহাই জীবের সর্ব্বকর্ম্মের মূল প্রযোজক। উহার জন্যই জীব, উহার উপায় বিষয়ে প্রযত্নবান্ হয়। সুতরাং সেই সমস্ত উপায় গৌণ প্রয়োজন। ভাষ্যকার কিন্তু ত্যাজ্য পদার্থকেও "প্রয়োজন" বলিয়াছেন। কারণ, দুঃখ ও দুঃখের হেতু যাহা ত্যাজ্য পদার্থ, তাহাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছাবশতঃও জীবের কর্ম্মপ্রবৃত্তি হওয়ায় সেই ত্যাজ্য পদার্থও জীবের প্রযোজক বলিয়া, উক্ত অর্থে তাহাও "প্রয়োজন" পদার্থ।

প্রয়োজন পদার্থগুলি যথাসম্ভব প্রমেয় পদার্থে অন্তর্ভূত হইলেও ভাষ্যকার প্রথম সূত্রে উহার পৃথক্ উল্লেখের কারণ ব্যক্ত করিতে পরে বলিয়াছেন যে, সমস্তই সপ্রয়োজন, নিষ্প্রয়োজন কোন কর্ম্ম ও বিদ্যা নাই। সুতরাং ন্যায়বিদ্যায় "প্রয়োজন" পদার্থ অবশ্য বুৎপাদ্য বলিয়া উহার পৃথক্ উল্লেখ আবশ্যক। পরন্তু বাদী মধ্যস্থ ব্যক্তিগণের নিকটে যে "ন্যায়ের" প্রয়োগ করেন, উহা "তদাশ্রয়"। "তৎ প্রয়োজনং আশ্রয়ো যস্য" এইরূপ বিগ্রহে বহুব্রীহি সমাসে "তদাশ্রয়" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, উক্ত প্রয়োজন পদার্থ ঐ ন্যায়ের আশ্রয়। আশ্রয় বলিতে এখানে উপকারক। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, যেমন পণ্ডিত রাজাশ্রিত, তদ্রূপ ন্যায় প্রয়োজনাশ্রিত। রাজা যেমন পণ্ডিতের উপকারকরূপ আশ্রয়, তদ্রূপ প্রয়োজন পদার্থ ন্যায়ের আশ্রয়। প্রয়োজন ব্যতীত উক্তরূপ ন্যায়প্রবৃত্তি হইতে পারে না। বাদী তাঁহার নিশ্চিত সিদ্ধান্তে অপরের বিবাদবশতঃ মধ্যস্থ ব্যক্তিগণের সংশয় বুঝিলে, সেই সংশয় নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগের নিকটে ন্যায়ের প্রয়োগ করেন। কোন প্রয়োজনজ্ঞান ব্যতীত তাহা করিতে পারেন না। সুতরাং মধ্যস্থগণের সংশয় এবং ন্যায়-প্রয়োগের প্রয়োজন ন্যায়ের পূর্ব্বাঙ্গ। তাই ন্যায়বিদ্যায় সংশয় ও প্রয়োজন পদার্থ পূর্ব্বেই প্রতিপাদন করা আবশ্যক, এ জন্য মহর্ষি "সংশয়ের" পরেই "প্রয়োজন" পদার্থের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন।

অবশ্যই প্রশ্ন হইবে যে, সংশয় ও প্রয়োজন পদার্থকে যে "ন্যায়ে"র পূর্ব্বাঙ্গ বলা হইয়াছে, সেই "ন্যায়" কি? তাই ভাষ্যকার পরে নিজেই সেই প্রশ্নপূর্ব্বক বলিয়াছেন,—"প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ"। বাদী মধ্যস্থ পণ্ডিতের নিকটে নিজ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিতে যে অনুমান-প্রমাণ প্রদর্শন করেন, তাহাকে বলে—পরার্থ অনুমান। তাহাতে যথাক্রমে "প্রতিজ্ঞা", "হেতু", "উদাহরণ",

"উপনয়" ও "নিগমন" নামক পঞ্চাবয়বরূপ যে বাক্যসমুদায়ের প্রয়োগ করেন, সেই বাক্যসমুদায় এবং সেই পরার্থ অনুমান, এই উভয়ই "ন্যায়" নামে কথিত হইয়াছে। অনেকে সেই বাক্যসমুদায়কেই পরার্থ অনুমান বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে "প্রমাণৈঃ" এই বহুবচনান্ত পদের দ্বারা উক্ত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ ন্যায়বাক্যকেই গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা "অর্থপরীক্ষণ"কে ন্যায় বলিয়াছেন। উক্ত প্রতিজ্ঞাদি বাক্য প্রমাণ না হইলেও উহার মূলে গোতমোক্ত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, এই চতুর্ব্বিধ প্রমাণ থাকে। সুতরাং ঐ তাৎপর্য্যেই ভাষ্যকার "প্রমাণৈঃ" এই পদের দ্বারা ঐ সমস্ত প্রমাণমূলক পঞ্চাবয়ব বাক্যই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ বাক্য ঐ সমস্ত প্রমাণের ব্যাপার। তাই উদ্দ্যোতকর ব্যাখ্যা করিয়াছেন,- "সমস্তপ্রমাণ-ব্যাপারাদর্থাধিগতির্ন্যায়ঃ"। পরে "অবয়ব" পদার্থের ব্যাখ্যায় ইহা পরিস্ফুট হইবে।

'তাৎপর্য্যটীকা'কার বাচস্পতি মিশ্র এখানে ভাষ্যকারোক্ত 'অর্থপরীক্ষা'র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,- "অর্থস্য লিঙ্গস্য পরীক্ষণং পরীক্ষা।" অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের দ্বারা "অর্থে"র কি না হেতুর পরীক্ষাই "ন্যায়"। বাদী কোন সাধ্য-সাধনের জন্য প্রকৃত হেতু গ্রহণ করিয়া অনুমানপ্রমাণ প্রদর্শন করিলে, সেই অনুমান উক্ত হেতুর পরীক্ষা। কারণ, তদ্দ্বারা সেই হেতু যে, সেই সাধ্যের সাধক, ইহা পরীক্ষিত বা নির্ণীত হয়। সেই হেতু-পরীক্ষার ফলই তাঁহার সাধ্যসিদ্ধি। সাধ্যরূপ অর্থের পরীক্ষা বা নির্ণয়কেই "ন্যায়" বলিলে উহাকে ন্যায়ের ফল বলা যায় না। যাহা ন্যায়ের ফল, তাহাকেই ন্যায় বলা যায় না। সুতরাং ভাষ্যকারোক্ত ঐ "অর্থ" শব্দের দ্বারা এখানে অনুমানের প্রকৃত হেতুই বুঝিতে হইবে। কিন্তু ভাষ্যকার তৃতীয়সূত্র-ভাষ্যে অনুমেয় পদার্থকেই "লিঙ্গী অর্থ" বলিয়াছেন। সুতরাং বাদীর যাহা সাধ্য বা প্রতিপাদ্য পদার্থ, তাহার পরীক্ষা বা নির্ণয় যে অনুমান-প্রমাণের দ্বারা হয়, তাহাই অর্থ-পরীক্ষা, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যাইতে পারে। পরন্তু "নীয়তে প্রাপ্যতে বিবক্ষিতার্থসিদ্ধিরনেন" অর্থাৎ যদ্দ্বারা বাদীর বিবক্ষিত অর্থের সিদ্ধি বা নিশ্চয়কে লাভ করা যায়, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে ঐ "ন্যায়" শব্দটি নী ধাতুর উত্তর করণবাচ্য ঘঞ্ প্রত্যয়সিদ্ধ। সুতরাং ঐ "ন্যায়" শব্দের সমানার্থ "পরীক্ষণ", "পরীক্ষা", "অন্বীক্ষণ" এবং "অন্বীক্ষা" শব্দও করণবাচ্যপ্রত্যয়সিদ্ধ, ইহাই বুঝা যায়। সুধীগণ বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যা বিচার করিবেন।

ভাষ্যকার তাঁহার পূর্ব্বকথিত ন্যায়ের স্বরূপ ব্যক্ত করিতে পরেই

বলিয়াছেন,—"প্রত্যক্ষাগমাশ্রিতমনুমানং"। উদ্দ্যোতকর এখানে "আশ্রিত" শব্দের ফলিতার্থ বলিয়াছেন,—অবিরোধী। বস্তুতঃ ভাষ্যকার শেষে প্রত্যক্ষ ও আগমের বিরুদ্ধ অনুমানকে "ন্যায়াভাস" বলিয়া, প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরোধী অনুমানপ্রমাণকেই যে তিনি পূর্ব্বে "ন্যায়" বলিয়াছেন, ইহা সুব্যক্ত করিয়াছেন। "ন্যায়বৎ আভাসতে প্রকাশতে" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে যাহা প্রকৃত ন্যায় নহে, কিন্তু ন্যায়বৎ প্রকাশিত হয়, তাহাকে বলে "ন্যায়াভাস"। তদ্দ্বারাও কাহারও ভ্রমাত্মক অনুমিতি জন্মে, সুতরাং সেই অনুমিতির করণকেও অনুমান বলা হয়। কিন্তু সেই অনুমান প্রমাণ নহে, তাহা প্রমাণাভাস। যে অনুমানপ্রমাণ প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরোধী, তাহাই প্রকৃত ন্যায়। সর্ব্ব-প্রমাণমূলক পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ হইলে সেখানে সেই অনুমান-প্রমাণ প্রত্যক্ষ ও আগম-প্রমাণের অবিরুদ্ধ হইবেই, এই তাৎপর্য্যেই ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন, —"প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ"। কিন্তু সর্ব্বত্রই যে পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ করিতে হইবে, নচেৎ সেখানে "ন্যায়" হইবে না, ইহা ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য নহে। কারণ, মধ্যস্থহীন "বাদ" বিচারে গুরু ও শিষ্যের পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ ব্যতীতও প্রমাণ দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় হয়, ইহা পরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন। (বাদলক্ষণসূত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

ফলকথা, যে অনুমান অন্য সমস্ত প্রমাণের অবিরুদ্ধ যাহা কখনও অন্য বলবৎ প্রমাণ দ্বারা বাধিত হয় না, তাদৃশ অনুমানপ্রমাণকেই ভাষ্যকার এখানে "ন্যায়" বলিয়াছেন এবং পরে তাহাকেই বলিয়াছেন—"অন্বীক্ষা"। "অনু" শব্দের অর্থ পশ্চাৎ এবং ঈক্ষ ধাতুর অর্থ জ্ঞান। যদ্দ্বারা পশ্চাৎ জ্ঞান জন্মে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে ঐ "অন্বীক্ষা" শব্দের দ্বারা অনুমান-প্রমাণ বুঝা যায়। কিন্তু উহা "অন্বীক্ষা" শব্দের ব্যুৎপত্তি মাত্র। ভাষ্যকার ঐ ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের ব্যাখ্যা করিতেই পরে বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ ও আগমের দ্বারা ঈক্ষিত বা জ্ঞাত বিষয়ের যদ্দ্বারা পশ্চাৎ ঈক্ষণ বা জ্ঞান জন্মে, সেই অন্বীক্ষণকে উক্ত অর্থে "অন্বীক্ষা" বলে। যেমন প্রথমে অনুমানপ্রমাণ দ্বারা নির্ণীত পদার্থকে পরে প্রত্যক্ষ ও আগম-প্রমাণ দ্বারা তদ্রূপে বুঝিলে সেই জ্ঞান দৃঢ়তর হয়, তদ্রূপ প্রতক্ষ্য ও আগম-প্রমাণ দ্বারা কোন পদার্থকে বুঝিয়া, পরে অনুমান-প্রমাণ দ্বারাও তদ্রূপে বুঝিলে সেই জ্ঞান দৃঢ়তর হয়। সুতরাং বাদী যদি প্রত্যক্ষ ও আগম- প্রমাণসিদ্ধ পদার্থকেই অনুমান-প্রমাণ দ্বারাও প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই পদার্থ ঐ সমস্ত প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় তদ্বিষয়ে

অপরের বিবাদ থাকিতে পারে না। সুতরাং "ন্যায়ে"র দ্বারা বিপ্রতিপন্ন ব্যক্তিও প্রকৃত সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারেন। বাদীর ন্যায়-প্রয়োগের উহাই মুখ্য উদ্দেশ্য। পরে ইহা পরিস্ফুট হইবে।

বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ ও আগমের দ্বারা ঈক্ষিত পদার্থের অন্বীক্ষণকে অন্বীক্ষা বলিয়া ভাষ্যকার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "অন্বীক্ষা" শব্দের ব্যুৎপত্তি মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন। উহার দ্বারাও প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরুদ্ধ অনুমান-প্রমাণই ন্যায়, ইহাই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত। ভাষ্যকার পরে "আন্বীক্ষিকী" শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনের জন্যও পূর্ব্বে "অন্বীক্ষা' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। "অন্বীক্ষয়া প্রবর্ত্ততে" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে "অন্বীক্ষা" শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয়ে উক্ত "আন্বীক্ষিকী" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "কন্যয়া শোকঃ" এইরূপ প্রয়োগে যেমন "কন্যা" শব্দের উত্তর হেত্বর্থে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে, তদ্রূপ "অন্বীক্ষয়া প্রবর্ত্ততে" এই স্থলেও হেত্বর্থে তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা উক্ত "অন্বীক্ষা" ন্যায়শাস্ত্র প্রকাশের হেতু, ইহা বুঝা যায়। অর্থাৎ উক্ত অনুমানরূপ অন্বীক্ষা-নির্ব্বাহের জন্য যে সমস্ত জ্ঞান আবশ্যক, তাহা এই ন্যায়শাস্ত্রের দ্বারাই লাভ করা যায়। সুতরাং ন্যায়শাস্ত্র অন্বীক্ষাহেতুক অর্থাৎ ঐ অন্বীক্ষা-নির্ব্বাহের জন্যই এই ন্যায়শাস্ত্র প্রবৃত্ত বা প্রকাশিত হইয়াছে, তজ্জন্য উহার নাম "আন্বীক্ষিকী"। "আন্বীক্ষিকী" শব্দের উক্তরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে উহার দ্বারা যে, ন্যায়বিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্রই বুঝা যায়, ইহাই প্রকাশ করিতে পরে ভাষ্যকার উহার অর্থ স্পষ্ট বলিয়াছেন,—"ন্যায়বিদ্যা ন্যায়শাস্ত্রং"। অর্থাৎ ঐ তিনটি শব্দ সমানার্থ। কোষকার অমর সিংহও "আন্বীক্ষিকী" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন তর্কবিদ্যা। কিন্তু ভাষ্যকারের মতেও ইহা কেবল ন্যায়বিদ্যা বা তর্কবিদ্যা নহে। ইহা উপনিষদের ন্যায় কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা না হইলেও অধ্যাত্ম অংশে ইহাও অধ্যাত্মবিদ্যা। এই সূত্রের ভাষ্যশেষে ভাষ্যকার নিজেই ইহা বলিয়াছেন। পরে তাহা বুঝা যাইবে।

প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ন্যায়াভাসের উদাহরণ

কোন বাদী যদি 'অগ্নিরনুষ্ণঃ, কার্য্যত্বাৎ জলবৎ' ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া অনুমান প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে সেই অনুমান প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ন্যায়াভাস। কারণ, অগ্নিতে উষ্ণস্পর্শ ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং সেই প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। সুতরাং নিশ্চিতপ্রামাণ্য

ঐ প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলবত্তর হওয়ায় উহার দ্বারা অগ্নিতে অনুষ্ণত্বের অনুমান বাধিত হয়। অগ্নিতে উষ্ণত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া, তাহাতে কোন হেতুর দ্বারাই অনুষ্ণত্বের যথার্থ অনুমিতি হইতেই পারে না। সুতরাং অগ্নিতে অনুষ্ণত্ব অনুমানের বিষয়ই নহে। তাই উদ্দ্যোতকর অনুমানের অবিষয় পদার্থে অনুমানপ্রয়োগই উক্ত স্থলে প্রত্যক্ষবিরোধ বলিয়াছেন। উক্ত স্থলে ঐ হেতুতে অন্য দোষ থাকিলেও প্রত্যক্ষবাধরূপ দোষই প্রতিবাদী দেখাইবেন, নচেৎ ঐ হেতুর ব্যভিচার দোষও পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা যায় না। কিন্তু ঐ বাধদোষের দ্বারাই ঐ হেতু দূষিত হইলে পরে আর উহাতে অন্য দোষ প্রদর্শন অনাবশ্যক। "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" টীকায় উদয়নাচার্য্যও এ বিষয়ে বিচারপূর্ব্বক পরে ঐ কথাই বলিয়াছেন। তিনি ইহার দৃষ্টান্তরূপে সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন,—"নহি মৃতোঽপি মার্য্যতে"। অর্থাৎ প্রথমে প্রত্যক্ষবাধের দ্বারাই যে অনুমান খণ্ডিত হইয়া যায়, তাহাতে পরে আবার অন্য দোষ প্রদর্শন অনাবশ্যক। মৃতকেও আবার কেহ মারিতে যায় না।

মহাযান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগ ("ন্যায়প্রবেশ" গ্রন্থে) প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ন্যায়াভাসের উদাহরণ বলিয়াছেন,—"অশ্রাবণঃ শব্দঃ কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ"। কিন্তু বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, যাঁহারা ঐরূপ উদাহরণ বলেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষের বিষয় পদার্থও জানেন না, অনুমানের বিষয় পদার্থও জানেন না। কারণ, শ্রাবণত্ব বলিতে বুঝা যায় শ্রবণেন্দ্রিয়ের বৃত্তি, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহ অতীন্দ্রিয়। তাৎপর্য্য এই যে, "শ্রবণেন গৃহ্যতে" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে "শ্রবণ" শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয়ে সিদ্ধ "শ্রাবণ" শব্দ দ্বারা বুঝা যায়—শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত উক্ত "শ্রাবণ" শব্দের উত্তর 'ত্ব' প্রত্যয় করিলে উহার দ্বারা সম্বন্ধ বুঝা যায়। কারণ, বার্ত্তিককার কাত্যায়ন মুনি সূত্রে বলিয়াছেন,—"কৃত্তদ্ধিতসমাসেষু সম্বন্ধাভিধানং ত্বতল্‌ভ্যাম্‌"। তাহা হইলে 'শ্রাবণত্ব' শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—শব্দের সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সমবায়রূপ সম্বন্ধ। উহাই সেখানে শ্রবণেন্দ্রিয়ের বৃত্তি। কিন্তু আকাশস্বরূপ শ্রবণেন্দ্রিয় যখন অতীন্দ্রিয় পদার্থ, তখন তাহার সম্বন্ধ যে শ্রাবণত্ব, তাহাও অতীন্দ্রিয়ই হইবে, উহা লৌকিক প্রত্যক্ষের যোগ্যই নহে। সুতরাং অগ্নিতে উষ্ণত্ব যেমন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তদ্রূপ শব্দে শ্রাবণত্বও প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ইহা বলাই যায় না। অতএব শব্দে শ্রাবণত্বাভাবের যে অনুমান, তাহাকে কখনই প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ন্যায়াভাসের উদাহরণ বলা যায় না। অনুমানের ধর্ম্মীতে

অনুমেয় পদার্থের অভাব প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেই সেখানে সেই অনুমানকে প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ বলা যায়। কিন্তু শব্দের শ্রাবণত্বকে এমন কোন পদার্থ বলা যায় না, যাহাতে তাহা শব্দে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইতে পারে। "শ্লোকবার্ত্তিকে"র অনুমান পরিচ্ছেদে কুমারিলভট্টও দিঙ্‌নাগের উক্ত উদাহরণ খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন,—"নহি শ্রাবণতা নাম প্রত্যক্ষেণাবগম্যতে"।

আগমবিরুদ্ধ ন্যায়াভাসের উদাহরণ

কাপালিক সম্প্রদায় বলিতেন,—"নরশিরঃ কপালং শুচি, প্রাণ্যঙ্গত্বাৎ শঙ্খবৎ"। অর্থাৎ উক্তরূপ প্রয়োগের দ্বারা তাঁহারা বৈদিকসম্প্রদায়ের নিকটে অনুমান প্রদর্শন করিতেন যে, মৃত নরের শিরঃকপাল (মাথার খুলি) শুচি, যেহেতু উহা প্রাণীর অঙ্গ, যেমন শঙ্খ। শঙ্খ যে মৃত প্রাণীর অঙ্গ হইলেও পবিত্র, ইহা বৈদিকসম্প্রদায়ের সকলেরই সম্মত। সুতরাং কাপালিক সম্প্রদায় ঐ শঙ্খকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, মৃত নরের শিরঃকপালে শুচিত্বের অনুমান প্রদর্শন করিতেন। তাঁহারা বেদ এবং বেদমূলক স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র মানিতেন না। তাঁহাদিগের আশ্রিত তন্ত্র পৃথক্। উদ্দ্যোতকরও তাঁহাদিগের উক্ত উদাহরণের উল্লেখ করায় তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ও যে প্রাচীন এবং তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেক বিচারপটু পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারাও বৈদিক সম্প্রদায়ের সহিত বিচার করিতেন ইহা বুঝা যায়। তাঁহারা নরশিরঃকপালকে পবিত্র বলিয়া নিত্য ব্যবহার করায় এবং তদ্দ্বারাই পানভোজনাদি কার্য্য করায় কাপালিক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র তাঁহাদিগের নিজমত-সমর্থনে অন্যান্য কথাও বলিয়া, তাহারও উত্তর দিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেন যে, তোমাদিগেরও কেবল শাস্ত্র দ্বারাই সর্ব্বত্র ধর্ম্মনির্ণয় হয় না, অনেক ক্ষেত্রে আচারের দ্বারাও ধর্ম্ম-নির্ণয় করিতে হয়। এ বিষয়ে তাঁহারা দাক্ষিণাত্যদিগের আচারবিশেষকে দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন যে, সেইরূপ মৃত নরের শিরঃকপালের দ্বারা পান ভোজনাদি কার্যের আচারও আমাদিগের সম্প্রদায়ে চিরপ্রচলিত অনিন্দিত আচার বলিয়া, উহা আমাদিগের ধর্ম্ম। "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" টীকায় উদয়নাচার্য্যও এ বিষয়ে বিচার করিয়াছেন। ফলকথা, কাপালিকগণের ঐ সমস্ত আচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ। বেদ এবং বেদমূলক শাস্ত্রের প্রামাণ্য অবশ্য স্বীকার্য্য এবং আচার হইতে সেই শাস্ত্র-প্রমাণই ধর্ম্ম-বিষয়ে বলবত্তর প্রমাণ। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের

কোন আচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে তাহা সদাচার বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং তদ্দ্বারা ধর্ম্ম-নির্ণয় হইতে পারে না। বেদমূলক মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে মৃত নরের অস্থিস্পর্শকারীর প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ থাকায় উহা যে পাপজনক, সুতরাং অকর্ত্তব্য, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ। অতএব কাপালিকগণের উক্তরূপ অনুমান আগমবিরুদ্ধ "ন্যায়াভাস"।

"কথামিদমাগমবিরুদ্ধং ?" পূর্ব্বোক্ত অনুমান শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় কিরূপে ? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, "নরশিরঃ কপালং শুচি" এই কথা বলিলে ঐ "শুচি" শব্দের অর্থ কি, তাহা অবশ্য বক্তব্য। আর তাঁহার মতে অশুচি কি, ইহাও বক্তব্য এবং সে বিষয়ে প্রমাণও বক্তব্য। অগত্যা শেষে সমস্ত পদার্থকেই শুচি বলিয়া "সর্ব্বং শুচি" এইরূপে অনুমান প্রয়োগ করিতে গেলে তাহাতে কোন দৃষ্টান্ত নাই। কারণ, সমস্ত পদার্থই ঐ অনুমানে পক্ষরূপে গৃহীত হওয়ায় উহার অন্তর্গত কোন পদার্থকে দৃষ্টান্ত বলা যায় না। ঐ অনুমানের পূর্ব্বে যাহা শুচি বলিয়া সর্ব্বসিদ্ধ, এমন পদার্থই দৃষ্টান্ত হইতে পারে। সুতরাং শুচি পদার্থ কি, ইহা অবশ্য বক্তব্য। যে দ্রব্যের স্পর্শ করিলে তজ্জন্য কোন পাপ হয় না, তাহা শুচি, ইহা বলিলে কাহার পাপ হয় না, ইহা বক্তব্য। কাপালিকগণের পাপ হয় না, ইহা বলিলে উহা তাঁহাদিগের নিজ শাস্ত্রসম্মত মতই হইবে। আর যদি বলেন যে, যে দ্রব্য স্পর্শ করিলে বৈদিক সম্প্রদায়ের পাপ হয় না, তাহা শুচি; কিন্তু ইহা বলিলে বেদাদি শাস্ত্রকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করায় উক্ত অনুমান যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ, ইহা স্বীকার্য্য।

তাৎপর্য্য এই যে, শঙ্খ যে শুচি, এ বিষয়ে বেদাদি শাস্ত্রই প্রমাণ। কাপালিকগণের মতেও সে বিষয়ে আর কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং তাঁহাদিগের উক্ত অনুমানে গৃহীত দৃষ্টান্ত শঙ্খের শুচিত্ববোধক শাস্ত্র অবশ্য মান্য, নচেৎ ঐরূপ অনুমানের প্রয়োগ হইতেই পারে না। সুতরাং মৃত নরের অস্থির অশুচিত্ববোধক যে বেদমূলক শাস্ত্র* আছে, তাহাও শঙ্খের শুচিত্ববোধক শাস্ত্রের সজাতীয় বলিয়া অবশ্য মান্য। তাহা হইলে সেই শাস্ত্র দ্বারা উক্ত অনুমানের বাধ বা অপ্রামাণ্য-নিশ্চয় হওয়ায় উহা আগমবিরুদ্ধ ন্যায়াভাস। কারণ, উক্ত অনুমানের উপজীব্য বা আশ্রয় শঙ্খের শুচিত্ববোধক যে শাস্ত্র, তাহার সজাতীয় বলিয়া ঐ বাধক শাস্ত্র ঐ অনুমান হইতে বলবত্তর।

---

* "নারং স্পৃষ্ট্বাস্থি সস্নেহং স্নাত্বা বিপ্রো বিশুধ্যতি।
আচম্যৈব তু নিঃস্নেহং গামালভ্যার্কমীক্ষ্য বা" ॥ মনু সং, ৫।৭।

"যোগ্যতা"-সিদ্ধান্ত গ্রন্থে চিন্তামণিকার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও উক্ত স্থলেই বলিয়াছেন,—"উপজীব্য-জাতীয়ত্বেন শব্দস্য বলবত্ত্বাৎ তেনৈব তদনুমানবাধাৎ"।

এবং "ব্রাহ্মণেন সুরা পেয়া—দ্রবদ্রব্যত্বাৎ ক্ষীরবৎ" এইরূপে ক্ষীর পানের ন্যায় ব্রাহ্মণের সুরাপান পাপজনক নহে, এইরূপ অনুমানও আগমবিরুদ্ধ 'ন্যায়াভাস"। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও "ব্রাহ্মণেন সুরা পেয়া" এইরূপ প্রতিজ্ঞাকে আগমবিরোধী প্রতিজ্ঞাভাস বলিয়াছেন। সেখানে "কিরণাবলী" টীকাকার মৈথিল উদয়নাচার্য্য এবং "ন্যায়কন্দলী" টীকাকার দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রীধরভট্ট প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, ক্ষীরপান ব্রাহ্মণের পাপজনক নহে, এ বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। সুতরাং উক্ত দৃষ্টান্তের সাধক শাস্ত্র-প্রমাণ যখন স্বীকৃত হইয়াছে—নচেৎ ঐরূপ অনুমান প্রয়োগ করাই যায় না—তখন ব্রাহ্মণের সুরাপাননিষেধক শাস্ত্রও অবশ্য মান্য। সুতরাং উক্তরূপ অনুমান সেই বলবত্তর শব্দপ্রমাণ দ্বারাই বাধিত হইবে। ব্রাহ্মণ যে প্রাণাত্যয়েও সুরাপান করিবেন না, ইহা শারীরক ভাষ্যে (৩।৪।৩০।৩১ সূঃ) আচার্য্য শঙ্করও সপ্রমাণ বলিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ অন্য কোন বলবত্তর শব্দপ্রমাণ বিরুদ্ধ হইলেও আগমবিরুদ্ধ ন্যায়াভাসই হইবে। যেমন উপমানবিরুদ্ধ যে অনুমান, তাহা সেই উপমানের মূলভূত শব্দ-প্রমাণবিরুদ্ধ হওয়ায় উহাকে আগমবিরুদ্ধ ন্যায়াভাসই বলা যায়। তাই ভাষ্যকার পৃথক্ করিয়া উপমানবিরুদ্ধ ন্যায়াভাস বলেন নাই। উদ্দ্যোতকরও ইহাই বলিয়াছেন। ভাষ্যোক্ত ঐ "আগম" শব্দের অর্থ কেবল শাস্ত্র নহে, শব্দপ্রমাণমাত্র।

ভাষ্যকার অনুমানবিরুদ্ধ ন্যায়াভাস বলেন নাই কেন? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, এক পদার্থে দুইটি বিরোধী অনুমানের সমাবেশ সম্ভবই হয় না। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র অনুমানবিরুদ্ধ ন্যায়াভাসও সমর্থন করিয়াছেন। তিনি উদ্দ্যোতকরের ঐ কথার গূঢ় তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, একই সময়ে পরস্পর নিরপেক্ষ সমর্থ অনুমানদ্বয়ের সমাবেশ সম্ভব নহে। কারণ, সেইরূপ স্থলে উভয় হেতুই তুল্যবল বিরোধী বলিয়া সৎপ্রতিপক্ষরূপ দুষ্ট হেতু হওয়ায় কোন হেতুর দ্বারাই অনুমিতিই জন্মে না। বার্ত্তিককার এই অভিপ্রায়েই ঐকথা বলিয়াছেন। কিন্তু যে স্থলে কোন অনুমান পূর্ব্বোৎপন্ন অপর অনুমানকে অপেক্ষা করে, সেই অপেক্ষিত অনুমান বিরোধী হইলে তাহা প্রবল বলিয়া, তাহার বাধ্য অনুমানের প্রতিবন্ধক হইবেই।

সুতরাং সেইরূপ স্থলে অনুমানবিরুদ্ধ ন্যায়াভাসই বক্তব্য। ভাষ্যকার তাহা না বলিলেও উহা তাঁহারও সম্মত।

যেমন কেহ যদি "অশ্রাবণঃ শব্দঃ" এইরূপে শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, ইহা অনুমান করেন, তাহা হইলে শ্রবণেন্দ্রিয় ও তাহার গ্রাহ্যস্বরূপ পদার্থ তাহাকে পূর্ব্বে সিদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্বে যে অনুমানপ্রমাণ দ্বারা তিনি উহা সিদ্ধ করিবেন, তদ্দ্বারা শব্দ যে শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ইহাই সিদ্ধ হওয়ায় শব্দে অশ্রাবণত্বের অনুমান বাধিত হইবে। সুতরাং উহা পূর্ব্বোৎপন্ন সেই বলবত্তর অনুমানবিরুদ্ধ ন্যায়াভাস। এবং 'ঈশ্বরো ন কর্ত্তা' এইরূপে ঈশ্বরে কর্ত্তৃত্বাভাবের অনুমান করিতে হইলে পূর্ব্বে যে অনুমান দ্বারা ঈশ্বররূপ পক্ষ বা ধর্ম্মী সিদ্ধ করা আবশ্যক, সেই অনুমান দ্বারা ঈশ্বরে কর্ত্তৃত্বও সিদ্ধ হওয়ায় তাঁহাতে কর্ত্তৃত্বাভাবের অনুমান পূর্ব্বোৎপন্ন সেই বলবত্তর অনুমানবিরুদ্ধ ন্যায়াভাস। কুমারিলভট্ট প্রভৃতিও অনুমানবিরুদ্ধ "পক্ষাভাস" বলিয়াছেন। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে।

ভাষ্য। তত্র* বাদজল্পৌ সপ্রয়োজনৌ, বিতণ্ডা তু পরীক্ষ্যতে। বিতণ্ডয়া প্রবর্ত্তমানো বৈতণ্ডিকঃ। স প্রয়োজনমনুযুক্তো যদি প্রতিপদ্যতে, সোঽস্য পক্ষঃ সোঽস্য সিদ্ধান্ত ইতি, বৈতণ্ডিকত্বং জহাতি। অথ ন প্রতিপদ্যতে, নায়ং লৌকিকো ন পরীক্ষক ইত্যাপদ্যতে।

অনুবাদ। সেই ন্যায়াভাসে—"বাদ" ও "জল্প" সপ্রয়োজন, অর্থাৎ বাদ ও জল্পের যে প্রয়োজন আছে, ইহা সর্ব্বসম্মত। কিন্তু বিতণ্ডাকে পরীক্ষা করিতেছি অর্থাৎ বিতণ্ডা সপ্রয়োজন, কি নিষ্প্রয়োজন, তাহা বিচার করিতেছি।

বিতণ্ডার দ্বারা প্রবর্ত্তমান ব্যক্তি বৈতণ্ডিক, অর্থাৎ যিনি "বিতণ্ডা" নামক

---

* যদিও প্রকৃত ন্যায়ে "বাদ" ও "জল্প" সপ্রয়োজন, ইহাই বক্তব্য, কিন্তু অব্যবহিত পূর্ব্বে ভাষ্যকার ন্যায়াভাসের উল্লেখ করায় শেষোক্ত "তৎ" শব্দের দ্বারা ন্যায়াভাসই বুঝা যায়। তাই উদ্দ্যোতকর এখানে ভাষ্যকারোক্ত "তত্র" এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"তস্মিন্ ন্যায়াভাসে"। টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, ন্যায়াভাসে বাদ ও জল্প সপ্রয়োজন, ইহা বলিলে প্রকৃত ন্যায়ে যে উহা সপ্রয়োজন, ইহাও বলা হয়। কারণ, বাদী ও প্রতিবাদী নিজ নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে সেখানে একের অনুমান ন্যায়াভাস হইলেও অপরের অনুমান প্রকৃত ন্যায়ই হইবে। সুতরাং ন্যায়াভাস স্থলেও প্রকৃত ন্যায় থাকায় উদ্দ্যোতকরের ঐ ব্যাখ্যা অসংগত হয় নাই।

বিচার করেন, তাঁহাকে বৈতণ্ডিক বলে। সেই বৈতণ্ডিক যদি (তাঁহার বিতণ্ডার) প্রয়োজন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেইটি ইহার পক্ষ, সেইটি ইহার সিদ্ধান্ত, ইহা স্বীকার করেন, তাহা হইলে (নিষ্প্রয়োজন বিতণ্ডাবাদীর মতে) বৈতণ্ডিকত্ব ত্যাগ করিলেন [অর্থাৎ স্বপক্ষসিদ্ধিই তাঁহার বিতণ্ডার প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করিলে, তখন তাঁহাকে বৈতণ্ডিক বলা যায় না]। আর যদি স্বীকার না করেন অর্থাৎ বৈতণ্ডিক যদি জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার স্বপক্ষ বা সিদ্ধান্ত কিছু স্বীকার না করেন, তাহা হইলে ইনি লৌকিক নহেন, পরীক্ষক নহেন অর্থাৎ বোদ্ধাও নহেন, বোধয়িতাও নহেন, ইহা আপত্তির বিষয় হয় অর্থাৎ তিনি নিষ্প্রয়োজন কথা বলায় সভ্য সমাজে উন্মত্তের ন্যায় উপেক্ষিত হইবেন।

টিপ্পনী :—"তত্র বাদজল্পৌ"—ইত্যাদি ভাষ্যসন্দর্ভ পূর্ব্বোক্ত "প্রয়োজন" পদার্থ ব্যাখ্যারই অঙ্গ। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত "প্রয়োজন" পদার্থের পরীক্ষা করিতেই পরে ঐ সমস্ত কথা বলিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বাপর সংগতি আছে। বাদী ও প্রতিবাদীর "বাদ", "জল্প" ও "বিতণ্ডা" নামক ত্রিবিধ বিচার-বাক্যের নাম "কথা"। কেবল তত্ত্ব-নির্ণয়োদ্দেশ্যে জিগীষাশূন্য গুরু শিষ্য প্রভৃতি বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারবাক্যসমূহের নাম 'বাদ"। জিগীষু বাদী ও প্রতিবাদীর জয়লাভরূপ মুখ্য উদ্দেশ্যে যথানিয়মে নিজ নিজ পক্ষ স্থাপনপূর্ব্বক বিচার-বাক্যের নাম "জল্প"। জিগীষু প্রতিবাদী নিজের কোন পক্ষ স্থাপন না করিয়া কেবল বাদীর পক্ষ স্থাপনার খণ্ডন করিতে যে সমস্ত বিচারবাক্য প্রয়োগ করেন, তাহার নাম "বিতণ্ডা"। দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রথমে উক্ত ত্রিবিধ "কথা"র লক্ষণাদি পাওয়া যাইবে। তন্মধ্যে "বাদ" ও "জল্পের" স্বপক্ষসিদ্ধিরূপ প্রয়োজন বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। সুতরাং উহার পরীক্ষা অনাবশ্যক। সংশয় ব্যতীত পরীক্ষাও হয় না। এই তাৎপর্য্যেই ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন,—"তত্র বাদ-জল্পৌ সপ্রয়োজনৌ"। অর্থাৎ বাদ ও জল্পের সপ্রয়োজনত্ব নির্ব্বিবাদ। কিন্তু "বিতণ্ডার" সপ্রয়োজনত্ব বিষয়ে বিবাদ আছে। কোন বৈতণ্ডিক সম্প্রদায় বলিতেন যে, বিতণ্ডা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যদি ইহাই সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে ভাষ্যকার যে পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—সমস্তই সপ্রয়োজন, নিষ্প্রয়োজন কিছুই নাই, এই সিদ্ধান্তের ভঙ্গ হয়। তাই ভাষ্যকার বিতণ্ডারও সপ্রয়োজনত্ব সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন,—"বিতণ্ডা তু পরীক্ষ্যতে"।

প্রাচীন কালে কোন বৈতণ্ডিকসম্প্রদায় যে "বিতণ্ডা"কে নিষ্প্রয়োজনই

বলিতেন ; ইহা বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরও বলিয়াছেন,—"একে তাবদ্বর্ণয়ন্তি নিষ্প্রয়োজনা, দূষণমাত্রত্বাৎ"। অর্থাৎ কোন সম্প্রদায় বলিতেন যে, বৈতণ্ডিকের নিজের কোন পক্ষ বা সিদ্ধান্ত নাই। স্বপক্ষ থাকিলে বৈতণ্ডিক কেন তাহার সংস্থাপন করিবেন না ? যাহার সংস্থাপন করা হয় না, তাহা স্বপক্ষ বলা যায় না। পরপক্ষ-খণ্ডন দ্বারাই স্বপক্ষ-সিদ্ধি হয়, ইহাও বলা যায় না। কারণ, কেহ পর্ব্বতে ধূম হেতুর দ্বারা বহ্নি সিদ্ধ করিতে গেলে প্রতিবাদী যদি পর্ব্বতে ধূমহেতু নাই, ইহা প্রতিপন্ন করেন, তাহা হইলেও পর্ব্বতে বহ্নির অভাব সিদ্ধ হয় না। কারণ, পর্ব্বতে ধূম না থাকিলেও বহ্নি থাকিতে পারে। সুতরাং বিতণ্ডা পরপক্ষের দূষণমাত্র, অতএব স্বপক্ষ-সিদ্ধি উহার প্রয়োজন বলা যায় না। অন্য কোন প্রয়োজনও বলা যায় না। অতএব বিতণ্ডা নিষ্প্রয়োজন। বস্তুতঃ সমস্তই যে সপ্রয়োজন, ইহা অন্য অনেক সম্প্রদায়ও স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে পরমেশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যের কারণ থাকিলেও প্রয়োজন নাই। কারণ ও প্রয়োজন, একই পদার্থ নহে। প্রয়োজনজ্ঞান ব্যতীতও মত্ত ব্যক্তি নৃত্য গানাদি করে। ধর্ম্মশাস্ত্রেও নিষেধবাক্য আছে,—"ন কুর্ব্বীত বৃথা চেষ্টাং"। কিন্তু নিষ্প্রয়োজন কর্ম্ম অসম্ভব বা অলীক হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রে উহার নিষেধ হইতে পারে না। "ভামতী" টীকায় (২।১।৩৩) বাচস্পতি মিশ্রও এ কথা বলিয়াছেন (চতুর্থ খণ্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সে যাহা হউক, বিতণ্ডা যে সপ্রয়োজন, ইহাও অন্যান্য অনেক সম্প্রদায়ই বলিয়াছেন। সুতরাং উক্ত বিষয়ে বিপ্রতিপত্তিবশতঃ মধ্যস্থ ব্যক্তিগণের সংশয় হওয়ায় সেই সংশয়-নিবৃত্তির জন্য বিতণ্ডার পরীক্ষা আবশ্যক। বিতণ্ডা সপ্রয়োজন, কি নিষ্প্রয়োজন, এ বিষয়ে বিচারই এখানে বিতণ্ডার পরীক্ষা।

বিতণ্ডার নিষ্প্রয়োজনত্ব পক্ষ খণ্ডন করিতে ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, বৈতণ্ডিক যদি জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার পক্ষ বা সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে সেই স্বপক্ষ-সিদ্ধিই তাঁহার বিতণ্ডার প্রয়োজন, ইহা তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন। তাহা হইলে তখন তিনি নিজমতে বৈতণ্ডিক হইতে পারিবেন না। ভাষ্যে "সোঽস্য সিদ্ধান্তঃ" এই বাক্য "সোঽস্য পক্ষঃ"—এই পূর্ব্ববাক্যেরই বিবরণ। প্রমাণাদির দ্বারা সংস্থাপন না করিলেও যাহা সংস্থাপনের যোগ্য তাহাকেই স্বপক্ষ বলা যায়। তাই সংস্থাপনের পূর্ব্বেও বাদীর সিদ্ধান্ত স্বপক্ষ নামে কথিত হইয়া থাকে। বৈতণ্ডিক প্রতিবাদীরও স্বপক্ষ অবশ্য আছে। কিন্তু তিনি তাহার সংস্থাপন করেন না। সর্ব্বত্র সেই

স্বপক্ষ সিদ্ধ হউক বা না হউক, পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করিতে পারিলেই উহা সিদ্ধ হইয়া যাইবে, এই অভিপ্রায়েই তিনি প্রমাণাদির দ্বারা উহার সংস্থাপন করেন না। বস্তুতঃ তাঁহারও গূঢ়ভাবে স্বপক্ষ আছেই এবং তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য। আর যদি তাহা কিছুতেই স্বীকার না করেন, তাহা হইলে তিনি নিষ্প্রয়োজনে সেই সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করিবেন কেন? যিনি সভ্যসমাজে উপস্থিত হইয়া এবং বিচারক পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দিয়াও বলিবেন যে, আমার কোন পক্ষ না থাকায় স্বপক্ষসিদ্ধি আমার বিতণ্ডার প্রয়োজন নহে, আমার বিতণ্ডা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু ইহা বলিলে তিনি লৌকিকও নহেন এবং পরীক্ষকও নহেন, অর্থাৎ তিনি উন্মত্তবৎ উপেক্ষণীয়, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কারণ, কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি নিষ্প্রয়োজনে ঐরূপ বহু কথা বলেন না। "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে"। বস্তুতঃ স্বপক্ষসিদ্ধিই বিতণ্ডার প্রয়োজন; সুতরাং বাদ ও জল্পের ন্যায় বিতণ্ডাও সপ্রয়োজন। কেবল পরপক্ষদূষণ মাত্রই বিতণ্ডা নহে। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরও সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন,—"ন দূষণমাত্রং বিতণ্ডা, কিন্তু অভ্যুপেত্য পক্ষং যো ন স্থাপয়তি, স বৈতণ্ডিক উচ্যতে"।

ভাষ্য। অথাপি পরপক্ষপ্রতিষেধজ্ঞাপনং প্রয়োজনং ব্রবীতি, এতদপি তাদৃগেব। যো জ্ঞাপয়তি, যো জানাতি, যেন জ্ঞাপ্যতে, যচ্চ জ্ঞাপ্যতে, এতচ্চ প্রতিপদ্যতে যদি, তদা বৈতণ্ডিকত্বং জহাতি। অথ ন প্রতিপদ্যতে, পরপক্ষপ্রতিষেধজ্ঞাপনং প্রয়োজনমিত্যেতদস্য বাক্যমনর্থকং ভবতি।

বাক্যসমূহশ্চ স্থাপনাহীনো বিতণ্ডা, তস্য যদ্যভিধেয়ং প্রতিপদ্যতে, সোঽস্য পক্ষঃ স্থাপনীয়ো ভবতি, অথ ন প্রতিপদ্যতে, প্রলাপমাত্রমনর্থকং ভবতি, বিতণ্ডাত্বং নিবর্ত্তত ইতি।

অনুবাদ :—আর যদি (বৈতণ্ডিক বিতণ্ডার প্রয়োজন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া) পরপক্ষ-প্রতিষেধ-জ্ঞাপনকে অর্থাৎ পরপক্ষ-সাধনের দোষ-প্রদর্শনকে প্রয়োজন বলেন, ইহাও সেইরূপই অর্থাৎ এ পক্ষেও পূর্ব্বোক্তপ্রকার দোষ অপরিহার্য্য। কারণ, যিনি বুঝাইবেন, যিনি বুঝিবেন, যাঁহার দ্বারা বুঝাইবেন

এবং যাহা বুঝাইবেন অর্থাৎ জ্ঞাপক, জ্ঞাতা, জ্ঞাপনের সাধন প্রমাণাদি এবং জ্ঞাপনীয়, এই চারিটি যদি স্বীকার করিলেন, তাহা হইলে (সেই শূন্যবাদী) বৈতণ্ডিকত্ব ত্যাগ করিলেন অর্থাৎ স্বপক্ষ স্বীকার করায় তাঁহার নিজমতানুসারে তাঁহাতে বৈতণ্ডিকত্ব নাই। আর যদি (পূর্ব্বোক্ত জ্ঞাপক প্রভৃতি পদার্থ) স্বীকার না করেন, (তাহা হইলে) ইঁহার "পরপক্ষ-প্রতিষেধ-জ্ঞাপনং প্রয়োজনং" এই বাক্য অনর্থক হয়।

পরন্তু স্বপক্ষের সংস্থাপনশূন্য বাক্যসমূহ "বিতণ্ডা"। (শূন্যবাদী) যদি সেই বাক্যসমূহের প্রতিপাদ্য স্বীকার করেন,—সেই ইঁহার পক্ষ স্থাপনীয় হয় [অর্থাৎ তাঁহার সেই সমস্ত বাক্যের প্রতিপাদ্য অর্থ তাঁহার পক্ষ বা সিদ্ধান্ত হওয়ায় উহা প্রমাণাদির দ্বারা সংস্থাপন করিতেই হইবে], আর যদি তিনি (তাঁহার "বিতণ্ডা" নামক বাক্যসমূহের প্রতিপাদ্য) স্বীকার না করেন, প্রলাপমাত্র অনর্থক হয়, বিতণ্ডাত্ব থাকে না [অর্থাৎ যাহার কোন প্রতিপাদ্যই নাই, তাহা বাক্যই হয় না, সুতরাং তাহা "বিতণ্ডা" হইতেই পারে না। তাহা নিরর্থক প্রলাপমাত্র]।

টিপ্পনী—ভাষ্যকার প্রথমে নিষ্প্রয়োজনবিতণ্ডাবাদীর মত খণ্ডন করিয়া, বিতণ্ডারও সপ্রয়োজনত্ব সমর্থন করিয়াছেন। তদ্দ্বারা গোতমোক্ত "প্রয়োজন" পদার্থও পরীক্ষিত হইয়াছে। পরে এই প্রসঙ্গে কোন শূন্যবাদী বৈতণ্ডিকের মত খণ্ডনের জন্য বলিয়াছেন, "অথাপি" ইত্যাদি। 'তাৎপর্য্যটীকা'কার বাচস্পতি মিশ্র এখানে কেবল নাস্তিকমত বলিয়াই শূন্যবাদীর যে মত বলিয়াছেন উক্ত বৌদ্ধমতে যে, কোন পদার্থেরই কোনরূপ সত্তাই নাই, ইহা বুঝা যায় না। উক্ত মতে পারমার্থিক সত্তা না থাকিলেও কল্পিত ব্যবহারিক সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে। উক্তরূপ বৌদ্ধমতে সমস্ত পদার্থই অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ সৎ ও অসৎ ইত্যাদি কোন প্রকারেই নিরূপণ করা যায় না। "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রীহর্ষও শেষে ইহাই বলিয়াছেন। কিন্তু মনে হয়, সর্ব্বনাস্তিত্ববাদও প্রাচীনকালে শূন্যবাদ বা "সর্ব্বশূন্যতাবাদ" নামে কথিত হইত। ভাষ্যকার পরে চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে সেই সর্ব্বশূন্যতাবাদীকে "আনুপলম্ভিক" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে ভাষ্যকারের খণ্ডনসন্দর্ভ দ্বারা বুঝা যায় যে, সেই সর্ব্বনাস্তিত্ববাদীই তাঁহার বুদ্ধিস্থ। উক্তরূপ শূন্যবাদীর নিজের কোন পক্ষ না থাকায় স্বপক্ষসিদ্ধি তাঁহার বিতণ্ডার প্রয়োজন, ইহা তিনি বলেন নাই। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে, কেবল পরপক্ষ খণ্ডনই আমার বিতণ্ডার প্রয়োজন।

আমি নিষ্প্রয়োজনে বিতণ্ডা করি না। ভাষ্যকার এতদুত্তরে বলিয়াছেন,—"এতদপি তাদৃগেব"। কারণ, যিনি পরপক্ষপ্রতিষেধের জ্ঞাপন করিবেন, সেই জ্ঞাপক পুরুষ এবং জ্ঞাতা পুরুষ এবং সেই জ্ঞাপনের সাধন ও সেই জ্ঞাপনীয় পদার্থ, এই চারিটি স্বীকার করিলে ঐ সমস্ত তাঁহার নিজসম্মত সিদ্ধান্ত হওয়ায় তিনি নিজমতে বৈতণ্ডিক হইতে পারেন না। কারণ, তিনি জ্ঞাপক ও জ্ঞাতা প্রভৃতি পদার্থ স্বীকার করিলে 'আমার কোন পক্ষ বা সিদ্ধান্ত নাই', এ কথা আর বলিতে পারেন না।

আর যদি উক্ত শূন্যবাদী বলেন যে, আমি সৎ বলিয়া কিছুই স্বীকার করি না। আমি "অসৎখ্যাতি"বাদী অর্থাৎ আমার মতে সর্ব্বত্র অসৎ পদার্থেরই ভ্রম হয়। জ্ঞাপক ও জ্ঞাতা প্রভৃতি সমস্তই কল্পিত অসৎ পদার্থ। সর্ব্বত্র অসৎ পদার্থের ভ্রমজ্ঞানের দ্বারাই সমস্ত ব্যবহার চলিতেছে। কিন্তু ইহা বলিলে পরপক্ষ-প্রতিষেধ-জ্ঞাপনই বিতণ্ডার প্রয়োজন, এই পূর্ব্বোক্ত কথা অনর্থক হয়। কারণ, উক্ত মতে ঐ পরপক্ষ-প্রতিষেধও যখন অসৎ পদার্থ, তখন উহার জ্ঞাপন হইতে পারে না। উক্ত শূন্যবাদীর মতে অসতের ভ্রমজ্ঞান হইলেও যাঁহারা "অসৎখ্যাতি" মানেন না, তাঁহাদিগের কখনই অসৎ পদার্থের ভ্রম জন্মে না। সুতরাং তাঁহাদিগকে অসৎ পদার্থের জ্ঞাপন অসম্ভব হওয়ায় শূন্যবাদীর ঐ কথা নিরর্থক। ফল কথা, উক্ত শূন্যবাদীর "বিতণ্ডা" করিতে হইলে তাঁহার জ্ঞাপনীয় পদার্থ তাঁহাকে সৎ বলিয়াই মানিতে হইবে এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞাপক প্রভৃতি পদার্থও তাঁহার সিদ্ধান্তরূপে স্বীকার্য্য হইবে। সুতরাং ফলে স্বপক্ষসিদ্ধিই তাঁহার বিতণ্ডার প্রয়োজন, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তিনি সেই প্রয়োজন অস্বীকার করায় বৈতণ্ডিক হইতে পারেন না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত নিষ্প্রয়োজন বিতণ্ডাবাদীর কথা ও তাঁহার কথা এক না হইলেও তুল্যদোষবশতঃ তুল্যই। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"এতদপি তাদৃগেব"।

ভাষ্যকার পরে শেষকথা বলিয়াছেন যে, স্বপক্ষ-স্থাপনাশূন্য বাক্যসমূহই বিতণ্ডা। সুতরাং উক্ত শূন্যবাদী তাঁহার "বিতণ্ডা" নামক সেই সমস্ত বাক্যের প্রতিপাদ্য স্বীকার করিতে বাধ্য। কারণ, প্রতিপাদ্য না থাকিলে তাহা বাক্যই হয় না, সুতরাং তাহাতে বিতণ্ডাত্ব থাকিতেই পারে না, তাহা নিরর্থক প্রলাপ-মাত্র। অতএব উক্ত শূন্যবাদী বিতণ্ডার দ্বারা বাদীর হেতুতে যে সমস্ত দোষ প্রদর্শন করেন, তাহা যে তাঁহার "বিতণ্ডা" নামক বাক্যের প্রতিপাদ্য, ইহা

তাঁহার স্বীকার্য্য। তাহা হইলে সেই সমস্ত দোষ তিনি স্বীকার করায় উহা তাঁহার স্বপক্ষ বা সিদ্ধান্ত বলিয়া সংস্থাপনীয় হইবে। সুতরাং উক্ত শূন্যবাদীর যে, স্বপক্ষ বা নিজ সিদ্ধান্ত কিছুই নাই, ইহা তিনি কখনই বলিতে পারেন না। তিনি বাদীর সম্মত প্রমাণাদি পদার্থ গ্রহণ করিয়াই বাদীর সংস্থাপিত পক্ষের খণ্ডন করেন, ইহা বলিলেও সেই সমস্ত পদার্থ তাঁহার নিজমতে অসৎ হইলে উহা তাঁহার বাক্যের প্রতিপাদ্য বলিতে পারেন না। কারণ, বাদীকে তিনি অসৎপদার্থ কোন বাক্যদ্বারাও বুঝাইতে পারেন না। যে বাদীর মতে অসৎপদার্থ কোন বাক্যের প্রতিপাদ্যই হয় না, তাঁহার নিকটে তিনি নিজ মতানুসারে বাক্য প্রয়োগ করিলে উহা অনর্থক বাক্যই হইবে। মূলকথা, বিতণ্ডারও প্রয়োজন আছে, উহা নিষ্প্রয়োজন নহে, এবং কেবলমাত্র পরপক্ষ-খণ্ডনও উহার প্রয়োজন হইতে পারে না। কিন্তু স্বপক্ষসিদ্ধিই উহার প্রয়োজন বলিতে হইবে। যিনিই বিতণ্ডা করিবেন, তাঁহাকে কোন স্বপক্ষ স্বীকার করিতেই হইবে। যদিও তিনি প্রমাণ দ্বারা সেই স্বপক্ষের সংস্থাপন করেন না, কিন্তু সেই স্বপক্ষের সিদ্ধিই তাঁহার বিতণ্ডার উদ্দেশ্য, ইহা স্বীকার্য্য।

ভাষ্য। অথ দৃষ্টান্তঃ, প্রত্যক্ষবিষয়োঽর্থো দৃষ্টান্তঃ, যত্র লৌকিক-পরীক্ষকাণাং দর্শনং ন ব্যাহন্যতে। স চ প্রমেয়ং, তস্য পৃথগ্‌বচনঞ্চ—তদাশ্রয়াবনুমানাগমৌ, তস্মিন্ সতি স্যাতামনু-মানাগমাবসতি চ ন স্যাতাং। তদাশ্রয়া চ ন্যায়প্রবৃত্তিঃ। দৃষ্টান্তবিরোধেন চ পরপক্ষপ্রতিষেধো বচনীয়ো ভবতি, দৃষ্টান্তসমাধিনা চ স্বপক্ষঃ সাধনীয়ো ভবতি। নাস্তিকশ্চ দৃষ্টান্ত-মভ্যুপগচ্ছন্নাস্তিকত্বং জহাতি, অনভ্যুপগচ্ছন্ কিং সাধনঃ পরমুপালভেতেতি। নিরুক্তেন চ দৃষ্টান্তেন শক্যমভিধাতুং 'সাধ্যসাধর্ম্ম্যাত্তদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণং,' 'তদ্বিপর্য্যয়াদ্বা বিপরীত'মিতি।

অনুবাদ:—অনন্তর "দৃষ্টান্ত" কথিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষের বিষয় পদার্থ দৃষ্টান্ত। ফলিতার্থ এই যে, যে পদার্থে লৌকিকদিগের এবং পরীক্ষকদিগের জ্ঞান ব্যাহত হয় না, সেই দৃষ্টান্তও প্রমেয়। তাহার পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন,

যেহেতু* অনুমান ও শব্দপ্রমাণ সেই দৃষ্টান্ত পদার্থের আশ্রিত, অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থ ঐ প্রমাণদ্বয়ের আশ্রয় বা নিমিত্ত। বিশদার্থ এই যে—সেই দৃষ্টান্ত থাকিলে অনুমান ও শব্দপ্রমাণ থাকিতে পারে, না থাকিলে থাকিতে পারে না এবং 'ন্যায়প্রবৃত্তি' অর্থাৎ পঞ্চাবয়বাত্মক বাক্যরূপ ন্যায়ের প্রকাশও সেই দৃষ্টান্তের আশ্রিত অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থও তাহার আশ্রয় বা নিমিত্ত।

এবং দৃষ্টান্তবিরোধের দ্বারা অর্থাৎ দৃষ্টান্তবিরোধ দোষ প্রদর্শন করিয়া পরপক্ষপ্রতিষেধ বচনীয় হয় অর্থাৎ দূষিত করিতে পারা যায় এবং দৃষ্টান্তের অবিরোধের দ্বারা নিজপক্ষ সাধনীয় হয় অর্থাৎ সাধন করিতে পারা যায়। নাস্তিক কিন্তু দৃষ্টান্ত পদার্থ স্বীকার করিলেই নাস্তিকত্ব ত্যাগ করিবেন [অর্থাৎ সর্ব্বশূন্যতাবাদী নাস্তিক সমস্ত পদার্থকে অসৎ বলিয়াও পরে কোন দৃষ্টান্ত পদার্থের সত্তা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলে তাঁহাকে আস্তিকমতই গ্রহণ করিতে হইবে], অস্বীকার করিলে কোন্ সাধনবান্ হইয়া অর্থাৎ কোন্ সাধনের সাহায্যে পরকে উপালম্ভ করিবেন ? [অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থের সত্তা স্বীকার না করিলে তিনি বৈতণ্ডিক হইয়া পরপক্ষের সাধনকে খণ্ডন করিতেও পারেন না] এবং নিরুক্ত অর্থাৎ পূর্ব্বে লক্ষিত দৃষ্টান্ত পদার্থের দ্বারা (মহর্ষি) "সাধ্য-সাধর্ম্ম্যাত্তদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণং," এবং "তদ্বিপর্য্যয়াদ্বা বিপরীতং"—অর্থাৎ এই দুইটি সূত্র (১অঃ, ৩৬।৩৭) বলিতে পারেন, [অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থ কি, তাহা বিশেষ করিয়া না বলিলে মহর্ষি পরে যে উদাহরণ-বাক্যের দুইটি লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহা বলিতে পারেন না। কারণ, দৃষ্টান্ত না বুঝিলে সে লক্ষণ বুঝা যায় না]।

ভাষ্য। অস্ত্যয়মিত্যভ্যনুজ্ঞায়মানোঽর্থঃ সিদ্ধান্তঃ, স চ প্রমেয়ং, তস্য পৃথগ্‌বচনং সৎস্থ সিদ্ধান্তভেদেষু বাদ-জল্প-বিতণ্ডাঃ প্রবর্ত্তন্তে, নাতোঽন্যথেতি।

অনুবাদ ঃ—ইহা আছে অর্থাৎ এই পদার্থ ইহা এবং এইপ্রকার,—এইরূপে স্বীক্রিয়মাণ পদার্থ সিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্ত পদার্থও প্রমেয়। সিদ্ধান্তের প্রকারভেদ থাকাতেই বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা প্রবৃত্ত হয়, ইহার অন্যথা অর্থাৎ

* ভাষ্যে "তস্য পৃথগ্‌বচনঞ্চ" এই স্থলে "চ" শব্দের হেতু অর্থও বুঝা যায়। অনেক পূর্ব্বাচার্য্য হেতু অর্থেও "চ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কুসুমাঞ্জলির প্রথম স্তবকে, সপ্তম কারিকায় উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন,—"শক্তিভেদো নচাভিন্নঃ"। হরিদাস ব্যাখ্যা করিয়াছেন "অভিন্নো—ষতঃ, চো হেতৌ"।

সিদ্ধান্তের কোন ভেদ না থাকিলে বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা প্রবৃত্ত হয় না—এ জন্য সেই সিদ্ধান্তে পদার্থের পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে।

টিপ্পনী ঃ—প্রথম সূত্রে প্রয়োজন পদার্থের পরে দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত পদার্থের উল্লেখ হইয়াছে। যদি প্রমেয় পদার্থের মধ্যেই দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত পদার্থ থাকে, তাহা হইলে উহার পৃথক্ উল্লেখ অনাবশ্যক। কিন্তু মহর্ষি পরে যে আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থকে "প্রমেয়" বলিয়াছেন, তন্মধ্যে দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত পদার্থ নাই। তবে ভাষ্যকার "স চ প্রমেয়ং" এই কথা কিরূপে বলিয়াছেন ? এইরূপ প্রশ্ন অবশ্যই হইবে। তাই বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন, "সোঽয়ং দৃষ্টান্তঃ প্রমেয়মুপলব্ধিবিষয়ত্বাৎ"। তাৎপর্য্য এই যে, মহর্ষির পরিভাষিত দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের মধ্যে "দৃষ্টান্ত" নামক পদার্থের উল্লেখ না থাকিলেও উহা সামান্য প্রমেয় পদার্থে অন্তর্ভূ`ত। মহর্ষি তাঁহার কথিত প্রমাণ পদার্থের মধ্যে "বুদ্ধি" বা উপলব্ধিকে পঞ্চম প্রমেয় বলায় সেই উপলব্ধির বিষয় পদার্থমাত্রই যে সামান্যতঃ প্রমেয় পদার্থ, ইহাও সূচিত হইয়াছে। নচেৎ তাঁহার অনুক্ত যে সমস্ত পদার্থ প্রমাণদ্বারা উপলব্ধির বিষয় হয়, তাহা তাঁহার মতে কি পদার্থ হইবে ? সুতরাং দৃষ্টান্ত পদার্থ যখন সামান্য প্রমেয়েই অন্তর্ভূ`ত, তখন উহার পৃথক্ উল্লেখ অনাবশ্যক, ইহাই পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য।

অবশ্য উদ্দ্যোতকর শাস্ত্রার্থনিশ্চয়রূপ জ্ঞানবিশেষকে সিদ্ধান্ত পদার্থ বলায় তাঁহার মতে উহা বিশেষ প্রমেয়েই অন্তর্ভূ`ত বলা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার সেই নিশ্চিত শাস্ত্রার্থকেই সিদ্ধান্ত পদার্থ বলায় তাঁহার মতে সিদ্ধান্তত্বরূপে উহাও সামান্য প্রমেয়ে অন্তর্ভূ`ত, ইহাই বুঝিতে হইবে। সুতরাং ভাষ্যকার পূর্ব্বে "সংশয়াদয়ো হি যথাসম্ভবং প্রমাণেষু প্রমেয়েষু চান্তর্ভবন্তো ন ব্যতিরিচ্যন্তে"—এই সন্দর্ভে "প্রমেয়েষু" এই বহুবচনান্ত পদের দ্বারা গোতমের সম্মত সামান্য প্রমেয়ও গ্রহণ করিয়াছেন এবং "যথাসম্ভবং" এই পদের দ্বারা কোন কোন পদার্থের সামান্য প্রমেয়েও অন্তর্ভাব তাঁহার বিবক্ষিত, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু মহর্ষি গোতম প্রথম সূত্রে তাঁহার সম্মত বহু সামান্য প্রমেয়ের পৃথক্ উল্লেখ না করিয়া, দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত পদার্থের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন কেন ? ইহা বলা আবশ্যক। তাই ভাষ্যকার এখানে প্রথমে দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত পদার্থের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া, উহারও পৃথক্ উল্লেখের কারণ বলিয়াছেন।

ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন,—'প্রত্যক্ষবিষয়োঽর্থো দৃষ্টান্তঃ"। কিন্তু দৃষ্টান্ত পদার্থমাত্রই প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। কারণ, অনেক অতীন্দ্রিয় পদার্থও

দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে। মহর্ষি গোতমও সেইরূপ পদার্থকে দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র এ বিষয়ে বিচার করিয়া পরে বলিয়াছেন,—"প্রত্যক্ষমূলত্বাদ্বা প্রত্যক্ষো দৃষ্টান্তঃ"। অর্থাৎ দৃষ্টান্তের মূল প্রত্যক্ষ বলিয়া ভাষ্যকার ঐ কথা বলিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ স্থলে যেমন দৃষ্টান্ত আবশ্যক হয় না, তদ্রূপ কোন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে তাহার অপর দৃষ্টান্ত আবশ্যক হয় না। প্রত্যক্ষ বিষয়ে যেমন বিবাদ থাকে না, তদ্রূপ প্রকৃত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেও বিবাদ-নিবৃত্তি হয়, এই তাৎপর্য্যেই ভাষ্যকার প্রথমে ঐ কথা বলিয়াছেন এবং পরে তাঁহার বিবক্ষিত ফলিতার্থ প্রকাশ করিবার জন্যই মহর্ষি গোতমের দৃষ্টান্তলক্ষণ-সূত্রানুসারে বলিয়াছেন,—"যত্র লৌকিকপরীক্ষকানাং দর্শনং ন ব্যাহন্যতে"। যিনি বোদ্ধা, তিনি লৌকিক আর যিনি বোধয়িতা, তিনি পরীক্ষক। ফলিতার্থ এই যে, যে পদার্থ বোদ্ধা ও বোধয়িতার বুদ্ধির সাম্য বা অবিরোধের হেতু, তাহা দৃষ্টান্ত। ঐরূপ পদার্থ না হইলে তাহা দৃষ্টান্ত হইবে না, ইহাই তাৎপর্য্য। পরে গোতমোক্ত দৃষ্টান্তলক্ষণসূত্রের ব্যাখ্যায় অন্যান্য কথা পাওয়া যাইবে। সিদ্ধান্ত পদার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যাও পরে পাওয়া যাইবে।

দৃষ্টান্ত পদার্থের বিশেষ উল্লেখ কেন হইয়াছে, ভাষ্যকার তাহার কয়েকটি কারণ বলিয়াছেন। প্রথম কারণ, দৃষ্টান্ত অনুমান-প্রমাণের একটা নিমিত্ত, দৃষ্টান্ত ব্যতীত অনুমান-প্রমাণ থাকিতেই পারে না। যে হেতুর দ্বারা যে পদার্থের অনুমান করিতে হইবে, সেই হেতুতে সেই অনুমেয় পদার্থের ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের জন্য অর্থাৎ সেই হেতু পদার্থটি যেখানে যেখানে থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই সেই অনুমেয় পদার্থটি থাকে, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝিবার জন্য দৃষ্টান্ত আবশ্যক, নচেৎ ব্যাপ্তিনিশ্চয় না হওয়ায় অনুমান হইতে পারে না। এইরূপ শব্দপ্রমাণেও দৃষ্টান্ত আবশ্যক হয়। কারণ, সর্ব্বপ্রথম কোন শব্দ শ্রবণ করিলেও শাব্দ বোধ হয় না। শাব্দ বোধে শব্দ ও অর্থের সংকেতরূপ সম্বন্ধ-জ্ঞান আবশ্যক, তাহাতে দৃষ্টান্ত আবশ্যক। কারণ, লোক সমস্ত পূর্ব্বজ্ঞাত পদার্থকেই অপর ব্যক্তিকে শব্দের দ্বারা প্রকাশ করে ; সুতরাং পূর্ব্ববোধানুসারে দৃষ্টান্তের সাহায্যেই শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ জ্ঞান হয়, নচেৎ প্রথম শব্দ শুনিয়াই শাব্দ বোধ হইত। যে শব্দের যে অর্থ যে কোন উপায়ে পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, তদনুসারেই আমরা শব্দ প্রয়োগ করি এবং পূর্ব্বদৃষ্টান্তে পূর্ব্ববৎ তাহার অর্থবোধ করি ; সুতরাং দৃষ্টান্ত না থাকিলে শব্দপ্রমাণও থাকিতে পারে না। এবং পরার্থ অনুমানের জন্য প্রতিজ্ঞাদি

পঞ্চাবয়বরূপ ন্যায়বাক্য-প্রয়োগও দৃষ্টান্ত পদার্থ ব্যতীত সম্ভব হয় না। সুতরাং সে জন্যও দৃষ্টান্ত পদার্থের বিশেষ জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

ভাষ্যকার দৃষ্টান্ত পদার্থের পৃথক উল্লেখের আরও কারণ বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী পরপক্ষ-খণ্ডনের জন্য কোন দৃষ্টান্ত বলিলে, যদি সেই দৃষ্টান্ত বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই বিরোধ প্রদর্শন করিয়া প্রতিবাদীর সেই খণ্ডনকে দূষিত করা যায় এবং নিজের কথিত দৃষ্টান্তের অবিরোধ প্রদর্শন করিয়া নিজ পক্ষের সাধন করিতে পারা যায়। সুতরাং এজন্যও দৃষ্টান্ত পদার্থের বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। কিন্তু সর্ব্বশূন্যতাবাদী যে নাস্তিক দৃষ্টান্ত পদার্থের সত্তাই মানেন না, তিনি কিরূপে বিতণ্ডার দ্বারা পরপক্ষের খণ্ডন করিবেন? দৃষ্টান্ত ব্যতীত তাঁহার পরপক্ষখণ্ডনও সম্ভব হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত পদার্থের সত্তা স্বীকার করিলে কিন্তু তাঁহার নাস্তিকত্ব অর্থাৎ "সর্ব্বং নাস্তি" এই মত থাকে না, উহা পরিত্যাগ করিতে হয়। আর সর্ব্বাস্তিবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও সকল পদার্থের ক্ষণকালমাত্রস্থায়িত্বরূপ ক্ষণিকত্ব স্বীকার করায় কোন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন না। কারণ, যাহা বহু পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, এমন পদার্থকে দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করা যায় না। সুতরাং দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য স্থায়ী পদার্থ স্বীকার করিতে হইলে নিজসিদ্ধান্ত-ভঙ্গ হইবে। ফলকথা, নাস্তিক-নিরাসের জন্যও দৃষ্টান্ত পদার্থের বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক।

ভাষ্যকার দৃষ্টান্ত পদার্থের পৃথক্ উল্লেখের শেষ হেতু বলিয়াছেন যে, দৃষ্টান্ত পদার্থের লক্ষণ না বলিলে মহর্ষি পরে যে, তৃতীয় অবয়ব উদাহরণ-বাক্যের দুইটি লক্ষণসূত্র বলিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। কারণ, দৃষ্টান্ত পদার্থের স্বরূপ না জানিলে সেই সূত্রার্থ বুঝা যায় না। সুতরাং পূর্ব্বে দৃষ্টান্ত পদার্থের লক্ষণ বক্তব্য হওয়ায় তৎপূর্ব্বে উহার উদ্দেশ কর্ত্তব্য। ভাষ্যকার এখানে মহর্ষির যে দুইটি সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার অর্থ যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। কোন পুস্তকে 'নিরুক্তে চ দৃষ্টান্তে' এইরূপ ভাষ্যপাঠ আছে। দৃষ্টান্ত নিরুক্ত অর্থাৎ নিরূপিত হইলেই মহর্ষি উক্ত সূত্রদ্বয় বলিতে পারেন, ইহাই ঐ পাঠ-পক্ষে ভাষ্যার্থ।

ভাষ্যকার সিদ্ধান্ত পদার্থের পৃথক উল্লেখের কারণ বলিয়াছেন যে, সিদ্ধান্তের নানা ভেদ আছে বলিয়াই বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা নামক ত্রিবিধ বিচার প্রবৃত্ত হইতেছে, নচেৎ তাহা হইতেই পারে না। সুতরাং মহর্ষি সিদ্ধান্ত পদার্থের উল্লেখ করিয়া, পরে উহাকে চতুর্ব্বিধ বলিয়া, সেই চতুর্ব্বিধ সিদ্ধান্তের লক্ষণ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত "সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত" অস্বীকার করিলে অথবা

উহা না জানিলে কোন বিচারই হইতে পারে না। কারণ, যদি শব্দাদি ধর্ম্মীই অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উহা নিত্য, কি অনিত্য, দ্রব্য, কি গুণ, পরিণাম, কি বিবর্ত্ত, এইরূপে তাহার ধর্ম্মবিচার সম্ভবই হয় না। এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যে সমস্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত অর্থাৎ মহর্ষি গোতম যাহাকে বলিয়াছেন, "প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত", সে সমস্তও বিশেষরূপে না জানিলেও বিচারই হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত সিদ্ধান্ত পদার্থের বিশেষরূপে জ্ঞানের জন্যই মহর্ষি উহার পৃথক উল্লেখ করিয়াছেন।

ভাষ্য। সাধনীয়ার্থস্য যাবতি শব্দসমূহে সিদ্ধিঃ পরিসমাপ্যতে, তস্য পঞ্চাবয়বাঃ প্রতিজ্ঞাদয়ঃ সমূহমপেক্ষ্যাবয়বা উচ্যন্তে। তেষু প্রমাণসমবায়ঃ। আগমঃ প্রতিজ্ঞা, হেতুরনুমানং, উদাহরণং প্রত্যক্ষং, উপমানমুপনয়ঃ, সর্ব্বেষামেকার্থসমবায়ে সামর্থ্যপ্রদর্শনং নিগমনমিতি। সোঽয়ং পরমো ন্যায় ইতি। এতেন বাদ-জল্প-বিতণ্ডাঃ প্রবর্ত্তন্তে, নাতোঽন্যথেতি। তদাশ্রয়া চ তত্ত্বব্যবস্থা। তে চৈতেঽবয়বাঃ শব্দবিশেষাঃ সন্তঃ প্রমেয়েঽন্তর্ভূতা এবমর্থং পৃথগুচ্যন্ত ইতি।

অনুবাদঃ—যতগুলি শব্দসমূহে (বাক্যসমূহে) সাধনীয় পদার্থের সিদ্ধি অর্থাৎ বাস্তব ধর্ম্ম পরিসমাপ্ত অর্থাৎ বিশেষরূপে নিশ্চিত হয়, সেই বাক্য-সমষ্টির প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি অর্থাৎ "প্রতিজ্ঞা", "হেতু", "উদাহরণ", "উপনয়" ও "নিগমন",—এই পাঁচটি অংশ, সমূহকে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি নিগমন পর্য্যন্ত বাক্যসমষ্টিকে অপেক্ষা করিয়া "অবয়ব" বলিয়া কথিত হইয়াছে। সেই পঞ্চাবয়বে প্রমাণসমূহের অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি চারিটী প্রমাণেরই মেলন আছে। (কিরূপে আছে, তাহা বলিতেছেন) "প্রতিজ্ঞা" শব্দপ্রমাণ, "হেতু" অনুমান-প্রমাণ, "উদাহরণ" প্রত্যক্ষ-প্রমাণ, "উপনয়" উপমান-প্রমাণ,—সকলের অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি চারিটী অবয়বের এবং তাহাদিগের মূলীভূত প্রমাণ-চতুষ্টয়ের একার্থসমবায়ে অর্থাৎ একটি প্রতিপাদ্যের সহিত সম্বন্ধ বিষয়ে অথবা উহাদিগের একবাক্যতা-বুদ্ধিতে সামর্থ্য প্রদর্শন অর্থাৎ পরস্পর সাকাঙ্ক্ষতার প্রদর্শক বাক্য "নিগমন"। ইহা সেই পরম "ন্যায়" (অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি নিগমন পর্য্যন্ত পাঁচটি বাক্যের সমষ্টি সর্ব্বপ্রমাণমূলক বলিয়া ইহাকে পরম

"ন্যায়" বলে।) এই ন্যায়ের দ্বারা বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা (ত্রিবিধ বিচার) প্রবৃত্ত হয়, ইহার অন্যথায় হয় না, (অর্থাৎ আর কোনও প্রকারে ঐ বিচার হয় না, কদাচিৎ বাদ-বিচার হইলেও জল্প ও বিতণ্ডা কখনই হয় না) এবং তত্ত্বের ব্যবস্থা অর্থাৎ ইহাই তত্ত্ব, অন্যটি তত্ত্ব নহে, এইরূপ তত্ত্বের নিয়ম বা নির্ণয় সেই ন্যায়ের আশ্রিত (ন্যায়ের অধীন)।

সেই এই অবয়বগুলি (প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চাবয়ব) শব্দবিশেষ হওয়ায় প্রমেয়ে (মহর্ষি-কথিত প্রমেয় পদার্থে) অন্তর্ভূত হইয়াও এই নিমিত্ত অর্থাৎ ইহাদিগের মূলে সমস্ত প্রমাণ থাকে,—ইহারা একবাক্য ভাবে মিলিত হইয়া বিরুদ্ধবাদীকে তত্ত্বপ্রতিপাদন করে, তত্ত্বব্যবস্থা ইহাদিগের অধীন, ইত্যাদি কারণে পৃথক্ উক্ত হইয়াছে।

টিপ্পনী :—যেমন পরার্থানুমানকে "ন্যায়" বলে, তদ্রূপ ঐ পরার্থানুমানে "প্রতিজ্ঞা" প্রভৃতি "নিগমন" পর্য্যন্ত যে পাঁচটি বাক্য-প্রয়োগ করিতে হয়, যথাক্রমে প্রযুক্ত ঐ বাক্যসমষ্টিকেও "ন্যায়" বলে। ভাষ্যকারও এখানে তাহাকে "পরম ন্যায়" বলিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। নীয়তে ('নি' নিশ্চয়েন ঈয়তে) জ্ঞায়তে অনেন' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে নি পূর্ব্বক ইণ্ ধাতুর উত্তর করণবাচ্য ঘঞ্ প্রত্যয়ে উক্ত "ন্যায়" শব্দটি সিদ্ধ হইয়াছে ; পূর্ব্বেও (৩১ পৃ:) এইরূপ বুঝিতে হইবে। প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের লক্ষণ মহর্ষি পরে নিজেই বলিয়াছেন। পরার্থানুমান স্থলে ঐ "ন্যায়" নামক বাক্যসমূহে সাধ্যসিদ্ধি পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ উহারই এক একটি অংশ "প্রতিজ্ঞা" প্রভৃতি পাঁচটী বাক্যের দ্বারা সাধনীয় পদার্থের বাস্তব ধর্ম্ম বিশেষরূপে নিশ্চিত হইয়া যায়। ভাষ্যে "সিদ্ধি" শব্দের দ্বারা বাস্তব ধর্ম্ম এবং "পরিসমাপ্তি" বলিতে তাহার নিশ্চয় বুঝিতে হইবে। উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র তাহাই বলিয়াছেন। যে ধর্ম্মটি সাধন করিতে ইচ্ছা হইবে, ঐ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীই এখানে সাধনীয় পদার্থ। ঐ ধর্ম্মীতে সেই ধর্ম্মটি বস্তুতঃ থাকিলেই তাহা ঐ ধর্ম্মীর বাস্তব ধর্ম্ম হয় ; ঐ বাস্তব ধর্ম্মের নিশ্চয় অর্থাৎ ধর্ম্মীকে সেই ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া নিশ্চয়ই ন্যায়ের পরিসমাপ্তি বা চরম ফল। ভাষ্যে "শব্দসমূহে" এই পদে নিমিত্তার্থে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে।

প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটী বাক্যের প্রত্যেকটী পূর্ব্বোক্ত "ন্যায়" নামক বাক্য-সমষ্টির অপেক্ষায় ব্যষ্টি, তাই ঐ সমষ্টিকে অপেক্ষা করিয়া "প্রতিজ্ঞা" প্রভৃতিকে "অবয়ব" বলা হইয়াছে, "অবয়ব" শব্দের দ্বারা একদেশ বা অংশ বুঝা যায়।

তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, দ্রব্যের উপাদান-কারণকেই "অবয়ব" বলে। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটী বাক্য ন্যায়-বাক্যের উপাদান-কারণ হইতে পারে না, কিন্তু যেমন উপাদান-কারণ অবয়বগুলি মিলিত হইয়া একটী অবয়বী দ্রব্যকে ধারণ করে, তদ্রূপ প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটী বাক্য মিলিত হইয়া "ন্যায়" বাক্যের প্রতিপাদ্য, একটী বিবক্ষিতার্থের প্রতিপাদন করে, তাই উহারা অবয়বসদৃশ বলিয়া "অবয়ব" নামে কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ ঐগুলি অবয়বসদৃশ বলিয়াই উহাতে "অবয়ব" শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে। প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব পদার্থগুলি বাক্যরূপ শব্দ, সুতরাং উহা গোতমোক্ত চতুর্থ প্রমেয় পদার্থেই অন্তর্ভূত। কারণ, গোতম পরে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দকে "অর্থ" নামক চতুর্থ প্রমেয় বলিয়াছেন। কিন্তু উক্ত অবয়ব পদার্থের বিশেষ জ্ঞান-সম্পাদনের জন্য উহার পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকার পরে তাহা বলিয়াছেন এবং সেই পৃথক্ উল্লেখের বিশেষ কারণ প্রকাশ করিতে পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—"তেষু প্রমাণসমবায়ঃ" ইত্যাদি।

সেই অবয়বসমূহের মূলে গোতমোক্ত চতুর্ব্বিধ প্রমাণ থাকে, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার প্রতিজ্ঞা-বাক্যকে আগমপ্রমাণ, হেতুবাক্যকে অনুমানপ্রমাণ, উদাহরণ-বাক্যকে প্রত্যক্ষপ্রমাণ এবং উপনয়বাক্যকে উপমানপ্রমাণ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রতিজ্ঞাদি চারিটী বাক্যই যে, উক্ত চতুর্ব্বিধ প্রমাণ, ইহা ভাষ্যকারের বিবক্ষিত নহে। পূর্ব্বে "তেষু প্রমাণসমবায়ঃ" এই কথার দ্বারাই ভাষ্যকার ব্যক্ত করিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞাদি অবয়বগুলি গোতমোক্ত চতুর্ব্বিধ প্রমাণমূলক। তাই ঐ তাৎপর্য্যেই পরে প্রতিজ্ঞাদি অবয়বচতুষ্টয়কে আগম প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ প্রমাণ বলিয়াছেন। অর্থাৎ ভাষ্যকারের "আগমঃ প্রতিজ্ঞা" ইত্যাদি প্রয়োগ ঔপচারিক প্রয়োগ। ভাষ্যকার পূর্ব্বেও ঐ তাৎপর্য্যে প্রতিজ্ঞাদি অবয়বচতুষ্টয়কে "প্রমাণ" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন,—"প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ"।

বস্তুতঃ প্রমাণ ব্যতীত কেবল উক্ত প্রতিজ্ঞাদি বাক্যমাত্র দ্বারা কোন তত্ত্ব-নির্ণয় হইতে পারে না। কিন্তু উক্ত প্রতিজ্ঞাদি বাক্যচতুষ্টয়, উহাদিগের মূলীভূত প্রমাণচতুষ্টয়ের ব্যাপার। সুতরাং সেই প্রমাণচতুষ্টয়ই উক্ত বাক্যচতুষ্টয়ের উত্থাপক হইয়া তদ্দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় জন্মায়। তাই ভাষ্যকার উক্ত পঞ্চাবয়ব রূপ ন্যায়বাক্যকে বলিয়াছেন,—"সোঽয়ং পরমো ন্যায়ঃ"।

পরম ন্যায় কি? উক্তরূপ ন্যায়ের পরমত্ব কি? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন,—"বিপ্রতিপন্নপুরুষপ্রতিপাদকত্বং"। যাঁহারা বিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থন

করেন, সেই সমস্ত বিরুদ্ধপক্ষপাতী পুরুষকে বলে বিপ্রতিপন্ন পুরুষ। তাঁহাদিগকে তত্ত্ব প্রতিপাদন করিতে হইলে বিচার আবশ্যক। এক একটী প্রমাণ পৃথক্‌ভাবে বিপ্রতিপন্ন ব্যক্তিকে প্রতিপন্ন করিতে পারে না। লৌকিক বিষয়ে তাহা সম্ভব হইলেও আত্মার নিত্যত্ব, বেদের প্রামাণ্য ও পরলোকাদি অলৌকিক বিষয়ে সর্ব্বত্র তাহা সম্ভব হয় না। প্রকৃত সিদ্ধান্তে বেদপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেও সেই বেদবাক্যের অন্যথা ব্যাখ্যা করিয়াও বিপ্রতিপন্ন ব্যক্তিগণ নিজ পক্ষ রক্ষা করিতে ব্যগ্র হইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে প্রকৃত তত্ত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য সর্ব্বপ্রমাণমূলক প্রকৃত ন্যায়বাক্যের প্রয়োগ কর্ত্তব্য। সেই ন্যায়বাক্যের মূলীভূত প্রমাণচতুষ্টয় মিলিত হইয়া সেখানে যে তত্ত্বের নিশ্চয় জন্মাইবে, তাহাই প্রকৃত তত্ত্ব বলিয়া বিপ্রতিপন্ন পুরুষেরও গ্রাহ্য হইবে। কারণ, তাহা সেখানে সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধ তত্ত্ব। তাই ভাষ্যকার উক্তরূপ ন্যায়বাক্যকে "পরম" অর্থাৎ বিপ্রতিপন্ন পুরুষের প্রতিপাদক ন্যায় বলিয়াছেন এবং পরে বলিয়াছেন,—"তদাশ্রয়া চ তত্ত্বব্যবস্থা"। প্রতিজ্ঞাদি অবয়বচতুষ্টয়কে ভাষ্যকার কিরূপে আগমাদি প্রমাণ বলিয়াছেন, এ বিষয়ে তাঁহার কথা পরে নিগমন-সূত্রভাষ্যে (৩৯ সূত্রভাষ্যে) পাওয়া যাইবে।

ভাষ্য। তর্কো ন প্রমাণসংগৃহীতো ন প্রমাণান্তরং, প্রমাণানামনুগ্রাহকস্তত্ত্বজ্ঞানায় কল্পতে। তস্যোদাহরণং,—কিমিদং জন্ম কৃতকেন হেতুনা নির্ব্বর্ত্ত্যতে ? আহোস্বিদকৃতকেন ? অথাকস্মিকমিতি। এবমবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্ত্যা ঊহঃ প্রবর্ত্ততে,—যদি কৃতকেন হেতুনা নির্ব্বর্ত্ত্যতে হেতূচ্ছেদাদুপপন্নোঽয়ং জন্মোচ্ছেদঃ। অথাকৃতকেন হেতুনা, ততো হেতূচ্ছেদস্যাশক্যত্বাদনুপপন্নো জন্মোচ্ছেদঃ। অথাকস্মিকমতোঽকস্মান্নির্ব্বর্ত্ত্যমানং ন পুনর্নিবর্ৎস্যতীতি নিবৃত্তিকারণং নোপপদ্যতে, তেন জন্মানুচ্ছেদ ইতি। এতস্মিংস্তর্কবিষয়ে কর্ম্মনিমিত্তং জন্মেতি প্রমাণানি প্রবর্ত্তমানানি তর্কেনানুগৃহ্যন্তে। তত্ত্বজ্ঞানবিষয়স্য বিভাগাৎ তত্ত্বজ্ঞানায় কল্পতে তর্ক ইতি। সোঽয়মিত্থম্ভূতস্তর্কঃ প্রমাণসহিতো বাদে সাধনায়োপালম্ভায় চার্থস্য ভবতীত্যেবমর্থং পৃথগুচ্যতে প্রমেয়ান্তর্ভূতোঽপীতি।

অনুবাদ—তর্ক প্রমাণসংগৃহীত অর্থাৎ কথিত চারিটী প্রমাণের অন্যতম নহে, প্রমাণান্তরও নহে, প্রমাণগুলির অনুগ্রাহক (সহকারী) হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত সমর্থ হয়। সেই তর্কের উদাহরণ,—এই জন্ম কি অনিত্য কারণের দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে? অথবা নিত্য কারণের দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে? অথবা আকস্মিক অর্থাৎ বিনা কারণে আপনা আপনিই হইতেছে? এইরূপে অনিশ্চিত-তত্ত্বপদার্থে কারণের উপপত্তি অর্থাৎ প্রমাণের সম্ভবহেতুক তর্ক প্রবৃত্ত হয়। (সে কিরূপ তর্ক, তাহা দেখাইতেছেন)।

যদি (এই জন্ম) অনিত্য কারণের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, (তাহা হইলে) হেতুর অর্থাৎ সেই নশ্বর হেতুর উচ্ছেদবশতঃ এই জন্মোচ্ছেদ উপপন্ন হয়। আর যদি নিত্য কারণের দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে থাকে, তাহা হইলে (সেই নিত্যকারণের) উচ্ছেদ অশক্য বলিয়া জন্মের উচ্ছেদ উপপন্ন হয় না। আর যদি (জন্ম) আকস্মিক হয়, তাহলে অকস্মাৎ (বিনা কারণে) উৎপদ্যমান জন্ম আর নিবৃত্ত হইবে না। নিবৃত্তির কারণ উৎপন্ন হয় না, সুতরাং জন্মের উচ্ছেদ নাই।

এই তর্কবিষয় পদার্থে—জন্ম কর্ম্ম-নিমিত্তক অর্থাৎ জন্ম জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল ধর্ম্মাধর্ম্মজন্য,—এইরূপে প্রবর্ত্তমান প্রমাণগুলি তর্ক কর্ত্তৃক অনুগৃহীত অর্থাৎ অযুক্ত নিষেধের দ্বারা যুক্ত বিষয়ে অনুজ্ঞাত হয়। তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ের বিভাগ অর্থাৎ যুক্তাযুক্ত বিচারপ্রযুক্ত তর্ক তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত সমর্থ হয়।

সেই এই এবম্ভূত তর্ক, প্রমাণসহিত হইয়া 'বাদে' পদার্থের সাধন এবং উপালম্ভ অর্থাৎ পরপক্ষখণ্ডনের নিমিত্ত হয়। এই জন্য প্রমেয়ে অন্তর্ভূ'ত হইলেও পৃথক্ উক্ত হইয়াছে।

টিপ্পনী ঃ 'প্রমাণ' শব্দের দ্বারা যে চারিটী প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, 'তর্ক' তাহার মধ্যে কেহ নহে, অন্য কোন প্রমাণও নহে। কারণ, 'তর্ক' তত্ত্বনিশ্চায়ক নহে; তত্ত্বনিশ্চয়ের জন্য প্রমাণই প্রযুক্ত হয়। ঐ প্রমাণের দ্বারা বিভিন্ন বিরুদ্ধ পদার্থ জ্ঞানের বিষয় হইলে তর্ক, যুক্ততত্ত্বে প্রবর্ত্তমান প্রমাণকে অনুজ্ঞা করিয়া অনুগ্রহ করে। এই তত্ত্বেই প্রমাণ সম্ভব, ইহাই যুক্ত—এইরূপে প্রমাণ-সম্ভব-প্রযুক্ত তত্ত্ববিশেষের অনুমোদনই তর্কের অনুগ্রহ। ঐরূপে তর্কানুগৃহীত হইয়া প্রমাণই তত্ত্ব-নিশ্চয় জন্মায়; সুতরাং তর্ক প্রমাণের সহকারী, স্বয়ং কোন প্রমাণ নহে; প্রমাণের সহকারী হইয়াই তর্ক তত্ত্বজ্ঞানের সহায়।

জীবের জন্মের কারণ অনিত্য হইলে তাহার বিনাশে জন্মের উচ্ছেদ সম্ভব

হয়। কিন্তু জন্মের কারণ নিত্য পদার্থ হইলে কখনও তাহার বিনাশ সম্ভব না হওয়ায় জন্মের উচ্ছেদ হইতে পারে না। সুতরাং মুক্তি অসম্ভব। অকস্মাৎ অর্থাৎ বিনা কারণেই জীবের জন্ম হইলেও পরেও আবার জন্ম হইতে পারে। একেবারে উহার নিবৃত্তি অসম্ভব, সুতরাং মুক্তি অসম্ভব। উক্তরূপে তর্কের বিষয় জন্ম পদার্থে "জন্ম বিচিত্রকর্ম্মজন্যং বিচিত্রত্বাৎ"—এইরূপে প্রমাণসমূহ প্রবৃত্ত হইলে তর্ক পদার্থ সংশয়নিবৃত্তির দ্বারা ঐ প্রমাণের অনুগ্রাহক বা সহকারী হইয়া থাকে। অর্থাৎ তখন মনের দ্বারা এইরূপ তর্ক জন্মে যে, জীবের জন্ম তাহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল বিচিত্র ধর্ম্মাধর্ম্মজন্য, ইহাই যুক্ত, ঐ তত্ত্বেই প্রমাণ সম্ভব, কারণ, জীবের নানাবিধ অবস্থাবিশিষ্ট বিচিত্র জন্ম কখনই একটী নিত্য কারণজন্য অথবা নিষ্কারণ হইতেই পারে না। জীবের বিচিত্র কর্ম্মফলেই বিচিত্র জন্ম হইতেছে। এইরূপ তর্ক, যুক্ত তত্ত্বে প্রবর্ত্তমান পূর্ব্বোক্ত প্রমাণকে অনুজ্ঞা করায় তখন উক্ত প্রমাণই ঐ তত্ত্বনিশ্চয় জন্মায়। তর্ক-সূত্র-ভাষ্যে ইহা পরিস্ফুট হইবে। উক্তরূপ তর্কপদার্থ প্রমাণের সহকারী হইয়া বাদ-বিচারে স্বপক্ষ সাধন ও পরপক্ষ খণ্ডনের কারণ হয়, এ জন্য উহারও পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে।

ভাষ্য। নির্ণয়স্তত্ত্বজ্ঞানং প্রমাণানাং ফলং, তদবসানো বাদঃ। তস্য পালনার্থং জল্পবিতণ্ডে। তাবেতৌ তর্কনির্ণয়ৌ লোকযাত্রাং বহত ইতি। সোঽয়ং নির্ণয়ঃ প্রমেয়ান্তর্ভূত এবমর্থং পৃথগুদ্দিষ্ট ইতি।

অনুবাদ—প্রমাণসমূহের অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব বাক্যের ফল তত্ত্বজ্ঞানকে 'নির্ণয়' বলে। "বাদ" সেই পর্য্যন্ত অর্থাৎ নির্ণয় পর্য্যন্ত। সেই নির্ণয়ের রক্ষার জন্য 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা' (আবশ্যক হয়)। সেই এই তর্ক ও নির্ণয় লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। সেই এই "নির্ণয়" পদার্থ প্রমেয়ে অন্তর্ভূত হইলেও এই জন্য অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কারণে পৃথক্ উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

টিপ্পনী—তত্ত্বজ্ঞানমাত্রাকে নির্ণয় বলিলে ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধজন্য প্রত্যক্ষরূপ তত্ত্বজ্ঞানও গোতমোক্ত "নির্ণয়" পদার্থ হয়। তাই বলিয়াছেন,—"প্রমাণানাং ফলম্"। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, "প্রমাণানাং" এই বহুবচনান্ত বাক্যের দ্বারা প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব বাক্যই লক্ষিত হইয়াছে ; কারণ, তাহাতেই তর্কযুক্ত প্রমাণসমূহের মেলন থাকে। বস্তুতঃ যে কোন প্রমাণের দ্বারা

তর্কপূর্ব্বক তত্ত্বনিশ্চয়ই "নির্ণয়" পদার্থ। তর্ক সহিত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের ফলও নির্ণয় হইবে। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা কিন্তু ইহা বুঝা যায় না (নির্ণয়-সূত্র দ্রষ্টব্য)।

বাদি-নিরাস হইলেই "জল্প" ও "বিতণ্ডা"র নিবৃত্তি হয়। কিন্তু নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত "বাদ"-বিচারের নিবৃত্তি নাই। কারণ, নির্ণয়ই বাদের উদ্দেশ্য। "জল্প" ও "বিতণ্ডা" এই নির্ণয়কে রক্ষা করিবার জন্যই আবশ্যক হয়। পূর্ব্বোক্ত "তর্ক" ও "নির্ণয়" লোকযাত্রার নির্ব্বাহক। কারণ, লোক সমস্ত বুঝিয়া বুঝিয়া প্রবর্ত্তমান হইয়া তর্ক ও নির্ণয়ের দ্বারা ত্যাজ্য ত্যাগ করে, গ্রাহ্য গ্রহণ করে। তাৎপর্য্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, এই "লোক" বলিতে পরীক্ষাসমর্থ লোকই বুঝিতে হইবে। কারণ, পরীক্ষক ভিন্ন সাধারণ লোকের প্রকৃত তর্ক সম্ভব হয় না। পূর্ব্বোক্ত ঐ সমস্ত কারণে উক্ত নির্ণয় পদার্থ গোতমোক্ত প্রমেয় পদার্থে অন্তর্ভূত হইলেও উহার বিশেষ জ্ঞানের জন্য পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে। বার্ত্তিককার বলিয়াছেন,—"অস্যান্তর্ভাবঃ প্রমাণেষু প্রমেয়েষু বা। যদা ফলং তদা প্রমেয়ং, যদা তেন পরিছিনত্তি, তদা প্রমাণং"। অর্থাৎ উক্ত নির্ণয় পদার্থ প্রমাণের ফল জ্ঞানবিশেষ বলিয়া প্রমেয়। কিন্তু যখন ঐ নির্ণয় দ্বারা অন্য পদার্থের যথার্থ নিশ্চয় হইবে, তখন উহা প্রমাণ হইবে। প্রমাণত্ব ও প্রমাণফলত্ব এবং প্রমাণত্ব ও প্রমেয়ত্ব অবস্থাভেদে এক পদার্থেও থাকিতে পারে। তাই বার্ত্তিককার পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—"ন ব্যবতিষ্ঠতে প্রমাণফলভাবঃ, এতচ্চ বক্ষ্যাম", ইত্যাদি। পরে প্রমাণ-ব্যাখ্যায় ইহা পরিস্ফুট হইবে।

ভাষ্য। বাদঃ খলু নানাপ্রবক্তৃকঃ প্রত্যধিকরণসাধনোঽন্যতরাধিকরণ-নির্ণয়াবসানো বাক্যসমূহঃ পৃথগুদ্দিষ্ট উপলক্ষণার্থং। উপলক্ষিতেন ব্যবহারস্তত্ত্বজ্ঞানায় ভবতীতি। তদ্বিশেষৌ জল্পবিতণ্ডে তত্ত্বাধ্যবসায়-সংরক্ষণার্থমিত্যুক্তম্।

অনুবাদ—নানাবক্তৃক অর্থাৎ যাহাতে বক্তা একের অধিক, প্রত্যেক সাধ্যে সাধনবিশিষ্ট অর্থাৎ যাহাতে উভয় পক্ষেই স্ব স্ব সাধ্যে হেতু প্রয়োগ করেন, একতর সাধ্যের নির্ণয়াবসান অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর সাধ্যের মধ্যে যে কোন সাধ্যের নির্ণয়ই যাহার শেষ ফল, এমন বাক্যসমূহরূপ বাদ উপলক্ষণের জন্য অর্থাৎ পরিজ্ঞানের জন্য পৃথক্ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। উপলক্ষিত অর্থাৎ পরিজ্ঞাত সেই বাদের দ্বারা ব্যবহার তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত হয়। 'তদ্বিশেষ'

অর্থাৎ সেই বাদ হইতে বিশিষ্ট জল্প ও বিতণ্ডা, তত্ত্বনিশ্চয়-সংরক্ষণের জন্য পৃথক্ উদ্দিষ্ট হইয়াছে,—ইহা উক্ত হইয়াছে।

টিপ্পনী—একজন বক্তার অথবা শাস্ত্রকর্ত্তার পূর্ব্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, দূষণ-সমাধান-প্রতিপাদক বাক্যসমূহ গোতমোক্ত "বাদ" পদার্থ নহে। তাই ভাষ্যকার প্রথমেই বলিয়াছেন, "নানাপ্রবক্তৃকঃ"। "নানা প্রবক্তারো যস্মিন্ স তথা"। অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই যাহাতে নিজ সিদ্ধান্তের অনুকূল বাক্য প্রয়োগ করেন। তাহা হইলে "বিতণ্ডা"ও বাদলক্ষণাক্রান্ত হয়, এ জন্য পরে বলিয়াছেন,—"প্রত্যধিকরণসাধনঃ"। তাৎপর্য্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"অধিক্রিয়তে ইত্যধিকরণং সাধ্যং, তদধিকৃত্য সাধনপ্রবৃত্তেঃ, প্রত্যধিকরণং সাধনং যস্মিন্ বাদে স তথোক্তঃ"। অর্থাৎ "অধিকরণ" শব্দের অর্থ এখানে সাধ্য ধর্ম্ম। বাদবিচারে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই নিজ নিজ সাধ্য সাধনের জন্য সাধন অর্থাৎ হেতুর প্রয়োগ করেন, তাই উহা "প্রত্যধিকরণসাধন"। কিন্তু বিতণ্ডায় প্রতিবাদী নিজ সাধ্যের সাধনের জন্য হেতু প্রয়োগ অর্থাৎ নিজপক্ষ স্থাপন করেন না; সুতরাং বিতণ্ডা উক্ত বাদলক্ষণাক্রান্ত হয় না। কিন্তু ঐরূপ লক্ষণ বলিলে "জল্প" বিচারও বাদলক্ষণাক্রান্ত হয়। এ জন্য পরে আবার বলিয়াছেন,—"অন্যতরাধিকরণ-নির্ণয়াবসানঃ"। অর্থাৎ একতর সাধ্যের নির্ণয় হইলেই যাহার অবসান বা সমাপ্তি হয়। কিন্তু জিগীষু বাদী ও প্রতিবাদীর "জল্প" বিচার ঐরূপ নহে। কারণ, যে কোনরূপে একের পরাজয় হইলেই তাহার সমাপ্তি হয়। তাহাতে তত্ত্বনির্ণয়ের সেরূপ অপেক্ষা নাই। উক্তরূপ "বাদ" পদার্থ গোতমোক্ত চতুর্থ প্রমেয় পদার্থে অন্তর্ভূত হইলেও উহার বিশেষ জ্ঞানের জন্য পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে। কারণ উহা তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষ সহায়।

বাদের পরে "জল্প" ও "বিতণ্ডা" নামক পদার্থদ্বয়ের পৃথক্ উল্লেখের কারণ বলিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"তদ্বিশেষৌ জল্পবিতণ্ডে" ইত্যাদি। "বিশিষ্যেতে ভিদ্যেতে" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে এখানে "বিশেষ" শব্দের অর্থ বিশিষ্ট বা ভিন্ন। বাদ হইতে জল্প ও বিতণ্ডার বিশেষ কি? এতদুত্তরে বার্ত্তিককার বলিয়াছেন,—"অঙ্গাধিক্যমঙ্গহানিশ্চ"। অর্থাৎ "জল্পে" ছল, জাতি ও সমস্ত নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন থাকায় বাদ হইতে অঙ্গাধিক্য আছে। আর "বিতণ্ডা"য় প্রতিবাদীর স্বপক্ষস্থাপন না থাকায় অঙ্গহানি আছে। বিষয়ভেদ প্রযুক্তও বাদ হইতে জল্প ও বিতণ্ডার ভেদ আছে। কিন্তু সর্ব্বথা ভেদ নাই। কারণ,

বাদী ও প্রতিবাদীর বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা নামক ত্রিবিধ বিচারের নাম "কথা"। সুতরাং কথাস্বরূপে উক্ত পদার্থত্রয়ের অভেদও আছে। ভাষ্যকারোক্ত "উদ্দিষ্ট" শব্দের লিঙ্গবচন পরিবর্ত্তন করিয়া "জল্পবিতণ্ডে পৃথক্ উদ্দিষ্টে" এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। বাক্যরূপ জল্প ও বিতণ্ডা চতুর্থ প্রমেয় পদার্থে অন্তর্ভূত হইলেও উহার পৃথক্ উল্লেখের কারণ কি? তাই পরে বলিয়াছেন,—"তত্ত্বাধ্যবসায়সংরক্ষণার্থমিত্যুক্তং"। অর্থাৎ তত্ত্বনিশ্চয় রক্ষার জন্য জল্প এবং বিতণ্ডাও যে আবশ্যক হয়, ইহা মহর্ষি গোতম নিজেই পরে "তত্ত্বাধ্যবসায়-সংরক্ষণার্থং" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন (চতুর্থ অধ্যায়, ২য় আঃ, ৫০শ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্য। নিগ্রহস্থানেভ্যঃ পৃথগুদ্দিষ্টা হেত্বাভাসা বাদে চোদনীয়া ভবিষ্যন্তীতি। জল্পবিতণ্ডয়োস্তু নিগ্রহস্থানানীতি।

অনুবাদ—হেত্বাভাসগুলি বাদে অর্থাৎ "বাদ" নামক কথায় উদ্ভাবনীয় হইবে,—এ জন্য নিগ্রহস্থান হইতে পৃথক্ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। জল্প ও বিতণ্ডাতে কিন্তু (যথাসম্ভব) সকল নিগ্রহস্থানই উদ্ভাবনীয় হইবে।

টিপ্পনী—যাহা "ব্যভিচার" প্রভৃতি কোন দোষযুক্ত বলিয়া প্রকৃত হেতু নহে, কিন্তু হেতুর ন্যায় প্রতীত হয়, তাহাকে হেত্বাভাস বলে। মহর্ষি গোতমের মতে এই হেত্বাভাস পঞ্চবিধ। ন্যায়ের দ্বারা তত্ত্বনির্ণয়াদি করিতে এই হেত্বাভাসের বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। সুতরাং ন্যায়বিদ্যায় হেত্বাভাস অবশ্য উল্লেখ্য। কিন্তু মহর্ষি যখন তাঁহার ষোড়শ পদার্থ "নিগ্রহ-স্থানের" বিভাগে শেষে হেত্বাভাসেরও উল্লেখ করিয়াছেন, তখন আর হেত্বাভাসের পৃথক্ উদ্দেশের প্রয়োজন কি? এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বাদবিচারে হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থান উদ্ভাব্য হইবে, এ জন্য হেত্বাভাসের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, জল্প ও বিতণ্ডায় পরাজয়-সূচনার জন্য সম্ভব হইলে, সর্ব্ববিধ নিগ্রহস্থানেরই উদ্ভাবন করা যায় এবং করিতে হয়। কিন্তু বাদবিচারে সর্ব্ববিধ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন নিষিদ্ধ। কারণ, তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্য, গুরু প্রভৃতির সহিত তত্ত্বনির্ণয়োদ্দেশ্যে বাদবিচার করেন। জিগীষা না থাকায় তিনি গুরু প্রভৃতি বক্তার "অপ্রতিভাদি" নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিবেন না, করিলে সে বিচারের বাদত্ব থাকে না। কিন্তু গুরু প্রভৃতি বক্তা ভ্রমবশতঃ কোন হেত্বাভাসের দ্বারা অর্থাৎ দুষ্ট হেতুর দ্বারা সাধ্যসাধন করিলে অথবা কোন অপসিদ্ধান্ত বলিলে তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্য অবশ্য তাহার উদ্ভাবন করিবেন। নচেৎ সেখানে তত্ত্ব-নির্ণয়রূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধ

হইতে পারে না। মহর্ষি এই সিদ্ধান্ত-সূচনার জন্যই প্রথম সূত্রে হেত্বাভাসের পৃথক্‌ উল্লেখ করিয়াছেন এবং ঐ পৃথক্‌ উল্লেখের দ্বারা তুল্য যুক্তিতে "অপসিদ্ধান্ত" নামক নিগ্রহস্থানও যে, বাদবিচারে অবশ্য উদ্ভাব্য, ইহাও সূচিত হইয়াছে। সুতরাং তাহার পৃথক উল্লেখ অনাবশ্যক, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যায়।

কিন্তু বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর এখানে বলিয়াছেন যে, বাদবিচারে উদ্ভাব্য হইলেই যে, তাহা পৃথক্‌ বক্তব্য, ইহা যেমন বলা যায় না, তদ্রূপ পৃথক্‌ কথিত হইলেই যে, তাহা বাদবিচারে উদ্ভাব্য, ইহাও বলা যায় না। তবে হেত্বাভাস পদার্থের পৃথক্‌ উল্লেখের প্রয়োজন কি? বার্ত্তিককার বলিয়াছেন, "এতদেব তু ন্যায্যং প্রয়োজনং, বিদ্যা-প্রস্থানভেদজ্ঞাপনার্থত্বাদিতি"। টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এখানে লিখিয়াছেন,—"তদেতদেকদেশি মতং দূষয়িত্বা স্বমতেন ভাষ্যং ব্যাচষ্টে, এতদেব তু ন্যায্যমিতি"। এখানে বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যানুসারে বাদ, জল্প ও বিতণ্ডারূপ যে বিদ্যা, তাহার প্রস্থান বা ব্যাপারের ভেদজ্ঞাপনই হেত্বাভাসের পৃথক্‌ উল্লেখের চরম ফল। কিন্তু উদ্দ্যোতকরোক্ত "বিদ্যাপ্রস্থান" শব্দের উক্তরূপ অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। উদয়নাচার্য্য ঐ ব্যাখ্যার সমর্থন করিলেও বৃত্তিকার বিশ্বনাথও উহার দ্বারা "আন্বীক্ষিকী" প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ বিদ্যাপ্রস্থানই বুঝিয়াছেন। পরন্তু বার্ত্তিককার যে, এখানে পূর্ব্বে ভাষ্যকারের কথারই খণ্ডন করিয়া, পরে নিজমত বলিয়াছেন, তিনি পরে নিজমতে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্যই ব্যাখ্যা করেন নাই, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও তাহাই বুঝিয়া প্রথম সূত্রবৃত্তিতে বার্ত্তিককারের ঐ কথারও উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—"তদপ্যসৎ"। তিনি পরে নিজের অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, হেত্বাভাস পদার্থ নিগ্রহস্থানই নহে। কিন্তু হেত্বাভাসের প্রয়োগই নিগ্রহস্থান। সুতরাং "নিগ্রহস্থান" পদার্থের মধ্যে হেত্বাভাস পদার্থ উক্ত না হওয়ায় উহার পৃথক্‌ উল্লেখ হইয়াছে। বৃত্তিকারের এই সমাধানেও বহু বক্তব্য আছে। সে যাহা হউক, ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য এই যে, বাদবিচারে উদ্ভাব্য হইলেই তাহার পৃথক্‌ উল্লেখ কর্ত্তব্য, ইহা ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য নহে। কিন্তু বাদবিচারেও হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থান অবশ্য উদ্ভাব্য, ইহা সূচনার জন্যই উহার পৃথক্‌ উল্লেখ হইয়াছে। বাদ হইতে জল্প ও বিতণ্ডার বৈলক্ষণ্য-সূচনাও ঐ পৃথক্‌ উল্লেখের উদ্দেশ্য। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—"জল্পবিতণ্ডয়োস্তু নিগ্রহস্থানানি"।

ভাষ্য। ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং পৃথগুপদেশ উপলক্ষণার্থ ইতি। উপলক্ষিতানাং স্ববাক্যে পরিবর্জ্জনং ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং পরবাক্যে পর্য্যনুযোগঃ। জাতেশ্চ পরেণ প্রযুজ্যমানায়াঃ সুলভঃ সমাধিঃ, স্বয়ঞ্চ সুকরঃ প্রয়োগ ইতি।

অনুবাদ—"ছল", "জাতি" ও "নিগ্রহস্থানের" পৃথক্ উল্লেখ পরিজ্ঞানার্থ। পরিজ্ঞাত ছল, জা'ত ও নিগ্রহস্থানের নিজবাক্যে পরিবর্জ্জন (অপ্রয়োগ) ও পরবাক্যে পর্য্যনুযোগ (উদ্ভাবন) হয়। এবং পরকর্ত্তৃক প্রযুজ্যমান "জাতির" সমাধি (সম্যক্ উত্তর) সুলভ হয় এবং স্বয়ং প্রয়োগ সুকর হয়।

টিপ্পনী—প্রথম সূত্রে শেষোক্ত 'ছল', 'জাতি' ও 'নিগ্রহস্থান' নামক পদার্থত্রয়ের পরিচয় প্রথম অধ্যায়ের শেষে পাওয়া যাইবে। কিন্তু উক্ত পদার্থত্রয়ও প্রমেয়পদার্থে অন্তর্ভূ'ত হইলেও মহর্ষি উহাদিগের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন কেন? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"উপলক্ষণার্থঃ"। বার্ত্তিককার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"পরিজ্ঞানার্থমেব কেবলং"। ঐ পদার্থত্রয়ের উপলক্ষণ বা পরিজ্ঞানের ফল কি? তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—"স্ববাক্যে পরিবর্জ্জনং" ইত্যাদি। অর্থাৎ ঐ পদার্থত্রয়ে নিজবাক্যে অপ্রয়োগ এবং প্রতিবাদীর বাক্যে উদ্ভাবন, উহাদিগের পরিজ্ঞানের ফল। উক্ত পদার্থত্রয়ের সর্ব্বতোভাবে জ্ঞান না থাকিলে নিজবাক্যে উহাদিগের বর্জ্জন ও পরবাক্যে উদ্ভাবন কখনই সম্ভব হয় না। পরন্তু গোতমোক্ত জাতি পদার্থের অর্থাৎ "জাতি" নামক অসদুত্তরের পরিজ্ঞান থাকিলেই প্রতিবাদীর প্রযুক্ত জাতির সমাধান বা সম্যক্ উত্তর করিতে পারা যায় এবং স্বয়ংও ঐ জাতির প্রয়োগ সুকর হয়।

ভাষ্যকার পূর্ব্বে বাদীর নিজ বাক্যে পরিবর্জ্জন কর্ত্তব্য বলিয়াও পরে আবার "স্বয়ঞ্চ সুকরঃ প্রয়োগঃ" এই কথা কিরূপে বলিয়াছেন? ইহা অবশ্যই প্রশ্ন হইবে। বার্ত্তিককার উক্তরূপ বিরোধের আশঙ্কা করিয়া, তাহার পরিহার করিতে বলিয়াছেন,—"ন ব্যাঘাতঃ প্রশ্নাপাকরণার্থত্বাৎ"। অর্থাৎ যেখানে প্রতিবাদী "জাতি" নামক অসদুত্তর করিয়াছেন, সেখানে বাদী সভ্যদিগকে সেই কথা বলিলে সভ্যগণ প্রশ্ন করিলেন—কেন? প্রতিবাদীর এই উত্তর জাত্যুত্তর কেন? গোতমোক্ত চতুর্ব্বিংশতি জাতির মধ্যে ইহা কোন্ জাতি? তাহার লক্ষণই বা কি? সভ্যগণের ঐ সমস্ত প্রশ্ন নিরাকরণের জন্যই বাদীরও "জাতি"র

পরিজ্ঞান আবশ্যক। জাতির লক্ষণাদি জ্ঞান থাকিলেই বাদী তখন তাহা বুঝাইয়া দিতে পারেন। ভাষ্যকার এই তাৎপর্য্যেই পরে বলিয়াছেন,—"স্বয়ঞ্চ সুকরঃ প্রয়োগঃ"। কিন্তু বাদী নিজপক্ষ স্থাপন করিতে জাতির প্রয়োগ করিবেন না, ইহা স্থিরই আছে। সুতরাং ভাষ্যকারের পূর্ব্বাপর উক্তির বিরোধ নাই। ভাষ্যকার এ পর্য্যন্ত প্রথম সূত্রোক্ত সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থ যে, ন্যায়বিদ্যার প্রস্থান, ইহা সমর্থন করিতে উহাদিগের পৃথক্ উল্লেখের কারণ বর্ণন করিয়াছেন। তদ্দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমাধান পরিস্ফুট হইয়াছে।

ভাষ্য। সেয়মান্বীক্ষিকী প্রমাণাদিভিঃ পদার্থৈর্ব্বিভজ্যমানা—
প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা॥

তদিদং তত্ত্ব-জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সাধিগমশ্চ যথাবিদ্যং বেদিতব্যং। ইহ ত্বধ্যাত্মবিদ্যায়ামাত্মাদিজ্ঞানং তত্ত্ব-জ্ঞানং, নিঃশ্রেয়সাধিগমোঽপবর্গ-প্রাপ্তিরিতি॥ *॥ ১॥

অনুবাদ—প্রমাণাদি পদার্থ কর্ত্তৃক বিভজ্যমান (পৃথক্ক্রিয়মাণ) অর্থাৎ প্রমাণাদি পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ পদার্থ যে বিদ্যাকে অন্য বিদ্যা হইতে বিশিষ্ট করিয়াছে, সেই এই আন্বীক্ষিকী (ন্যায়বিদ্যা) সর্ব্ববিদ্যার প্রদীপ, সর্ব্বকর্ম্মের উপায় ও সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া বিদ্যার উদ্দেশে অর্থাৎ শাস্ত্রে বিদ্যার পরিগণনাস্থলে প্রকৃষ্টরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সেই এই তত্ত্বজ্ঞান এবং নিঃশ্রেয়সলাভ বিদ্যানুসারে বুঝিতে হইবে। এই অধ্যাত্মবিদ্যাতে কিন্তু আত্মাদিজ্ঞান অর্থাৎ আত্মা প্রভৃতি প্রমেয়-তত্ত্বজ্ঞান—তত্ত্বজ্ঞান, নিঃশ্রেয়সলাভ অপবর্গপ্রাপ্তি অর্থাৎ অন্য বিদ্যা হইতে এই ন্যায়বিদ্যায় তত্ত্বজ্ঞান ও নিঃশ্রেয়সে বিশেষ আছে। ইতি।

টিপ্পনী—উপসংহারে ভাষ্যকার ন্যায়বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন যে, বুদ্ধিমান্দিগের এমন কোন প্রয়োজন নাই, যাহাতে এই ন্যায়-

---

* প্রচলিত ভাষ্যপুস্তকে এখানে "অপবর্গপ্রাপ্তিঃ" এই পর্য্যন্তই পাঠ দেখা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার যে, এখানে পরে সমাপ্তিসূচক "ইতি" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা অবশ্যই বুঝা যায়। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরও প্রথমসূত্রবার্ত্তিকের শেষে "ইতি" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সেখানে টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও শেষে লিখিয়াছেন—"ইতি সূত্রসমাপ্তৌ"॥

বিদ্যা আবশ্যক নহে,* এই ন্যায়বিদ্যা-ব্যুৎপাদিত প্রমাণাদি পদার্থকে অবলম্বন করিয়াই অন্যান্য বিদ্যা স্ব স্ব প্রতিপাদ্য তত্ত্বের প্রতিপাদন করে। তাই সর্ব্ব-বিদ্যার প্রকাশক বলিয়া ইহা সর্ব্ববিদ্যার প্রদীপস্বরূপ। ইহা সর্ব্বকর্ম্মের উপায়; কারণ, এই ন্যায়বিদ্যা-পরিশোধিত প্রমাণাদির দ্বারাই সর্ব্ববিদ্যার প্রতিপাদ্য কর্ম্মগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। সাম-দানাদি, কৃষিবাণিজ্যাদি কর্ম্মে এই ন্যায়বিদ্যাই মূল। ইহা সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয় অর্থাৎ রক্ষক। তাৎপর্য্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পুরুষের প্রবর্ত্তনা অর্থাৎ পুরুষকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করা সর্ব্ববিদ্যার ধর্ম্ম, তাহাও এই ন্যায়বিদ্যার অধীন। কারণ, বিমৃশ্যকারী পুরুষগণ এই ন্যায়বিদ্যার সাহায্যেই কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া ক্লেশসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। অন্যান্য বিদ্যাও এই ন্যায়বিদ্যার সাহায্যে পুরুষ-প্রবর্ত্তনা করে।

কিন্তু সর্ব্ববিদ্যার উপযোগী প্রমাণ প্রভৃতি পদার্থ যখন এই ন্যায়বিদ্যার প্রতিপাদ্য, তখন প্রথম সূত্রোক্ত "নিঃশ্রেয়স" শব্দের দ্বারা মোক্ষকে এই বিদ্যার প্রয়োজন বলিয়া কিরূপে বুঝা যায়? উক্ত প্রমাণাদি পদার্থের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যায় যে, উহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান হইলে ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত বিদ্যাসাধ্য সর্ব্ববিধ নিঃশ্রেয়সই লাভ করা যায়। সুতরাং ন্যায়বিদ্যাসাধ্য নিঃশ্রেয়সের অন্যান্য বিদ্যাসাধ্য নিঃশ্রেয়স হইতে কোন বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে না, এই আশঙ্কা মনে করিয়া ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন,—"তদিদং তত্ত্বজ্ঞানং" ইত্যাদি। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, সকল বিদ্যাতেই "তত্ত্বজ্ঞান" এবং "নিঃশ্রেয়স" আছে। অন্য বিদ্যাসাধ্য সেই সমস্ত নিঃশ্রেয়স হইতে ন্যায়বিদ্যার মুখ্য ফল নিঃশ্রেয়স যে, বিভিন্ন হইবে, ইহা সেই সমস্ত বিদ্যা ও তাহার ফল তত্ত্বজ্ঞানের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যায়। মনূক্ত ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি এবং আন্বীক্ষিকী, এই চতুর্ব্বিধ বিদ্যার মধ্যে বেদবিদ্যার নাম "ত্রয়ী", যাগাদিবিষয়ক যথার্থ জ্ঞানই তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান, স্বর্গপ্রাপ্তিই সেখানে নিঃশ্রেয়স। কৃষ্যাদি জীবিকা-শাস্ত্রের নাম বার্ত্তা, ভূম্যাদিবিষয়ক যথার্থ জ্ঞানই তাহাতে তত্ত্ব-জ্ঞান, কৃষিবাণিজ্যাদি লাভই সেখানে নিঃশ্রেয়স। দণ্ডনীতিশাস্ত্রে দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডাদিপ্রয়োগ-জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, রাজ্যাদিলাভই সেখানে নিঃশ্রেয়স। ঐ সমস্ত বিদ্যার প্রতিপাদ্য বিষয়ের স্বভাব পর্য্যালোচনা

---

* সূত্রকারেণ শাস্ত্রস্যাত্যন্তিকদুঃখোপরমরূপনিঃশ্রেয়সাধিগমঃ প্রয়োজনমুক্তং, ভাষ্যকারস্তু নাস্ত্যেব তৎ প্রেক্ষাবতাং প্রয়োজনং, যত্রান্বীক্ষিকী ন নিমিত্তং ভবতীত্যাহ—"সেয়মান্বীক্ষি-কীতি"।—তাৎপর্য্যটীকা।

করিলেই এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান ও নিঃশ্রেয়স বুঝিতে পারা যায়। তাই বলিয়াছেন,—"যথাবিদ্যং বেদিতব্যম্।"

কিন্তু এই "আন্বীক্ষিকী" অধ্যাত্মবিদ্যা অর্থাৎ যদিও প্রমাণাদি পদার্থগুলি সর্ব্ববিদ্যার উপযোগী বলিয়া সর্ব্ববিদ্যা-সাধারণ, কিন্তু ইহাতে আত্মা প্রভৃতি "প্রমেয়"রূপ অসাধারণ পদার্থেরও উল্লেখ থাকায়, ইহা উপনিষদের ন্যায় কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা না হইলেও অধ্যাত্মবিদ্যা। তাই পরে বলিয়াছেন,—"ইহ ত্বধ্যাত্মবিদ্যায়াং" ইত্যাদি। অর্থাৎ সর্ব্ববিদ্যাসাধারণ প্রমাণাদি পদার্থের ব্যুৎপাদক বলিয়া, সর্ব্ববিদ্যা-সাধ্য নিঃশ্রেয়স লাভের সহায় হইলেও এবং সংশয়াদি প্রস্থানভেদবশতঃ উপনিষদের ন্যায় কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা না হইলেও আত্মতত্ত্বজ্ঞানের সাধন বলিয়া এবং আত্মনিরূপণরূপ মুখ্য উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত বলিয়া, এই ন্যায়বিদ্যা যখন অধ্যাত্মবিদ্যা, তখন ইহাতে আত্মাদিবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান বুঝিতে হইবে এবং মোক্ষলাভই নিঃশ্রেয়স লাভ বুঝিতে হইবে।

কিন্তু এখানে স্মরণ করিতে হইবে, এই ন্যায়বিদ্যা কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা নহে, এ কথা পূর্ব্বে (২৫শ পৃঃ) ভাষ্যকারও বলিয়া আসিয়াছেন এবং এখানেও প্রথমে ন্যায়বিদ্যাকে সর্ব্ববিদ্যার প্রদীপ এবং সর্ব্বকর্ম্মের উপায় এবং সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয় বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারা তিনি যে, সর্ব্ববিধ নিঃশ্রেয়সই ন্যায়বিদ্যার প্রয়োজন বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকারও ভাষ্যকারের ঐ কথার অবতারণায় তাঁহার ঐরূপ তাৎপর্য্য বলিয়াছেন। "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" টীকায় উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকারোক্ত অন্য প্রয়োজনগুলি সূত্রকারোক্ত প্রয়োজনের বিরোধী নহে, পরন্তু অনুকূল, ইহা দেখাইতেই বাচস্পতি মিশ্র সূত্রকারোক্ত প্রয়োজনের অনুবাদ করিয়াছেন। অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়স মোক্ষই ন্যায়বিদ্যার মুখ্য প্রয়োজন হইলেও অন্যান্য বিদ্যাসাধ্য সমস্ত দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সও ন্যায়বিদ্যার গৌণ বা সাধারণ প্রয়োজন। ফলকথা, ভাষ্যকারের মতে যে, মুখ্য ও গৌণ সমস্ত নিঃশ্রেয়সই ন্যায়বিদ্যার প্রয়োজন, ইহা বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতিরও স্বীকৃত।

পরন্তু যে বিদ্যার যাহা মুখ্য প্রয়োজন, তাহাকেই সেই বিদ্যায় "নিঃশ্রেয়স" বলা হয় এবং তাহার সাধনজ্ঞানবিশেষকেই সেই বিদ্যায় "তত্ত্বজ্ঞান" বলা হয়। ন্যায়বিদ্যা অধ্যাত্মবিদ্যা বলিয়া তাহার মুখ্য প্রয়োজন অপবর্গ এবং তাহার সাক্ষাৎ সাধন আত্মাদি-তত্ত্বজ্ঞান। সুতরাং ভাষ্যকার অপবর্গকেই ন্যায়বিদ্যায় "নিঃশ্রেয়স" বলিয়াছেন এবং আত্মাদি তত্ত্বজ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান বলিয়াছেন, তাহাতে

অন্যান্য নিঃশ্রেয়স যে, ন্যায়বিদ্যার ফলই নহে, এ কথা বলা হয় নাই। কারণ, ন্যায়বিদ্যার যাহা মুখ্য ফল, সেই ফলাংশে অন্যান্য বিদ্যা হইতে ন্যায়বিদ্যার ভেদ দেখাইতেই ভাষ্যকার ঐ কথা বলিয়াছেন। কিন্তু উপনিষদের ন্যায় "ন্যায়বিদ্যা" যদি কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা হইত এবং মোক্ষ ভিন্ন আর কোন ফল তাহার না থাকিত, তাহা হইলে ভাষ্যকারের ঐ কথার কোন প্রয়োজনও ছিল না। অন্য বিদ্যার ফল সমস্ত নিঃশ্রেয়সও ন্যায়বিদ্যার ফল বলিয়াই সেই সকল বিদ্যার ফলের সহিত ন্যায়বিদ্যার ফলের সম্পূর্ণ অভেদের আপত্তি হয়, এ জন্যই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ন্যায়বিদ্যা উপনিষদের ন্যায় সর্ব্বাংশে অধ্যাত্মবিদ্যা না হইলেও যখন অধ্যাত্মবিদ্যা, তখন অপবর্গই ইহার মুখ্য ফল হওয়ায় বেদের কর্ম্মকাণ্ডরূপ ত্রয়ী এবং বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি হইতে ফলাংশেও ইহার ভেদ আছে। কিন্তু অন্যান্য বিদ্যাসাধ্য সমস্ত নিঃশ্রেয়সও এই ন্যায়বিদ্যার ফল। সুতরাং অন্যান্য বিদ্যা হইতে ন্যায়বিদ্যার উক্তরূপ বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সর্ব্ববিধ নিঃশ্রেয়স-ফলকত্ব থাকায় সেই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতেই মহর্ষি প্রথম সূত্রের শেষে বলিয়াছেন,—"নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ"। কিন্তু দ্বিতীয় সূত্রে মুখ্য ফল পরামুক্তির ক্রম বর্ণন করিতে সেই মুখ্যফলমাত্র বোধের জন্যই মহর্ষি বলিয়াছেন,—"অপবর্গঃ"। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে ॥ ১ ॥

ভাষ্য। তচ্চ খলু বৈ নিঃশ্রেয়সং কিং তত্ত্ব-জ্ঞানানন্তরমেব ভবতি ? নেত্যুচ্যতে, কিং তর্হি ? তত্ত্ব-জ্ঞানাৎ—

সূত্র। দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানা-নামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ ॥২॥*

অনুবাদ—সেই নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ ন্যায়বিদ্যার পূর্ব্বোক্ত মুখ্য প্রয়োজন অপবর্গ কি তত্ত্ব-জ্ঞানের অব্যবহিত পরেই হয় ? (উত্তর) ইহা উক্ত হয় নাই অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের অব্যবহিত পরেই নির্ব্বাণ মুক্তি হয়, ইহা মহর্ষি গোতম বলেন নাই। (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত—

---

* অনেক পুস্তকে উদ্ধৃত এই সূত্রে "তদনন্তরাভাবাৎ" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু মহর্ষি প্রথমে "অপায়" শব্দের প্রয়োগ করায় পরেও যে, "অপায়" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। ভাষ্যকারও পরে "অপবর্ত্তি" ও "অপৈতি" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর, শঙ্করাচার্য্য ও বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতিও "তদনন্তরাপায়াৎ" এইরূপ পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন।

দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি (ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম), দোষ (রাগ ও দ্বেষ) এবং মিথ্যা-জ্ঞানের অর্থাৎ আত্মাদি প্রমেয় পদার্থ বিষয়ে নানাপ্রকার ভ্রম জ্ঞানের— উত্তরোত্তরের অপায় অর্থাৎ পর পরটির নিবৃত্তি হইলে "তদনন্তর" পদার্থের অর্থাৎ উক্ত মিথ্যাজ্ঞান প্রভৃতি পর পর পদার্থের অব্যবহিত পূর্ব্বোক্ত দুঃখ-পর্য্যন্ত পদার্থের নিবৃত্তিপ্রযুক্ত অপবর্গ (নির্ব্বাণ) হয়।

টিপ্পনী—মহর্ষি প্রথম সূত্রের দ্বারা ন্যায়শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ষোড়শ পদার্থ এবং ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন নিঃশ্রেয়স ও তাহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধের সূচনা করিয়াছেন। কিন্তু পরীক্ষা ব্যতীত ঐ প্রয়োজন ও সম্বন্ধের নির্ণয় হইতে পারে না। তাই পরে দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারাই সেই পরীক্ষা করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রয়োজন ও সম্বন্ধ সমর্থন করিয়াছেন। এই দ্বিতীয় সূত্রটি তাঁহার সিদ্ধান্তসূত্র। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষ ব্যতীত সিদ্ধান্ত প্রকাশ সংগত হয় না। তাই ভাষ্যকার প্রথমে সেই পূর্ব্বপক্ষের সূচনা করিয়াই এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের শেষোক্ত "তত্ত্বজ্ঞানাৎ" এই পদের সূত্রের সহিত যোজনা বুঝিতে হইবে।

বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকার পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ চরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে পরক্ষণেই যদি সেই তত্ত্বদর্শীর নির্ব্বাণমুক্তিরূপ অপবর্গ হয়, তাহা হইলে তাঁহার সশরীরে অবস্থান সম্ভব না হওয়ায় তিনি কাহাকেও তাঁহার সেই দৃষ্ট তত্ত্বের উপদেশ করিতে পারেন না। কারণ, নির্ব্বাণ মুক্তি হইলে তখন তাঁহার দেহাদি থাকে না। শ্রুতিও বলিয়াছেন,—"অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" (ছান্দোগ্য)। কিন্তু শাস্ত্রসম্প্রদায়ের অবিচ্ছেদবশতঃ তত্ত্বদর্শী সিদ্ধ গুরুগণের সশরীরে অবস্থানও স্বীকার্য্য। কারণ, শিষ্য ও গুরুর সম্বন্ধের অবিচ্ছেদবশতঃ প্রকৃত গুরুর নিকটে প্রকৃত শিষ্যের যে শাস্ত্রপ্রাপ্তি, তাহাকে বলে শাস্ত্রসম্প্রদায়। কিন্তু তত্ত্বদর্শী প্রকৃত গুরু কেহই সশরীরে না থাকিলে সেই শাস্ত্রসম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সুতরাং চরম তত্ত্বজ্ঞান লাভের পরে সেই তত্ত্বদর্শী জীবিত থাকিয়া শিষ্যগণের নিকটে তাঁহার দৃষ্ট সমস্ত তত্ত্বের উপদেশ করেন, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহা হইলে সেই চরম তত্ত্বজ্ঞানকেও মুক্তির কারণ বলা যায় না। কারণ, উহার অব্যবহিত পরেই মুক্তি লাভ হয় না। মহর্ষি উক্তরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর সূচনার জন্য দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা পরা মুক্তির ক্রম প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাই উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন,—"ক্রমপ্রতিপাদনার্থঞ্চেদং সূত্রং, দুঃখজন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-

মিথ্যা-জ্ঞানানা”মিত্যাদি। উত্তর পক্ষে মহর্ষির গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, অপবর্গরূপ নিঃশ্রেয়স দ্বিবিধ—পর ও অপর। পর নিঃশ্রেয়সই নির্ব্বাণ মুক্তি, উহাই চরম মুক্তি। উহা তত্ত্বজ্ঞানের পরেই হয় না, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানজন্য মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তিক্রমেই হয়। কিন্তু অপর নিঃশ্রেয়স চরম তত্ত্বজ্ঞানের অব্যবহিত পরেই হয়, উহাকে বলে জীবন্মুক্তি। চরম তত্ত্বজ্ঞানের মহিমায় সেই তত্ত্বদর্শীর পূর্ব্বসঞ্চিত সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের ক্ষয় হইলেও তাঁহার সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্ম অর্থাৎ তাঁহার সেই শরীরাদির জনক যে সমস্ত প্রাক্তন অদৃষ্টের ফলভোগারম্ভ হইয়াছে, সেই সমস্ত অদৃষ্ট বিদ্যমান থাকে। কারণ, ভোগ ব্যতীত সেই সমস্ত অদৃষ্টের বিনাশ হইতে পারে না। এই মতে কোন কোন জীবন্মুক্ত পুরুষ যোগশক্তির প্রভাবে শীঘ্র বহু শরীর (কায়ব্যূহ) নির্ম্মাণ করিয়া, সেই সমস্ত শরীরে নানা স্থানে শীঘ্র সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া, পরক্ষণে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিলেও অনেক জীবন্মুক্ত সিদ্ধ মহর্ষি পরমেশ্বরের নিয়োগানুসারে সুদীর্ঘ কাল জীবিত থাকিয়া, শাস্ত্রাদির দ্বারা নানা তত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন এবং পরেও ঐরূপ করিবেন। সুতরাং তাঁহাদিগের সেই উপদেশেই শাস্ত্রসম্প্রদায়ের রক্ষা হইয়াছে এবং পরেও হইবে।

ফলকথা, মহর্ষি প্রথম সূত্রে তত্ত্বজ্ঞানকে নিঃশ্রেয়সের কারণ বলিয়া, দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা অপবর্গের ক্রম প্রকাশ করায় তাঁহার মতে মুক্তি যে দ্বিবিধ অর্থাৎ জীবন্মুক্তিও তাঁহার সম্মত, ইহা সূচিত হইয়াছে এবং চরম তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃই চরম মুক্তির কারণ নহে, কিন্তু উহা মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির দ্বারাই সেই মুক্তির কারণ হয়, ইহাও সূচিত হইয়াছে। এইরূপ আরও অনেক তত্ত্ব এই সূত্র দ্বারা সূচিত হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে হইবে।

মহর্ষি এই সূত্রে তত্ত্বজ্ঞানের উল্লেখ না করিলেও পরে বলিয়াছেন,—“মিথ্যোপলব্ধিবিনাশস্তত্ত্বজ্ঞানাৎ” ইত্যাদি (৪।২।৩৫ সূত্র)। তদনুসারে ভাষ্যকার এই সূত্রের অবতারণা করিতে পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—“তত্ত্বজ্ঞানাৎ”। বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত আর কোন উপায়েই মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্তই যে, মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, ইহা সমর্থন করিতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও আচার্য্য গোতম-প্রণীত যুক্তিযুক্ত এই সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে তিনি লিখিয়াছেন,—“তথাচাচার্য্যপ্রণীতং ন্যায়োপ-বৃংহিতং সূত্রং” (বেদান্তদর্শন, চতুর্থ সূত্র-ভাষ্য)।

পরা মুক্তি অপবর্গই যে, এই ন্যায়শাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজন এবং প্রথম সূত্রে

যে, "নিঃশ্রেয়স" শব্দের দ্বারা তাহা সূচিত হইয়াছে, ইহাও মহর্ষি এই সূত্রে "অপবর্গ" শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন এবং প্রথম সূত্রোক্ত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে দ্বিতীয় প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞানই যে, সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির দ্বারা সেই অপবর্গের সাক্ষাৎ কারণ হয়, ইহাও এই সূত্র দ্বারা ব্যক্ত করিয়া অপবর্গরূপ মুখ্য প্রয়োজনের পরীক্ষা করিয়াছেন। যুক্তির দ্বারা শাস্ত্রের প্রয়োজনসিদ্ধিই সেই প্রয়োজনের পরীক্ষা। সেই পরীক্ষা ব্যতীত সেই শাস্ত্রের চর্চ্চায় কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা ন্যায়শাস্ত্রের সাহায্যে মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তিক্রমে যে অপবর্গ হয়, এই বিষয়ে যুক্তি প্রকাশ করিয়া অপবর্গ যে ন্যায়শাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজন, ইহা সিদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং প্রয়োজনের সহিত এই শাস্ত্রের যে প্রযোজ্য প্রযোজকভাব সম্বন্ধ অর্থাৎ অপবর্গ প্রযোজ্য, ন্যায়শাস্ত্র তাহার প্রযোজক বা সম্পাদক, ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন। পরে ইহা সুব্যক্ত হইবে।

এই সূত্রে "দুঃখ" প্রভৃতি চারিটী শব্দ যে ক্রমে কথিত হইয়াছে, তদনুসারে ঐ দুঃখ প্রভৃতি চারিটী পদার্থের অব্যবহিত উত্তর জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ, মিথ্যাজ্ঞান, এই চারিটী পদার্থকেই গ্রহণ করিয়া মহর্ষি বলিয়াছেন,—"উত্তরোত্তরাপায়ে"। এখানে সপ্তমী বিভক্তির অর্থ প্রযুক্তত্ব অর্থাৎ উত্তর উত্তর পদার্থগুলির অপায় বা নিবৃত্তিপ্রযুক্ত। সেই উত্তরপদার্থগুলিকেই যথাক্রমে "তৎ" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়া মহর্ষি পরে বলিয়াছেন,—"তদনন্তরাপায়াৎ"। অব্যবহিত পূর্ব্ব অর্থেও "অনন্তর" শব্দের প্রয়োগ করা যায়। সুতরাং "তদনন্তর" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়,—তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ব।

এখন দেখুন,—

(পূর্ব্ব) দুঃখ,	(উত্তর) জন্ম।
(পূর্ব্ব) জন্ম,	(উত্তর) প্রবৃত্তি।
(পূর্ব্ব) প্রবৃত্তি,	(উত্তর) দোষ।
(পূর্ব্ব) দোষ,	(উত্তর) মিথ্যাজ্ঞান।

উত্তরগুলি কারণ, পূর্ব্বগুলি তাহার কার্য্য ; কারণের অপায়ে কার্য্যের অপায় হইয়া থাকে, যেমন কফনিমিত্তিক জ্বর হইলে সেখানে কফের অপায়ে জ্বরের অপায় হয়। এখানেও সূত্রোক্ত দুঃখাদি পদার্থগুলির ঐরূপ নিমিত্তনৈমিত্তিক ভাব থাকায় উহাদিগের এক একটি উত্তরের অপায়ে তৎপূর্ব্বটির অর্থাৎ তাহার কার্য্য পূর্ব্বটির অপায় হইবে। 'মিথ্যাজ্ঞানে'র অপায়ে তাহার

কার্য্য "দোষে"র অপায় হইবে। দোষের অপায় হইলে তাহার কার্য্য "প্রবৃত্তি"র অপায় হইবে। প্রবৃত্তির অপায় হইলে "জন্মে"র অপায় হইবে। জন্মের অপায় হইলে "দুঃখে"র অপায় হইবে। জন্ম না হইলে আর দুঃখের সম্ভাবনাই নাই। কারণ, তখন আর দুঃখের হেতু কিছুই থাকে না। দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ, ইহারা মিথ্যাজ্ঞানপূর্ব্বক, ঐ মিথ্যাজ্ঞান আবার দুঃখাদিপূর্ব্বক। পূর্ব্বে দুঃখাদি, পরে মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি, অথবা পূর্ব্বে মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি, পরে দুঃখাদি, ইহা বলা যাইবে না। উহারা অনাদি। অনাদি কাল হইতে ঐ পদার্থগুলির কার্য্য-কারণ-ভাবই সংসার। উহাদিগের অনাদিত্ব সূচনার জন্যই সূত্রকার দুঃখ হইতে মিথ্যাজ্ঞান পর্য্যন্ত বলিলেও ভাষ্যকার সূত্রকারের ক্রম লঙ্ঘন করিয়া বলিয়াছেন,—"ত ইমে মিথ্যাজ্ঞানাদয়ঃ।" বার্ত্তিককার আবার ঐ অনাদিত্বকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করাইবার জন্য ভাষ্যকারোক্ত ক্রমের বিপরীত ক্রমে উহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"ত ইমে দুঃখাদয়ঃ।"

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সূত্রের "তদনন্তরাপায়াৎ" এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"তদনন্তরস্য তৎসন্নিহিতস্য পূর্ব্বপূর্ব্বস্যাপায়াৎ।" শেষে বলিয়াছেন যে, দুঃখের অপায়ই যখন অপবর্গ, তখন অপবর্গকে দুঃখের অপায়প্রযুক্ত বলা যায় না, সুতরাং সূত্রে ঐ স্থলে পঞ্চমী বিভক্তির অভেদ অর্থ বুঝিতে হইবে। পঞ্চমী বিভক্তির অভেদ অর্থ কোথাও দেখা যায় না, ইহা মনে করিয়া আবার শেষে বলিয়াছেন যে, অথবা সূত্রে "অপবর্গ" শব্দের দ্বারা অপবর্গব্যবহার পর্য্যন্তই বিবক্ষিত। মনের ভাব এই যে, অপবর্গ দুঃখের অপায়স্বরূপ হইলেও অপবর্গ-ব্যবহার অর্থাৎ অন্য লোকে যে 'অমুকের অপবর্গ হইয়াছে' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগাদি করে, তাহা দুঃখের অপায়প্রযুক্ত। কেহ বলিয়াছেন, সূত্রে 'অপবর্গ' শব্দের দ্বারা এখানে অপবর্গের প্রাপ্তি বিবক্ষিত। অর্থাৎ সূত্রোক্ত দুঃখের অপায় অপবর্গ হইতে অভিন্ন পদার্থ হইলেও তাহার যে প্রাপ্তি, তাহা ঐ অপবর্গ না হইলে সম্ভব হয় না। সুতরাং অপবর্গের প্রাপ্তিকে অপবর্গ-প্রযোজ্য বলা যায়। কিন্তু সেই অপবর্গের প্রাপ্তি যে, অপবর্গ হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থ, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। আর বৃত্তিকার বিশ্বনাথ যে, উক্ত সূত্রে "অপবর্গ" শব্দের অপবর্গব্যবহার অর্থ বলিয়াছেন, তাহাও মহর্ষির বিবক্ষিত বলিয়া বুঝা যায় না। কারণ, উক্ত সূত্রে তিনি অপবর্গের কারণই ব্যক্ত করিয়া, তাহারই ক্রম বলিয়াছেন। অপবর্গব্যবহারের কারণ তাঁহার বক্তব্য নহে। উক্ত "অপবর্গ" শব্দে ঐরূপ লক্ষণা স্বীকারও অযুক্ত।

মনে হয়, উক্ত সূত্রে "তদনন্তরাপায়াৎ" এই পদে পঞ্চমী বিভক্তির অনুপপত্তি বুঝিয়াই বেদান্তদর্শনের চতুর্থসূত্রভাষ্যের "রত্নপ্রভা" টীকায় শ্রীগোবিন্দ উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"তস্য প্রবৃত্তিরূপহেতোরনন্তরস্য জন্মনোঽপায়াৎ দুঃখধ্বংসরূপোঽপবর্গো ভবতীত্যর্থঃ।" অর্থাৎ তিনি সূত্রস্থ ঐ "তৎ" শব্দের দ্বারা কেবল সূত্রোক্ত "প্রবৃত্তি"কেই গ্রহণ করিয়া, "তদনন্তর" অর্থাৎ সেই প্রবৃত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বোক্ত জন্মের অপায়কেই সূত্রোক্ত "তদনন্তরাপায়" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সূত্রস্থ ঐ "তৎ" শব্দের দ্বারা উহার পূর্ব্বোক্ত জন্মাদি চারিটীই যে, মহর্ষির বুদ্ধিস্থ, ইহাই বুঝা যায়। কারণ ঐ চারিটীই সূত্রে "উত্তরোত্তর" শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। বস্তুতঃ সূত্রে "তদনন্তরাপায়" শব্দের দ্বারা কেবল জন্মের অপায়ই মহর্ষির বিবক্ষিত নহে। কিন্তু উহার দ্বারা দোষ, প্রবৃত্তি, জন্ম ও দুঃখ, এই চারিটির অপায়ই বিবক্ষিত। তন্মধ্যে চরম দুঃখের অপায় অপবর্গ হইতে অভিন্ন পদার্থ হইলেও দোষ, প্রবৃত্তি ও জন্মের অপায় ঐ অপবর্গের প্রযোজক। সুতরাং ঐ অপায়ত্রয়ের প্রযোজকত্ব পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারাই প্রকাশ করিতে হইবে। তাই অপবর্গরূপ চরম দুঃখাপায়ে অপবর্গের প্রযোজকত্ব সম্ভব না হইলেও মহর্ষি বহুর অনুরোধে "তদনন্তরাপায়াৎ" এইরূপই প্রয়োগ করিয়াছেন। তন্মধ্যে দুঃখাপায়ের সহিত ঐ পঞ্চমী বিভক্তির প্রযোজ্যত্ব অর্থের সম্বন্ধ নাই। ফলকথা, "দুঃখাপায়াদপবর্গঃ" এইরূপ প্রয়োগ সাধু না হইলেও "তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ" এইরূপ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তাই মহর্ষি বহুর অনুরোধেই উক্তরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাই আমরা বুঝি। বাচস্পতি মিশ্রও উক্ত বিষয়ে কোন আলোচনা করেন নাই।

ভাষ্য। তত্র আত্মাদ্যপবর্গপর্য্যন্তপ্রমেয়ে মিথ্যাজ্ঞানমনেক-প্রকারকং বর্ত্ততে। আত্মনি তাবন্নাস্তীতি। অনাত্মন্যাত্মেতি, দুঃখে সুখমিতি, অনিত্যে নিত্যমিতি, অত্রাণে ত্রাণমিতি, সভয়ে নির্ভয়মিতি, জুগুপ্সিতেঽভিমতমিতি, হাতব্যেঽপ্রতিহাতব্যমিতি। প্রবৃত্তৌ—নাস্তি কর্ম্ম, নাস্তি কর্ম্মফলমিতি। দোষেষু—নায়ং দোষনিমিত্তঃ সংসার ইতি। প্রেত্যভাবে—নাস্তি জন্তুর্জ্জীবো বা সত্ত্ব আত্মা বা, যঃ প্রেয়াৎ প্রেত্য চ ভবেদিতি। অনিমিত্তং জন্ম, অনিমিত্তো জন্মোপরম ইত্যাদিমান্ প্রেত্যভাবোঽনন্তশ্চেতি।

নৈমিত্তিকঃ সম্নকর্ম্মনিমিত্তঃ প্রেত্যভাব ইতি। দেহেন্দ্রিয়-বুদ্ধিবেদনা-সন্তানোচ্ছেদ-প্রতিসন্ধানাভ্যাং নিরাত্মকঃ প্রেত্যভাব ইতি। অপবর্গে—ভীষ্মং খল্বয়ং সর্ব্বকার্য্যোপরমঃ, সর্ব্ব বিপ্রয়োগেঽপবর্গে বহু ভদ্রকং লুপ্যত ইতি কথং বুদ্ধিমান্ সর্ব্বসুখোচ্ছেদমচৈতন্যমমুমপবর্গং রোচয়েদিতি।

অনুবাদ—সেই আত্মাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত "প্রমেয়" পদার্থ বিষয়ে মিথ্যা-জ্ঞান অনেক প্রকার। যথা—আত্মবিষয়ে "নাই" অর্থাৎ আত্মা নাই, এইরূপ জ্ঞান। অনাত্মাতে (দেহাদিতে) "আত্মা" এইরূপ জ্ঞান। দুঃখপদার্থে সুখ এইরূপ জ্ঞান। অনিত্য পদার্থে নিত্য এইরূপ জ্ঞান। অত্রাণে অর্থাৎ যাহা রক্ষক নহে, তাহাতে ত্রাণ এইরূপ জ্ঞান। সভয় পদার্থে নির্ভয় এইরূপ জ্ঞান। নিন্দিত পদার্থে অভিমত এইরূপ জ্ঞান। "হাতব্য" অর্থাৎ ত্যাজ্য পদার্থে অত্যাজ্য এইরূপ জ্ঞান। "প্রবৃত্তি" অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্মবিষয়ে কর্ম্ম নাই, কর্ম্মফল নাই, এইরূপ জ্ঞান। "দোষ" অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহ বিষয়ে—এই সংসার দোষনিমিত্ত নহে, এইরূপ জ্ঞান। "প্রেত্যভাব" অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মবিষয়ে,—যে মৃত হইবে এবং মরণের পরে জন্মিবে, এমন জন্তু বা জীব, সত্ত্ব বা আত্মা নাই, এইরূপ জ্ঞান। জন্ম নিমিত্তশূন্য, জন্মের নিবৃত্তিও নিমিত্তশূন্য অর্থাৎ জীবের জন্ম ও জন্মনিবৃত্তির কোন কারণ নাই, অতএব "প্রেত্যভাব" সাদি ও অনন্ত, এইরূপ জ্ঞান। প্রেত্যভাবে নিমিত্তজন্য হইলেও কর্ম্মনিমিত্তক নহে, এইরূপ জ্ঞান। দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি (জ্ঞান) ও বেদনার অর্থাৎ সুখ ও দুঃখের সন্তানদের উচ্ছেদ ও প্রতিসন্ধান হওয়ায় অর্থাৎ কোন দেহাদিপ্রবাহের উচ্ছেদের পরে অপর দেহাদিরই পুনর্জ্জন্ম হওয়ায় প্রেত্যভাব "নিরাত্মক" অর্থাৎ উহাতে অতিরিক্ত কোন আত্মার সম্বন্ধ নাই, এইরূপ জ্ঞান।*

---

* নৈরাত্ম্যবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ও পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করিতেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মতে উহা নিরাত্মক। ভাষ্যকার এখানে "প্রেত্যভাব" বিষয়ে উক্তরূপ জ্ঞানকেও একপ্রকার মিথ্যা-জ্ঞান বলিয়াছেন। উক্ত মতে রূপাদি পঞ্চ স্কন্ধ হইতে অতিরিক্ত কোন আত্মা নাই (তৃতীয় খণ্ড, সপ্তম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। উক্ত মতে এক দেহাদিসমষ্টিরূপ সন্তানের উচ্ছেদ বা বিনাশ হইলে অপর দেহাদিসমষ্টিরূপ সন্তানেরই প্রতিসন্ধান হয়। ভাষ্যকার এখানে সংক্ষেপেই উক্ত মতের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যে "উচ্ছেদ" শব্দের পরে প্রযুক্ত "প্রতিসন্ধান" শব্দের অর্থ এখানে পুনরুৎপত্তি বা পুনর্জ্জন্ম। মহর্ষি গোতমও পরে (৪।১।৬৩ সূত্রে) উক্ত অর্থে "প্রতিসন্ধান" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। "বেদনা" শব্দের জ্ঞান অর্থ এবং দুঃখ অর্থ প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু ভাষ্যে উক্ত স্থলে "বেদনা" শব্দের অর্থ সুখ ও দুঃখ। বৌদ্ধসম্প্রদায়ও সুখ ও দুঃখকে "বেদনা" বলিয়াছেন। ন্যায়বার্ত্তিকে (৪।২।৩৭) বৌদ্ধমতবিচারে উদ্দ্যোতকরও লিখিয়াছেন,—"বেদনা সুখদুঃখে"। শারীরক ভাষ্যে (১।৩।১৯) আচার্য্য শঙ্করও বেদনার উল্লেখ করিয়াছেন। সেখানে "রত্নপ্রভা" টীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"বেদনা হর্ষশোকাদিঃ।"

অপবর্গ বিষয়ে—যাহাতে সর্ব্বকার্য্যের উপরম বা নিবৃত্তি হয়, এমন এই অপবর্গ ভীষ্মই অর্থাৎ ভয়ানকই। যাহাতে সমস্ত অভীষ্ট পদার্থের বিয়োগ হয়, এমন অপবর্গ হইলে বহু শুভ নষ্ট হয়—এ জন্য কিরূপে বুদ্ধিমান্ মানব সর্ব্বসুখের উচ্ছেদকর চৈতন্যহীন এই অপবর্গকে ভাল বোধ করিবে? অর্থাৎ উক্তরূপ অপবর্গ বা মুক্তি কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই রুচিকর হইতে পারে না—এইরূপ জ্ঞান (অপবর্গ বিষয়ে মিথ্যা জ্ঞান)।

ভাষ্য। এতস্মান্মিথ্যাজ্ঞানাদনুকূলেষু রাগঃ প্রতিকূলেষু দ্বেষঃ। রাগদ্বেষাধিকারাচ্চাসত্যের্ষ্যা-মায়া-লোভাদয়ো দোষা ভবন্তি। দোষৈঃ প্রযুক্তঃ শরীরেণ প্রবর্ত্তমানো হিংসাস্তেয়-প্রতিষিদ্ধমৈথুনান্যাচরতি। বাচানৃতপরুষ-সূচনাসম্বদ্ধানি। মনসা পরদ্রোহং পরদ্রব্যাভীপ্সাং নাস্তিক্যঞ্চেতি। সেয়ং পাপাত্মিকা প্রবৃত্তিরধর্ম্মায়।

অথ শুভা—শরীরেণ দানং পরিত্রাণং পরিচরণঞ্চ। বাচা সত্যং হিতং প্রিয়ং স্বাধ্যায়ঞ্চেতি। মনসা দয়ামস্পৃহাং শ্রদ্ধাঞ্চেতি। সেয়ং ধর্ম্মায়।

অত্র প্রবৃত্তিসাধনৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ "প্রবৃত্তি"শব্দেনোক্তৌ। যথা অন্নসাধনাঃ প্রাণাঃ,—"অন্নং বৈ প্রাণিনঃ প্রাণাঃ" ইতি।

সেয়ং প্রবৃত্তিঃ কুৎসিতস্যাভিপূজিতস্য চ জন্মনঃ কারণং। জন্ম পুনঃ শরীরেন্দ্রিয়বুদ্ধিবেদনানাং নিকায়বিশিষ্টঃ প্রাদুর্ভাবঃ।* তস্মিন্ সতি দুঃখং, তৎ পুনঃ প্রতিকূলবেদনীয়ং বাধনা পীড়া

* এখানে প্রচলিত ভাষ্যপুস্তকে "শরীরেন্দ্রিয়-বুদ্ধীনাং" এইরূপ পাঠই আছে। কিন্তু এখানেও ভাষ্যকার বুদ্ধির পরে সুখদুঃখরূপ "বেদনা"র উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। পরে ১৯শ সূত্রের ভাষ্যেও ভাষ্যকার পুনর্জ্জন্মের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"সম্বন্ধস্তু দেহেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধিবেদনাভিঃ"। এখানে "ইন্দ্রিয়" শব্দের দ্বারাই মনও গৃহীত হইতে পারে। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভবার্ত্তিকে (৩৪০ পৃঃ) উদ্দ্যোতকরও লিখিয়াছেন,—"কিং পুনরাত্মনো জন্ম? নিকায়বিশিষ্টাভিঃ শরীরেন্দ্রিয়-বুদ্ধি-বেদনাভিরপূর্ব্বাভিরভিসম্বন্ধঃ"। সেখানে টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"নিকায়ো দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদীনামনৌত্তরাধর্য্যেণাবস্থিতঃ সংঘাতঃ, তদ্বিশিষ্টাভিরিত্যর্থঃ"। বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতেও (১৯শ কারিকার টীকায়) জন্মের ব্যাখ্যায় উক্তরূপ অর্থেই "নিকায়" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং এখানে ভাষ্যকারোক্ত "নিকায়" শব্দেরও উক্তরূপ অর্থই বুঝা যায়।

তাপ ইতি। ত ইমে মিথ্যাজ্ঞানাদয়ো দুঃখান্তা ধর্ম্মা অবিচ্ছেদেনৈব প্রবর্ত্তমানাঃ সংসার ইতি।

যদা তু তত্ত্বজ্ঞানান্মিথ্যাজ্ঞানমপৈতি, তদা মিথ্যাজ্ঞানাপায়ে দোষা অপযন্তি, দোষাপায়ে প্রবৃত্তিরপৈত, প্রবৃত্ত্যপায়ে জন্মাপৈতি, জন্মাপায়ে দুঃখমপৈতি, দুঃখাপায়ে চাত্যন্তিকোঽপবর্গো নিঃশ্রেয়সমিতি।

অনুবাদ—এই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নানাপ্রকার মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ অনুকূল বিষয়সমূহে অনুরাগ এবং প্রতিকূল বিষয়সমূহে দ্বেষ জন্মে। রাগ ও দ্বেষের অধিকার অর্থাৎ বশবর্ত্তিতাবশতঃ অসত্য, ঈর্ষ্যা, কপটতা ও লোভাদি নানা দোষ জন্মে। দোষসমূহকর্ত্তৃক "প্রযুক্ত" অর্থাৎ জনিতপ্রযত্ন মানব শরীর দ্বারা প্রবর্ত্তমান হইয়া হিংসা, চৌর্য্য এবং নিষিদ্ধ মৈথুন আচরণ করে। বাক্যদ্বারা মিথ্যা, পরুষ (কটূক্তি), সূচনা (পরদোষপ্রকাশ) এবং "অসম্বদ্ধ" অর্থাৎ প্রলাপাদি আচরণ করে। মনের দ্বারা পরদ্রোহ, পরদ্রব্যের প্রাপ্তিকামনা এবং নাস্তিকতা আচরণ করে। সেই এই পাপাত্মিকা প্রবৃত্তি (অশুভ কর্ম্ম) অধর্ম্মের নিমিত্ত হয়।

অনন্তর শুভ প্রবৃত্তি (কর্ম্ম) বলিতেছি, যথা—শরীরের দ্বারা দান, পরিত্রাণ এবং পরিচর্য্যা অর্থাৎ (পরসেবা) আচরণ করে। বাক্যের দ্বারা সত্য, হিত, প্রিয় ও স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদপাঠাদি আচরণ করে। মনের দ্বারা দয়া, নিস্পৃহতা এবং শ্রদ্ধা আচরণ করে। সেই এই শুভ প্রবৃত্তি (শুভ কর্ম্ম) ধর্ম্মের নিমিত্ত হয়।

এই সূত্রে "প্রবৃত্তিসাধন" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শুভ ও অশুভ কর্ম্মরূপ প্রবৃত্তি যাহার সাধন বা জনক, এমন ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই "প্রবৃত্তি" শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। যেমন প্রাণ অন্ন-সাধন অর্থাৎ অন্ন-সাধ্য, (এ জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন) 'অন্নই প্রাণীর প্রাণ'। [অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিবাক্যে যেমন অন্নসাধ্য অর্থে প্রাণকে অন্ন বলা হইয়াছে, তদ্রূপ এই সূত্রে প্রবৃত্তিসাধ্য অর্থে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে প্রবৃত্তি বলা হইয়াছে।]

সেই এই প্রবৃত্তি অর্থাৎ অধর্ম্ম ও ধর্ম্ম (যথাক্রমে) নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট জন্মের কারণ। জন্ম বলিতে শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বেদনার (সুখ-দুঃখের) নিকায়বিশিষ্ট প্রাদুর্ভাব (অর্থাৎ দেবমনুষ্যাদি কোন জীবকুলে সংঘাতবিশিষ্ট বা মিলিত

অভিনব দেহাদির সহিত আত্মার সম্বন্ধবিশেষই সেই আত্মার জন্ম বলিয়া কথিত হয়)। সেই জন্ম হইলে দুঃখ হইবেই, সেই দুঃখ বলিতে প্রতিকূল-বেদনীয়, বাধনা, পীড়া, তাপ [অর্থাৎ যাহা জীবের প্রতিকূল ভাবে অনুভবের বিষয় হয় এবং যাহাকে বাধনা, পীড়া ও তাপ বলে, তাহাই দুঃখপদার্থ] অবিচ্ছেদেই প্রবর্ত্তমান অর্থাৎ অনাদি কাল হইতেই কার্য্যকারণভাবে উৎপদ্যমান সেই এই সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানাদি দুঃখপর্য্যন্ত ধর্ম্ম সংসার।

কিন্তু যে সময়ে তত্ত্বজ্ঞানজন্য মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হয়, তখন মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশে (তাহার কার্য্য) দোষগুলি নিবৃত্ত হয়। দোষের নিবৃত্তি হইলে "প্রবৃত্তি" (ধর্ম্মাধর্ম্ম) নিবৃত্ত হয়। প্রবৃত্তির অপায় হইলে "জন্ম" নিবৃত্ত হয়। জন্মের নিবৃত্তি হইলে দুঃখ নিবৃত্ত হয়। দুঃখের নিবৃত্তি (আত্যন্তিক অভাব) হইলে, আত্যন্তিক অপবর্গরূপ অর্থাৎ পরমমুক্তিরূপ নিঃশ্রেয়স হয়।

ভাষ্য। তত্ত্বজ্ঞানন্তু খলু মিথ্যাজ্ঞানবিপর্য্যয়েণ ব্যাখ্যাতং। আত্মনি তাবদস্তীতি, অনাত্মন্যনাত্মেতি। এবং দুঃখে নিত্যে ত্রাণে সভয়ে জুগুপ্সিতে হাতব্যে চ যথাবিষয়ং বেদিতব্যম্। প্রবৃত্তৌ—অস্তি কর্ম্ম, অস্তি কর্ম্মফলমিতি। দোষেষু—দোষনিমিত্তোঽয়ং সংসার ইতি। প্রেত্যভাবে খল্বস্তি জন্তুর্জীবঃ সত্ত্ব আত্মা বা, যঃ প্রেত্য ভবেদিতি। নিমিত্তবজ্জন্ম, নিমিত্তবান্ জন্মোপরম ইত্যনাদিঃ প্রেত্যভাবোঽপবর্গান্ত ইতি। নৈমিত্তিকঃ সন্ প্রেত্যভাবঃ প্রবৃত্তিনিমিত্ত ইতি। সাত্মকঃ সন্ দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিবেদনা-সন্তানোচ্ছেদপ্রতিসন্ধানাভ্যাং প্রবর্ত্তত ইতি। অপবর্গে—শান্তঃ খল্বয়ং সর্ব্ববিপ্রয়োগঃ সর্ব্বোপরমোঽপবর্গঃ, বহু চ কৃচ্ছ্রং ঘোরং পাপকং লুপ্যত ইতি কথং বুদ্ধিমান্ সর্ব্বদুঃখোচ্ছেদং সর্ব্বদুঃখাসংবিদমপবর্গং ন রোচয়েদিতি। তদ্‌যথা—মধুবিষসম্পৃক্তান্নমনাদেয়মিতি, এবং সুখং দুঃখানুষক্ত-মনাদেয়মিতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ—তত্ত্বজ্ঞান কিন্তু মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (সে কিরূপ, তাহা নিজেই যথাক্রমে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিতেছেন।) আত্ম-

বিষয়ে "আছে" অর্থাৎ আত্মা আছে, এইরূপ জ্ঞান। অনাত্মাতে (দেহাদিতে) অনাত্মা (আত্মা নহে), এইরূপ জ্ঞান। এইরূপ (পূর্ব্বোক্ত) দুঃখে, নিত্যে, ত্রাণে, সভয়ে, নিন্দিতে এবং ত্যাজ্য বিষয়ে বিষয়ানুসারে (তত্ত্বজ্ঞান) জানিবে। (দুঃখে দুঃখবুদ্ধি, নিত্যে নিত্যবুদ্ধি ইত্যাদি)।

"প্রবৃত্তি বিষয়ে"—কর্ম্ম আছে, কর্ম্মফল আছে, এইরূপ জ্ঞান। "দোষ" বিষয়ে—এই সংসার দোষজন্য, এইরূপ জ্ঞান। "প্রেত্যভাব"—যিনি মরিয়া জন্মিবেন, সেই জন্তু বা জীব আছেন, সত্ত্ব বা * আত্মা আছেন, এইরূপ জ্ঞান। জন্ম কারণজন্য, জন্মের নিবৃত্তি কারণজন্য ; সুতরাং প্রেত্যভাব অনাদি মোক্ষ-পর্য্যন্ত, এইরূপ জ্ঞান। "প্রেত্যভাব" কারণ-জন্য হইয়া প্রবৃত্তি-জন্য অর্থাৎ ধর্ম্মা-ধর্ম্ম-জন্য এইরূপ জ্ঞান। "সাত্মক" হইয়াই অর্থাৎ প্রেত্যভাব দেহাদি হইতে অতিরিক্ত নিত্য আত্মযুক্ত হইয়াই দেহ-ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি-সুখ-দুঃখ-সমষ্টির উচ্ছেদ ও প্রতিসন্ধানবশতঃ প্রবৃত্ত হইতেছে—এইরূপ জ্ঞান। "অপবর্গ" বিষযে—যাহাতে সকল পদার্থের সহিত বিয়োগ হয়, যাহাতে সর্ব্বকার্য্যের নিবৃত্তি হয়, এমন এই অপবর্গ শান্ত অর্থাৎ ভয়ানক নহে এবং (ইহাতে) বহু কষ্টকর ঘোর পাপ নষ্ট হয়, সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বদুঃখের উচ্ছেদকর, সর্ব্বদুঃখের জ্ঞানরহিত অপবর্গকে কেন ভালবাসিবেন না। অতএব যেমন মধু ও বিষ-মিশ্রিত অন্ন অগ্রাহ্য, তদ্রূপ দুঃখানুষক্ত সুখ অগ্রাহ্য, এইরূপ জ্ঞান † ॥ ২ ॥

টিপ্পনী—ভাষ্যকার পরে তাঁহার পূর্ব্ববর্ণিত মিথ্যাজ্ঞানগুলির বিপরীত জ্ঞানকেই তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ, উক্তরূপ তত্ত্বজ্ঞানই উহার বাধ্য মিথ্যাজ্ঞানকে নিবৃত্ত করে। কিন্তু তুল্য যুক্তিতে উক্ত মিথ্যাজ্ঞানও

---

* "জন্তু" বলিয়া শেষে আবার জীব বলিয়া তাহার বিবরণ করিযাছেন। এবং "সত্ত্ব" বলিয়া, শেষে আবার "আত্মা" বলিয়াই তাহারই বিবরণ করিয়াছেন। প্রাচীন কালে ঐ সমস্ত শব্দ একত্র এক অর্থে প্রযুক্ত হইত। বিশদ বিবরণের জন্যই ভাষ্যকার ঐরূপ বলিয়াছেন। আত্মবাচক "সত্ত্ব" শব্দের পুংলিঙ্গ-প্রয়োগেও প্রমাণ আছে। তৃতীয় খণ্ড, ২২শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১। সুখ "দুঃখানুষক্ত" অর্থাৎ দুঃখের অনুষঙ্গবিশিষ্ট। অনুষঙ্গ বলিতে অবিনাভাব সম্বন্ধ। যেখানে সুখ, সেখানে দুঃখ এবং যেখানে দুঃখ, সেখানে সুখ। ইহাই সুখদুঃখের অবিনাভাব। ২। অথবা সমাননিমিত্ততাই অনুষঙ্গ। যাহা যাহা সুখের সাধন, তাহাই দুঃখের সাধন। ৩। অথবা সমানাধারতাই অনুষঙ্গ ; যে আধারে সুখ আছে, সেই আধারেই দুঃখ আছে। ৪। অথবা সমানোপলভ্যতাই অনুষঙ্গ, যিনি সুখের উপলব্ধি করেন, তিনি দুঃখের উপলব্ধি করেন। উদ্দ্যোতকর এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যের সর্ব্বশেষবর্ত্তী "ইতি" শব্দটি সূত্রের সমাপ্তিবোধক।

তত্ত্বজ্ঞানের বাধক হওয়ায় কিরূপে সেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে ? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, মিথ্যাজ্ঞান প্রথমোৎপন্ন জ্ঞান হইলেও উহা নিঃসহায় বলিয়া দুর্ব্বল। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের সত্য বিষয়ই তাহার সহায় এবং আগমাদি প্রমাণও তাহার সহায়। সুতরাং মিথ্যাজ্ঞান কখনই প্রবল তত্ত্ব-জ্ঞানের বাধক হইতে পারে না। কিন্তু পরে উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞানই উহার বাধক বা নিবর্ত্তক হয়। বস্তুতঃ পরস্পর নিরপেক্ষ উক্তরূপ জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যে পরজ্ঞানই প্রবল। কারণ, তত্ত্ব-পক্ষপাতই জ্ঞানের স্বভাব। সুতরাং দুর্ব্বল মিথ্যাজ্ঞান কখনই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের বাধক হইতে পারে না। বেদবাহ্য বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ও ঐ কথাই বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রও অনেক গ্রন্থে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। *

ভাষ্যকার সূত্রার্থ-ব্যাখ্যার জন্য প্রথম সূত্রোক্ত মিথ্যাজ্ঞানের বর্ণন করিতে আত্মা হইতে অপবর্গ পর্য্যন্ত দ্বাদশ প্রমেয় বিষয়ে অনেক প্রকার মিথ্যাজ্ঞানের বর্ণন করিয়াছেন। ভাষ্যে "বর্ত্ততে" এই পদের দ্বারা আত্মাদি প্রমেয়বর্গ অনেক প্রকার মিথ্যাজ্ঞানের বিষয় হয়, ইহাই কথিত হইয়াছে। মহর্ষি পরে নবম সূত্রে (১) আত্মা, (২) শরীর, (৩) ইন্দ্রিয়, (৪) গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থ, (৫) বুদ্ধি বা জ্ঞান, (৬) মন, (৭) শুভ ও অশুভ কর্ম্মরূপ প্রবৃত্তি, (৮) রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দোষ, (৯) প্রেত্যভাব অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম, (১০) ফল, (১১) দুঃখ ও (১২) অপবর্গ, এই দ্বাদশ প্রকার "প্রমেয়" পদার্থ বলিয়াছেন। সেই প্রমেয়পদার্থ বিষয়ে নানা প্রকার মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রমই জীবের সংসারের নিদান। সুতরাং এই সূত্রে "মিথ্যাজ্ঞান" শব্দের দ্বারা সংসারনিদান মিথ্যা-জ্ঞানই মহর্ষির বুদ্ধিস্থ, ইহা বুঝা যায়। কারণ, মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তিপ্রযুক্তই ক্রমে মুমুক্ষুর সংসারের উচ্ছেদ হয়, সুতরাং আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ অপবর্গ হয়, এই কথাই এই সূত্রে তিনি বলিয়াছেন এবং পরে চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রারম্ভে বলিয়াছেন,—"দোষনিমিত্তানাং তত্ত্বজ্ঞানাদহঙ্কারনিবৃত্তিঃ"। ভাষ্যকার উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, আত্মাদি দ্বাদশবিধি প্রমেয়ের মধ্যে শরীর হইতে দুঃখ পর্য্যন্ত দশবিধ প্রমেয় নানারূপ মিথ্যাজ্ঞানের বিষয় হওয়ায়

* "তদিদমন্যৈরপ্যুক্তং—"পূর্ব্বাৎ পরবলীয়স্ত্বং তত্র নাম প্রতীয়তাং। অন্যোন্য-নিরপেক্ষাণাং যত্র জন্মধিয়াং ভবেৎ"। ভূতার্থ-পক্ষপাতো হি বুদ্ধেঃ স্বভাবঃ। যদাহুর্ব্বাহ্যা অপি "নিরুপদ্রবভূতার্থস্বভাবস্য বিপর্য্যয়ৈঃ। ন বাধো যত্নবত্ত্বেঽপি বুদ্ধেস্তৎপক্ষপাততঃ"।' —তাৎপর্য্যটীকা। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী", ৫৪ কারিকা।

রাগদ্বেষাদিদোষের নিমিত্ত হয়। সেই দশবিধ প্রমেয়ের চরম তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহা তদ্বিষয়ে অহঙ্কারকে নিবৃত্ত করে। ফলকথা, শরীরাদি দশবিধ প্রমেয় বিষয়ে নানারূপ মিথ্যাজ্ঞানও সংসারের নিদান বলিয়া, ভাষ্যকার এখানে তাহারও বর্ণন করিয়াছেন। "দুঃখে সুখমিতি" ইত্যাদি "অপ্রতিহাতব্যং" ইত্যন্ত সন্দর্ভের দ্বারা শরীরাদি মনঃ পর্য্যন্ত পঞ্চবিধ প্রমেয় বিষয়ে যথাসম্ভব মিথ্যা-জ্ঞানের বর্ণন করিয়া, "প্রবৃত্তৌ" ইত্যাদি "রোচয়েৎ" ইত্যন্ত সন্দর্ভের দ্বারা যথাক্রমে "প্রবৃত্তি" হইতে "অপবর্গ" পর্যন্ত প্রমেয় বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানের বর্ণন করিয়াছেন। চরম প্রমেয় অপবর্গ বিষয়ে উক্তরূপ মিথ্যাজ্ঞান জন্মিলে ঐহিক বা পারত্রিক সুখ-ভোগাদির জন্যই কর্ম্মপ্রবৃত্তি হয়। সুতরাং অপবর্গ বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানও সংসারের নিদান হইয়া থাকে।

ভাষ্যকারের মতে মহর্ষি গোতমোক্ত প্রথম প্রমেয় জীবাত্মা। সেই আত্মা সৎ পদার্থ হইলেও তাহাতে অসতের ধর্ম্ম নাস্তিত্বের আরোপ হইতে পারে। সুতরাং "আত্মা নাস্তি" এইরূপে আত্মাতে যে নাস্তিত্ব ভ্রম, তাহা প্রথম প্রকার মিথ্যাজ্ঞান। আর অনাত্মা দেহাদি যে কোন পদার্থে অথবা দেহাদিসমুদায়ে যে আত্মবুদ্ধি, তাহাও আত্মবিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান। উক্ত দ্বাদশবিধ প্রমেয় মধ্যে প্রথম আত্মা ও চরম প্রমেয় অপবর্গ ই উপাদেয়, এবং শরীরাদি দশবিধ প্রমেয় হেয়। অনেকে স্বস্বরূপেই আত্মাকে উপাদেয় বলিয়া, সুখ-দুঃখাদিবিশিষ্টস্বরূপে উহাকেও হেয় বলিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, আত্মার মুক্তাবস্থায় সুখ-দুঃখাদি কোন বিশেষ গুণ জন্মে না, তখনই তাহার স্বস্বরূপে অবস্থান হয়। সুতরাং আত্মার বদ্ধাবস্থা হেয় বলিয়া বদ্ধ আত্মা হেয়মধ্যেই গণ্য। ভাষ্যকার উক্ত দ্বাদশ প্রমেয় বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানের বর্ণন করিয়া, পরে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—"এতস্মাৎ" ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত নানারূপ মিথ্যাজ্ঞানবশতঃই অনুকূল বিষয়ে আকাঙ্ক্ষারূপ রাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষরূপ দোষ জন্মে। তাহার ফলে অসত্য প্রভৃতি আরও নানা দোষ জন্মে। সেই সমস্ত দোষবশতঃই মানব নানাবিধ পাপকর্ম্ম ও পুণ্যকর্ম্ম করিয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম লাভ করে। তাহার ফলে নানাবিধ জন্ম লাভ করিয়া নানাবিধ দুঃখ ভোগ করে। সুতরাং ঐ সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানই যে সংসারের নিদান এবং উহাই সর্ব্বদুঃখের মূল, ইহা যুক্তিসিদ্ধ। সুতরাং ঐ আত্মাদি প্রমেয়তত্ত্বের সাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞানই যে, ঐ সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির দ্বারা মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হয়, ইহাও যুক্তিসিদ্ধ। কারণ, সেই

তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত ঐ সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারে না, তাহা না হইলেও রাগদ্বেষাদি দোষের নিবৃত্তি হইতে পারে না, তাহা না হইলেও ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইতে পারে না, তাহা না হইলেও জন্মের নিবৃত্তি হইতে পারে না, তাহা না হইলেও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ অপবর্গ অসম্ভব। অতএব মুমুক্ষু যোগীর যে, চরম আত্মসাক্ষাৎকার জন্মে, তাহা তখন ঐ আত্মাদি সমস্ত প্রমেয়বিষয়কই হয়, অর্থাৎ যোগজ সন্নিকর্ষের দ্বারা তিনি তখন ঐ আত্মাদি সমস্ত প্রমেয়েরই অলৌকিক প্রত্যক্ষ করেন, ইহাই মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। মহর্ষি পরে চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে "সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারাও তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন।

কিন্তু মুমুক্ষুর নিজের আত্মাই মিথ্যাজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান বিষয়। কারণ, সেই আত্মবিষয়ে সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি ব্যতীত কোনরূপেই তাহার মুক্তি হইতে পারে না। এ জন্য উপনিষদে প্রধানতঃ আত্মদর্শনই মুক্তির সাক্ষাৎকারণরূপে কথিত হইয়াছে এবং পরমাত্মা পরমেশ্বরের দর্শন সেই আত্মদর্শনের উৎপাদক বলিয়া তাহাও ঐ ভাবে প্রধানতঃ মুক্তির কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। কারণ, সেই পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত কোন উপায়েই আত্মদর্শন জন্মিতে পারে না। ঐ তাৎপর্য্যেই শ্রুতি বলিয়াছেন,—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"—(শ্বেতাশ্বতর, ৬।৮) এবং ঐ তাৎপর্য্যেই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥"—(গীতা, ৮।১৬)। তাই মুমুক্ষু যোগীও নিজের আত্মদর্শন লাভের জন্য সেই পরমেশ্বরেরই শরণাপন্ন হইয়া বলেন,—"তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।" (শ্বেতাশ্বতর উপ)। পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত যে, মুমুক্ষুর আত্মদর্শন জন্মে না, ইহা শারীরক ভাষ্যে (২।৩।৪১) অদ্বৈতবাদী আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন। মহর্ষি গোতমও পরে "তৎকারিতত্বাদহেতুঃ" (৪।১।২১) এই সূত্রের দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তেরও সূচনা করিয়াছেন। "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" (অক্ষপাদ দর্শনে) গোতম মতের ব্যাখ্যা করিতে মাধবাচার্য্যও লিখিয়াছেন,—"তস্মাৎ পরিশেষাৎ পরমেশ্বরানুগ্রহবশাৎ শ্রবণাদিক্রমেণাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারবতঃ পুরুষধৌরেয়স্য দুঃখনিবৃত্তিরাত্যন্তিকী নিঃশ্রেয়সমিতি নিরবদ্যম্"।*

* এ বিষয়ে অন্যান্য বক্তব্য ও আলোচনা মৎপ্রণীত "ন্যায়-পরিচয়" পুস্তকের সপ্তম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

মূলকথা, মহর্ষি গোতমোক্ত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকারই সংসারনিদান সর্ব্বপ্রকার সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির দ্বারা মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ এবং প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান ঐ প্রমেয়তত্ত্বজ্ঞানের নির্ব্বাহক ও সংরক্ষক হওয়ায় উহা পরম্পরায় মুক্তির প্রযোজক, ইহাই মহর্ষির এই স্থত্রের দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। তাই ভাষ্যকারও প্রথম স্থত্রভাষ্যেই বলিয়াছেন,—"তচ্চৈতদুত্তরস্থত্রেণানূদ্যতে"। এ বিষয়ে অন্যান্য কথা চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রারম্ভে ভাষ্যটিপ্পনীতে লিখিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, রাগ ও দ্বেষ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কারণ নহে। ইচ্ছা ব্যতীতও গঙ্গাস্নানাদি ঘটিলে কর্ম্মশক্তিতে যখন ধর্ম্ম হয় এবং দ্বেষ ব্যতীতও হিংসাদি ঘটিয়া গেলে যখন তজ্জন্য অধর্ম্ম হয়, আবার জীবন্মুক্ত ব্যক্তির রাগ ও দ্বেষ থাকিলেও যখন ধর্ম্মাধর্ম্ম জন্মে না, তখন রাগ ও দ্বেষকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কারণ বলা যায় না। অতএব স্থত্রে "দোষ" শব্দের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কারই বিবক্ষিত। উহাই ধর্ম্মাধর্ম্মের কারণ। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির উহা না থাকাতেই রাগ ও দ্বেষবশতঃ কর্ম্ম করিলেও ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হয় না। কিন্তু ইহাতে বক্তব্য এই যে, মহর্ষি গোতমের পরিভাষানুসারে "দোষ" শব্দের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কার বুঝা যায় না। মহর্ষি ঐরূপ অর্থে কোথাও "দোষ" শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। পরন্তু এখানে মিথ্যাজ্ঞানের নাশে যখন দোষের নাশ বলিয়াছেন, তখন এখানে দোষ বলিতে মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কার বুঝাও যায় না। কারণ, জ্ঞানের নাশে ঐ জ্ঞানজন্য সংস্কার নষ্ট হয়, এ কথা বলা যায় না। জ্ঞান নষ্ট হইয়া গেলেও তজ্জন্য অনেক সংস্কার থাকিয়া যায়। অবশ্য তত্ত্বজ্ঞানজন্য সংস্কারের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কার নষ্ট হয়, ইহা বলা যাইতে পারে ; কিন্তু মহর্ষি ত তাহা বলেন নাই। মহর্ষির স্থত্রের দ্বারা বুঝা যায় যে, মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে মিথ্যাজ্ঞানের অপায় হয়, তজ্জন্য দোষের অপায় হয়। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের অপায় হয়, এ কথার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, মিথ্যাজ্ঞান আর জন্মিতে পারে না এবং তত্ত্বজ্ঞান যে সংস্কার উৎপন্ন করে, ঐ সংস্কার মিথ্যাজ্ঞানজন্য পূর্ব্বসংস্কারকে বিনষ্ট করে। স্থতরাং তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানকে ঐরূপে বিনষ্ট করে, ইহা বলা হয়। বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞানজন্য সংস্কার থাকায় জীবন্মুক্তের আর উৎকট রাগদ্বেষ জন্মিতে পারে না। অর্থাৎ যেরূপ রাগ ও দ্বেষ কর্ম্মে আসক্ত করিয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কারণ হয়, জীবন্মুক্তের তাহা জন্মিতে পারে না। স্থতরাং

তাঁহার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম জন্মে না। সূত্রে "দোষ" শব্দের দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের কারণরূপে সেইরূপ রাগ-দ্বেষই উক্ত হইয়াছে। কারণ, ঐরূপ দোষই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কারণ। জীবন্মুক্তের রাগ-দ্বেষ সেরূপ নহে। আর যাঁহাদিগের বিষয়বিশেষে নিজের রাগ বা দ্বেষ না থাকিলেও ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম জন্মিতেছে, তাঁহাদিগের মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কার থাকায় সে বিষয়ে রাগ ও দ্বেষের যোগ্যতা আছে। ফল কথা, মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কারসহিত যে রাগ ও দ্বেষ, তাহাই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কারণ। কিন্তু উহা সাক্ষাৎ কারণ নহে। শুভ ও অশুভ কর্ম্ম উৎপন্ন করিয়া তদ্দ্বারাই উহা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কারণ হয়।

মহর্ষি পরে "প্রবৃত্তির্ব্বাগ্‌বুদ্ধিশরীরারম্ভঃ"—(১।১।১৭) এই সূত্রের দ্বারা বাচিক, মানসিক ও শারীরিক অশুভ ও শুভ কর্ম্মকেই "প্রবৃত্তি" নামক প্রমেয় বলিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে উক্ত দ্বিবিধ কর্ম্মকেই দশবিধ বলিয়াছেন, ইহা বুঝা আবশ্যক। প্রথমেই পাপকর্ম্মের উল্লেখ করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—শরীরের দ্বারা (১) হিংসা, (২) চৌর্য্য, (৩) নিষিদ্ধ মৈথুন ; বাক্যের দ্বারা (৪) মিথ্যাভাষণ, (৫) কটূক্তি, (৬) পরদোষ প্রকাশ, (৭) অসম্বদ্ধ প্রলাপ , মনের দ্বারা (৮ পরদ্রোহ, (৯) পরদ্রব্যের প্রাপ্তিকামনা এবং (১০) নাস্তিক্য। ভাষ্যকার যে, নাস্তিকতাকেও মানসিক পাপকর্ম্ম বলিয়াছেন, ইহা প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝা আবশ্যক এবং সতত মনে রাখা আবশ্যক। ভাষ্যকার পরে শুভ কর্ম্মের উল্লেখ করিতে বলিয়াছেন,—শরীরের দ্বারা (১) দান, (২) পরিত্রাণ ও (৩) পরিচর্য্যা ; বাক্যদ্বারা (৪) সত্যভাষণ, (৫) হিতোপদেশ, (৬) প্রিয়ভাষণ ও (৭) স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রপাঠ ; মনের দ্বারা (৮) দয়া, (৯) নিস্পৃহতা এবং (১০) শ্রদ্ধাকেও মানসিক শুভ কর্ম্ম বলিয়াছেন, ইহা বুঝা আবশ্যক এবং সতত মনে রাখা আবশ্যক। আরও বুঝা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার পরে মানসিক শুভ কর্ম্মের মধ্যে যে শ্রদ্ধার উল্লেখ করিয়াছেন, উহার বিপরীত অশ্রদ্ধাকেই তিনি পূর্ব্বে "নাস্তিক্য" শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিয়াছেন,—"শাস্ত্রার্থে দৃঢ়প্রত্যয়ঃ শ্রদ্ধা"। অর্থাৎ বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রসিদ্ধান্তে দৃঢ় বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধারূপ বুদ্ধির বিপরীত বুদ্ধিই অশ্রদ্ধা। সেই অশ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তিতেও "নাস্তিক" শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় ভাষ্যকার এখানে সেই অশ্রদ্ধাকেই "নাস্তিক্য" বলিয়াছেন।

যদিও পাণিনির "অস্তি নাস্তি দিষ্টং মতিঃ" এই সূত্রানুসারে "দিষ্টং পরলোকো নাস্তি"—অর্থাৎ পরলোক নাই, এইরূপ মতিবিশিষ্ট ব্যক্তিই "নাস্তিক"

শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ, কিন্তু মনু বলিয়াছেন,—'নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ", * সুতরাং পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও কেহ বেদের অবমাননা করিলে তাহাকেও উক্তরূপ অর্থে নাস্তিক বলা যায়। তাই বেদবিশ্বাসী পূর্ব্বাচার্য্যগণ পরলোকবাদী জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায়কেও উক্ত অর্থে "নাস্তিক" বলিয়াছেন। কারণ, তাঁহারা বেদের অবমাননা করিয়াছেন। বৌদ্ধাচার্য্য শান্ত রক্ষিত "তত্ত্বসংগ্রহে" স্পষ্ট বলিয়াছেন,—"বেদমুলঞ্চ নৈবেদং বুদ্ধানামুপদেশনং। নিষ্কলঙ্কন্তু তৎ প্রোক্তং সকলঙ্কং শ্রুতৌ পুনঃ॥"— (তত্ত্বসংগ্রহ, গাইকোয়াড় সংস্করণ, ৯১৯ পৃ°)।' "নহি নিষ্কলঙ্কমুপদেশনং সকলঙ্কমূলং যুক্তং" (পঞ্জিকা)। উক্ত শ্লোকে শান্ত রক্ষিত বেদের উপদেশকে সকলঙ্ক বলিয়া বেদের নিন্দাই করিয়াছেন।**

ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে "প্রবৃত্তি" শব্দের দ্বারা "প্রবৃত্তিসাধন" ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই উক্ত হইয়াছে। শুভাশুভ কর্ম্মরূপ প্রবৃত্তি যাহার সাধন বা কারণ, এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে ভাষ্যকারোক্ত "প্রবৃত্তিসাধন" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে—প্রবৃত্তিজন্য। অর্থাৎ কর্ম্মরূপ প্রবৃত্তিজন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম-নামক আত্মগুণই এই সূত্রে "প্রবৃত্তি" শব্দের লাক্ষণিক অর্থ। বেদেও উক্তরূপ লাক্ষণিক প্রয়োগ হইয়াছে অর্থাৎ উক্তরূপ প্রয়োগ আধুনিক নহে, ইহা প্রদর্শন করিতে ভাষ্যকার দৃষ্টান্তরূপে বলিয়াছেন,—"যথা অন্নসাধনাঃ প্রাণাঃ" ইত্যাদি।

---

* "যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্ব্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ" ॥—মনুসং, ২।১১।

** ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণও যে বেদের নিন্দা করিয়া গিয়াছেন, ইহা কিন্তু একেবারেই অসত্য। যিনি বলিয়াছেন,—"ঋক্ সাম যজুরেব চ" (গীতা, ৯ম অঃ) অর্থাৎ সমস্ত বেদই যাঁহার বিভূতি, বেদরক্ষক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বেদের নিন্দা করিতেই পারেন না। কিন্তু যাঁহারা স্বর্গাদি কামনার বশবর্ত্তী হইয়াই বেদবিহিত সেই সমস্ত কাম্য যজ্ঞাদিরই অনুষ্ঠান করেন এবং স্বর্গ ভিন্ন আর কিছু প্রাপ্য নাই, ইহা বলিয়া বেদের জ্ঞানকাণ্ডকে অনাদর করেন, সেই সমস্ত ব্যক্তিকেই ঐ ভাবে নিন্দা করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রশংসা করাই সেখানে তাঁহার উদ্দেশ্য। ভগবদ্গীতার (২য় অঃ) "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং" ইত্যাদি শ্লোকের চতুর্থ পাদে "নান্যদস্তীতি বাদিনঃ" এই বিশেষণ বাক্যের প্রয়োজন কি? ইহা চিন্তা করিয়াই উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। কর্ম্মমীমাংসাচার্য্য কুমারিল ভট্টও জ্ঞানকাণ্ড বেদান্তের অনাদর করেন নাই। তিনিও "শ্লোকবার্ত্তিকে" "আত্মবাদে"র শেষ শ্লোকে বলিয়াছেন,— "দৃঢ়ত্বমেতদ্বিষয়শ্চ বোধঃ প্রয়াতি বেদান্তনিষেবণেন"। তিনি ভগবদ্গীতারও প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াই নিজমতানুসারে অনেক কথার অন্যার্থেই তাৎপর্য্য বলিয়াছেন। "গীতামন্ত্রার্থবাদৈর্যা কল্প্যতেঽনর্থহেতুতা" ইত্যাদি ("শ্লোকবার্ত্তিক," চোদনা-সূত্র, ৩৭৫-৭৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

প্রাণ অন্ন নহে, কিন্তু অন্নসাধ্য, অন্ন প্রাণের জনক, এই তাৎপর্য্যেই বেদে কথিত হইয়াছে, "অন্নং বৈ প্রাণিনঃ প্রাণাঃ"। উক্ত বেদবাক্যে "অন্ন" শব্দের অর্থ যেমন অন্নসাধ্য বা অন্নজন্য, তদ্রূপ উক্ত সূত্রে "প্রবৃত্তি" শব্দের অর্থ প্রবৃত্তিজন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, যদিও মহর্ষি পূর্ব্বোক্তরূপ শুভাশুভ কর্ম্মসমূহকেই পরে "প্রবৃত্তি" বলিয়াছেন, কিন্তু কর্ম্মরূপ প্রবৃত্তি কোন জীবেরই জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে বিদ্যমান না থাকায় উহা জন্মের সাক্ষাৎ কারণ হইতে পারে না। কিন্তু সেই কর্ম্মজন্য যে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ আত্মগুণ, তাহা জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বেও বিদ্যমান থাকায় সাক্ষাৎ কারণ হইতে পারে এবং তত্ত্বজ্ঞানের মহিমায় তাহারই ক্ষয় বলা যায়। অতএব এই সূত্রে "প্রবৃত্তি" শব্দের দ্বারা সেই সমস্ত কর্ম্মজন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই বুঝিতে হইবে। উহাকে বলে—কার্য্যরূপ প্রবৃত্তি।

বস্তুতঃ মহর্ষি গোতমও পরে "পূর্ব্বকৃতফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ" (৩।২।৬০) এই সূত্রে "পূর্ব্বকৃত" শব্দের পরে "ফল" শব্দের প্রয়োগ করিয়া, জীবের পূর্ব্বজন্মকৃত শুভাশুভ কর্ম্মজন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই যে, জন্মের সাক্ষাৎ কারণ, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি যে, জীবের মানবদেহে পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মকৃত সেই সমস্ত বিনষ্ট কর্ম্মকেই জন্মাদির কারণ বলিতেন, সেই সমস্ত কর্ম্মজন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামে জীবাত্মার বিশেষ গুণ স্বীকার করিতেন না, ইহা সত্য নহে। তাঁহার মতেও পূর্ব্বকৃত পাপকর্ম্মজন্য অধর্ম্মরূপ অদৃষ্টদ্বারা সেই পাপকর্ম্ম নিকৃষ্ট জন্মের কারণ হয়, এবং পুণ্যকর্ম্মজন্য ধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট দ্বারা সেই পুণ্যকর্ম্ম উৎকৃষ্ট জন্মের কারণ হয়। সুতরাং উক্ত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই জন্মের সাক্ষাৎ কারণ। উহাকে বলা হইয়াছে— কার্য্যরূপ প্রবৃত্তি। আর উহার সাধন বা জনক যে, শুভাশুভ কর্ম্মরূপ প্রবৃত্তি, তাহাকে বলা হইয়াছে--কারণরূপ প্রবৃত্তি। এই সূত্রে সেই কার্য্যরূপ প্রবৃত্তিই "প্রবৃত্তি" শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। এইরূপ শাস্ত্রে "কর্ম্মন্" শব্দেরও কর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম অর্থেও প্রয়োগ হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" (মুণ্ডক)। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" (গীতা)। অন্যান্য কথা চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে তত্ত্বজ্ঞানের পরীক্ষায় এবং মুক্তিপরীক্ষায় পাওয়া যাইবে ॥ ২ ॥

অভিধেয়-সম্বন্ধ-প্রয়োজন-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

ভাষ্য। ত্রিবিধা চাস্য শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিরুদ্দেশো লক্ষণং পরীক্ষা চেতি। তত্র নামধেয়েন পদার্থমাত্রস্যাভিধানমুদ্দেশঃ,

তত্রোদ্দিষ্টস্যাতত্ত্বব্যবচ্ছেদকো ধর্ম্মো লক্ষণং, লক্ষিতস্য যথালক্ষণমুপপদ্যতে ন বেতি প্রমাণৈরবধারণং পরীক্ষা। তত্রোদ্দিষ্টস্য প্রবিভক্তস্য লক্ষণমুচ্যতে, যথা প্রমাণানাং প্রমেয়স্য চ। উদ্দিষ্টস্য লক্ষিতস্য চ বিভাগবচনং, যথা ছলস্য, "বচনবিঘাতোঽর্থবিকল্পোপপত্ত্যা ছলং"—"তৎ ত্রিবিধ"মিতি।

অনুবাদ—এই শাস্ত্রের (ন্যায়দর্শনের) প্রবৃত্তি অর্থাৎ উপদেশ-ব্যাপার ত্রিবিধ, (১) উদ্দেশ, (২) লক্ষণ এবং (৩) পরীক্ষা। তন্মধ্যে নামের দ্বারা পদার্থমাত্রের উল্লেখ অর্থাৎ পদার্থগুলির নামমাত্র কথন "উদ্দেশ"। তন্মধ্যে উদ্দিষ্ট পদার্থের "অতত্ত্বব্যবচ্ছেদক" ধর্ম্ম অর্থাৎ সেই পদার্থ যে তদ্ভিন্ন পদার্থ হইতে ভিন্ন, ইহার বোধক (ইতরব্যাবর্ত্তক) অসাধারণ ধর্ম্ম "লক্ষণ" [অর্থাৎ সেই লক্ষণবচনই এই শাস্ত্রের দ্বিতীয় ব্যাপার], লক্ষিত পদার্থের সেই লক্ষণানুসারে (সেই পদার্থ) উপপন্ন হয় কি না, এ জন্য অর্থাৎ তদ্বিষয়ে সংশয় নিরাসের জন্য প্রমাণসমূহের দ্বারা অবধারণ অর্থাৎ বিচারপূর্ব্বক সেই পদার্থের তত্ত্বনির্ণয় "পরীক্ষা"।

তন্মধ্যে উদ্দিষ্ট হইয়া বিভক্ত পদার্থের অর্থাৎ উদ্দেশের পরে সামান্য লক্ষণ না বলিয়াই বিভক্ত বিশেষ পদার্থগুলির লক্ষণ উক্ত হইয়াছে—যেমন 'প্রমাণে'র এবং 'প্রমেয়ে'র। উদ্দিষ্ট ও লক্ষিত পদার্থের অর্থাৎ উদ্দেশের পরে যাহার সামান্য লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, এমন পদার্থের বিভাগসূত্র উক্ত হইয়াছে—যেমন "ছল" পদার্থের "বচনবিঘাতোঽর্থবিকল্পোপপত্ত্যা ছলং" (এই সামান্য লক্ষণসূত্রের পরেই) "তৎ ত্রিবিধং" ইত্যাদি বিভাগসূত্র—১।২।১০।১১।

টিপ্পনী—প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা এক প্রকরণে ন্যায়শাস্ত্রের অভিধেয়, প্রয়োজন ও ঐ উভয়ের সম্বন্ধ কথিত হইয়াছে। কারণ, শাস্ত্রারম্ভে প্রথমে তাহাই অবশ্য বক্তব্য। প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থই ন্যায়শাস্ত্রের অভিধেয় অর্থাৎ প্রতিপাদ্য। ঐ সমস্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনের জন্য মহর্ষি প্রথম সূত্রেই যথাক্রমে উহাদিগের নাম বলিয়াছেন। কিন্তু কেবল তদ্দ্বারাই ঐ সমস্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব হয় না, ঐ সমস্ত পদার্থের লক্ষণবচন এবং পরীক্ষাও তাহাতে আবশ্যক। সেই লক্ষণ ও পরীক্ষার জন্যই মহর্ষি গোতমের পরবর্ত্তী সূত্রসমূহ আবশ্যক হওয়ায় উহা ব্যর্থ নহে। ভাষ্যকার ইহাই প্রকাশ করিতে তৃতীয় সূত্রের অবতারণার পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, এই ন্যায়শাস্ত্রের প্রবৃত্তি বা কার্য্যরূপ

ব্যাপার ত্রিবিধ—উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা।* প্রথমে প্রতিপাদ্য পদার্থসমূহের নাম কথনই "উদ্দেশ"। উদ্দিষ্ট পদার্থের প্রকারভেদ বলিবার জন্য তাহার ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ নাম কথনকে সেই পদার্থের 'বিভাগ' বলে। সেই বিভাগও উদ্দেশ, উহাকে বলে বিশেষ উদ্দেশ। সেই বিভাগও মহর্ষি দুই প্রকারে করিয়াছেন। যেমন প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থের পৃথক্ সূত্রের দ্বারা সামান্য লক্ষণ না বলিয়াই বিভাগ করিয়াছেন এবং "ছল" পদার্থের পৃথক্ সূত্রের দ্বারা সামান্য লক্ষণ বলিয়া, পরে বিভাগ করিয়াছেন।

"উদ্দেশে"র পরে সেই উদ্দিষ্ট পদার্থের লক্ষণবচনই এই শাস্ত্রের দ্বিতীয় ব্যাপার। সুতরাং ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত "লক্ষণ" শব্দের দ্বারা লক্ষণবচনই বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকারও পরে "লক্ষণমুচ্যতে" এই কথার দ্বারা তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু বক্তব্য সেই লক্ষণ কাহাকে বলে, ইহা বলা আবশ্যক। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, উদ্দিষ্ট পদার্থের অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহার নাম বলা হইয়াছে, সেই পদার্থের অতত্ত্বব্যবচ্ছেদক ধর্ম্মকে তাহার লক্ষণ বলে। "অতৎ" শব্দের অর্থ—তদ্‌ভিন্ন, সুতরাং "অতত্ত্ব" বলিতে বুঝা যায়—তদ্‌ভিন্নত্ব। সেই তদ্‌ভিন্নত্বের ব্যবচ্ছেদক অর্থাৎ সেই পদার্থ যে, অন্য সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন, ইহার বোধক অসাধারণ ধর্ম্মই তাহার লক্ষণ। সেই লক্ষণরূপ হেতুর দ্বারা সেই পদার্থে তদ্‌ভিন্ন সমস্ত পদার্থের ভেদ অনুমান-প্রমাণসিদ্ধ হয়, এ জন্য উহাকে বলে ইতরব্যাবর্ত্তক বা ইতরভেদানুমাপক লক্ষণ। যে পদার্থের যেরূপ লক্ষণ বলা হয়, তদনুসারে সেই পদার্থ সেইরূপে উপপন্ন হয় কি না, ইহা প্রমাণ দ্বারা বিচারপূর্ব্বক তদ্রূপে তাহার নির্ণয়ই পরীক্ষা। ফলকথা, মহর্ষি গোতম এই ন্যায়দর্শনে যথাক্রমে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ, লক্ষণবচন এবং তন্মধ্যে অনেক পদার্থের পরীক্ষা করায় ভাষ্যকার এই শাস্ত্রের প্রবৃত্তি অর্থাৎ কার্য্যরূপ ব্যাপারকে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থের সামান্য লক্ষণসূত্র না বলিয়াই বিভাগসূত্র বলিয়াছেন। সুতরাং সেখানে সেই বিভাগসূত্রের দ্বারাই সেই পদার্থের সামান্য লক্ষণও সূচিত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। কারণ, সামান্য লক্ষণ না বুঝিলে বিভক্ত পদার্থগুলির লক্ষণ অর্থাৎ বিশেষ লক্ষণ বুঝা যায় না।

* ন্যায়দর্শনের এই উপদেশপদ্ধতির অনুসরণ করিয়াই জৈন দার্শনিক হেমচন্দ্র তৎকৃত "প্রমাণমীমাংসা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"ত্রয়ী হি শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিঃ, উদ্দেশো লক্ষণং পরীক্ষা চ। তত্র নামধেয়কীর্ত্তনমাত্রমুদ্দেশঃ। উদ্দিষ্টস্য অসাধারণধর্ম্মবচনং লক্ষণং, তদ্দ্বেধা, সামান্যলক্ষণং বিশেষলক্ষণঞ্চ। লক্ষিতস্য ইদমিত্থং ভবতি নেত্থমিতি ন্যায়তঃ পরীক্ষণং পরীক্ষা"।

ভাষ্য। অথোদ্দিষ্টস্য বিভাগবচনং—

অনুবাদ—অতঃপর উদ্দিষ্টের অর্থাৎ প্রথম উদ্দিষ্ট "প্রমাণ" পদার্থের বিভাগসূত্র বলিতেছেন—

সূত্র। প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি ॥৩॥

অনুবাদ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, প্রমাণ অর্থাৎ উক্ত প্রত্যক্ষাদি নামে প্রমাণপদার্থ চতুর্ব্বিধ।

টিপ্পনী—মহর্ষি পরে প্রত্যক্ষাদি চতুর্ব্বিধ প্রমাণের লক্ষণ বলিলেও উহা হইতে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ তাঁহার সম্মত কি না? এইরূপ সংশয় হইতে পারে। কারণ, চতুর্ব্বিধ প্রমাণের লক্ষণ-বচন দ্বারা উক্তরূপ সংশয়-নিবৃত্তি হয় না। কারণ, সজাতীয় ও বিজাতীয় সমস্ত পদার্থ হইতে ব্যবচ্ছেদই লক্ষণের প্রয়োজন। সুতরাং উহার দ্বারা পদার্থের সংখ্যানিয়ম নিশ্চয় করা যায় না। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর বিচারপূর্ব্বক ইহা সমর্থন করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন,—"তস্মাৎ সংশয়নিবৃত্ত্যর্থং যুক্তো বিভাগোদ্দেশ ইতি।" অর্থাৎ উক্তরূপ সংশয় নিবৃত্তির জন্য প্রমাণ-পদার্থের বিভাগরূপ বিশেষ উদ্দেশ উচিত, এই জন্য মহর্ষি এই সূত্র বলিয়াছেন। ইহার দ্বারা তাঁহার মতে প্রমাণ-প্রদার্থ যে চতুর্ব্বিধই, ইহা পূর্ব্বেই নিশ্চিত হওয়ায় উক্তরূপ সংশয়ের কারণ নাই।

প্রমাণ-পদার্থের সামান্য লক্ষণ না বুঝিলে তাহার বিশেষ লক্ষণ বুঝা যায় না, সুতরাং বিশেষ লক্ষণ বলিবার পূর্ব্বে সামান্য লক্ষণ বলা আবশ্যক। কিন্তু মহর্ষি গোতম প্রমাণের সামান্য লক্ষণসূত্র বলেন নাই। প্রাচীন কালে অনেকে গৌতম ন্যায়সূত্রের এই ন্যূনতাদোষেরও উল্লেখ করিয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। তাই বাচস্পতি মিশ্র উক্ত দোষ পরিহারের জন্য ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত কথারই তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, এই সূত্রটি প্রমাণ-পদার্থের বিভাগের জন্য কথিত হইলেও শেষোক্ত "প্রমাণ" শব্দের দ্বারাই প্রমাণের সামান্য লক্ষণও সূচিত হইয়াছে। কারণ, সূত্রের দ্বারা বহু অর্থ সূচিত হয়, এ জন্যই উহাকে সূত্র বলে। বাচস্পতি মিশ্র অন্যত্রও বলিয়াছেন,—"সূত্রঞ্চ বহ্বর্থসূচনাদ্ভবতি।" ("ভামতী", আদিভাষ্যশেষ টীকা)। "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্টও ইহা সমর্থন করিয়াছেন এবং পূর্ব্বে তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, —"একেনানেন সূত্রেণ দ্বয়ঞ্চাহ মহামুনিঃ। প্রমাণেষু চতুঃসংখ্যং তথা সামান্যলক্ষণং॥" জয়ন্ত ভট্ট পরবর্ত্তী উপমানলক্ষণসূত্র হইতে "সাধ্যসাধনং" এই পদ এবং প্রত্যক্ষলক্ষণসূত্রে হইতে কয়েকটী পদের এই সূত্রে আবৃত্তির

সমর্থন করিয়াও তদ্দ্বারা প্রমাণের সামান্য লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি মহর্ষির ঐরূপ অভিপ্রায় বুঝেন নাই। তাই তাঁহারা ঐরূপ কষ্টকল্পনা করেন নাই।

এই সূত্রোক্ত "প্রমাণ" শব্দটি প্রপূর্ব্বক মাধাতুর উত্তর করণবাচ্য ল্যুট্ প্রত্যয়সিদ্ধ। সুতরাং প্রমাজ্ঞানের করণত্বই যে, প্রমাণের সামান্য লক্ষণ, ইহা উক্ত "প্রমাণ" শব্দের দ্বারাই বুঝা যায়। বস্তুতঃ প্রপূর্ব্বক "মা" ধাতুর অর্থ প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান। সেই যথার্থ জ্ঞান দ্বিবিধ—অনুভূতি ও স্মৃতি। জৈন দার্শনিকগণ পরোক্ষ প্রমাণের বিভাগে স্মৃতিকেও গ্রহণ করিয়াছেন। * কিন্তু ন্যায়বৈশেষিকাদি সম্প্রদায় স্মৃতি বা স্মৃতির করণকে প্রমাণ বলেন নাই। কারণ, যে বিষয় পূর্ব্বে কোন প্রমাণ দ্বারা অধিগত বা অনুভূত হইয়াছে, সেই বিষয়ের সংস্কারজন্য যে স্মরণরূপ জ্ঞান, তাহাই স্মৃতি। কিন্তু সেই স্থলে সেই স্মরণের করণ পূর্ব্বানুভবের যাহা করণ, তাহাই সে বিষয়ে প্রমাণ হওয়ায় পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার অনাবশ্যক। সুতরাং যদিও যথার্থ জ্ঞানমাত্রই প্রমা, কিন্তু উক্ত প্রমাণ শব্দের অন্তর্গত প্রপূর্ব্বক মা ধাতুর অর্থ যে প্রমা, তাহা যথার্থ অনুভূতি। তাই বাচস্পতি মিশ্রও এখানে বলিয়াছেন,—"প্রমীয়তেঽনেন ইত্যস্য বাক্যস্যার্থে প্রমাণপদপ্রয়োগঃ প্রমা চ স্মৃতেরন্যা অর্থাব্যভিচারী স্বতন্ত্রঃ পরিচ্ছেদঃ"। 'পরিচ্ছেদ' বলিতে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। স্মৃতিরূপ জ্ঞান নিশ্চয়াত্মক হইলেও স্বতন্ত্র নহে; কারণ, উহা নিজ বিষয়ের পূর্ব্বানুভবের পরতন্ত্র বা সাপেক্ষ। কিন্তু যথার্থ অনুভবরূপ জ্ঞানই উক্ত লক্ষণাক্রান্ত প্রমা। "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে (৪।১) উদয়নাচার্য্যও উক্ত যুক্তি অনুসারে নৈয়ায়িক মতে উক্ত 'প্রমা'র লক্ষণ বলিয়াছেন,—"যথার্থানুভবো মানমনপেক্ষতয়েষ্যতে।" ফলকথা, প্রমাণ লক্ষণে যথার্থ অনুভবত্বই প্রমাত্ব।**

---

* "অবিশদঃ পরোক্ষং"। "স্মৃতি-প্রত্যভিজ্ঞানোহানুমানাগমাস্তদ্বিধয়ঃ"
—"প্রমাণমীমাংসা", ১।২।১।২।

** "খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে"র টীকায় বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন,—"প্রমাত্বং জাতিরিতি তার্কিকসময়ো নিরস্তঃ" (প্রথম সং, ৪৪৮ পৃঃ)। কিন্তু প্রমাত্ব যে জাতিবিশেষ, ইহা নৈয়ায়িকসিদ্ধান্ত নহে। "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" টীকায় (১৫৮ পৃঃ) উদয়নাচার্য্য উক্ত প্রমার লক্ষণ বিষয়ে বিশেষ বিচার করিতে "নাপি প্রমাত্বং নাম সামান্যবিশেষঃ সম্ভবতি" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা প্রমাত্ব যে জাতি-বিশেষ নহে, এ বিষয়ে অনেক যুক্তি বলিয়াছেন। তাই চিৎসুখ মুনি উদয়নাচার্য্যের কোন কথায় খণ্ডনার্থ প্রমাত্বকে জাতিবিশেষ বলিয়া সমর্থন করিতে অনেক বিচার করিয়াছেন। ("চিৎসুখী," ২২৬-২৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। "তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও প্রত্যক্ষখণ্ডে প্রমাত্ব যে জাতি হইতে পারে না—কারণ, ভ্রমজ্ঞানেও কোন অংশে প্রমাত্ব থাকায় আংশিক জাতি স্বীকার করা যায় না, ইহাই বিচারপূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন। তিনি চরম কল্পে প্রমালক্ষণসিদ্ধান্ত বলিয়াছেন,—"তদ্বতি তৎপ্রকারকানুভবো বা।" অর্থাৎ যে পদার্থে যে ধর্ম্ম বস্তুতঃ থাকে, সেই পদার্থকে সেই ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া যে অনুভব, তাহা প্রমা। সেই প্রমার করণত্বই প্রমাণের সামান্য লক্ষণ।

ভাষ্যকারও পরে "উপলব্ধিসাধনানি প্রমাণানি" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উপলব্ধির করণত্বই যে প্রমাণের সামান্য লক্ষণ এবং তাহা "প্রমাণ" শব্দের ব্যুৎপত্তির দ্বারাই বুঝা যায়, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রমাণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে বার্ত্তিককারও পূর্ব্বে (৫ম পৃঃ) বলিয়াছেন,—"উপলব্ধিহেতুঃ প্রমাণং, উপলব্ধিহেতুত্বং প্রমাণত্বং।" "হেতু" শব্দের দ্বারা এখানে করণরূপ হেতুই বিবক্ষিত। প্রমারূপ উপলব্ধির কর্ত্তা প্রমাতা এবং সেই উপলব্ধির বিষয়রূপ কর্ম্ম প্রমেয়, সেই উপলব্ধির নিমিত্ত বা কারণ হইলেও করণ নহে, সুতরাং প্রমাণ নহে। কারণ, যাহা উপস্থিত হইলে কার্য্য অবশ্যই জন্মে, তাহাই সেই কার্য্যে সাধকতম বলিয়া মুখ্য করণ। সুতরাং প্রমাতা ও প্রমেয় পদার্থ সেই উপলব্ধির সাধকতম না হওয়ায় প্রমাণ নহে। বার্ত্তিককার অন্যরূপেও প্রমাণের বৈশিষ্ট্য সমর্থন করিয়া ইহা বুঝাইয়াছেন। ফলকথা, যথার্থ অনুভূতিরূপ উপলব্ধির করণত্বই প্রমাণের সামান্য লক্ষণ। মহর্ষি গোতমের মতে সেই অনুভূতি চতুর্ব্বিধ, যথা,—(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমিতি, (৩) উপমিতি ও (৪) শাব্দ। সুতরাং উহার করণ প্রমাণও পূর্ব্বোক্ত নামে চতুর্ব্বিধ। তাই মহর্ষি বলিয়াছেন,—"প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি।"

ভাষ্য। অক্ষস্যাক্ষস্য প্রতিবিষয়ং বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং। বৃত্তিস্তু সন্নিকর্ষো জ্ঞানং বা।* যদা সন্নিকর্ষস্তদা জ্ঞানং প্রমিতিঃ, যদা জ্ঞানং তদা হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধয়ঃ ফলং। মিতেন লিঙ্গেন লিঙ্গিনোঽর্থস্য পশ্চান্মানমনুমানং। উপমানং সামীপ্যমানং, যথা গৌরেবং গবয় ইতি। সামীপ্যন্তু সামান্যযোগঃ। শব্দঃ শব্দ্যতেঽনেনার্থ ইত্যভিধীয়তে জ্ঞাপ্যতে।

উপলব্ধি-সাধনানি প্রমাণানীতি সমাখ্যা-নির্ব্বচন-সামর্থ্যাদ্‌-বোদ্ধব্যং। প্রমীয়তেঽনেনেতি করণার্থাভিধানো হি প্রমাণশব্দঃ, তদ্বিশেষসমাখ্যায়া অপি তথৈব ব্যাখ্যানং।

---

* প্রত্যক্ষ প্রমাণের ব্যাখ্যায় প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও শেষে "অথবা" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা যথার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়াছেন। সেখানে "কিরণাবলী"কার উদয়নাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"অথবেতি বা শব্দঃ সমুচ্চয়ে, নতু বিকল্পে। হেয়াদিজ্ঞানোৎপত্তাবপি দ্রব্যাদিজ্ঞানং প্রমাণমিতি বাক্যার্থঃ।" তদনুসারে এখানে ভাষ্যকারোক্ত "বা" শব্দেরও সমুচ্চয়ার্থ বুঝা যায়। উদ্দ্যোতকরও লিখিয়াছেন,—"সন্নিকর্ষো জ্ঞানঞ্চ।"

অনুবাদ—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে বৃত্তি অর্থাৎ ব্যাপার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বৃত্তি কিন্তু সন্নিকর্ষ ও জ্ঞান [অর্থাৎ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ও তজ্জন্য সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান, এই উভয়ই ফলভেদে প্রত্যক্ষ প্রমাণ]। যে সময়ে সন্নিকর্ষ বৃত্তি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তখন জ্ঞান অর্থাৎ সেই সন্নিকর্ষজন্য নির্ব্বিকল্পক বা সবিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রমিতিরূপ ফল। যে সময়ে জ্ঞান (পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষরূপ প্রমাজ্ঞান) বৃত্তি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপাররূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তখন "হানবুদ্ধি" অথবা "উপাদানবুদ্ধি" অথবা "উপেক্ষাবুদ্ধি" ফল [অর্থাৎ কোন বিষয়ের যথার্থ প্রত্যক্ষের পরে যে বুদ্ধির দ্বারা সে বিষয়ে হেয়ত্ব বোধ জন্মে (হানবুদ্ধি) অথবা যে বুদ্ধির দ্বারা সে বিষয়ে উপাদেয়ত্ব বা গ্রাহ্যত্ব বোধ জন্মে (উপাদানবুদ্ধি) অথবা যে বুদ্ধির দ্বারা সে বিষয়ে উপেক্ষ্যত্ব বোধ জন্মে (উপেক্ষাবুদ্ধি), সেই "হানাদিবুদ্ধি"রূপ প্রমিতিই সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানরূপ প্রমাণের ফল]।

"মিত" অর্থাৎ যথার্থরূপে নিশ্চিত লিঙ্গের (হেতুর) দ্বারা লিঙ্গী অর্থের (সাধ্য পদার্থের) পশ্চাৎ মান অনুমান [অর্থাৎ লিঙ্গনিশ্চয়ের পশ্চাৎ যদ্দ্বারা লিঙ্গীর অনুমিতিরূপ মান বা জ্ঞান জন্মে, তাহা "অনুমান" শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ]। যথা—গো এবং গবয়, এইরূপে সামীপ্যজ্ঞান উপমান। সামীপ্য কিন্তু সামান্য যোগ অর্থাৎ সমানধর্ম্মরূপ সাদৃশ্য সম্বন্ধ [অর্থাৎ "উপ"শব্দের অর্থ সাদৃশ্যরূপ সামীপ্য এবং জ্ঞানার্থক মা ধাতুনিষ্পন্ন "মান" শব্দের অর্থ জ্ঞান, সুতরাং "উপমান" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—সাদৃশ্য জ্ঞান। যেমন গবয় নামক পশুতে গোর সাদৃশ্য দর্শন]। ইহার দ্বারা অর্থ শব্দিত হয়, এ জন্য শব্দ, শব্দিত হয় অর্থাৎ অভিহিত হয়, জ্ঞাপিত হয় [অর্থাৎ যদ্দ্বারা অর্থ জ্ঞাপিত বা বোধিত হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে "শব্দ" ধাতুনিষ্পন্ন প্রমাণবোধক "শব্দ" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—অর্থবোধের সাধন শব্দ]।

উপলব্ধির সাধনসমূহ "প্রমাণ", ইহা সমাখ্যার (প্রমাণ শব্দের) নির্ব্বচন-শক্তিবশতঃ অর্থাৎ উক্ত "প্রমাণ" শব্দের নিষ্পাদক ধাতু ও প্রত্যয়ের শক্তিবশতঃ বুঝা যায়। কারণ, "প্রমীয়তেঽনেন" অর্থাৎ ইহার দ্বারা পদার্থ প্রমিত হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তিবশতঃ "প্রমাণ" শব্দটি করণার্থবোধক, অর্থাৎ উহার অর্থ প্রমাজ্ঞানের করণ, সুতরাং সেই প্রমাণের বিশেষ সংজ্ঞারও অর্থাৎ সূত্রোক্ত প্রত্যক্ষাদি চারিটি নামেরও সেইরূপই ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে।

টিপ্পনী—ভাষ্যকার এখানে সূত্রোক্ত "প্রত্যক্ষ" প্রভৃতি চারিটি নামের

ব্যুৎপত্তিমাত্রের ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—"অক্ষস্যাক্ষস্য প্রতিবিষয়ং বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং"। "প্রত্যক্ষ" শব্দের অন্তর্গত "অক্ষ" শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের বিষয় এবং প্রত্যক্ষ নামক প্রমাণ, এই তিন অর্থেই "প্রত্যক্ষ" শব্দের প্রয়োগ হয়। সুতরাং অর্থভেদে উহার সমাসের ভেদ আছে, সে বিষয়ে মতভেদও হইয়াছে। উদ্দ্যোতকর প্রথমে অব্যয়ীভাব সমাস বলিয়া, পরে প্রাদি সমাসও বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র তাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "প্রত্যক্ষ" শব্দের অন্য অর্থে প্রাদি সমাস হইলেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ অর্থে এই সূত্রোক্ত "প্রত্যক্ষ" শব্দে অব্যয়ীভাব সমাস। "অক্ষমক্ষং প্রতি বর্ত্ততে" ইহাই উক্ত সমাসের বিগ্রহবাক্য হইবে। ভাষ্যকার "অক্ষস্য অক্ষস্য" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা উক্ত বিগ্রহবাক্যের অর্থই প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু উহা বিগ্রহবাক্য নহে। কারণ, তাহা হইলে উক্ত বাক্যে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ হইতে পারে না। "প্রতি" শব্দের যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তিরই বিধান হইয়াছে। উক্ত বিগ্রহবাক্যে "বর্ত্ততে" এই ক্রিয়াপদের দ্বারা যে বৃত্তি অর্থ বুঝা যায়, তাহাই ভাষ্যকার "বৃত্তি" শব্দের দ্বারা বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"বৃত্তিরিতি হি ব্যাপারঃ"। ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানে অপেক্ষিত চরম কারণরূপ ব্যাপারই ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি। "প্রতি" শব্দের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সংগ্রহ হওয়ায় প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের নিজ নিজ বিষয়ে সেই ব্যাপাররূপ বৃত্তিই উক্ত "প্রত্যক্ষ" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়। কিন্তু উহা উক্ত "প্রত্যক্ষ" শব্দের ব্যুৎপত্তিমাত্রলভ্য অর্থ। প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রকৃত লক্ষণ মহর্ষি পরে বলিয়াছেন।

নিজ বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি কি? তাই ভাষ্যকার পরেই বলিয়াছেন,—"বৃত্তিস্তু সন্নিকর্ষো জ্ঞানং বা" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সেই ইন্দ্রিয়ের যে সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধবিশেষ হইলে তজ্জন্য প্রথমে সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই সন্নিকর্ষই সেখানে সেই ইন্দ্রিয়ের প্রথম বৃত্তি বা ব্যাপার। সেই সন্নিকর্ষজন্য প্রথমে সেই বিষয়ের "আলোচন" অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জন্মে এবং উহার পরক্ষণে সেই বিষয়ের বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সবিকল্পক প্রত্যক্ষ জন্মে। উক্ত দ্বিবিধ প্রত্যক্ষই সেই সন্নিকর্ষরূপ প্রমাণের ফল। তন্মধ্যে প্রথমোৎপন্ন নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করিতে সেই সন্নিকর্ষ অন্য কোন জ্ঞানের অপেক্ষা করে না। কিন্তু পরে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করিতে তৎপূর্ব্বে নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষরূপ বিশেষণ জ্ঞানের অপেক্ষা করে।

কারণ, বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্যবিষয়ক প্রত্যক্ষই সবিকল্পক প্রত্যক্ষ। বিশেষণজ্ঞান ব্যতীত বিশিষ্ট বুদ্ধি জন্মিতে পারে না। সুতরাং সবিকল্পক প্রত্যক্ষের অব্যবহিত পূর্ব্বে নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য। সেই প্রত্যক্ষে কোন পদার্থ বিশেষণরূপে বিষয় হয় না, উহা বস্তুর স্বরূপমাত্রজ্ঞান, উহারই নাম "আলোচন"। উহা বিশেষণজ্ঞানরূপে সেই সন্নিকর্ষের সহকারী হইয়া সবিকল্পক প্রত্যক্ষের কারণ হয়। "ন্যায়কন্দলী" টীকায় (২৯৮ পৃঃ) শ্রীধর ভট্টও ইহাই বলিয়াছেন।

কিন্তু ইহাও বলা আবশ্যক ও বুঝা আবশ্যক যে, "সমবায়" নামক সম্বন্ধ এবং অভাব পদার্থের নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। কারণ, যে পদার্থের সমবায় সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ জন্মে, সেই সম্বন্ধী পদার্থ সেই প্রত্যক্ষে সমবায়াংশে বিশেষণরূপে বিষয় হইবেই। যেমন ঘটের অবয়বে ঘটসমবায়ের যে প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা ঘটবিশিষ্ট সমবায়ের প্রত্যক্ষ। নির্ব্বিশেষণ শুদ্ধ সমবায়সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ সম্ভবই হয় না। বৈশেষিকমতে সমবায় সম্বন্ধ অতীন্দ্রিয় পদার্থ হইলেও ন্যায়মতে অনেক স্থানে সেই সম্বন্ধিপদার্থবিশিষ্ট সমবায় সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ জন্মে। এবং ন্যায়বৈশেষিকসম্প্রদায়ের মতে অনেক অভাব পদার্থের প্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু সেই প্রত্যক্ষে সেই অভাবের প্রতিযোগী পদার্থ অভাবাংশে বিশেষণরূপে বিষয় হইবেই। যেমন ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ করিলে তখন সেই অভাবে উহার প্রতিযোগী ঘট বিশেষণরূপে বিষয় হয়। কেবল অভাববিষয়ক প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সমবায়সম্বন্ধ ও অভাব পদার্থের প্রত্যক্ষ হইলে উহা সবিকল্পকই হয়, উহা নির্ব্বিকল্পনিরপেক্ষ। "কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে (৪।৪) উদয়নাচার্য্যও ইহা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন,—"তয়োর্ব্বিশেষণাংশস্য প্রাগ্‌গ্রহণাদনুমানাদিবৎ তদুপপত্তেঃ।" অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধ ও অভাব পদার্থে যাহা বিশেষণ হয়, তাহা পূর্ব্বজ্ঞাত ; সুতরাং তাহার স্মরণরূপ জ্ঞানজন্য সেই বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে। ফলকথা, সম্ভব স্থলে সর্ব্বত্রই গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য প্রথমে নির্ব্বিকল্পক ও পরে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু কুমারিল ভট্ট সমবায় সম্বন্ধ অস্বীকার করায় এবং অভাব পদার্থ স্বীকার করিলেও তাহার প্রত্যক্ষ অস্বীকার করায় তাঁহার মতে প্রত্যক্ষ স্থলে সর্ব্বত্রই প্রথমে নির্ব্বিকল্পক ও পরে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ জন্মে।* বৌদ্ধসম্প্রদায় সবিকল্পক

---

* "অস্তি হ্যালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্ব্বিকল্পকং।
বালমূকাদিবিজ্ঞানসদৃশং শুদ্ধবস্তুজং॥" ১১২॥
"ততঃ পরং পুনর্ব্বস্তু ধর্ম্মৈর্জাত্যাদিভির্যয়া।
বুদ্ধ্যাবসীয়তে, সাপি প্রত্যক্ষত্বেন সম্মতা॥" ১২০॥ শ্লোকবার্ত্তিক, প্রত্যক্ষসূত্র

প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য অস্বীকার করায় কুমারিলও বিশেষ বিচার করিয়া তাঁহাদিগের মত খণ্ডন করিয়াছেন। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষরূপ বৃত্তি বা ব্যাপার যেমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তদ্রূপ সেই সন্নিকর্ষজন্য যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে, তাহাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়। কারণ, তাহাও পরে 'হানবুদ্ধি' অথবা 'উপাদানবুদ্ধি' অথবা 'উপেক্ষা বুদ্ধি'-রূপ প্রত্যক্ষপ্রমার করণ হয়। সুতরাং ঐ সমস্ত বুদ্ধিই সেই জ্ঞানরূপ প্রমাণের ফল। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"যদা জ্ঞানং, তদা হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধয়ঃ ফলং।" "হীয়তে ত্যজ্যতেঽনেন" অর্থাৎ যদ্দ্বারা হেয়ত্ববোধ করিয়া ত্যাগ করে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে ত্যাগার্থ হা ধাতুর উত্তর করণবাচ্য ল্যুট্ প্রত্যয়ে উক্ত "হান" শব্দটি সিদ্ধ হইয়াছে। হান—এমন যে বুদ্ধি বা জ্ঞান. তাহা "হানবুদ্ধি"। এইরূপ যে বুদ্ধির দ্বারা উপাদেয়ত্ব অর্থাৎ গ্রাহ্যত্বের বোধ করিয়া উপাদান (গ্রহণ) করে, তাহাকে বলে—"উপাদানবুদ্ধি"। এবং যে বুদ্ধির দ্বারা উপেক্ষ্যত্বের বোধ করিয়া উপেক্ষা করে, তাহাকে বলে—"উপেক্ষাবুদ্ধি"। প্রাচীনগণ উক্ত ত্রিবিধ বুদ্ধিকেই বলিয়াছেন,—"**হানাদিবুদ্ধি**"। শ্লোকবার্ত্তিকে (প্রত্যক্ষসূত্র) কুমারিল ভট্টও বলিয়াছে,—"হানাদিবুদ্ধিফলতা"। "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্টও বলিয়াছেন,—"ফলং হানাদিবুদ্ধয়ঃ" (৬৬ পৃঃ)। জ্ঞান-প্রামাণ্যবাদী জৈন দার্শনিক হেমচন্দ্রও "প্রমাণমীমাংসা" গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"হানাদিবুদ্ধয়ো বা" ।১।১।৪১।

বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন,—"জ্ঞাতে খল্বর্থে ত্রিধা বুদ্ধির্ভবতি, হেয়ো বা উপাদেয়ো বা উপেক্ষণীয়ো বেতি।" অর্থাৎ কোন পদার্থ জ্ঞাত হইলে পরে সেই জ্ঞাতা জীবের তদ্বিষয়ে ইহা হেয়, অথবা গ্রাহ্য, অথবা উপেক্ষণীয়, এইরূপ বুদ্ধি বা জ্ঞান জন্মে। হেয় বলিয়া বুঝিলে তাহা ত্যাগ করে এবং গ্রাহ্য বলিয়া বুঝিলে তাহা গ্রহণ করে এবং উপেক্ষণীয় বলিয়া বুঝিলে তাহা উপেক্ষা করে। ভাষ্যকার পূর্ব্বে ইহাকেই বলিয়াছেন,—তত্ত্বপরিসমাপ্তি (১১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু উপেক্ষণীয় বিষয়ে ত্যাগের ইচ্ছা অথবা গ্রহণের ইচ্ছা না হওয়ায় তদ্বিষয়ে কোন প্রবৃত্তিই জন্মে না, এ জন্য আদিভাষ্যে "অর্থ" শব্দের দ্বারা কেবল গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য পদার্থকেই গ্রহণ করিয়া উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "অর্থস্তু সুখং সুখহেতুর্দ্দুঃখং দুঃখহেতুশ্চ" (১ম পৃঃ)। সুখ এবং সুখের কারণ পদার্থ ই সাধারণ জীবের গ্রাহ্য এবং দুঃখ ও দুঃখের কারণ পদার্থ সকল জীবেরই ত্যাজ্য। সেই সুখ এবং দুঃখও অনিয়ম্য, ইহাও ভাষ্যকার

সেখানে পরে বলিয়াছেন। কিন্তু যে পদার্থের জ্ঞানের পরে যে জীব তাহাকে নিজের উপকারী বলিয়াও বুঝে না এবং অপকারী বলিয়াও বুঝে না, এমন পদার্থ ই তাহার পক্ষে "উপেক্ষণীয়" বলিয়া কথিত হইয়াছে। উহা গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য হইতে ভিন্ন তৃতীয় প্রকার পদার্থ।* মূলকথা, জীবের কোন পদার্থ জ্ঞানের পরে তাহার গ্রহণ, ত্যাগ অথবা উপেক্ষা হইলে তৎপূর্ব্বে সে বিষয়ে গ্রাহ্যত্ব, ত্যাজ্যত্ব অথবা উপেক্ষ্যত্বের বোধ অবশ্যই জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য।

যেমন আমাদিগের কোন জলের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগরূপ সন্নিকর্ষ জন্মিলে পরক্ষণেই জল ও জলত্ব ধর্ম্ম বিষয়ে অবিশিষ্ট প্রত্যক্ষ জন্মে, উহাকে বলে নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। "বিকল্প" বলিতে এখানে পদার্থদ্বয়ের বিশেষ্য-বিশেষণভাব। পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষে জলে জলত্ব ধর্ম্ম বিশেষণ ভাবে বিষয় হয় না, কিন্তু কেবল জল ও জলত্বই বিষয় হয়, এ জন্য উহাকে নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে। ঐ প্রত্যক্ষের পরেই ইহা জল অর্থাৎ জলত্ববিশিষ্ট, এইরূপ যে প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাতে সেই জলে জলত্বরূপ ধর্ম্ম বিশেষণ ভাবে বিষয় হওয়ায় উহাকে বলে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ বা বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ। ঐ প্রত্যক্ষের পরে আমরা যদি সেই জলের উপাদান অর্থাৎ গ্রহণ করি, তাহা হইলে তৎপূর্ব্বে "এই জল গ্রাহ্য" এইরূপ জ্ঞান আমাদিগের অবশ্যই জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু কি প্রমাণের দ্বারা আমাদিগের সেই জ্ঞান জন্মে, ইহা বুঝিতে হইবে। সেই জলের গ্রহণ যখন ভাবী পদার্থ, তখন তৎপূর্ব্বে সেই গ্রহণযোগ্যতার লৌকিক প্রত্যক্ষ সম্ভবই নহে। অতএব অনুমানপ্রমাণ দ্বারাই ঐ জ্ঞান জন্মে, ইহাই বুঝিতে হইবে।

কিন্তু সেই জলে গ্রাহ্যত্বের অনুমান করিতে হইলে তাহাতে ঐ গ্রাহ্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট কোন হেতুর নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান আবশ্যক। সুতরাং পূর্ব্বে যে জলের

---

* পরে বৌদ্ধসম্প্রদায় উপেক্ষণীয় বিষয়কেও অগ্রাহ্যত্ববশতঃ হেয়ই বলিয়াছেন। ধর্ম্মকীর্ত্তির "ন্যায়বিন্দু"র টীকায় ধর্ম্মোত্তর বলিয়াছেন,—"উপেক্ষণীয়ো হ্যনুপাদেয়ত্বাদ্ধেয় এব" (৬ পৃঃ)। অর্থাৎ হেয় ও উপাদেয়, এই দ্বিবিধ ভিন্ন তৃতীয় প্রকার কোন বিষয় নাই। জৈন দার্শনিক প্রভাচন্দ্রও 'প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড" গ্রন্থে উহাই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু জয়ন্ত ভট্ট উক্ত মতের প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছেন যে, পথে যাইতে এমন অনেক তৃণ-পত্রাদি দেখা যায়, যে বিষয়ে দ্রষ্টার ছত্রাদি গ্রাহ্য পদার্থের ন্যায় এবং সর্পাদি ত্যাজ্য পদার্থের ন্যায় বুদ্ধি জন্মে না, ইহা অনুভবসিদ্ধ। আর যে বিষয়ের পরিত্যাগে ইচ্ছাই জন্মে না, তাহা ত্যাজ্য পদার্থের মধ্যে গণ্য করা যায় না। জয়ন্ত ভট্টের পরে জৈন দার্শনিক হেমচন্দ্রও "প্রমাণমীমাংসা" গ্রন্থে প্রমাণ-লক্ষণ ব্যাখ্যায় (৫ম পৃঃ) তৃতীয় উপেক্ষণীয় অর্থও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

গ্রহণ করিয়া আমরা উপকার লাভ করিয়াছি, তাদৃশ জলমাত্রই গ্রাহ্য, এইরূপ ব্যাপ্তিনিশ্চয়জন্য সংস্কারবশতঃ সেই ব্যাপ্তির স্মরণ হওয়ায় তাহার ফলে পরে এই জল তজ্জাতীয় অর্থাৎ গ্রাহ্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট তাদৃশ জলত্ব এই জলে আছে, এইরূপ অপর একটি প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য। সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানই উক্ত স্থলে সেই জলে গ্রাহ্যত্বের অনুমাপক "লিঙ্গপরামর্শ" নামক অনুমানপ্রমাণ। তাদৃশ জলত্বই সেই অনুমানের লিঙ্গ বা হেতু। উক্তরূপ অর্থাৎ "এই জল তজ্জাতীয়" এইরূপ যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহাই উক্ত স্থলে **উপাদানবুদ্ধি**। উহার দ্বারা সেই জলে গ্রাহ্যত্বের অনুমিতিরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় আমরা সেই জলকে গ্রহণ করি। এইরূপ কোন জলে পূর্ব্বপরিত্যক্ত জলের সাদৃশ্য দর্শন করিলে, পরে পূর্ব্ববৎ ব্যাপ্তিস্মরণাদিজন্য এই জল তজ্জাতীয়, এইরূপ যে প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা উক্ত স্থলে **হানবুদ্ধি**। উহার দ্বারা সেই জলে হেয়ত্বের অনুমিতিরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় আমরা সেই জল পরিত্যাগ করি। এইরূপ কোন জলে পূর্ব্বে উপেক্ষিত জলের সাদৃশ্য দর্শন করিলে পূর্ব্ববৎ ব্যাপ্তিস্মরণাদিজন্য 'এই জল তজ্জাতীয়' এইরূপে যে প্রত্যক্ষ জন্মে, উহা **উপেক্ষাবুদ্ধি**। উহার দ্বারা সেই জলে উপেক্ষ্যত্বের অনুমিতিরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় আমরা তাহার উপেক্ষা করি।

পূর্ব্বোক্ত প্রকার "হানবুদ্ধি", "উপাদানবুদ্ধি" ও "উপেক্ষাবুদ্ধি" প্রত্যক্ষ স্থলে প্রত্যক্ষরূপ প্রমিতি। সুতরাং উহার করণ যে পূর্ব্বোৎপন্ন নির্ব্বিকল্পক বা সবিকল্পক প্রত্যক্ষ, তাহাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তাহার ফল ঐ হানাদিবুদ্ধি। কিন্তু ঐ হানাদিবুদ্ধি প্রত্যক্ষ প্রমিতি হইলেও উহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ, উহার ফল যথাক্রমে হেয়ত্ব, গ্রাহ্যত্ব ও উপেক্ষ্যত্বের অনুমিতি। যাহার ফল অনুমিতি, তাহা অনুমানপ্রমাণই হইবে। কিন্তু উক্ত 'হানাদিবুদ্ধি' লিঙ্গপরামর্শরূপ অনুমানপ্রমাণ হইলেও উহা যখন প্রত্যক্ষ প্রমিতি, তখন উহার করণকে প্রত্যক্ষ প্রমাণই বলিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেও হানাদিবুদ্ধিরূপ ফলের পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণই বলিয়াছেন। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যায় পরে "অথবা" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা ঐ কথাই বলিয়াছেন।

কিন্তু প্রাচীন কালেও এ বিষয়ে বিবাদ হইয়াছে। কোন সম্প্রদায় ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তাই উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন,—"কেচিত্তু সন্নিকর্ষমেব প্রত্যক্ষং বর্ণয়ন্তি, ন তন্ন্যায্যং,

প্রমাণাভাবাৎ।" "উভয়ন্তু যুক্তং পরিচ্ছেদকত্বাৎ, উভয়ং পরিচ্ছেদকং সন্নিকর্ষো জ্ঞানঞ্চ। একান্তবাদিনস্তু দোষ ইতি।" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ যেমন সেই বিষয়ের পরিচ্ছেদক অর্থাৎ যথার্থ নিশ্চয়জনক হওয়ায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তদ্রূপ সেই সন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানও পরে সে বিষয়ে হানাদি-বুদ্ধিরূপ নিশ্চয়াত্মক যথার্থ প্রত্যক্ষের করণ হওয়ায় সেই ফলের পক্ষে উহাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু সেখানে কেবল ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষই যে, সেই হানাদিবুদ্ধিরূপ ফলের পক্ষেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহা বলা যায় না। কারণ, সেই সন্নিকর্ষজন্য সে বিষয়ে নিশ্চয়াত্মক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন না হইলে পূর্ব্বোক্ত হানাদিবুদ্ধি জন্মে না, সুতরাং সেই সন্নিকর্ষকে উহার করণ বলা যায় না। তজ্জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানরূপ ব্যাপার দ্বারাও উহাকে হানাদিবুদ্ধির করণ বলা যায় না। কারণ, সেই হানাদিবুদ্ধির অব্যবহিত পূর্ব্বে সেই প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানও থাকে না। কারণ, গৌতম মতে সেই জ্ঞান দ্বিক্ষণমাত্র স্থায়ী। ফলকথা, ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষে করণ হইলেও হানাদিবুদ্ধির করণ হইতে পারে না। কিন্তু পরম্পরায় সেই সন্নিকর্ষ এবং সেই ইন্দ্রিয়ও উহার কারণ হওয়ায় উহাকেও ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান বলা হয়।*

ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য প্রথমোৎপন্ন নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ পূর্ব্বোক্ত হানাদিবুদ্ধির অব্যবহিত পূর্ব্বে বিদ্যমান না থাকায় কিরূপে তাহার করণ হইবে? এ বিষয়েও প্রাচীন কালে বহু বিবাদ ও মতভেদ হইয়াছে। "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্ট উক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন করিয়া, তদুত্তরে নানা মতের ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ উক্ত হানাদিবুদ্ধিরূপ ফলের পক্ষে প্রমাণই নহে, ইহা আচার্য্য বলেন। কিন্তু উক্ত "আচার্য্য" শব্দের দ্বারা আমরা বাচস্পতি মিশ্রকে বুঝিতে পারি না। কারণ, তাৎপর্য্যটীকায় বাচস্পতি মিশ্র

* "তাৎপর্য্যটীকা"কার বাচস্পতি মিশ্রও "ইন্দ্রিয়াদিনা প্রমাণেন প্রমায়াং ফলে প্রবৃত্তেন" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা ফলানুকূল চরম কারণকে ব্যাপার বলিয়া প্রমাণও বলিয়াছেন এবং পরম্পরায় ইন্দ্রিয়কেও প্রমাণ বলিয়াছেন। "প্রত্যক্ষসূত্রবার্ত্তিকে" ভট্ট কুমারিলও "যদ্বেন্দ্রিয়ং প্রমাণং স্যাৎ" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা এক পক্ষে তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সেখানে পরে তিনিও আত্মমনঃসংযোগকেই প্রকৃষ্ট কারণ বলিয়া মুখ্য প্রমাণ বলিয়াছেন (৬৮ শ্লোক)। ফলকথা, চরম কারণই যে মুখ্য করণ পদার্থ, ইহা প্রাচীন মত বুঝা যায়। শব্দশাস্ত্রে করণে তৃতীয়া বিভক্তির বিধান হওয়ায় শাব্দিকশিরোমণি ভর্ত্তৃহরি সেই করণকারকেরই লক্ষণ বলিয়াছেন,—"ক্রিয়ায়াঃ পরিনিষ্পত্তির্যদ্ব্যাপারাদনন্তরং। বিবক্ষ্যতে, তদা তত্র করণং তৎ প্রকীর্ত্তিতং ॥"—'বাক্যপদীয়'।

ঐরূপ কথা বলেন নাই। তবে কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষের পরে পূর্ব্বোক্তরূপ হানাদিবুদ্ধি যে, সবিকল্পক প্রত্যক্ষেরই ফল, নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ তাহাতে প্রমাণ নহে, ইহাই বহুসম্মত। প্রত্যক্ষসূত্র-বার্ত্তিকে ভট্ট কুমারিলও বলিয়াছেন,—"হানাদিবুদ্ধিফলতা প্রমাণঞ্চেদ্ বিশেষ্যধীঃ।" অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ পরক্ষণে যদি সবিকল্পক প্রত্যক্ষকে উৎপন্ন করে, তাহা হইলে উহা সেই সবিকল্পক প্রত্যক্ষরূপ ফলের পক্ষেই প্রমাণ হইবে। কিন্তু বিশেষ্যজ্ঞান অর্থাৎ সবিকল্পক প্রত্যক্ষরূপ প্রমাণের ফল হানাদিবুদ্ধি। বৈশেষিকাচার্য প্রশস্তপাদের "অথবা" ইত্যাদি সন্দর্ভের প্রয়োজন ব্যাখ্যায় (১৯৯ পৃঃ) শ্রীধর ভট্টও ঐরূপ কথাই বলিয়াছেন।

কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের "যদা জ্ঞানং" এই উক্তিতে "জ্ঞান" শব্দের দ্বারা তৎপূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য দ্বিবিধ প্রত্যক্ষই তাঁহার অভিপ্রেত বুঝা যায়। সেখানে বাচস্পতি মিশ্রও ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"যদা জ্ঞানমালোচনং বা বিকল্পো বা ব্যাপার ইন্দ্রিয়াদীনাং, তদা হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধয়ঃ ফলং।" বাচস্পতি মিশ্র পরে ইহা বুঝাইতে উপাদেয় জলকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, সেই জলের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য প্রথমে সে বিষয়ে "আলোচন" (নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ), পরে "বিকল্প" (সবিকল্পক প্রত্যক্ষ) জন্মে। তজ্জন্য পরে পূর্ব্বসংস্কারের উদ্বোধ হয়। তজ্জন্য পরে তজ্জাতীয়ত্ব হেতুতে গ্রাহ্যত্বের ব্যাপ্তির স্মরণ হয়। পরে "এই জল তজ্জাতীয়" এইরূপ লিঙ্গপরামর্শ জন্মে; উহা সেখানে প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান এবং উহাই সেখানে উপাদানবুদ্ধি। তাহা হইলে সেই আলোচন ও বিকল্পরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান শেষোৎপন্ন উপাদানবুদ্ধির অব্যবহিত পূর্ব্বে বিদ্যমান না থাকায় কিরূপে উহার কারণ হইবে, এতদুত্তরে বাচস্পতি মিশ্র পরে বলিয়াছেন, "তদুদ্বোধিতসংস্কারদ্বারেণ ব্যাপ্তিস্মরণে পরামর্শে চ তস্য তদানীমসতোঽপি কারণত্বাৎ" ইত্যাদি।

তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষ জন্মিলে সেই বিষয়ের সজাতীয় বিষয়ে পূর্ব্বোৎপন্ন সংস্কারবিশেষ উদ্বোধিত (ফলোন্মুখ) হয় অর্থাৎ সেই প্রত্যক্ষই সেই সংস্কারের উদ্বোধক হয়। সুতরাং সেই প্রত্যক্ষ পূর্ব্বোক্ত হানাদিবুদ্ধির অব্যবহিত পূর্ব্বে বিদ্যমান না থাকিলেও সেই সংস্কাররূপ ব্যাপার দ্বারাই উহা সেখানে সেই পূর্ব্বনিশ্চিত ব্যাপ্তির স্মরণ এবং 'এই জল তজ্জাতীয়' এইরূপ উপাদানবুদ্ধির কারণ হয়, যেমন স্বর্গাদি ফলের উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে যাগাদি কর্ম্ম বিদ্যমান না থাকিলেও

তজ্জন্য অদৃষ্টরূপ ব্যাপার থাকায় তদ্দারাই সেই যাগাদি স্বর্গাদির কারণ হয়। যদিও পূর্ব্বোক্ত স্থলে সেই পূর্ব্বসংস্কার সেই নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষজন্য নহে, কিন্তু তাহার উদ্বোধ সেই প্রত্যক্ষজন্য, এবং উদ্বুদ্ধ সংস্কারই স্মৃতি উৎপন্ন করে। তাই বাচস্পতি মিশ্র উক্তরূপ সংস্কারকেই সেই প্রত্যক্ষের ব্যাপার বলিয়া, তদ্দারা সেই প্রত্যক্ষকে হানাদিবুদ্ধির করণ বলিয়াছেন। কিন্তু এই মত সর্ব্বসম্মত হইতে পারে না। অন্য সম্প্রদায় অন্যরূপেই হানাদিবুদ্ধির উপপাদন করিয়াছেন; জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি তাহা বলিয়াছেন। সে যাহা হউক, ভাষ্যকারের মতে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণ এবং সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হানাদিবুদ্ধির করণ, ইহা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কথার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়।

কিন্তু জয়ন্ত ভট্ট প্রথমে নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন যে, কার্য্যের কোন কারণ-বিশেষই করণ নহে, কিন্তু সমগ্র কারণের সংহতিরূপ সামগ্রীই করণ। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ প্রমাজ্ঞানের সামগ্রীই তাহার করণ বলিয়া তাহাই প্রমাণ, যে কোন কারণ প্রমাণ নহে। কারণ, প্রমাজ্ঞানের সমগ্র কারণরূপ সামগ্রী ব্যতীত যে কোন কারণ দ্বারা সেই প্রমাজ্ঞান জন্মে না। সুতরাং প্রমাজ্ঞানের সেই সামগ্রীই উহার সাধকতম হওয়ায় করণ, সুতরাং তাহাই প্রমাণ। সেই কারণসমূহের মধ্যে বোধ এবং বোধভিন্ন অনেক পদার্থ থাকায় সেই সামগ্রী "বোধাবোধস্বভাবা"। অর্থাৎ কেবল বোধ বা জ্ঞানবিশেষই প্রমাণ নহে এবং অবোধ অর্থাৎ জ্ঞান ভিন্ন কোন পদার্থবিশেষও প্রমাণ নহে, কিন্তু জ্ঞান এবং জ্ঞানভিন্ন সমগ্র কারণস্বরূপ যে সামগ্রী, তাহাই প্রমাণ। জয়ন্ত ভট্ট এই মত সমর্থন করিতে প্রথমে অনেক প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু পরেই অপর সম্প্রদায় যে, উক্ত মতে দোষ প্রদর্শন করিয়া, প্রমাতা ও প্রমেয় পদার্থ ভিন্ন প্রমাজ্ঞানের উক্তরূপ সামগ্রীকেই প্রমাণ বলিতেন, ইহাও সমর্থন করিয়া, সে মতের কোন প্রতিবাদ করেন নাই। অবশ্য মীমাংসক কুমারিল ভট্টও 'প্রত্যক্ষসূত্রবার্ত্তিকে' চরম কল্পে ইন্দ্রিয়াদি কতিপয় কারণসমষ্টিকেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতেও চরম কারণই মুখ্য প্রমাণ। জয়ন্ত ভট্টের মতে প্রমাণের মুখ্য-গৌণভাব সম্ভব নহে। কারণ, প্রমাজ্ঞানের সামগ্রীই প্রমাণ। কিন্তু পরে প্রত্যক্ষ প্রমাণের ব্যাখ্যায় জয়ন্ত ভট্টও সেই সামগ্রীরূপ প্রমাণের ফল প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেও হানাদিবুদ্ধিরূপ ফলের পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়াছেন। তাই সেখানে লিখিয়াছেন,—"প্রমাণতায়াং সামগ্র্যাস্তজ্জ্ঞানং ফলমিষ্যতে। তস্য প্রমাণভাবে তু ফলং হানাদিবুদ্ধয়ঃ॥"—ন্যায়মঞ্জরী, ৬৬ পৃঃ।

কিন্তু জয়ন্ত ভট্টের সমর্থিত পূর্ব্বোক্ত মতদ্বয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কারকসমূহের কারণত্বও বহু বিবাদগ্রস্ত। জৈন দার্শনিক প্রভাচন্দ্র "প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড" গ্রন্থের প্রথম ভাগে উক্তরূপ মতের বিরুদ্ধে বহু কথা বলিয়াছেন। পরন্তু পাণিনির "সাধকতমং করণনং" এই সূত্রের দ্বারা কারণসমূহের মধ্যে অসাধারণ কারণবিশেষেরই করণত্ব বুঝা যায়। উহার দ্বারা সমগ্র কারণসংহতির করণত্ব বুঝা যায় না। স্বল্পাক্ষর হইলেও পাণিনি "সামগ্রী করণং" এইরূপ সূত্র বলেন নাই। বস্তুতঃ অসাধারণ কারণই করণ। সাধকতমত্বই তাহার অসাধারণত্ব। নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতির মতে ব্যাপারবত্ত্ব বা ব্যাপার দ্বারা কার্য্যজনকত্বই সেই অসাধারণত্ব। তদনুসারে অনুমিতিদীধিতির টীকায় (সঙ্গতিবিচারে) গদাধর ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন—"ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নব্যাপারবৎ কারণত্বং করণত্বং, ন তু কারণত্বমাত্রং"। অর্থাৎ যে ব্যাপার উপস্থিত হইলে ফল বা কার্য্য অবশ্য জন্মে সেই ব্যাপারবিশিষ্ট কারণই করণ। যে কুঠারের সংযোগরূপ ব্যাপার ছেদনক্রিয়ারূপ ফল জন্মায় নাই, সেই কুঠার ছেদনক্রিয়ার করণ নহে। গদাধর পরে তাঁহার উক্ত করণলক্ষণের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলকথা, তাদৃশ ব্যাপার দ্বারা কার্য্যজনক পদার্থ ই করণ। উক্ত নব্য মতে চরম কারণ ব্যাপারের কোন ব্যাপার না থাকায় তাহা করণ হইতে পারে না। সুতরাং ঘটাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষের চরম কারণ ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ করণ না হওয়ায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে। কিন্তু যেমন কাষ্ঠ ও কুঠারের বিলক্ষণসংযোগরূপ ব্যাপার দ্বারা সেই কুঠারই কাষ্ঠছেদনরূপ ক্রিয়ার করণ হয়, এইরূপ ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষরূপ ব্যাপার দ্বারা সেই ইন্দ্রিয়ই সেই যথার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণ হওয়ায় সেখানে সেই ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু ভাষ্যকার ইন্দ্রিসন্নিকর্ষকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়াছেন। বার্ত্তিককারও প্রথমে বলিয়াছেন—"ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষস্য করণভাবাৎ।" পরে পাণিনিসূত্রোক্ত সাধকতমত্বেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরে অনুমানসূত্র-বার্ত্তিকে অনুমিতির চরম কারণ লিঙ্গপরামর্শকেই প্রধান অনুমানপ্রমাণ বলিয়াছেন। "তর্ক-সংগ্রহদীপিকা"র টীকায় নীলকণ্ঠও লিখিয়া গিয়াছেন,—"ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নং কারণং করণমিতিমতে তু পরামর্শ এব করণমিতি ধ্যেয়ং।" পরে অনুমান ব্যাখ্যায় ইহা পরিস্ফুট হইবে।

ভাষ্যকার পরে সূত্রোক্ত "অনুমান" শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—"মিতেন লিঙ্গেন লিঙ্গিনোঽর্থস্য পশ্চান্মানমনুমানং"। অনুমানের

প্রকৃত হেতুকে লিঙ্গ বলে। বাচস্পতি মিশ্র এখানে সেই লিঙ্গবিশিষ্ট ধর্ম্মীকেই লিঙ্গী অর্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু অনুমানসূত্রভাষ্যে ভাষ্যকারের কথার দ্বারা বুঝা যায়, লিঙ্গের ব্যাপক অনুমেয় ধর্ম্মই লিঙ্গী। "অনু" শব্দের অর্থ এখানে পশ্চাৎ। অনুমানের ধর্ম্মী পদার্থবিশেষে অনুমেয় ধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট লিঙ্গ 'মিত' অর্থাৎ যথার্থরূপে নিশ্চিত হইলে অর্থাৎ সেই লিঙ্গ-পরামর্শের পশ্চাৎ সেই অনুমেয় ধর্ম্মরূপ লিঙ্গীর যে "মান" অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান জন্মে, তাহার করণই অনুমানপ্রমাণ। "অনুমান" শব্দটি ভাববাচ্যনিষ্পন্ন হইলে উহার দ্বারা বুঝা যায়—অনুমিতিরূপ জ্ঞান। তদনুসারেই উদ্দ্যোতকর এখানে ভাষ্যকারোক্ত "মান" শব্দকে ভাববাচ্য ল্যুট্ প্রত্যয়সিদ্ধ বুঝিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"পশ্চান্মানং ভবতি যত ইত্যর্থঃ।" অর্থাৎ যদ্দারা পশ্চাৎ পূর্ব্বোক্ত "মান" বা প্রমিতি জন্মে, তাহা "অনুমান" শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। কিন্তু উক্ত ব্যাখ্যায় "যতঃ" এই পদের অধ্যাহার কল্পনা করিতে হয়, এ জন্য উদ্দ্যোতকর পরেই বলিয়াছেন যে, অথবা তাদৃশ লিঙ্গজ্ঞানজন্য পশ্চাৎ যে লিঙ্গীর 'মান' অর্থাৎ যথার্থ অনুমিতিরূপ জ্ঞান, তাহা অনুমানপ্রমাণ, ইহাই ভাষ্যার্থ। সেই প্রমাণের ফল—হানাদিবুদ্ধি। সুতরাং ফলাভাববশতঃ সেই অনুমিতিরূপ প্রমিতি প্রমাণ হইতে পারে না, এই কথা বলা যায় না। উদ্দ্যোতকর পরে "সর্ব্বঞ্চ প্রমাণং স্ববিষয়ং প্রতি ভাবসাধনং ; প্রমিতিঃ প্রমাণমিতি" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা বলিয়াছেন যে, প্রমাণবোধক "প্রমাণ" শব্দটি এক পক্ষে ভাববাচ্য ল্যুট্‌প্রত্যয়সিদ্ধ, উহার অর্থ—প্রমিতি। উহাও এক পক্ষে প্রমাণপদার্থ, ঐ প্রমিতিরূপ প্রমাণের ফল হানাদিবুদ্ধি। সুতরাং ভাষ্যকার......"পশ্চান্মানমনুমানং" একই কথার দ্বারা সূত্রোক্ত "অনুমান"শব্দের উক্তরূপ ব্যুৎপত্তির ব্যাখ্যা করিতে পারেন।

কিন্তু ভাষ্যকার পরেই বলিয়াছেন যে, সূত্রোক্ত "প্রমাণ" শব্দটি করণার্থ-বোধক, অর্থাৎ "প্রমীয়তেঽনেন" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রমাজ্ঞানের করণই উহার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। সুতরাং সেই প্রমাণের প্রত্যক্ষ প্রভৃতি চারিটি বিশেষ সংজ্ঞারও সেইরূপই ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে অর্থাৎ তদ্দারাও যথাক্রমে প্রত্যক্ষাদি প্রমাজ্ঞানের করণই বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকারের এই কথার দ্বারা তাঁহার মতে সূত্রোক্ত "অনুমান" শব্দও যে, "অনুমীয়তেঽনেন" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে করণবাচ্য ল্যুট্‌প্রত্যয়সিদ্ধ এবং উহার অর্থ—অনুমিতির করণ, ইহাই স্পষ্ট বুঝা যায়। তাহা হইলে ভাষ্যকার পূর্ব্বে সূত্রোক্ত "অনুমান" শব্দের

ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে "পশ্চান্মানং" এই বাক্যেও করণবাচ্য ল্যুট্‌প্রত্যয়সিদ্ধ "মান" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাই মনে হয়। তাহা হইলে ভাষ্যকারের ঐ ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝিতে হয় যে, অনুমানের ধর্ম্মীতে মিত অর্থাৎ যথার্থরূপে নিশ্চিত লিঙ্গ বা হেতুর দ্বারা পশ্চাৎ অনুমেয় ধর্ম্মের যে মিতি বা প্রমা জন্মে, তাহার করণই উক্ত "অনুমান" শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। ভাষ্যকার প্রভৃতি অন্যত্রও ঐরূপ একদেশান্বয়তাৎপর্য্যে বাক্যপ্রয়োগ করিয়াছেন। পরন্তু অনুমিতিরূপ প্রমাজ্ঞান অপর যথার্থ অনুমিতিবিশেষের করণ হইয়া পূর্ব্বোক্ত হানাদিবুদ্ধিরূপ ফলের পক্ষে অনুমানপ্রমাণ হইলেও সেই প্রথম অনুমিতির যাহা করণ, তাহাও ত সূত্রোক্ত "অনুমান" শব্দের অর্থ, সুতরাং সামান্যতঃ উক্তরূপ যথার্থ অনুমিতির করণই সূত্রোক্ত "অনুমান" শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ, ইহাই ভাষ্যকারের বক্তব্য। কেবল হানাদিবুদ্ধিরূপ ফলের করণ অনুমিতিরূপ প্রমাজ্ঞানকে "অনুমান" শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ বলিলে উহার দ্বারা সমস্ত অনুমানপ্রমাণের বোধ হয় না, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। সুধীগণ উদ্দ্যোতকরের ব্যাখ্যার বিচার করিবেন।

ভাষ্যকার পরে 'উপমান" শব্দের ব্যুৎপত্তির ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, সামীপ্যমান উপমান। সামীপ্য বলিতে সাদৃশ্য। "মান" শব্দের দ্বারা এখানে প্রত্যক্ষরূপ যথার্থ জ্ঞানই বুঝিতে হইবে। এ বিষয়ে অন্য কথা পরে উপমান-লক্ষণসূত্র-ভাষ্যে পাওয়া যাইবে। সূত্রোক্ত প্রমাণবোধক "শব্দ" শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"শব্দ্যতেঽনেনার্থ ইতি।" অর্থাৎ যদ্দ্বারা অর্থ শব্দিত হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে "শব্দ" ধাতুর উত্তর করণবাচ্য অল্‌ প্রত্যয়ে সিদ্ধ উক্ত "শব্দ" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়,—অর্থবিশেষবোধের সাধন শব্দ। ভাষ্যকার পরে পূর্ব্বোক্ত "শব্দ্যতে" এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন— "অভিধীয়তে"। অভিধা বৃত্তি ভিন্ন লক্ষণা বৃত্তির দ্বারাও শব্দের অর্থবিশেষের বোধ জন্মে, তাই আবার উহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"জ্ঞাপ্যতে"। অর্থাৎ উক্ত "শব্দ" শব্দের অন্তর্গত শব্দ ধাতুর অর্থ এখানে অভিধা বা লক্ষণা বৃত্তির দ্বারা অর্থজ্ঞাপন।

ভাষ্য। কিং পুনঃ প্রমাণানি প্রমেয়মভিসংপ্লবন্তেঽথ প্রতিপ্রমেয়ং ব্যবতিষ্ঠন্ত ইতি। উভয়থাদর্শনং। অস্ত্যাত্মে-ত্যাপ্তোপদেশাৎ প্রতীয়তে। তত্রানুমানং "ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখ-

দুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গ”মিতি। প্রত্যক্ষং যুঞ্জানস্য যোগসমাধিজ "মাত্মমনসোঃ সংযোগবিশেষাদাত্মা প্রত্যক্ষ” ইতি।* অগ্নিরাপ্তোপদেশাৎ প্রতীয়তে অত্রাগ্নিরিতি। প্রত্যাসীদতা ধূমদর্শনেনানুমীয়তে। প্রত্যাসন্নেন চ প্রত্যক্ষত উপলভ্যতে।

ব্যবস্থা পুন"রগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকাম” ইতি। লৌকিকস্য স্বর্গে ন লিঙ্গদর্শনং, ন প্রত্যক্ষং। স্তনয়িত্নুশব্দে শ্রূয়মানে শব্দহেতোরনুমানং। তত্র ন প্রতক্ষং, নাগমঃ। পাণৌ প্রত্যক্ষত উপলভ্যমানে নানুমানং নাগম ইতি।

সা চেয়ং প্রমিতিঃ প্রতক্ষ্যপরা। জিজ্ঞাসিতমর্থমাপ্তোপদেশাৎ প্রতিপদ্যমানো লিঙ্গদর্শনেনাপি বুভুৎসতে, লিঙ্গদর্শনানুমিতঞ্চ প্রত্যক্ষতো দিদৃক্ষতে, প্রত্যক্ষত উপলব্ধেঽর্থে জিজ্ঞাসা নিবর্ত্ততে। পূর্ব্বোক্তমুদাহরণমগ্নিরিতি। প্রমাতুঃ প্রমাতব্যেঽর্থে প্রমাণানাং সংকরোঽভিসংপ্লবঃ, অসংকরো ব্যবস্থেতি।

ইতি ত্রিসূত্রীভাষ্যম্ ॥৩॥

অনুবাদ—(প্রশ্ন) অনেক প্রমাণ কি এক প্রমেয় পদার্থকে অভিসংপ্লব করে অর্থাৎ ক্রমশঃ বিষয় করে? অথবা স্ব স্ব প্রমেয় বিষয়ে ব্যবস্থিতই হয়? (উত্তর) উভয় প্রকারই দেখা যায়, অর্থাৎ একই বিষয়ে অনেক প্রমাণের সংকর এবং একমাত্র প্রমাণের ব্যবস্থা, এই উভয়েরই উদাহরণ আছে।

[অলৌকিক ও লৌকিক বিষয়ে যথাক্রমে ‘প্রমাণসংপ্লব’ ও ‘প্রমাণব্যবস্থা’র উদাহরণ]

আত্মা আছে, ইহা আপ্তোপদেশ অর্থাৎ শব্দপ্রমাণ হইতে প্রতীত হয়।

---

* যোগীর যোগজসন্নিকর্ষজন্য মনের দ্বারা আত্মার অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে, এ বিষয়ে প্রমাণরূপে ভাষ্যকার পরে মহর্ষি কণাদের “আত্ম-মনসোঃ” ইত্যাদি সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। এখন প্রচলিত বৈশেষিক দর্শনে (৯।১।১১) উক্ত সূত্রে পাঠভেদ দৃষ্ট হইলেও ভাষ্যকারের সময়ে তাঁহার উদ্ধৃত উক্তরূপ সূত্রপাঠই প্রচলিত ছিল, ইহাই মনে হয়; কারণ, পরিদৃষ্ট সমস্ত ভাষ্যপুস্তকে উক্তরূপ পাঠই দেখা যায়। যুক্ত ও বিযুক্ত যোগীর কিরূপে আত্ম-প্রত্যক্ষ হয়, ইহা প্রশস্তপাদ বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীধর ভট্ট প্রভৃতি তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ‘ন্যায়কন্দলী’ ১৯৫-৯৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সেই আত্মবিষয়ে অনুমানও হয়,—'ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ' অর্থাৎ অনুমাপক (দশম সূত্র দ্রষ্টব্য)। যুঞ্জান ব্যক্তির অর্থাৎ ধ্যানাদিপরায়ণ যোগিবিশেষের যোগসমাধিজাত প্রত্যক্ষও হয়। 'আত্মা ও মনের সংযোগবিশেষ-প্রযুক্ত আত্মা প্রত্যক্ষ' (বৈশেষিক দর্শন, ৯ম অ, ১ম আ, ১১শ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

'এই স্থানে অগ্নি আছে'—এইরূপ আপ্তবাক্য অর্থাৎ শব্দপ্রমাণ হইতে অগ্নি প্রতীত হয়। প্রত্যাসন্ন হইতে গেলে তৎকর্তৃক ধূমদর্শনের দ্বারা অনুমিত হয় এবং প্রত্যাসন্ন অর্থাৎ সেই অগ্নির নিকটস্থ হইলে প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধ হয় অর্থাৎ তখন ঐ অগ্নিই প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় হয়।

'ব্যবস্থা' অর্থাৎ প্রমাণের অসংকর যথা—"অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" এইরূপ শ্রুতিবাক্যই (স্বর্গবিষয়ে প্রমাণ)—লৌকিক ব্যক্তির স্বর্গ বিষয়ে লিঙ্গ-দর্শন অর্থাৎ অনুমান প্রমাণ নাই, প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই (অর্থাৎ অলৌকিক স্বর্গাদি পদার্থ বিষয়ে শাস্ত্র ভিন্ন কোন প্রমাণ সম্ভব না হওয়ায় প্রমাণব্যবস্থাই স্বীকার্য্য) এবং মেঘের শব্দ শ্রূয়মাণ হইলে শব্দহেতুর অর্থাৎ সেই শব্দের অপ্রত্যক্ষ কারণের অনুমান হয়, সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, শব্দপ্রমাণ নাই। হস্ত প্রত্যক্ষতঃ উপলভ্যমান হইলে তখন সে বিষয়ে অনুমানপ্রমাণ নাই, শব্দপ্রমাণ নাই অর্থাৎ উক্তরূপ লৌকিক বিষয়েও অনেক স্থলে প্রমাণব্যবস্থাই স্বীকার্য্য।

কিন্তু সেই এই প্রমিতি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত 'প্রমাণসংপ্লব' স্থলে একই বিষয়ে ক্রমশঃ অনেক প্রমাণ দ্বারা যে সমস্ত প্রমিতি জন্মে, তাহা 'প্রত্যক্ষপরা' অর্থাৎ তন্মধ্যে প্রত্যক্ষই পর বা প্রধান, (কারণ) জিজ্ঞাসিত বিষয়কে আপ্তবাক্য হইতে বুঝিলে তখন সেই ব্যক্তি 'লিঙ্গদর্শন' অর্থাৎ অনুমানপ্রমাণ দ্বারাও বুঝিতে ইচ্ছা করে। লিঙ্গদর্শন দ্বারা অনুমিত সেই বিষয়কেও প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা দর্শন করিতে ইচ্ছা করে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধ বিষয়ে অর্থাৎ পরে সেই বিষয় প্রত্যক্ষ হইলে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হয়, এ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ অগ্নি। প্রমাতা ব্যক্তির এক প্রমেয়বিষয়ে অনেক প্রমাণের সংকরকে বলে 'অভিসংপ্লব' এবং অসংকরকে বলে ব্যবস্থা।*

---

* ভাষ্যকার প্রথমে "কিং পুনঃ" ইত্যাদি ভাষ্যসন্দর্ভের দ্বারা প্রমাণের যে "অভিসংপ্লব" ও "ব্যবস্থা" বলিয়াছেন, সেই "অভিসংপ্লব" ও "ব্যবস্থা"র ব্যাখ্যা করিতে শেষে বলিয়াছেন যে, এক বিষয়ে অনেক প্রমাণের সংকরই প্রমাণের "অভিসংপ্লব" এবং অসংকরই প্রমাণের "ব্যবস্থা"। প্রথমোক্ত প্রমাণসংকর "প্রমাণসংপ্লব" নামেও কথিত হইয়াছে। অনেক পুস্তকে "প্রমাণানাং সম্ভবঃ", এইরূপ পাঠান্তরই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি "সংকর" শব্দেরই প্রয়োগ করায় এবং সরলার্থ বলিয়া "প্রমাণানাং সংকরঃ" এইরূপ ভাষ্যপাঠই প্রকৃত বলিয়া বুঝা যায়।

ত্রিসূত্রীর অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, এই তিনটী প্রধান সূত্রের ভাষ্য সমাপ্ত ॥

টিপ্পনী—পূর্ব্বোক্তরূপ 'প্রমাণসংপ্লব' সর্ব্বসম্মত নহে। প্রাচীন কালেও ঐ বিষয়ে বিবাদ হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার এখানে পরে উক্ত বিষয়ে প্রশ্নপূর্ব্বক মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—"উভয়থাদর্শনং" অর্থাৎ প্রমাণসংপ্লব ও প্রমাণব্যবস্থা, উভয়েরই উদাহরণ থাকায় উভয়ই স্বীকার্য্য। ভাষ্যকার যথাক্রমে অলৌকিক ও লৌকিক বিষয়ে ঐ উভয়ের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, পরে "সা চেয়ং প্রমিতিঃ প্রত্যক্ষপরা" ইত্যাদি ভাষ্যসন্দর্ভের দ্বারা উক্ত "প্রমাণসংপ্লব" যে স্বীকার্য্য, এ বিষয়ে সংক্ষেপে যুক্তিও প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের কথা এই যে, প্রমাতা ব্যক্তি কোন বিষয়কে প্রথমে শব্দপ্রমাণ দ্বারা বুঝিলেও সে বিষয়ে দৃঢ়তর জ্ঞানের জন্য অনুমানপ্রমাণ দ্বারাও তাহা বুঝিতে ইচ্ছা করেন এবং পরে প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাও তাহা বুঝিতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং সম্ভব হইলে ক্রমে তাহার সেই একই বিষয়ে শাব্দ, অনুমিতি ও প্রত্যক্ষ, এই প্রমিতিত্রয় জন্মে ; তন্মধ্যে চরম প্রত্যক্ষই প্রধান। কারণ, প্রত্যক্ষ হইলে আর সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা জন্মে না। ফলকথা, প্রমাতার জিজ্ঞাসাবশতঃ একই বিষয়ে সম্ভব হইলে ক্রমে প্রত্যক্ষ পর্য্যন্ত জ্ঞান জন্মে, ইহার অনেক উদাহরণ আছে, এবং সেইরূপ স্থলে সেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় জ্ঞানকে ব্যর্থ বলাও যায় না। সুতরাং সেইরূপ স্থলে "প্রমাণসংপ্লব" অবশ্য স্বীকার্য্য। মহর্ষি গোতমও পরে "প্রমাণতশ্চার্থপ্রতিপত্তেঃ" (৪।২।২৯) এই সূত্রে "প্রমাণতঃ" এইরূপ পদপ্রয়োগ দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের সূচনা করিয়াছেন। তদনুসারে ভাষ্যারম্ভে বাৎস্যায়নও "প্রমাণতঃ" এইরূপ পদের দ্বারা তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। সেখানে উদ্দ্যোতকরের কথা পূর্ব্বে (৭ম পৃঃ) সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে বাচস্পতি মিশ্র সেখানে ভাষ্যকারোক্ত "প্রমাণতঃ" এই পদে তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তির সার্থকতাও বুঝাইয়াছেন।

ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের কোন কথা বলেন নাই ; ইহার দ্বারাও বুঝা যায়, তিনি প্রমাণদ্বয়বাদী বৌদ্ধাচার্য্যগণের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন প্রাচীন বৌদ্ধমতানুসারে প্রত্যক্ষাদি চতুর্ব্বিধ প্রমাণই বলিয়া

গিয়াছেন।* কিন্তু পরে বসুবন্ধু ও তাঁহার শিষ্য দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি বিশেষ বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রমাণ দ্বিবিধ,—প্রত্যক্ষ ও অনুমান। কারণ, বিষয় দ্বিবিধ—(১) বিশেষ ও (২) সামান্য, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। যাহা বিশেষ, তাহাই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। কারণ, নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষই প্রমাণ। যেমন বহ্নির প্রত্যক্ষকালে সেই বহ্নিবিশেষেরই প্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু তাহাতে বহ্নিত্ব প্রভৃতি বিষয় হয় না। সমস্ত বহ্নির সামান্য বা সাধারণ ধর্ম্ম যে বহ্নিত্ব, তাহা কল্পিত—উহা সৎ নহে। কারণ, উহার দ্বারা কোন প্রয়োজননির্ব্বাহ হয় না। সুতরাং কল্পনার বিষয় ঐ বহ্নিত্ব প্রভৃতি সামান্য ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় হইতে পারে না। কিন্তু উহা কেবল অনুমানেরই বিষয় হয়। অতএব উক্ত প্রমাণদ্বয়ের বিষয়ভেদপ্রযুক্ত একই বিষয়ে উক্ত প্রমাণদ্বয়ের সংকররূপ সংপ্লব উপপন্ন হয় না। পরে ধর্ম্মকীর্ত্তি বিশেষ বিচার করিয়া উক্ত মত সমর্থন করেন। তিনি বলিয়াছেন,—"স্বলক্ষণ"ই পরমার্থসৎ এবং উহাই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। তদ্ভিন্ন সমস্তকে বলে, "সামান্যলক্ষণ"; উহা কল্পিত এবং কেবল অনুমানের বিষয়। ধর্ম্মকীর্ত্তির "ন্যায়বিন্দু" গ্রন্থ ও ধর্ম্মোত্তরের টীকা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু ধর্ম্মকীর্ত্তির অনেক পূর্ব্বে "ন্যায়বার্ত্তিকে" উদ্দ্যোতকর সংক্ষেপে পূর্ব্বপক্ষরূপে উক্ত বৌদ্ধমতের উল্লেখ করিয়া উহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন,—"এতচ্চ ন, অনভ্যুপগমাৎ" ইত্যাদি (৫ম পৃঃ)। অর্থাৎ বিষয় দ্বিবিধ, সুতরাং প্রমাণ দ্বিবিধ এবং প্রমাণসংকর সম্ভব নহে, এই সমস্ত আমরা স্বীকার করি না। কারণ, প্রমাণ চতুর্ব্বিধ এবং বিষয় ত্রিবিধ, যথা—(১) সামান্য, (২) বিশেষ ও (৩) 'তদ্বান্' অর্থাৎ সেই সামান্য ও বিশেষ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মী। সুতরাং সেই একই ধর্ম্মীর অনেক প্রমাণজন্য প্রমিতি হইতে পারে এবং অনেক স্থলে তাহা হইয়া থাকে। যেমন ঘটাদি অবয়বিরূপ ধর্ম্মীর চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হইলে ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারাও তাহারই প্রত্যক্ষ জন্মে এবং প্রত্যক্ষের বিষয় গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ এবং সুখাদি গুণপদার্থে সত্তা ও গুণত্ব নামক জাতির যথাক্রমে ঘ্রাণাদি

---

* "অথ কতিবিধং প্রমাণং? চতুর্ব্বিধং প্রমাণং—প্রত্যক্ষমনুমানমুপমানমাগমশ্চেতি। চতুর্ষু প্রমাণেষু প্রত্যক্ষং শ্রেষ্ঠং, কুতঃ পুনঃ প্রত্যক্ষং শ্রেষ্ঠমিতি চেদপরেষাং ত্রয়াণাং প্রমাণানাং প্রত্যক্ষোপজীবকত্বাচ্ছ্রেষ্ঠং" ইত্যাদি।—নাগার্জ্জুন-প্রণীত "উপায়হৃদয়ং" (১৩শ পৃঃ), গাইকোয়াড় সংস্করণ। কিন্তু "প্রমাণসমমুচ্চয়" গ্রন্থে দিঙ্‌নাগ বলিয়াছেন,—"প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ প্রমাণং হি দ্বিলক্ষণং। প্রমেয়ং তত্র সিদ্ধং হি ন প্রমাণান্তরং ভবেৎ।।" পরবর্ত্তী বৌদ্ধাচার্য্য শান্তরক্ষিত "তত্ত্বসংগ্রহে" প্রমাণান্তরপরীক্ষায় (৪৩৩-৪৮৫ পৃঃ) বিচারপূর্ব্বক অন্যান্য প্রমাণের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। সে সমস্ত কথাও অবশ্য পাঠ্য।

সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারাই প্রত্যক্ষ জন্মে। উদ্দ্যোতকর কণাদের সূত্রানুসারেই ঐ কথা বলিয়াছেন। কারণ, বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন,—"এতেন গুণত্বে ভাবে চ সার্ব্বেন্দ্রিয়ং জ্ঞানং ব্যাখ্যাতং" (৪।১।১৩)। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত স্থলে একই বিষয়ে প্রত্যক্ষরূপ সজাতীয় অনেক প্রমাণসংকরের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, তুল্য যুক্তিতে সামান্য ও বিশেষ ধর্ম্মবিশিষ্ট বহ্নি প্রভৃতি কোন এক অবয়বিবিষয়ে ক্রমে শব্দ, অনুমান এবং প্রত্যক্ষ, এই বিজাতীয় প্রমাণত্রয়ের সংকরও যে উপপন্ন হয়, ইহাও উদ্দ্যোতকর ব্যক্ত করিয়াছেন।*

পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে অপর পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিতে উদ্দ্যোতকর পরে আবার বলিয়াছেন যে, কোন বিষয় এক প্রমাণদ্বারা অধিগত হইলে, সে বিষয়ে দ্বিতীয় প্রমাণ ব্যর্থ, ইহাও বলা যায় না।** কারণ, বিভিন্ন প্রমাণের দ্বারা বিভিন্নরূপেই সেই বিষয়ের জ্ঞান জন্মে। যেমন ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বদ্ধ বিষয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় হয় এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত অসম্বদ্ধ বিষয়ই অনুমানের বিষয় হয়। ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষকালে সে বিষয়ে অনুমিতি জন্মে না এবং অনুমানাদি জ্ঞান হইতে প্রত্যক্ষজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য আছে। তাই অনুমানাদির পরে প্রত্যক্ষ হইলে আর সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা জন্মে না। সুতরাং শব্দ বা অনুমানপ্রমাণদ্বারা নির্ণীত

* বৌদ্ধসম্প্রদায় ভাবরূপ সামান্য বা জাতি মানেন নাই। তাঁহাদিগের মতে জাতি "অপোহ"রূপ। "অপোহ" বলিতে "অতদ্ব্যাবৃত্তি" অর্থাৎ তদ্‌ভিন্ন সমস্ত পদার্থের ভেদ। যেমন গোভিন্ন সমস্ত পদার্থের ভেদই গোত্ব। সুতরাং উহা অভাবরূপ। উহা অনাদিসংস্কার-সম্ভূত বিকল্প বা কল্পনার বিষয় এবং সেই কল্পিত ধর্ম্মবিশিষ্ট অতিরিক্ত অবয়বীও কল্পিত অর্থাৎ পরমার্থসৎ নহে। অবয়বী ও জাতি যে বলা হয়, উহা বার্ত্তামাত্র অর্থাৎ কথা মাত্র। বস্তুতঃ উহার সত্তা নাই। উক্ত মতের ব্যাখ্যায় ঐ তাৎপর্য্যেই জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন,—"তস্মানবয়বী জাতিরিতি বার্ত্তৈব ভদ্রিকা"। (ন্যায়মঞ্জরী, ৩০ পৃঃ)। এ বিষয়ে পরবর্ত্তী বৌদ্ধসম্প্রদায় বহু সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছিলেন। রত্নকীর্ত্তি-বিরচিত "অপোহসিদ্ধি" এবং পণ্ডিত অশোক-রচিত "অবয়বি-নিরাকরণ" ও "সামান্যদূষণদিক্‌প্রসারিতা" নামক গ্রন্থ (সোসাইটি সং) পাঠ করিলে তাহা বুঝা যাইবে।

** দ্বিতীয় প্রমাণ ব্যর্থ বলিয়া মীমাংসক 'প্রমাণসংপ্লব' স্বীকার করেন নাই, ইহা এখানে তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি টীকায় (১৪৫ পৃঃ) উদয়নাচার্য্য লিখিয়াছেন। কিন্তু মীমাংসকমতে যাহা "গৃহীতগ্রাহী" অর্থাৎ পূর্ব্বজ্ঞাত বিষয়ের বোধক, তাহা প্রমাণই নহে। উদ্দ্যোতকর উক্ত স্থলে সে ভাবের কোন কথা বলেন নাই। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিতে দ্বিতীয় প্রমাণকে ব্যর্থই বলিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টও পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধমতে পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিতেই উক্ত বৈয়র্থ্য দোষেরও উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেখানে উহা বুঝাইতে উদ্দ্যোতকরের বার্ত্তিকসন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"অধিগতমর্থমধিগময়তা পিষ্টং পিষ্টং স্যাদিতি"।—ন্যায়মঞ্জরী, ৩০ পৃঃ।

বিষয়েও সম্ভব স্থলে যখন প্রত্যক্ষেচ্ছা জন্মে, তখন সেই প্রত্যক্ষের কারণ উপস্থিত হইলে তাহা অবশ্যই জন্মে, ব্যর্থ বলিয়া তাহার নিবারণ করা যায় না এবং জিজ্ঞাসা নিবৃত্তির জন্য তাহার সার্থকতাও স্বীকার্য্য। কিন্তু যে সময়ে যে বিষয়ে একমাত্র প্রমাণই ব্যবস্থিত, তখন সেই বিষয়ে সেই একমাত্র প্রমাণজন্য প্রমিতিই জন্মে, সেখানে অন্য প্রমাণের দ্বারা জিজ্ঞাসাও জন্মে না এবং সেই প্রমাণের ব্যর্থত্বের আশঙ্কাও নাই।

মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে বহু বিচার করিয়া, পরে বলিয়াছেন যে, 'প্রমাণসংপ্লব' স্বীকার না করিলে বৌদ্ধসম্প্রদায়ও অনুমানের প্রামাণ্য স্থাপন করিতে পারেন না। জয়ন্ত ভট্ট পরে ইহা বুঝাইয়াছেন এবং পরে উক্ত বিষয়ে ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রভৃতির কথারও উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। সে যাহা হউক, বস্তুতঃ এক বিষয়ে অনেক প্রমাণের সংকররূপ "প্রমাণসংপ্লব" স্বীকার্য্য এবং অনেক স্থলে তাহা আবশ্যক। তাই বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ, শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা এক আত্মবিষয়েই যথাক্রমে শব্দ, অনুমান ও প্রত্যক্ষ, এই প্রমাণত্রয়জন্য জ্ঞানের কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে। তদনুসারেই ভাষ্যকার আত্মবিষয়ে উক্তরূপ প্রমাণসংপ্লবের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। লৌকিক বিষয়েও উক্তরূপ প্রমাণসংপ্লব স্বীকার্য্য। যেমন রোগবিশেষ নির্ণয়ের জন্য প্রমাণত্রয় আবশ্যক হয়। তাই চরকসংহিতার বিমান-স্থানের চতুর্থ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে,—"ত্রিবিধং খলু রোগবিশেষবিজ্ঞানং ভবতি, তদ্‌যথা, আপ্তোপদেশঃ প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চেতি।" নিদানের চতুর্থ শ্লোকের টীকায় বহুবিজ্ঞ বিজয় রক্ষিতও "প্রমাণসংপ্লবস্যাপি দৃষ্টত্বাৎ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উহা সমর্থন করিয়াছেন।

প্রথম তিন সূত্রের দ্বারা ন্যায়দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য এবং প্রয়োজনাদি ও সকল পদার্থের ব্যবস্থাপক প্রথমোক্ত প্রমাণপদার্থের প্রকাশ হওয়ায় উক্ত তিন সূত্র বিশেষরূপে ব্যাখ্যেয় এবং ন্যায়দর্শনে উহা "ত্রিসূত্রী" নামেই প্রসিদ্ধ হয়। তাই ভাষ্যকার উহার ভাষ্য সমাপ্ত করিয়া পরে বলিয়াছেন,—"ইতি ত্রিসূত্রীভাষ্যং"। 'ত্রয়াণাং সূত্রাণাং সমাহারস্ত্রিসূত্রী'। বার্ত্তিককারও এখানে শেষে বলিয়াছেন,—"ইতি ত্রিসূত্রীবার্ত্তিকম্।" উক্ত 'ত্রিসূত্রী'র সম্বন্ধে উদয়নাচার্য্যকৃত "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" টীকাও "ত্রিসূত্রীনিবন্ধ" নামে কথিত হইয়াছে॥ ৩॥

ভাষ্য। অথ বিভক্তানাং লক্ষণবচনম্—

অনুবাদ—অনন্তর বিভক্ত প্রমাণসমূহের লক্ষণবচন কর্ত্তব্য (এ জন্য ক্রমানুসারে প্রথমোক্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণসূত্র বলিয়াছেন)।

সূত্র। ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সেই ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবিশেষহেতুক উৎপন্ন 'অব্যপদেশ্য' (অশাব্দ), 'অব্যভিচারী' (যথার্থ), 'ব্যবসায়াত্মক' (নিশ্চয়াত্মক) জ্ঞান প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ উক্তরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের যাহা করণ, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ভাষ্য। ইন্দ্রিয়স্যার্থেন সন্নিকর্ষাদুৎপদ্যতে যজ্‌জ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্। ন তর্হীদানীমিদং ভবতি? আত্মা মনসা সংযুজ্যতে, মন ইন্দ্রিয়েণ, ইন্দ্রিয়মর্থেনেতি। নেদং কারণাবধারণমেতাবৎ-প্রত্যক্ষে কারণমিতি, কিন্তু বিশিষ্টকারণবচনমিতি। যৎ প্রত্যক্ষজ্ঞানস্য বিশিষ্টকারণং তদুচ্যতে, যত্তু সমানমনুমানাদিজ্ঞানস্য ন তন্নিবর্ত্ত্যত ইতি। মনসস্তর্হীন্দ্রিয়েণ সংযোগো বক্তব্যঃ? ভিদ্যমানস্য প্রত্যক্ষজ্ঞানস্য নায়ং ভিদ্যত ইতি সমানত্বান্নোক্ত ইতি।

অনুবাদ—অর্থের (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের) সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজন্য যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা প্রত্যক্ষ। (পূর্ব্বপক্ষ) তাহা হইলে ইদানীং ইহা হয় না? আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হয়, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, ইন্দ্রিয় অর্থের সহিত সংযুক্ত হয়। [অর্থাৎ মনের সহিত আত্মার সংযোগ এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগও যে প্রত্যক্ষের কারণ, ইহা এই সূত্রে উক্ত হয় নাই।] (উত্তর) ইহা অর্থাৎ এই সূত্রে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের উল্লেখ, এতাবন্মাত্রই প্রত্যক্ষে কারণ, এইরূপে কারণের অবধারণ নহে, কিন্তু বিশিষ্ট কারণবচন, (তাৎপর্য্য) যাহা প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানের বিশিষ্ট কারণ অর্থাৎ অসাধারণ কারণ, তাহাই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু যাহা অনুমানাদি জ্ঞানের সমান কারণ, অর্থাৎ জন্য জ্ঞানমাত্রের সাধারণ কারণ, তাহা নিষিদ্ধ হয় নাই।

(পূর্ব্বপক্ষ) তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ বক্তব্য, অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ বক্তব্য হইলে এই সূত্রে ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগও বলা উচিত, (উত্তর) "ভিদ্যমান" অর্থাৎ 'রূপজ্ঞান' অথবা 'চাক্ষুষ জ্ঞান' ইত্যাদি সংজ্ঞার দ্বারা অন্যান্য জ্ঞান হইতে ভিন্নস্বরূপে জ্ঞাপ্যমান প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সম্বন্ধে এই ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ বিশিষ্ট হয় না অর্থাৎ ঐ সংযোগের আশ্রয় ইন্দ্রিয় অথবা মনের বাচক সংজ্ঞার দ্বারা বিভিন্ন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভেদ বোধিত হয় না। এ জন্য সমানত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ উহাও আত্মমনঃসংযোগের সমান বলিয়া উক্ত হয় নাই।

টিপ্পনী—(তৃতীয় সূত্রের দ্বারা প্রথমোক্ত প্রমাণপদার্থের বিভাগরূপ বিশেষ উদ্দেশ হইয়াছে এবং "প্রমাণ" শব্দের দ্বারা "প্রমাণ" পদার্থের সামান্য লক্ষণও সূচিত হইয়াছে। এখন সেই বিভক্ত প্রমাণচতুষ্টয়ের বিশেষ লক্ষণ বক্তব্য। তাই মহর্ষি প্রথমে এই সূত্রদ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষ ব্যতীত কোন প্রমাণেরই সত্তা সিদ্ধ হয় না, সুতরাং প্রত্যক্ষই জ্যেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া সর্ব্বাগ্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণেরই উদ্দেশপূর্ব্বক লক্ষণ কথিত হইয়াছে। লক্ষণ না বুঝিলে পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব হয় না। সুতরাং পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনের জন্য তাহার লক্ষণ অবশ্য বক্তব্য। সজাতীয় ও বিজাতীয় সমস্ত পদার্থ হইতে ব্যবচ্ছেদ বা ভেদনিশ্চয়ই লক্ষণের প্রয়োজন।) অনুমানাদিপ্রমাণ প্রত্যক্ষপ্রমাণের সজাতীয় এবং প্রমাণাভাস ও প্রমেয়াদি পদার্থ উহার বিজাতীয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রকৃত লক্ষণ বুঝিলে সেই লক্ষণরূপ হেতুর দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, ঐ প্রত্যক্ষ প্রমাণ উহার সজাতীয় ও বিজাতীয় ঐ সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন। সুতরাং লক্ষণ দ্বারা উহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। এইরূপ অন্যান্য সমস্ত পদার্থেরও লক্ষণদ্বারা উক্তরূপে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। সুতরাং উদ্দেশের পরে সমস্ত পদার্থেরই লক্ষণ বক্তব্য।

(যে পদার্থের লক্ষণ বক্তব্য, তাহা সেই লক্ষণের লক্ষ্য। এই সূত্রে শেষোক্ত "প্রত্যক্ষং" এই পদের দ্বারা সেই লক্ষ্য পদার্থের নির্দ্দেশ হইয়াছে। প্রথমোক্ত পঞ্চ পদের দ্বারা তাহার লক্ষণ কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যে কোন একটী অথবা দুই, তিন বা চারিটী পদের দ্বারা প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলে 'অতিব্যাপ্তি' দোষ হয়, এ জন্য মহর্ষি ঐ সমস্ত পদই বলিয়াছেন।) তাই বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর উক্ত বিষয়ে বিচারপূর্ব্বক বলিয়াছেন,—"সমস্তমিত্যাহ—যস্মাদেকশোঽনুমান-সুখ-শাব্দ-বিপর্য্যয়-সংশয়জ্ঞানানি নিবর্ত্ত্যন্ত ইতি।" অর্থাৎ এই সূত্রে প্রথমোক্ত পঞ্চ পদই প্রত্যক্ষের লক্ষণার্থ কথিত হইয়াছে। কারণ,

উহার মধ্যে যথাক্রমে এক একটী পদের দ্বারা (১) অনুমান, (২) সুখ, (৩) শাব্দ জ্ঞান, (৪) বিপর্য্যয়রূপ ভ্রম প্রত্যক্ষ এবং (৫) সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষ নিবারিত হইয়াছে। অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষ লক্ষণের লক্ষ্য নহে—অলক্ষ্য, তাহা ঐ লক্ষণাক্রান্ত হইলে সেই লক্ষণের "অতিব্যাপ্তি" নামক দোষ হয়। সুতরাং সেই দোষ বারণের জন্য মহর্ষি উক্ত পঞ্চ পদ বলিয়াছেন, ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক। পরে ইহা বুঝা যাইবে এবং উক্ত পঞ্চ পদের মধ্যে কোন কোন পদের প্রয়োজন বিষয়ে মতভেদও পরে আলোচিত হইবে।

'তাৎপর্য্যটীকা'কার বাচস্পতি মিশ্র ও জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি এই সূত্রে "যতঃ" এই পদের অধ্যাহার সমর্থন করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যদ্দ্বারা উক্তরূপ জ্ঞান জন্মে অর্থাৎ উক্তরূপ জ্ঞানের যে সমস্ত করণ, তাহাই "প্রত্যক্ষ" অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নামক প্রমাণ। কারণ, পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রত্যক্ষ নামক প্রমাণের লক্ষণই মহর্ষির বক্তব্য। প্রত্যক্ষরূপ প্রমাজ্ঞানের করণই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সেই প্রমাজ্ঞানও পূর্ব্বোক্ত হানাদিবুদ্ধির করণ হইয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয় এবং সেই প্রমাজ্ঞানের করণ হইয়া ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ প্রমাণ হয় এবং পরম্পরায় সেই ইন্দ্রিয়ও তাহার করণ হওয়ায় প্রমাণ হয়। সুতরাং মুখ্য ও গৌণ সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণই বক্তব্য হওয়ায় এই সূত্রের দ্বারা তাহাই উক্ত হইয়াছে। কেবল প্রত্যক্ষরূপ প্রমাজ্ঞানের লক্ষণ বলিলে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বলা হয় না। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বলিতে হইলে প্রথমে প্রত্যক্ষরূপ প্রমাজ্ঞানের লক্ষণই বক্তব্য, নচেৎ তাহা বুঝা যায় না। তাই মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা প্রত্যক্ষরূপ প্রমাজ্ঞানের লক্ষণ বলিয়া, তদ্দ্বারা তাদৃশ জ্ঞানের করণই যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহার সূচনা করিয়াছেন। একই সূত্রের দ্বারা সেই প্রমাণের ফল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণও সূচিত হইয়াছে। সূত্রের দ্বারা এরূপ বহু অর্থই সূচিত হয়, এ জন্যই উহার নাম সূত্র।

মহর্ষি এই সূত্রে প্রথমে বলিয়াছেন,—"ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানং।" ভাষ্যকার প্রথমে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াই পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে, কেবল ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষকে প্রত্যক্ষের কারণ বলিলে ইদানীং ইহা হয় না ? কি হয় না ? তাহাই প্রকাশ করিতে পরেই বলিয়াছেন,—"আত্মা মনসা সংযুজ্যতে" ইত্যাদি। অর্থাৎ জীবের প্রত্যক্ষ স্থলে প্রথমে আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হয়, পরে মন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয় এবং সেই গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সেই ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট হয়, ইহাই মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত। কিন্তু তিনি 'ইদানীং'

এই সূত্রে সেই সমস্ত কারণ না বলিয়া, কেবল ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষকেই কারণ বলিয়াছেন। সুতরাং এই সূত্র তাঁহার সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা কেবল ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষই যে, প্রত্যক্ষের কারণ, ইহা বলেন নাই। প্রত্যক্ষের কারণ কি, ইহা এই সূত্রে তাঁহার বক্তব্য নহে, কিন্তু উহার লক্ষণই বক্তব্য। সুতরাং প্রত্যক্ষের যাহা অসাধারণ কারণ, তাহাই গ্রহণ করিয়া তিনি ঐরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন। সুতরাং তদ্দ্বারা আত্মমনঃসংযোগ যে, প্রত্যক্ষের কারণ নহে, ইহা বুঝা যায় না। পরন্তু জন্য জ্ঞানমাত্রেই আত্মমনঃসংযোগ কারণ। সুতরাং আত্মমনঃসংযোগজন্য জ্ঞানই প্রত্যক্ষ, এইরূপ লক্ষণ বলা যায় না। অনুমানপ্রমাণজন্য অনুমিতিরূপ জ্ঞানে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্যই মহর্ষি প্রথম পদ বলিয়াছেন।

প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণই বক্তব্য হইলে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগও বলা উচিত? এতদুত্তরে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছে.--"ভিদ্যমানস্য" ইত্যাদি। বস্তুতঃ বহিরিন্দ্রিয়ের মধ্যে যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সময়ে যাহার প্রত্যক্ষ জন্মে, তখন সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার মনের সংযোগও সেই প্রত্যক্ষের কারণ। কিন্তু কেবল মনের দ্বারা যে প্রত্যক্ষ জন্মে, সেই মানস প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ কারণ নহে। সুতরাং ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগজন্য জ্ঞানই প্রত্যক্ষ, এইরূপ লক্ষণও বলা যায় না। কিন্তু ভাষ্যকার মানস প্রত্যক্ষের কথা পরে বলিয়াছেন। এখানে কেবল বাহ্য প্রত্যক্ষকে গ্রহণ করিয়াই উক্তরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, পূর্ব্বোক্তরূপ ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ বাহ্য প্রত্যক্ষে অসাধারণ কারণ, উহা অনুমানাদি জ্ঞানের কারণ নহে। সুতরাং প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ বক্তব্য হইলে বাহ্য প্রত্যক্ষের পক্ষে ঐ অসাধারণ কারণটিও বলা উচিত, ইহাই পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য। এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"ভিদ্যমানস্য প্রত্যক্ষজ্ঞানস্য নায়ং ভিদ্যতে" ইত্যাদি।)

বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের ঐ কথার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে,*

---

* "তেন ভাষ্যস্যায়মর্থঃ, 'প্রত্যক্ষজ্ঞানস্য' রূপজ্ঞানস্য রূপজ্ঞানমিতি বা চক্ষুর্ব্বিজ্ঞানমিতি বা ব্যপদেশেন ভিদ্যমানস্য আত্মমনঃসংযোগ ইবায়মিন্দ্রিয়মনঃসংযোগো 'ন ভিদ্যতে', এবং হি স ভিদ্যতে যদি স্বসম্বন্ধিবাচকেন ব্যপদেশেন স্বমন্যতো ব্যাবর্ত্ত্যেত" ইত্যাদি তাৎপর্য্যটীকা। প্রাচীন কালে অর্থবিশেষে ভিদ্ ধাতুর "ভিদ্যতে" এইরূপ প্রয়োগও হইত, ইহা ভাষ্যকারের উক্ত প্রয়োগ দ্বারা বুঝা যায়। পরে নব্যনৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও "পৃথিবী ইতরেভ্যো ভিদ্যতে" এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু গদাধর ভট্টাচার্য্য উক্তরূপ স্থলে বিচার করিয়া সমাধান করিয়াছেন যে, উহা কর্ম্মবাচ্য প্রয়োগ। ভিন্নত্বরূপে জ্ঞাপনই উক্ত স্থলে ভিদ্ ধাতুর অর্থ। "কর্ত্তরি যগাত্মনেপদাসম্ভবাৎ। অদৈবাদিকাচ্চ ন শ্যন্সম্ভবঃ, পরস্মৈপদিত্বাচ্চ। অকর্ম্মকধাতুযোগে কর্ম্মকর্ত্তৃবিবক্ষায়া অপ্যযোগাৎ।" "অতো ভিন্নত্বেন জ্ঞাপনং ভিদ্ধাতোরর্থঃ" ইত্যাদি। —ব্যুৎপত্তিবাদ (পঞ্চমীপ্রকরণ)।

চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপের প্রত্যক্ষ জন্মিলে, সেই প্রত্যক্ষের নাম বলা হয়—রূপজ্ঞান অথবা চাক্ষুষ জ্ঞান। অর্থাৎ সেখানে ইন্দ্রিয় চক্ষু এবং তাহার বিষয় যে রূপ, তাহার বাচক সংজ্ঞার দ্বারাই সেই জ্ঞানের ব্যপদেশ হইয়া থাকে। সংজ্ঞার দ্বারা পদার্থের প্রকাশকেও "ব্যপদেশ" বলে। যেমন অঙ্কুরের বহু কারণ থাকিলেও তন্মধ্যে বীজ অসাধারণ কারণ বলিয়া "বীজাঙ্কুর" এই সংজ্ঞাই কথিত হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের আধার সেই ইন্দ্রিয়বিশেষ অথবা সেই অর্থ বা বিষয়বিশেষের সংজ্ঞার দ্বারাই সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ব্যপদেশ হইয়া থাকে; যেমন—"রূপজ্ঞান", "চক্ষুর্বিজ্ঞান" ইত্যাদি। কিন্তু সেই জ্ঞানে আত্মমনঃসংযোগ এবং ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ কারণ হইলেও সেই সংযোগের আধার আত্মা ও মনের সংজ্ঞার দ্বারা সেই জ্ঞানের ব্যপদেশ হয় না। অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপের প্রত্যক্ষ হইলে সেই জ্ঞানকে 'আত্মজ্ঞান' অথবা 'মনোজ্ঞান' এইরূপ নাম দ্বারা প্রকাশ করে না। সুতরাং উক্তরূপে ব্যপদেশের অভাবই আত্মমনঃসংযোগ ও ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগের সাম্য। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"সমানত্বান্নোক্ত ইতি।" অর্থাৎ আত্মমনঃসংযোগের তুল্য বলিয়াই মহর্ষি ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের প্রাধান্যবশতঃ তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এ সমস্ত কথা মহর্ষি পরে নিজেই বলিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ড, ১১৬-১৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মহর্ষি পরে ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ, ত্বক্‌ ও শ্রোত্র, এই পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়কেই ইন্দ্রিয় বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতে মনও ইন্দ্রিয়। সুতরাং এই সূত্রে "ইন্দ্রিয়" শব্দের দ্বারা উক্ত ষড়িন্দ্রিয়ই বুঝিতে হইবে।) প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যায় প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও বলিয়াছেন,—"অক্ষাণীন্দ্রিয়াণি, ঘ্রাণ-রসন-চক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্রমনাংসি ষট্‌।" (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ই ইন্দ্রিয়ার্থ। সেই বিষয়ের সহিত সেই ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ব্যতীত প্রত্যক্ষ জন্মে না, কিন্তু সেই সন্নিকর্ষরূপ ব্যাপার দ্বারাই সেই ইন্দ্রিয় সেই প্রত্যক্ষের জনক হয়, ইহাই সূচনা করিবার জন্য মহর্ষি "সন্নিকর্ষ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এবং "অর্থ" শব্দের দ্বারা সূচনা করিয়াছেন যে, যে পদার্থ যে ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বা গ্রহণযোগ্য, তাহার সহিত সেই ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষবিশেষই তাহার প্রত্যক্ষের জনক হয়। আকাশাদি অতীন্দ্রিয় পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষজনক নহে। কিন্তু প্রত্যক্ষ-যোগ্য পদার্থ হইলেও তাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের যে কোনরূপ সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষজনক নহে। তাই উক্ত পদে "উৎপন্ন" শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে যে, গ্রাহ্য পদার্থের

সহিত ইন্দ্রিয়ের যেরূপ সন্নিকর্ষ তাহার প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে, তাহাই ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ। নচেৎ যে-কোনরূপ সন্নিকর্ষ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ নহে।) যেমন কোন ভিত্তির সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে তখন সেই ভিত্তির ব্যবহিত ও তাহার সহিত সংযুক্ত বস্ত্রাদির সহিত সেই ইন্দ্রিয়ের 'সংযুক্ত-সংযোগ' সম্বন্ধ হয়। কারণ, সেখানে চক্ষুঃসংযুক্ত সেই ভিত্তির সহিত সেই বস্ত্রাদি দ্রব্যের সংযোগসম্বন্ধ আছে। কিন্তু ঐরূপ সংযোগ সেখানে সেই বস্ত্রাদি দ্রব্যের প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে না। সুতরাং উহা সেখানে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ নহে।

(মহর্ষি গোতমের মতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই "প্রাপ্যকারী" অর্থাৎ গ্রাহ্য বিষয়কে প্রাপ্ত হইয়াই প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে।) মহর্ষি পরে তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে ইন্দ্রিয়পরীক্ষায় বিশেষ বিচারপূর্ব্বক তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রদীপের ন্যায় তৈজস দ্রব্য, উহার রশ্মি আছে। (যেমন প্রদীপের রশ্মি বহির্গত হইয়া দূরস্থ অব্যবহিত দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হয়, তদ্রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের রশ্মিও বহির্গত হইয়া অব্যবহিত দূরস্থ দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হয়।) কিন্তু সেই রশ্মি অদৃশ্য, উহা অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ। দ্রব্যবিশেষের সহিত সেই রশ্মির সংযোগই চক্ষুঃসংযোগরূপ সন্নিকর্ষ। তাই মহর্ষি পরে নিজেই বলিয়াছেন,—"রশ্ম্যর্থসন্নিকর্ষবিশেষাত্তদ্গ্রহণং" (৩।১।৩৪)। এইরূপ শ্রবণেন্দ্রিয়ও তাহার গ্রাহ্য শব্দবিশেষের সহিত সম্বদ্ধ হইয়াই তাহার প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে। বৈদান্তিকসম্প্রদায় শব্দের উৎপত্তিস্থানে শ্রবণেন্দ্রিয়ের গতি সমর্থন করিয়া, শব্দের সহিত তাহার সম্বন্ধ সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ন্যায়বৈশেষিক মতে আকাশস্বরূপ শ্রবণেন্দ্রিয়ের অন্যত্র গতি অসম্ভব। কারণ, আকাশ নিষ্ক্রিয়। কিন্তু তরঙ্গ হইতে তরঙ্গের ন্যায় প্রথম উৎপন্ন শব্দ হইতে দ্বিতীয় শব্দ এবং সেই শব্দ হইতে তৃতীয় শব্দ, এইরূপ ক্রমে শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়ে উৎপন্ন শব্দের সহিতই তাহার "সমবায়" সম্বন্ধরূপ সন্নিকর্ষজন্য সেই শব্দেরই প্রত্যক্ষ জন্মে।

কিন্তু পরে বৌদ্ধসম্প্রদায় উক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় প্রাপ্যকারী হইতেই পারে না। কারণ, গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত উহার সন্নিকর্ষ সম্ভবই হয় না। কারণ, জীবদেহের যে স্থানকে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান বলা হয়, সেই অধিষ্ঠান প্রদেশই ইন্দ্রিয়, উহা হইতে ভিন্ন কোন ইন্দ্রিয় নাই। যাহা চক্ষুর্গোলক বা কৃষ্ণসার নামে কথিত হয়, তাহাই চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং

কর্ণগোলকই শ্রবণেন্দ্রিয়। নেত্ররোগ বা কর্ণরোগ উৎপন্ন হইলে সেই স্থানবিশেষেরই চিকিৎসাদি করা হয়। অতএব চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা যখন "সান্তর গ্রহণ" অর্থাৎ দূরস্থ বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মে এবং "পৃথুতরগ্রহণ" অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় হইতে বৃহৎ দ্রব্যের প্রত্যক্ষ জন্মে; তখন সেই বিষয়ের সহিত তাহার সংযোগ সম্ভব না হওয়ায় উহা বিষয়ের সহিত অসন্নিকৃষ্ট হইয়াই তাহার প্রত্যক্ষ জন্মায়, ইহাই স্বীকার্য্য। জীবের কর্ম্মফলানুসারে ঐরূপ শক্তিসম্পন্ন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয় এবং সেই শক্তিরও তারতম্য বা হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়। কিন্তু ইহা স্বীকার না করিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বহির্গমন স্বীকার করিলেও তাহার সেই বিষয়দর্শন কার্য্যে সামর্থ্য বলা যায় না। যদি সেই সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে সেই বিষয় দর্শনের জন্য চক্ষু উন্মীলন করিয়া, পরে নিমীলন করিলে তখনও সেই বিষয়ের দর্শন হইতে পারে। কারণ, উক্ত মতে পূর্ব্বে সেই চক্ষুর রশ্মি বহির্গত হইলে সেই বিষয়ের সহিত উহা পরেও সংযুক্ত থাকিবে, তাহা কেন থাকিবে না? সেই সমস্ত রশ্মিই তখন কোথায় যাইবে? তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র উক্ত বিষয়ে বৌদ্ধাচার্য্য দিঙ্‌নাগের শ্লোকদ্বয়ও উদ্ধৃত করিয়াছেন।* "ন্যায়বার্ত্তিকে" উদ্দ্যোতকর উক্ত বৌদ্ধমতের ব্যাখ্যা করিয়া বিচারপূর্ব্বক উহার খণ্ডন করিয়াছেন। পরে কুমারিল ভট্ট প্রভৃতিও উক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন।** উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠ করিলে উভয় পক্ষের কথা বুঝা যাইবে। মূলকথা, (গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ব্যতীত প্রত্যক্ষ জন্মে না। তাই মহর্ষি বলিয়াছেন,— "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং।")

(প্রাচীন ন্যায়াচার্য্য উদ্দ্যোতকর উক্ত ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষকে ছয় প্রকার বলিয়াছেন ; যথা,—(১) সংযোগ, (২) সংযুক্তসমবায়, (৩) সংযুক্তসমবেতসমবায়, (৪) সমবায়, (৫) সমবেতসমবায় ও (৬) বিশেষণবিশেষ্যভাব।) তন্মধ্যে দ্রব্য

* "সান্তরগ্রহণং ন স্যাৎ প্রাপ্তৌ জ্ঞানেঽধিকস্য চ।
অধিষ্ঠানাদ্বহির্নাক্ষং, তচ্চিকিৎসাদিযোগতঃ ॥
সত্যপি চ বহির্ভাবে ন শক্তির্বিষয়েক্ষণে।
যদি চ স্যাত্তদা পশ্যেদপ্যুন্মীল্য নিমীলনাৎ ॥"—প্রমাণসমুচ্চয়।

** "ততশ্চাপ্রাপ্যকারিত্বাদ্ যদ্বৌদ্ধৈঃ শ্রোত্রচক্ষুষোঃ।"......
"চিকিৎসাদিপ্রয়োগশ্চ যোঽধিষ্ঠানে প্রযুজ্যতে।
সোঽপি তস্যৈব সংস্কার আধেয়স্তোপকারকঃ।"
শ্লোকবার্ত্তিক, প্রত্যক্ষসূত্র, ৪০-৪৫।

পদার্থের প্রত্যক্ষে সেই দ্রব্যের সহিত সেই ইন্দ্রিয়ের সংযোগসম্বন্ধই প্রথম সন্নিকর্ষ। যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘটের প্রত্যক্ষে তাহার সহিত যথাক্রমে চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয়ের সংযোগই সন্নিকর্ষ। এবং মনের দ্বারা আত্মার প্রত্যক্ষে সেই আত্মার সহিত সেই মনের সংযোগবিশেষই সন্নিকর্ষ। কিন্তু সেই ঘটের রূপ এবং স্পর্শের প্রত্যক্ষে যথাক্রমে সেই রূপ ও স্পর্শের সহিত "চক্ষুঃসংযুক্তসমবায়" এবং "ত্বক্‌সংযুক্তসমবায়"ই দ্বিতীয় সন্নিকর্ষ এবং আত্মাতে উৎপন্ন সুখদুঃখাদি বিশেষ গুণের মানস প্রত্যক্ষে তাহার সহিত "মনঃসংযুক্ত-সমবায়"ই দ্বিতীয় সন্নিকর্ষ। কারণ, দ্রব্যপদার্থ ভিন্ন গুণাদিপদার্থে সংযোগরূপ গুণ জন্মে না। দ্রব্যপদার্থই গুণের আশ্রয় এবং অবয়ব হইতে অবয়বী দ্রব্য এবং দ্রব্য হইতে তাহার গুণ ভিন্ন পদার্থ এবং ক্রিয়া ও জাতিও তাহার আধার হইতে ভিন্ন পদার্থ, ইহাই ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। সুতরাং "সংযুক্তসমবায়" নামক দ্বিতীয় সন্নিকর্ষ স্বীকৃত হইয়াছে। দ্রব্যগত গুণবিশেষ ও ক্রিয়াবিশেষের ন্যায় জাতিবিশেষের প্রত্যক্ষেও "সংযুক্তসমবায়" নামক দ্বিতীয় সন্নিকর্ষই বুঝিতে হইবে। কিন্তু দ্রব্যপদার্থের প্রত্যক্ষে সংযোগ নামক প্রথম সন্নিকর্ষই স্বীকার্য্য। "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি"র প্রকাশ টীকায় বর্দ্ধমান উপাধ্যায় উক্ত বিষয়ে বিচার করিয়া বলিয়াছেন যে, আত্মার মানস প্রত্যক্ষে যখন মনের সহিত তাহার সংযোগবিশেষকেই সন্নিকর্ষ বলিতে হইবে, কারণ, আত্মার অবয়ব না থাকায় তাহাতে মনঃসংযুক্তসমবায় সম্ভবই হয় না—তখন, সর্ব্বত্রই দ্রব্যপদার্থের প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগই সন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকার্য্য। পরে অনেকে বলিয়াছেন যে, "এসরেণু" নামক দ্রব্যের অবয়ব "দ্ব্যণুক"নামক দ্রব্যে মহৎ পরিমাণ না থাকায় তাহার সহিত চক্ষুঃসংযোগ সেই ত্রসরেণুতে চক্ষুঃসংযুক্তসমবায়রূপ দ্বিতীয় সন্নিকর্ষের প্রযোজক হয় না। কারণ, মহৎপরিমাণ-বিশিষ্ট চক্ষুঃসংযুক্ত দ্রব্যেরই কারণসত্ত্বে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। তাই পরমাণু ও দ্ব্যণুকের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু ত্রসরেণুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং ত্রসরেণুর প্রত্যক্ষের জন্যও প্রথম সন্নিকর্ষ স্বীকার্য্য। (পঞ্চম খণ্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে দ্রব্যের অবয়বরূপ দ্রব্যে সেই অবয়বী দ্রব্য সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে এবং গুণ, ক্রিয়া ও জাতিও নিজ নিজ আধারে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে। কারণ, ঐ সমস্ত পদার্থের নিজ আধার হইতে কখনও বিভাগ সম্ভব না হওয়ায় উহাদিগের সংযোগসম্বন্ধ বলা যায় না।

ঐ সমস্ত আধার ও আধারের ভেদসাধক প্রমাণ থাকায় উহাদিগের অভেদ সম্বন্ধও বলা যায় না। স্বরূপসম্বন্ধ স্বীকার করিলে অনন্ত পদার্থের সম্বন্ধত্ব কল্পনায় মহাগৌরব হয়। এইরূপ অনেক বিচার করিয়া ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায় "সমবায়" নামক এক অতিরিক্ত নিত্য সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের মতে চক্ষুঃসংযুক্ত ঘটে তাহার রূপাদি গুণ এবং ঘটত্বাদি সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকায় তাহার সহিত "চক্ষুঃসংযুক্তসমবায়" নামক দ্বিতীয় প্রকার সন্নিকর্ষ বলা যায়। এইরূপ স্পর্শের সহিত "ত্বক্‌সংযুক্তসমবায়" এবং আত্মগত সুখাদি গুণের সহিত "মনঃসংযুক্তসমবায়" দ্বিতীয় সন্নিকর্ষ বুঝিতে হইবে। কিন্তু সেই রূপস্থ রূপত্বাদি জাতি এবং স্পর্শত্বাদি জাতি এবং সুখাদিগত সুখত্বাদির জাতির প্রত্যক্ষে যথাক্রমে 'চক্ষুঃসংযুক্তসমবেতসমবায়', 'ত্বক্‌সংযুক্তসমবেতসমবায়' এবং 'মনঃসংযুক্তসমবেতসমবায়' তৃতীয় প্রকার সন্নিকর্ষ। যাহা সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান, তাহাকে বলে "সমবেত"। যেমন চক্ষুঃসংযুক্ত ঘটাদি দ্রব্যে যে রূপাদি গুণ সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাহা চক্ষুসংযুক্তসমবেত। সুতরাং সেই রূপাদি গুণে যে রূপত্বাদি জাতি সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাহাতে "চঃক্ষুসংযুক্তসমবেতসমবায়" সম্বন্ধ বলা যায়। এইরূপ ত্বগিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধেও "ত্বকসংযুক্তসমবেতসমবায়" এবং মনের সম্বন্ধে "মনঃসংযুক্তসমবেতসমবায়" তৃতীয় সন্নিকর্ষ বুঝিতে হইবে এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। এ বিষয়ে বৈশেষিকদর্শনের অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে কণাদের সূত্র দ্রষ্টব্য।

শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষে সেই শ্রবণেন্দ্রিয়ে উৎপন্ন সেই শব্দের সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের "সমবায়" নামক চতুর্থ সন্নিকর্ষ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই শব্দগত শব্দত্বাদি জাতিবিশেষেরও প্রত্যক্ষ জন্মে। কারণ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারাই সেই শব্দের মন্দত্ব ও তীব্রত্বাদি জাতিবিশেষ বুঝা যায়। কিন্তু তাহার সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সমবায় সম্বন্ধ নাই। কারণ, সেই শব্দত্বাদি জাতি সেই শব্দেই সমবেত অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে থাকে। সুতরাং তাহার সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের "সমবেতসমবায়" সম্বন্ধই পঞ্চম সন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রবণেন্দ্রিয়ে যে শব্দ সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান, তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়সমবেত। তাহাতে শব্দত্বাদি জাতি সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকায় তাহার সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের "সমবেতসমবায়"রূপ সন্নিকর্ষ বলা যায়। ফলকথা, শ্রবণেন্দ্রিয়রূপ আকাশে উৎপন্ন হইয়া সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান শব্দে শব্দত্বাদি

জাতির যে সমবায় সম্বন্ধ, তাহাই "সমবেতসমবায়" নামে পঞ্চম সন্নিকর্ষ কথিত হইয়াছে।*

কিন্তু 'সমবায়' নামক সম্বন্ধ এবং অভাব পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্বোক্ত সংযোগাদি সম্বন্ধ সম্ভব হয় না। তাই উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন,—"সমবায়ে চাভাবে চ বিশেষণবিশেষ্যভাবাৎ।" পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণ উহারই ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, সমবায় সম্বন্ধ এবং অভাব পদার্থের প্রত্যক্ষে 'বিশেষণতা' নামক সন্নিকর্ষ। কিন্তু উহাও ইন্দ্রিয়সম্বন্ধবিশেষণতা প্রভৃতিই বুঝিতে হইবে। যেমন "চক্ষুঃসংযুক্তবিশেষণতা", "চক্ষুঃসংযুক্তসমবেতবিশেষণতা", "সমবেত-বিশেষণতা" ইত্যাদি। "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি"র প্রকাশ টীকায় (৪৬৪ পৃঃ) বর্দ্ধমান উপাধ্যায় উক্তরূপেই প্রাচীন সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উক্ত 'বিশেষণতা' সম্বন্ধ নানাপ্রকার হইলেও বিশেষণতাত্বরূপে উহা একই, এই তাৎপর্য্যে উহাকে ষষ্ঠ সন্নিকর্ষ বলা হইয়াছে। কিন্তু উহা স্বরূপসম্বন্ধ অর্থাৎ "সমবায়"সম্বন্ধের ন্যায় অতিরিক্ত কোন সম্বন্ধ নহে। সমবায়সম্বন্ধ যে স্থানে থাকে, তাহাও ঐ স্বস্বরূপ সম্বন্ধেই থাকে। অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধের আর পৃথক্ সম্বন্ধ নাই। কারণ, তাহা স্বীকার করিতে গেলে সেই সম্বন্ধের অপর সম্বন্ধ এবং তাহারও অপর সম্বন্ধ প্রভৃতি অনন্ত সম্বন্ধ স্বীকারে 'অনবস্থা' দোষ হয়। তাই কথিত হইয়াছে,—"সমবায়স্যাপি স্বাত্মক এব স্বরূপসম্বন্ধঃ"। যেমন ঘটে ঘটত্বাদি জাতি ও তাহার রূপাদিগুণ সমবায়সম্বন্ধে থাকায় সেই সমবায়সম্বন্ধ তাহাতে বিশেষণতা অর্থাৎ স্বস্বরূপ সম্বন্ধেই থাকে। সুতরাং চক্ষুঃসংযুক্ত সেই ঘটে ঘটত্বের সমবায়সম্বন্ধের প্রত্যক্ষে 'চক্ষুঃসংযুক্তবিশেষণতা'ই ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ। এবং সেই ঘটের রূপে রূপত্ব জাতির সমবায়সম্বন্ধের প্রত্যক্ষে 'চক্ষুঃসংযুক্তসমবেত-

---

* ভাষাপরিচ্ছেদের শেষে বিশ্বনাথ বলিয়াছেন,—"কদম্বগোলকন্যায়াদুৎপত্তিঃ কস্যচিন্মতে"। কিন্তু উদ্দ্যোতকর কদম্বগোলকন্যায়ে শব্দের উৎপত্তি বলায় উহাই নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের প্রাচীন মত বুঝা যায়। বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ বীচিতরঙ্গন্যায়ে শব্দের উৎপত্তি বলিয়াছেন। "পরিশুদ্ধি" টীকাকার উদয়নাচার্য্যও তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু মীমাংসকসম্প্রদায়ের মতে বর্ণাত্মক শব্দ নিত্য, উহার অভিব্যক্তিই হয়, উৎপত্তি হয় না। কুমারিল ভট্ট শব্দকে বিভু দ্রব্যপদার্থ বলিয়া সমর্থন করায় তাঁহার মতে শব্দের প্রত্যক্ষে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সংযোগই সন্নিকর্ষ। তিনি সমবায় সম্বন্ধ অস্বীকার করায় এবং দ্রব্য ও গুণাদির তাদাত্ম্য বা অভেদ স্বীকার করায় তাঁহার মতে সংযোগ, "সংযুক্ততাদাত্ম্য" এবং "সংযুক্ততাদাত্ম্যতাদাত্ম্য" এই ত্রিবিধ সন্নিকর্ষ ("মানমেয়োদয়" দ্রষ্টব্য)। বৈদান্তিকমতেও উক্ত ত্রিবিধ সন্নিকর্ষ। কিন্তু গুরু প্রভাকরের মতে সংযোগ, সংযুক্তসমবায় ও সমবায়, এই ত্রিবিধ সন্নিকর্ষ। "রত্নকোষ"কারের মতে সংযোগ ও বিশেষণতা, এই দুই প্রকারই সন্নিকর্ষ (তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি-প্রকাশ, ৪৬৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

বিশেষণতা'ই সন্নিকর্ষ। এইরূপ অন্যত্রও সমবায়সম্বন্ধের প্রত্যক্ষে উক্তরূপে 'বিশেষণতা' সম্বন্ধই সন্নিকর্ষ বুঝিতে হইবে। "প্রত্যক্ষং সমবায়স্য বিশেষণতয়া ভবেৎ।"—ভাষাপরিচ্ছেদ।

এইরূপ কোন স্থানে কোন অভাব পদার্থের প্রত্যক্ষেও উক্তরূপে 'বিশেষণতা' সম্বন্ধই সন্নিকর্ষ ("বিশেষণতয়া তদ্বদভাবানাং গ্রহো ভবেৎ।"—ভাষাপঃ)। যেমন চক্ষুঃসংযুক্ত ভূতলে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হইলে চক্ষুঃসংযুক্তবিশেষণতাই সেই প্রত্যক্ষের জনক সন্নিকর্ষ। সেখানে চক্ষুঃসংযুক্ত সেই ভূতলে 'বিশেষণতা' নামক সম্বন্ধেই ঘটাভাব বিদ্যমান থাকে। ঐ "বিশেষণতা" সম্বন্ধ স্বরূপসম্বন্ধ নামেও কথিত হইয়াছে। কারণ, সেই অভাবীয় বিশেষণতা সেখানে তৎকালীন সেই ভূতলস্বরূপই, উহা সমবায়সম্বন্ধের ন্যায় অতিরিক্ত কোন সম্বন্ধ নহে।* কোন মতে উহা বিশেষ্য ও বিশেষণস্বরূপ। যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলে ঐ 'বিশেষণতা' সম্বন্ধ সেই অভাব প্রত্যক্ষের বিশেষ্য ভূতল ও বিশেষণ অভাব, এই উভয়স্বরূপ। তাই উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন,—"বিশেষণবিশেষ্যভাবাৎ।" বৈশেষিক দর্শনের (৯।১।১ম সূত্র) "উপস্কারে" শঙ্কর মিশ্রও ঐরূপ প্রাচীন সিদ্ধান্তই বলিয়াছেন।

সে যাহা হউক, ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত ষড়্বিধ সন্নিকর্ষবাদই ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের প্রাচীন প্রসিদ্ধ মত এবং তাঁহাদিগের মতে উক্ত ষড়্বিধ সন্নিকর্ষ সংগ্রহের জন্যই মহর্ষি অন্য কোন শব্দের প্রয়োগ না করিয়া "সন্নিকর্ষ' শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন।** প্রাচীন কালে উক্ত মতের বিরুদ্ধে বহু বিচার হইয়াছে। পরে "তত্ত্বচিন্তামণি"কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রত্যক্ষ খণ্ডে "সন্নিকর্ষবাদ" গ্রন্থে বহু

---

* ভাট্ট সম্প্রদায় অভাবপদার্থের "বৈশিষ্ট্য" নামক সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন এবং উহা তাঁহাদিগের মতে অতিরিক্ত পদার্থ। নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণিও অভাবের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিয়াও "পদার্থতত্ত্বনিরূপণ" গ্রন্থে নিজমত বলিয়াছেন,—"বৈশিষ্ট্যমপি পদার্থান্তরং" ইত্যাদি (৭৬ পৃঃ)। কিন্তু তৎপূর্ব্বে গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি উক্ত মতের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। শিরোমণির পরে বিশ্বনাথও "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী"তে উক্ত মতের খণ্ডন করিতে সংক্ষেপে বলিয়াছেন যে, উক্ত "বৈশিষ্ট্য" নামক অতিরিক্ত সম্বন্ধকে নিত্যসম্বন্ধ বলা যায় না। সুতরাং অনিত্য সম্বন্ধ বলিতে হইলে উহার উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার্য্য হওয়ায় অতিরিক্ত অসংখ্য "বৈশিষ্ট্য" স্বীকারে উক্ত মতেই মহাগৌরব দোষ হয়। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি উক্ত গ্রন্থে ঐ সমস্ত কথার কোন উল্লেখ করেন নাই।

** "সামান্যলক্ষণ", "জ্ঞানলক্ষণ" ও "যোগজ" নামে যে ত্রিবিধ অলৌকিক সন্নিকর্ষ পরে কথিত হইয়াছে, তাহাও উক্ত "সন্নিকর্ষ" শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে, ইহাও বলা যায়। (তৃতীয় খণ্ড, ১৩২পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু "পরিশুদ্ধিপ্রকাশে" (৪৬৬ পৃঃ) বর্দ্ধমান উপাধ্যায় যোগীর যোগজ সন্নিকর্ষকেই পৃথক্ সন্নিকর্ষ বলিয়া "জ্ঞানলক্ষণ" ও "সামান্যলক্ষণ" সন্নিকর্ষকে উদ্দ্যোতকরোক্ত ষষ্ঠ সন্নিকর্ষ "বিশেষণতা"রই অন্তর্গত বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। "কণাদরহস্য" গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্রও সেই কথাই বলিয়াছেন।

সূক্ষ্ম বিচার করিয়া উক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন। "রহস্য" টীকার সহিত ঐ গ্রন্থ পাঠ করিলে উক্ত বিষয়ে বহু বিচার ও বহু জ্ঞাতব্য জানা যাইবে। গঙ্গেশ প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণ সমবায়সম্বন্ধ এবং অভাব পদার্থের সংস্থাপন করিতেও বহু বিচার করিয়া গিয়াছেন। সে সকল কথাও সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যায় না। বৈশেষিক দর্শনের সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের ষড়্‌বিংশ সূত্রের এবং নবম অধ্যায়ের প্রথম সূত্র হইতে কতিপয় সূত্রের "উপস্কার" পাঠ করিলেও উক্ত বিষয়ে অনেক কথা জানা যাইবে এবং অভাব পদার্থও যে কণাদের সম্মত, ইহা বুঝা যাইবে।

মূলকথা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সেই ইন্দ্রিয়ের যেরূপ সন্নিকর্ষ তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষজনক হয়, তাহাই ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ। (কিন্তু ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জন্য নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।" অর্থাৎ ঈশ্বরের সর্ব্ববিষয়ক প্রত্যক্ষের কোন কারণ নাই, উহাও ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য। সুতরাং সেই নিত্য প্রত্যক্ষ উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয় না। পরবর্ত্তী কালে মহর্ষি গোতমোক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণে উক্ত অব্যাপ্তি দোষেরও আশঙ্কা হইয়াছে। তাই "তত্ত্বচিন্তামণি"কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় পরে বিচারপূর্ব্বক নিত্য ও অনিত্য সমস্ত প্রত্যক্ষের এক লক্ষণ বলিয়াছেন—জ্ঞানাকরণক জ্ঞানত্ব। অর্থাৎ জ্ঞান যাহার করণ নহে, এমন জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। গঙ্গেশের মতে ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষের করণ, কোন জ্ঞান করণ নহে। সুতরাং উহা জ্ঞানাকরণক জ্ঞান। ঈশ্বরের নিত্য প্রত্যক্ষের কোনই কারণ না থাকায় তাহাও জ্ঞানাকরণক জ্ঞান। সুতরাং তাহাও উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় তাহাতে অব্যাপ্তি দোষ নাই।) বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পরে গঙ্গেশের উক্ত লক্ষণানুসারেই এই সূত্রোক্ত "ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নং" এই পদেরও উক্তরূপ তাৎপর্য্যার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (কিন্তু উক্ত পদের দ্বারা মহর্ষি যে, জন্য প্রত্যক্ষেরই লক্ষণ বলিয়াছেন, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ তাঁহার উক্ত লক্ষণের লক্ষ্যই নহে, ইহাই স্পষ্ট বুঝা যায়।) বিশ্বনাথও "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী"তেও প্রথমে ঐ কথাই বলিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বলিতে সেই প্রমাণের ফল জন্য প্রত্যক্ষের লক্ষণই মহর্ষির বক্তব্য। অবশ্য ঈশ্বরকেও প্রমাণ বলা হইয়াছে, (শিবাদিত্য মিশ্র "সপ্তপদার্থী" গ্রন্থে প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্যে ঈশ্বরেরও উল্লেখ করিয়াছেন), কিন্তু সেই "প্রমাণ" শব্দটি কর্ত্তৃবাচ্য ল্যুট্‌প্রত্যয়সিদ্ধ এবং উহার অর্থ—সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ক প্রমাবান্‌ অর্থাৎ কোন কালেই ঈশ্বরে সেই সর্ব্ববিষয়ক যথার্থ প্রত্যক্ষরূপ সর্ব্বজ্ঞতার অভাব

থাকে না। উক্তরূপ নিত্যসর্ব্বজ্ঞতাই গৌতম মতে ঈশ্বরের প্রামাণ্য। এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেই "কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন,— "তদযোগব্যবচ্ছেদঃ প্রামাণ্যং গৌতমে মতে" (৪।৫) এবং পরে সেখানে তিনিও বলিয়াছেন,—"ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নত্বস্য চ লৌকিকমাত্রবিষয়ত্বাৎ।" পরন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকমতে জ্ঞানাকরণক জ্ঞানত্বকে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলাও যায় না। কারণ, যথার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞানও হানাদিবুদ্ধিরূপ প্রত্যক্ষের করণ হয়, ইহাও স্মরণ করা আবশ্যক।

(কোন বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজন্য সুখ এবং দুঃখও উৎপন্ন হয়। তাই মহর্ষি উক্ত সূত্রে দ্বিতীয় পদ বলিয়াছেন,—"জ্ঞানং"। সুখ ও দুঃখ জ্ঞানপদার্থ নহে, এ জন্য তাহাতে ঐ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ নাই।) বৌদ্ধ সম্প্রদায় সুখদুঃখাদিকেও জ্ঞানেরই প্রকারবিশেষ বলিয়া উক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। জয়ন্ত ভট্ট ও উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি বিচারপূর্ব্বক তাঁহাদিগের যুক্তি খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জয়ন্ত ভট্ট কোন মতে ইহাও সমর্থন করিয়াছেন যে, এই সূত্রে শেষোক্ত "ব্যবসায়াত্মকং" এই পদের দ্বারাই সুখদুঃখাদির ব্যবচ্ছেদ হয়। কারণ, ব্যবসায়াত্মক বলিতে বুঝা যায়,— নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। সুতরাং সুখদুঃখাদির ব্যবচ্ছেদের জন্য পূর্ব্বে "জ্ঞানং" এই পদের উল্লেখ অনাবশ্যক। কিন্তু সূত্রে "ব্যবসায়াত্মকং" এই পদটিও পূর্ব্ববৎ বিশেষণবোধক হওয়ায় বিশেষ্যবোধক পদের প্রয়োগ করা আবশ্যক, নচেৎ সরল ভাবে ঐ বিশেষ্যভূত জ্ঞান বুঝা যায় না, এ জন্যই মহর্ষি বলিয়াছেন,— "জ্ঞানং"। কিন্তু উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি সুখদুঃখে অতিব্যাপ্তি বারণই উহার প্রয়োজন বলিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টও পূর্ব্বে 'অথবা' কল্পে ঐ কথাই বলিয়াছেন। উক্ত সূত্রে মহর্ষি তৃতীয় পদ বলিয়াছেন,—"অব্যপদেশ্যং"। অতঃপর ভাষ্যকার ঐ তৃতীয় পদের প্রয়োজন বলিতেছেন।

ভাষ্য। যাবদর্থং বৈ নামধেয়শব্দাস্তৈরর্থ-সম্প্রত্যয়ঃ, অর্থ-সম্প্রত্যয়াচ্চ ব্যবহারঃ। তত্রেদমিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাদুৎপন্নমর্থজ্ঞানং রূপমিতি বা রস ইত্যেবং বা ভবতি। রূপরসশব্দাশ্চ বিষয়নামধেয়ম্। তেন ব্যপদিশ্যতে জ্ঞানং, রূপমিতি জানীতে রস ইতি জানীতে। নামধেয়শব্দেন ব্যপদিশ্যমানং সৎ শাব্দং প্রসজ্যতে, অত আহ "অব্যপদেশ্য"মিতি।

যদিদমনুপযুক্তে শব্দার্থসম্বন্ধেঽর্থজ্ঞানং, তন্ন নামধেয়শব্দেন ব্যপদিশ্যতে। গৃহীতেঽপি চ শব্দার্থসম্বন্ধেঽস্যার্থস্যায়ং শব্দো নামধেয়মিতি। যদা তু সোঽর্থো গৃহ্যতে, তদা তৎপূর্ব্বস্মাদর্থ-জ্ঞানান্ন বিশিষ্যতে, তদর্থবিজ্ঞানং তাদৃগেব ভবতি। তস্য ত্বর্থজ্ঞানস্যান্যঃ সমাখ্যাশব্দো নাস্তি, যেন প্রতীয়মানং ব্যবহারায় কল্পেত। ন চাপ্রতীয়মানেন ব্যবহারঃ, তস্মাজ্‌জ্ঞেয়স্যার্থস্য সংজ্ঞাশব্দেনেতিকরণযুক্তেন নির্দ্দিশ্যতে রূপমিতিজ্ঞানং, রস ইতি জ্ঞানমিতি। তদেবমর্থজ্ঞানকালে স ন সমাখ্যাশব্দো ব্যাপ্রিয়তে, ব্যবহারকালে তু ব্যাপ্রিয়তে। তস্মাদশাব্দমর্থজ্ঞানমিন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নমিতি।

অনুবাদ—যতগুলি পদার্থ আছে, তাহার প্রত্যেকেরই সংজ্ঞাশব্দ অর্থাৎ বাচক শব্দ আছে, সেই সংজ্ঞাশব্দগুলির সহিতই অর্থের (বিষয়ের) সম্যক্ প্রতীতি জন্মে, অর্থের সম্যক্ প্রতীতিবশতঃই ব্যবহার হয়। তন্মধ্যে এই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজন্য উৎপন্ন অর্থজ্ঞানও 'ইহা রূপ' অথবা 'ইহা রস' এই প্রকার হয়। রূপ ও রস প্রভৃতি শব্দগুলি বিষয়ের অর্থাৎ ঐ জ্ঞানের বিষয় রূপাদি অর্থের সংজ্ঞা। সেই সংজ্ঞার দ্বারা 'রূপ ইহা জানিতেছে', 'রস ইহা জানিতেছে'—এইরূপে জ্ঞান ব্যপদিষ্ট অর্থাৎ অন্যান্য জ্ঞান হইতে বিশিষ্টরূপে কথিত হয়। সংজ্ঞা শব্দের দ্বারা ব্যপদিশ্যমান হওয়ায় (পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানও) শাব্দ প্রসক্ত হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্য উক্তরূপ জ্ঞানও রূপাদিশব্দবিষয়ক হওয়ায় শব্দজন্য হউক? এ জন্য মহর্ষি "অব্যপদেশ্যং" এই পদ বলিয়াছেন।

শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অনুপযুক্ত (অজ্ঞাত) হইলে (অর্থাৎ যাহাদিগের শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ জ্ঞান নাই, জ্ঞেয় বিষয়ের বাচক শব্দ যাহারা জানে না, তাহাদিগের) এই যে অর্থজ্ঞান, তাহা সংজ্ঞা শব্দদ্বারা ব্যপদিষ্ট হয় না। আর শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ গৃহীত হইলেও অর্থাৎ যাহাদিগের শব্দার্থসম্বন্ধজ্ঞান আছে, তাহাদিগেরও এই শব্দটি এই অর্থের নাম, এই জ্ঞান জন্মে অর্থাৎ তাহাদিগেরও অর্থের জ্ঞান সেই শব্দবিষয়ক হয় না। কিন্তু যে সময়ে সেই অর্থ (বিষয়) জ্ঞাত হয়, তখন সেই জ্ঞান পূর্ব্বোক্ত অর্থজ্ঞান হইতে অর্থাৎ শব্দার্থসম্বন্ধজ্ঞানশূন্য বালক প্রভৃতির জ্ঞান হইতে বিশিষ্ট হয় না, সেই অর্থজ্ঞান তাদৃশই হয়। কিন্তু

সেই অর্থজ্ঞানের সম্বন্ধে অন্য সংজ্ঞা শব্দ নাই, যদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইয়া তাহা ব্যবহারের নিমিত্ত সমর্থ হইতে পারে, অপ্রতীয়মান পদার্থের দ্বারাও ব্যবহার হয় না। অতএব জ্ঞেয় বিষয়ের "ইতি" শব্দযুক্ত সংজ্ঞা শব্দের দ্বারা (সেই অর্থজ্ঞান) কথিত হয় (যেমন) 'রূপং ইতি জ্ঞানং', 'রস ইতি জ্ঞানং' (অর্থাৎ 'রূপ' শব্দের দ্বারা রূপজ্ঞানকে এবং 'রস' শব্দের দ্বারা রসজ্ঞানকে প্রকাশ করা হয়), সুতরাং এইরূপ হইলে অর্থজ্ঞানকালে সেই সংজ্ঞা শব্দ ব্যাপারবিশিষ্ট হয় না, কিন্তু ব্যবহারকালে (অপরকে বুঝাইবার সময়ে) ব্যাপারবিশিষ্ট হয় [অর্থাৎ কোন অর্থজ্ঞানে সেই অর্থের বাচক শব্দ বিষয় হয় না, কিন্তু কিরূপ অর্থজ্ঞান হইয়াছে, ইহা অপরকে বুঝাইতে হইলে তখন উহার অন্য কোন সংজ্ঞা শব্দ না থাকায় সেই অর্থবাচক শব্দেরই প্রয়োগ করিতে হয়] অতএব ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্ন অর্থজ্ঞান শাব্দ নহে, অর্থাৎ শব্দবিষয়ক না হওয়ায় শব্দজন্য নহে।

টিপ্পনী—ভাষ্যকার প্রথমে পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,—"**যাবদর্থং বৈ নামধেয়শব্দাঃ।**" 'যাবন্তোঽর্থাঃ' এইরূপ বিগ্রহে "যাবদর্থং" এই পদটি সাকল্য অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস। "বৈ" শব্দের অর্থ অবধারণ। "যাবদর্থং বৈ" যাবদর্থমেব। অর্থাৎ জগতে যত পদার্থ আছে, তাহার প্রত্যেকেরই বাচক শব্দ আছে। সেই সমস্ত শব্দের সহিত তাহার অর্থের সম্যক্ প্রতীতি হওয়ায় তদ্দ্বারা ব্যবহার চলিতেছে। রূপাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজন্য যে রূপজ্ঞান ও রসজ্ঞান প্রভৃতি জন্মে, তাহা সেই বিষয়ের নাম যে রূপ ও রস প্রভৃতি শব্দ, তদ্দ্বারাই ব্যপদিষ্ট অর্থাৎ কথিত হয়। যেমন রূপের জ্ঞান হইলে "রূপ" শব্দের উল্লেখপূর্ব্বক 'রূপ ইহা জানিতেছে', ইহাই বলা হয় এবং রসের জ্ঞান হইলে "রস" শব্দের উল্লেখপূর্ব্বক 'রস ইহা জানিতেছে,' ইহাই বলা হয়। এইরূপ সর্ব্বত্রই জ্ঞানের বিষয়বাচক শব্দের দ্বারাই সেই জ্ঞানের ব্যপদেশ হওয়ায় সেই সমস্ত শব্দও যে, সেই জ্ঞানের বিষয় হয়, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, জ্ঞানের বিষয়ই তাহার অন্য জ্ঞান হইতে বিশেষক হইয়া থাকে। রূপাদি শব্দ ঐ সমস্ত জ্ঞানের বিষয় না হইলে তদ্দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের উক্তরূপে ব্যপদেশ হইতে পারে না। সুতরাং ঐ সমস্ত রূপাদি জ্ঞান সেই রূপাদি শব্দবিষয়ক হওয়ায় উহা সেই সমস্ত শব্দজন্য, সুতরাং শাব্দ জ্ঞান, ইহা স্বীকার করিতে হয়। —এ জন্য মহর্ষি বলিয়াছেন,—"**অব্যপদেশ্যং**"। ভাষ্যকার মহর্ষির সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিতে পরে "**যদিদং**" ইত্যাদি ভাষ্যসন্দর্ভের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত যুক্তির খণ্ডনপূর্ব্বক উপসংহারে বলিয়াছেন,—"**তস্মাদশাব্দমর্থ-**

জ্ঞানমিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নমিতি"। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্য যে রূপাদিজ্ঞান, তাহা শাব্দজ্ঞান নহে, কিন্তু প্রত্যক্ষ। ঐ সমস্ত জ্ঞানে রূপাদি শব্দ বিষয় হয় না।)

তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যসন্দর্ভের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সমস্ত পদার্থই সর্ব্বদা সর্ব্বথা নামান্বিত। এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা কখনও কোনরূপে নামশূন্য হয়। ভাষ্যকার ঐ কথার দ্বারা পদার্থ ও তাহার নামের অর্থাৎ বাচ্য অর্থ ও বাচক শব্দের অভেদই সাধ্যরূপে প্রকাশ করিয়া, উহার সাধক হেতু প্রকাশ করিবার জন্য বলিয়াছেন—"তৈরর্থসংপ্রত্যয়ঃ।" অর্থাৎ যেহেতু 'গো' প্রভৃতি শব্দের সহিত অভিন্ন রূপেই গো প্রভৃতি অর্থের সম্যক্ প্রতীতি হয়,—কারণ, 'গো এই অর্থ', 'অশ্ব এই অর্থ' ইত্যাদিরূপে শব্দ ও অর্থের অভেদই প্রতীত হয়, অতএব শব্দ ও অর্থ অভিন্ন। কিন্তু যদি ঐরূপ প্রতীতি ভ্রমাত্মক হয়, তাহা হইলে উহার দ্বারা শব্দ ও অর্থের বাস্তব অভেদ সিদ্ধ হয় না। এ জন্য পরে বলিয়াছেন,—"অর্থসম্প্রত্যয়াচ্চ ব্যবহারঃ।"—অর্থাৎ উক্তরূপ প্রতীতিবশতঃ যখন ব্যবহার চলিতেছে, তখন উহাকে ভ্রম বলা যায় না। তাৎপর্য্য এই যে, সুচিরকাল হইতেই ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিগণ গো প্রভৃতি অর্থের জ্ঞান হইলে উহার বাচক সেই "গো" প্রভৃতি শব্দকে গ্রহণ করিয়াই "গো এই অর্থ" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। কিন্তু শব্দ ও অর্থের বাস্তব অভেদ ব্যতীত ঐরূপ ব্যবহার হইতে পারে না। উক্তরূপ অভেদ জ্ঞানের ভ্রমত্বনিশ্চায়ক কোন প্রমাণও নাই।

ভাষ্যকার পরে প্রকৃত স্থলে ইহার যোজনা করিতে বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্য যে রূপাদিজ্ঞান, তাহাও 'রূপ এই জ্ঞান' এবং 'রস এই জ্ঞান' ইত্যাদিরূপে সেই রূপাদি অর্থের সহিত অভিন্ন ভাবেই হয়। তাহা হইলেই বা কি হয়? এজন্য পরে বলিয়াছেন যে, রূপ ও রস প্রভৃতি শব্দগুলি সেই সমস্ত বিষয়ের নাম। তাহাতেই বা কি সিদ্ধ হয়? এ জন্য পরে বলিয়াছেন যে, সেই সমস্ত শব্দবিশেষের দ্বারাই সেই সমস্ত জ্ঞানবিশেষের ব্যপদেশ হয়। সে কিরূপ ব্যপদেশ? তাই ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—"রূপমিতি জানীতে রস ইতি জানীতে"। অর্থাৎ কাহারও রূপের জ্ঞান হইলে 'রূপ ইহা জানিতেছে' এবং রসের জ্ঞান হইলে 'রস ইহা জানিতেছে', এইরূপে সেই জ্ঞানের নামকরণ হয়। সুতরাং রূপাদি শব্দের দ্বারাই যখন ঐ সমস্ত জ্ঞানের ব্যপদেশ হয়, তখন উহা শাব্দজ্ঞান। ভাষ্যকার উক্ত মতানুসারেই

বলিয়াছেন,—**"শাব্দং প্রসজ্যতেঽত আহ অব্যপদেশ্যমিতি।"** "শাব্দ" বলিতে এখানে শব্দপ্রমাণজন্য নহে, কিন্তু "শব্দে জাতং শাব্দং" অর্থাৎ শব্দবিষয়ক হওয়ায় শব্দজন্য। তাই বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন,—"শব্দশ্চাস্য বিষয়ত্বেন জনকোঽর্থতাদাত্ম্যাৎ।" অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ অভিন্ন বলিয়া অর্থবিষয়ক যে জ্ঞান তাহাতে শব্দও বিষয় হওয়ায় বিষয়রূপে শব্দও তাহার জনক, সুতরাং উহা শব্দজন্য বলিয়া শাব্দ। ফলকথা, উক্ত মতে সমস্ত জ্ঞানই শব্দানুবিদ্ধ, "ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে।" অর্থাৎ এমন কোন জ্ঞান নাই, যাহা শব্দবিষয়ক হয় না, সুতরাং নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ নাই। কারণ, সমস্ত জ্ঞানেই যখন তাহার বিষয়বাচক শব্দ বিশেষণরূপে বিষয় হইবেই, তখন নির্ব্বিকল্পক অর্থাৎ অবশিষ্ট জ্ঞান সম্ভবই নহে। এই মতে বালক এবং মূক প্রভৃতিরও অনাদিশব্দসংস্কারবশতঃ সমস্ত জ্ঞানই শব্দানুবিদ্ধই হয়। পূর্ব্বে শব্দভাবনা ব্যতীত কাহারও শব্দের উচ্চারণও হইতে পারে না। বাচস্পতি মিশ্র এখানে উক্ত মতের ব্যাখ্যা করিতে শাব্দিকশিরোমণি ভর্ত্তৃহরির কারিকাদ্বয়ও উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, * এই সূত্রে "অব্যপদেশ্যং" এই পদের দ্বারা উক্ত মতের খণ্ডনই সূচিত হইয়াছে। কারণ, উক্ত "অব্যপদেশ্য" শব্দের অর্থ "আলোচন" অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। "ব্যপদেশ্য" শব্দের অর্থ —বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্য। যে প্রত্যক্ষে সেই ব্যপদেশ্য নাই, তাহা অব্যপদেশ্য। যাহা বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্যবিষয়ক নহে, কিন্তু বস্তুর স্বরূপমাত্র-জ্ঞান, সেই অবশিষ্ট প্রত্যক্ষই নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ, উহা অবশ্য স্বীকার্য্য। মহর্ষি উক্ত পদের দ্বারা প্রত্যক্ষের ঐ প্রকার ভেদই বলিয়াছেন।

ভাষ্যকার মহর্ষির সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য পূর্ব্বোক্ত মতের খণ্ডন করিতে পরেই বলিয়াছেন,—**"যদিদমনুপযুক্তে শব্দার্থসম্বন্ধেঽর্থজ্ঞানং তন্ন নামধেয়-শব্দেন ব্যপদিশ্যতে।"** বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে এখানে বলিয়াছেন যে, রূপাদি অর্থকে যে শব্দাত্মক বলা হইয়াছে, তাহা কি

* তথাচ নাবিকল্পকং শব্দরহিতমস্তীতি তাৎপর্য্যার্থঃ। তথাচাহুঃ—"ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে। অনুবিদ্ধমিব জ্ঞানং সর্ব্বং শব্দেন গম্যতে॥"—(বাক্যপদীয়)। "বালমূকাদীনামপি বিজ্ঞানং শব্দানুব্যাধবদেবানাদিশব্দভাবনাবশাৎ। যদবোচৎ "আন্তঃ করণ-বিন্যাসঃ প্রাণস্যোর্দ্ধ্বং সমীরণং। স্থানানামভিঘাতশ্চ ন বিনা শব্দভাবনাং॥" ইতি (বাক্যপদীয়)। "তদস্য নিরাকরণং লক্ষণগতেন আলোচনজ্ঞানাবরোধার্থেনাব্যপদেশ্যপদেন সূচিতমিতি।"—তাৎপর্য্যটীকা।

নিত্যস্ফোটরূপ শব্দব্রহ্মাত্মক * অথবা শ্রূয়মাণ শব্দবিশেষাত্মক? ইহা বলা আবশ্যক, কিন্তু উহার কোন পক্ষই বলা যায় না। কারণ, স্ফোটবাদীর সম্মত সেই স্ফোটরূপ শব্দব্রহ্ম এবং রূপাদি অর্থ যে তত্ত্বতঃ অভিন্ন, ইহা লৌকিক ব্যক্তিগণ কখনই বুঝেন না ও বুঝিতে পারেন না। আর দ্বিতীয়পক্ষে শ্রূয়মাণ বর্ণাত্মক শব্দ ও তাহার অর্থ যে অভিন্ন, ইহাও প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, বালক ও মূক প্রভৃতি অব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদিগের যে রূপাদিজ্ঞান, তাহা সেই রূপাদি শব্দের দ্বারা ব্যপদিষ্ট হয় না। কারণ, যাহারা সেই সমস্ত শব্দ জানে না, অথবা উচ্চারণ করিতে পারে না, তাহাদিগেরও সেই সমস্ত অর্থজ্ঞান যে, সেই সমস্ত শব্দবিষয়ক হয়, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত মতের খণ্ডন করিতে বহু বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন যে, শব্দ ও অর্থ অভিন্ন হইলে অন্ধ ব্যক্তিও শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দাত্মক রূপের প্রত্যক্ষ করে এবং বধির ব্যক্তিও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থাত্মক রূপ শব্দের প্রত্যক্ষ করে, ইহাও স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তাহা কখনই স্বীকার করা যায় না। সুতরাং শব্দ ও অর্থ যে বস্তুতঃ অভিন্ন, ইহার বহু বাধক আছে এবং উহার সাধক প্রমাণও নাই। সুতরাং অব্যুৎপন্ন বালক প্রভৃতির রূপাদি বিষয়ে শব্দরহিত নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়, ইহা স্বীকার্য্য।

পরন্তু যাঁহাদিগের শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধজ্ঞান জন্মে, সেই সমস্ত ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদিগেরও সেই সমস্ত জ্ঞান শব্দবিষয়ক হয় না। কিন্তু তাঁহাদিগেরও পদার্থজ্ঞানের পরে এই শব্দটি এই পদার্থের নাম, এইরূপ জ্ঞানই জন্মে। অর্থাৎ পরে তাঁহাদিগের সেই পদার্থের সংজ্ঞাশব্দের স্মরণই জন্মে, কিন্তু পূর্ব্বোৎপন্ন সেই অর্থের জ্ঞান সেই শব্দবিষয়ক হয় না। পূর্ব্বোৎপন্ন সেই অর্থজ্ঞানই সেই সংজ্ঞার স্মারক হইয়া থাকে। সুতরাং সেই সমস্ত ব্যুৎপন্নদিগেরও সেই

* স্ফোটবাদী পতঞ্জলির মহাভাষ্যের দ্বারা তাঁহার মতে শব্দ ও অর্থ যে, তত্ত্বতঃ অভিন্ন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। ভর্ত্তৃহরির বাক্যপদীয় গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে "বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন" এই স্থলে বিবর্ত্ততে পরিণমতে, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া প্রাচীনকালে কেহ কেহ শব্দব্রহ্মের পরিণামবাদই ভর্ত্তৃহরির মত বলিতেন, ইহা কোন কোন গ্রন্থের দ্বারা জানা যায়। তাহা হইলে উক্ত মতে পরিণামী শব্দব্রহ্ম ও তাঁহার পরিণাম অর্থ অভিন্ন, ইহা সহজেই বলা যায়। কিন্তু ভর্ত্তৃহরির "বিবর্ত্ততে" এই পদের দ্বারা শব্দব্রহ্মের বিবর্ত্তবাদই যে, তাঁহার সম্মত, ইহাই বহুসম্মত ও প্রসিদ্ধ। বাচস্পতি মিশ্র ও জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি নানা প্রকারে শব্দব্রহ্মবাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য স্পষ্ট ভাষায় উহাকে নিষ্প্রমাণ বলিয়াছেন। কিন্তু উহাও সমর্থিত সুপ্রাচীন মত।

অর্থবিষয়ে নামরহিত অর্থাৎ শব্দাবিষয়ক নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"তৎপূর্ব্বস্মাদর্থজ্ঞানান্ন বিশিষ্যতে"। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বালকাদি অব্যুৎপন্নদিগের সেই অর্থজ্ঞান হইতে ব্যুৎপন্নদিগের অর্থজ্ঞান বিশিষ্ট হয় না, "তদর্থবিজ্ঞানং তাদৃগেব ভবতি"—অর্থাৎ ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদিগের জ্ঞানতুল্যই হয়। ফলকথা, অব্যুৎপন্ন ও ব্যুৎপন্ন সকলেরই প্রথমে নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জন্মে, এবং উহাই পরে সে বিষয়ে সবিকল্পক প্রত্যক্ষের কারণ হয়, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু সেই সবিকল্পক প্রত্যক্ষও তাহার বিষয়ের নামবিষয়ক হয় না।

আশঙ্কা হইতে পারে যে, কোন বিষয়ে কোন জ্ঞান উৎপন্ন হইলে যখন অপরকে তাহা বুঝাইতে হয়, তখন সেই জ্ঞাত পদার্থের নামের দ্বারাই তাহা বুঝাইতে হয়, অর্থাৎ রূপ এই জ্ঞান, রস এই জ্ঞান, এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াই অপরকে তাহা বুঝান হয়। সুতরাং উৎপন্ন সেই জ্ঞান যে, সেই পদার্থাকার ও সেই সংজ্ঞাকার, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু সেই জ্ঞাত পদার্থ ও তাহার সংজ্ঞাশব্দ অভিন্ন না হইলে সেই জ্ঞান সেই সংজ্ঞাকার হইতে পারে না, সেই সংজ্ঞাশব্দের দ্বারাই সেই জ্ঞানের নির্দ্দেশ হইতে পারে না। সুতরাং সেই জ্ঞান যে, সেই সংজ্ঞাবিষয়ক, ইহা স্বীকার্য্য। ভাষ্যকার এতদুত্তরে পরে বলিয়াছেন,—"তস্য ত্বর্থজ্ঞানস্যান্যঃ সমাখ্যাশব্দো নাস্তি" ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে, সেই অর্থ জ্ঞানের পরিচায়ক অন্য কোন সংজ্ঞাশব্দ না থাকায় সেই অর্থের বাচক সংজ্ঞাশব্দকে 'ইতি' শব্দযুক্ত করিয়া 'রূপং ইতি', 'রস ইতি' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারাই তাহা প্রকাশ করিতে হয়। অর্থাৎ কিরূপ জ্ঞান হইয়াছে, ইহা অপরকে বুঝাইতে হইলে তখন 'রূপ এই জ্ঞান', 'রস এই জ্ঞান', এইরূপ বাক্য বলিতে হয়। সুতরাং পরে উক্তরূপ ব্যবহারকালেই সেই সংজ্ঞাশব্দের ব্যাপার হয়, কিন্তু তৎপূর্ব্বে অর্থজ্ঞানকালে সংজ্ঞাশব্দের কোন ব্যাপার নাই। সেই জ্ঞানে সেই সংজ্ঞাশব্দ বিষয় হয় না। সুতরাং ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন অর্থজ্ঞান শাব্দ নহে।

মহর্ষি গোতমের প্রত্যক্ষ-লক্ষণসূত্রে "অব্যপদেশ্যং" এই পদের প্রয়োজন বিষয়ে প্রাচীন কালে বহু বিচার ও নানা মতভেদ হইয়াছে, ইহা "ন্যায়মঞ্জরী"কার বহুবিজ্ঞ জয়ন্ত ভট্টের সমালোচনার দ্বারা বুঝা যায়। সে সমস্ত কথাও অবশ্য জ্ঞাতব্য ও বিশেষরূপে বিবেচ্য। সুতরাং এখানে সংক্ষেপে তাহাও কিছু লিখিত হইতেছে। জয়ন্ত ভট্ট প্রথমে বৃদ্ধ নৈয়ায়িকগণের ব্যাখ্যাবিশেষের

উল্লেখ করিয়া বিচারপূর্ব্বক উহাকে অপব্যাখ্যাই বলিয়াছেন। কিন্তু ঐ বৃদ্ধ নৈয়ায়িকগণের কোন পরিচয় তিনি বলেন নাই। তবে সেখানে ভাষ্যকারও তাঁহার বুদ্ধিস্থ হইতে পারেন। (জয়ন্ত ভট্ট পরেই উক্ত বিষয়ে আচার্য্যমত বলিয়াছেন যে, কোন স্থলে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ এবং শব্দ, এই উভয়জন্য যে জ্ঞান জন্মে, তাহা প্রত্যক্ষ নহে, কিন্তু উহা শাব্দজ্ঞান। সুতরাং সেই শাব্দজ্ঞানে প্রত্যক্ষলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ বারণের জন্যই মহর্ষি এই সূত্রে "অব্যপদেশ্যঃ" তৃতীয় পদ বলিয়াছেন।) কিন্তু জয়ন্ত ভট্টের কথিত ঐ "আচার্য্য"শব্দের দ্বারা বাচস্পতি মিশ্রকে বুঝা যায় না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত আচার্য্যমত বাচস্পতি মিশ্রের সম্মত নহে। পরে ইহা বুঝা যাইবে।* পূর্ব্বোক্ত সূত্রে "অব্যপদেশ্যং" এই পদের প্রয়োজন বিষয়ে উদয়নাচার্য্যও বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যাই সমর্থন করিয়াছেন।

কিন্তু প্রশস্তপাদ ভাষ্যে (১৮৭ পৃঃ) প্রত্যক্ষ প্রমাণের ব্যাখ্যায় "অব্যপদেশ্যং" এই পদের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিতে উদয়নাচার্য্য এবং শ্রীধর ভট্টও একই যুক্তির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি পূর্ব্বে গো দেখে নাই, তাহার প্রথমে কোন গোর সহিত চক্ষুঃসন্নিকর্ষ হইলে তজ্জন্য তখন গোত্বরূপে গোর প্রত্যক্ষ জন্মে না। পরে সেখানে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি 'অয়ং গৌঃ' এইরূপ বাক্য বলিলে সেই বাক্য শ্রবণের পরেই গোত্বরূপে সেই গোর জ্ঞান জন্মে। কিন্তু সেই জ্ঞানে তাহার চক্ষুঃসন্নিকর্ষ কারণ হইলেও উহা প্রত্যক্ষ নহে, উহা শব্দ-প্রমাণজন্য শাব্দজ্ঞান। কারণ, সেখানে পরে সেই শ্রুত বাক্যই সেই জ্ঞানের সাধকতম বলিয়া করণ হওয়ায় উহাই প্রমাণ হইবে। সুতরাং উক্তরূপ জ্ঞান

* জয়ন্ত ভট্ট পূর্ব্বেও (৬৬ পৃঃ) "অত্রাচার্য্যাস্তাবদাচক্ষতে" ইত্যাদি সন্দর্ভে যে আচার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র, ইহাই অনেকে লিখিয়াছেন। কাশী চৌখাম্বা হইতে পরে প্রকাশিত "ন্যায়মঞ্জরী" গ্রন্থে (৬২ পৃঃ) উক্ত স্থলে নিম্নে তাৎপর্য্যটীকার সন্দর্ভও উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু বুঝা আবশ্যক যে, বাচস্পতি মিশ্র সেখানে নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষকেও প্রমাণ বলিয়াছেন। (পূর্ব্ব ৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) কিন্তু উক্ত স্থলে জয়ন্ত ভট্ট আচার্য্যমতের ব্যাখ্যা করিতে লিখিয়াছেন,—"ন বয়ং প্রথমালোচনজ্ঞানস্য উপাদানাদিষু প্রমাণতাং ক্রমঃ"। আরও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, পূর্ব্বোক্ত আচার্য্যমতের ব্যাখ্যায় জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন, "ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদিসামগ্রীস্বভাবস্য প্রত্যক্ষস্য প্রমাণস্য ফলমেব"। সুতরাং উক্ত আচার্য্য যে, জয়ন্ত ভট্টেরই গুরুসম্প্রদায়ের কোন প্রসিদ্ধ আচার্য্য, ইহাই বুঝা যায়। কারণ, ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ প্রভৃতি প্রত্যক্ষের সমগ্র কারণই যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহা বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতির মত নহে। জয়ন্ত ভট্টই উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন।

সেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফলে নহে। কিন্তু উক্তরূপ যথার্থ জ্ঞানও ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ জন্য বলিয়া প্রত্যক্ষলক্ষণাক্রান্ত হয়, এ জন্য প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন,—"অব্যপদেশ্যং"। সংজ্ঞাশব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ হইলে তজ্জন্য যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে বলে ব্যপদেশ্য; যাহা ব্যপদেশ্য নহে, তাহা অব্যপদেশ্য অর্থাৎ শব্দাজন্য। "ব্যপদেশে ভবং ব্যপদেশ্যং, ন ব্যপদেশ্যমব্যপদেশ্যং শব্দাজন্যং" ("ন্যায়কন্দলী", ১৯৯ পৃঃ)।

প্রাচীন ন্যায়াচার্য্য উদ্দ্যোতকরও শাব্দজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি বারণই গোতমের প্রত্যক্ষ সূত্রে "অব্যপদেশ্যং" এই পদের প্রয়োজন বলিয়াছেন। তাহা হইলে তিনিও যে, পূর্ব্বোক্তরূপ স্থলেই ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ও শব্দজন্য উক্তরূপ জ্ঞানকে শাব্দজ্ঞানই স্বীকার করিয়া ঐ কথা বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু 'তাৎপর্য্যটীকা'কার বাচস্পতি মিশ্র ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ও শব্দ, এই উভয়জন্য কোন শাব্দজ্ঞান স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে পূর্ব্বোক্তরূপ স্থলে পরে অভিজ্ঞ ব্যক্তির "অয়ং গৌঃ" ইত্যাদি বাক্য সেই জ্ঞানের সহায় হইলেও উহা শাব্দজ্ঞান নহে, কিন্তু উহা সেই ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষই। কারণ, উহা শাব্দজ্ঞান হইতে স্পষ্টজ্ঞান, পরোক্ষ শাব্দজ্ঞান ঐরূপ স্পষ্টজ্ঞান হইতে পারে না। বাচস্পতি মিশ্র এ বিষয়ে তাঁহার গুরূপদিষ্ট গাথারও উল্লেখ করিয়া, তাঁহার গুরুসম্প্রদায়েরও যে উহাই মত, ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন।* জয়ন্ত ভট্টও পরে বলিয়াছেন,—"তদেতদ্ব্যাখ্যাতারো নানুমন্যন্তে।" ব্যাখ্যাতৃগণ পূর্ব্বোক্ত আচার্য্যমত কেন স্বীকার করেন না, ইহাও বিচারপূর্ব্বক ব্যক্ত করিয়া, জয়ন্ত ভট্ট পরে মতান্তরে এই সূত্রোক্ত "অব্যপদেশ্যং" এই পদের অন্যরূপ ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন।

জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, কোন মতে অসম্ভব-দোষ বারণই উক্ত পদের প্রয়োজন। কারণ, লক্ষ্য থাকিলেই লক্ষণ বলা উচিত। কিন্তু কোন মতে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষনামক কোন জ্ঞানই না থাকায় উক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণের লক্ষ্যই নাই। কারণ, সমস্ত জ্ঞানেই শব্দবিশিষ্ট অর্থই বিষয় হয়। কেবল অর্থবিষয়ক কোন জ্ঞান জন্মে না। সুতরাং যে জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলা হয়, তাহাতেও সেই জ্ঞানের বিষয়বোধক সংজ্ঞা সেই বিষয়ের বিশেষণরূপে বিষয় হয়। যেমন কাহারও ঘটে চক্ষুঃসংযোগ হইলে প্রথমে 'ঘট' এই সংজ্ঞার অর্থাৎ

---

* "তত্র গুরূপদিষ্টা গাথা পঠিতব্যা—

'শব্দজত্বেন শাব্দশ্চেৎ প্রত্যক্ষাক্ষজত্বতঃ।

স্পষ্টগ্রহণরূপত্বাদ্যুক্তমৈন্দ্রিয়কং হি তদিতি ॥"—তাৎপর্য্যটীকা।

ঘট শব্দের স্মরণ হইয়া থাকে। পরে সেই স্মরণরূপ বিশেষণজ্ঞানজন্য 'ঘটসংজ্ঞা-বিশিষ্ট ঘট' এইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞানই জন্মে। সুতরাং সেই জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা যায় না। কারণ, সেই জ্ঞানের বিশেষণ যে ঘট শব্দ, তাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে এবং বিশেষ্য যে ঘট, তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। যুগপৎ ইন্দ্রিয়দ্বয়জন্য কোন একটি জ্ঞানও কুত্রাপি হয় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানে স্মৃতির বিষয় সেই ঘটশব্দই করণ, অর্থাৎ উহা সেইশব্দজন্য শাব্দজ্ঞান। এইরূপ সর্ব্বত্রই যাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়, তাহা উক্তরূপে শাব্দজ্ঞানই। "তস্মাৎ প্রত্যক্ষস্য লক্ষ্যস্যাসদ্ভাবাৎ কস্যেদং লক্ষণমুপক্রান্তমিত্যসম্ভবদোষ-মাশঙ্ক্যাহ সূত্রকারঃ—'অব্যপদেশ্য'মিতি।"—"ন্যায়মঞ্জরী", ৮০ পৃঃ।

তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত জ্ঞানই শাব্দজ্ঞান হইলে প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপ লক্ষ্যই থাকে না ; সুতরাং তাহার লক্ষণ বলাই যায় না, ইহাই উক্ত মতবাদীর অভিমত উক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণের অসম্ভব দোষ। তাই মহর্ষি উক্ত অসম্ভব-দোষ বারণের উদ্দেশ্যেই এই সূত্রে "অব্যপদেশ্যং" এই তৃতীয় পদের দ্বারা তাঁহার সিদ্ধান্ত সূচনা করিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান আছে ; কারণ, উহা "অব্যপদেশ্য" অর্থাৎ শব্দবিষয়ক না হওয়ায় অশাব্দ। রূপাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষে কখনও সেই রূপাদি শব্দ বিষয় হয় না, সুতরাং উহা সেই শব্দজন্য শাব্দজ্ঞান নহে। অতএব অসম্ভবদোষ নাই। বস্তুতঃ কোনরূপেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অপলাপ করা যায় না। প্রত্যক্ষ ব্যতীত শাব্দ জ্ঞানেরও সত্তা সিদ্ধ হয় না। কারণভেদপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষ ও শাব্দ পৃথক্ জ্ঞান, ইহাও স্বীকার্য্য। পরন্তু কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষের পূর্ব্বে তাহার সংজ্ঞার স্মরণ হইলেও সেই সংজ্ঞা তাহার প্রত্যক্ষত্বের বাধক হইতে পারে না। কারণ, সেই সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞীর স্বরূপাচ্ছাদন করিতে পারে না। সুতরাং তাহার প্রত্যক্ষের সমস্ত কারণ উপস্থিত হইলে প্রত্যক্ষই জন্মে, তাহার বাধক কিছু নাই। তাই কথিত হইয়াছে,—"সংজ্ঞাহি স্মর্য্যমাণাপি প্রত্যক্ষত্বং ন বাধতে। সংজ্ঞিনঃ সা তটস্থাহি ন রূপাচ্ছাদনক্ষমা॥"

জয়ন্ত ভট্ট পরে বলিয়াছেন,—তদেতদাচার্য্যা ন ক্ষমন্তে"। এখানেও "আচার্য্য" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বকথিত আচার্য্যই বুঝা যায়। তাঁহার কথা এই যে, ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য গোত্বাদিরূপে যে গো প্রভৃতি অর্থের জ্ঞান হয়, তাহা কখনই সেই অর্থের বাচক গো প্রভৃতি শব্দবিষয়ক হইতেই পারে না, "অতশ্চ ন শাব্দং তৎ, অপিতু সুস্পষ্টং প্রত্যক্ষমেব।" অতএব প্রত্যক্ষ জ্ঞানরূপ লক্ষ্য সিদ্ধই থাকায় উক্ত অসম্ভব দোষের আশঙ্কাই নাই। সুতরাং অসম্ভব দোষ

বারণের জন্য মহর্ষি উক্ত পদ বলিতে পারেন না। তবে কেন মহর্ষি প্রত্যক্ষসূত্রে "অব্যপদেশ্যং" এই পদ বলিয়াছেন? এতদুত্তরে জয়ন্ত ভট্ট পরে বলিয়াছেন—"উক্তমাচার্য্যৈঃ, উভয়জজ্ঞানব্যবচ্ছেদার্থমিতি।" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ও শব্দ, এই উভয়জন্য যে শাব্দ জ্ঞান জন্মে, তাহার প্রত্যক্ষত্ব বারণই উক্ত পদের প্রয়োজন, ইহা আচার্য বলিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টেরও উহাই সম্মত মনে হয়। এই মতে পূর্ব্বোক্ত স্থলে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ এবং শব্দ, এই উভয়জন্য যে জ্ঞান জন্মে, তাহাও শব্দবিষয়ক নহে। কিন্তু "ব্যপদেশ্য" অর্থাৎ শব্দপ্রমাণজন্য শাব্দজ্ঞান। তাই সেখানে সেই ব্যক্তিকে পরে জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলে যে, আমি পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ দ্বারা বুঝিতে পারি নাই যে, 'ইহা গো', —কিন্তু পরে অমুকের বাক্য শ্রবণ করিয়াই উহা বুঝিয়াছি। সুতরাং তাহার উক্তরূপ জ্ঞান যে প্রত্যক্ষ নহে, কিন্তু শাব্দ, ইহা স্বীকার্য। মহর্ষিও উক্ত পদের দ্বারা তাঁহার এই সিদ্ধান্তও সূচনা করিয়াছেন।

জয়ন্ত ভট্ট উক্ত বিষয়ে আরও বহু বিচার করিয়া নানা মতভেদের সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু 'তাৎপর্য্যটীকা'কার বাচস্পতি মিশ্র যে ভাবে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদনুসারে তিনি উক্ত মতের কোন আলোচনা করেন নাই। (বাচস্পতি মিশ্রের মতে উক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণসূত্রে "অব্যপদেশ্যং" এই পদের দ্বারা প্রত্যক্ষের নির্ব্বিকল্পকরূপ প্রকারভেদই কথিত হইয়াছে, উহা প্রত্যক্ষের লক্ষণার্থ নহে।) কিন্তু জয়ন্ত ভট্ট উক্ত বিষয়ে তাঁহার পরিজ্ঞাত সমস্ত মতের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করিলেও বাচস্পতি মিশ্রের উক্ত বিশিষ্ট মতের কোন উল্লেখ করেন নাই। পরে ইহা আরও ব্যক্ত হইবে। বাচস্পতি মিশ্রও জয়ন্ত ভট্টের বিশিষ্ট মতের কোন উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু জয়ন্ত ভট্টও পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে তাঁহার নিজের মত স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তিনি নানা মতেরই ব্যাখ্যা ও বিচার করিয়া শেষে বলিয়াছেন,—

"ইত্যাচার্য্যমতানীহ দর্শিতানি যথাগমং।
যদেভ্যঃ সত্যমাভাতি সদ্ভিস্তদবলম্ব্যতাং ॥"—ন্যায়মঞ্জরী, ৮৮ পৃঃ।

ভাষ্য। গ্রীষ্মে মরীচয়ো ভৌমেনোষ্মণা সংসৃষ্টাঃ স্পন্দমানা দূরস্থস্য চক্ষুষা সন্নিকৃষ্যন্তে, তত্রেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাদুদকমিতি জ্ঞানমুৎপদ্যতে। তচ্চ প্রত্যক্ষং প্রসজ্যেত ইত্যত আহ "অব্যভিচারী"তি। যদতস্মিংস্তদিতি তদ্ব্যভিচারি। যত্তু

তস্মিংস্তদিতি তদব্যভিচারি প্রত্যক্ষমিতি। দূরাচ্চক্ষুষা হ্যয়মর্থং পশ্যন্নাবধারয়তি ধূম ইতি বা রেণুরিতি বা, তদেতদিন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নমনবধারণজ্ঞানং প্রত্যক্ষং প্রসজ্যেত ইত্যত আহ "ব্যবসায়াত্মক"মিতি।

ন চৈতন্মন্তব্যং আত্মমনঃসন্নিকর্ষজমেবানবধারণজ্ঞানমিতি। চক্ষুষা হ্যয়মর্থং পশ্যন্নাবধারয়তি, যথা চেন্দ্রিয়েণোপলব্ধমর্থং মনসোপলভতে, এবমিন্দ্রিয়েণানবধারয়ন্ মনসা নাবধারয়তি। যচ্চ তদিন্দ্রিয়ানবধারণ-পূর্ব্বকং মনসানবধারণং, তদ্বিশেষাপেক্ষং বিমর্শমাত্রং সংশয়ো ন পূর্ব্বমিতি। সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষবিষয়ে জ্ঞাতুরিন্দ্রিয়েণ ব্যবসায় উপহতেন্দ্রিয়াণামনুব্যবসায়াভাবাদিতি।

অনুবাদ—গ্রীষ্মকালে পার্থিব উষ্মার সহিত সংসৃষ্ট স্পন্দমান (ক্রিয়াবিশিষ্ট) সৌর কিরণসমূহ দূরস্থ ব্যক্তির চক্ষুর সহিত সন্নিকৃষ্ট (সংযুক্ত) হয়। সেই সূর্য্য-কিরণে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্য "উদক" এইরূপ জ্ঞান জন্মে। তাহাও অর্থাৎ সেই বিপরীত নিশ্চয়রূপ ভ্রমজ্ঞানও প্রত্যক্ষ প্রসক্ত হয় অর্থাৎ সেই ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষও উক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণাক্রান্ত হয়, এ জন্য (মহর্ষি) "অব্যভিচারি" এই পদ বলিয়াছেন। তদ্‌ভিন্ন পদার্থে 'তৎ' এইরূপ যে প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ যাহা বস্তুতঃ যে পদার্থ নহে, তাহার সেই পদার্থরূপে যে প্রত্যক্ষ, তাহা ব্যভিচারি প্রত্যক্ষ। কিন্তু সেই পদার্থে 'তৎ' এইরূপ যে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ যাহা বস্তুতঃ যে পদার্থ, তাহার সেই পদার্থরূপেই যে প্রত্যক্ষ, তাহা অব্যভিচারি প্রত্যক্ষ।

এই ব্যক্তি অর্থাৎ কোন দ্রষ্টা দূর হইতে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থকে অর্থাৎ চক্ষুর্গ্রাহ্য কোন দ্রব্যপদার্থকে দর্শন করতঃ অনবধারণ করে—ধূম এই বা? রেণু এই বা? অর্থাৎ দৃশ্যমান সেই পদার্থে ধূম ও ধূলির সমান ধর্ম্ম দেখিয়া ইহা কি ধূম? অথবা ধূলি? এইরূপ 'অনবধারণ' (সংশয়) করে। ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজন্য উৎপন্ন সেই এই অনবধারণরূপ জ্ঞান অর্থাৎ উক্তরূপ সংশয়াত্মক জ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রসক্ত হয়, অর্থাৎ উক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণাক্রান্ত হয়, এ জন্য (মহর্ষি) "ব্যবসায়াত্মকং" এই পদ বলিয়াছেন।

অনবধারণ-জ্ঞান অর্থাৎ সংশয়াত্মক জ্ঞান আত্মমনঃসন্নিকর্ষজন্যই অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজন্য নহে, ইহা কিন্তু স্বীকার করা যায় না; যেহেতু এই ব্যক্তি

অর্থাৎ সেই দ্রষ্টা চক্ষুর দ্বারা পদার্থ-বিশেষকে (সমান-ধর্ম্মা ধর্ম্মীকে) দর্শন করতঃ অনবধারণ করে অর্থাৎ সেই পদার্থে বিশেষরূপে সংশয় করে। এবং যেমন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ (ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট) পদার্থকে মনের দ্বারা অর্থাৎ নেত্রসহায় মনের দ্বারা উপলব্ধি করে, এইরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনবধারণ করতঃ মনের দ্বারা অনবধারণ করে। সেই যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনবধারণপূর্ব্বক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষপূর্ব্বক মনের দ্বারা অনবধারণ, সেই বিশেষাপক্ষ (যাহাতে বিশেষ-জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা থাকে) বিমর্শই অর্থাৎ একধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের জ্ঞানই সংশয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া আপত্তির বিষয় সংশয়। পূর্ব্বটি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ব্যাপার নিবৃত্তির পরে কেবল আত্মমনঃসংযোগজন্য যে মানস সংশয় দৃষ্টান্তরূপে আপত্তিকারীর মনে আছে, সেই সংশয় নহে, অর্থাৎ উহা প্রত্যক্ষ-লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া আপত্তির বিষয় নহে। সমস্ত প্রত্যক্ষ বিষয়ে জ্ঞাতার (আত্মার) ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই ব্যবসায় (বিষয়ের সবিকল্পক জ্ঞান) হয় ; কারণ, বিনষ্টেন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের অনুব্যবসায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ হয় না।

টিপ্পনী—পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষসূত্রে মহর্ষি চতুর্থ পদ বলিয়াছেন,—"**অব্যভিচারি**"। এবং পঞ্চম পদ বলিয়াছেন—"**ব্যবসায়াত্মকং**"। ভাষ্যকার যথাক্রমে ঐ পদদ্বয়ের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, গ্রীষ্মকালে পার্থিব উষ্মার সহিত সংসৃষ্ট স্পন্দমান সূর্য্যকিরণের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগরূপ সন্নিকর্ষ হইলে, তজ্জন্য তাহাতে "ইহা জল" এইরূপ ভ্রম প্রত্যক্ষ জন্মে। উহাকেই মরীচিকায় জলভ্রম বলে। উহা জল বা জলত্ব-রূপ বিশেষণ অংশেই ভ্রম। এইরূপ রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম প্রভৃতি অসংখ্য ভ্রমপ্রত্যক্ষজন্মে। কিন্তু বিশেষণাংশে ঐ সমস্ত ভ্রমের করণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে। সুতরাং ঐ সমস্ত ভ্রমপ্রত্যক্ষ উক্ত প্রতক্ষ্যলক্ষণের লক্ষ্য নহে। কিন্তু ঐ সমস্ত ভ্রম প্রত্যক্ষও ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন অশাব্দ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হওয়ায় তাহাতে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। তাই মহর্ষি উক্ত সূত্রে বলিয়াছেন,—"অব্যভিচারী"। ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যাহা যে পদার্থ নহে, তাহার সেই পদার্থরূপে যে প্রত্যক্ষ, তাহা ব্যাভিচারি প্রত্যক্ষ। ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যার দ্বারা নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের মতে ভ্রমজ্ঞান যে, "অন্যথাখ্যাতি" অর্থাৎ অন্য পদার্থের অন্যপ্রকারে জ্ঞান, ইহা বুঝা যায়। (পঞ্চম খণ্ডে ১৭৩ পৃষ্ঠায় উক্ত মতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। উক্ত "অন্যথাখ্যাতিবাদে"

সৎ পদার্থে সৎ পদার্থেরই ভ্রম হয় অর্থাৎ ভ্রম-বিষয় যে বিশেষণ, তাহা অসৎ বা অলীক নহে। যাহা অলীক, তাহার ভ্রমজ্ঞানও হইতে পারে না। বাচস্পতি মিশ্রের মতে কোন স্থলে অলীক পদার্থও বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধরূপে ভ্রমের বিষয় হইতে পারে। কিন্তু "তত্ত্বচিন্তামণি"কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় তাহাও স্বীকার করেন নাই।*

ফলকথা, এই মতে পূর্ব্বোক্তরূপ সূর্য্যকিরণের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ-সম্বন্ধরূপ সন্নিকর্ষ হইলে তাহাতে অন্যত্র পূর্ব্বদৃষ্ট জলের সাদৃশ্যদর্শন হওয়ায় তজ্জন্য সেই জল বিষয়ে পূর্ব্বসংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়। সুতরাং পরে সেই সংস্কারজন্য সেই পূর্ব্বদৃষ্ট জলের স্মরণ হওয়ায় তজ্জন্য পরে সেই দৃশ্যমান সূর্য্যকিরণে স্থানান্তরীণ সেই জলের বা জলত্বের ভ্রমপ্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু যে ব্যক্তি কখনও জল দেখে নাই, জল বিষয়ে যাহার সংস্কার নাই, তাহার ঐরূপ ভ্রম জন্মে না। সুতরাং জল বিষয়ে পূর্ব্বসংস্কারজন্য সেই জলের স্মরণ যে, উক্তরূপ ভ্রম প্রত্যক্ষের চরম কারণ, ইহা স্বীকার্য্য। পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণ ভ্রম প্রত্যক্ষ স্থলে উক্তরূপ স্মরণাত্মক জ্ঞানকেই "জ্ঞানলক্ষণ" অলৌকিক সন্নিকর্ষ বলিয়া, সেই সন্নিকর্ষ জন্য বিশেষণাংশে উক্তরূপ ভ্রমকে একপ্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলিয়াছেন। কারণ, ভ্রমপ্রত্যক্ষস্থলে সেখানে সেই বিষয় না থাকায় তাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগাদি লৌকিক সন্নিকর্ষ সম্ভব হয় না।

কিন্তু উক্তরূপ ভ্রম জ্ঞান ও বিশেষ্য অংশে অভ্রান্ত। তাই কথিত হইয়াছে, "ধর্ম্মিণি সর্ব্বমভ্রান্তং প্রকারেতু বিপর্য্যয়ঃ।" যেমন 'ইদং জলং', 'অয়ং সর্পঃ', ইত্যাদিরূপে যে ভ্রম জন্মে, তাহাতে সম্মুখীন সেই পদার্থই বিশেষ্য বা ধর্ম্মী। কিন্তু ইদন্ত্ব ধর্ম্মরূপে সেই ধর্ম্মীর জ্ঞান অভ্রান্ত; কারণ, সম্মুখীন সেই পদার্থে ইদন্ত্ব ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। সুতরাং সেই বিশেষ্য অংশে ইদন্ত্বরূপে ঐ জ্ঞানকে ভ্রম বলা যায় না। কিন্তু জল বা জলত্বাদি মুখ্য বিশেষণ অংশেই জ্ঞান ভ্রম। ঐ তাৎপর্য্যেই ভ্রমজ্ঞানকে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—ব্যভিচারী অর্থাৎ সেই ভ্রম বিষয়ের ব্যভিচারী। মহর্ষিও এই সূত্রে যথার্থ প্রত্যক্ষকে অব্যভিচারী

* "ব্যাপ্তিপঞ্চকদীধিতি"র টীকার শেষে জগদীশ লিখিয়াছেন,—"সদুপরাগেণাপ্যসতঃ সংসর্গতয়া ভানস্য মণিকৃতানঙ্গীকারাৎ"। কিন্তু পূর্ব্বে অনুমিতিদীধিতির টীকায় বাচস্পতি মিশ্রের উক্ত মতও তিনি লিখিয়াছেন, এবং সেখানে গদাধর ভট্টাচার্য্যও লিখিয়াছেন, "অলীকস্য সংসর্গতয়ৈব বিষয়তায়া বাচস্পত্যনুমতত্বাৎ"। অর্থাৎ বাচস্পতি মিশ্রের মতেও বিশেষ্য বা বিশেষণরূপে অলীক পদার্থ কুত্রাপি জ্ঞানের বিষয় হয় না। সেইরূপে "অসৎখ্যাতি" তাঁহারও সম্মত নহে। পঞ্চম খণ্ডে ১৭৬ পৃষ্ঠায় উক্ত বিষয়ে লিখিত কথার মধ্যে ইহাও জ্ঞাতব্য।

বলিয়াছেন। অব্যভিচারী বলিতে সেই বিষয়ের অব্যভিচারী অর্থাৎ ব্যাপ্য, ইহাও বুঝা যায়। তাহা হইলে ভাষ্যকারও আদিভাষ্যে ঐ তাৎপর্য্যে প্রমাণ-পদার্থকেও অর্থের অব্যভিচারী অর্থাৎ ব্যাপ্য, ইহা বলিতে পারেন। সেখানে বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যাও প্রথমে লিখিত হইয়াছে। তাঁহার সেই ব্যাখ্যার কারণ ব্যক্ত করিতে সেখানে "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" টীকায় (৫৪ পৃঃ) উদয়নাচার্য্য লিখিয়াছেন,—"অর্থাব্যভিচারোঽপি ব্যাপ্যব্যাপকভাবলক্ষণঃ প্রমাণপ্রমেয়োর্নাস্তি।" অবশ্য কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ-পদার্থ তাহার প্রমেয় পদার্থের ব্যাপ্য হয় না। তাই বাচস্পতি মিশ্র সেখানে উক্তরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। কিন্তু নব্যনৈয়ায়িকগণ বিশেষ্যতা সম্বন্ধে এবং অনেক পরম্পরা সম্বন্ধেও ব্যাপ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং যে সম্বন্ধে ব্যাপ্য হয়, তাহাকে বলিয়াছেন—'ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ' এবং যে সম্বন্ধে ব্যাপক হয়, তাহাকে বলিয়াছেন—'ব্যাপকতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ।'*

(প্রশ্ন হয় যে, যাহা ভ্রম প্রত্যক্ষের করণ, তাহা ত প্রমাণই নহে, ইহা প্রমাণের সামান্য লক্ষণের দ্বারাই বুঝা যায়। সুতরাং যাহাতে প্রমাণের সামান্যলক্ষণই নাই, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণাক্রান্ত হইতে পারে না। তথাপি মহর্ষি এই সূত্রে প্রত্যক্ষলক্ষণে অব্যভিচারিত্ব বিশেষণ কেন বলিয়াছেন?) আর তাহা বক্তব্যই হইলে পরে অনুমানাদি প্রমাণের লক্ষণেও কেন তাহা বলেন নাই?

---

* অনুমিতিদীধিতির শেষে (চার্ব্বাকমতখণ্ডন ব্যাখ্যায়) রঘুনাথ শিরোমণি লিখিয়াছেন,—"ভ্রমস্ত বিষয়বাধাধীনতয়া"। টীকাকার গদাধর ভট্টাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"বিষয়বাধাধীনতয়া বিশেষ্যতাসম্বন্ধেন বিষয়বাধব্যাপ্যতয়া।" অর্থাৎ ভ্রম জ্ঞানের বিশেষ্য পদার্থে বিশেষ্যতা সম্বন্ধে সেই ভ্রমজ্ঞান থাকে এবং তাহাতে সেই ভ্রম বিষয় পদার্থের বাধ (অভাব) অবশ্যই থাকে। সুতরাং বিশেষ্যতা সম্বন্ধে ভ্রমজ্ঞান সেই বিষয়াভাবের ব্যাপ্য। তাহা হইলে প্রমাজ্ঞানকেও বিশেষ্যতা সম্বন্ধে সেই বিষয়ের ব্যাপ্য বলা যায় এবং স্বজন্য জ্ঞানের বিশেষ্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ পদার্থকেও তাহার প্রমেয় পদার্থের ব্যাপ্য বলা যায়। যেমন যে যে স্থানে বিলক্ষণসংযোগ সম্বন্ধে ধূম থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নি থাকে, এ জন্য উক্ত সংযোগ-সম্বন্ধে ধূম বহ্নির ব্যাপ্য; তদ্রূপ কোন প্রমাণজন্য প্রমাজ্ঞানের যে বিশেষ্য পদার্থে স্বজন্য অর্থাৎ সেই প্রমাণ-জন্য জ্ঞানের বিশেষ্যতা সম্বন্ধে সেই প্রমাণ পদার্থ থাকে, সেই পদার্থে বিশেষণীভূত সেই প্রমেয় পদার্থ সেই বিশেষণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে অবশ্য থাকে, এ জন্য সেই প্রমাণ পদার্থ প্রমেয় পদার্থের ব্যাপ্য। সেই প্রমেয় পদার্থ বিশেষণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে উহার ব্যাপক। যে সম্বন্ধে কোন পদার্থ বিশেষণরূপে জ্ঞানের বিষয় হয়, সেই সম্বন্ধকে বলে—বিশেষণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ। তৃতীয় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এতদুত্তরে বাচস্পতি মিশ্র অনেক কথা বলিয়া, শেষে বলিয়াছেন যে, অথবা প্রত্যক্ষের অব্যভিচারিত্বপ্রযুক্তই অন্যান্য প্রমাণের অব্যভিচারিত্ব। অন্যান্য প্রমাণ হইতে প্রত্যক্ষের এই বিশেষ সূচনার জন্য মহর্ষি পূর্ব্বে প্রত্যক্ষলক্ষণ-সূত্রেই "অব্যভিচারি" এই পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র কুমারিল ভট্টের উক্তির দ্বারাও তাঁহার ঐ কথার সমর্থন করিতে পরেই বলিয়াছেন,—"যথাহ মীমাংসাবার্ত্তিককারঃ, 'প্রত্যক্ষাব্যভিচারেণ স্বলক্ষণবলেন চ। প্রসিদ্ধাব্যভিচারিত্বান্নানুমানং পরীক্ষ্যত' ইতি।" *

ভাষ্যকারের উক্ত ব্যাখ্যানুসারে সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষও অব্যভিচারী। কারণ, দূর হইতে কোন দ্রব্য দর্শন করিয়া, তাহাতে ধূম ও ধূলির সমানধর্ম্ম দর্শন করিলে, ইহা কি ধূম? অথবা ধূলি? এইরূপ যে সংশয় জন্মে, তাহাও তৎপদার্থে তদ্বুদ্ধি। কারণ, সেই দৃশ্যমান দ্রব্য ধূম বা ধূলি, ইহার মধ্যে একতর হইবেই। উহা ধূম হইলে তাহাতে ধূমবুদ্ধি তৎপদার্থে তদ্বুদ্ধি এবং ধূলি হইলেও তাহাতে ধূলিবুদ্ধি তৎপদার্থে তদ্বুদ্ধি। উক্তরূপ সংশয়ের বিশেষ্য পদার্থে বিশেষণদ্বয়ের মধ্যে কোন একটি যখন অবশ্যই থাকে, তখন উক্ত সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষও সেই প্রকৃত বিষয়টির অব্যভিচারী। ফলকথা, ভাষ্যকার বিপরীতনিশ্চয়রূপ ভ্রমপ্রত্যক্ষকেই বলিয়াছেন—ব্যভিচারী প্রত্যক্ষ। সুতরাং উক্তরূপ সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষও অব্যভিচারি প্রত্যক্ষ বলিয়া উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়। কিন্তু ঐরূপ প্রত্যক্ষের যাহা করণ, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে। কারণ, সংশয়াত্মক জ্ঞান কোন প্রমাণের ফল নহে। নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানবিশেষেই প্রমাণের ফল। সুতরাং মহর্ষি উক্তরূপ সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষের বারণের জন্যই পরে পঞ্চম পদ বলিয়াছেন—"**ব্যবসায়াত্মকং**"। "ব্যবসায়" শব্দের অর্থ নিশ্চয়। সুতরাং 'ব্যবসায়াত্মক' বলিলে বুঝা যায়—নিশ্চয়াত্মক। সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষ ব্যবসায়াত্মক নহে। সুতরাং তাহাতে উক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ নাই।

আশঙ্কা হইতে পারে যে, সংশয় মাত্রই আত্ম-মনঃসন্নিকর্ষজন্য অর্থাৎ মানস,

---

* কুমারিল ভট্টের "শ্লোকবার্ত্তিকে"র অনুমান পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে অন্যরূপ শ্লোকপাঠ দেখা যায়, যথা,—"প্রত্যক্ষাব্যভিচারিত্বাদেবংলক্ষণকঞ্চ যৎ। প্রসিদ্ধমনুমানাদি ন পরীক্ষ্যং তদপ্যতঃ ॥" টীকাকার পার্থসারথি মিশ্রও উক্তরূপ পাঠেরই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বাচস্পতি মিশ্রের পরে বা পূর্ব্ব হইতেই দেশবিশেষে উক্তরূপ শ্লোকপাঠই প্রচলিত ছিল, ইহা বুঝা যায়।

এই মত স্বীকার করিলে সূত্রোক্ত প্রথম পদের দ্বারাই উহার বারণ হওয়ায় শেষোক্ত পঞ্চম পদ অনাবশ্যক। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—"ন চৈতন্মন্তব্যং" ইত্যাদি। প্রাচীন কালে সংশয় অর্থে "অনবধারণ" শব্দেরও প্রয়োগ হইত, ইহা মনে রাখা আবশ্যক। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, অনবধারণ-রূপ জ্ঞান যে, সর্ব্বত্রই আত্মমনঃসন্নিকর্ষজন্যই অর্থাৎ উহা চক্ষুরাদি কোন বহিরিন্দ্রিয়জন্য নহে, ইহা স্বীকার করা যায় না।* কারণ, পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয়কারী চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারাই সেই সম্মুখীন পদার্থবিশেষকে দর্শন করতঃ অনবধারণ করে অর্থাৎ তদ্বিষয়ে সংশয় করে। যেমন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ পদার্থবিশেষকে মনের দ্বারা উপলব্ধি করে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনবধারণ করতঃ মনের দ্বারা অনবধারণ করে। বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের ঐ শেষ কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট পদার্থকে চক্ষুঃসহায় মনের দ্বারা অর্থাৎ সেই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত মনের দ্বারা উপলব্ধি করে, তদ্রূপ উক্ত স্থলে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষপূর্ব্বক মনের দ্বারা অনবধারণ (সংশয়) করে। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষ সেই সম্মুখীন দ্রব্যের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ না হইলে জন্মে না। কারণ, অন্ধ ব্যক্তির ঐরূপ সংশয় জন্মে না। সুতরাং ঐরূপ সংশয় যে, চক্ষুরিন্দ্রিয়নিরপেক্ষ মনের দ্বারাই জন্মে, ইহা বলা যায় না। কিন্তু উহা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত মনের দ্বারা জন্মে, ইহাই স্বীকার্য্য। সুতরাং উহা চাক্ষুষ সংশয়, ইহাও স্বীকার্য্য। কারণ, বাহ্য প্রত্যক্ষেই বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ এবং সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সন্নিকর্ষ কারণ। অতএব পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয় যে, বাহ্য প্রত্যক্ষ, ইহা স্বীকার্য্য।

ভাষ্যকার পরে তাঁহার মূল বক্তব্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—"যচ্চ তদিন্দ্রিয়ানবধারণপূর্ব্বকং" ইত্যাদি। বার্ত্তিককারের কথানুসারে বাচস্পতি মিশ্র উক্ত ভাষ্যসন্দর্ভের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে,† মানস ও বাহ্য, এই

* প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও বাহ্য ও আন্তর, এই দ্বিবিধ সংশয় বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের বিচারের দ্বারা বুঝা যায়, প্রাচীন কালেও কোন সম্প্রদায় সংশয়মাত্রই মানস, এই মতের সমর্থন করিতেন। উক্ত মতের খণ্ডনার্থ পরে বহু বিচার হইয়াছে। উদয়নাচার্য্যের "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" ও বর্দ্ধমানকৃত প্রকাশটীকা (সোসাইটী সং, ৬৩১ পৃঃ) এবং "ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশ" (চৌখাম্বা সং, ৪১৩ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

† "অনয়োঃ সংশয়জ্ঞানয়োর্ম্মধ্যে যত্তদিন্দ্রিয়ানবধারণপূর্ব্বকমিন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষপূর্ব্বকং মনসা অনবধারণং সংশয়জ্ঞানমিত্যর্থঃ। "ন পূর্ব্বং", যদুপরতেন্দ্রিয়ব্যাপারস্য সংশয়জ্ঞানং দৃষ্টান্ততয়া হৃদি স্থিতং শঙ্কিতুমিত্যর্থঃ"। "দৃষ্টান্ততয়া পূর্ব্বত্বং"।—তাৎপর্য্যটীকা।

দ্বিবিধ সংশয়ের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনবধারণপূর্ব্বক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ-পূর্ব্বক মনের দ্বারা যে অনবধারণ, সেই বিশেষাপেক্ষ বিমর্শমাত্র যে সংশয়রূপ জ্ঞান, তাহাই এখানে অভিপ্রেত, কিন্তু "ন পূর্ব্বং" অর্থাৎ যে মানস সংশয়কে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বপক্ষবাদী সংশয়মাত্রকেই মানস বলেন, সেই মানস সংশয় এখানে মহর্ষির বুদ্ধিস্থ নহে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ বাহ্য সংশয় বারণের জন্যই তিনি এই সূত্রে পরে বলিয়াছেন, "ব্যবসায়াত্মকং"। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সন্দর্ভে ভাষ্যকারের "ন পূর্ব্বং" এই উক্তির দ্বারা সরলভাবে বুঝিতে পারি যে, ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্য যে অনবধারণ অর্থাৎ সংশয়, তাহা "ন পূর্ব্বং" অর্থাৎ প্রথমোক্ত মানস অনবধারণ নহে। সুতরাং সংশয়মাত্রই যে মানস, ইহা বলা যায় না। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ মানস সংশয়ের উদাহরণ বলিয়াছেন যে, জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত গ্রহসঞ্চারাদির দ্বারা গণনা করিয়া যে সমস্ত ফলের আদেশ করেন, তন্মধ্যে কোন ফলকে পরে মিথ্যা বুঝিলে আবার অন্য সময়ে গণনার দ্বারা যে সমস্ত ফলের নির্ণয় করেন, তদ্বিষয়ে কখনও তাহার প্রামাণ্যসংশয় জন্মে। সেই সংশয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে উহার কারণরূপে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ না থাকায় উহা কেবল মনোজন্য অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষরূপ সংশয়, ইহাই স্বীকার্য্য। জয়ন্ত ভট্টও প্রশস্তপাদোক্ত ঐ মানস সংশয়ের উল্লেখ করিয়া, উহাই যে এখানে মনোমাত্রজন্য বলিয়া ভাষ্যকারের হৃদয়স্থ, ইহা বলিয়াছেন। ফলকথা, ধূম বা ধূলির সহিত চক্ষুঃসন্নিকর্ষজন্য যেরূপ সংশয় ভাষ্যকার বলিয়াছেন, তাহা উক্তরূপ মানস সংশয় নহে, কিন্তু উহা চাক্ষুষ সংশয়, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য।

পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘটাদির প্রত্যক্ষ জন্মিলে পরক্ষণে 'আমি ঘট জানিতেছি' ইত্যাদিরূপে মনের দ্বারাই সেই প্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষ জন্মে, এবং তখন সেই বাহ্য ঘটাদি পদার্থও সেই মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। সুতরাং বাহ্য বিষয়েও যে, মনের প্রবৃত্তি হয়, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে বাহ্য বিষয়ে যে সমস্ত সংশয় জন্মে, তাহাও মানস প্রত্যক্ষ, ইহা বলিবার কোন বাধক নাই। তাই ভাষ্যকার পরে আবার বলিয়াছেন,—"**সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষবিষয়ে জ্ঞাতুরিন্দ্রিয়েণ ব্যবসায় উপহতেন্দ্রিয়াণামনুব্যবসায়াভাবাৎ।**" ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, কুত্রাপি বাহ্য ঘটাদি বিষয়ে স্বতন্ত্র ভাবে মনের প্রবৃত্তি হয় না। সর্ব্বত্রই বাহ্য ঘটাদির প্রত্যক্ষ হলে প্রথমে চক্ষুরাদি কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সেই প্রত্যক্ষ জন্মে, উহাকে

বলে—"ব্যবসায়"রূপ প্রত্যক্ষ। পরে মনের দ্বারা সেই প্রত্যক্ষের যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকে বলে—"অনুব্যবসায়"। কিন্তু তাহাতে বিষয়রূপে পূর্ব্বোৎপন্ন সেই ব্যবসায় কারণ, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, বিনষ্টেন্দ্রিয় অন্ধ বধির প্রভৃতির অর্থাৎ যাহাদিগের সেই ইন্দ্রিয়ের অভাবে তজ্জন্য "ব্যবসায়"রূপ প্রত্যক্ষ জন্মে না, তাহাদিগের মনের দ্বারা সে বিষয়ের 'অনুব্যবসায়' জন্মে না। সুতরাং যাহাদিগের বাহ্য ঘটাদি প্রত্যক্ষের মানস প্রত্যক্ষরূপ অনুব্যবসায় জন্মে, তাহাদিগের তৎপূর্ব্বে সেই ঘটাদি বিষয়ের ব্যবসায়রূপ প্রত্যক্ষ অবশ্যই জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অনুব্যবসায়কে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, বাহ্য বিষয়েও স্বতন্ত্রভাবে মনের প্রবৃত্তি হয়, সুতরাং বাহ্যবিষয়ক সংশয়ও মানস সংশয়, ইহা সিদ্ধ করা যায় না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত বাহ্য প্রত্যক্ষের অনুব্যবসায় স্থলে কোন বহিরিন্দ্রিয়কে অপেক্ষা করিয়াই সেই বাহ্য বিষয়ে মনের প্রবৃত্তি হয়। কুত্রাপি বাহ্য বিষয়ে স্বতন্ত্র ভাবে মনের প্রবৃত্তি হয় না। তাই কথিত হইয়াছে—"চক্ষুরাদ্যুক্তবিষয়ং পরতন্ত্রং বহির্ম্মনঃ।"

কিন্তু ঘটাদি প্রত্যক্ষের মানস প্রত্যক্ষরূপ অনুব্যবসায়েই বা কিরূপে সেই ঘটাদি বাহ্য পদার্থে মনের প্রবৃত্তি হইবে? তাহার সহিত মনের সন্নিকর্ষই তাহাতে মনের প্রবৃত্তি। কিন্তু সেই সন্নিকর্ষ কি? এবং বাহ্য পদার্থে তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে? ইহা বলা আবশ্যক। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি"র চতুর্থ স্তবকের চতুর্থ কারিকার ব্যাখ্যার শেষে নিজেই উক্তরূপ প্রশ্নের উল্লেখপূর্ব্বক তদুত্তরে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন,—**"জ্ঞানেন সংযুক্তসমবায়ঃ, তদর্থেন সংযুক্তসমবেতবিশেষণত্বং** ইত্যাদি।" "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" টীকাতেও তিনি উহাই সংক্ষেপে বলিয়াছেন।* তাৎপর্য্য এই যে, যে জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ জন্মে, সেই জ্ঞানরূপ বিশেষ্যে বিষয়িতাসম্বন্ধে তাহার বিষয় বাহ্য ঘটাদি পদার্থ বিশেষণরূপে সেই মানস প্রত্যক্ষে বিষয় হয়। যেমন ঘটের প্রত্যক্ষ হইলে পরক্ষণে "ঘটমহং জানামি" অর্থাৎ 'আমি ঘটবিষয়ক জ্ঞানবান্', এইরূপে সেই ঘট-প্রত্যক্ষের যে মানস প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাতে সেই

* "মনসা হ্যনুব্যবসীয়মানজ্ঞানলক্ষণবিশেষ্যসন্নিকৃষ্টেনাসন্নিকৃষ্টো ঘটাদিরবচ্ছেদকতয়া প্রতীয়তে, চক্ষুষেব ঘটসন্নিকৃষ্টেন প্রাগুপলব্ধা তদবস্থা"।—"তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি", ৬৩৩ পৃঃ। "মনসেতি। মনঃসংযুক্তাত্মসমবেতজ্ঞানবিষয়কে জ্ঞানে 'সংযুক্তসমবেতবিশেষণতয়া' প্রত্যাসত্ত্যা ঘটাদিরপি ভাসতে, চাক্ষুষ ইব প্রত্যভিজ্ঞানে তত্ত্বা, ইত্যর্থঃ।—বর্দ্ধমানকৃত "প্রকাশ" টীকা, ৬৩২ পৃঃ (সোসাইটি সং)।

আত্মাতে সমবায় সম্বন্ধে সেই ঘটপ্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান বিশেষণ হয় এবং সেই জ্ঞানে সেই ঘট বিষয়িতাসম্বন্ধে বিশেষণ হয়। সুতরাং সেখানে মনঃসংযুক্ত যে সেই আত্মা, তাহাতে সমবেত অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধে বর্ত্তমান যে, সেই ঘটবিষয়ক প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান, সেই জ্ঞানরূপ বিশেষ্যে সেই ঘটের বিশেষণত্বরূপ যে সম্বন্ধ, তাহাই সেই ঘটের সহিত মনের সন্নিকর্ষ। তাই উহাকে মনের "সংযুক্তসমবেত-বিশেষণতা" প্রত্যাসত্তি (সন্নিকর্ষ) বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ উক্ত স্থলে উহা সেই ঘটজ্ঞানস্বরূপই, কিন্তু অতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে। তাই গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি উক্তরূপ সন্নিকর্ষকে "জ্ঞানলক্ষণ" সন্নিকর্ষ বলিয়াছেন। উদয়নমতের ব্যাখ্যায় বর্দ্ধমান উপাধ্যায় ঐ "জ্ঞানলক্ষণ" সন্নিকর্ষকেও উদ্দ্যোতকরোক্ত ষষ্ঠ সন্নিকর্ষ "বিশেষণতা"রই অন্তর্গত বলিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

মূলকথা, সংশয়মাত্রই মানস নহে। বহিরিন্দ্রিয়জন্যও বহু সংশয় জন্মে, যাহা ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন অশাব্দ অব্যভিচারী জ্ঞান। সুতরাং তাদৃশ সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষ বারণের জন্যই মহর্ষি এই সূত্রে পরে "ব্যবসায়াত্মকং" এই পদ বলিয়াছেন, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্টও উক্তরূপেই সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে সমর্থন করিয়াছেন যে, সূত্রোক্ত "অব্যভিচারি" এই পদের দ্বারা সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষের বারণ হয় না। সুতরাং মহর্ষি পরে "ব্যবসায়াত্মকং" এই পদ বলিয়াছেন। সূত্রোক্ত ঐ সমস্ত বিশেষণ-বিশিষ্ট জ্ঞান যদ্দ্বারা জন্মে, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহাই সূত্রার্থ। *

কিন্তু 'তাৎপর্য্যটীকা'কার বাচস্পতি মিশ্র এখানে কোন কারণে সমর্থন করিয়াছেন যে, সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষও ব্যভিচারী প্রত্যক্ষ। কারণ, উহাও ভ্রমজ্ঞান। যাহা ভ্রমাত্মক জ্ঞান, তাহা অব্যভিচারী নহে। সুতরাং এই সূত্রে "অব্যভিচারি" এই পদের দ্বারাই বিপর্য্যয় ও সংশয়রূপ দ্বিবিধ ভ্রমপ্রত্যক্ষেরই বারণ হওয়ায় মহর্ষি সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষবারণের উদ্দেশ্যেই পরে "ব্যবসায়াত্মকং" এই পদ বলেন নাই। কিন্তু উহার দ্বারা যথার্থ সবিকল্পক প্রত্যক্ষও যে স্বীকার্য্য, সুতরাং তাহার করণও প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহাই সূচিত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র উহা সমর্থন করিতে পরে ইহাও বলিয়াছেন যে, "ব্যবসায়", "বিকল্প" ও "বিনিশ্চয়" শব্দ সবিকল্পক প্রত্যক্ষেরই নাম। সুতরাং "ব্যবসায়াত্মক" শব্দের

* "তেনেন্দ্রিয়ার্থজত্বাদিবিশেষণগণান্বিতং।
যতো ভবতি বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষমিতি স্থিতং॥"—ন্যায়মঞ্জরী, ৯২ পৃঃ।

দ্বারা বুঝা যায়, সবিকল্পক প্রত্যক্ষ। তবে উহার দ্বারা সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষেরও বারণ হয়, এ জন্য ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার তাহার "অন্বাচয়" করিয়াছেন অর্থাৎ ঐ গৌণ উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু সূত্রোক্ত ঐ "ব্যবসায়াত্মক" শব্দের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য অতিস্ফুট, সুতরাং শিষ্যগণ নিজেই উহা বুঝিতে পারিবে, এ জন্য ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার উহার ব্যাখ্যা করেন নাই। আমরা ত্রিলোচনগুরুর উপাদেশানুসারে এইরূপ যথার্থ ব্যাখ্যা করিলাম।* ফলকথা, বাচস্পতি মিশ্রের মতে এই সূত্রে "অব্যপদেশ্যং" ও "ব্যবসায়াত্মকং" এই পদদ্বয় প্রত্যক্ষের লক্ষণার্থ নহে। কিন্তু উহার দ্বারা যথাক্রমে 'নির্ব্বিকল্পক' ও 'সবিকল্পক' এই দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ সূচিত হইয়াছে। ন্যায়সূত্রবৃত্তিকার বিশ্বনাথও উক্ত মতই গ্রহণ করিয়া স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"তস্য বিভাগঃ, অব্যপদেশ্যং ব্যবসায়াত্মকমিতি, নির্ব্বিকল্পকং সবিকল্পকঞ্চেতি দ্বিবিধং প্রত্যক্ষমিত্যর্থঃ।"

বাচস্পতি মিশ্র যে, ত্রিলোচনগুরুর উপদেশানুসারেই উদ্দ্যোতকরের "ন্যায়বার্ত্তিকে"র টীকা করিয়াছিলেন, ইহা "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" টীকার প্রারম্ভে উদয়নাচার্য্যও বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উদ্দ্যোতকর ঐরূপ কথা বলেন নাই। তিনিও এই সূত্রে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ পদই যে, প্রত্যক্ষের লক্ষণার্থ, ইহা বলিয়া প্রত্যক্ষলক্ষণে যথাক্রমে উক্ত পঞ্চ পদেরই প্রয়োজন বলিয়াছেন (পূর্ব্ব ১০৫-১০৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সর্ব্বশেষেও তিনি আবার স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—"পঞ্চপদ-পরিগ্রহেণ প্রত্যক্ষলক্ষণমুক্তং, যত্রান্যতরপদপরিগ্রহো নাস্তি তৎ প্রত্যক্ষাভাস-মিতি।" উক্ত পঞ্চ পদের মধ্যে যে যে পদ পরিত্যাগ করিয়া যেরূপে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রও সেখানে সেই ভাবেই সে সমস্ত কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তথাপি তিনি উদ্দ্যোতকরের মতব্যাখ্যা করিতেও কেন যে পরে পূর্ব্বোক্ত কথা বলিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। আর সূত্রোক্ত "ব্যবসায়াত্মকং" এই পদের দ্বারা তাঁহার ব্যাখ্যাত অর্থ অতিস্ফুট বলিয়া শিষ্যগণ নিজেই উহা বুঝিতে পারিবে, এ জন্য ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার তাহা ব্যাখ্যা করেন নাই,

---

* "ব্যবসায়াত্মকপদং সাক্ষাৎ সবিকল্পকস্য বাচকং। তথাহি, ব্যবসায়ো বিনিশ্চয়ো বিকল্প ইত্যনর্থান্তরং, স এবাত্মা রূপং যস্য তৎ সবিকল্পকং প্রত্যক্ষং। তদেতদতিস্ফুটত্বাচ্ছিষ্যৈ-র্গম্যত এবেতি ভাষ্যবার্ত্তিককারাভ্যামব্যাখ্যাতং। অস্মাভিঃ—

ত্রিলোচনগুরূন্নীতমার্গানুগমনোন্মুখৈঃ।
যথামানং যথাবস্তু ব্যাখ্যাতমিদমীদৃশং॥"—তাৎপর্য্যটীকা।

তাঁহারা উক্ত পদের গৌণ উদ্দেশ্যই বলিয়া গিয়াছেন, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি না। তাঁহারা সূত্রোক্ত "ব্যবসায়াত্মকং" এই পদের উক্তরূপ উদ্দেশ্যই প্রকৃত বুঝিলে, তাহা না বলিয়া অনাবশ্যক কথা কেন বলিবেন? পরন্তু এই সূত্রে প্রত্যক্ষের প্রকারভেদও মহর্ষির বিবক্ষিত হইলে পরবর্ত্তী পঞ্চম সূত্রে "ত্রিবিধং" এই পদের ন্যায় এই সূত্রেও তিনি "দ্বিবিধং" এই পদ কেন বলেন নাই? পরবর্ত্তী সূত্রে "ত্রিবিধং" এই পদ তিনি কেন বলিয়াছেন, এ বিষয়ে সেই সূত্রের ভাষ্যে পরে ভাষ্যকারের কথাও দ্রষ্টব্য।

বস্তুতঃ বৌদ্ধমতখণ্ডনে নিতান্ত আগ্রহবশতঃই ত্রিলোচনগুরুর উপদেশানুসারে বাচস্পতি মিশ্র গোতমের প্রত্যক্ষসূত্রে "অব্যপদেশ্যং" ও "ব্যবসায়াত্মকং" এই পদদ্বয়ের উক্তরূপ প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাই আমরা বুঝি। কিন্তু উহা প্রাচীন ব্যাখ্যা নহে। জৈন দার্শনিক হেমচন্দ্রও "প্রমাণমীমাংসা" গ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেন যে, * ত্রিলোচন ও বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ গোতমের প্রত্যক্ষলক্ষণসূত্রের পূর্ব্বাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যায় অর্থাৎ প্রাচীন ব্যাখ্যায় বৈমুখ্যবশতঃ এইরূপ অর্থ সমর্থন করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের পূর্ব্বে জয়ন্ত ভট্টও কিন্তু বহু প্রাচীন মতের বর্ণনা করিলেও বাচস্পতি মিশ্রের উক্তরূপ ব্যাখ্যার কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই। তিনি বাচস্পতি মিশ্রের 'তাৎপর্য্যটীকা' দেখিতে পাইলে অবশ্যই তাঁহার ঐ সমস্ত কথারও সমালোচনা করিতেন। আর তিনি যে পরেও "তাৎপর্য্যটীকা"র সন্দর্ভ উদ্ধৃত করেন নাই, ইহাও এখন আমরা বুঝিতেছি।† পরন্তু জয়ন্ত ভট্ট পরে (১০৯ পৃঃ) ঈশ্বরকৃষ্ণের কথিত প্রত্যক্ষলক্ষণ খণ্ডন করিতে সেখানে "সাংখ্যকারিকা"র প্রাচীন রাজবার্ত্তিকের

---

* "অত্র চ পূর্ব্বাচার্য্যকৃতব্যাখ্যাবৈমুখ্যেন সংখ্যাবদ্ভিস্ত্রিলোচনগুরুবাচস্পতিপ্রমুখৈরয়মর্থঃ সমর্থিতো যথা ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যভিচারি প্রত্যক্ষমিত্যেবং প্রত্যক্ষলক্ষণং, 'যতঃ' শব্দাধ্যাহারেণ চ" ইত্যাদি।—"প্রমাণমীমাংসা", ৩৬ পৃঃ।

† জয়ন্ত ভট্ট পরে (৩১২ পৃঃ) জাতির সমবায়সম্বন্ধ সমর্থন করিতে লিখিয়াছেন,—"তদপি পরিহৃতমাচার্য্যৈঃ, 'জাতঞ্চ সম্বদ্ধঞ্চেত্যেকঃ কালঃ' ইতিবদদ্ভিঃ।" কিন্তু উক্ত "আচার্য্য" শব্দের দ্বারা বাচস্পতি মিশ্রকেই বুঝিবার কোন কারণ নাই। তাঁহার বহু পূর্ব্বে অবয়বরূপ দ্রব্যে অবয়বী দ্রব্যের সমবায় সম্বন্ধ সমর্থন করিতে "ন্যায়বার্ত্তিকে" ।২।১।৩৩ (২৩৩ পৃঃ) উদ্দ্যোতকর লিখিয়া গিয়াছেন,—"জাতঃ সম্বদ্ধশ্চেত্যেকঃ কালঃ"। বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য্যটীকায় (২৬৭ পৃঃ) ঐ কথারই অনুবাদ করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্ট উক্ত সন্দর্ভে "আচার্য্য" শব্দের দ্বারা উদ্দ্যোতকরকেও গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি তাৎপর্য্য-টীকার সন্দর্ভ উদ্ধৃত করেন নাই।

ব্যাখ্যাবিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বাচস্পতি মিশ্রের "তত্ত্বকৌমুদী"র ব্যাখ্যা দেখিতে পাইলে সেখানে ঐরূপ দোষ বলিতেই পারিতেন না, ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক।

ভাষ্য। আত্মাদিষু সুখাদিষু চ* প্রত্যক্ষলক্ষণং বক্তব্য-মনিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজং হি তদিতি। ইন্দ্রিয়স্য বৈ সতো মনস ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পৃথগুপদেশো ধর্ম্মভেদাৎ। ভৌতিকানীন্দ্রিয়াণি নিয়তবিষয়াণি, সগুণানাঞ্চৈষামিন্দ্রিয়ভাব ইতি। মনস্ত্বভৌতিকং সর্ব্ববিষয়ঞ্চ, ন্যাস্য সগুণস্যেন্দ্রিয়ভাব ইতি। সতি চেন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষে সন্নিধিমসন্নিধিঞ্চাস্য যুগপজ্‌জ্ঞানানুৎপত্তিকারণং বক্ষ্যাম ইতি। মনসশ্চেন্দ্রিয়ভাবান্ন বাচ্যং লক্ষণান্তরমিতি। তন্ত্রান্তরসমাচারাচ্চৈতৎ প্রত্যেতব্যমিতি। পরমতমপ্রতিষিদ্ধ-মনুমতমিতি হি তন্ত্রযুক্তিঃ। ব্যাখ্যাতং প্রত্যক্ষম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—(পূর্ব্বপক্ষ) আত্মা প্রভৃতি এবং সুখ প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যক্ষের লক্ষণ (লক্ষণান্তর) বক্তব্য। কারণ, তাহা অর্থাৎ আত্মাদি এবং সুখাদির প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজন্য নহে। (উত্তর) ইন্দ্রিয়রূপেই বিদ্যমান মনের ধর্ম্মভেদবশতঃ (ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের বৈধর্ম্ম্যবশতঃ) ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে পৃথক্ উপদেশ হইয়াছে। (যে ধর্ম্মভেদবশতঃ মনের পৃথক্ উপদেশ হইয়াছে, সেই ধর্ম্মভেদগুলি ক্রমশঃ দেখাইতেছেন)। ইন্দ্রিয়গুলি (ঘ্রাণ প্রভৃতি পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়) ভৌতিক (ভূত-জন্য বা ভূতাত্মক), নিয়তবিষয় (তাহাদিগের বিষয়ের নিয়ম আছে) এবং গুণবিশিষ্ট হইয়াই ইহাদিগের (ঘ্রাণাদির) ইন্দ্রিয়ত্ব। মন কিন্তু অভৌতিক এবং সর্ব্ববিষয়, গুণবিশিষ্ট হইয়া ইহার ইন্দ্রিয়ত্ব নাই এবং ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ থাকিলে ইহার (মনের) সন্নিধি ও অসন্নিধি অর্থাৎ কোন এক ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ এবং তৎকালে অন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত অসংযোগকে যুগপৎ জ্ঞানের অনুৎপত্তির অর্থাৎ একই সময়ে অনেক ইন্দ্রিয়জন্য অনেক প্রত্যক্ষ না

* "সুখাদিষু" এই পদে 'আদি' শব্দের দ্বারা অনিত্য জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন ও দুঃখ এবং "আত্মাদিষু" এই পদে 'আদি' শব্দের দ্বারা জ্ঞানত্বাদি জাতি গৃহীত হইয়াছে। "ভাষ্যে চাত্মাদিষু সুখাদিষ্বিতি নিত্যানিত্যাভিপ্রায়ং বর্গদ্বয়ং, আত্মসুখত্বাদয়ো নিত্যা অনিত্যাশ্চ সুখ-দুঃখাদয় ইতি।"—তাৎপর্য্যটীকা।

হওয়ার কারণ (প্রয়োজক) বলিব। সুতরাং মনেরও ইন্দ্রিয়ত্ব থাকায় (মানস প্রত্যক্ষের) লক্ষণান্তর বক্তব্য নহে।

"তন্ত্রান্তর-সমাচার" অর্থাৎ শাস্ত্রান্তরের সংবাদ বা অবিরোধ প্রযুক্তও ইহা (মনের ইন্দ্রিয়ত্ব) বুঝিতে পারা যায়। কারণ, অপ্রতিষিদ্ধ পরমত "অনুমত", ইহা তন্ত্রযুক্তি। প্রত্যক্ষ ব্যাখ্যাত হইল।

টিপ্পনী:—ভাষ্যকার মহর্ষির প্রত্যক্ষলক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে একটি পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন যে, মহর্ষি পরে ইন্দ্রিয়ের বিভাগসূত্রে ইন্দ্রিয়মধ্যে মনের উল্লেখ না করায় বুঝা যায় যে, তাঁহার মতে মন ইন্দ্রিয় নহে। কিন্তু তাহা হইলে আত্মা ও সুখ-দুঃখাদি অনেক পদার্থের যে মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ জন্মে, সেই সমস্ত মানস প্রত্যক্ষ উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয় না। কারণ, তাহা ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজন্য নহে। অতএব সেই সমস্ত মানস প্রত্যক্ষের লক্ষণান্তর বক্তব্য। এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—**"ইন্দ্রিয়স্য বৈ"** ইত্যাদি। উক্ত স্থলে "বৈ" শব্দের অর্থ অবধারণ। "ইন্দ্রিয়স্য বৈ" ইন্দ্রিয়স্যৈব। ভাষ্যকারের উত্তর এই যে, মহর্ষি গোতমের মতেও মন ইন্দ্রিয়ই। তথাপি তিনি যে, ইন্দ্রিয় হইতে মনের পৃথক্ উপদেশ করিয়াছেন, তাহার কারণ "ধর্ম্মভেদ"। ধর্ম্মভেদ বলিতে ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনের বৈধর্ম্ম্য। ভাষ্যকার পরে সেই সমস্ত বৈধর্ম্ম্য বলিয়াছেন। যথা—ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় ভৌতিক, এবং তাহাদিগের বিষয়নিয়ম আছে এবং তাহারা গন্ধ প্রভৃতি যে সমস্ত গুণের প্রত্যক্ষ জন্মায়, তজ্জাতীয় গন্ধাদি গুণবিশিষ্ট। কিন্তু মন ইহার বিপরীত, মন অভৌতিক, এবং সর্ব্ববিষয় অর্থাৎ মনের গ্রাহ্য বিষয়ের কোন নিয়ম নাই। সমস্ত বিষয়জ্ঞানেই মন আবশ্যক। এবং মনে গন্ধাদি কোন গুণ না থাকিলেও উহা গন্ধাদি গুণের গ্রাহক হয়। কিন্তু উদ্দ্যোতকর এখানে ভাষ্যকারোক্ত সমস্ত বৈধর্ম্ম্য গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে অভৌতিকত্ব অনিত্য পদার্থেরই ধর্ম্ম, সুতরাং উহা নিত্য মনের ধর্ম্ম হইতে পারে না এবং তাহা বলিলে নিত্য শ্রবণেন্দ্রিয়েও অভৌতিকত্ব স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয় ও মনের সর্ব্ববিষয়ত্ব ও অসর্ব্ববিষয়ত্বই বৈধর্ম্ম্য। মন সর্ব্ববিষয়, "মনঃ সর্ব্ববিষয়ং স্মৃতিকারণসংযোগধারত্বাৎ আত্মবৎ" ইত্যাদি প্রকারে অনুমান দ্বারা মনের সর্ব্ববিষয়ত্ব সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন বিষয়ের সহিত এক সময়ে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ থাকিলেও একই সময়ে অতি সূক্ষ্ম মনের অনেক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ সম্ভব না হওয়ায় যুগপৎ অনেক ইন্দ্রিয়জন্য

অনেক প্রত্যক্ষ জন্মে না। তৎকালে কোন এক ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সন্নিধি বা সংযোগ এবং অপর ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার অসংযোগই যুগপৎ ঐরূপ প্রত্যক্ষ না হওয়ার হেতু বা প্রয়োজক বলিব। অর্থাৎ মহর্ষি নিজেই পরে ঐ কথা বলিয়া মনের অস্তিত্বসাধক অনুমান-প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। যথাস্থানে তাহা বলিব।

ফলকথা, মহর্ষি গোতমের মতে মনও ইন্দ্রিয়, সুতরাং "ন বাচ্যং লক্ষণান্তরং" অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষের পৃথক লক্ষণ তাঁহার বক্তব্য নহে। কিন্তু মহর্ষি গোতম মনের অস্তিত্বসাধক প্রমাণাদি বলিলেও মন যে তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়, ইহা ত তদ্দ্বারা বুঝা যায় না, সুতরাং কিরূপে তাহা বুঝিব? বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, এই জন্যই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন, "তন্ত্রান্তরসমাচারাচ্চ" ইত্যাদি। "তন্ত্র্যতে ব্যুৎপাদ্যতেঽনেন তন্ত্রং" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে "তন্ত্র" শব্দের অর্থ শাস্ত্র। অর্থাৎ শাস্ত্রান্তরে মনের যে ইন্দ্রিয়ত্ব কথিত হইয়াছে, মহর্ষি তাহার প্রতিষেধ বা খণ্ডন না করায় উহা তাঁহার সম্মতই বুঝা যায়। কারণ, পরমত প্রতিষিদ্ধ বা খণ্ডিত না হইলে উহা 'অনুমত', ইহা 'তন্ত্রযুক্তি'।*

ভাষ্যকারের প্রতিবাদী বৌদ্ধাচার্য্য দিঙ্‌নাগ পরে নিজমত সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন যে, † ন্যায়সূত্র-কারের মতেও সুখাদি প্রমেয় নাই এবং মন নামে অন্য ইন্দ্রিয়ও নাই। যদি বল, তিনি মনের ইন্দ্রিয়ত্বের নিষেধ বা খণ্ডন না করায় উহা তাঁহার সম্মত বুঝা যায়, তাহা হইলে "অন্যেন্দ্রিয়রুতং বৃথা"। অর্থাৎ তিনি যে, ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় বলিয়াছেন, তাহা ব্যর্থ হয়। কারণ, সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের খণ্ডন না করাতেই উহা তাঁহার সম্মত, ইহা বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু তিনি যখন ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন, তখন তাঁহার মতে মন ইন্দ্রিয়ই নহে, ইহাই বুঝা যায়। 'ন্যায়বার্ত্তিকে' উদ্দ্যোতকর দিঙ্‌নাগের নামাদির উল্লেখ না করিলেও তাঁহার ঐ কথারই প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছেন,— "ন ভবতা তন্ত্রযুক্তিঃ পরিজ্ঞায়তে"। অর্থাৎ উক্ত তন্ত্রযুক্তি না বুঝিয়াই ঐরূপ

* 'সুশ্রুত' গ্রন্থের উত্তরতন্ত্রে ৩২ প্রকার "তন্ত্রযুক্তি"র লক্ষণ ও উদাহরণ কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটির নাম "অনুমত"। "পরমতমপ্রতিষিদ্ধমনুমতং ভবতি, যথা অন্যো ব্রূয়াৎ সপ্তরসা ইতি" (সুশ্রুত)। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'র শেষভাগেও ঐ সমস্ত "তন্ত্রযুক্তি" কথিত হইয়াছে।

† "ন সুখাদি প্রমেয়ং বা মনো বাস্তীন্দ্রিয়ান্তরং। অনিষেধাদুপাত্তঞ্চেদন্যেন্দ্রিয়রুতং বৃথা।।"—"প্রমাণসমুচ্চয়", ১ম পঃ।

অমূলক প্রতিবাদ করা হইয়াছে। কেহ নিজমত কিছুই না বলিলে তাঁহার নিজমত ও পরমত বুঝাই যায় না। কোন বিষয়ে নিজমত বলিয়া, তাহার অবিরুদ্ধ পরমতের খণ্ডন না করিলেই সেই পরমতকে 'অনুমত' বলে। অর্থাৎ সেইরূপ স্থলেই উক্ত "তন্ত্রযুক্তি" বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ মহর্ষি ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ না করিলে তাঁহার অবশ্যবক্তব্য দ্বাদশ প্রমেয় বলা হয় না। আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় মধ্যে তৃতীয় প্রমেয় ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের উদ্দেশ না করিলে তাহার লক্ষণবচন ও পরীক্ষাও হয় না। সুতরাং শিষ্যগণের ইন্দ্রিয়তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না। পরন্তু মহর্ষি মনের তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনের জন্য দ্বাদশ প্রমেয় মধ্যে মনের পৃথক্ উল্লেখ করায় তৃতীয় প্রমেয় ইন্দ্রিয়ের বিভাগসূত্রে মনের উল্লেখ করেন নাই, ইহাও বুঝা আবশ্যক।

প্রশ্ন হয় যে, শাস্ত্রান্তরে মনের ন্যায় বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ও কথিত হইয়াছে। মনু বলিয়াছেন—"একাদশেন্দ্রিয়াণ্যাহুর্যানি পূর্ব্বে মনীষিণঃ।" "একাদশং মনো জ্ঞেয়ং" (২য় অঃ, ৮৯।৯২)। পূর্ব্বোক্ত বাক্, পাণি প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে গ্রহণ করিয়াই একাদশ ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে এবং উহা যে, সুপ্রাচীন মত, ইহাও ব্যক্ত করিতে বলা হইয়াছে,— "যানি পূর্ব্বে মনীষিণঃ।" কিন্তু মহর্ষি গোতম উক্ত বাক্, পাণি প্রভৃতির ইন্দ্রিয়ত্বও খণ্ডন না করায় উহাও কি তাঁহার সম্মত বুঝিতে হইবে? এ বিষয়ে বাচস্পতি মিশ্র পরে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি গোতম বিচার দ্বারা বহিরিন্দ্রিয়ের পঞ্চত্বসিদ্ধান্তই সমর্থন করায় বাক্, পাণি প্রভৃতি যে, তাঁহার মতে ইন্দ্রিয় নহে, কিন্তু শাস্ত্রে উহাতে "ইন্দ্রিয়" শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে, ইহাই বুঝা যায়। বাচস্পতি মিশ্র সেখানে ইহার যুক্তিও বলিয়াছেন (তৃতীয় খণ্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সে যাহা হউক, বস্তুতঃ মহর্ষি গোতমের মতে মনও ইন্দ্রিয়। কিন্তু কিরূপে ইহা বুঝা যায়? এ বিষয়ে ভাষ্যকার এখানে পরে গৌণভাবে 'তন্ত্রান্তর-সমাচার'কেও হেতু বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের "তন্ত্রান্তর-সমাচারাচ্চ" এই বাক্যে "চ" শব্দের অর্থ সমুচ্চয় নহে, কিন্তু "অন্বাচয়", ইহাই আমাদিগের মনে হয়। তাহা হইলে উক্ত "চ" শব্দের দ্বারা উক্ত হেতুর অপ্রাধান্যই বুঝা যায়।* তাহা হইলে ভাষ্যকারের অভিমত

* যেমন কোন ব্রহ্মচারী বটুকে তাহার গুরু বলিয়াছেন,—"ভো বটো ভিক্ষামট, যদি পশ্যসি গাঞ্চানয়।" উক্ত বাক্যে "চ" শব্দের অর্থ "অন্বাচয়"। কারণ, সেই ব্রহ্মচারীর ভিক্ষাচরণই মুখ্য কর্ত্তব্য, সম্ভব হইলে গো আনয়নও কর্ত্তব্য, তাহা না করিলেও ক্ষতি নাই, ইহাই উক্ত বাক্যের দ্বারা গুরুর বিবক্ষিত। সুতরাং উক্তরূপ স্থলে "চ" শব্দের সমুচ্চয় অর্থ

প্রধান হেতু বা প্রকৃত হেতু কি? যদ্দ্বারা গোতমের মতে মনও ইন্দ্রিয়, ইহা বুঝা যায়? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, উক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণ-সূত্র দ্বারাই বুঝা যায় যে, মনও তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়। কারণ, তাঁহার মতে জ্ঞানের যে মানস প্রত্যক্ষ হয়, ইহা পরে তিনি "জ্ঞান-বিকল্পানাং ভাবাভাবসংবেদনাদধ্যাত্মং"— এই (৫।১।৩১) সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতে মন ইন্দ্রিয় না হইলে তিনি ঐ কথা বলিতে পারেন না। কারণ, পূর্ব্বে প্রত্যক্ষলক্ষণে তিনি বলিয়াছেন,—"ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানং।" কিন্তু ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় হইতে মনের বৈশিষ্ট্যবশতঃ মনের বিশেষরূপে তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনের জন্যই তিনি প্রমেয় পদার্থমধ্যে ইন্দ্রিয় হইতে মনের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। উপনিষদেও উক্ত কারণেই ইন্দ্রিয় হইতে মনের পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে। তদনুসারে "চরকসংহিতা"তেও উক্ত হইয়াছে,—"মনোদশেন্দ্রিয়াণ্যর্থাঃ"। "বুদ্ধীন্দ্রিয়-মনোঽর্থানাং" (শারীরস্থান, ১ম অঃ, ১৫শ ও ২৩শ শ্লোক)।

পরবর্ত্তী নব্যবৈদান্তিক ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র "বেদান্তপরিভাষা" গ্রন্থে উপনিষদে ইন্দ্রিয় হইতে মনের পৃথক্ উল্লেখ দেখাইয়া মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকার করেন নাই। কিন্তু শারীরকভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর যে মনকেও ইন্দ্রিয়ই বলিয়াছেন* এবং সেখানে 'ভামতী' টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও যে, উহা সমর্থন করিতে উপনিষদে ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে মনের পৃথক্ উল্লেখের পূর্ব্বোক্তরূপ কারণই বলিয়াছেন, ইহাও দেখা আবশ্যক। "বেদান্তপরিভাষা"কার সে সকল কথার কোন উল্লেখই করেন নাই। পরন্তু তিনি ভগবদ্‌গীতার "মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি" এই বাক্যের দ্বারা মনের ইন্দ্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন হয় না, ইহা সমর্থন করিয়া গীতাশাস্ত্রেও যে, মনকে ইন্দ্রিয় বলা হয় নাই, ইহাও সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ভগবদ্‌গীতার দশম অধ্যায়ে "ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি" এই সরলার্থ বাক্যের দ্বারা মনের ইন্দ্রিয়ত্ব যে স্পষ্টই বুঝা যায় এবং ভাষ্যকার শঙ্কর প্রভৃতিও যে সেখানে অন্যরূপ কোন ব্যাখ্যা করেন নাই এবং তাহা করিতেও পারেন না, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। "বেদান্তপরিভাষা"কার পূর্ব্বোক্ত সুপ্রসিদ্ধ ভগবদবাক্যেরও কোন

বলা যায় না। তাই পূর্ব্বাচার্য্যগণ উক্তরূপ স্থলে "চ" শব্দ ও তদর্থক "অপি" শব্দের "অন্বাচয়" নামে একটি পৃথক্ অর্থ স্বীকার করিয়াছেন। তদনুসারে অনেক গ্রন্থের টীকাকারগণ উক্তরূপ স্থলে "অন্বাচয়ে 'চ' কারঃ" এবং "চকারস্ত অন্বাচয়শিষ্টত্বাৎ" এইরূপ লিখিয়াছেন। এই সূত্রে "ব্যবসায়াত্মকং" এই পদের ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্রের কথাও দ্রষ্টব্য।

* "স্মৃতৌ ত্বেকাদশেন্দ্রিয়াণীতি মনোঽপীন্দ্রিয়ত্বেন শ্রোত্রাদিবৎ সংগৃহ্যতে।"— শারীরকভাষ্য, ২।৪।১৭।

উল্লেখই করেন নাই। ফলকথা, "বেদান্তপরিভাষা"কারের উক্ত নবীন মতকে আমরা বেদান্তমত বলিয়া বুঝিতে পারি না। কারণ, বেদমূলক স্মৃতিশাস্ত্রে মনকে ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। তদনুসারে আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি উক্ত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। সাংখ্যাচার্য্যগণও মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়াছেন। পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে মহর্ষি জৈমিনিও "সংসম্প্রয়োগে পুরুষস্যেন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধিজন্ম তৎ প্রত্যক্ষং" ইত্যাদি সূত্রে "ইন্দ্রিয়" শব্দের দ্বারা মনকেও গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত প্রত্যক্ষসূত্রবার্ত্তিকে মীমাংসাচার্য্য কুমারিল ভট্টও স্পষ্ট বলিয়াছেন, "মনসস্ত্বিন্দ্রিয়ত্বেন সুখদুঃখাদিবুদ্ধিষু" ইত্যাদি (১২৬ শ্লোক)।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত জৈমিনিসূত্রে সংশয়াদিপ্রত্যক্ষ-বারক কোন পদের প্রয়োগ না হওয়ায় উদ্দ্যোতকর শেষে জৈমিনির প্রত্যক্ষলক্ষণকে এবং উক্ত কারণে সর্ব্বশেষে বৃদ্ধসাংখ্য বার্ষগণ্য মুনির লক্ষণকেও অলক্ষণ বলিয়াছেন।* কারণ, সংশয় ও বিপর্য্যয়রূপ ভ্রম প্রত্যক্ষও উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়। পরে মীমাংসাচার্য্যগণ নানারূপে জৈমিনিসূত্রোক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়া নিজ নিজ মতানুসারে উক্ত লক্ষণের পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জয়ন্ত ভট্ট তাঁহাদিগেরও অনেক কথার প্রতিবাদ করিয়া, গোতমোক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণেরই সমর্থন করিয়াছেন। পরন্তু তিনি ঐ প্রসঙ্গে বহু বিচারপূর্ব্বক ইহাও সমর্থন করিয়াছেন যে, যোগিবিশেষের যোগজ সন্নিকর্ষজন্য অলৌকিক প্রত্যক্ষ এবং যুগপৎ সর্ব্ববিষয়ক প্রত্যক্ষরূপ সর্ব্বজ্ঞতাও অবশ্য জন্মে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত মীমাংসা-সূত্রে জৈমিনি যে, প্রত্যক্ষকে ধর্ম্মবিষয়ে অপ্রমাণ বলিয়াছেন, ইহা বলা যায় না। কারণ, যোগিবিশেষের অলৌকিক প্রত্যক্ষও ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে। কিন্তু জয়ন্ত ভট্টের ঐ কথায় বক্তব্য এই যে, মনু বলিয়াছেন,—"বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাং।" ধর্ম্মবিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্র ও সদাচারের প্রামাণ্যও বেদমূলকত্বপ্রযুক্ত। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি

---

* "বার্ষগণ্যস্যাপি লক্ষণমযুক্তমিত্যাহ,—"শ্রোত্রাদিবৃত্তি"রিতি। পঞ্চানাং খল্বিন্দ্রিয়াণামর্থাকারেণ পরিণতানামালোচনমাত্রং বৃত্তিরিষ্যতে, সাচ সংশয়াদিব্যাপকত্বাদলক্ষণমিতি" (তাৎপর্য্যটীকা, ১০৩ পৃঃ)। জয়ন্ত ভট্টও বার্ষগণ্যের উক্ত মত খণ্ডন করিতেই বলিয়াছেন,—"শ্রোত্রাদিবৃত্তিরপরৈরবিকল্পিকেতি প্রত্যক্ষলক্ষণমবর্ণি তদপ্যসারং" ইত্যাদি (ন্যায়মঞ্জরী"—১০০ পৃঃ)। "প্রমাণসমুচ্চয়ে"র বৃত্তিতে উহা কাপিল মত বলিয়া এবং জৈন হেমচন্দ্রের "প্রমাণমীমাংসা" গ্রন্থে বৃদ্ধসাংখ্য-মত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। "সাংখ্যকারিকা"র নবপ্রকাশিত প্রাচীন টীকা "যুক্তিদীপিকা"য়—(কলিকাতা সংস্কৃত সিরীজ) বার্ষগণ্যের অনেক মত পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ দেখিতে পাই না।

নৈয়ায়িকগণও বিচারপূর্ব্বক উক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন (জয়ন্ত ভট্টও পরে (২৪৬ পৃঃ) ইহা স্বীকার করিয়াছেন।) বেদের কোন অপেক্ষা না করিয়া, ঋষিগণ অতীন্দ্রিয় অদৃষ্টের প্রত্যক্ষ করিয়া স্মৃতি রচনা করিতে পারেন না, এই তাৎপর্য্যেই কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে (২।৩) উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন,—"মন্বাদীনামতীন্দ্রিয়ার্থদর্শনে প্রমাণাভাবাৎ।" "বাক্যপদীয়" গ্রন্থে ভর্ত্তৃহরিও বলিয়াছেন,—"ঋষীণামপি যজ্‌জ্ঞানং তদপ্যাগমহেতুকং।" কিন্তু বেদানুসারে বহু জন্মের সাধনার দ্বারা কালে যোগসংসিদ্ধ মহর্ষিগণের সর্ব্বজ্ঞতালাভ যোগশাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। উপনিষদেও একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান লাভ উপদিষ্ট হইয়াছে। ন্যায়বৈশেষিকসম্প্রদায়ও যোগীর যোগজসন্নিকর্ষজন্য সর্ব্ববিষয়ক অলৌকিক প্রত্যক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। অবশ্য মীমাংসাচার্য্য প্রভাকর ও কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি যোগীর অলৌকিক প্রত্যক্ষ এবং সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের অস্তিত্বেরও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যমূলক প্রৌঢ়িবাদও বলা যাইতে পারে। বেদ কোন পুরুষপ্রণীত নহে, বেদ নিত্য, এবং ধর্ম্মবিষয়ে কাহারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে পারে না। কিন্তু বেদই প্রমাণ, এই সিদ্ধান্ত স্থাপনই তখন তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল।

পরন্তু পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে মহর্ষি জৈমিনি সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের অস্তিত্বের কোন প্রতিবাদ করেন নাই। বেদান্তদর্শনে বাদরায়ণ অনেক বেদান্তসিদ্ধান্তে জৈমিনির মতবিশেষের উল্লেখ করিয়া স্বর্গভিন্ন মুক্তি এবং সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরও যে জৈমিনির সম্মত, ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন। আর পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে জৈমিনি ইন্দ্রিয়ের লৌকিকসন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষকেই বর্ত্তমানবিষয়ক বলিয়াছেন, ইহাই সরল ভাবে বুঝা যায়। তদনুসারেই "শ্লোকবার্ত্তিকে" কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন,—"সম্বদ্ধং বর্ত্তমানঞ্চ গৃহ্যতে চক্ষুরাদিনা" (৪ সূ, ৮৪)। কিন্তু জৈমিনির মতে যে, কোন মহাযোগীরও মনের দ্বারা কখনও অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ বিষয়ে প্রত্যক্ষ জন্মে নাই এবং তাহা জন্মিতেই পারে না, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। কুমারিল ভট্টও পরে ভবিষ্যৎ পদার্থ-বিষয়েও প্রত্যক্ষ স্বীকার করিয়াছেন, ইহাও জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন। সে যাহা হউক, বস্তুতঃ যোগশক্তির অসামান্য প্রভাবে অনেক মহাযোগী যে, জাতিস্মরও হইয়াছেন এবং অনেকে অতীত ও ভবিষ্যৎ প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েরই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এ বিষয়ে বহু প্রমাণ আছে। কেবল তর্কের দ্বারা সেই সমস্ত যোগসিদ্ধ মহর্ষিগণের ত্রিকালদর্শিত্বের অপলাপ

করা যায় না। জৈনসম্প্রদায়ও ব্যক্তিবিশেষের সর্ব্বজ্ঞতা সমর্থন করিয়াছেন।* বৌদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তিও চতুর্ব্বিধ প্রত্যক্ষ বলিতে সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন,—"ভূতার্থ-ভাবনাপ্রকর্ষপর্য্যন্তজং যোগিজ্ঞানঞ্চেতি" ("ন্যায়বিন্দু")। কিন্তু বৌদ্ধমতে যোগীদিগের নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষই প্রমাণ। কারণ, কাহারও সবিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতেই পারে না।

ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতে প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু ক্ষণিক, অর্থাৎ যে ক্ষণে সেই বিষয়ের উৎপত্তি হয়, তাহার পরক্ষণেই উহার বিনাশ এবং তজ্জাতীয় অপর বিষয়ের উৎপত্তি হয়। সুতরাং সেই বিষয়ের উৎপত্তির পরক্ষণেই তাহার প্রত্যক্ষ জন্মিলে তাহাতে অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সেই বিষয় কারণ হইতে পারে। কিন্তু পরে সবিকল্পক প্রত্যক্ষের অব্যবহিত পূর্ব্বে সেই বিষয় বিদ্যমান না থাকায় সেই প্রত্যক্ষে সেই বিষয় কারণ হইতে পারে না। সুতরাং সবিকল্পক প্রত্যক্ষ সদ্বিষয়ক না হওয়ায় তাহাকে প্রমাণ বলা যায় না। বিষয়জন্য প্রত্যক্ষই প্রমাণ হইতে পারে। সুতরাং প্রথমোৎপন্ন নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষই প্রমাণ। উক্ত সিদ্ধান্তানুসারেই বিজ্ঞানবাদী কোন বৌদ্ধসম্প্রদায় প্রথমে বলিয়াছিলেন,—"ততোঽর্থাদ্বিজ্ঞানং প্রত্যক্ষং।" "কাব্যালঙ্কার" গ্রন্থে ভামহও উক্ত মতান্তর প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,—"ততোঽর্থাদিতি কেচন।" বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রবল প্রতিবাদী প্রাচীন ন্যায়াচার্য্য উদ্দ্যোতকর ন্যায়বার্ত্তিকে প্রথমে উক্ত মতেরই খণ্ডনার্থ বলিয়াছেন,—"অপরে পুনর্ব্বর্ণয়ন্তি 'ততোঽর্থাদ্বিজ্ঞানং প্রত্যক্ষ'মিতি তন্ন।" উদ্দ্যোতকর উক্ত মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মে, কেবল সেই বিষয়জন্য যে বিজ্ঞান, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অনুমানাদি জ্ঞান কেবল সেই বিষয়জন্য নহে, সুতরাং তাহা প্রত্যক্ষ নহে। উদ্দ্যোতকর পরে বিচারপূর্ব্বক উক্ত লক্ষণে "অর্থাৎ" এই পদকে এবং পরে প্রথমোক্ত "ততঃ" এই পদকেও ব্যর্থ বলিয়াছেন। এবং বৌদ্ধসম্প্রদায়ের নিজসম্মত অনেক মূল সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া উক্ত লক্ষণের খণ্ডন করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া উক্ত লক্ষণের খণ্ডন করিয়াছেন এবং তিনি প্রথমে বলিয়াছেন,—"বাসুবন্ধবং তাবৎ প্রত্যক্ষলক্ষণং বিকল্পয়িতুমুপন্যস্যতি 'অপরে পুন'রিতি"

* সূক্ষ্মান্তরিতদূরার্থাঃ প্রত্যক্ষাঃ কস্যচিদ্ যথা।
অনুমেয়ত্বতোঽগ্ন্যাদিরিতি সর্ব্বজ্ঞসংস্থিতিঃ॥—'আপ্তমীমাংসা'। জৈন ধর্ম্মভূষণ যতির "ন্যায়দীপিকা" গ্রন্থে উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাদি দ্রষ্টব্য।

৯৯ পৃঃ—(বসুবন্ধোরিদং বাসুবন্ধবং) অর্থাৎ উদ্দ্যোতকর বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধুর উক্ত লক্ষণেরই উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। বস্তুতঃ "প্রমাণসমুচ্চয়" গ্রন্থে দিঙ্‌নাগের কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, "বাদবিধি" নামক গ্রন্থে "ততোঽর্থাদ্বিজ্ঞানং প্রত্যক্ষং" এইরূপ প্রত্যক্ষলক্ষণ কথিত হইয়াছে এবং ঐ গ্রন্থ যে বসুবন্ধুর রচিত, এইরূপ লোকপ্রসিদ্ধিও ছিল। সুতরাং তদনুসারে বাচস্পতি মিশ্র পরেও উক্ত লক্ষণকে বসুবন্ধুর লক্ষণ বলিতে পারেন। কিন্তু দিঙ্‌নাগ বলিয়া গিয়াছেন যে, উক্ত "বাদবিধি" গ্রন্থ আচার্য্য বসুবন্ধুর রচিত নহে। ঐরূপ দোষযুক্ত গ্রন্থ তাঁহার রচিত হইতে পারে না, তিনি উক্তরূপ লক্ষণ বলেন নাই। দিঙ্‌নাগ পরে উক্ত লক্ষণেরও খণ্ডন করিয়াছেন।*

কিন্তু দিঙ্‌নাগের মতেও যে জ্ঞানে বিষয়ের নাম ও জাতি প্রভৃতির যোজনা হয় না, অর্থাৎ নামাদির দ্বারা যাহার ব্যপদেশ হয় না, সেই স্বতঃপ্রকাশ জ্ঞানই অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তাই দিঙ্‌নাগ বলিয়াছেন, —"প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়ং।" কল্পনয়া অপোঢ়ং হীনং কল্পনাপোঢ়ং। দিঙ্‌নাগ পরে উহারই ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—"নামজাত্যাদ্যসংযুতং।"† 'ন্যায়-

* "প্রমাণসমুচ্চয়" গ্রন্থে দিঙ্‌নাগ বলিয়াছেন,—"নাচার্য্যস্য বাদবিধির্নাকৃতং সারনিশ্চয়ঃ। কথানাদস্তথাংশানাং পরীক্ষ্যাস্তে ন তে ময়া।।" "ততোঽর্থাজ্জাতং বিজ্ঞানং প্রত্যক্ষমিতি তত্র তু। ততোঽর্থাদিতি সর্ব্বঞ্চেৎ তদ্‌যৎ তন্মাত্রতো নহি।।" ১৪। ১৫ ।। "ন্যায়বার্ত্তিকে" (১।১।৩৩) উদ্দ্যোতকরও "যদপি বাদবিধৌ" ইত্যাদি সন্দর্ভে "বাদবিধি" নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থ কাহার রচিত, ইহা দিঙ্‌নাগও বলেন নাই। দিঙ্‌নাগের কথার দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে, তিনি বিজ্ঞানমাত্রবাদী মহাযান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের আচার্য্য বসুবন্ধুর সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য নহেন। তাঁহার গ্রন্থ রচনাকালে বসুবন্ধু জীবিত ছিলেন না, ইহা নিশ্চিত।

† মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গার কর্ত্তৃক তিব্বতী হইতে সম্পাদিত "প্রমাণসমুচ্চয়" গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে "প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়ং নামজাত্যাদ্যসংযুতং", এইরূপ পাঠই দেখা যায়। কিন্তু মীমাংসক মণ্ডন মিশ্রের "বিধিবিবেকে"র "ন্যায়কণিকা" টীকায় বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়া গিয়াছেন,—"ন খলু 'প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তমি'তি লক্ষণং নির্দ্দিষ্টলক্ষণ'মিতি প্রণয়তো দিঙ্‌নাগস্যৈব কল্পনাপোঢ়ত্বমাত্রং লক্ষণমপিতু তদেবাভ্রান্তত্বসহিতং প্রত্যক্ষলক্ষণমিতি মন্যতে স্ম কীর্ত্তিঃ" (১৯২ পৃঃ)। বাচস্পতি মিশ্র উক্ত স্থলে দিঙ্‌নাগের অন্য কোন গ্রন্থের উক্তরূপ শ্লোকার্দ্ধও উদ্ধৃত করিতে পারেন। কিন্তু তিনি "তাৎপর্য্যটীকা"য় দিঙ্‌নাগের "প্রমাণ-সমুচ্চয়" গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের অনেক শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে কোন কোন শ্লোক পূর্ব্বোক্ত "প্রমাণসমুচ্চয়" পুস্তকে যথাযথ দেখা যায় না।

বার্ত্তিকে' উদ্দ্যোতকর দিঙ্‌নাগের উক্ত মতেরই উল্লেখ করিতে পরে বলিয়াছেন,—"অপরে তু মন্যন্তে প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়মিতি।"* উদ্দ্যোতকর দিঙ্‌নাগের কথানুসারেই পরে তাঁহার ঐ লক্ষণোক্ত "কল্পনা"র ব্যাখ্যা করিয়া, তাঁহার মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"অথ কেয়ং কল্পনা? নামজাতিযোজনেতি, যৎ কিল ন নাম্না অভিধীয়তে, নচ জাত্যাদিভির্ব্যপদিশ্যতে, বিষয়স্বরূপানুবিধায়ি পরিচ্ছেদকমাত্মসংবেদ্যং তৎ প্রত্যক্ষমিতি।" অর্থাৎ নাম ও জাতি প্রভৃতি কল্পিত পদার্থের যোজনাই "কল্পনা" শব্দের অর্থ। যে জ্ঞানে সেই কল্পনা সম্ভব হয় না, যাহা কেবল সেই বিষয়ের স্বলক্ষণ বা স্বরূপমাত্রের নিশ্চায়ক আত্মসংবেদ্য জ্ঞান, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

উদ্দ্যোতকর পরে বিচারপূর্ব্বক উক্ত মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, উক্ত মতে "প্রত্যক্ষ" শব্দের অর্থ কি? যদি পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানই উহার অর্থ হয়, তাহা হইলে উহাকে অবাচ্য বা নামের দ্বারা অপ্রকাশ্য বলা যায় না। আর ঐ প্রত্যক্ষ শব্দের কোন অর্থ নাই, ইহা বলিলে উহা অবাচক শব্দ হয়। পরন্তু প্রত্যক্ষ শব্দেরই উক্তরূপ অর্থ হইলে "কল্পনাপোঢ়" শব্দ প্রয়োগ ব্যর্থ। আর উক্ত "কল্পনাপোঢ়" শব্দের অর্থ কি এবং উহার দ্বারা কিরূপে সেই অর্থ বুঝা যায়, ইহাও বক্তব্য। "অশ্বকর্ণ" প্রভৃতি শব্দের ন্যায় উক্ত "কল্পনাপোঢ়" শব্দের কোন ব্যুৎপত্তি নাই, ইহা বলিলেও উহার অর্থ বক্তব্য। পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানই উহার অর্থ হইলে সেই জ্ঞানকে অবাচ্য বলা যায় না। এবং "কল্পনাপোঢ়ং প্রত্যক্ষং" এই বাক্যের অভিধেয় কি? তাহাও বক্তব্য। উক্তরূপ জ্ঞানকেই অভিধেয় বলিলে উহাকে অবাচ্য বলা যায় না। "ন চাভিধেয়মিতি কোহন্যো ভদন্তাদ্বক্তু মর্হতি"। অর্থাৎ উক্ত বাক্যের কোন অভিধেয় বা প্রতিপাদ্যই নাই, ইহা ভদন্ত ভিন্ন আর কেহই বলিতে পারেন না। এখানে "ভদন্ত" শব্দের দ্বারা দিঙ্‌নাগই উদ্দ্যোতকরের বুদ্ধিস্থ। অন্যত্রও তিনি ঐরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর এই ভাবে অনেক বিচার করিয়া সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন,—"এবং যথাযথেদং লক্ষণং বিচার্য্যতে, তথা তথা

* প্রাচীন আলঙ্কারিক ভামহও "কাব্যালঙ্কার" গ্রন্থে (৫ম পৃঃ) দিঙ্‌নাগের মতানুসারেই প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই দ্বিবিধ প্রমাণ এবং যথাক্রমে তাহার অসাধারণ ও সামান্য, এই দ্বিবিধ বিষয় বলিয়া, পরে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিয়াছেন,—প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়ং ততোহর্থাদিতি কেচন। কল্পনাং নামজাত্যাদিযোজনাং প্রতিজানতে॥" (৫।৬) ভামহ প্রধানতঃ দিঙ্‌নাগের মতেরই উল্লেখ করায় তিনি দিঙ্‌নাগের সম্প্রদায়ভুক্তবৌদ্ধই ছিলেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। তথাপি এবিষয়ে মতভেদ আছে।

ন্যায়ং ন সহতে”। অর্থাৎ দিঙ্‌নাগের উক্ত লক্ষণ কোনরূপেই বিচারসহ নহে। ফলকথা এই যে, সবিকল্পক জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বীকার না করিলে কোন শব্দ বা বাক্যের দ্বারা তত্ত্ব-প্রতিপাদন সম্ভবই হইতে পারে না এবং সবিকল্পক জ্ঞানের বিষয় জাতি প্রভৃতি যে, কল্পিত বা অবাস্তব পদার্থ, ইহা কোনরূপেই প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না। এবং সমস্ত বস্তুই যে ক্ষণিক, ইহাও কোনরূপে প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না। পরে কুমারিল ভট্ট ও মণ্ডন মিশ্র প্রভৃতি মহামীমাংসকগণ সূক্ষ্মভাবে বিশেষ বিচার করিয়া বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সমস্ত কথার খণ্ডন করেন। কিন্তু বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের আচার্য্য মহামনীষী ধর্ম্মকীর্ত্তি নানা গ্রন্থের দ্বারা নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন।

দিঙ্‌নাগ বলিয়াছিলেন,—**“প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়ং”**। কিন্তু ধর্ম্মকীর্ত্তি উহার পরে “অভ্রান্তং” এই পদের যোগ করিয়া বলেন,—**“প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তং”**।—(ন্যায়বিন্দু)। অন্য গ্রন্থে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে, —“কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তং প্রত্যক্ষং নির্ব্বিকল্পকং। বিকল্পোঽবস্তুনির্ভাসাদসংবাদাদুপপ্লবঃ॥”* সবিকল্পক জ্ঞানের নামই “বিকল্প”, উহাতে জাতি প্রভৃতি অবস্তুর প্রকাশ হওয়ায় উহা উক্ত মতে “উপপ্লব” অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান। বৈশেষিকদর্শনের অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় সূত্রের “উপস্কারে” শঙ্কর মিশ্রও বলিয়াছেন,— “সবিকল্পকং জ্ঞানং ন প্রমাণমিতি কীর্ত্তি-দিঙ্‌নাগাদয়ঃ।” দিঙ্‌নাগের অনেক পরবর্ত্তী ধর্ম্মকীর্ত্তিই উক্ত সন্দর্ভে প্রথমে “কীর্ত্তি” নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রও ধর্ম্মকীর্ত্তিকে “কীর্ত্তি” নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। শঙ্কর মিশ্র উক্ত স্থলে পরে ধর্ম্মকীর্ত্তির কথার ব্যাখ্যা করিয়া সংক্ষেপে তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণ নানা গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধমত-খণ্ডনে বিস্তৃত বিচার করিয়া গিয়াছেন। “ন্যায়মঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্ট

---

* উক্ত শ্লোকটি ধর্ম্মকীর্ত্তির “প্রমাণবার্ত্তিক” গ্রন্থের শ্লোক, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রত্যক্ষলক্ষণে “কল্পনাপোঢ়” শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “অভিলাপসংসর্গযোগ্যপ্রতিভাসপ্রতীতিঃ কল্পনা, তয়া রহিতং” (“ন্যায়বিন্দু”)। অভিলাপ বলিতে পদার্থের বাচক শব্দ। সেই শব্দের সংসর্গযোগ্য প্রতিভাস অর্থাৎ অভিধেয় অর্থের প্রকাশ, যেরূপ প্রতীতিতে হয়, তাহাই “কল্পনা”। উক্ত মতে সবিকল্পক জ্ঞানে বিষয়বাচক শব্দসংসৃষ্ট অর্থ প্রকাশই হয়। শব্দানভিজ্ঞ বালক প্রভৃতির তাহা না হইলেও তাহা শব্দসংসর্গের যোগ্য। কিন্তু নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষে যে অর্থ প্রকাশ হয়, তাহা ঐরূপ শব্দসংসর্গের যোগ্যও নহে। সুতরাং নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষই “কল্পনাপোঢ়”। অন্য কথা ধর্ম্মোত্তরের টীকায় দ্রষ্টব্য।

ধর্মকীর্ত্তির প্রত্যক্ষলক্ষণ খণ্ডনেও অসামান্য পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনিও সবিকল্পক প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়া, শেষে বলিয়াছেন,—"তস্মাদ্‌যৎ কল্পনাপোঢ়পদং প্রত্যক্ষলক্ষণে। ভিক্ষুণা পঠিতং তস্য ব্যবচ্ছেদ্যং ন বিদ্যতে॥"—অর্থাৎ ধর্মকীর্ত্তির উক্ত লক্ষণে "কল্পনাপোঢ়ং" এই পদ ব্যর্থ। পরন্তু উক্ত পদের দ্বারাই ভ্রমপ্রত্যক্ষের বারণ হওয়ায় পরে "অভ্রান্তং" এই পদও ব্যর্থ। কারণ, কোন ভ্রমপ্রত্যক্ষই "কল্পনাপোঢ়" হইতে পারে না। কিন্তু 'তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" টীকায় (৬৫১ পৃঃ) উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন,—"দিঙ্‌নাগস্যাতিব্যাপকতয়াঽলক্ষণং, কীর্ত্তেস্ত্বব্যাপকতয়া, বিকল্পপ্রত্যক্ষানবরোধাৎ, তস্য চ প্রত্যক্ষত্বব্যুৎপাদনাৎ অনিষ্টমাত্রস্যাতিপ্রসঞ্জকত্বাদিতি সিদ্ধান্তঃ।" অর্থাৎ দিঙ্‌নাগের প্রত্যক্ষলক্ষণে ভ্রমপ্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তিদোষবশতঃ উহা লক্ষণ নহে। কিন্তু ধর্মকীর্ত্তির লক্ষণে "অভ্রান্তং" এই পদের দ্বারা উক্ত দোষের বারণ হইলেও সবিকল্পক যথার্থ প্রত্যক্ষে অব্যাপ্তিদোষবশতঃ উহাও লক্ষণ নহে। দিঙ্‌নাগের লক্ষণেও ঐ অব্যাপ্তিদোষ আছেই। কারণ, সবিকল্পক প্রত্যক্ষবিশেষের প্রামাণ্যও অবশ্য স্বীকার্য্য। নচেৎ নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষের প্রামাণ্যও সিদ্ধ হইতে পারে না। সবিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয় জাতি প্রভৃতিও সৎপদার্থ।

উদয়নাচার্য্যের পূর্ব্বে বাচস্পতি মিশ্র প্রথমে "ন্যায়কণিকা" টীকায় এবং পরে "ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা" ও "ভামতী" টীকায় বিস্তৃত বিচার দ্বারা বৌদ্ধসম্প্রদায়ের নানা মত খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত দুর্ব্বোধ মত সম্যক্ বুঝিতে হইলে বৌদ্ধাচার্য্যগণের অনেক গ্রন্থ পড়া আবশ্যক এবং পরে বৌদ্ধাচার্য্য রত্নকীর্ত্তি "অপোহসিদ্ধি" প্রভৃতি গ্রন্থে ত্রিলোচন, বাচস্পতি মিশ্র ও ন্যায়ভূষণের যে সমস্ত কথার উল্লেখপূর্ব্বক প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহাও সম্যক্ বুঝা আবশ্যক এবং বৌদ্ধাচার্য্যগণের সম্মত প্রমাণের স্বরূপ, বিজ্ঞানবাদ ও সে বিষয়ে মতভেদ প্রভৃতি প্রথমে জানা আবশ্যক।* ভারতের স্বধর্ম্মরক্ষক

* পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতে জ্ঞান স্বতঃপ্রকাশ। সম্যক্ জ্ঞান অর্থাৎ অবিসংবাদক জ্ঞানই প্রমাণ এবং সেই প্রমাণের ফল অর্থপ্রতীতিও বস্তুতঃ সেই প্রমাণ হইতে অভিন্ন। তাই তাঁহারা ফলপ্রমাণবাদী বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি বলিয়াছেন,—"তদেব প্রত্যক্ষং জ্ঞানং প্রমাণফলমর্থপ্রতীতিরূপত্বাৎ। অর্থসারূপ্যমস্য প্রমাণং, তদ্বশাদর্থপ্রতীতিসিদ্ধেরিতি" ('ন্যায়বিন্দু')। টীকাকার ধর্ম্মোত্তরের ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায় যে, যে বিষয় হইতে কোন জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানটী সেই বিষয়ের সদৃশ হয়। জ্ঞানের সেই যে বিষয়-সারূপ্য, তাহাই জ্ঞানের আকার ও আভাস বলিয়া কথিত হয়। জ্ঞানগত সেই বিষয়সাদৃশ্যই প্রমাণ। সেই সাদৃশ্যও সেই জ্ঞান হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। সুতরাং বস্তুতঃ উক্তরূপ জ্ঞানবিশেষই প্রমাণ।

সাধক ব্রাহ্মণ দার্শনিকগণ প্রথম হইতেই কত গ্রন্থে যে কতরূপে বিচার করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বৌদ্ধমতের খণ্ডন করিয়াছিলেন, তাহা এখন বলিবার উপায় নাই। সকল সম্প্রদায়েরই বহু গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পরে মিথিলার শিবসাধক মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের অখণ্ডনীয় প্রভাবেই ভারতে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের প্রভাব বিধ্বস্ত হয়। "বৌদ্ধাধিকারে" উদয়নাচার্য্যের এবং "ন্যায়মঞ্জরী"তে কাশ্মীরের বৌদ্ধবিজয়ী জয়ন্ত ভট্টের জয়শ্রী বিশেষ দ্রষ্টব্য। উক্ত বিষয়ে এখানে অধিক আলোচনা সম্ভব নহে। অতঃপর অনুমানপ্রমাণের ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য ॥ ৪ ॥

সূত্র। অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ব্ববচ্ছেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অর্থাৎ প্রত্যক্ষনিরূপণের অনন্তর (অনুমাননিরূপণ করিতেছি)। "তৎপূর্ব্বক" অর্থাৎ প্রত্যক্ষবিশেষমূলক জ্ঞান—অনুমান-প্রমাণ ত্রিবিধ, (১) পূর্ব্ববৎ, (২) শেষবৎ ও (৩) সামান্যতো দৃষ্ট।

টিপ্পনী—কোন বিষয়-নিরূপণের পরে অন্য বিষয়-নিরূপণে সেই নিরূপণীয় বিষয়ে সংগতি আবশ্যক, নচেৎ তাহার নিরূপণ অসংগত হয়। তাই মহর্ষি সেই সংগতি সূচনার জন্যই এই সূত্রের প্রথমে "অথ"শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। তদনুসারেই "তত্ত্বচিন্তামণি"কার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও প্রত্যক্ষখণ্ড-রচনার পরে অনুমানখণ্ড-রচনার প্রারম্ভে সংগতি প্রদর্শন করিয়াছেন। টীকাকারগণ তাহার বিশদব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। অনুমিতিদীধিতির টীকায় জগদীশ ও গদাধর ভট্টাচার্য্যের সংগতিব্যাখ্যা পাঠ করিলে উক্ত বিষয়ে বহু সূক্ষ্ম বিচার ও জ্ঞাতব্য জানা যাইবে। গঙ্গেশ উপাধ্যায় উপমানখণ্ড-রচনার পরে শব্দখণ্ড-রচনার প্রারম্ভেও বলিয়াছেন,—"অথ শব্দো নিরূপ্যতে।" সেখানে টীকাকার মথুরানাথ তর্কবাগীশ উক্ত অব্যয় "অথ" শব্দের উত্তর ক্রিয়াবিশেষণে দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ বলিয়া, উহার অর্থকে অভেদসম্বন্ধে নিরূপণ-ক্রিয়ার বিশেষণ বলিয়াছেন।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ন্যায় বাহ্য পদার্থের পৃথক্ সত্তাবাদী সৌত্রান্তিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ও উক্তরূপে সাকার বিজ্ঞানবাদী। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানের উক্তরূপ বিষয়সারূপ্য মানেন নাই, তাঁহারা নিরাকার বিজ্ঞানবাদী। "তাৎপর্য্যটীকা"য় (১৪ পৃঃ) বাচস্পতি মিশ্র উক্ত উভয় মতেরই উল্লেখ করিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য শেষোক্ত মতের ব্যাখ্যা করিয়া, পরে বলিয়াছেন,—"ইতি নিরাকারবাদিনো বৈভাষিকাদয়ঃ।" 'তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি', ১৫২-৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাঁহার ঐ সিদ্ধান্তানুসারে এখানে মহর্ষির উক্ত সূত্রেও 'অথ প্রত্যক্ষনিরূপণানন্তরং অনুমানং নিরূপ্যতে" এইরূপ ব্যাখ্যাই বুঝিতে হইবে। উক্ত "অথ" শব্দের বাচ্য অর্থ, লাক্ষণিক অর্থ ও সে বিষয়ে বিচার উক্ত স্থানে মথুরনাথের 'রহস্য'-টীকায় পাওয়া যাইবে।

ন্যায়সূত্রবৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে প্রথমে সংক্ষেপে বলিয়াছেন যে, এই সূত্রের প্রথমে আনন্তর্য্যবোধক "অথ" শব্দ হেতু-হেতুমদ্ভাবসংগতিসূচনার্থ। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বাচার্য্যগণ (১) "প্রসঙ্গ", (২) "উপোদ্‌ঘাত", (৩) "হেতুতা", (৪) "অবসর", (৫) "নির্ব্বাহকত্ব" ও (৬) "এককার্য্যত্ব" নামে যে ষট্‌প্রকার সংগতি বলিয়াছেন,* তন্মধ্যে "হেতুতা" নামক সংগতিই হেতু-হেতুমদ্ভাবসংগতি। "হেতু" শব্দের অর্থ কারণ এবং "হেতুমৎ" শব্দের অর্থ কার্য্য। যে কার্য্যে যাহা পরম্পরায় আবশ্যক হয়, তাহাও সেই কার্য্যে হেতু বা কারণ বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষপ্রমাণকে তজ্জন্য জ্ঞানবিশেষরূপ অনুমানপ্রমাণের হেতু বলা যায়। সুতরাং প্রত্যক্ষপ্রমাণের নিরূপণের অনন্তরই তাহার কার্য্য অনুমান-প্রমাণের নিরূপণ সংগত হয়। কারণ, উক্ত প্রমাণদ্বয়ের হেতু-হেতুমদ্ভাব আছে। কিন্তু অনুমান নিরূপণের অনন্তর প্রত্যক্ষ নিরূপণ সংগত নহে। মহর্ষি প্রথমে "অথ" শব্দের দ্বারা ইহাই সূচনা করিয়াছেন। পরন্তু প্রত্যক্ষের জ্ঞান ব্যতীত অনুমানের জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং ঐ জ্ঞানদ্বয়েরও কার্য্য-কারণভাব আছে। তাই অনুমানচিন্তামণির 'দীধিতি' টীকায় সংগতিবিচারে রঘুনাথ শিরোমণি পরে বলিয়াছেন,—"সম্ভবতি চেহ নিরূপণয়োরপি কার্য্যকারণভাবঃ। 'অথ তৎপূর্ব্বক'মিত্যাদিসূত্রে প্রত্যক্ষপূর্ব্বকত্বেনানুমাননিরূপণাৎ, তচ্ছব্দেন ব্যাপ্ত্যাদিপ্রত্যক্ষ-পরামর্শাৎ" ইত্যাদি।

---

* "অনুমিতিদীধিতি"র টীকায় সংগতিবিচারে জগদীশ লিখিয়াছেন,—সংগতিঃ ষড়্‌বিধা। তদুক্তমভিযুক্তৈঃ,—'সপ্রসঙ্গ উপোদ্‌ঘাতো হেতুতাবসরস্তথা। নির্ব্বাহকৈককার্য্যত্বে ষোঢ়া সংগতিরিষ্যতে॥' তত্র নির্দ্দিষ্টোপপাদকত্বমুপোদ্‌ঘাতঃ। 'চিন্তাং প্রকৃতসিদ্ধ্যর্থামুপোদ্‌-ঘাতং বিদুর্ব্বুধা' ইতি প্রাচীনগাথায়ামপি 'চিন্তা'পদং 'কৃদভিহিতো ভাবো দ্রব্যবৎ প্রকাশতে' ইতিন্যায়েন চিন্তনীয়পরং।" "অবসরো"হনন্তরবক্তব্যত্বং, অনন্তরোদ্দিষ্টত্বং তথেতি 'ন্যায়ভাস্কর'-কৃতঃ।" উক্ত মতান্তর ব্যক্ত করিতে পরে বলিয়াছেন,—"অনন্তরোদ্দিষ্টত্বমেবাবসরঃ, অতএব 'অবসরতঃ কথকাশক্তিনিরূপণ'মিতি 'পরিশিষ্ট-ব্যাখ্যানে ন্যায়ভাস্করকৃতা উদ্দেশলক্ষণা চাত্র সংগতিরিত্যুক্তমিত্যপি কেচিৎ।" উদয়নাচার্য্যের "প্রবোধসিদ্ধি" গ্রন্থের নামান্তরই "ন্যায়-পরিশিষ্ট" ও "পরিশিষ্ট" (পঞ্চম খণ্ড, ২৫৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। উহার টীকার নাম "ন্যায়-ভাস্কর"। ঐ টীকা পাইলে ঐ গ্রন্থ সুগম হইবে এবং উহার পাঠাপাঠও বুঝা যাইবে।

এই সূত্রে "অনুমানং" এই পদের দ্বারা লক্ষ্য নির্দ্দেশ হইয়াছে এবং "তৎপূর্ব্বকং" এই পদের দ্বারা লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। অনুমানপ্রমাণের লক্ষণই মহর্ষির বক্তব্য। সুতরাং "অনুমীয়তেঽনেন" অর্থাৎ যদ্দ্বারা অনুমিতি জন্মে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে এই সূত্রে "অনুমান" শব্দটি করণবাচ্য ল্যুট্‌প্রত্যয়সিদ্ধ, ইহাই বুঝা যায়। উদ্দ্যোতকরও বলিয়াছেন,—"কঃ পুনরনুমানার্থঃ? অনুমীয়তেঽনেনেতি করণার্থঃ।" কিন্তু ভাবার্থে ল্যুট্‌ প্রত্যয়সিদ্ধ "অনুমান" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—অনুমিতিরূপ জ্ঞান। যথার্থ অনুমিতিরূপ জ্ঞানও অনুমানপ্রমাণ হয়, তাহার ফল হানাদিবুদ্ধি। তাই উদ্দ্যোতকর পরে বলিয়াছেন,—"যদা ভাবস্তদা হানাদিবুদ্ধয়ঃ ফলং।" হানাদিবুদ্ধি কি, তাহা পূর্ব্বে তৃতীয়সূত্রভাষ্যব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে। এই সূত্রে "তৎপূর্ব্বক" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—প্রত্যক্ষপূর্ব্বক। কিন্তু প্রত্যক্ষজন্য সংস্কার অনুমানপ্রমাণ নহে। সুতরাং পূর্ব্বসূত্র হইতে "জ্ঞানং" এই পদের অনুবৃত্তি মহর্ষির অভিপ্রেত বুঝা যায়। তাহা হইলে "তৎপূর্ব্বকং জ্ঞানমনুমানং" এই বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়—তৎপূর্ব্বক জ্ঞানবিশেষই অনুমানপ্রমাণ। এখন ঐ "তৎপূর্ব্বকং" এই পদের দ্বারা মহর্ষির বিবক্ষিত কি? তাহাই প্রথমে বুঝা আবশ্যক।

ভাষ্য। "তৎপূর্ব্বক"মিত্যনেন লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধদর্শনং লিঙ্গদর্শনঞ্চাভিসম্বধ্যতে। লিঙ্গ-লিঙ্গিনোঃ সম্বদ্ধয়োর্দ্দর্শনেন লিঙ্গ-স্মৃতিরভিসম্বধ্যতে। স্মৃত্যা লিঙ্গদর্শনেন চাপ্রত্যক্ষোঽর্থোঽনু-মীয়তে।

অনুবাদ—"তৎপূর্ব্বকং" এই পদের দ্বারা অর্থাৎ উক্ত পদের প্রথমোক্ত "তৎ" শব্দের দ্বারা লিঙ্গ ও লিঙ্গীর (হেতু ও সাধ্য ধর্ম্মের) সম্বন্ধদর্শন অর্থাৎ ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ এবং লিঙ্গদর্শন (হেতুর প্রত্যক্ষ) অভিসম্বদ্ধ অর্থাৎ মহর্ষির অভিপ্রেত বা বিবক্ষিত হইয়াছে। "সম্বদ্ধ" অর্থাৎ ব্যাপ্যব্যাপক-ভাবরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট লিঙ্গ ও লিঙ্গীর দর্শনের দ্বারা লিঙ্গস্মৃতি অর্থাৎ অনুমেয় পদার্থের ব্যাপ্যত্বরূপে সেই হেতুর স্মরণ অভিসম্বদ্ধ অর্থাৎ মহর্ষির অভিপ্রেত বা বিবক্ষিত হইয়াছে। স্মৃতির দ্বারা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গস্মরণের দ্বারা এবং লিঙ্গদর্শনের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ পদার্থ অনুমিত হয়।

টিপ্পনী—(পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানই এই সূত্রের প্রথমোক্ত "তৎ" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়। তাহা হইলে "তৎপূর্ব্বক" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—

প্রত্যক্ষপূর্ব্বক। কিন্তু যে কোন প্রত্যক্ষপূর্ব্বক জ্ঞানকে অনুমানপ্রমাণ বলিলে শব্দশ্রবণরূপ প্রত্যক্ষপূর্ব্বক শাব্দ বোধও উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়। সুতরাং উক্ত "তৎ" শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষবিশেষই মহর্ষির বিবক্ষিত, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু সেই প্রত্যক্ষ কি? ইহা বলা আবশ্যক। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,— "**লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধদর্শনং লিঙ্গদর্শনঞ্চ।**" যে স্থলে অনুমানের যাহা প্রকৃত হেতু, তাহাকে বলে **লিঙ্গ**। এবং তাহা যে পদার্থের লিঙ্গ বা অনুমাপক, সেই অনুমেয় পদার্থকে বলে "**লিঙ্গী**"। যে যে স্থানে সেই লিঙ্গ পদার্থ থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই সেই লিঙ্গী পদার্থ অবশ্য থাকে। সুতরাং লিঙ্গ পদার্থটী ব্যাপ্য এবং লিঙ্গী পদার্থ তাহার ব্যাপক। সুতরাং লিঙ্গ পদার্থ ও লিঙ্গী পদার্থের ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধ থাকে। পূর্ব্বে কোন স্থানে সেই সম্বন্ধের যে প্রত্যক্ষ, তাহাই লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধদর্শন। যেমন ধূম লিঙ্গ এবং বহ্নি লিঙ্গী। বহ্নিশূন্য স্থানে ধূমের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং ধূম ও বহ্নির কার্য্যকারণভাব সম্বন্ধবশতঃ ধূমের উৎপত্তিস্থানমাত্রেই অবশ্যই বহ্নির সত্তা স্বীকার্য্য। সুতরাং ধূমত্বরূপে ধূম ব্যাপ্য এবং বহ্নিত্বরূপে বহ্নি তাহার ব্যাপক পদার্থ হওয়ায় ঐ উভয়ের ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধ আছে। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পদার্থকেই ব্যাপ্য বলে। ধূমত্বরূপে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকায় ধূম বহ্নির ব্যাপ্য। বহ্নিশূন্য কোন স্থানেই বিলক্ষণ-সংযোগসম্বন্ধে ধূম থাকে না। সুতরাং বহ্নিশূন্য স্থানে তাদৃশ সংযোগ সম্বন্ধে বর্ত্তমানত্বের অভাবই ফলতঃ ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি। প্রথমে উক্ত ব্যাপ্তি-সম্বন্ধের নিশ্চয় ব্যতীত কোন স্থানে ধূম দর্শন করিলেও তদ্দ্বারা সেখানে বহ্নির অনুমিতি জন্মে না। তাই ভাষ্যকার প্রথমে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধদর্শন বলিয়া, সেই ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষই মহর্ষির বিবক্ষিত বলিয়াছেন।)

ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের উপায়

ব্যভিচারের অজ্ঞান এবং সহচারের জ্ঞান ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের উপায় বা কারণ। যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলে ধূমে বহ্নির ব্যভিচারের অর্থাৎ বহ্নিশূন্য স্থানে বিলক্ষণ-সংযোগ সম্বন্ধে ধূমের বর্ত্তমানতার অদর্শন এবং পাকশালাদি কোন স্থানে ধূমে বহ্নির সহচারের অর্থাৎ সামানাধিকরণ্যের দর্শন ধূমত্বরূপে ধূমে বহ্নিত্বরূপে বহ্নির ব্যাপ্তিসম্বন্ধের প্রত্যক্ষরূপ নিশ্চয়ের উপায়। "বেদান্তপরিভাষা"কারও ইহাই বলিয়াছেন। কিন্তু "শ্লোকবার্ত্তিকে" কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন,

"ভূয়োদর্শনগম্যা চ ব্যাপ্তিঃ সামান্যধর্ম্ময়োঃ।"—(অনু-পঃ)। আরও অনেকে ঐরূপ কথা বলিয়াছেন। কিন্তু কত স্থানে কত বার সহচার দর্শন হইলে তাহাকে ভূয়োদর্শন বলে, ইহার নিয়ত নির্দ্দেশ করা যায় না। পরন্তু ব্যভিচারের কোনরূপ জ্ঞান না হইলে কোন স্থানে পদার্থদ্বয়ের একবার মাত্র সহচার দর্শন হইলেও তন্মধ্যে কোন পদার্থে অপর পদার্থের ব্যাপ্তিনিশ্চয় জন্মে এবং বহু স্থানে বহু বার সহচার দর্শন হইলেও কোন এক স্থানে ব্যভিচার দর্শন হইলে ব্যাপ্তিনিশ্চয় জন্মে না, ইহারও বহু উদাহরণ আছে। সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে ব্যভিচারের অজ্ঞানকে যখন সর্ব্বত্রই ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের কারণ বলিতেই হইবে, তখন স্থলবিশেষেও বিশেষ করিয়া ভূয়োদর্শনকে ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের কারণ বলা অনাবশ্যক। তবে কোন স্থলে উহাও ব্যভিচারসংশয় নিবৃত্তি করিয়া তদ্দ্বারা ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের সহায় হয়। কিন্তু উহা ব্যপ্তিনিশ্চয়ের কারণ নহে। কোন স্থলে অব্যভিচারী হেতুতে কাহারও ব্যভিচার সংশয় হইলে ব্যাপ্তিগ্রাহক অনুকূল তর্কই সেই সংশয়কে নিবৃত্ত করে। সুতরাং সর্ব্বত্রই ব্যভিচারের সংশয়াত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় কুত্রাপি ব্যভিচারের অজ্ঞান সম্ভবই হয় না, ইহা বলা যায় না। এ বিষয়ে বহু সূক্ষ্ম বিচার হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে তাহা পাওয়া যাইবে।

বৌদ্ধসম্প্রদায় তাদাত্ম্যসম্বন্ধ এবং "তদুৎপত্তি" অর্থাৎ কার্য্যকারণভাব সম্বন্ধকে ব্যাপ্তির নিয়ামক বা গ্রাহক বলিয়াছেন। কিন্তু কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি এবং জৈন দার্শনিকগণও বহু বিচার করিয়া উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। কুমারিল ভট্টের কথানুসারে "মানমেয়োদয়" গ্রন্থে মীমাংসক নারায়ণ ভট্টও বলিয়াছেন যে, কৃত্তিকানক্ষত্রের উদয় দেখিলে উহার পরে রোহিণীনক্ষত্রের উদয় হইবে, এইরূপ অনুমিতি জন্মে। কিন্তু সেখানে হেতু ও অনুমেয় পদার্থের কার্য্যকারণভাব সম্বন্ধও নাই, তাদাত্ম্য বা অভেদসম্বন্ধও নাই। সুতরাং উক্ত স্থলে এবং ঐরূপ বহু স্থলে বৌদ্ধমতে ব্যাপ্তিনিশ্চয় সম্ভব না হওয়ায় উক্তরূপ অনুমিতি হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধমতখণ্ডনে বাচস্পতি মিশ্র ও জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি বহু সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে (২৪৯—৫২ পৃষ্ঠায়) উক্ত বৌদ্ধমতের ব্যাখ্যা এবং বাচস্পতি মিশ্রের প্রতিবাদ ও সিদ্ধান্ত দ্রষ্টব্য। বাচস্পতি মিশ্র বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদের "অস্যেদং কার্য্যং কারণং" ইত্যাদি (৯।২।১) সূত্রোক্ত চতুর্ব্বিধ সম্বন্ধও যে, অনুমানের অঙ্গ বলা যায় না, ইহাও পরে বিচারপূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন

এবং পরে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে বলিয়াছেন,—"এতেনৈব 'মাত্রা-নিমিত্ত-সংযোগি-বিরোধি-সহচারিভিঃ। স্বস্বামিবধ্যঘাতাদ্যৈঃ সাংখ্যানাং সপ্তধাঽনুমা' ইত্যপি পরাকৃতং বেদিতব্যং" (তাৎপর্য্যটীকা, ১০৯ পৃঃ)।*

বস্তুতঃ বৈশেষিক দর্শনে কণাদের "অস্যেদং কার্য্যং কারণং" ইত্যাদি সূত্রে চতুর্ব্বিধ সম্বন্ধের উল্লেখ উদাহরণমাত্র। অর্থাৎ কেবল উক্ত চতুর্ব্বিধ সম্বন্ধই যে, ব্যাপ্তির অঙ্গ ইহা কণাদের বিবক্ষিত নহে। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও বলিয়া গিয়াছেন "শাস্ত্রে কার্য্যাদিগ্রহণং নিদর্শনার্থং কৃতং নাবধারণার্থং" ইত্যাদি। "ন্যায়মঞ্জরী" গ্রন্থে (১১৭ পৃঃ) জয়ন্ত ভট্টও বলিয়াছেন,—"কণাদসূত্রে কার্য্যাদিগ্রহণঞ্চোপলক্ষণং।" কণাদের উক্ত সূত্রের পরে দ্বিতীয় (৯।২।২) সূত্রের উপস্কারে শঙ্কর মিশ্রও পরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন "তেনোদাহরণমনুরুধ্য কার্য্যকারণভাবাদেঃ সম্বন্ধস্যোপন্যাস ইহ দর্শনে সাংখ্যাদিদর্শনে চ ভবতীত্যর্থঃ।" সুতরাং শঙ্কর মিশ্রের মতে সাংখ্যমতেও পরিগণিত সপ্তবিধ সম্বন্ধই অনুমানের অঙ্গ নহে। কিন্তু উহাও কতিপয় প্রসিদ্ধ উদাহরণানুসারেই কথিত হইয়াছে। ঐরূপ যে সম্বন্ধই হউক, স্বাভাবিক নিয়ত সম্বন্ধই বস্তুতঃ ব্যাপ্তি। তাই শঙ্কর মিশ্র পরে বলিয়াছেন,—"এবঞ্চ স্বাভাবিকসম্বন্ধশালিত্বং ব্যাপ্যত্বং।" সাংখ্যসূত্রকারও ঐ তাৎপর্য্যেই ব্যাপ্তির লক্ষণ বলিয়াছেন,—"নিয়তধর্ম্মসাহিত্যমুভয়োরেকতরস্য বা ব্যাপ্তিঃ।" (৫।২৯)।

তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও বিচারপূর্ব্বক উপসংহারে বলিয়াছেন যে, স্বাভাবিক সম্বন্ধ অর্থাৎ অনৌপাধিক সম্বন্ধই ব্যাপ্তি। যেমন ধূমে বহ্নির যে সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ, তাহা কোন উপাধিকৃত নহে, সুতরাং উহা অনৌপাধিক সম্বন্ধ। কিন্তু বহ্নিতে ধূমের যে উক্তরূপ সম্বন্ধ, তাহা আর্দ্র

* "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" টীকায় উদয়নাচার্য্যও উক্ত প্রাচীন শ্লোকের সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। কিন্তু সেখানে "পরিশুদ্ধিপ্রকাশে" বর্দ্ধমান উপাধ্যায় অতি সংক্ষেপে বলিয়া গিয়াছেন,—"সাংখ্যবার্ত্তিকে, মাত্রা স্বভাবঃ। 'বধ্যঘাতাদ্যৈ'রিতি পূর্ব্বার্দ্ধোক্তবিশেষণং, নাতঃ সপ্তত্ববিরোধঃ" (৬৭১ পৃঃ)। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, উক্ত শ্লোকটি প্রাচীন "সাংখ্যবার্ত্তিকে"র শ্লোক এবং উহার প্রথমোক্ত "মাত্রা" শব্দের অর্থ স্বভাব অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধ। "নিমিত্ত" শব্দের দ্বারা কার্য্যকারণভাব সম্বন্ধ বুঝা যায়। এবং "সংযোগি-বিরোধিসহচারিভিঃ' ইত্যাদি অংশের দ্বারা সংযোগাদিসম্বন্ধ গ্রহণ করিয়া সাংখ্যমতে সপ্তবিধ সম্বন্ধ অনুমানের অঙ্গ, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু বর্দ্ধমান উপাধ্যায় সপ্তত্ববিরোধের আশঙ্কা করিয়া অতি সংক্ষেপে পরে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি না। উক্ত "সাংখ্যবার্ত্তিক" গ্রন্থও দেখিতে পাই না।

ইন্ধনরূপ উপাধিকৃত। কারণ, আর্দ্র ইন্ধনের সহিত বহ্নির সংযোগবিশেষ না হইলে সেখানে ধূম জন্মে না। সুতরাং বহ্নিত্বরূপে বহ্নিমাত্রে ধূমের ব্যাপ্তি নাই। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যও অনৌপাধিক সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি বলিয়াছেন। পরে "তত্ত্বচিন্তামণি"কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় বহু সূক্ষ্ম বিচার করিয়া বহুবিধ ব্যাপ্তির লক্ষণ বলিলেও ("বিশেষ ব্যাপ্তি" গ্রন্থে) উদয়নাচার্য্যের উক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণেরও নবীন ভাবে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। পরে মিথিলার শঙ্কর মিশ্র প্রভৃতিও সূক্ষ্ম বিচারপূর্ব্বক অনৌপাধিক সম্বন্ধই ব্যাপ্তি, এই মতের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থ পাঠ করিয়াই তাহা বুঝিতে হইবে।

প্রাচীনকালে ব্যাপ্তি অর্থে কেবল "সম্বন্ধ" শব্দেরও প্রয়োগ হইয়াছে। তদনুসারেই সাংখ্যসূত্রকার বলিয়াছেন,—"সম্বন্ধাভাবান্নানুমানং" (৫।১১)। উক্ত "সম্বন্ধ" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত স্বাভাবিক সম্বন্ধ অর্থাৎ অনৌপাধিক সম্বন্ধই বিবক্ষিত। পূর্ব্বমীমাংসাভাষ্যে শবরস্বামীও অনুমানের লক্ষণে বলিয়াছেন,—"জ্ঞাতসম্বন্ধস্য"। "শ্লোকবার্ত্তিকে" কুমারিল ভট্টও উক্ত সম্বন্ধ শব্দের অর্থ বলিয়াছেন,—"সম্বন্ধো ব্যাপ্তিরিষ্টাত্র লিঙ্গধর্ম্মস্য লিঙ্গিনা।" (অনু-পঃ)। বাচস্পতি মিশ্রেরও পূর্ব্বে কুমারিল ভট্টও "ব্যাপ্তি" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রাচীন কালে উক্ত ব্যাপ্তি অর্থে "সময়," "নিয়ম", "প্রতিবন্ধ," "অব্যভিচার" ও "অবিনাভাব" প্রভৃতি শব্দেরও প্রয়োগ হইয়াছে। ন্যায়দর্শনেও (২।২।১৫) "অব্যভিচার" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে এবং পরে (৩।২।১১।৬৮।৭০) "নিয়ম" ও "অনিয়ম" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তি ও তাহার অভাবই কথিত হইয়াছে। বৈশেষিক দর্শনেও (৩।১।১৪) ব্যাপ্তি অর্থে "প্রসিদ্ধি" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সুচিরকাল হইতেই অনুমানপ্রমাণ ও তাহার প্রধান অঙ্গ ব্যাপ্তিপদার্থের উল্লেখ ও আলোচনা হইয়াছে। ন্যায়বৈশেষিকসূত্রে ব্যাপ্তির কোনরূপ উল্লেখ নাই, বাৎস্যায়নভাষ্যেও উহার স্পষ্ট প্রকাশ নাই, এইরূপ আধুনিক মন্তব্য নিতান্তই অমূলক অসত্য। পরে যথাস্থানে ইহা সুব্যক্ত হইবে।

মূলকথা, এই সূত্রে "তৎ"শব্দের দ্বারা যে প্রত্যক্ষবিশেষ মহর্ষির বুদ্ধিস্থ, তাহা ভাষ্যকারের মতে প্রথমোৎপন্ন লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ এবং পরে উৎপন্ন লিঙ্গের প্রত্যক্ষ।* পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে পাকশালাদি কোন স্থানে

---

* অনুমানদীধিতিটীকায় (সংগতিবিচারে) রঘুনাথ শিরোমণিও বলিয়াছেন,—"তচ্ছব্দেন ব্যাপ্ত্যাদিপ্রত্যক্ষপরামর্শাৎ।" টীকাকার জগদীশ সেখানে "ব্যাপ্ত্যাদেঃ প্রত্যক্ষং যস্মাৎ" এইরূপ

প্রথমে যে ধূমদর্শন, তাহাই প্রথম লিঙ্গদর্শন। পরে পর্ব্বতাদি কোন স্থানে ধূমদর্শন দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শন। ভাষ্যকার পরে **"লিঙ্গদর্শনঞ্চ"** এই বাক্যের দ্বারা সেই দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শনেরই উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমে পাকশালাদি কোন স্থানে ধূমত্বরূপে ধূমে বহ্নিত্বরূপে বহ্নির যে ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাই উক্ত স্থলে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধদর্শন। সেই প্রত্যক্ষজন্য ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, এইরূপ সংস্কার জন্মে। পরে পর্ব্বতাদি কোন স্থানে পূর্ব্বদৃষ্ট ধূমের সদৃশ ধূম দর্শন করিলে তজ্জন্য সেই পূর্ব্বোৎপন্ন সংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়ায় তজ্জন্য 'ধূম বহ্নির ব্যাপ্য' এইরূপ স্মৃতি জন্মে। উক্তরূপে লিঙ্গ-স্মৃতি না হইলে সেখানে অনুমিতি জন্মে না। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,......**"লিঙ্গস্মৃতিরভি-সম্বধ্যতে।"** অর্থাৎ লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ দর্শনজন্য উক্তরূপে লিঙ্গস্মৃতিও মহর্ষির বিবক্ষিত। কিন্তু উক্তরূপে লিঙ্গস্মৃতি হইলেও উহার পরক্ষণেই অনুমিতি জন্মে না। সেই লিঙ্গস্মৃতির পরে সেখানে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সেই লিঙ্গের দর্শন হইলেই পরক্ষণে অনুমিতি জন্মে। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,— **"স্মৃত্যা লিঙ্গদর্শনেন চাপ্রত্যক্ষোঽর্থোঽনুমীয়তে"।** ভাষ্যকারের শেষোক্ত ঐ লিঙ্গদর্শন অনুমেয় ধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট লিঙ্গদর্শন। উহাকেই বলে,—"ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান" এবং উহারই নাম—"তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ"। যেমন পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে পাকশালাদি কোন স্থানে প্রথম ধূমদর্শনের পরে পর্ব্বতে ধূমদর্শন হওয়ায় পরে 'বহ্নিব্যাপ্য ধূম' এইরূপে বহ্নির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূমের স্মরণ হইলে পরক্ষণে 'বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বত' এইরূপে পর্ব্বতে আবার যে ধূমদর্শন হয়, তাহাই শেষোক্ত তৃতীয় লিঙ্গদর্শন। তাই উহা 'তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ' নামে কথিত হইয়াছে। উক্তরূপ লিঙ্গপরামর্শের পরক্ষণেই 'পর্ব্বতে বহ্নিমান্' এইরূপে সেই পর্ব্বতে অপ্রত্যক্ষ বহ্নির অনুমিতি জন্মে। পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শের পূর্ব্বে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ দর্শন এবং

বিগ্রহে বহুব্রীহি সমাসের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু পরে নব্যমতে উক্ত সূত্রে "অনুমান" শব্দটি ভাববাচ্য ল্যুট্ প্রত্যয়সিদ্ধ অর্থাৎ উহার অর্থ অনুমিতি, ইহাও বলিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও প্রথমে তাহাই বলিয়া লিখিয়াছেন,—"যত ইত্যধ্যাহারেণ চ করণলক্ষণং।" অর্থাৎ সূত্রে "অনুমানং" এই পদের পরে "যতঃ" এই পদের অধ্যাহার করিয়া যদ্দ্বারা উক্তরূপ অনুমিতি জন্মে, তাহা অনুমানপ্রমাণ, ইহাই বুঝিতে হইবে। কিন্তু বৃত্তিকারও পরে বলিয়াছেন,—"অথবা করণলক্ষণমেবেদং" ইত্যাদি। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের মতে ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমিতির করণ। তদনুসারেই বৃত্তিকার পরে বলিয়াছেন,—"তচ্চ ব্যাপ্তিস্থানং প্রত্যক্ষপূর্ব্বকং সহচারপ্রত্যক্ষপূর্ব্বকং"।

দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শন ও পূর্ব্বদৃষ্ট সেই ব্যাপ্তিবিশিষ্ট লিঙ্গের স্মরণ উৎপন্ন হওয়ায় অনুমিতির চরম কারণ সেই লিঙ্গপরামর্শরূপ জ্ঞান 'তৎপূর্ব্বক জ্ঞান'। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যানুসারে উহা অনুমানপ্রমাণের লক্ষণাক্রান্ত হয়।

কিন্তু সমস্ত অনুমানপ্রমাণই পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষজন্য নহে। অনুমান বা শব্দপ্রমাণের দ্বারা কোন হেতুর জ্ঞান এবং তাহাতে কোন পদার্থের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইলেও তদ্দ্বারা সেই পদার্থের অনুমিতি জন্মে। সুতরাং ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে অনুমানপ্রমাণের পূর্ব্বোক্তরূপ লক্ষণ বলা যায় না। তাই বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে 'তানি পূর্ব্বাণি যস্য', 'তে পূর্ব্বে যস্য' এবং 'তৎ পূর্ব্বং যস্য' এই ত্রিবিধ বিগ্রহবাক্যানুসারে "তৎপূর্ব্বক" শব্দের দ্বারা ত্রিবিধ অর্থই বুঝা যায়।* 'তানি পূর্ব্বাণি যস্য' এইরূপ বিগ্রহবাক্য পক্ষে "তৎ" শব্দের দ্বারা তৃতীয়সূত্রোক্ত প্রত্যক্ষাদি চারিটী প্রমাণই গ্রাহ্য। তাহা হইলে বুঝা যায়, প্রত্যক্ষাদি যে কোন প্রমাণ দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞানাদিজন্য যে লিঙ্গপরামর্শ তাহা অনুমানপ্রমাণ। 'তে পূর্ব্বে যস্য' এইরূপ বিগ্রহবাক্য পক্ষেও "তৎ" শব্দের দ্বারা অনুমানাদি প্রমাণও বুঝিতে হইবে, ইহা বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর পরে বলিয়াছেন যে, যদিও (ভাষ্যকারোক্ত) লিঙ্গ ও লিঙ্গীর প্রত্যক্ষ এবং লিঙ্গপ্রত্যক্ষ ও লিঙ্গস্মৃতি ভিন্ন পদার্থ, তাহা হইলেও উহাদিগের ভেদবিবক্ষা না করিয়াই 'তৎ পূর্ব্বং যস্য' এইরূপ বিগ্রহপক্ষে একবচনান্ত "তৎ" শব্দের দ্বারা একসঙ্গে ঐ তিনটীই গৃহীত হইয়াছে। সমস্ত অনুমানই পরম্পরায় প্রত্যক্ষমূলক, অনুমানপ্রমাণের মূলে অবশ্যই প্রত্যক্ষ থাকে, এ জন্য মহর্ষি বলিয়াছেন,—"তৎপূর্ব্বকং"। শ্লোকবার্ত্তিকে কুমারিল ভট্টও বলিয়াছেন,—"যত্রাপ্যনুমিতাল্লিঙ্গাল্লিঙ্গিনি গ্রহণং ভবেৎ। তত্রাপি মৌলিকং লিঙ্গং প্রত্যক্ষাদেব গম্যতে॥"—(অনু পঃ, ১৭০)।

বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষজন্য অনুমানকে প্রধানরূপে গ্রহণ করিয়াই ভাষ্যকার সূত্রকারের "তৎপূর্ব্বকং" এই পদের উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

---

* জয়ন্ত ভট্ট প্রথমে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"তৎপূর্ব্বকমিতি লক্ষণং। 'ত'দিতি সর্ব্বনাম্না প্রক্রান্তং প্রত্যক্ষমবমৃশ্যতে। 'তৎ পূর্ব্বং কারণং যস্য তৎ তৎপূর্ব্বকং।" কিন্তু উপমানাদি প্রমাণে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তিদোষের আশঙ্কা করিয়া জয়ন্ত ভট্ট ও পরে "তে দ্বে প্রত্যক্ষে পূর্ব্বং যস্য" এইরূপ বিগ্রহবাক্যও প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সর্ব্বশেষে "তানি প্রত্যক্ষাদীনি পূর্ব্বং যস্য" এইরূপ বিগ্রহবাক্যই গ্রহণ করিয়াছেন। পরে অন্য সম্প্রদায়ের অন্যরূপ সূত্রার্থব্যাখ্যারও উল্লেখ করিয়া, তাহা গ্রহণ করেন নাই। "ন্যায়মঞ্জরী," ২২৫-২২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জয়ন্ত ভট্টও প্রথমে বলিয়াছেন,—"যদ্বা প্রাধান্যাভিপ্রায়েণ প্রত্যক্ষপূর্ব্বকত্বমুচ্যতে ন নিয়মার্থমিতি নাব্যাপ্তিঃ।" পরন্তু অনেক অতীন্দ্রিয় পদার্থও অনুমানপ্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়, ইহা পরে মহর্ষি গোতমের অনেক সূত্রের দ্বারাই ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং এই সূত্রে "তৎপূর্ব্বকং" এই পদের দ্বারা মহর্ষি কেবল ভাষ্যকারোক্ত প্রত্যক্ষবিশেষজন্য জ্ঞানকে অনুমানপ্রমাণ বলিতে পারেন না। কিন্তু সূত্রের দ্বারা বহু অর্থ সূচিত হয়, এ জন্যই উহাকে সূত্র বলে। মহর্ষি "তৎপূর্ব্বকং" এই পদের দ্বারা সূচনা করিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ এবং তত্তুল্য যে কোন প্রমাণ দ্বারা ব্যাপ্তিনিশ্চয়াদিজন্য যথার্থ লিঙ্গপরামর্শ জন্মিলে তজ্জন্য যে অনুমিতিরূপ জ্ঞান জন্মে, তাহার করণই অনুমানপ্রমাণ।

অনুমিতির করণবিষয়ে মতভেদ

প্রাচীন কালেও অনেকে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধস্মৃতিকে অর্থাৎ অনুমাপক হেতুপদার্থে অনুমেয় ধর্ম্মের ব্যাপ্তিসম্বন্ধের স্মরণকে অনুমিতির করণ বলিতেন। কিন্তু অনেকে অনুমিতির চরম কারণ লিঙ্গপরামর্শকেই অনুমিতির করণ বলিতেন। "ন্যায়বার্ত্তিকে" উদ্দ্যোতকর উক্ত মতভেদের উল্লেখপূর্ব্বক নিজমত বলিয়াছেন যে,* প্রথম লিঙ্গদর্শন হইতে চরম লিঙ্গপরামর্শ পর্য্যন্ত সমস্তই অনুমিতির কারণ হওয়ায় অনুমানপ্রমাণ। কিন্তু তন্মধ্যে চরম কারণ লিঙ্গ-পরামর্শই মুখ্য অনুমানপ্রমাণ। কারণ, উহার অব্যবহিত পরেই অনুমিতি জন্মে। অনুমানের হেতুতে অনুমেয় পদার্থের ব্যাপ্তি স্মরণের অব্যবহিত পরেই অনুমিতি জন্মে না। কারণ, উহা লিঙ্গপরামর্শকে অপেক্ষা করে। পরন্তু উক্ত লিঙ্গপরামর্শ অনুমিতির করণ হওয়ায় প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের মধ্যে চতুর্থ অবয়ব উপনয়বাক্যও সার্থক হয়। কারণ, তদ্দ্বারা উক্ত লিঙ্গপরামর্শরূপ জ্ঞান জন্মে। উদ্দ্যোতকর পূর্ব্বেও বলিয়াছেন যে, যাহা উপস্থিত হইলে কার্য্য বা ফল অবশ্য জন্মে, উহা অন্য কোন কারণের অপেক্ষা করে না, তাহাই সেই কার্য্যের মুখ্য করণ। নব্য নৈয়ায়িকগণ উহাকেই বলিয়াছেন,—ফলাযোগব্যবচ্ছিন্ন কারণ।

---

* বয়ন্তু পশ্যামঃ, সর্ব্বমনুমানমনুমিতেস্তন্নান্তরীয়কত্বাৎ। প্রধানোপসর্জ্জনতাবিবক্ষায়াং লিঙ্গপরামর্শ ইতি ন্যায্যং। কঃ পুনরত্র ন্যায়ঃ? আনন্তর্য্যপ্রতিপত্তিঃ। যস্মাল্লিঙ্গপরামর্শাদনন্তরং শেষার্থ-প্রতিপত্তিরিতি, তস্মাল্লিঙ্গপরামর্শো ন্যায্য ইতি। স্মৃতির্ন প্রধানং। কিং কারণং? স্মৃত্যনন্তরমপ্রতিপত্তেঃ।......এবঞ্চ উপনয়স্যার্থবত্তা" ইত্যাদি।—ন্যায়বার্ত্তিক।

"তত্ত্বচিন্তামণি"র শব্দখণ্ডের প্রারম্ভে পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিতে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও বলিয়াছেন,—"করণবিশেষঃ প্রমাণং, করণঞ্চ তৎ, যস্মিন্ সতি ক্রিয়া ভবত্যেব।" সেখানে টীকাকার মথুরানাথ তর্কবাগীশ উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"করণত্বঞ্চ ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নকারণত্বং ফলোপধায়কত্বমিতি যাবৎ।" কিন্তু উহা গঙ্গেশের নিজমত নহে। মথুরানাথ সেখানে বৌদ্ধমতানুসারে পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিতেই করণলক্ষণের উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ উদ্দ্যোতকরের মতেও ফলাযোগব্যবচ্ছিন্ন কারণ অর্থাৎ চরম কারণই মুখ্য করণ। সুতরাং তাঁহার মতে লিঙ্গপরামর্শই অনুমিতির মুখ্য করণ। পরন্তু নব্যনৈয়ায়িক অন্নং ভট্টও "তর্কসংগ্রহে" বলিয়াছেন,—"স্বার্থানুমিতি-পরার্থানুমিত্যোর্লিঙ্গপরামর্শ এব করণং।"* "তর্কভাষা" গ্রন্থে কেশব মিশ্রও বলিয়াছেন,—"লিঙ্গপরামর্শোঽনুমানং।" সেখানে "ন্যায়প্রদীপ"কার উদ্দ্যোতকরের উক্ত মতের উল্লেখ করিয়াই উহা সমর্থন করিয়াছেন।† নবদ্বীপের নব্যনৈয়ায়িক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশও "কারকচক্র" গ্রন্থে করণের লক্ষণ ব্যাখ্যায় প্রথমে উক্ত প্রাচীন মতেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।††

'অনুমানচিন্তামণি'তে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও প্রথমে অনুমিতির লক্ষণ বলিয়া, পরে বলিয়াছেন,—"তৎকরণমনুমানং, তচ্চ লিঙ্গ-পরামর্শো নতু পরামৃশ্যমানং লিঙ্গমিতি বক্ষ্যতে।" গঙ্গেশের ঐ কথার দ্বারা তিনিও যে, প্রথমে উদ্দ্যোতকরের মতানুসারেই লিঙ্গপরামর্শকে অনুমিতির করণ বলিয়াছিলেন,

---

* অন্নং ভট্ট "দীপিকা"য় বলিয়াছেন,—"ব্যাপারবৎ কারণং করণমিতি মতে পরামর্শদ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞানং করণং।" "দীপিকাপ্রকাশে" নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন,—"ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নং কারণং করণমিতি মতে তু পরামর্শ এব করণমিতি ধ্যেয়ং।" যদিও প্রত্যক্ষ খণ্ডে অন্নং ভট্ট পূর্ব্বোক্ত মতানুসারে ইন্দ্রিয়কেই প্রত্যক্ষের করণ বলিয়াছেন, কিন্তু পরে তিনি লিঙ্গপরামর্শকেই অনুমিতির করণ বলায় প্রাচীন উদ্দ্যোতকরের মতই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন বুঝা যায়। তাই পূর্ব্বে করণের লক্ষণ-ব্যাখ্যায় নীলকণ্ঠ ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষরূপ ব্যাপারকেই প্রত্যক্ষের করণ বলিয়া লিখিয়াছেন,—"এতচ্চ 'লিঙ্গপরামর্শোঽনুমান'মিতি মূল এব স্ফুটীভবিষ্যতি।"

† ননু লিঙ্গপরামর্শস্য চরমকারণত্বাৎ তস্য চ স্বোত্তরভাবিভাবভূতকারণানপেক্ষত্বরূপত্বাদ্ব্যাপারাভাবেন করণত্বাভাবাৎ কথমনুমানত্বমিতি চেন্ন, বার্ত্তিককারমতে 'যস্মিন্ সতি ক্রিয়া ভবত্যেবে'তি তস্যৈব করণত্বেন নির্ব্যাপারস্যাদোষত্বাৎ।" 'ন্যায়প্রদীপ' (তর্কভাষাব্যাখ্যা)।

†† "এবঞ্চ তদনুকূলব্যাপারমদ্বারীকৃত্য তজ্জনকত্বং ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নকারণত্বং পর্য্যবসিতং করণত্বমিতি লব্ধং। এবঞ্চ এতন্মতে চরমকারণত্বমেব করণত্বমিতি কুঠারাদৌ করণপদং গৌণমিতি।—"কারকচক্র"।

ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়।* নচেৎ তাঁহার উক্ত স্থলে "লিঙ্গপরামর্শ" শব্দপ্রয়োগের সার্থকতা বুঝা যায় না। কিন্তু গঙ্গেশ পরে "পরামর্শ" গ্রন্থে বিচার করিয়া নিজমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গপরামর্শ অনুমিতির করণ হইতে পারে না। কারণ, উহাই অনুমিতির চরম কারণ, অর্থাৎ উহা পরে অনুমিতিজনক কোন ব্যাপারকে অপেক্ষা করে না, উহা নির্ব্যাপার। কিন্তু যাহার কোন ব্যাপার উপস্থিত হইলে তাহার ফল অবশ্য জন্মে, সেই ব্যাপারকে বলে—ফলাযোগব্যবচ্ছিন্ন ব্যাপার, তাদৃশ ব্যাপারবিশিষ্ট কারণই করণ (পূর্ব্ব ৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং অনুমেয় ধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্টত্বরূপে যে লিঙ্গস্মরণ অর্থাৎ অনুমাপক হেতুতে উক্তরূপে যে ব্যাপ্তিস্মরণ, তাহাই অনুমিতির করণ, এবং তজ্জন্য উক্তরূপ লিঙ্গপরামর্শই সেই কারণের ব্যাপার। সেই ব্যাপার উৎপন্ন হইলে অনুমিতিরূপ ফল অবশ্য জন্মে। সুতরাং উহাকে বলে—ফলাযোগব্যবচ্ছিন্ন ব্যাপার। সেই ব্যাপারবিশিষ্ট ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমিতির করণ। কিন্তু গঙ্গেশের পূর্ব্বে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য পূর্ব্বোক্তরূপ লিঙ্গপরামর্শের বিষয় লিঙ্গকেই অনুমিতির করণ বলিয়া সমর্থন করেন। তাই তিনি প্রশস্তপাদের উদ্ধৃত শ্লোকে "তল্লিঙ্গমনুমাপকং" এই কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"অনুমিতিরূপপ্রমাকরণং, এতেন পরামৃশ্যমানং লিঙ্গমনুমানং" ("কিরণাবলী")। তিনি "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" টীকায় উক্ত মত সমর্থন করিতে 'তাৎপর্য্যটীকা'কার বাচস্পতি মিশ্রেরও যে উহাই মত, ইহাও তাঁহার কোন কথার দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র যে, উদ্দ্যোতকরের মতেরই সমর্থন করিয়াছেন, ইহাই আমরা বুঝিতে পারি।

সে যাহা হউক, উদয়নাচার্য্যের উক্ত মতও প্রাচীন মত। উক্ত মতের নামই 'জ্ঞায়মান লিঙ্গের করণতামত।† বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদের

---

* নীলকণ্ঠ ভট্টও তাহাই বুঝিয়া "তর্কসংগ্রহদীপিকাপ্রকাশে" করণলক্ষণের ব্যাখ্যায় পূর্ব্বোদ্ধৃত সন্দর্ভের পরে বলিয়াছেন,—"অতএব মণিকারৈরপ্যুক্তং 'তচ্চ লিঙ্গপরামর্শ' ইতি গ্রন্থেনেতি তু নব্যাঃ।" কিন্তু নীলকণ্ঠ প্রাচীন মতকে কেন নব্যমত বলিয়াছেন, ইহা চিন্তনীয়। নীলকণ্ঠের পুত্র লক্ষ্মীনৃসিংহ সেখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—নব্যা দীধিতিকারাদয়ঃ।" কিন্তু দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণি ঐরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহার নিজ মতেও মনই অনুমিতির করণ। "পক্ষতাদীধিতি"র টীকার শেষে (প্রগল্ভ-মতখণ্ডন-ব্যাখ্যায়) জগদীশও বলিয়াছেন,—"ন চ স্বমতে মনস এবানুমিতিকরণত্বাৎ।"

† জৈন ন্যায়ের "শ্লোকবার্ত্তিক" গ্রন্থেও কথিত হইয়াছে,—"সাধনাৎ সাধ্যবিজ্ঞানমনুমানং

"হেতুরপদেশো লিঙ্গং প্রমাণং] করণমিত্যনর্থান্তরম্" (৯।২।৪) এই সূত্রেই উক্ত মতের মূল বুঝা যায়। কারণ, উক্ত সূত্রে কণাদ অনুমান স্থলে লিঙ্গ, প্রমাণ ও করণকে একই পদার্থ বলিয়াছেন। গঙ্গেশ উপাধ্যায় উদয়নাচার্য্যের উক্ত মতে অনেক দোষ প্রদর্শন করিলেও পরে বৈশেষিকদর্শনের নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রথম সূত্রের "উপস্কারে" শঙ্কর মিশ্র তাহার প্রতিবাদ করিয়া উদয়নাচার্য্যের উক্ত মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি সেখানে বৈশেষিকমতের ব্যাখ্যায় প্রথমে সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন,—"এতেন লিঙ্গমেবানুমিতিকরণং নতু তস্য ব্যাপারঃ, তস্য নির্ব্ব্যাপারত্বেনাকরণত্বাৎ, লিঙ্গস্য তু স এব ব্যাপারঃ।" কিন্তু তাঁহার বহু পূর্ব্বে "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে বরদরাজ বলিয়াছেন,—"লিঙ্গপরামর্শোঽনুমানমিত্যাচার্য্যাঃ।" সেখানে টীকাকার মল্লিনাথও লিখিয়াছেন যে, প্রকারান্তরে উদয়নাচার্য্যও লিঙ্গপরামর্শকে অনুমান প্রমাণ বলিয়াছেন। কারণ, লিঙ্গপরামর্শ ব্যতীত তাঁহার মতেও অনুমিতি জন্মে না। পরে অনুমিতিদীধিতির টীকার শেষে জগদীশ তর্কালঙ্কারও আচার্য্যমতে স্থলবিশেষে দোষ প্রদর্শন করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন,—"আচার্য্যমতেঽপি তদ্ধেতুকানুমিতে পরামর্শস্যৈব করণত্বাৎ।" সুতরাং উদয়নাচার্য্যের মতের উক্তরূপ ব্যাখ্যাও পরে হইয়াছে ইহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু উদয়নাচার্য্যের নিজের কথার দ্বারা বুঝা যায়, তাঁহার মতে লিঙ্গপরামর্শের বিষয়ীভূত লিঙ্গ বা হেতুপদার্থই অনুমিতির করণ। শঙ্কর মিশ্রও উক্ত মতের সমর্থন করিলেও রঘুনাথ শিরোমণি উক্ত মত-খণ্ডনে বিশেষ যুক্তিও বলিয়াছেন। কিন্তু গঙ্গেশের "পরামর্শ" গ্রন্থের "দীধিতি" টীকায় রঘুনাথ শিরোমণি পরে নিজমতে বলিয়াছেন যে সর্ব্বত্র অনুমিতিকর্ত্তার মনই অনুমিতির করণ। মন করণ হইলেও মনোজন্য সেই অনুমিতিরূপ জ্ঞান মানস প্রত্যক্ষ হইতে বিজাতীয় জ্ঞান হইতে পারে। কারণ, উহা ব্যাপ্তিজ্ঞান ও লিঙ্গপরামর্শরূপ

বিদুর্বুধাঃ।" ধর্ম্মভূষণ যতি "ন্যায়দীপিকা"য় উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"সাধনাজ্‌জ্ঞায়মানাদ্ধূমাদেঃ সাধ্যেঽগ্ন্যাদৌ লিঙ্গিনি যদ্বিজ্ঞানং তদনুমানং।" সুতরাং উক্ত মতেও জ্ঞায়মান লিঙ্গই অনুমিতির করণ। কিন্ত বিশেষ এই যে, জৈনমতে স্বতঃপ্রকাশ সম্যক জ্ঞানই প্রমাণ। সুতরাং যথার্থ অনুমিতিরূপ জ্ঞানই অনুমানপ্রমাণ। সেই প্রমাণভূত অনুমিতির করণ জ্ঞায়মান লিঙ্গ। তাই ধর্ম্মভূষণ যতি পরে বলিয়াছেন,—"জ্ঞায়মানলিঙ্গকরণকস্য সাধ্যজ্ঞানস্যৈব সাধ্যাব্যুৎপত্তি-নিরাকারকত্বেনানুমানত্বম্, ন তু লিঙ্গপরামর্শাদেরিতি বুধাঃ প্রামাণিকা বিদুরিতি বার্ত্তিকার্থঃ।"—"ন্যায়দীপিকা" তৃতীয় প্রকাশ।

বিশেষ কারণজন্য জ্ঞান। রঘুনাথ শিরোমণি ইহা সমর্থন করিলেও নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ে তাঁহার উক্ত মত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। নব্যনৈয়ায়িকসম্প্রদায়ে গঙ্গেশের মতই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তদনুসারেই "ভাষাপরিচ্ছেদে" বিশ্বনাথ বলিয়াছেন,—"ব্যাপারস্তু পরামর্শঃ করণং ব্যাপ্তিধীর্ভবেৎ।

অদ্বৈতবাদী ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র "বেদান্তপরিভাষা" গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোৎপন্ন ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমিতির করণ এবং তজ্জন্য সংস্কারই তাহার ব্যাপার। লিঙ্গপরামর্শ অনাবশ্যক বলিয়া অনুমিতির কারণই নহে। সুতরাং তাহা করণ হইতেই পারে না। কিন্তু ব্যাপ্তিবিষয়ক পূর্ব্বসংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলে অনেক স্থলে ব্যাপ্তি স্মরণের পূর্ব্বেই সেই সংস্কারজন্য অনুমিতি জন্মে। সুতরাং ব্যাপ্তিস্মরণও অনুমিতির কারণ নহে। কিন্তু এই মতে বক্তব্য এই যে, অনুমিতির পূর্ব্বে সর্ব্বত্রই অনুমাপক হেতুতে অনুমেয় ধর্ম্মের ব্যাপ্তির স্মরণ জন্মে, ইহাই অনুভব-সিদ্ধ। ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তির স্মরণ না হইলেও ধূমহেতুর দ্বারা বহ্নির অনুমিতি জন্মে, এ বিষয়ে প্রমাণ নাই। "শ্লোকবার্ত্তিকে" কুমারিল ভট্টও বলিয়াছেন,— "ধূম-তজ্‌জ্ঞান-সম্বন্ধস্মৃতিপ্রামাণ্যকল্পনে" (অনু-পঃ, ৫২)। সুতরাং তাঁহার মতে ধূম, ধূমজ্ঞান ও ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধের স্মরণই মুখ্য গৌণভাবে অনুমিতির করণ, কিন্তু ব্যাপ্তি স্মরণের পরে লিঙ্গপরামর্শ অনাবশ্যক, ইহা বুঝা যায়। মীমাংসাচার্য্য গুরু প্রভাকরের মতেও লিঙ্গদর্শন ও ব্যাপ্তিস্মরণ, এই জ্ঞানদ্বয়ের পরেই অনুমিতি জন্মে। আরও অনেক সম্প্রদায় উহাই সমর্থন করিয়াছেন। প্রশস্তপাদের উক্তির দ্বারাও সরলভাবে তাহাই বুঝা যায়।* সেখানে "ন্যায়কন্দলী"কার শ্রীধর ভট্টও মীমাংসকমতপক্ষপাতী হইয়া স্পষ্ট বলিয়াছেন,—"নহি নস্তেন প্রয়োজনং, লিঙ্গদর্শনব্যাপ্তিস্মরণাভ্যামেবানুমেয়-প্রতীত্যুপপত্তেঃ।" (২০৬ পৃঃ)। কিন্তু উদয়নাচার্য্য ও ব্যোমশিবাচার্য্য প্রভৃতি—বৈশেষিকমতের ব্যাখ্যা করিতেও ব্যাপ্তি স্মরণের পরে পূর্ব্বোক্তরূপ তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শকেই অনুমিতির চরম কারণ বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন।

* অনুমান-ব্যাখ্যায় প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন,—"এবং প্রসিদ্ধসময়স্যাসন্দিগ্ধধূমদর্শনাৎ সাহচর্য্যানুস্মরণাৎ তদনন্তরমগ্ন্যধ্যবসায়ো ভবতীতি" (২০৫ পৃঃ)। কোন পুস্তকে ইহার পরেই "তৎপরং তদ্ভবতীতি" এইরূপ অতিরিক্ত পাঠ পাওয়া যায়। তদনুসারেই উদয়নাচার্য্য কষ্ট কল্পনা করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"অগ্নিরধ্যবসীয়তেঽনেনেতি অগ্ন্যধ্যবসায়ঃ পরামর্শঃ। তৎপরং তদ্ভবতি প্রমাণং ভবতীত্যর্থঃ।.........নূনং পরামর্শোঽপি তৃতীয়ঃ স্বীকর্ত্তব্যঃ" ("কিরণাবলী")। কিন্তু শ্রীধর ভট্ট উক্তরূপ পাঠ বা ব্যাখ্যার কোন উল্লেখ করেন নাই। তিনি উদায়নাচার্য্যের "কিরণাবলী" দেখিলে অবশ্যই ঐ কথার প্রতিবাদ করিতেন।

"ন্যায়বার্ত্তিকে" উদ্দ্যোতকরও উহা সমর্থন করিতে পরে বলিয়াছেন যে, উক্ত লিঙ্গপরামর্শের জন্যই পরার্থ অনুমানে চতুর্থ অবয়ব উপনয়বাক্য সার্থক হয়। সুতরাং উদ্দ্যোতকরের মতেও ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত "স্মৃত্যা লিঙ্গদর্শনেন চ" এই বাক্যেও "লিঙ্গদর্শন" শব্দের দ্বারা ব্যাপ্তি স্মরণের পরে উৎপন্ন তৃতীয় লিঙ্গ-পরামর্শই বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" টীকায় (৬৫৯ ও ৭০৭ পৃঃ) উদয়নাচার্য্য বিশেষ বিচার করিয়া তাঁহার উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন। তিনিও পরে বলিয়াছেন যে, যদি স্বার্থানুমানে তৃতীয় লিঙ্গ-পরামর্শ অনাবশ্যক হয়, তাহা হইলে পরার্থানুমানেও উহার জন্য চতুর্থ অবয়ব উপনয়বাক্য ব্যর্থ হয়। সুতরাং অনুমেয় ধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে হেতু, সেই হেতুবিশিষ্ট পক্ষ, এইরূপ যে জ্ঞান, তাহা অনুমিতির অব্যবহিত পূর্ব্বে আবশ্যক, ইহা স্বীকার্য্য। উহাকেই বলে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান ও তৃতীয় লিঙ্গ-পরামর্শ। তাই বলিয়াছেন,—"নূনং পরামর্শোঽপি তৃতীয়ঃ স্বীকার্য্যঃ" (৭০৭ পৃঃ)। পরে "তত্ত্বচিন্তামণি"কার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও উক্ত মত সমর্থনে বহু সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন এবং উহাই ন্যায়বৈশেষিকসম্প্রদায়ের প্রচলিত প্রসিদ্ধ মত। পরে অবয়বপ্রকরণে চতুর্থ অবয়ব উপনয়বাক্যের ব্যাখ্যায় ইহা পরিস্ফুট হইবে।

অনুমানপ্রমাণের প্রমেয় বিষয়ে মতভেদ

অনুমেয় পদার্থই অনুমানপ্রমাণের প্রমেয়। কিন্তু সেই অনুমেয় কি, এ বিষয়েও প্রাচীনকাল হইতে নানা মতভেদ হইয়াছে। কোন সম্প্রদায় বলিয়াছিলেন যে, অনুমানের ধর্ম্মীতে ধর্ম্মবিশেষই অনুমেয়। কারণ, সেই ধর্ম্মবিশেষের সহিতই সেই লিঙ্গের অব্যভিচার অর্থাৎ ব্যাপ্তিসম্বন্ধ আছে। যেমন ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিসম্বন্ধ থাকায় ধূমহেতুর দ্বারা পর্ব্বতাদি ধর্ম্মীতে বহ্নিরূপ ধর্ম্মই অনুমেয়। অপর সম্প্রদায় বলিয়াছিলেন যে, উক্ত স্থলে পর্ব্বতাদি ধর্ম্মী এবং বহ্নিরূপ ধর্ম্ম যখন পূর্ব্বসিদ্ধ পদার্থ, তখন উহা সাধ্য বা অনুমেয় হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত স্থলে বহ্নি ও ধূমের সম্বন্ধই অনুমেয়। কারণ, তাহা পূর্ব্বে পর্ব্বতাদি স্থানে অসিদ্ধ। বৌদ্ধাচার্য্য দিঙ্‌নাগ "প্রমাণসমুচ্চয়" গ্রন্থে উক্ত উভয় মতের উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়া, পরে নিজমত বলিয়াছেন। "তাৎপর্য্যটীকা"কার বাচস্পতি মিশ্র দিঙ্‌নাগের সেই সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত

করিয়াছেন।* "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি"র প্রকাশটীকায় (৭৪৮ পৃঃ) বর্দ্ধমান উপাধ্যায় তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রথমোক্ত মতের খণ্ডন করিতে দিঙ্‌নাগ বলিয়াছেন যে, যদি বহ্নিরূপ ধর্ম্মে ধূমরূপ লিঙ্গ পূর্ব্বেই প্রসিদ্ধ হয় অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মরূপে নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে ধূমহেতুর দ্বারা অন্য কি অনুমেয় হইবে? বহ্নি যখন পূর্ব্বসিদ্ধ, তখন তাহা সাধ্য বা অনুমেয় হইতে পারে না। আর যদি সেই ধূমরূপ লিঙ্গ— পর্ব্বতরূপ ধর্ম্মীতে নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে পর্ব্বতই বহ্নিবিশিষ্টরূপে অনুমেয় কেন হইবে না? দ্বিতীয় মতের খণ্ডন করিতে দিঙ্‌নাগ বলিয়াছেন যে, বহ্নি ও ধূমের সম্বন্ধও অনুমেয় বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে 'পর্ব্বতে বহ্নি-ধূময়োঃ সম্বন্ধোঽস্তি' এইরূপ ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্য কেন বলা হয় না? পরন্তু উক্তরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা ঐ সম্বন্ধও অবাচ্য অর্থাৎ বক্তব্য নহে। কারণ, "ধূমাদত্র বহ্নিরস্তি" এইরূপ বলিলেই অর্থতঃই সেই স্থানে ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধ বুঝা যায়। পরন্তু ঐ সম্বন্ধ "লিঙ্গসংগত"ও নহে অর্থাৎ উক্ত স্থলে ধূমের সহিত সম্বন্ধ নহে। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র দিঙ্‌নাগের ঐ কথার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"নহি সম্বন্ধধর্ম্মতয়া লিঙ্গং প্রমীয়তে, অপিতু দেশসংগতমিত্যর্থঃ।" অর্থাৎ সেই সম্বন্ধের ধর্ম্মরূপে লিঙ্গের যথার্থ জ্ঞান জন্মে না, কিন্তু পর্ব্বতাদি দেশের ধর্ম্মরূপেই সেই লিঙ্গের যথার্থ জ্ঞান হয়। সুতরাং সেই লিঙ্গের দ্বারা সেই সম্বন্ধ অনুমেয় হইতে পারে না। ফলকথা, দিঙ্‌নাগের মতে অনুমাপক লিঙ্গ যাহার ধর্ম্ম নহে, তাহাকে অনুমেয় বলা যায় না। তাই তিনি পরে তাঁহার সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন,—"তত্র প্রসিদ্ধং তদ্‌যুক্তং ধর্ম্মিণং গময়িষ্যতি।" অর্থাৎ অনুমাপক লিঙ্গটি যে ধর্ম্মীতে সিদ্ধ বা নিশ্চিত হয়, সেই ধর্ম্মীকেই তদ্‌যুক্ত অর্থাৎ কোন ধর্ম্মবিশিষ্টত্বরূপে সিদ্ধ করে,—যে ধর্ম্মের সহিত পূর্ব্বে অন্য স্থানে সেই লিঙ্গের অব্যভিচার বা ব্যাপ্তিসম্বন্ধের নিশ্চয় জন্মে। যেমন পাকশালাদি স্থানে পূর্ব্বে বহ্নিরূপ ধর্ম্মের সহিত ধূমরূপ লিঙ্গের ব্যাপ্তি-নিশ্চয় হওয়ায় পরে সেই ধূমহেতুর দ্বারা সেই বহ্নিবিশিষ্টত্বরূপে পর্ব্বতাদি ধর্ম্মীরই অনুমিতি জন্মে। মীমাংসাচার্য্য কুমারিল ভট্টও "শ্লোকবার্ত্তিকে" উক্ত

* কেচিদ্ধর্ম্মান্তরং মেয়ং লিঙ্গস্যাব্যভিচারতঃ। সম্বন্ধং কেচিদিচ্ছন্তি সিদ্ধত্বাৎ ধর্ম্মধর্ম্মিণোঃ ॥
লিঙ্গং ধর্ম্মে প্রসিদ্ধঞ্চেৎ কিমন্যৎ তেন মীয়তে। অথ ধর্ম্মিণি তস্যৈব কিমর্থং নানুমেয়তা ॥
সম্বন্ধেঽপি দ্বয়ং নাস্তি ষষ্ঠী শ্রূয়েত তদ্বতি। অবাচ্যোঽনুগৃহীতত্বান্ন চাসৌ লিঙ্গসংগতঃ ॥
লিঙ্গস্যাব্যভিচারস্তু ধর্ম্মেণান্যত্র দৃশ্যতে। তত্র প্রসিদ্ধং তদ্‌যুক্তং ধর্ম্মিণং গময়িষ্যতি ॥"
—"প্রমাণসমুচ্চয়", দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিষয়ে সমস্ত মতের খণ্ডন করিয়া, উক্তরূপ সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন।* অর্থাৎ তাঁহার মতেও ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীই অনুমেয়। যেমন যাহার বহ্নিবিশিষ্টত্বরূপে পর্ব্বতের জ্ঞান পূর্ব্বে নাই, তাহার পর্ব্বতে ধূম দর্শন ও ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিসম্বন্ধের স্মরণ হইলে বহ্নিবিশিষ্টত্বরূপে পর্ব্বতেরই অনুমিতি জন্মে।

কিন্তু "ন্যায়বার্ত্তিকে" উদ্দ্যোতকর উক্ত বিষয়ে নানা মতের খণ্ডন ও দিঙ্‌নাগের মত খণ্ডন করিয়া, গত্যন্তর নাই বলিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন,—"অনুমেয়োঽগ্নিমানয়ং ধূম ইতি।" উদ্দ্যোতকর পরেও (২।১।৪৬ সূত্রবার্ত্তিকে) বলিয়াছেন,—"যথা প্রত্যক্ষেণ ধূমধর্ম্মেণ ঊর্দ্ধগত্যাদিনাঽপ্রত্যক্ষো ধূমধর্ম্মোঽগ্নিরনুমীয়তে।" উদ্দ্যোতকরের মতে ঊর্দ্ধগমনাদি যে সমস্ত ধর্ম্মবিশিষ্ট ধূমবিশেষ দর্শন করিলে বহ্নি বিষয়ে অনুমিতি জন্মে, সেই সমস্ত ধূমধর্ম্মই সেই অনুমানে হেতু। সুতরাং তাদৃশ ধূমবিশেষই সেই অনুমানে পক্ষ। তাদৃশ ধূমের দর্শনকালে সেই সমস্ত ধর্ম্মের দর্শন হওয়ায় তাহাতে পূর্ব্বনিশ্চিত বহ্নিব্যাপ্তির স্মরণের পরে তাদৃশ ধূমে সেই ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধর্ম্মরূপ লিঙ্গের পরামর্শজন্য "বহ্নিমান্ অয়ং ধূমঃ" এইরূপে সেই ধূমই ঐকাধিকরণ্য সম্বন্ধে বহ্নিবিশিষ্টত্বরূপে অনুমিত হয়। তাহা হইলে ফলতঃ তাদৃশ ধূমের অধিকরণ সেই পর্ব্বতাদি স্থানে বহ্নির নিশ্চয়ও হয়। কিন্তু ধূমত্বরূপে ধূমহেতুকে বহ্নির অনুমাপক বলা যায় না। কারণ, বহ্নিশূন্য আকাশাদি স্থানেও ধূম থাকে। সুতরাং ধূম বহ্নির ব্যভিচারী অর্থাৎ উহাতে বহ্নির ব্যাপ্তিই নাই। কুমারিল ভট্টও (পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের চতুর্থ পাদে) "ধূমস্যান্যৈশ্চ কল্পিতা" এই কথার দ্বারা পরে উদ্দ্যোতকরের উক্ত মতেরই উল্লেখ করিয়াছেন এবং "কল্পিত" শব্দের দ্বারা উক্ত মত যে, লোকবিরুদ্ধ, ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর নিজেও পরে উক্ত মতে লোকবিরুদ্ধতার আশঙ্কা করিয়া, তদুত্তরে লোকবিরোধ হয় না, ইহাই বলিয়াছেন।

কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায় উদ্দ্যোতকরের উক্ত মত গ্রহণ করেন নাই। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও পরে "পূর্ব্ববৎ" অনুমানের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন,—"যথা ধূমে নাগ্নিরিতি।" সুতরাং তাঁহার মতেও ধূমত্বরূপে ধূমহেতুর দ্বারা বহ্নিত্বরূপে বহ্নিই অনুমেয়। সামান্যতঃ সংযোগ সম্বন্ধে ধূমত্বরূপে ধূম বহ্নির ব্যভিচারী হইলেও বিলক্ষণসংযোগ সম্বন্ধে ধূম বহ্নির ব্যাপ্য হয়।

---

* তস্মাদ্ধর্ম্মবিশিষ্টস্য ধর্ম্মিণঃ স্যাৎ প্রমেয়তা। সা দেশস্যাগ্নিযুক্তস্য ধূমস্যান্যৈশ্চ কল্পিতা।।"
—"শ্লোকবার্ত্তিক", অনু-পঃ।

"তত্ত্বচিন্তামণি"র হেত্বাভাসসামান্যনিরুক্তির "দীধিতি" টীকায় রঘুনাথ শিরোমণি লিখিয়াছেন,—"অথ পর্ব্বতত্বেন পক্ষত্বে বহ্নিত্বেন সাধ্যত্বে বিশিষ্টধূমত্বেন হেতুত্বে।" তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও বিশিষ্ট ধূমকে বহ্নির অনুমাপক হেতু বলিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে (২৪৫-৪৬ পৃঃ) উক্ত বিষয়ে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য। কোন নব্য নৈয়ায়িক-সম্প্রদায় ইহাও সমর্থন করিয়াছিলেন যে, পরার্থানুমান স্থলে 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্' এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা পর্ব্বতে অভেদ সম্বন্ধে বহ্নিমানেরই বোধ জন্মে। সুতরাং উক্ত স্থলে পর্ব্বতে অভেদ সম্বন্ধে বহ্নিমান্ই সাধ্য, বহ্নি সাধ্য নহে; এইরূপ অন্যত্রও বুঝিতে হইবে। গঙ্গেশের 'অনুমানচিন্তামণি'র 'অবয়ব' গ্রন্থের দীধিতি টীকায় রঘুনাথ শিরোমণিও উক্ত মতের উল্লেখ করিয়া কোন প্রতিবাদ করেন নাই। বস্তুতঃ অনুমিতির বিধেয় পদার্থই অনুমেয়। কিন্তু যে পদার্থের ব্যাপ্য লিঙ্গের পরামর্শজন্য অনুমিতি হয়, সেই পদার্থেই অনুমিতির বিধেয়তানামক বিষয়তা স্বীকার্য্য। "পক্ষতাদীধিতি"র টীকায় জগদীশ তর্কালঙ্কারও যুক্তিসিদ্ধ ঐ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে লিখিয়াছেন,—"যদ্ব্যাপ্যবত্তাজ্ঞানজন্যত্বমনুমিতৌ, তদংশ এব বিধেয়তাখ্য-বিষয়তাস্বীকারাৎ।" সুতরাং 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্ব্বতঃ' এইরূপে লিঙ্গপরামর্শ জন্মিলে পরক্ষণে পর্ব্বতে বহ্নিবিধেয়ক অনুমিতিই জন্মিবে। তাহা হইলে সেখানে পর্ব্বতে বহ্নিই অনুমেয়, ইহা স্বীকার্য্য। বহ্নিপদার্থ অন্যত্র পূর্ব্বসিদ্ধ হইলেও উক্তরূপ অনুমানের পূর্ব্বে সেই পর্ব্বতে উহা অসিদ্ধ। সুতরাং পর্ব্বতে উহা সাধ্য বা অনুমেয় হইতে পারে।

পরন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ লিঙ্গপরামর্শের পরে অনুমিতি জন্মিলে পরক্ষণে সেই অনুমিতিকর্ত্তার মনের দ্বারা 'আমি পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতি করিলাম' এইরূপেই সেই অনুমিতির মানস প্রত্যক্ষ (অনুব্যবসায়) জন্মে। সুতরাং তদ্দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, উক্ত স্থলে পর্ব্বতে বহ্নিই অনুমেয়। উদয়নাচার্য্যের মতে 'বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবান্ পর্ব্বতঃ'—এইরূপ লিঙ্গপরামর্শ জন্মিলে পরক্ষণে 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্ব্বতো বহ্নিমান্',—এই আকারেই অনুমিতি জন্মে। এইরূপ সর্ব্বত্রই অনুমিতিতে পূর্ব্বোৎপন্ন লিঙ্গপরামর্শবিষয়ীভূত সেই লিঙ্গও উক্তরূপে পক্ষাংশে বিশেষণরূপে বিষয় হয়। এই মতের নাম "লিঙ্গোপধান মত" এই মতে উক্ত কারণে অনুমিতিকে বলা হইয়াছে,—"লিঙ্গোপহিত লৈঙ্গিক ভান।" কিন্তু গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণ এবং বাৎস্যায়ন প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণও অনুমিতির আকার বিষয়ে ঐরূপ কল্পনা করেন নাই। বৈদান্তিক

প্রভৃতি সম্প্রদায়ও 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্' এবং অনেকে 'বহ্নিমান্ পর্ব্বতঃ' এইরূপ আকারে অনুমিতি স্বীকার করিয়াছেন। কোন স্থলে 'অয়ং বহ্নিমান্' এইরূপ আকারেও অনুমিতি হইতে পারে। তাহা হইলে সেখানে ইদন্ত্বরূপে সেই পর্ব্বতাদি কোন ধর্ম্মীই সেই অনুমিতির উদ্দেশ্যরূপ বিষয় হইবে। তাহাতে সেই অনুমিতির বিধেয়তানামক বিষয়তা না থাকিলেও উদ্দেশ্যতানামক বিষয়তা থাকে। "বেদান্তপরিভাষা"কার বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ পর্ব্বতে 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্' এই আকারে যে অনুমিতি জন্মে, তাহা বহ্নিবিষয়কত্ব অংশেই অনুমিতি, পর্ব্বত-বিষয়কত্ব অংশে প্রত্যক্ষ। কিন্তু উক্ত স্থলে পর্ব্বতে যদি সেই অনুমিতির কোন বিষয়তাই না থাকে, তাহা হইলে সেখানে পর্ব্বত-বিষয়ক প্রত্যক্ষ ও বহ্নিবিষয়ক অনুমিতি, এই জ্ঞানদ্বয়ই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু উক্ত স্থলে পর্ব্বতকে বিষয় না করিয়া কেবল 'বহ্নিমান্' এইরূপ অনুমিতি জন্মে না। সুতরাং 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্' এইরূপ অনুমিতি যে, একই জ্ঞান ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু একই জ্ঞানে প্রত্যক্ষত্ব ও পরোক্ষত্ব ন্যায়বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের মতে যুক্তিবিরুদ্ধ। পরন্তু যে অনুমিতির যাহা বিশেষ্য হইবে, তাহাতে বিশেষ্যতারূপ বিষয়তা স্বীকার করিতেই হইবে, নচেৎ তাহাকে বিশেষ্য বলা যায় না। নির্ব্বিশেষ্যক কোন অনুমিতি হইতে পারে না।

ভাষ্য। "পূর্ব্ববৎ"দিতি—যত্র কারণেন কার্য্যমনুমীয়তে, যথা—মেঘোন্নত্যা ভবিষ্যতি বৃষ্টিরিতি। "শেষবৎ" তৎ,—যত্র কার্য্যেণ কারণমনুমীয়তে, পূর্ব্বোদকবিপরীতমুদকং নদ্যাঃ পূর্ণত্বং শীঘ্রত্বঞ্চ দৃষ্ট্বা স্রোতসোঽনুমীয়তে ভূতা বৃষ্টিরিতি। "সামান্যতো দৃষ্টং"—ব্রজ্যাপূর্ব্বকমন্যত্র দৃষ্টস্যান্যত্র দর্শনমিতি তথাচাদিত্যস্য, তস্মাদস্ত্যপ্রত্যক্ষাপ্যাদিত্যস্য ব্রজ্যেতি।

অনুবাদ—যে স্থলে কারণের দ্বারা কার্য্য অনুমিত হয় অর্থাৎ কারণ বিশেষের জ্ঞানের দ্বারা তাহার ব্যাপক কার্য্যের অনুমিতি জন্মে, সেই স্থলে অনুমানপ্রমাণ (১) "পূর্ব্ববৎ" এই নামে কথিত হয়। যেমন মেঘের উন্নতি-বিশেষের দ্বারা অর্থাৎ তাহার প্রত্যক্ষ দ্বারা 'বৃষ্টি হইবে' ইহা অনুমিত হয়। যে স্থলে কার্য্যের দ্বারা কারণ অনুমিত হয় অর্থাৎ কার্য্যবিশেষের জ্ঞানের দ্বারা তাহার ব্যাপক কারণের অনুমিতি জন্মে, তাহা অর্থাৎ সেই স্থলীয় অনুমান-প্রমাণ (২) "শেষবৎ"। যেমন নদীর পূর্ব্বস্থিত জলের বিপরীত জলরূপ

পূর্ণত্ব এবং স্রোতের শীঘ্রত্ব অর্থাৎ প্রখরতাবিশেষ দর্শন করিয়া 'বৃষ্টি হইয়াছে' ইহা অনুমিত হয়। (৩) "সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমান (যথা)—অন্যত্র দৃষ্ট দ্রব্যের অন্যত্র দর্শন 'ব্রজ্যাপূর্ব্বক' অর্থাৎ সেই দ্রব্যের গতিক্রিয়াপ্রযুক্ত, সূর্য্যেরও তদ্রূপ, অর্থাৎ প্রাতঃকালে এক স্থানে দৃষ্ট সূর্য্যেরও কালান্তরে অন্যত্র দর্শন হয়, অতএব অপ্রত্যক্ষ হইলেও সূর্য্যের গতি আছে, ইহা অনুমিত হয়।

টিপ্পনী—মহর্ষি এই সূত্রে তাঁহার কথিত অনুমানপ্রমাণকে ত্রিবিধ বলিয়া "পূর্ব্ববৎ" প্রভৃতি যে নামত্রয় বলিয়াছেন, ভাষ্যকার পরে যথাক্রমে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের এই প্রথম ব্যাখ্যায় "পূর্ব্ব" শব্দের অর্থ কারণ এবং শেষ শব্দের অর্থ কার্য্য। কার্য্য ও কারণের মধ্যে কারণটি পূর্ব্ব এবং কার্য্যটি শেষ, এজন্য কারণ অর্থেও "পূর্ব্ব" শব্দ এবং কার্য্য অর্থেও "শেষ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। 'পূর্ব্বং বিদ্যতে যত্র' অর্থাৎ যে অনুমানপ্রমাণে কারণবিশেষ হেতুরূপে বিদ্যমান থাকে এবং 'শেষো বিদ্যতে যত্র' অর্থাৎ যে অনুমানপ্রমাণে কার্য্যবিশেষ হেতুরূপে বিদ্যমান থাকে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে যথাক্রমে উক্ত "পূর্ব্ববৎ" ও "শেষবৎ" শব্দের দ্বারা কারণহেতুক ও কার্য্যহেতুক অনুমান বুঝা যায়। কারণবিশেষই তাহার ব্যাপক কার্য্যবিশেষের অনুমাপক হয় এবং কার্য্যবিশেষ তাহার ব্যাপক কারণবিশেষের অনুমাপক হয়। যেমন মেঘের উন্নতিবিশেষরূপ কারণের দর্শনের দ্বারা তাহার কার্য্য ভাবিবৃষ্টির অনুমিতি জন্মে এবং নদীর পূর্ণতা ও স্রোতের প্রখরতাবিশেষরূপ কার্য্যের দর্শনের দ্বারা তাহার কারণ অতীত বৃষ্টির অনুমিতি জন্মে।) উদ্দ্যোতকর উক্ত অনুমানদ্বয়ের প্রয়োগ বলিয়াছেন।* "ন্যায়মঞ্জরী" গ্রন্থে (১২৯-৩০ পৃঃ) জয়ন্ত ভট্ট উক্তরূপ অনুমান বিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়াছেন। "অনুমিতিদীধিতি"র টীকায় (সংগতি বিচারে) গদাধর ভট্টাচার্য্যও ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"পূর্ব্ববদিত্যাদেঃ কারণলিঙ্গকং কার্য্যলিঙ্গকং তদন্যলিঙ্গকঞ্চেত্যর্থঃ।" অর্থাৎ গোতমের এই সূত্রোক্ত "পূর্ব্ববৎ" শব্দের অর্থ কারণলিঙ্গক, "শেষবৎ" শব্দের অর্থ কার্য্যলিঙ্গক এবং "সামান্যতো দৃষ্ট" শব্দের অর্থ তদন্যলিঙ্গক। যে লিঙ্গ বা হেতু অনুমেয় পদার্থের কারণও নহে, কার্য্যও নহে, এমন লিঙ্গের দ্বারা অনুমিতি হইলে সেইরূপ স্থলীয় অনুমানপ্রমাণের নাম "সামান্যতো দৃষ্ট"। যেমন 'ইদং দ্রব্যং পৃথিবীত্বাৎ'

---

* "বৃষ্টিমন্ত এতে মেঘা গম্ভীরধ্বানবত্ত্বে সতি বহুলবলাকাবত্ত্বে সতি অচিরপ্রভাবত্ত্বে সতি উন্নতিমত্ত্বাৎ, বৃষ্টিমন্মেঘবৎ। উপরি বৃষ্টিমদ্দেশসম্বন্ধিনী নদী, স্রোতঃশীঘ্রত্বে সতি পর্ণফল-কাষ্ঠাদিবহনবত্ত্বে সতি পূর্ণত্বাৎ পূর্ণবৃষ্টিমন্নদীবৎ।"—ন্যায়বার্ত্তিক। দ্বিতীয় খণ্ড, ২১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

—এইরূপে পৃথিবীত্ব হেতুর দ্বারা দ্রব্যত্বের অনুমান স্থলে পৃথিবীত্ব হেতু দ্রব্যত্বের কার্য্যও নহে, কারণও নহে। প্রাচীন ন্যায়াচার্য্য উদ্দ্যোতকরও প্রথমে "সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমানের উক্তরূপই ব্যাখ্যা করিয়া উদাহরণ বলিয়াছেন,—"যথা বলাকয়া সলিলানুমানং।" দূর হইতে বলাকা দেখিলে তাহার আধার জলের অনুমান হয়। কিন্তু সেই বলাকা ঐ জলের কার্য্যও নহে, কারণও নহে।

কিন্তু ভাষ্যকার ঐরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। (ভাষ্যকারের মতে যে স্থলে অনুমেয় পদার্থ লৌকিকপ্রত্যক্ষের অযোগ্য, সুতরাং কোন পদার্থে তাহার ব্যাপ্তিসম্বন্ধের প্রত্যক্ষ সম্ভব নহে,—সেই স্থলে অন্য কোন পদার্থে অপর কোন পদার্থের সামান্যতঃ ব্যাপ্তিসম্বন্ধের প্রত্যক্ষের ফলে সেই অপ্রত্যক্ষ পদার্থের অনুমিতি হইলে, সেই স্থলীয় অনুমানপ্রমাণের নাম **"সামান্যতো দৃষ্ট"**। যেমন সূর্য্যের গতিক্রিয়া লৌকিকপ্রত্যক্ষের অযোগ্য। সুতরাং কোন পদার্থেই তাহার ব্যাপ্তিসম্বন্ধের লৌকিকপ্রত্যক্ষ সম্ভব নহে। কিন্তু এক স্থানে দৃষ্ট দ্রব্যের অন্যত্র দর্শন সেই দ্রব্যের গতিক্রিয়াপ্রযুক্ত, ইহা বহু দ্রব্যে প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং উক্তরূপে সামান্যতঃ ব্যাপ্তিপ্রত্যক্ষের ফলে 'সূর্য্যো গতিমান্'—এইরূপে সূর্য্যে অপ্রত্যক্ষ গতিক্রিয়ার অনুমিতি জন্মে। কারণ, প্রাতঃকালে এক স্থানে দৃষ্ট সূর্য্যেরও মধ্যাহ্নাদিকালে অন্য স্থানে দর্শন হয়। সুতরাং তাদৃশ দর্শনবিষয়ত্ব হেতুর দ্বারা সূর্য্যে গতিক্রিয়ার অনুমিতি হয়।) যোগদর্শনভাষ্যে (১।৭) উক্তরূপ অনুমানের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে ব্যাসদেবও বলিয়াছেন,—"দেশান্তর-প্রাপ্তের্গতিমচ্চন্দ্রতারকং।" (ভাষ্যকার পরে "সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমানের অন্য উদাহরণ বলিয়াছেন। অতীন্দ্রিয় ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের সাধক অনুমানও উহার উদাহরণরূপে অনেক গ্রন্থে কথিত হইয়াছে।)

কিন্তু বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর সূর্য্যের গতিক্রিয়া স্বীকার করিয়াও ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ খণ্ডন করিয়াছেন। 'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থে (১৩১ পৃঃ) জয়ন্ত ভট্টও বিশেষ বিচার করিয়া উক্ত অনুমানকে "শেষবৎ" বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, সূর্য্যের দেশান্তর-প্রাপ্তিও প্রত্যক্ষের অযোগ্য। সুতরাং প্রথমে "দেশান্তরপ্রাপ্তিমান্ আদিত্যঃ" এইরূপে সূর্য্যে দেশান্তরপ্রাপ্তি অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ হইলে, সেই অনুমিত দেশান্তর-প্রাপ্তিরূপ হেতুর দ্বারাই সূর্য্যে গতিক্রিয়া অনুমানসিদ্ধ হয়। কারণ, সূর্য্যের যে দেশান্তরপ্রাপ্তি, তাহা সূর্য্যের গতিক্রিয়াজন্য, গতিক্রিয়া তাহার কারণ।

তাহা হইলে উক্ত স্থলে সেই অনুমানপ্রমাণ ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত "শেষবৎ" অনুমানই হইবে, উহাকে "সামান্যতো দৃষ্ট" নামে পৃথক প্রকার বলাও যায় না। কিরূপ হেতুর দ্বারা প্রথমে সূর্য্যে দেশান্তরপ্রাপ্তি অনুমানসিদ্ধ হয়, তাহাও পরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন।* বাচস্পতি মিশ্র সেই "দণ্ডকানুমানে"র অর্থাৎ দণ্ডের ন্যায় দীর্ঘ হেতুর ব্যাখ্যাদি করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরোক্ত সেই অনুমান এবং ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য ও "সামান্যতো দৃষ্ট" শব্দের অর্থব্যাখ্যা দ্বিতীয় খণ্ডে ২০৭-৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। উদ্দ্যোতকর আরও অনেক প্রকারে সূত্রকারোক্ত ত্রিবিধ অনুমানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "সামান্যতো দৃষ্ট" এই শব্দে 'নঞ্' শব্দের অন্তর্ভাব করিয়া "সামান্যতোঽদৃষ্ট" এই নাম গ্রহণ করিয়াও নিজমতে অন্যরূপ সূত্রার্থ-ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। 'তাৎপর্য্যটীকা'কার বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে (১) 'পূর্ব্ববৎ শেষবৎ', (২) 'সামান্যতোঽদৃষ্ট' ও (৩) 'শেষবৎ সামান্যতোঽদৃষ্ট' নামে ত্রিবিধ অনুমান বলিয়াছেন।** সে সকল কথা সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যায় না। উদ্দ্যোতকরের সেই সমস্ত বার্ত্তিকসন্দর্ভ এবং তাৎপর্য্যটীকাদি পাঠ করিয়াই তাহা বুঝিতে হইবে।

ভাষ্য। অথবা 'পূর্ব্বব'দিতি, যত্র যথাপূর্ব্বং প্রত্যক্ষভূতয়োরন্যতরদর্শনেনান্যতরস্যাপ্রত্যক্ষস্যানুমানং, যথা ধূমেনাগ্নিরিতি।

'শেষব'ন্নাম পরিশেষঃ, স চ প্রসক্তপ্রতিষেধেঽন্যত্রাপ্রসঙ্গাৎ শিষ্যমাণে সম্প্রত্যয়, যথা—"সদনিত্য"মিত্যেবমাদিনা দ্রব্যগুণকর্ম্মণামবিশেষেণ সামান্যবিশেষসমবায়েভ্যো নির্ভক্তস্য শব্দস্য,

* কিন্তু শঙ্কর মিশ্র উদ্দ্যোতকরোক্ত হেতুবাক্যের যথাযথ পাঠ উদ্ধৃত করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—"দেশান্তরপ্রাপ্তিমানাদিত্যঃ, অবিনাশিত্বে দ্রব্যত্বে চ সতি প্রাঙ্মুখোপলব্ধস্য প্রত্যঙ্মুখেন তেনৈবোপলভ্যতয়া প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাদিত্যুদ্দ্যোতকরাচার্য্যাঃ।" বৈশেষিক দর্শনের প্রথম অ০ ২য় আ০ ৫ম সূত্রের "উপস্কার" ও তাহার "পরিষ্কার" টীকা দেখিলে শঙ্কর মিশ্রের ঐ কথা বুঝা যাইবে। কিন্তু উক্ত স্থলে উদ্দোতকরের বার্ত্তিকসন্দর্ভ এবং বাচস্পতি মিশ্রের তাৎপর্য্যটীকা অবশ্য দ্রষ্টব্য।

** অনুমিতিদীধিতির টীকায় (সংগতি বিচারে) জগদীশ তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন,—"বাচস্পতিমিশ্রাস্তু 'দৃষ্ট'মিতি সর্ব্বত্রান্বিতং। তথাচ পূর্ব্বমন্বয়সহচারঃ, তদ্বত্তয়া দৃষ্টং গৃহীতং। শেষো ব্যতিরেকসহচারঃ, তদ্বত্তয়া দৃষ্টং গৃহীতং। সামান্যতস্তদুভয়সহচারবত্তয়া দৃষ্টং গৃহীতমিত্যেবং ত্রৈবিধ্যবিবরণমাহুঃ।" কিন্তু "তাৎপর্য্যটীকা"য় বাচস্পতি মিশ্র ঐরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। "ন্যায়সূত্রোদ্ধার"কার পরবর্ত্তী স্মার্ত্ত বাচস্পতি মিশ্রের "ন্যায়তত্ত্বালোক" টীকা দ্রষ্টব্য।

তস্মিন্ দ্রব্যগুণকর্ম্মসংশয়ে ন দ্রব্যমেকদ্রব্যত্বাৎ, ন কর্ম্ম, শব্দান্তরহেতুত্বাৎ, যস্তু শিষ্যতে সোঽয়মিতি শব্দস্য গুণত্ব-প্রতিপত্তিঃ।

'সামান্যতো দৃষ্টং' নাম যত্রাপ্রত্যক্ষে লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধে কেনচিদর্থেন লিঙ্গস্য সামান্যাদপ্রত্যক্ষো লিঙ্গী গম্যতে, যথেচ্ছাদিভিরাত্মা, ইচ্ছাদয়ো গুণাঃ, গুণাশ্চ দ্রব্যসংস্থানাঃ তদ্‌যদেষাং স্থানং, স আত্মেতি।

অনুবাদ—অথবা যে স্থলে যথাপূর্ব্ব 'প্রত্যক্ষভূত' পদার্থদ্বয়ের মধ্যে অর্থাৎ ব্যাপ্তিপ্রত্যক্ষকালে পূর্ব্বে কোন স্থানে যে পদার্থদ্বয় যেরূপে প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তন্মধ্যে একতরের অর্থাৎ পূর্ব্বদৃষ্ট ব্যাপ্য পদার্থের সজাতীয় পদার্থের দর্শনের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ অন্যতরের অর্থাৎ পূর্ব্বদৃষ্ট ব্যাপক পদার্থের সজাতীয় পদার্থের অনুমিতি হয়, সেই স্থলীয় অনুমানপ্রমাণ "পূর্ব্ববৎ" এই নামে কথিত হইয়াছে। যেমন ধূমের দ্বারা অগ্নি অনুমিত হয়। [অর্থাৎ কোন স্থানে পূর্ব্বদৃষ্ট ধূমের সজাতীয় ধূম দর্শন করিলে সেখানে পূর্ব্বদৃষ্ট বহ্নির সজাতীয় বহ্নির অনুমিতি হওয়ায় উক্তরূপ স্থলীয় অনুমানপ্রমাণকে "পূর্ব্ববৎ" বলে]।

"শেষবৎ" বলিতে পরিশেষ অর্থাৎ 'পরিশেষ' অনুমানের নামই "শেষবৎ"; সেই "পরিশেষ" কিন্তু প্রসক্ত পদার্থের (আপত্তির বিষয় পদার্থের) প্রতিষেধ (খণ্ডন) হইলে অন্য পদার্থে প্রসঙ্গের (আপত্তির) অভাববশতঃ শিষ্যমাণ পদার্থে (অবশিষ্ট পদার্থ বিষয়ে) 'সংপ্রত্যয়' অর্থাৎ যথার্থ অনুমিতিরূপ সম্যক্ প্রতীতির করণ। অর্থাৎ উক্তরূপে শেষপদার্থবিষয়ক যথার্থ অনুমিতির করণই "পরিশেষ" অনুমান এবং উহাই "শেষবৎ" নামে কথিত হইয়াছে।

[**উদাহরণ**]—যেমন দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মপদার্থের সৎ ও অনিত্য ইত্যাদি-প্রকার অবিশেষ ধর্ম্মের দ্বারা অর্থাৎ "সদনিত্যং" ইত্যাদি সূত্রে মহর্ষি কণাদোক্ত দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মপদার্থের সত্তা ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি সাধর্ম্ম্যজ্ঞানের দ্বারা সামান্য, বিশেষ ও সমবায়পদার্থ হইতে 'নির্ভক্ত' অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়া নিশ্চিত শব্দের। (শব্দের কি? তাহা পরে বলিতেছেন) সেই শব্দে দ্রব্যগুণকর্ম্ম-সংশয় হইলে অর্থাৎ শব্দ কি দ্রব্যপদার্থ? অথবা গুণপদার্থ? অথবা কর্ম্মপদার্থ? এইরূপ সংশয় হইলে 'একদ্রব্যত্ব' অর্থাৎ একমাত্র দ্রব্যসমবায়িকারণবত্ত্বহেতুক শব্দ দ্রব্য নহে, "শব্দান্তরহেতুত্ব" অর্থাৎ সজাতীয় পদার্থের উৎপাদকত্বহেতুক শব্দ কর্ম্ম

নহে, কিন্তু যে পদার্থ শিষ্ট হয় অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের মধ্যে যে পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, এই শব্দ তাহা, অর্থাৎ গুণপদার্থ, এইরূপে শব্দের গুণত্ব-সিদ্ধি হয়।

"সামান্যতো দৃষ্ট" বলিতে যে স্থলে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ (ব্যাপ্যব্যাপক-ভাবরূপ সম্বন্ধ) অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ লৌকিকপ্রত্যক্ষের অযোগ্য হওয়ায় কোন পদার্থের সহিত লিঙ্গের সমানত্বপ্রযুক্ত (সেই লিঙ্গের দ্বারা) অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ লৌকিকপ্রত্যক্ষের অযোগ্য লিঙ্গী অনুমিত হয়, যেমন ইচ্ছা প্রভৃতির দ্বারা আত্মা অনুমিত হয়। (কি প্রকারে হয়, তাহা বলিতেছেন) ইচ্ছা প্রভৃতি গুণপদার্থ, গুণপদার্থসমূহ কিন্তু 'দ্রব্যসংস্থান' অর্থাৎ দ্রব্যপদার্থই গুণপদার্থের স্থান বা আধার, অতএব ইহাদিগের অর্থাৎ ইচ্ছা প্রভৃতি গুণপদার্থের যাহা স্থান বা আধার, অর্থাৎ যে দ্রব্যে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ উৎপন্ন হয়, তাহা আত্মা। অর্থাৎ উক্তরূপে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের দ্বারা আত্মার সাধক যে অনুমানপ্রমাণ, তাহা উক্ত স্থলে "সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমান।

টিপ্পনী—(ভাষ্যকার পরে মহর্ষির প্রথমোক্ত "পূর্ব্ববৎ" অনুমানের অন্যরূপ ব্যাখ্যা প্রকাশের জন্য বলিয়াছেন,—**"অথবা পূর্ব্ববদিতি।"** এই ব্যাখ্যাই তাঁহার নিজ সম্মত বুঝা যায়। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যে পদার্থদ্বয় পূর্ব্বে অর্থাৎ ব্যাপ্তিপ্রত্যক্ষকালে যেরূপে প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তন্মধ্যে অন্যত্র সেই পূর্ব্বদৃষ্ট ব্যাপ্যপদার্থের তুল্য বা সজাতীয় পদার্থের দর্শনজন্য পূর্ব্বদৃষ্ট ব্যাপক পদার্থের তুল্য বা সজাতীয় পদার্থের অনুমিতি হইলে সেই স্থলীয় অনুমানপ্রমাণের নাম "পূর্ব্ববৎ"। এই ব্যাখ্যায় "পূর্ব্ববৎ" শব্দটি ক্রিয়াতুল্যতা অর্থে বতিপ্রত্যয়সিদ্ধ এবং উহার অর্থ পূর্ব্বতুল্য। ভাষ্যকার পরে ইহার প্রসিদ্ধ উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন,—**"যথা ধূমেনাগ্নিরিতি।"** ভাষ্যকারের মতে ধূমত্বরূপে ধূম হেতুর দ্বারা বহ্নিত্বরূপে বহ্নিরই অনুমিতি জন্মে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ভাষ্যকার পরেও (২।১।৪৬) ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন,—"যথা ধূমেন প্রত্যক্ষেণা-প্রত্যক্ষস্য বহ্নেগ্রহণমনুমানং।" (দ্বিতীয় খণ্ড, ২৭৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্বে পাকশালাদি স্থানে ধূম ও বহ্নি যেরূপে 'প্রত্যক্ষভূত', পরে পর্ব্বতাদি স্থানে তত্তুল্য অর্থাৎ পূর্ব্বদৃষ্ট ধূমের সজাতীয় ধূম দর্শনের দ্বারা পূর্ব্বদৃষ্ট বহ্নির তুল্য বা সজাতীয় অপ্রত্যক্ষ বহ্নির অনুমিতি জন্মে। সেই অনুমিতির চরম কারণ যে বহ্নিব্যাপ্য ধূমদর্শনরূপ ক্রিয়া, তাহাও পাকশালাদি স্থানে প্রথম ধূমদর্শনক্রিয়ার তুল্য হওয়ায় উক্তরূপ অনুমানপ্রমাণ "পূর্ব্ববৎ" নামে কথিত হইয়াছে।)

বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, ভাষ্যে "প্রত্যক্ষভূত" শব্দটি প্রদর্শন মাত্র। পূর্ব্বে অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা পদার্থদ্বয়ের ব্যাপ্যব্যাপক ভাব সম্বন্ধের নিশ্চয় হইলেও অন্যত্র সেই ব্যাপ্য পদার্থের তুল্য বা সজাতীয় পদার্থের নিশ্চয়জন্য সেই ব্যাপক পদার্থের সজাতীয় পদার্থের অনুমিতি হইলে সেই স্থলীয় অনুমানপ্রমাণও **"পূর্ব্ববৎ"**।

ভাষ্যকার পরে দ্বিতীয় প্রকার "শেষবৎ" অনুমানের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—**"শেষবন্নাম পরিশেষঃ"** ইত্যাদি। "শিষ্যতে অবশিষ্যতে" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে "শেষ" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, যে পদার্থ অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ যাহা কোন প্রমাণ দ্বারা খণ্ডিত হয় না। "শেষোঽস্তি যস্য প্রতিপাদ্যতয়া" অর্থাৎ শেষ পদার্থটি যে অনুমানপ্রমাণের প্রতিপাদ্য, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে উক্ত "শেষবৎ" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, সেই শেষ পদার্থের সাধক অনুমানপ্রমাণ। উক্ত **"শেষবৎ"** অনুমানের নামই **"পরিশেষ"** অনুমান। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—**"স চ প্রসক্তপ্রতিষেধে"** ইত্যাদি। পরে **"যথা সদনিত্যং"** ইত্যাদি **"শব্দস্য"** ইত্যন্ত সন্দর্ভের দ্বারা শব্দের গুণত্বসাধক অনুমানপ্রমাণকে উহার উদাহরণরূপে সূচনা করিয়া **"তস্মিন্ দ্রব্যগুণকর্ম্ম-সংশয়ে"** ইত্যাদির সন্দর্ভের দ্বারা সেই অনুমানের প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন।

ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, বৈশেষিকদর্শনে মহর্ষি কণাদ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়, এই ষট্ পদার্থের উল্লেখ করিয়া, পরে "সদনিত্যং দ্রব্যবৎ কার্য্যং কারণং সামান্যবিশেষবদিতি দ্রব্য-গুণকর্ম্মণামবিশেষঃ," এই অষ্টম সূত্রদ্বারা সত্তা ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি কতিপয় ধর্ম্মকে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম, এই প্রথমোক্ত পদার্থত্রয়েরই সাধর্ম্ম্য বলিয়াছেন। অর্থাৎ ঐ ধর্ম্মগুলি দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মপদার্থেই থাকে, শেষোক্ত সামান্য, বিশেষ ও সমবায় নামক পদার্থত্রয়ে থাকে না। কিন্তু কণাদের মতে শব্দেও ঐ সত্তা ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম থাকে। সুতরাং তাঁহার মতে শব্দ যে সামান্য, বিশেষ ও সমবায় নামক পদার্থ হইতে ভিন্ন, ইহা নিশ্চিত। ভাষ্যকার এই তাৎপর্য্যেই পূর্ব্বে শব্দকে সামান্য, বিশেষ ও সমবায় হইতে "নির্ভক্ত" বলিয়াছেন। ফলকথা, শব্দে সামান্যত্ব, বিশেষত্ব ও সমবায়ত্ব প্রসক্তই হয় না। কিন্তু শব্দে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য সত্তা ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি থাকায় সেই সাধর্ম্ম্যজ্ঞানজন্য শব্দ কি দ্রব্য অথবা গুণ অথবা কর্ম্ম? এইরূপ সংশয় জন্মে। ভাষ্যকারের "তস্মিন্ দ্রব্যগুণকর্ম্মসংশয়ে"

এই উক্তির দ্বারা শব্দে অভেদসম্বন্ধে দ্রব্যাদি পদার্থের সংশয়ই এখানে তিনি বলিয়াছেন, এবং ঐরূপে ভাবপদার্থমাত্রকোটিক ও বহুকোটিক সংশয়ও তাঁহার সম্মত ইহা বুঝা যায়। শব্দে সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যত্বাদি ত্রিকোটিক সংশয়ও হইতে পারে। কিন্তু ভেদকোটিক সংশয়ও প্রাচীন-সম্মত বুঝা যায়।

ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—**"ন দ্রব্যমেকদ্রব্যত্বাৎ, ন কর্ম্ম, শব্দান্তর-হেতুত্বাৎ।"** ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে কণাদের মত শব্দ অনিত্য এবং একমাত্র দ্রব্য আকাশই শব্দের সমবায়িকারণ। সুতরাং শব্দে একদ্রব্যত্ব আছে। "একং দ্রব্যং সমবায়িকারণতয়া যস্য" এইরূপ বিগ্রহবাক্যানুসারে বহুব্রীহি সমাসে "একদ্রব্য" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, যাহার সমবায়িকারণ একমাত্র দ্রব্য। সুতরাং উক্ত "একদ্রব্যত্ব" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, একমাত্র দ্রব্যসমবায়িকারণবত্ত্ব। কিন্তু একমাত্র দ্রব্য কোন দ্রব্যপদার্থের সমবায়িকারণ হয় না। যেমন বস্ত্রের সমবায়িকারণ সূত্র, কিন্তু একটি মাত্র সূত্র বস্ত্রের উৎপাদক হয় না। সর্ব্বত্র একাধিক দ্রব্যবিশেষই অপর দ্রব্যবিশেষের সমবায়িকারণ হয়। সুতরাং কণাদের মতানুসারে উক্ত "একদ্রব্যত্ব" হেতুর দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, শব্দ দ্রব্যপদার্থ নহে। এইরূপ শব্দ কর্ম্মপদার্থও নহে। ভাষ্যকার ইহার সাধকহেতু বলিয়াছেন—"শব্দান্তরহেতুত্ব"। শব্দ অপর শব্দের হেতু অর্থাৎ সজাতীয় পদার্থের উৎপাদক। উক্ত হেতুবাক্যের দ্বারা সজাতীয়োৎ-পাদকত্ব হেতুই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত। কারণ, সেই হেতুর দ্বারাই শব্দে কর্ম্মপদার্থের ভেদ সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ কণাদের মতে পূর্ব্বোৎপন্ন শব্দ হইতে অপর শব্দ জন্মে, কিন্তু কর্ম্ম হইতে অপর কর্ম্ম জন্মে না। কারণ, কোন দ্রব্যে ক্রিয়া জন্মিলে পরক্ষণেই অপর দ্রব্য হইতে তাহার বিভাগ জন্মে। সুতরাং কর্ম্ম বা ক্রিয়ামাত্রই বিভাগজনক। কিন্তু প্রথম ক্রিয়াজন্যই সেই বিভাগ জন্মে। বিভক্তের আবার বিভাগ বলা যায় না। সুতরাং প্রথম ক্রিয়াজন্য অপর ক্রিয়ার উৎপত্তিবিষয়ে প্রমাণ নাই। যাহা বিভাগজনক নহে, তাহাতে কর্ম্ম বা ক্রিয়ার লক্ষণ নাই। ফলকথা, কর্ম্মপদার্থে সজাতীয়োৎপাদকত্ব নাই। দ্রব্য ও গুণপদার্থই সজাতীয়োৎপাদক হয়। তাই কণাদ পরে স্পষ্ট বলিয়াছেন,—"দ্রব্যগুণয়োঃ সজাতীয়ারম্ভকত্বং সাধর্ম্ম্যং।" "দ্রব্যাণি দ্রব্যান্তরমারভন্তে গুণাশ্চ গুণান্তরং ॥" "কর্ম্ম কর্ম্মসাধ্যং ন বিদ্যতে॥" ১।১০।১১॥ সুতরাং "শব্দো ন কর্ম্ম, সজাতীয়োৎপাদকত্বাৎ দ্রব্যবৎ", এইরূপে অনুমানপ্রমাণ দ্বারা শব্দে কর্ম্মপদার্থেরও ভেদ সিদ্ধ হয়। শব্দে দ্রব্য ও কর্ম্মের

ভেদ সিদ্ধ হইলেই তাহাতে দ্রব্যত্ব ও কর্ম্মত্বের অত্যন্তাভাব সিদ্ধ হয়। দ্রব্যাদি ধর্ম্মীর ভেদ এবং দ্রব্যত্বাদি ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব একই পদার্থ, ইহাও প্রাচীন মতবিশেষ। শব্দে প্রসক্ত দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্ম্মত্বের মধ্যে দ্রব্যত্ব ও কর্ম্মত্বের অভাব সিদ্ধ হইলে গুণত্বই শেষ অর্থাৎ অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং শব্দের গুণত্বপ্রতিপত্তি অর্থাৎ গুণত্বসিদ্ধি হয়। গুণত্বরূপ শেষ পদার্থবিষয়ক অনুমিতিই গুণত্বসিদ্ধি। উক্ত স্থলে সেই শেষ পদার্থের সাধক অনুমানপ্রমাণ "শেষবৎ" অনুমানের উদাহরণ।*

তৃতীয় প্রকার অনুমানের নাম "সামান্যতো দৃষ্ট"। উহা প্রথমোক্ত "পূর্ব্ববৎ" অনুমানের বিপরীত। কারণ, "পূর্ব্ববৎ" অনুমান স্থলে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধ লৌকিকপ্রত্যক্ষের যোগ্য। কিন্তু যে স্থলে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর উক্তরূপ সম্বন্ধ লৌকিকপ্রত্যক্ষের যোগ্যই নহে, সেই স্থলে "সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমানের দ্বারা প্রকৃত সাধ্য সিদ্ধ হয়। যেমন আত্মা দেহাদিভিন্নত্বরূপে লৌকিকপ্রত্যক্ষের যোগ্য নহে। সুতরাং তাহাতে উৎপন্ন ইচ্ছা প্রভৃতি বিশেষ গুণ, তাহার মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হইলেও সেই সমস্ত গুণে ঐ আত্মার ব্যাপ্তিসম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, যাহাতে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ জন্মে, তাহা দেহাদিভিন্ন আত্মা, এইরূপে ব্যাপ্তিনিশ্চয় করিতে প্রত্যক্ষসিদ্ধ কোন উদাহরণ নাই। কিন্তু যাহা যাহা গুণপদার্থ, সে সমস্তই দ্রব্যাশ্রিত, যেমন রূপাদি গুণ, এইরূপে সামান্যতঃ গুণপদার্থে অথবা গুণত্বে দ্রব্যাশ্রিতত্বের ব্যাপ্তিসম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয়। কারণ, বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপাদি গুণ যে, দ্রব্যাশ্রিত, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপে সামান্যতঃ ব্যাপ্তি-সম্বন্ধের প্রত্যক্ষের ফলে ইচ্ছা প্রভৃতি মনোগ্রাহ্য গুণ কোন দ্রব্যাশ্রিত অর্থাৎ

* কিন্তু "তাৎপর্য্যটীকা"কার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন,—"ইদন্তু পরিশেষস্যোদাহরণং নাদরণীয়ং। ব্যতিরেকিণো হি নামান্তরমিদং পরিশেষ ইতি। এষ পুনরন্বয়ব্যতিরেকী, দ্রব্যকর্ম্মান্যত্বে সতি সদাত্মভেদস্ত সপক্ষে রূপাদৌ সত্ত্বাদ্ বিপক্ষেচ সামান্যাদাবভাবাৎ। তস্মাদাত্মতন্ত্রতা-সাধনমিচ্ছাদীনাং পরিশেষোদাহরণং দ্রষ্টব্যং।' পরে ইহা বুঝা যাইবে। "ন্যায়বার্ত্তিকে" (১।১।৩৫) উদ্দ্যোতকরও "ব্যতিরেকী" অনুমানকেই "অবীত" অনুমান বলিয়াছেন। তদনুসারেই বাচস্পতি মিশ্র "সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী"তে প্রথমে অনুমানপ্রমাণকে "বীত" ও "অবীত" নামে দ্বিবিধ বলিয়া "শেষবৎ" অনুমানকেই বলিয়াছেন—"অবীত" অনুমান। "ব্যতিরেকমুখেন প্রবর্ত্তমানং নিষেধকমবীতং তত্রাবীতং শেষবৎ।" বাচস্পতি মিশ্র সেখানেও উক্ত "শেষবৎ" অনুমানের ব্যাখ্যায় বাৎস্যায়নের "প্রসক্তপ্রতিষেধে" ইত্যাদি সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াও তাঁহার পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ গ্রহণ করেন নাই।

কোন দ্রব্যপদার্থ তাহার আশ্রয় বা আধার, ইহা সিদ্ধ হয়। তাহা হইলেই ফলতঃ আত্মা নামে অতিরিক্ত দ্রব্যই সিদ্ধ হয়।

কিন্তু উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে "সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমানের দ্বারা আত্মা সিদ্ধ হয় না। কারণ, আত্মা সেই অনুমিতির বিষয়ই হয় না। কিন্তু যাহা যাহা গুণপদার্থ, তাহা পরতন্ত্র অর্থাৎ পরাশ্রিত, এইরূপে সামান্যতঃ গুণপদার্থমাত্রে পরাশ্রিতত্বের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হওয়ায় "সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমানের দ্বারা ইচ্ছা প্রভৃতি গুণবিশেষে পরাশ্রিতত্বই সিদ্ধ হয়। পরে ঐ ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ পৃথিব্যাদি কোন দ্রব্যাশ্রিত নহে, ইহা সিদ্ধ হইলে "শেষবৎ" অনুমানের দ্বারা উহাতে আত্মাশ্রিতত্ব সিদ্ধ হয়। সুতরাং পরে "শেষবৎ" অনুমানের দ্বারাই আত্মা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ প্রথমে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের পরতন্ত্রত্ব বা পরাশ্রিতত্বের সাধক যে অনুমান, তাহাই "সামান্যতো দৃষ্ট"। কিন্তু পরে ঐ ইচ্ছাদি গুণের আত্মাশ্রিতত্বসাধক যে অনুমান, তাহাই "শেষবৎ"। মহর্ষি কিন্তু পরে (দশম সূত্রে) ইচ্ছা প্রভৃতিকে আত্মারই লিঙ্গ বলিয়াছেন। তদনুসারেই ভাষ্যকার এখানে পরে "সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমানের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন,—"যথেচ্ছাদিভিরাত্মা"। পরন্তু মহর্ষি পরে তৃতীয় অধ্যায়ে অনুমানপ্রমাণ দ্বারা আত্মা দেহাদিভিন্ন নিত্য, ইহা সিদ্ধ করিয়া, পরে জ্ঞান যে, সেই আত্মারই গুণ, এই নিজ সিদ্ধান্ত সিদ্ধ করিতে উপসংহারে বলিয়াছেন, "পরিশেষাদ্‌যথোক্তহেতূপপত্তেশ্চ।" (৩।২।৩৯)। সুতরাং মহর্ষি যে, "পরিশেষ" অনুমানকেই "শেষবৎ" নামে দ্বিতীয় প্রকার অনুমান বলিয়াছেন, ইহা তাঁহার উক্ত সূত্রে "পরিশেষ" শব্দের প্রয়োগ দ্বারা বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকারও সেখানে উক্ত "পরিশেষ" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে পূর্ব্ববৎ বলিয়াছেন,—"পরিশেষো নাম প্রসক্তপ্রতিষেধেঽন্যত্রা-প্রসঙ্গাচ্ছিষ্যমাণে সম্প্রত্যয়ঃ।" (তৃতীয় খণ্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ফলকথা, মহর্ষির উক্ত সূত্রানুসারে ভাষ্যকারের মতে প্রসক্ত পদার্থের মধ্যে পূর্ব্বে অন্য প্রমাণ দ্বারা অপর পদার্থের বাধনিশ্চয় বা অভাব নিশ্চয় হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ যাহার খণ্ডন সম্ভব হয় না, সেই শেষ পদার্থের সাধক যে অনুমান, তাহা কোন স্থলে "অন্বয়ব্যতিরেকী" অনুমান হইলেও "শেষবৎ" ও "পরিশেষ" নামে কথিত হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার পূর্ব্বে শব্দের গুণত্বসাধক অনুমানকে "শেষবৎ" অনুমানের উদাহরণ বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইচ্ছাদি গুণের আধার আত্মার সাধক অনুমানকে "শেষবৎ" অনুমান বলেন নাই।

কারণ, ভাষ্যকারোক্ত সেই অনুমানে পূর্ব্বে প্রসক্ত পদার্থের প্রতিষেধ সিদ্ধ করা হয় না অর্থাৎ উহা ইতর পদার্থের বাধনিশ্চয়পূর্ব্বক নহে। কিন্তু প্রথমে সামান্যতঃ ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের ফলেই ইচ্ছাদিগুণের আধার কোন দ্রব্য সিদ্ধ হইলে ভাষ্যকারের মতে ফলতঃ সেই অনুমানের দ্বারাই আত্মা সিদ্ধ হয়। কারণ, ইচ্ছাদি গুণের আধার সেই দ্রব্য যে, দেহাদি কোন দ্রব্য নহে, ইহা পরে সিদ্ধ হইবে। পরন্তু মহর্ষি পরে তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমে আত্মপরীক্ষায় আত্মা যে, দেহাদি দ্রব্য হইতে ভিন্ন, ইহাই অনুমানপ্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু আত্মা পূর্ব্বে সিদ্ধ না হইলে তাহাতে সেই অনুমান হইতে পারে না, ইহা বুঝা আবশ্যক। পরে তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে অনুমানপ্রমাণ দ্বারা জ্ঞান যে, ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের গুণ নহে, ইহা সিদ্ধ করিয়া পরিশেষ অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছেন যে, জ্ঞান আত্মারই গুণ। তাই ভাষ্যকার সেখানে বলিয়াছেন,—"ভূতেন্দ্রিয়মনসাং প্রতিষেধে দ্রব্যান্তরং ন প্রসজ্যতে, শিষ্যতে চাত্মা, তস্য গুণো জ্ঞানমিতি জ্ঞায়তে।" (৩।২।৩৯ সূত্রভাষ্য)। কিন্তু আত্মা পূর্ব্বে সিদ্ধ না হইলে ঐ কথা বলা যায় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমানের দ্বারাই যে, পূর্ব্বেই আত্মা সিদ্ধ হয়, ইহা মহর্ষিরও সম্মত বুঝা যায়। ফলকথা, বাচস্পতি মিশ্র যে ভাবে ব্যতিরেকী অনুমানকেই "শেষবৎ" বলিয়া, উহাকেই আত্মার সাধক অনুমান বলিয়াছেন, তাহা ভাষ্যকারের সম্মত বুঝা যায় না।

অবশ্য "ব্যতিরেকী" অনুমানই যে "শেষবৎ", ইহাও প্রাচীন ব্যাখ্যা। "ন্যায়বার্ত্তিকে" (১।১।৫) উদ্দ্যোতকরও প্রথম ব্যাখ্যা করিয়াছেন,— "ত্রিবিধমিতি, অন্বয়ী ব্যতিরেকী অন্বয়ব্যতিরেকী চ।" পরে "তত্ত্ব-চিন্তামণি"কার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও উক্তরূপে অনুমানপ্রমাণকে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। উক্ত প্রকারত্রয়ের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ বিষয়েও ক্রমে নানা মতভেদ হইয়াছে। পরে হেতুবাক্য ও উদাহরণবাক্যের লক্ষণাদি-ব্যাখ্যায় উক্ত বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যাইবে। বৈশেষিকদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে এবং তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন,—"সামান্যতো দৃষ্টাচ্চাবিশেষঃ" (১৬শ ও ৭ম সূ), উক্ত দুই সূত্রের উপস্কারও দ্রষ্টব্য। প্রথমোক্ত সূত্রের "উপস্কারে" শঙ্কর মিশ্র অনুমানপ্রমাণকে "পূর্ব্ববৎ", "শেষবৎ" ও "সামান্যতো দৃষ্ট" নামে ত্রিবিধ বলিয়া, বায়ুর সাধক অনুমানপ্রমাণকে "সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমানের উদাহরণ বলিয়াছেন। কিরূপ স্থলে কি ভাবে

"সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমান হইবে এবং কিরূপ স্থলে কি ভাবে 'কেবল-ব্যতিরেকী' অনুমান হইবে, ইহাও সেখানে বলিয়াছেন। "কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থের তৃতীয় স্তবকে উপমানপ্রমাণের অনুমানত্ব-খণ্ডনে প্রকাশটীকাকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় এবং সেখানে "মকরন্দ"ব্যাখ্যাকার রুচি দত্তের বিচারেও উক্ত বিষয়ে অনেক কথা পাওয়া যায়। সে সকল কথাও সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যায় না।

কিন্তু ইহা বলা আবশ্যক যে, শঙ্কর মিশ্র বৈশেষিক মতেও পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অনুমান বলিলেও কণাদের সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ "শেষবৎ" অনুমান বুঝা যায় না। বস্তুতঃ বৈশেষিকসম্প্রদায়ের মতে অনুমান ত্রিবিধ নহে—দ্বিবিধ। তাই প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ অনুমানের ব্যাখ্যা করিয়া পরে বলিয়াছেন,—"তত্তু দ্বিবিধং, দৃষ্টং সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ।" গোতমোক্ত "পূর্ব্ববৎ" অনুমানকেই তিনি "দৃষ্ট" নামে বলিয়াছেন। ভাসর্ব্বজ্ঞও "ন্যায়সারে" লিঙ্গকে "দৃষ্ট" ও "সামান্যতো দৃষ্ট" নামে দ্বিবিধ বলিয়া অতীন্দ্রিয় পদার্থের অনুমাপক লিঙ্গকে বলিয়াছেন,—"সামান্যতো দৃষ্ট" এবং ইন্দ্রিয়ের অনুমাপক লিঙ্গকে উহার উদাহরণ বলিয়াছেন। "মানমেয়োদয়" গ্রন্থে মীমাংসক নারায়ণ ভট্টও পরে পূর্ব্বোক্ত নামদ্বয়ে অনুমানপ্রমাণকে দ্বিবিধ বলিয়াছেন। কিন্তু উক্ত মতে পূর্ব্বদৃষ্ট ও পরে দৃষ্ট সেই হেতুপদার্থ অভিন্ন হইলে এবং অনুমেয় পদার্থও পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থ হইতে অভিন্ন হইলে সেই স্থলীয় অনুমানের নাম "দৃষ্ট"। "কৃত্তিকোদয়মালক্ষ্য রোহিণ্যনুমিতির্যথা।" ("মানমেয়োদয়")। আর যে স্থলে পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের সজাতীয় ভিন্ন পদার্থের দর্শন করিয়া পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের সজাতীয় ভিন্ন পদার্থের অনুমিতি জন্মে, সেই স্থলীয় অনুমানের নাম "সামান্যতো দৃষ্ট"। "তদ্ধি সামান্যতো দৃষ্টং যথা বহ্ন্যনুমাদিকং।" ("মানমেয়োদয়")। উক্ত মতে অতীন্দ্রিয় পদার্থের অনুমিতি হয় না। "অর্থাপত্তি" নামক পৃথক্ প্রমাণের দ্বারাই অনেক অতীন্দ্রিয় পদার্থ সিদ্ধ হয়। কিন্তু অন্য সম্প্রদায় ইহা স্বীকার করেন নাই। "সাংখ্যকারিকা"য় ঈশ্বরকৃষ্ণ স্পষ্ট বলিয়াছেন,—"সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ।" মীমাংসক ও বৈদান্তিক সম্প্রদায় ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি অস্বীকার করিয়া "অর্থাপত্তি" নামে পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে সর্ব্বত্রই অন্বয় দৃষ্টান্তের সাহায্যে অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্যই অনুমিতি জন্মে, সুতরাং সমস্ত অনুমানই "অন্বয়ী"। "ব্যতিরেকী" ও "অন্বয়-ব্যতিরেকী" নামে কোন প্রকার অনুমান নাই। পরে হেতুবাক্য ও উদাহরণ-

বাক্যের ব্যাখ্যায় এ বিষয়েও আলোচনা পাওয়া যাইবে। অনুমানের প্রকারভেদ ও তাহার ব্যাখ্যায় আরও অনেক মতভেদ আছে।

ভাষ্য। বিভাগবচনাদেব ত্রিবিধমিতি সিদ্ধে ত্রিবিধবচনং—মহতো মহাবিষয়স্য ন্যায়স্য লঘীয়সা সূত্রেণোপদেশাৎ পরং বাক্যলাঘবং মন্যমানস্যান্যস্মিন্ বাক্যলাঘবেঽনাদরঃ। তথাচায়মস্যেত্থম্ভূতেন বাক্যবিকল্পেন প্রবৃত্তঃ সিদ্ধান্তে ছলে শব্দাদিষু চ বহুলং সমাচারঃ শাস্ত্রে ইতি।*

সদ্বিষয়ঞ্চ প্রত্যক্ষং, সদসদ্বিষয়ঞ্চানুমানং। কস্মাৎ? ত্রৈকাল্যগ্রহণাৎ। ত্রিকালযুক্তা অর্থা অনুমানেন গৃহ্যন্তে, ভবিষ্যতীত্যনুমীয়তে, ভবতীতি চাভূদিতি চ। অসচ্চ খল্বতীতমনাগতঞ্চেতি।

অনুবাদ—বিভাগবাক্য হইতেই অর্থাৎ সূত্রোক্ত "পূর্ব্ববৎ" ইত্যাদি বাক্য হইতেই ত্রিবিধ ইহা সিদ্ধ হইলেও "ত্রিবিধবচন" অর্থাৎ এই সূত্রে "ত্রিবিধ" শব্দের প্রয়োগ মহান্ ও মহাবিষয় ন্যায়ের (অনুমানপ্রমাণের) অতিলঘু একটি সূত্রের দ্বারা উপদেশপ্রযুক্ত অত্যন্ত বাক্যসংক্ষেপ মনে করায় সূত্রকারের অন্য বাক্যসংক্ষেপে অনাদর (অর্থাৎ ইহা হইতে আরও বাক্যসংক্ষেপে অনিচ্ছাপ্রযুক্তই সূত্রকার স্পষ্টার্থ "ত্রিবিধং" এই পদের প্রয়োগ করিয়াছেন) সেই প্রকারেই ইহার (সূত্রকার মহর্ষির) এবম্ভূত বাক্যবৈচিত্র্যের দ্বারা শাস্ত্রে (এই ন্যায়দর্শনে) সিদ্ধান্তে, ছলে এবং শব্দাদিতে এই সমাচার অর্থাৎ অতিরিক্ত বাক্যসংক্ষেপে অনিচ্ছাপ্রযুক্ত স্পষ্টার্থ বাক্যপ্রয়োগ বহু প্রবৃত্ত হইয়াছে।

এবং প্রত্যক্ষ সদ্বিষয় অর্থাৎ কেবল বর্ত্তমান পদার্থবিষয়ক। কিন্তু অনুমান সদ্বিষয়ক ও অসদ্বিষয়ক। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) ত্রিকালীন পদার্থের গ্রহণপ্রযুক্ত। (বিশদার্থ) অনুমানপ্রমাণের দ্বারা ত্রিকালীন পদার্থসমূহ গৃহীত হয়। 'হইবে', ইহা অনুমিত হয় এবং 'হইতেছে', ইহা অনুমিত হয় এবং

---

* "মহত"স্ত্রিবিধস্য "মহাবিষয়স্য" অতীতানাগতবর্ত্তমানবিষয়স্য "লঘীয়সা সূত্রেণ" 'তৎপূর্ব্বক'-মিত্যেতাবতৈব "উপদেশাৎ" পরং বাক্যলাঘবং মন্যমানস্যান্যস্মিন্ বাক্যলাঘবেঽনাদরঃ সূত্রকারস্যেতি শিষ্যান্ ব্যুৎপাদয়িষোঃ। অত্র নিদর্শনং, "তথাচায়মস্য সমাচার ইত্থম্ভূতেন বাক্যবিকল্পেন" বৈচিত্র্যেণ "প্রবৃত্ত" ইতি যোজনা।—তাৎপর্য্যটীকা।

'হইয়াছিল', ইহাও অনুমিত হয়। 'অসৎ' কিন্তু অতীত ও ভবিষ্যৎ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অসৎ শব্দের অর্থ এখানে অবিদ্যমান অতীত ও ভাবী পদার্থ।

টিপ্পনী—প্রশ্ন হয় যে, এই সূত্রে "বিভাগবচন" অর্থাৎ অনুমানপ্রমাণের প্রকারত্রয়বোধক "পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ, সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ" এই বাক্যের দ্বারাই অনুমানপ্রমাণ যে ত্রিবিধ, ইহা বুঝা যায়, তথাপি সূত্রকার তৎপূর্ব্বে "ত্রিবিধং" এই পদ কেন বলিয়াছেন? স্বল্পাক্ষরত্বই সূত্রের প্রথম লক্ষণ, তথাপি সূত্রকার অনাবশ্যক ঐ অতিরিক্ত পদ বলিয়াছেন কেন?* এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, উহা সূত্রকারের অত্যধিক বাক্যসংক্ষেপে অনাদর অর্থাৎ অনিচ্ছাপ্রযুক্ত। কারণ, অনুমানরূপ ন্যায় 'মহান্' অর্থাৎ ত্রিবিধ, উহার অবান্তর প্রকারভেদও বহু, এবং উহা মহাবিষয় অর্থাৎ অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান পদার্থ উহার বিষয়। সুতরাং উক্তরূপ অনুমানপ্রমাণের অতিলঘু একটি সূত্রের দ্বারা উপদেশ করায় সূত্রকার অত্যন্ত বাক্যসংক্ষেপ মনে করিয়া আরও বাক্যসংক্ষেপের ইচ্ছা করেন নাই। তাৎপর্য্য এই যে, "স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং" ইত্যাদি সূত্রলক্ষণে স্বল্পাক্ষরত্বের ন্যায় অসন্দিগ্ধত্বও সূত্রের লক্ষণ বলা হইয়াছে। সুতরাং এই সূত্রে শেষোক্ত "পূর্ব্ববৎ" প্রভৃতি শব্দত্রয় যে, পূর্ব্বোক্ত অনুমানপ্রমাণের প্রকারত্রয়েরই নাম, এ বিষয়ে যাহাতে শিষ্যগণের সন্দেহ না জন্মে, এই উদ্দেশ্যেই মহর্ষি তৎপূর্ব্বে "ত্রিবিধং" এই পদ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার পরে ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, সূত্রকারের এই শাস্ত্রে এবম্ভূত বাক্যবৈচিত্র্যের দ্বারা উক্তরূপ সমাচার বহু প্রবৃত্ত হইয়াছে। যেমন পরে 'সিদ্ধান্ত' পদার্থের প্রকারভেদ বলিতে সেই সূত্রের প্রথমে **"স চতুর্ব্বিধঃ"** এই বাক্য এবং 'ছল' পদার্থের প্রকারভেদ বলিতে সেই

---

* বাচস্পতি মিশ্র উক্ত ভাষ্যসন্দর্ভের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"ত্রিবিধমিতি বিভাগবচনাদেব ত্রিবিধে পূর্ব্ববদাদৌ সিদ্ধে কিমর্থং পূর্ব্ববদাদ্যুপাদানং সূত্রেণেতি, তত্র সমাধানং "ত্রিবিধবচনং ত্রিবিধস্য পূর্ব্ববদাদের্ব্বচনমুক্তিঃ" (তাৎপর্য্যটীকা ১২১ পৃঃ)। "বিভাগবচনাদেবেত্যাদি ভাষ্য-পঙ্‌ক্তিব্যাখ্যায়াঃ শঙ্কাপোষণে তাৎপর্য্যং" ("পরিশুদ্ধি" ৭৫৯ পৃঃ)। ঋজুভাষ্যং কুতো বক্রগত্যা ব্যাখ্যায়তে ইত্যত আহ শঙ্কাপোষণ ইতি। পূর্ব্ববদাদিপদত্বব্যাখ্যানমেব শঙ্কাপুষ্টিঃ" ("পরিশুদ্ধিপ্রকাশ")। প্রথম সংস্করণে বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যাই লিখিত হইয়াছে। কিন্তু উক্তরূপ ব্যাখ্যার কারণ বুঝা যায় না। "পরিশুদ্ধি" টীকায় উদয়নাচার্য্য অতি সংক্ষেপে যে কারণ বলিয়াছেন, তাহাও বুঝিতে পারি না। পরন্তু অনুমানপ্রমাণের "পূর্ব্ববৎ" প্রভৃতি নামত্রয়কথনই তাহার বিভাগ, সুতরাং উহা অবশ্য কর্ত্তব্য। কেবল "ত্রিবিধং" এই পদ বলিলে উক্ত নামত্রয় বলা হয় না এবং তাহা বুঝাও যায় না। ভাষ্যকারের শেষোক্ত "তথাচায়ং" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারাও সরলভাবে তাঁহার প্রথম কথায় উক্তরূপ তাৎপর্য্যই বুঝা যায়। জয়ন্ত ভট্টও সরলভাবেই ভাষ্যকারের ঐ কথাই বলিয়াছেন। "ন্যায়মঞ্জরী" ১২৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সূত্রের প্রথমে **"তৎ ত্রিবিধং"** এই বাক্য এবং শব্দপ্রমাণের প্রকারভেদ বলিতে সেই সূত্রের প্রথমে "স দ্বিবিধঃ" এই বাক্য বলিয়াছেন। এইরূপ আরও অনেক স্থলে অত্যন্ত বাক্যসংক্ষেপে অনিচ্ছাপ্রযুক্ত তিনি কোন কোন অতিরিক্ত বাক্য বলিয়াছেন। সেইরূপ এই সূত্রেও তিনি "ত্রিবিধং" এই পদ বলিয়াছেন। এখানে ভাষ্যকারের এই সমস্ত কথার দ্বারা প্রাচীন কালে বিরোধী সম্প্রদায় যে, ন্যায়সূত্রে অনেক স্থলে ব্যর্থত্ব-দোষও বলিয়াছিলেন, তাই ভাষ্যকার তাহারও সমাধান করিয়াছেন, ইহাও বুঝিতে পারা যায়। পরেও (১।২।৩ সূত্রভাষ্যে) ভাষ্যকারের কথার দ্বারা তাহা বুঝা যাইবে।

প্রত্যক্ষ ও অনুমানপ্রমাণের বিষয়ভেদপ্রযুক্তও যে ভেদ আছে, ইহা প্রকাশ করিতে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন—**"সদ্বিষয়ঞ্চ প্রত্যক্ষং"** ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে, লৌকিক সন্নিকর্ষজন্য যে সমস্ত লৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা কেবল বর্ত্তমান পদার্থবিষয়ক হয়। কিন্তু অনুমান বর্ত্তমান ও অবর্ত্তমান পদার্থবিষয়ক হয়। ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন, **"ত্রৈকাল্যগ্রহণাৎ"**। পরে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "ত্রৈকাল্য" অর্থাৎ ত্রিকালযুক্ত (ত্রিকালীন) পদার্থই অনুমানপ্রমাণের দ্বারা গৃহীত হয়। তৎকালে বিদ্যমান পদার্থ যেমন অনুমানের বিষয় হয়, তদ্রূপ অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থও অনুমানের বিষয় হয়। ভাষ্যকারের এই কথার দ্বারা কালত্রয়ের ভেদপ্রযুক্তও যে, উক্তরূপে অনুমানপ্রমাণ ত্রিবিধ, ইহাও সূচিত হইয়াছে। "চরকসংহিতা"তেও ঐ তাৎপর্য্যেই কথিত হইয়াছে,—"প্রত্যক্ষপূর্ব্বং ত্রিবিধং ত্রিকালঞ্চানুমীয়তে।" পরে যথাক্রমে বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ-বিষয়ক অনুমানের উদাহরণও প্রদর্শিত হইয়াছে।* ভাষ্যকার প্রথমে (১২শ পৃঃ) ভাব ও অভাব অর্থেই "সৎ" ও "অসৎ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। "চরকসংহিতা"র সূত্রস্থানেও (১১শ অঃ)—পদার্থ দ্বিবিধ, ভাব ও অভাব, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশের জন্য কথিত হইয়াছে, "দ্বিবিধমেব খলু সর্ব্বং সচ্চাসচ্চ"। সুতরাং এখানে ভাষ্যাকারোক্ত "অসৎ" শব্দের অভাব অর্থে ভ্রম হইতে পারে। তাই ভাষ্যকার শেষে ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, 'অসৎ' বলিতে এখানে অতীত ও অনাগত। অর্থাৎ "অস্" ধাতুর অর্থ বিদ্যমানতা।

---

* "প্রত্যক্ষপূর্ব্বং ত্রিবিধং ত্রিকালঞ্চানুমীয়তে। বহ্নির্নিগূঢ়ো ধূমেন মৈথুনং গর্ভসন্তবাৎ ॥
এবং ব্যবস্যন্ত্যতীতং বীজাৎ ফলমনাগতং। দৃষ্ট্বা বীজাৎ ফলং জাতমিহৈব সদৃশং বুধাঃ ॥
—'সূত্রস্থান', ১১শ অঃ, ১৩।১৪ ॥

সুতরাং যাহা তৎকালে বিদ্যমান, তাহাকে ঐ অর্থে সৎ বলা যায় এবং যাহা তৎকালে বিদ্যমান নহে অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ, তাহাকে ঐ অর্থে 'অসৎ' বলা যায়। তাই ঐ তাৎপর্য্যেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"সদসদ্বিষয়ঞ্চানুমানং"। যাহা পরে উৎপন্ন হয় বা হইতে পারে, এই অর্থে প্রাচীন কালে "অনাগত" শব্দেরও প্রয়োগ হইয়াছে। যথা যোগদর্শনে—"হেয়ং দুঃখমনাগতং।"

প্রচলিত বঙ্গভাষায় প্রায়শঃ সম্ভাবনা অর্থেই 'অনুমান' শব্দের প্রয়োগ হইতেছে। কিন্তু উক্ত সম্ভাবনা নামক যে জ্ঞান, তাহা সংশয়বিশেষ। অনুমান বা অনুমিতিরূপ জ্ঞান নিশ্চয়াত্মক। অনুমান নামক দ্বিতীয় প্রমাণের দ্বারা সেই নিশ্চয়াত্মক যথার্থ জ্ঞানই জন্মে। কোন বিষয়ে সম্ভাবনামাত্র জন্মিলে অথবা ভ্রমাত্মক অনুমিতি হইলে তাহা অনুমানপ্রমাণের ফল নহে। বঙ্গভাষায় রচিত পুস্তকে উক্ত অনুমান প্রমাণ অর্থেও "অনুমান" শব্দের বহু প্রয়োগ হইয়াছে। যথা—"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে"—"শিষ্য কহে ঈশ্বরতত্ত্ব সাধি অনুমানে।" ইত্যাদি (মধ্য, ষষ্ঠ পৃঃ)। বস্তুতঃ ঈশ্বর প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় পদার্থ প্রতিপাদন করিয়া নাস্তিকনিরাসের উদ্দেশ্যে পরবর্ত্তীকালে "অনুমান" নামে পৃথক প্রমাণ কল্পিত হয় নাই, উহা চিরন্তন বিশ্বজনীন সত্য। কোন সময়ে কোন উদ্দেশ্যে নাস্তিকশিরোমণি চার্ব্বাক নিজ বুদ্ধিবলে মুখে ঐ সত্যের অপলাপ করিলেও তিনিও উহাকে আশ্রয় করিয়াই অনেক কথা বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নচেৎ তাঁহার প্রতিবাদীর সহিত বিচারই হইতে পারে না। পরন্তু কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা এবং অনেক বিষয়ে সম্ভাবনামাত্রের দ্বারাই তাঁহারও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় নাই, ইহা সত্য। আর অনাদিকাল হইতে সকল জীবই যে, বহু অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে অনুমানপ্রমাণ দ্বারা যথার্থ নিশ্চয় করিতেছে এবং তদ্দ্বারাও জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ করিতেছে, ইহাও পরম সত্য। তাই পূর্ব্বাচার্য্যগণ এই অনুমানপ্রমাণকে বলিয়াছেন,—"সকললোকযাত্রা-নির্ব্বাহক"। বেদেও সেইরূপেই ইহার উল্লেখ হইয়াছে। বেদমূলক মনুস্মৃতিতে ধর্ম্মতত্ত্ব-নির্ণয়ের জন্যও প্রত্যক্ষ প্রমাণের পরে উক্ত অনুমানপ্রমাণেরও সম্যক্ জ্ঞানের কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে।*

---

* "স্মৃতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ং। এতৈরাদিত্যমণ্ডলং সর্ব্বৈরেব বিধাস্যতে॥"

—তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ১ প্রপাঠক, ৩য় অনুবাক।

প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমং। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥"

—"মনুসংহিতা", ১২শ অঃ, ১০৫ শ্লোক।

অনুমানের প্রামাণ্য খণ্ডনে চার্ব্বাকের কথা এবং তাহার খণ্ডনে "কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যের কথা ও তাহার ব্যাখ্যা, পরে "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" গ্রন্থে শ্রীহর্ষের উদয়নাচার্য্যের কথার প্রতিবাদ ও তাহার ব্যাখ্যা, পরে "তত্ত্ব-চিন্তামণি" গ্রন্থে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের শ্রীহর্ষোক্ত প্রতিবাদের খণ্ডন ও তাহার ব্যাখ্যা, অনুমানের দূষক "উপাধি"র লক্ষণ, বিভাগ ও উদাহরণ এবং সে বিষয়ে মতভেদ এবং অনুমানের প্রামাণ্য-স্বীকারে বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতির অকাট্য যুক্তি দ্বিতীয় খণ্ডে ২১৬-৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ॥ ৫ ॥

ভাষ্য। অথোপমানং—

অনুবাদ—অনন্তর অর্থাৎ অনুমানপ্রমাণ-নিরূপণের অনন্তর উপমানপ্রমাণ (নিরূপণ করিতেছেন)।

সূত্র। প্রসিদ্ধসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানং ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—প্রসিদ্ধ পদার্থের সহিত সাদৃশ্যপ্রযুক্ত 'সাধ্যসাধন' অর্থাৎ কোন সাধ্য পদার্থের যথার্থ নিশ্চয়ের করণ উপমানপ্রমাণ।

ভাষ্য। প্রজ্ঞাতেন সামান্যাৎ প্রজ্ঞাপনীয়স্য প্রজ্ঞাপনমুপমানমিতি। "যথা গৌরেবং গবয়" ইতি। কিং পুনরত্রোপমানেন ক্রিয়তে ? যদা খল্বয়ং গবা সমানধর্ম্মং প্রতিপদ্যতে, তদা প্রত্যক্ষতস্তমর্থং প্রতিপদ্যত ইতি। সমাখ্যাসম্বন্ধপ্রতিপত্তিরুপমানার্থ ইত্যাহ। "যথা গৌরেবং গবয়" ইত্যুপমানে প্রযুক্তে গবা সমানধর্ম্মাণমর্থমিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাদুপলভমানোঽস্য গবয়শব্দঃ সংজ্ঞেতি সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধং প্রতিপদ্যত ইতি। "যথা মুদ্গস্তথা মুদ্গপর্ণী", "যথা মাষস্তথা মাষপর্ণী"ত্যুপমানে প্রযুক্তে উপমানাৎ সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধং প্রতিপদ্যমানস্তামোষধীং ভৈষজ্যায়াহরতি। এবমন্যোঽপ্যুপমানস্য লোকে বিষয়ো বুভুৎসিতব্য ইতি।

অনুবাদ—প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত পদার্থের সহিত সাদৃশ্যপ্রযুক্ত প্রজ্ঞাপনীয় পদার্থের প্রজ্ঞাপন অর্থাৎ যদ্দ্বারা তাহার যথার্থ জ্ঞান জন্মে, তাহা উপমানপ্রমাণ। (উদাহরণ) 'যথা গৌঃ এবং গবয়ঃ' অর্থাৎ গবয়নামক পশু গোর সদৃশ। (পূর্ব্বপক্ষ) এই স্থলে উপমানপ্রমাণ কর্ত্তৃক কি কৃত হয়? অর্থাৎ উক্ত স্থলে উপমানপ্রমাণ অকিঞ্চিৎকর, উহার কোনই প্রয়োজন নাই, যেহেতু সে সময়ে এই ব্যক্তি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বাক্যশ্রোতা (গবয় পশুতে) গোর সহিত সমান ধর্ম্ম অর্থাৎ সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করে, সেই সময়ে প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারাই সেই পদার্থকে অর্থাৎ সেই সাদৃশ্যবিশিষ্ট গবয় পশুকে জানে। (উত্তর) 'সমাখ্যা'র অর্থাৎ সংজ্ঞা শব্দের 'সম্বন্ধপ্রতিপত্তি' অর্থাৎ অর্থবিশেষে বাচ্যত্ব সম্বন্ধের যথার্থ জ্ঞান উপমানপ্রমাণের অর্থ বা প্রয়োজন, ইহা (মহর্ষি গোতম) বলিয়াছেন। (বিশদার্থ) 'যথা গৌঃ এবং গবয়ঃ', এই উপমানবাক্য প্রযুক্ত হইলে গোর সহিত সমানধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থকে (গবয় পশুকে) ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্য উপলব্ধি করতঃ অর্থাৎ পরে সেই সাদৃশ্যবিশিষ্ট গবয় পশুর প্রত্যক্ষ হওয়ায় তজ্জন্য গবয় শব্দ ইহার সংজ্ঞা অর্থাৎ বাচক শব্দ, এইরূপে সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধ বুঝে অর্থাৎ উক্ত স্থলে সেই ব্যক্তির গবয়ত্বরূপ জাতিবিশিষ্ট পশুমাত্রে গবয় শব্দের বাচ্যত্বরূপ শক্তি নির্ণয়ই উপমানপ্রমাণের ফল।

(অন্য উদাহরণ) 'যথা মুদ্গস্তথা মুদ্গপর্ণী' অর্থাৎ 'মুদ্গপর্ণী' নামক ওষধীবিশেষ মুদ্গের সদৃশ এবং 'যথা মাষস্তথা মাষপর্ণী' অর্থাৎ 'মাষপর্ণী' নামক ওষধীবিশেষ মাষের সদৃশ, এইরূপ উপমানবাক্য প্রযুক্ত হইলে উপমানপ্রমাণজন্য সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া সেই ওষধীকে ঔষধের নিমিত্ত আহরণ করে। এইরূপ লোকে অন্যও উপমানের বিষয় বুঝিতে ইচ্ছা করিবে।

টিপ্পনী—মহর্ষি উদ্দেশক্রমানুসারে পরে এই সূত্রের দ্বারা তৃতীয় উপমান-প্রমাণের লক্ষণ বলিয়াছেন। "প্রসিদ্ধসাধর্ম্ম্যমুপমানং" এইরূপ সূত্র বলিলে যাহা প্রকৃত উপমানপ্রমাণ নহে, কিন্তু উপমানাভাস, তাহাও উপমানলক্ষণাক্রান্ত হয়, এজন্য বলিয়াছেন,—"সাধ্য-সাধনং"। "সাধ্য-সাধনমুপমানং" এইরূপ সূত্র বলিলে প্রত্যক্ষাদির সাধন এবং সুখাদির সাধনও উপমানলক্ষণাক্রান্ত হয়, এজন্য পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—**"প্রসিদ্ধসাধর্ম্ম্যাৎ"**। উদ্দ্যোতকর (উক্ত পদে) বহুব্রীহি সমাসই বলিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন,—"কর্ম্মধারয়স্তৃতীয়াসমাসো বহুব্রীহির্ব্বা।" কিন্তু তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাসই ভাষ্যকারের অভিমত। তাই তিনি উক্ত প্রথম পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—**"প্রজ্ঞাতেন সামান্যাৎ"**। যে পদার্থ পূর্ব্বে

প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত, তাহার সহিত সামান্য অর্থাৎ সমানত্ব বা সাদৃশ্যই 'প্রসিদ্ধসাধর্ম্ম্য'। কিন্তু অপ্রসিদ্ধ সাধর্ম্ম্য কোন সাধ্যসিদ্ধির প্রযোজক হয় না। সুতরাং সেই সাধর্ম্ম্যও প্রসিদ্ধ বা প্রজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, ইহাও উক্ত পদের দ্বারা বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত প্রসিদ্ধ সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ অদৃষ্টপূর্ব্ব কোন পদার্থে সেই সাদৃশ্যের দর্শন হইলে তাহাতে যাহা অজ্ঞাত সাধ্যবিশেষের সাধন অর্থাৎ সেই সাধ্যসিদ্ধির করণ, তাহা উপমানপ্রমাণ। ভাষ্যকার সূত্রোক্ত "সাধ্যসাধনং" এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—**"প্রজ্ঞাপনীয়স্য প্রজ্ঞাপনং"**। পরে উহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন,—**"যথা গৌরেবং গবয় ইতি।"**

গবয় নামে একপ্রকার পশু আছে, উহাকে দেশবিশেষে 'নীল গাই' বলে। উহার গলদেশে 'গলকম্বল' (লম্বমান চর্ম্ম) নাই, সুতরাং উহা গো নহে, কিন্তু গোর সদৃশ। যে ব্যক্তি কখনও গবয় পশু দেখেন নাই, গবয় শব্দের অর্থ যিনি জানেন না, কিন্তু গো তাঁহার প্রজ্ঞাত, তাঁহাকে দৃষ্টগবয় কোন বনবাসী বলিলেন,—'যেমন গো, এইরূপ গবয়' অর্থাৎ গবয় পশু গোর সদৃশ। পরে সেই ব্যক্তি কোন সময়ে কোন স্থানে গবয় পশু দেখিয়া, তখন তাহাতে গোর সাদৃশ্য দর্শন করিলে পরক্ষণে তাঁহার সেই পূর্ব্বশ্রুত বনেচর-বাক্যের অর্থস্মরণ হওয়ায় পরক্ষণে দৃশ্যমান গবত্বজাতিবিশিষ্ট পশু "গবয়" শব্দের বাচ্য, এইরূপ যথার্থবোধ জন্মে। উহারই নাম উপমিতি এবং ঐ উপমিতির করণই উক্ত স্থলে উপমান-প্রমাণ। মহর্ষি নিজেও পরে উপমানের প্রামাণ্যপরীক্ষায় (২য় অ০, ১ম আ০, ৪৭-৪৮ সূত্রে) উক্ত স্থলে উক্তরূপে সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধ-নির্ণয়ই উপমানপ্রমাণের ফল বলিয়াছেন এবং উহা যে অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা জন্মে না, ইহাও সমর্থন করিয়াছে। তদনুসারেই ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন, **"সমাখ্যাসম্বন্ধ-প্রতিপত্তিরুপমানার্থ ইত্যাহ।"** উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে 'কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যও বলিয়াছেন,—**"সম্বন্ধস্য পরিচ্ছেদঃ সংজ্ঞায়াঃ সংজ্ঞিনা সহ। প্রত্যক্ষাদেরসাধ্যত্বাদুপমানফলং বিদুঃ॥"** (৩।১০)। উদয়নাচার্য্যও উক্ত কারিকার বিবরণে বলিয়াছেন,—**"যথা গৌস্তথা গবয় ইতি শ্রুতাতিদেশবাক্যস্য গোসদৃশং পিণ্ডমনুভবতঃ স্মরতশ্চ বাক্যার্থময়মসৌ গবয়শব্দবাচ্য ইতি ভবতি মতিঃ।"** কিন্তু 'অয়ং গবয়পদবাচ্যঃ' এই আকারে উপমিতি জন্মিলে উক্ত মতে সেই দৃষ্ট গবয়েই গবয় শব্দের বাচ্যত্ব নির্ণয় হয়, গবয়ত্বরূপে গবয়মাত্রে গবয় শব্দের বাচ্যত্ব নির্ণয় হয় না, এ জন্য পরবর্ত্তী অনেক নব্যনৈয়ায়িক 'গবয়ো গবয়পদবাচ্যঃ'

এইরূপ আকারে উপমিতিই সমর্থন করিয়াছেন। উদয়নাচার্য্যও গবয়ত্বই যে, গবয় শব্দের 'প্রবৃত্তিনিমিত্ত', কিন্তু গোসাদৃশ্য প্রবৃত্তিনিমিত্ত (শক্যতাবচ্ছেদক) নহে, ইহাই বিচারপূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন।)

(ভাষ্যকার পরে ইহার আরও উদাহরণ বলিয়াছেন যে, "যথা মুদ্‌গস্তথা মুদ্‌গপর্ণী" এবং "যথা মাষস্তথা মাষপর্ণী" এইরূপ উপমানবাক্যের প্রয়োগ করিলে উপমানপ্রমাণ দ্বারা ওষধিবিশেষে "মুদ্‌গপর্ণী" ও "মাষপর্ণী" শব্দের বাচ্যত্বসম্বন্ধ-নির্ণয় হওয়ায় সেই ওষধিবিশেষকে ঔষধের নিমিত্ত আহরণ করে। তাৎপর্য্য এই যে, কোন ঔষধের জন্য "মুদ্‌গপর্ণী" ও "মাষপর্ণী" আবশ্যক হইলে যিনি উহা জানেন না, কিন্তু মুদ্‌গ ও মাষ তাঁহার পরিজ্ঞাত, তিনি কোন অভিজ্ঞ উপদেষ্টার নিকটে প্রশ্ন করিতে তিনি বলিলেন,—"যথা মুদ্‌গস্তথা মুদ্‌গপর্ণী" এবং "যথা মাষস্তথা মাষপর্ণী" অর্থাৎ 'মুদ্‌গপর্ণী' ওষধিবিশেষ (মুগানি) মুদ্‌গের সদৃশ এবং 'মাষপর্ণী' ওষধিবিশেষ (মাষানি) মাষের সদৃশ। পরে সেই ব্যক্তি স্থানবিশেষে মুদ্‌গপর্ণী ও মাষপর্ণী দেখিয়া, তাহাতে যথাক্রমে মুদ্‌গ ও মাষের সাদৃশ্য দর্শন করিলে তাহার সেই পূর্ব্বশ্রুত বাক্যার্থের স্মরণ হওয়ায় পরে তজ্জাতীয় ওষধিবিশেষ যথাক্রমে "মুদ্‌গপর্ণী" ও "মাষপর্ণী" শব্দের বাচ্য, এইরূপ যে বোধ জন্মে, তাহাও উপমানপ্রমাণের ফল উপমিতি। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত স্থলেই সেই উপদেষ্টার বাক্য আগম অর্থাৎ দৃষ্টার্থ শব্দপ্রমাণ হইলেও তদ্দ্বারা সেই সাদৃশ্যমাত্রেরই বোধ জন্মে, কিন্তু উক্তরূপ বাচ্যত্বসম্বন্ধের বোধ হয় না। কারণ, তাহা সেই বাক্যের অর্থ বা প্রতিপাদ্য নহে। পরে গবয় প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হইলেও তাহাতে গবয়াদি শব্দের বাচ্যত্ব সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয় না। কারণ, তাহা লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়ই নহে। সুতরাং প্রত্যক্ষ ও শব্দপ্রমাণের দ্বারাই উপমানপ্রমাণের ফলসিদ্ধি হওয়ায় উপমান নামে তৃতীয় প্রমাণ স্বীকার অনাবশ্যক, এই কথা বলা যায় না। তাই উদ্দ্যোতকর দিঙ্‌নাগের ঐরূপ কথার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন,—"অহো প্রমাণাভিজ্ঞতা ভদন্তস্য। গবা গবয়সারূপ্য-প্রতিপত্তেস্তু সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধং প্রতিপদ্যত ইতি সূত্রার্থঃ। তস্মাদপরিজ্ঞায় সূত্রার্থং যৎকিঞ্চিদুচ্যতে।" অর্থাৎ দিঙ্‌নাগ মহর্ষির এই সূত্রের অর্থ না বুঝিয়াই পূর্ব্বোক্ত ঐরূপ ব্যর্থ কথা বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্তরূপে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ-জন্য সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধবোধই উপমিতি। পূর্ব্বশ্রুত বাক্যজনিত সংস্কারজন্য স্মৃতিসাপেক্ষ সেই সাদৃশ্য প্রত্যক্ষই সেই উপমিতির করণ উপমানপ্রমাণ।)

(কিন্তু উপমানপ্রমাণের স্বরূপ বিষয়ে মতভেদ আছে। এখানে ভাষ্যকারের

সন্দর্ভের দ্বারা সরলভাবে বুঝা যায় যে, তাঁহার মতে উক্ত স্থলে পূর্ব্বশ্রুত "যথা গৌরেবং গবয়ঃ" এইরূপ উপমানবাক্যই উপমানপ্রমাণ। "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্টও প্রথমে উক্তরূপ মতকে বৃদ্ধ নৈয়ায়িকমত বলিয়া উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু "তাৎপর্য্যটীকা"কার বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের উক্ত সন্দর্ভের অন্যরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "গবয়" শব্দের বাচ্যত্বরূপে প্রজ্ঞাপনীয় এবং যাহাতে গোর সাদৃশ্য দৃশ্যমান, সেই গবয়ত্ববিশিষ্ট পিণ্ডের উক্তরূপে যে প্রজ্ঞাপন, তাহা উপমান অর্থাৎ উপমিতি। উপমান নামক তৃতীয় প্রমাণের দ্বারা উক্তরূপে গবয়ত্ববিশিষ্ট পিণ্ড বা দেহবিশেষের যে প্রজ্ঞাপন, তাহা সেই প্রমাণেরই ব্যাপার বা কার্য্য। সুতরাং "প্রমাণব্যাপারঃ প্রজ্ঞাপনমুক্তম্।" অর্থাৎ ভাষ্যকার এই সূত্রে "সাধন" শব্দের অর্থ যে প্রজ্ঞাপন বলিয়াছেন, তাহা উপমানপ্রমাণের ফল উপমিতিই। যদ্দ্বারা সেই উপমিতিরূপ সাধ্যসিদ্ধি জন্মে, অর্থাৎ উক্তরূপে 'সাধ্য' বা প্রজ্ঞাপনীয় পদার্থের 'সাধন' বা সিদ্ধির যাহা করণ, তাহা উপমানপ্রমাণ, ইহাই সূত্রার্থ। বস্তুতঃ উপমানপ্রমাণের লক্ষণই সূত্রের দ্বারা মহর্ষির বক্তব্য। যথার্থ উপমিতির করণই উপমানপ্রমাণ। তাই বাচস্পতি মিশ্র সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে প্রথমেই বলিয়াছেন,—"অত্রাপি যত ইত্যধ্যাহার্য্যং। সিদ্ধিঃ সাধনং।" কিন্তু ভাষ্যকারের উক্ত সন্দর্ভের দ্বারা এই সূত্রে "সাধন" শব্দ যে, ভাববাচ্য ল্যুট্‌প্রত্যয়সিদ্ধ, উহার অর্থ সিদ্ধি, সুতরাং "যতঃ" এই পদের অধ্যাহার করিয়াই উপমানপ্রমাণের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিতে হইবে, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। জয়ন্ত ভট্টও উক্তরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও পরে বলিয়াছেন,—"অথবা সাধ্যসাধনমিতি করণল্যুটা করণলক্ষণমেবেদম্।"

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পরে বলিয়াছেন,—"অত্র চ বৈধর্ম্ম্যোপমিতিমপি মন্যন্তে টীকাকৃতঃ।" বস্তুতঃ তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র পরে বৈধর্ম্ম্যোপমিতিও সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার, বার্ত্তিককার ও জয়ন্ত ভট্ট ইহা না বলিলেও বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে "সাধর্ম্ম্য" শব্দটি ধর্ম্মমাত্রের উপলক্ষণ, সুতরাং উহার দ্বারা বৈধর্ম্ম্যও বুঝিতে হইবে।* প্রসিদ্ধ পদার্থের বৈধর্ম্ম্যদর্শন-

* "কুসুমাঞ্জলি"র তৃতীয় স্তবকের দ্বাদশ কারিকার বিবরণে উদয়নাচার্য্যও বলিয়াছেন,—"বাক্যার্থশ্চ কচিৎ সাধর্ম্ম্যং কচিদ্বৈধর্ম্ম্যমতো নাব্যাপকং।" টীকাকার বরদরাজ উপমান-প্রমাণস্থলে অতিদেশ বাক্যার্থকে সাধর্ম্ম্য, ধর্ম্মমাত্র ও বৈধর্ম্ম্য, এই ত্রিবিধ বলিয়া উদাহরণও প্রদর্শন করিয়াছেন। বরদরাজের "কুসুমাঞ্জলিবোধনী" (১১৮ পৃঃ) এবং "তার্কিকরক্ষা"র উপমানব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

জন্য যে উপমিতি জন্মে, তাহাকে বলে—বৈধর্ম্ম্যোপমিতি। যেমন উত্তরদেশ-বাসী কোন ব্যক্তি কোন দাক্ষিণাত্যের নিকটে উষ্ট্রের নিন্দা করিতে বলিলেন যে, "করভ কুশ্রী, কঠোর তীক্ষ্ণ কণ্টকভক্ষণকারী, তাহার গ্রীবাদেশ অতি দীর্ঘ ও বক্র" ইত্যাদি। সেই দাক্ষিণাত্য কখনও উষ্ট্র দেখেন নাই। কিন্তু পরে কোন সময়ে তিনি উত্তরাপথে আসিয়া উষ্ট্র দর্শন করিলে, সেই দৃশ্যমান পশুতে তাঁহার পরিদৃষ্ট অন্যান্য পশুর ঐ সমস্ত বৈধর্ম্ম্য দর্শন করায়, তাঁহার পূর্ব্বশ্রুত সেই বাক্যার্থ স্মরণ হওয়ায় পরক্ষণে ইহা অথবা এই জাতীয় পশুমাত্র "করভ" শব্দের বাচ্য, এইরূপে তাহাতে "করভ" শব্দের বাচ্যত্ব নির্ণয় করেন। উক্ত স্থলে তাঁহার ঐরূপ সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধ-নির্ণয় অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা সম্ভব হয় না। উহার জন্য পঞ্চম কোন প্রমাণও স্বীকার করা যায় না। সুতরাং উহা উপমানপ্রমাণেরই ফল উপমিতিবিশেষ, ইহাই স্বীকার্য্য। বাচস্পতি মিশ্র পরে বলিয়াছেন যে, এই জন্যই ভগবান্ ভাষ্যকার উপমিতির বহু উদাহরণ বলিয়াও সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন,—"**এবমন্যোঽপ্যুপমানস্য বিষয়ো লোকে বুভুৎসিতব্যঃ।**" অর্থাৎ বাচস্পতি মিশ্রের মতে উক্তরূপ বৈধর্ম্ম্যোপমিতিকে গ্রহণ করিয়াই ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে ঐ কথা বলিয়াছেন। নচেৎ উহা বলা অনাবশ্যক। "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজও ভাষ্যকারের ঐরূপ তাৎপর্য্যই বলিয়াছেন। কিন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ভাষ্যকারের ঐ শেষোক্ত সন্দর্ভের উল্লেখপূর্ব্বক উদাহরণ বলিয়াছেন যে, কেহ "মুদ্গপর্ণীসদৃশী ওষধী বিষং হন্তি" এইরূপ অতিদেশবাক্যের অর্থ বুঝিয়া, পরে কোন ওষধীবিশেষে মুদ্গপর্ণীর সাদৃশ্য দর্শন করিলে পূর্ব্বশ্রুত সেই বাক্যার্থ স্মরণ করিয়া, এই ওষধীবিশেষ বিষনাশক, এইরূপে তাহাতে বিষনাশকত্বের যে নিশ্চয় করেন, তাহাও উপমিতি। অর্থাৎ কেবল গবয় প্রভৃতি কতিপয় শব্দের বাচ্যত্বসম্বন্ধই উপমানপ্রমাণের বিষয় নহে, অন্য পদার্থও উহার বিষয় হয়। উপমানপ্রমাণের দ্বারা অনেক স্থলে অন্য পদার্থও সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ ভাষ্যকারের যে, উহাই মত, ইহা তাঁহার অন্য কথার দ্বারাও বুঝা যায়। পরে ৩৯শ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য। উক্ত বিষয়ে এবং উপমানপ্রমাণ সম্বন্ধে অন্যান্য বক্তব্য ও বিচার পরে লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ২৬৮-২৮২ পৃষ্ঠা অবশ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৬ ॥

ভাষ্য। অথ শব্দঃ,—

অনুবাদ—অনন্তর অর্থাৎ উপমানপ্রমাণ-নিরূপণের অনন্তর "শব্দ" অর্থাৎ শব্দপ্রমাণ (নিরূপণ করিতেছেন)।

সূত্র। আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—আপ্তের অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বিষয়ের যথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন অপ্রতারক উপদেষ্টার উপদেশ (বাক্য) শব্দপ্রমাণ।

ভাষ্য। আপ্তঃ খলু সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা যথাদৃষ্টস্যার্থস্য চিখ্যাপয়িষয়া প্রযুক্ত উপদেষ্টা। সাক্ষাৎকরণমর্থস্যাপ্তিঃ, তয়া প্রবর্ত্তত ইত্যাপ্তঃ। ঋষ্যার্য্যম্লেচ্ছানাং সমানং লক্ষণম্। তথা চ সর্ব্বেষাং ব্যবহারাং প্রবর্ত্তন্ত ইতি। এবমেভিঃ প্রমাণৈর্দ্দেব-মনুষ্যতিরশ্চাং ব্যবহারাঃ প্রকল্পন্তে নাতোঽন্যথেতি।

অনুবাদ—"সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা" (যিনি ধর্ম্ম অর্থাৎ তাঁহার বক্তব্য পদার্থকে সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা অবধারণ করিয়াছেন) যথাদৃষ্ট পদার্থের খ্যাপনেচ্ছাবশতঃ "প্রযুক্ত" অর্থাৎ বাক্য-প্রয়োগে কৃতযত্ন, "উপদেষ্টা" অর্থাৎ উপদেশ-সমর্থ ব্যক্তি "আপ্ত"। (আপ্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন) অর্থের (পদার্থের) সাক্ষাৎকার অর্থাৎ সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা অবধারণ "আপ্তি"। তৎপ্রযুক্ত অর্থাৎ সেই আপ্তিবশতঃ (বাক্যপ্রয়োগে) প্রবৃত্ত হন, এ জন্য "আপ্ত"। ঋষিগণ, আর্য্যগণ এবং ম্লেচ্ছগণের সম্বন্ধে "লক্ষণ" (পূর্ব্বোক্ত আপ্তলক্ষণ) "সমান"। সুতরাং সকলেরই (ঋষি হইতে ম্লেচ্ছ পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যক্তিরই) ব্যবহার প্রবৃত্ত হইতেছে। এইরূপ এই সমস্ত প্রমাণের দ্বারা (ব্যাখ্যাত প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণের দ্বারা) দেবতা, মনুষ্য ও পশ্বাদির ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতেছে, ইহার অন্যথা অর্থাৎ এই প্রমাণগুলি ব্যতীত ব্যবহার নিষ্পন্ন হয় না।

টিপ্পনী—সূত্রে "আপ্তোপদেশঃ" এই পদে ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাসই ভাষ্যকার প্রভৃতির সম্মত। অর্থাৎ আপ্ত ব্যক্তির উপদেশ বা বাক্যই শব্দপ্রমাণ, ইহাই সূত্রার্থ।* কিন্তু আপ্ত কাহাকে বলে, তাহা বলা আবশ্যক। তাই ভাষ্যকার

---

* বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পরে "আপ্তো যথার্থ উপদেশঃ শাব্দবোধো যস্মাৎ" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া, যথার্থ শাব্দ বোধের করণই শব্দপ্রমাণ, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নব্যনৈয়ায়িক-গণের মতে বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহের স্মরণাত্মক জ্ঞানই শাব্দ বোধের করণ এবং সেই সমস্ত পদার্থের স্মরণাত্মক জ্ঞান ঐ করণের ব্যাপার। সুতরাং পদসমূহের সেই স্মরণাত্মক জ্ঞানই শব্দপ্রমাণ। কিন্তু মহর্ষি পরে বলিয়াছেন,—"আপ্তোপদেশ-সামর্থ্যাচ্ছব্দাদর্থসম্প্রত্যয়ঃ" (২।১।৫২)। সুতরাং এখানে মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারাও আপ্ত ব্যক্তির উপদেশ বা বাক্যরূপ শব্দই শব্দপ্রমাণ, এই অর্থই তাঁহার অভিমত বুঝা যায়। তাহা হইলে জ্ঞায়মান বাক্যরূপ

প্রথমে আপ্তের লক্ষণ বলিয়াছেন এবং পরে "আপ্ত" শব্দের ব্যুৎপত্তিও প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাচীন কালে পদার্থমাত্র বুঝাইতে "ধর্ম্ম" শব্দও প্রযুক্ত হইয়াছে। যিনি কোন পদার্থের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তিনি "সাক্ষাৎকৃত-ধর্ম্মা"। "তাৎপর্য্যটীকা"কার বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"সুদৃঢ়প্রমাণেনাবধারিতাঃ সাক্ষাৎকৃতা ধর্ম্মাঃ পদার্থা হিতাহিতপ্রাপ্তিপরিহারার্থা যেন।" অর্থাৎ যে কোন সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা পদার্থের নিশ্চয় হইলেই উহা সাক্ষাৎকারের তুল্য বলিয়া ভাষ্যকার ঐ তাৎপর্য্যে "সাক্ষাৎকৃত" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। যিনি অনুমান বা শব্দপ্রমাণের দ্বারা কোন তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া, সেই তত্ত্বের প্রতিপাদক বাক্য বলেন, তিনিও আপ্ত। কিন্তু 'সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা' হইয়াও যিনি সে বিষয়ে উপদেশ করিতে ইচ্ছা করেন না অথবা বিপরীত উপদেশ করেন, তিনি আপ্ত নহেন। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—"যথাদৃষ্টস্যার্থস্য চিখ্যাপয়িষয়া।" অর্থাৎ যে পদার্থ যেরূপে অবধারিত হইয়াছে, সেইরূপে তাহার খ্যাপনেচ্ছা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু যথাদৃষ্ট অর্থের খ্যাপনেচ্ছা হইলেও যিনি আলস্যাদিবশতঃ তাহার উপদেশে প্রযত্ন উৎপাদন করেন না, তিনিও আপ্ত নহেন। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"প্রযুক্তঃ।" বাচস্পতি মিশ্র উক্ত পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"উৎপাদিতপ্রযত্নঃ।" কিন্তু ঐরূপ ব্যক্তি হইলেও তাহার ইন্দ্রিয়াদির পটুতা না থাকায় যদি উপদেশ-সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে তিনিও আপ্ত নহেন। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—"উপদেষ্টা"। উক্তরূপ আপ্তলক্ষণসম্পন্ন ব্যক্তির উপদেশই শব্দপ্রমাণ। আর্য্যগণের এবং ম্লেচ্ছগণের বহু দৃষ্টার্থ বাক্যও শব্দপ্রমাণ, নচেৎ তাঁহাদিগের লৌকিক ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং ভাষ্যকার ঋষি, আর্য্য ও ম্লেচ্ছগণের পক্ষে উক্তরূপ এক আপ্তলক্ষণ বলিয়াছেন। অলৌকিক অতীন্দ্রিয় বিষয়ে যিনি ঋষি, তিনিই আপ্ত, কিন্তু অনেক লৌকিক বিষয়ে ঋষি ভিন্ন আর্য্যগণ ও ম্লেচ্ছগণও আপ্ত। সুতরাং বিষয়বিশেষে আপ্তলক্ষণ সকলেরই সমান ॥৭॥ †

শব্দই শাব্দ বোধের করণ, এই প্রাচীন মতও এই সূত্রের দ্বারা বুঝা যায়। "শব্দচিন্তামণি"র প্রারম্ভে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও বলিয়াছেন,—'শব্দঃ প্রমাণং" টীকাকার মথুরানাথ তর্কবাগীশও সেখানে বলিয়াছেন,—"এতচ্চ জ্ঞায়মানশব্দস্য প্রমাণত্বপক্ষে।"

† "আপ্তলক্ষণস্য ব্যাপকত্বমাহ 'ঋষীতি'। দর্শনাদৃষিঃ সাক্ষাৎকৃতত্রৈকাল্যবৃত্তিপ্রমেয়মাত্রঃ। আর্য্যাদ্যাতঃ পাতকেভ্য ইত্যার্য্যো মধ্যলোকঃ। ম্লেচ্ছাঃ প্রসিদ্ধাঃ।"—তাৎপর্য্যটীকা।

সূত্র। স দ্বিবিধো দৃষ্টাদৃষ্টার্থত্বাৎ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—দৃষ্টার্থকত্ব ও অদৃষ্টার্থকত্ববশতঃ অর্থাৎ দৃষ্টার্থক এবং অদৃষ্টার্থক-ভেদে তাহা (পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রমাণশব্দ) দ্বিবিধ।

ভাষ্য। যস্যেহ দৃশ্যতেহর্থঃ স দৃষ্টার্থো যস্যামুত্র প্রতীয়তে সোঽদৃষ্টার্থঃ। এবমৃষিলৌকিক-বাক্যানাং বিভাগ ইতি। কিমর্থং পুনরিদমুচ্যতে? স ন মন্যেত দৃষ্টার্থ এবাপ্তোপদেশঃ প্রমাণমর্থস্যাবধারণাদিতি। অদৃষ্টার্থোঽপি প্রমাণমর্থস্যানুমানাদিতি। ইতি প্রমাণভাষ্যম্।

অনুবাদ—ইহলোকে যাহার অর্থ (প্রতিপাদ্য) দৃষ্ট হয়, তাহা "দৃষ্টার্থ"। পরলোকে যাহার অর্থ প্রতীত হয় অর্থাৎ যে বাক্যের প্রতিপাদ্য ইহলোকে দৃষ্ট হয় না, তাহা "অদৃষ্টার্থ"। এইরূপে ঋষিবাক্য ও লৌকিকবাক্যসমূহের বিভাগ। (পূর্ব্বপক্ষ) কি জন্য আবার এই সূত্রটি বলিতেছেন?—(উত্তর) তিনি অর্থাৎ সেই নাস্তিক মনে না করেন—অর্থের (বাক্যপ্রতিপাদ্য পদার্থের) অবধারণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের দ্বারা নিশ্চয় হওয়ায় দৃষ্টার্থ আপ্তবাক্যই প্রমাণ—(কিন্তু) অর্থের অনুমান অর্থাৎ অনুমানপ্রমাণের দ্বারা নিশ্চয় হওয়ায় অদৃষ্টার্থ আপ্তবাক্যও প্রমাণ। (অর্থাৎ ইহা বলিবার জন্যই মহর্ষি এই সূত্রটি বলিয়াছেন)। প্রমাণভাষ্য সমাপ্ত॥

টিপ্পনী—মহর্ষি চতুর্থ শব্দপ্রমাণের লক্ষণ বলিয়া, পরে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, সেই প্রমাণশব্দ দ্বিবিধ—দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ। লৌকিক আপ্ত ব্যক্তিদিগের দৃষ্টার্থ শব্দ যে প্রমাণশব্দ বা শব্দপ্রমাণ, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। নচেৎ লৌকিক ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে পারে না। ইহলোকে সত্যবাদী বিজ্ঞ ব্যক্তির বাক্য শ্রবণ করিয়া, তদনুসারে অসংখ্য ব্যবহার চলিতেছে। বিবাদস্থলে সত্যবাদী প্রকৃত সাক্ষীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কত সত্য নির্ণয় হইতেছে। তথাপি মহর্ষি পরে আবার এই সূত্রটি বলিয়াছেন কেন? এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যে নাস্তিক কেবল দৃষ্টার্থ আপ্তবাক্যকেই শব্দপ্রমাণ বলেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, অদৃষ্টার্থ বেদাদি শাস্ত্ররূপ আপ্তবাক্যও শব্দপ্রমাণ। সেই সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের অর্থ বা প্রতিপাদ্য স্বর্গাদি পদার্থ আমাদিগের দৃষ্ট না হওয়ায় কিরূপে তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করা যায়?

তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"**অর্থস্যানুমানাৎ**।" বাচস্পতি মিশ্র ঐ কথার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বেদাদি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য স্বর্গাদি অলৌকিক পদার্থ ইহলোকে আমাদিগের দৃষ্ট না হইলেও উহা অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ। কারণ, সেই সমস্ত পদার্থের প্রতিপাদক বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ। যে নাস্তিক নিজমত স্থাপনের জন্য অনুমানপ্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন,* তিনি অনুমানপ্রমাণ দ্বারা বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইলে তাহাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। তাহা হইলে অদৃষ্টার্থ বেদবাক্যের প্রতিপাদ্য স্বর্গাদি পদার্থও পরম্পরায় সেই অনুমানপ্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ বলিয়াও স্বীকার করিতে হইবে।

এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার মহর্ষিসূত্রোক্ত দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ, এই দ্বিবিধ আপ্তবাক্যকে ঋষিবাক্য ও লৌকিকবাক্যের প্রকারভেদ বলিয়াছেন। ঋষিবাক্য ভিন্ন সমস্ত বাক্যই তাঁহার মতে লৌকিকবাক্য। কিন্তু ঋষিগণও বহু দৃষ্টার্থ বাক্যও বলিয়াছেন। যে বাক্যের অর্থ বা প্রতিপাদ্য পদার্থ ইহলোকে দৃষ্ট নহে, কিন্তু অনুমানাদি কোন প্রমাণসিদ্ধ, তাহা অদৃষ্টার্থ বাক্য, এইরূপও ব্যাখ্যা হইয়াছে। তাহা হইলে ইহলোকে অনুমানাদি প্রমাণ দ্বারা জ্ঞাত পদার্থের প্রতিপাদক যে সমস্ত লৌকিক বাক্য, তাহাও উক্ত অর্থে অদৃষ্টার্থ বাক্য বলা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে বাক্যের প্রতিপাদ্য অর্থ পরলোকে প্রতীত হয়, তাহা অদৃষ্টার্থ। তাহা হইলে বুঝা যায়, ভাষ্যকারের মতে স্বর্গাদি পদার্থের প্রতিপাদক বেদাদিবাক্যই অদৃষ্টার্থ আপ্তবাক্য। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে বাক্যের প্রতিপাদ্য পদার্থ শব্দপ্রমাণ ও তন্মূলক অনুমানপ্রমাণ ভিন্ন আর কোন প্রমাণ দ্বারা জানা যায় না, তাহাই অদৃষ্টার্থক প্রমাণ শব্দ। "তত্ত্বচিন্তামণি"র শব্দখণ্ডের "তাৎপর্য্যবাদ" গ্রন্থে বেদের লক্ষণ বলিতে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও ঐরূপ কথা বলিয়াছেন। সেখানে মথুরনাথ

---

* বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন,—"স ইতি বিপ্রকৃষ্টো নাস্তিকঃ পরামৃশ্যতে" (তাৎপর্য্যটীকা)। ইহার দ্বারা বুঝা যায়, প্রথমসূত্রভাষ্যে দৃষ্টান্ত পদার্থের পৃথক্ উল্লেখের প্রয়োজন-বর্ণনে ভাষ্যকার যে নাস্তিকের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই দূরস্থ নাস্তিকই এখানে "তৎ"শব্দের দ্বারা ভাষ্যকারের বুদ্ধিস্থ। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, যিনি শব্দপ্রমাণই মানেন নাই, এমন নাস্তিক এখানে ভাষ্যকারের বুদ্ধিস্থ নহেন। কিন্তু যিনি শব্দপ্রমাণ মানিয়া অদৃষ্টার্থ বেদাদি শব্দপ্রমাণ মানেন নাই, এমন নাস্তিকই এখানে ভাষ্যকারের বুদ্ধিস্থ। প্রাচীন বৌদ্ধসম্প্রদায় যে প্রত্যক্ষাদি চতুর্ব্বিধ প্রমাণই মানিতেন এবং পরে দিঙ্‌নাগ প্রমাণদ্বয়ই সমর্থন করেন, ইহা পূর্ব্বে (৮৭ পৃঃ), বলিয়াছি। এখানে 'ন্যায়বার্ত্তিকে' উদ্দ্যোতকর বিচারপূর্ব্বক দিঙ্‌নাগের মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন।

তর্কবাগীশের "রহস্য"টীকা পাঠ করিলে উক্ত বিষয়ে বহু জ্ঞাতব্য কথা পাওয়া যাইবে। ভাষ্যকার যে, দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ সমস্ত বেদবাক্যকেও ঋষিবাক্য বলিয়াছেন, ইহা পরে তাঁহার অন্য কথার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র, উদয়নাচার্য্য, জয়ন্ত ভট্ট ও গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি বিচারপূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বেদ পরমেশ্বরবাক্য, পরমেশ্বরই বেদের আদিবক্তা, ইহা শ্রুতি যুক্তিসিদ্ধ। এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা ও ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা দ্বিতীয় খণ্ডে ৩৫৭-৬৫ পৃষ্ঠা ও চতুর্থ খণ্ডে ৩০৬-১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পরন্তু এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, মহর্ষি গোতম পরে শব্দের নিত্যত্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া, অনিত্যত্বপক্ষেরই সংস্থাপন করায় তাঁহার মতে বেদ নিত্য নহে, কিন্তু পৌরুষেয় অর্থাৎ বেদার্থবিষয়ে আপ্ত পুরুষের প্রণীত। সুতরাং সেই আপ্ত পুরুষের প্রামাণ্যপ্রযুক্তই বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। তাই পরে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের শেষ সূত্রে বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ করিতে মহর্ষি বলিয়াছেন,—"আপ্তপ্রামাণ্যাৎ।" বৈশেষিকদর্শনে মহর্ষি কণাদও বলিয়াছেন,—"বুদ্ধিপূর্ব্বা বাক্যকৃতির্ব্বেদে" (৬।১।১) অর্থাৎ বেদবাক্যের যে রচনা, তাহাও লৌকিক বাক্যরচনার ন্যায় রচয়িতার বুদ্ধিপূর্ব্বক। তদনুসারেই ন্যায়বৈশেষিক মতের ব্যাখ্যাতা আচার্য্যগণ বেদের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদের খণ্ডন করিয়া, পরতঃপ্রামাণ্যবাদেরই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে জ্ঞানের প্রমাত্ব যেমন অনুমানপ্রমাণ দ্বারা বোধ্য, তদ্রূপ সেই প্রমাজ্ঞানের করণ প্রমাণপদার্থের প্রামাণ্যও অনুমানপ্রমাণবোধ্য। তাই সেই অনুমান প্রকাশ করিতেই ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রথমেই বলিয়াছেন,—"প্রমাণতোঽর্থপ্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তি-সামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণং।"

কিন্তু মীমাংসকসম্প্রদায় নানাপ্রকারে প্রমাজ্ঞানের প্রমাত্বকে স্বতোগ্রাহ্য বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতে প্রথমে জ্ঞানের বোধক সামগ্রীর দ্বারাই জ্ঞানের প্রমাত্বনিশ্চয় হওয়ায় পরে উহার জন্য অন্য প্রমাণ আবশ্যক হয় না।* পরন্তু জ্ঞানের প্রমাত্বনিশ্চয়ের জন্য অন্য অনুমান আবশ্যক

* এ বিষয়ে মীমাংসকসম্প্রদায়ের মধ্যে গুরু প্রভাকর, কুমারিল ভট্ট ও মুরারি মিশ্রের মতভেদ আছে। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের "তত্ত্বচিন্তামণি"র "প্রামাণ্যবাদ" ও তাহার "রহস্য" টীকায় উক্ত বিষয়ে বহু সূক্ষ্ম বিচার হইয়াছে। সংক্ষেপে তাহার কিছুই ব্যক্ত করা যায় না। "ভাষারত্ন" গ্রন্থে কণাদ তর্কবাগীশ এবং "তর্কসংগ্রহদীপিকা"র 'নীলকণ্ঠী' টীকার "ভাস্করোদয়া" ব্যাখ্যায় লক্ষ্মীনৃসিংহ সংক্ষেপে উক্ত মীমাংসকমতের সরল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মৎপ্রণীত "ন্যায়পরিচয়" পুস্তকের নবম অধ্যায়ে সংক্ষেপে উক্ত মতভেদের ব্যাখ্যাও পরতঃপ্রামাণ্যবাদী ন্যায়বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের কথা লিখিত হইয়াছে।

হইলে সেই অনুমিতির প্রমাত্বনিশ্চয়ের জন্য আবার অন্য অনুমানপ্রমাণ আবশ্যক হওয়ায় উক্তরূপে অনবস্থা-দোষ হয়। সুতরাং উক্ত মীমাংসকমতে তুল্য যুক্তিতে প্রমাণপদার্থের প্রামাণ্যনিশ্চয়ের জন্যও যে, পরে অন্য অনুমানপ্রমাণ আবশ্যক হয় না, ইহাও বলিতে হইবে। তাই শ্লোকবার্ত্তিকে কুমারিল ভট্ট স্পষ্ট বলিয়াছেন,—"ন চানুমানতঃ সাধ্যা শব্দাদীনাং প্রমাণতা। সর্ব্বস্যৈব হি মাপ্রাপৎ প্রমাণান্তর-সাধ্যতা॥" (৮১ শ্লোক)। সুতরাং কুমারিল ভট্টের মতে শব্দপ্রমাণ বেদের প্রামাণ্য যে, অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ নহে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। "কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থের দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম কারিকার প্রথম চরণের বিবরণে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য বিশেষ বিচার করিয়া মীমাংসকসম্মত স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ ও বেদের নিত্যত্ববাদের খণ্ডন করিয়াছেন। সেখানে তিনিও পূর্ব্বপক্ষরূপে কুমারিল ভট্টের মতের উল্লেখ করিতে বলিয়াছেন,—"স্বত এব প্রামাণ্যনিশ্চয়ঃ, কিন্তু শঙ্কামাত্রমনেনা-পনীয়তে" ইত্যাদি। অর্থাৎ অপৌরুষেয় বেদের কোন বক্তা বা রচয়িতা না থাকায় বক্তার দোষপ্রযুক্ত বেদের অপ্রামাণ্য সম্ভবই না। সুতরাং বেদের স্বরূপনিশ্চয় হইলেই তাহাতে প্রামাণ্যনিশ্চয় হয়। তথাপি কোন কারণে কাহারও তাহাতে অপ্রামাণ্য শঙ্কা হইলে সেই শঙ্কা-নিবৃত্তির জন্যই বেদে বক্তৃদোষশূন্যত্ব বলা হইয়াছে। কিন্তু উহা বেদের প্রামাণ্যানুমানের হেতু নহে।* উদয়নাচার্য্য পরে মহাজন-পরিগৃহীতত্ব হেতুর দ্বারা নিত্যবেদের প্রামাণ্যনিশ্চয় হয়—এই মতেরও উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। কারিকাব্যাখ্যাকার হরিদাস ভট্টাচার্য্য উক্ত মতই পূর্ব্বপক্ষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উহা কুমারিল ভট্ট প্রভৃতির মত নহে, উহা একদেশি মত। "কুসুমাঞ্জলিবোধনী" টীকায় (৬৫ পৃঃ) বরদরাজও ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। মহাজনপরিগ্রহ যে, কুমারিলের মতে বেদের প্রামাণ্যানুমানে হেতু নহে, ইহা পরে তাঁহার অন্য কথার দ্বারাও বুঝা যায়।†

কিন্তু মহর্ষি গোতমের মতানুসারে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের প্রথমোক্ত "প্রমাণতোঽর্থপ্রতিপত্তৌ"—ইত্যাদি সন্দর্ভের ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্রও বেদের

* "ন তাবদ্বেদানাং প্রামাণ্যমপেতবক্তৃদোষত্বেনানুমীয়তে, স্বতো বোধজনকত্বেন নিশ্চিতে প্রামাণ্যে হেত্বন্তরাদপ্রামাণ্যশঙ্কায়াং তন্নিরাকরণমাত্রমপ্রামাণ্যকারণদোষাভাবাবধারণেন ক্রিয়তে" ইত্যাদি, বরদরাজকৃত "কুসুমাঞ্জলিবোধনী" (কাশী সংস্করণ, ৬২ পৃঃ)।

† "বক্তা গুণাশ্চ দোষাশ্চ মহাজনপরিগ্রহঃ।
এবমাদি বিনা যুক্ত্যা কল্প্যং মীমাংসকৈঃ পুনঃ।
ইদানীমিব সর্ব্বত্র দৃষ্টান্নাধিকমিষ্যতে॥"—শ্লোকবার্ত্তিক, ৯৮।

প্রামাণ্য যে, অনুমানপ্রমাণ দ্বারাই সিদ্ধ হয়, এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" টীকায় (১১৬ পৃঃ) উদয়নাচার্য্যও বিশেষ বিচার দ্বারা উহা সমর্থন করিতে কুমারিল ভট্টের পূর্ব্বোক্ত মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র পরতঃপ্রামাণ্যবাদের সমর্থন করিতে সেই প্রামাণ্যানুমিতির প্রমাত্বকে স্বতোগ্রাহ্য বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত অনুমিতি নির্দোষ হেতুর নিশ্চয়জন্য উৎপন্ন হওয়ায় উহাতে প্রমাত্ব-সংশয়ই জন্মে না। সুতরাং স্বতঃই তাহাতে প্রমাত্বনিশ্চয় হওয়ায় সেই প্রমাত্বনিশ্চয়ের জন্য আবার অন্য অনুমান আবশ্যক হয় না। সুতরাং উক্তরূপে অনবস্থাদোষের আশঙ্কা নাই (পূর্ব্ব ৫ম ও ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক চিৎসুখ মুনিও স্বতঃপ্রামাণ্যবাদের সমর্থন করিতে "তাৎপর্য্যটীকা"কার বাচস্পতি মিশ্রের ঐ কথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, পরতঃপ্রামাণ্যবাদী নৈয়ায়িকমতেও স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। "তত্ত্বচিন্তামণি"র 'প্রামাণ্যবাদ' গ্রন্থে স্বতঃপ্রামাণ্যবাদের খণ্ডন করিতে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও বাচস্পতি মিশ্রের প্রতি সম্মানবশতঃ তাঁহার ঐ বিরুদ্ধবাদের অভিপ্রায়বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র বর্দ্ধমান উপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্রের "স্বত এব প্রামাণ্যং" এই কথায় বিচলিত হইয়া প্রথমে "সু সুষ্ঠু অতএব স্বত এব" এইরূপ অনুচিত ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও পরে বুঝিয়া বাচস্পতি মিশ্রের উক্ত মতেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই মতে 'নিঃসন্দিগ্ধ প্রামাণ্য' এই অর্থেও "স্বতঃপ্রমাণ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। জৈন দার্শনিকগণও প্রামাণ্যসংশয় স্থলেই পরতঃপ্রামাণ্যবাদ স্বীকার করিয়াছেন। প্রাচীন কাল হইতেই জ্ঞানের প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্ব বিষয়ে স্বতঃ অথবা পরতঃ, এই পক্ষদ্বয়াবলম্বনে বহু গুরুতর সূক্ষ্ম বিচার ও নানা মতভেদ হইয়াছে।* সংক্ষেপে তাহার কিছুই ব্যক্ত করা যায় না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গ্রন্থ পাঠ করিয়াই তাহা বুঝিতে হইবে। প্রমাণপদার্থ সম্বন্ধে মহর্ষি গোতম ও ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতির অন্যান্য কথা পরে দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে ॥ ৮ ॥

প্রমাণপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

---

* প্রমাণত্বাপ্রমাণত্বে স্বতঃ সাংখ্যাঃ সমাশ্রিতাঃ। নৈয়ায়িকাস্তে পরতঃ সৌগতাশ্চরমং স্বতঃ ॥
প্রথমং পরতঃ প্রাহুঃ প্রামাণ্যং, বেদবাদিনঃ। প্রমাণত্বং স্বতঃ প্রাহুঃ পরতশ্চাপ্রমাণতাম্ ॥
("সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" জৈমিনি-দর্শন দ্রষ্টব্য)। সৌগতা বৌদ্ধাঃ চরমং অপ্রমাত্বং স্বতঃ, প্রথমং প্রমাত্বং পরতঃ প্রাহুঃ। বেদবাদিনো মীমাংসকা বেদান্তিনশ্চ প্রমাত্বং স্বতঃ, অপ্রমাত্বঞ্চ পরতঃ প্রাহুঃ।

ভাষ্য। কিং পুনরনেন † প্রমাণেনার্থজাতং প্রমাতব্যমিতি তদুচ্যতে।

অনুবাদ—এই সমস্ত প্রমাণের দ্বারা কোন্ পদার্থসমূহ যথার্থরূপে বুঝিতে হইবে, এ জন্য অর্থাৎ এই প্রশ্নবশতঃ (মহর্ষি) সেই পদার্থগুলি বলিয়াছেন।

সূত্র। আত্ম-শরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধি-মনঃ-প্রবৃত্তি-দোষ-প্রেত্যভাব-ফল-দুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্॥৯॥

অনুবাদ—(১) আত্মা, (২) শরীর, (৩) ইন্দ্রিয়, (৪) অর্থ, (৫) বুদ্ধি, (৬) মন, (৭) প্রবৃত্তি, (৮) দোষ, (৯) প্রেত্যভাব, (১০) ফল, (১১) দুঃখ ও (১২) অপবর্গই অর্থাৎ এই দ্বাদশ প্রকার পদার্থই "প্রমেয়" অর্থাৎ প্রথম সূত্রে কথিত "প্রমেয়" পদার্থ।

ভাষ্য। তত্রাত্মা সর্ব্বস্য দ্রষ্টা, সর্ব্বস্য ভোক্তা, সর্ব্বজ্ঞঃ, সর্ব্বানুভাবী। তস্য ভোগায়তনং শরীরম্। ভোগসাধনানীন্দ্রিয়াণি। ভোক্তব্যা ইন্দ্রিয়ার্থাঃ। ভোগো বুদ্ধিঃ। সর্ব্বার্থোপলব্ধৌ নেন্দ্রিয়াণি প্রভবন্তীতি সর্ব্ববিষয়মন্তঃকরণং মনঃ। শরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধিসুখবেদনানাং নির্ব্বৃত্তিকারণং প্রবৃত্তির্দোষাশ্চ। নাস্যেদং শরীরমপূর্ব্বমনুত্তরঞ্চ। পূর্ব্বশরীরাণামাদির্নাস্তি, উত্তরেষামপ-বর্গোহন্ত ইতি প্রেত্যভাবঃ। সসাধন সুখদুঃখোপভোগঃ ফলম্। দুঃখমিতি নেদমনুকূলবেদনীয়স্য সুখস্য প্রতীতেঃ প্রত্যাখ্যানম্। কিং তর্হি? জন্মন এবেদং সসুখসাধনস্য দুঃখানু-ষঙ্গাদ্দুঃখেনাবিপ্রয়োগাদ্বিবিধবাধনাযোগাদ্দুঃখমিতি সমাধি-ভাবনমুপদিশ্যতে। সমাহিতো ভাবয়তি, ভাবয়ন্ নির্ব্বিদ্যতে, নির্ব্বিণ্ণস্য বৈরাগ্যং, বিরক্তস্যাপবর্গ ইতি। জন্মমরণপ্রবন্ধোচ্ছেদঃ সর্ব্বদুঃখপ্রহাণমপবর্গ ইতি।

অস্ত্যন্যদপি দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়াঃ প্রমেয়ং

---

† "কিং পুনরনেন প্রমাণেনেতি। জাত্যভিপ্রায়মেকবচনং প্রকৃতে প্রমেয়ে যথাযথং প্রমাণানামুপযোগাৎ" (তাৎপর্য্যটীকা)।

তদ্‌ভেদেন চাপরিসংখ্যেয়ম্। অস্য তু তত্ত্বজ্ঞানাদপদবর্গো মিথ্যা-জ্ঞানাৎ সংসার ইত্যত এতদুপদিষ্টং বিশেষেণেতি।

অনুবাদ—সেই আত্মাদি প্রমেয়বর্গের মধ্যে (১) "আত্মা" সমস্তের অর্থাৎ সমস্ত সুখদুঃখকারণের দ্রষ্টা (বোদ্ধা), সমস্তের অর্থাৎ সমস্ত সুখদুঃখের ভোক্তা, (সুতরাং) "সর্ব্বজ্ঞ" অর্থাৎ স্বকীয় সুখদুঃখের সমস্ত কারণ ও সমস্ত সুখদুঃখের জ্ঞাতা, (সুতরাং) "সর্ব্বানুভাবী" অর্থাৎ স্বকীয় সুখদুঃখের সমস্ত কারণ ও সমস্ত সুখদুঃখপ্রাপ্ত। সেই আত্মার ভোগের স্থান (২) "শরীর"। ভোগের সাধন (৩) "ইন্দ্রিয়" অর্থাৎ ঘ্রাণাদি বহিরিন্দ্রিয়বর্গ। ভোগ্য (৪) "ইন্দ্রিয়ার্থ"বর্গ, অর্থাৎ গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। ভোগ (৫) "বুদ্ধি" অর্থাৎ জ্ঞান। বহিরিন্দ্রিয়গুলি সকল পদার্থের উপলব্ধি-কার্য্যে সমর্থ হয় না, এ জন্য সর্ব্ববিষয় অর্থাৎ সকল পদার্থই যাহার বিষয় হয়, এমন অন্তঃকরণ অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় (৬) "মন"। শরীর, বহিরিন্দ্রিয়, গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থ, বুদ্ধি, সুখ এবং বেদনার (দুঃখের) উৎপত্তির কারণ (৭) "প্রবৃত্তি" এবং (৮) "দোষ"বর্গ, অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্ম এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহ। এই আত্মার অর্থাৎ সংসারী জীবাত্মার এই শরীর অপূর্ব্ব নহে, অনুত্তরও নহে, অর্থাৎ ইহার পূর্ব্বশরীর নাই, এমন নহে, ইহার উত্তর-শরীর নাই, এমনও নহে। পূর্ব্বশরীরগুলির আদি নাই, পরবর্ত্তী শরীরগুলির মোক্ষই শেষ অর্থাৎ মোক্ষ হইলে আত্মার আর শরীর-সম্বন্ধ হয় না, ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অনাদি জন্মমরণ-প্রবাহ (৯) "প্রেত্যভাব"। সাধন সহিত সুখ দুঃখের উপভোগ অর্থাৎ সুখ-দুঃখের উপভোগ এবং তাহার সাধন দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি (১০) "ফল"। (১১) "দুঃখ" এই যে বলিয়াছেন, ইহা অনুকূলবেদনীয় অর্থাৎ অনুকূলভাবে সর্ব্বজীবের অনুভব-বিষয় সুখের অনুভূতির অপলাপ নহে অর্থাৎ মহর্ষি প্রমেয় পদার্থমধ্যে সুখ না বলিয়া সর্ব্বানুভবসিদ্ধ সুখ পদার্থের অস্বীকার করেন নাই। (প্রশ্ন) তবে কি? (উত্তর) সুখসাধন সহিত জন্মেরই দুঃখানুষঙ্গবশতঃ, দুঃখের সহিত অবিচ্ছেদ-বশতঃ, বিবিধ দুঃখসম্বন্ধবশতঃ ইহা অর্থাৎ সুখের কারণ এবং সুখ ও দুঃখ, এইরূপে সমাধিভাবনা অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে ভাবনা উপদেশ করিয়াছেন। (মুমুক্ষু) সমাহিত হইয়া ভাবিবেন অর্থাৎ জন্মাদি সুখসাধন সমস্তকেই দুঃখ বলিয়া চিন্তা করিবেন, ভাবনা করতঃ নির্ব্বিণ্ণ হইবেন, অর্থাৎ সমগ্র জগতে উপেক্ষা-বুদ্ধি-সম্পন্ন হইবেন, নির্ব্বিণ্ণ মুমুক্ষুর বৈরাগ্য হইবে, অর্থাৎ সমস্ত বস্তু-বিষয়ে তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইবে। বিরক্ত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার ভাবনার ফলে

বৈরাগ্যসম্পন্ন আত্মার মোক্ষ হইবে। জন্মমরণপ্রবাহের উচ্ছেদ (অর্থাৎ) সর্ব্বদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি (১২) "অপবর্গ"।

অন্যও অর্থাৎ এই আত্মা প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় ভিন্নও "দ্রব্য", "গুণ", "কর্ম্ম", "সামান্য", "বিশেষ" ও "সমবায়" (কণাদোক্ত ষট্ পদার্থ) এবং তাহাদিগের ভেদবশতঃ অর্থাৎ ঐ দ্রব্যাদি পদার্থের অসংখ্য প্রকার ভেদ থাকায় অসংখ্য প্রমেয় আছে। কিন্তু এই আত্মাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানজন্য অপবর্গ হয়, মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংসার হয়, এই কারণে এই আত্মাদি দ্বাদশ প্রকার পদার্থই বিশেষ করিয়া (প্রমেয় বলিয়া) কথিত হইয়াছে।

টিপ্পনী—চতুর্ব্বিধ প্রমাণের লক্ষণ বলা হইয়াছে। এই চতুর্ব্বিধ প্রমাণের সাহায্যে যে সকল পদার্থকে যথার্থরূপে বুঝিলে মোক্ষ হয়, সেই "প্রমেয়" পদার্থ নিরূপণের জন্য মহর্ষি প্রথমে সেই প্রমেয় পদার্থগুলির বিভাগ অর্থাৎ তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ নামের উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিভাগসূত্রস্থ "প্রমেয়" শব্দের দ্বারাই মহর্ষি-কথিত "প্রমেয়" পদার্থের সামান্য লক্ষণও সূচিত হইয়াছে। যাহা প্রকৃষ্ট মেয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ মোক্ষজনক জ্ঞানের বিষয়, তাহাই "প্রমেয়"। এই প্রমেয়বর্গের বিশেষ লক্ষণগুলি মহর্ষি নিজেই পৃথক পৃথক সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে যথাক্রমে মহর্ষি-সূত্রোক্ত প্রমেয়গুলির পরিচয় বলিয়াছেন। "প্রমেয়"বর্গের মধ্যে প্রথম পদার্থ জীবাত্মা। ভাষ্যকার তাহাকে বলিয়াছেন—সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বভোক্তা, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বানুভাবী। এখানে "সর্ব্ব" শব্দের দ্বারা ভাষ্যকার সমস্ত সুখদুঃখসাধন এবং সমস্ত সুখ-দুঃখকেই গ্রহণ করিয়াছেন।* ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, "প্রমেয়"বর্গের মধ্যে জীবাত্মা অনাদিকাল হইতে নিজের সমস্তসুখদুঃখ-সাধনের জ্ঞাতা এবং সমস্ত সুখ-দুঃখের ভোক্তা। অর্থাৎ যে জীবাত্মার সম্বন্ধে যতগুলি সুখ-দুঃখ ও তাহার কারণ উপস্থিত হয়, সেই জীবাত্মাই সেই সমস্তের জ্ঞাতা, আর কেহ উহার একটিরও জ্ঞাতা নহে। দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জড় পদার্থ জ্ঞাতা হইতেই পারে না। পরন্তু বহিরিন্দ্রিয়গুলির বিষয় নির্দ্দিষ্ট বা নিয়মবদ্ধ। উহারা জ্ঞাতা হইলে সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞাতা হইতে পারে না, কিন্তু আত্মা তাহার সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সর্ব্ব বিষয়েরই জ্ঞাতা, এই তাৎপর্য্যেই ভাষ্যকার

* "সর্ব্বস্য সুখদুঃখসাধনস্য দ্রষ্টা, সর্ব্বস্য সুখদুঃখস্য ভোক্তা, যতঃ সুখদুঃখসাধনং সর্ব্বং সর্ব্বঞ্চ সুখদুঃখং জানাতি, অতঃ সর্ব্বজ্ঞঃ, ন চাপ্রাপ্তান্যেতানি জানাতীত্যত আহ "সর্ব্বানুভাবী"। অনুভবঃ প্রাপ্তিঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

এখানে এবং আত্মপরীক্ষাপ্রকরণে জীবাত্মাকে "সর্ব্বজ্ঞ" বলিয়াছেন। সুখ-দুঃখ এবং তাহার সাধনগুলি প্রাপ্ত না হইলে তাহার জ্ঞাতা হওয়া যায় না, এ জন্যে শেষে বলিয়াছেন,—"সর্ব্বানুভাবী"। অনুপূর্ব্বক "ভূ" ধাতুর অর্থ এখানে প্রাপ্তি। ভাষ্যকার অন্যত্রও প্রাপ্তি অর্থে "অনুভব" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ফলকথা, যে পদার্থ সুখদুঃখের সমস্ত সাধন ও সমস্ত সুখ-দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া ঐ সমস্তের জ্ঞাতা ও ভোক্তা, সেই পদার্থই জীবাত্মা। "তাৎপর্য্যটীকা"কার বলিয়াছেন যে, প্রমেয়বর্গের মধ্যে আত্মা ও অপবর্গ উপাদেয় হইলেও সুখদুঃখাদিভোক্তৃত্বরূপে মুমুক্ষুর নিজের আত্মাও হেয়, কিন্তু স্বস্বরূপেই উপাদেয়। এই মতে আত্মার সুখদুঃখাদিবিশেষগুণশূন্যাবস্থাই আত্মার স্বস্বরূপ বা কেবল রূপ। তাই আত্মার ঐ মুক্তাবস্থাকেই "কৈবল্য" বলে। কিন্তু আত্মাকে সুখদুঃখাদিভোক্তা বলিয়া বুঝিলে নিজের আত্মাতেও উক্তরূপে হেয়ত্ববোধজন্য বৈরাগ্য জন্মে, এ জন্যই ভাষ্যকার এখানে আত্মাকে উক্তরূপে বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু গোতমের মতে জ্ঞান, ইচ্ছা ও সুখদুঃখাদি আত্মাতেই জন্মে, উহা আত্মারই গুণ। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

মহর্ষি এই প্রমেয়বিভাগ-সূত্রে সুখের উল্লেখ না করিয়া দুঃখের উল্লেখ করায় আশঙ্কা হইতে পারে যে, মহর্ষি সুখ নামে কোন প্রমেয় স্বীকার করিতেন না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সুখ সর্ব্বজীবের অনুকূল ভাবে অনুভব-সিদ্ধ। মহর্ষি প্রমেয়মধ্যে দুঃখের উল্লেখ করিয়া ঐ সুখপদার্থের অপলাপ করেন নাই। কিন্তু সুখ ও সুখসাধন জন্মাদি সমস্তই দুঃখ, এইরূপ ভাবনা করিলে নির্ব্বেদ ও বৈরাগ্য জন্মে। বিরক্ত ব্যক্তিরই তত্ত্ব-জ্ঞানের ফলে মোক্ষ হয়। সুতরাং মুমুক্ষু সুখকেও দুঃখ বলিয়া ভাবনা করিবেন, এইরূপ উপদেশা-ভিপ্রায়েই মহর্ষি প্রমেয়মধ্যে সুখের উল্লেখ না করিয়া দুঃখের উল্লেখ করিয়াছেন। পরে চতুর্থ অধ্যায়ে দুঃখপরীক্ষা-প্রকরণে মহর্ষি নিজেই বিচারপূর্ব্বক ইহা বলিয়াছেন। ভাষ্যকারও সেখানে মহর্ষির উদ্দেশ্য ও সিদ্ধান্ত সুব্যক্ত করিয়াছেন। জৈন দার্শনিক হরিভদ্র সূরি "ষড়্দর্শন-সমুচ্চয়" গ্রন্থে ন্যায়দর্শনে গোতমোক্ত প্রমেয় পদার্থের বর্ণনায় সুখেরও উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক কল্পনা করিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে গোতমের প্রমেয়বিভাগসূত্রে "সুখ" শব্দই ছিল, "দুঃখ" শব্দ ছিল না। পরে "সুখ" শব্দের স্থানে "দুঃখ" শব্দ নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে পরে চতুর্থ অধ্যায়ে "দুঃখপরীক্ষা-প্রকরণ"ও কল্পিত বলিতে হয় এবং এই সূত্রে প্রমেয়মধ্যে সুখের উদ্দেশ করিলে

পরে তাহার লক্ষণ-বচন এবং পরীক্ষাও কর্ত্তব্য হয়। কিন্তু ন্যায়সূত্রে তাহা নাই। পরন্তু যাঁহারা প্রাচীন ন্যায়সূত্রকে অধ্যাত্মবিদ্যা বা দর্শন না বলিয়া, কেবল 'হেতুবিদ্যা'ই বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতে এই প্রমেয়বিভাগসূত্রটিও পরে রচিত, ইহা বলিতেই হইবে। তাহা হইলে প্রাচীনকালে এই সূত্রে "সুখ" শব্দই ছিল, "দুঃখ" শব্দ ছিল না, এই কথা কিরূপে বলা যাইবে? এ বিষয়ে অন্যান্য কথা চতুর্থ খণ্ডে ২৬১-৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যকার মহর্ষির এই সূত্রোক্ত আত্মাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত দ্বাদশ প্রমেয়ের সংক্ষেপে পরিচয় প্রকাশ করিয়া, পরে বলিয়াছেন যে, এতদ্‌ভিন্ন দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং তাহাদিগের অসংখ্য ভেদে আরও অসংখ্য প্রমেয় আছে। কিন্তু উক্ত আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় বিষয়ে নানা-প্রকার মিথ্যাজ্ঞানবশতঃই জীবাত্মার সংসার হয় এবং উহাদিগের তত্ত্ব-জ্ঞানজন্য মুক্তি হয়, এজন্য উক্ত দ্বাদশ প্রমেয়ই বিশেষতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, মহর্ষির প্রথম সূত্রোক্ত "প্রমেয়" শব্দটি উক্ত আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থ অর্থে পারিভাষিক। সুতরাং সেই আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়ই তিনি এই সূত্রে বলিয়াছেন। উহা মুমুক্ষুর প্রকৃষ্ট মেয় অর্থাৎ উহাদিগের তত্ত্ব-সাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞানই ঐ সমস্ত বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া তদ্দ্বারা মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হয়, এ জন্য বিশেষতঃ উক্ত দ্বাদশ পদার্থকেই তিনি উক্তরূপ অর্থে "প্রমেয়" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু যাহা প্রমাণসিদ্ধ তাহাই প্রমেয়, এই অর্থে "প্রমেয়" শব্দটি পদার্থমাত্রেরই বোধক। মহর্ষি গোতমও ঐ অর্থে তাঁহার সম্মত অন্যান্য সমস্ত পদার্থকেও প্রমেয় বলিতেন। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর ইহা সমর্থন করিতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের "প্রমেয়া চ তুলা-প্রামাণ্যবৎ" এই (১৬শ) সূত্রের উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মহর্ষি উক্ত সূত্রে তুলাদণ্ডকেও প্রমেয় বলিয়াছেন এবং তদ্দৃষ্টান্তে প্রমাণ-পদার্থেরও প্রমেয়ত্ব সমর্থন করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর কল্পান্তরে এই সূত্রোক্ত "তু" শব্দের সর্ব্বশেষে যোগ করিয়া "প্রমেয়ন্তু প্রমেয়মেব" এইরূপ ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। কিন্তু উহা তাঁহার ব্যাখ্যাকৌশলমাত্র। কারণ আত্মাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত দ্বাদশ পদার্থই মহর্ষির প্রথম সূত্রোক্ত বিশেষ প্রমেয়, ইহাই এই সূত্রে তাঁহার বক্তব্য। বাচস্পতি মিশ্রও ইহাই বলিয়াছেন। মূলকথা, উক্ত বিশেষ প্রমেয় ভিন্ন সামান্য প্রমেয়ও অসংখ্য আছে, যাহা মহর্ষি গোতমেরও সম্মত। ভাষ্যকার সেই সমস্ত প্রমেয় পদার্থ প্রকাশ করিতে এখানে বৈশেষিক

দর্শনের চতুর্থ সূত্রে মহর্ষি কণাদোক্ত দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়, এই ষট্ পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ কথানুসারেই "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী"তে নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথও বলিয়াছেন,—"এতে চ পদার্থা বৈশেষিকপ্রসিদ্ধা নৈয়ায়িকানামপ্যবিরুদ্ধাঃ প্রতিপাদিতশ্চৈবমেব ভাষ্যে"।*

বস্তুতঃ পরে গোতমের ন্যায়সূত্রেই কণাদোক্ত দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম ও সামান্য পদার্থের স্পষ্ট উল্লেখ হইয়াছে এবং সমবায় সম্বন্ধেরও প্রকাশ হইয়াছে। পরে তাহা পাওয়া যাইবে। ন্যায়সূত্রে কণাদোক্ত "বিশেষ" নামক পদার্থের প্রকাশ না থাকিলেও উহার খণ্ডন নাই। ভাষ্যকার এখানে উক্ত "বিশেষ" পদার্থেরও উল্লেখ করিয়াছেন। নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি নিজমতানুসারে "পদার্থতত্ত্ব-নিরূপণ" গ্রন্থে উক্ত "বিশেষ" পদার্থ অস্বীকার করিলেও "সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী"তে বিশ্বনাথ দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থকেই নৈয়ায়িকসম্প্রদায়েরও সম্মত বলিয়াছেন। সুতরাং উক্ত "বিশেষ" নামক নিত্যপদার্থ যে, কেবল বৈশেষিক সম্প্রদায়েরই সম্মত এবং তজ্জন্যই "বৈশেষিক" এই নাম হইয়াছে, ইহা সত্য নহে। পরন্তু ইহাও বুঝা আবশ্যক যে, বিশ্বনাথের "ভাষাপরিচ্ছেদ" বৈশেষিকগ্রন্থ নহে। কারণ, উহাতে নৈয়ায়িকমতানুসারেই প্রত্যক্ষাদি চতুর্ব্বিধ প্রমাণের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে এবং উপমান ও শব্দপ্রমাণ যে, অনুমানের অন্তর্গত, ইহা বৈশেষিক মত বলিয়া পরে তাহার খণ্ডন হইয়াছে। বৈশেষিক মতে সমবায় সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয় না, উহা অনুমেয়। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে বিশ্বনাথ বলিয়াছেন,—"প্রত্যক্ষং সমবায়স্য বিশেষণতয়া ভবেৎ।" পরে আরও বলিয়াছেন,—"তত্রাপি পরমাণৌ স্যাৎ পাকো বৈশেষিকে নয়ে।" "সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী"তে উক্ত বিষয়ে তিনি নৈয়ায়িকমতেরই সমর্থন করিয়াছেন। আরও

* বিশ্বনাথ সপ্তম অভাব পদার্থকেও বৈশেষিকপ্রসিদ্ধ বলিয়াছেন। কারণ, বৈশেষিক-দর্শনের নবম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে মহর্ষি কণাদ অভাব পদার্থেরও সমর্থন করিয়াছেন। তদনুসারেই বৈশেষিকমতব্যাখ্যাতৃগণ অভাব পদার্থও কণাদের সম্মত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় "ফেলোসিপের লেক্‌চারে" 'বৈশেষিকদর্শন' প্রবন্ধে (১০০ পৃঃ) লিখিয়াছেন যে, প্রথমে প্রশস্তপাদই কণাদকে সপ্তপদার্থবাদী বলিয়াছেন। কারণ, তিনি বলিয়াছেন,—"ষণ্ণাং পদার্থানামভাবসপ্তমানং।" কিন্তু প্রশস্তপাদভাষ্যের কোন পুস্তকেই "অভাবসপ্তমানাং" এইরূপ পাঠ নাই। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি টীকাকারগণও উক্তরূপ পাঠ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু কণাদ ও প্রশস্তপাদ পদার্থের উদ্দেশ করিতে অভাব পদার্থের উদ্দেশ করেন নাই কেন? এ বিষয়ে তাঁহারা কারণ বলিয়া গিয়াছেন। উক্ত স্থলে "কিরণাবলী" ও "ন্যায়কন্দলী" প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

নানা কারণে তিনি যে, ন্যায়মত-বর্ণনের জন্যই উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহেই বুঝা যায়। তবে তিনি কেন প্রথমে উক্ত গ্রন্থে দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থের উদ্দেশ করিয়াছেন? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। তাই তিনি পূর্ব্বোক্ত সন্দর্ভের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত পদার্থ বৈশেষিকপ্রসিদ্ধ হইলেও নৈয়ায়িকসম্প্রদায়েরও অবিরুদ্ধ অর্থাৎ সম্মত। বস্তুতঃ নৈয়ায়িকসম্প্রদায় বৈশেষিকসম্প্রদায়ের ন্যায় নিয়তপদার্থবাদী নহেন, কিন্তু অনিয়তপদার্থবাদী (পূর্ব্ব ১৮শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতে যাহা প্রমাণসিদ্ধ, তাহাই পদার্থ বলিয়া স্বীকার্য্য। তাই পরে নব্যনৈয়ায়িকগণের মধ্যে অনেকে দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করিয়াও অনেক বিষয়ে সমাধান করিয়াছেন॥ ৯॥

ভাষ্য। তত্রাত্মা তাবৎ প্রত্যক্ষতো ন গৃহ্যতে,* স কিমাপ্তোপদেশমাত্রাদেব প্রতিপদ্যত ইতি? নেত্যুচ্যতে, অনুমানাচ্চ প্রতিপত্তব্য ইতি। কথম্?

অনুবাদ—তন্মধ্যে আত্মা প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারা গৃহীত হয় না অর্থাৎ দেহাদিভিন্নস্বরূপে জীবাত্মার লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় না। (প্রশ্ন) সেই আত্মা

* বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদের "তত্রাত্মা মনশ্চাপ্রত্যক্ষে" এই (৮।১।২) সূত্রানুসারে প্রশস্তপাদও আত্মাকে অপ্রত্যক্ষই বলিয়াছেন। সেখানে 'ন্যায়কন্দলী'কার শ্রীধর ভট্ট বলিয়াছেন যে, সর্ব্বজীবেরই 'অহং মম' ইত্যাদিরূপে নিজদেহবর্ত্তী আত্মার নিজ মনের দ্বারাই প্রত্যক্ষ জন্মে, সুতরাং বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না, ইহাই প্রশস্তপাদের ঐ কথার তাৎপর্য্য। কিন্তু ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। কারণ, দেহাদিভিন্ন রূপাদিশূন্য আত্মার যে, কোন বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হইতেই পারে না, ইহা সর্ব্বসিদ্ধ। সুতরাং তাহা বলা অনাবশ্যক। পরন্তু প্রশস্তপাদ আত্মার অপ্রত্যক্ষত্বের হেতু বলিয়াছেন,—'সৌক্ষ্ম্য'। শ্রীধর ভট্টও উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"প্রত্যক্ষোপলব্ধিযোগ্যতাবিরহঃ সৌক্ষ্ম্যং।" অবশ্য "ভাষাপরিচ্ছেদে" বিশ্বনাথ এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বহু নৈয়ায়িকও জীবের নিজ আত্মাতে উৎপন্ন সুখ-দুঃখাদি বিশেষ গুণের 'আমি সুখী, আমি দুঃখী' ইত্যাদিরূপে মানস প্রত্যক্ষকালে মনের দ্বারা সেই অহংজ্ঞানের বিষয় নিজ আত্মারও প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু মনের দ্বারাও দেহাদিভিন্ন প্রকৃত আত্মার লৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে না, ইহাই এখানে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের অভিপ্রেত বুঝা যায়। তাই তিনি তৃতীয়সূত্র-ভাষ্যশেষে আত্মার যোগসমাধিজন্য অলৌকিক প্রত্যক্ষই বলিয়াছেন এবং সেখানে উক্ত বিষয়ে কণাদের সূত্রও উদ্ধৃত করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত কণাদসূত্রের "উপস্কারে" শঙ্কর মিশ্রও কণাদের উক্তরূপ তাৎপর্য্যই গ্রহণ করিয়াছেন। জীবাত্মার প্রত্যক্ষত্ব বিষয়ে মতভেদ ও বিশেষ বিচার "ন্যায়মঞ্জরী" গ্রন্থে ৪২৯-৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কি কেবল শব্দপ্রমাণ হইতেই জ্ঞাত হয়? (উত্তর) ইহা বলিতেছি না, অনুমানপ্রমাণ হইতেও জ্ঞাতব্য। (প্রশ্ন) কি প্রকারে? অর্থাৎ আত্মার অনুমাপক লিঙ্গ কি? (উত্তর)—

সূত্র। ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখ-জ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ দেহাদিভিন্ন চিরস্থায়ী জীবাত্মার অনুমাপক।

ভাষ্য। যজ্জাতীয়স্যার্থস্য সন্নিকর্ষাৎ সুখমাত্মোপলব্ধবান্, তজ্জাতীয়মেবার্থং পশ্যন্নুপাদাতুমিচ্ছতি। সেয়মুপাদাতুমিচ্ছা একস্যানেকার্থদর্শিনো দর্শনপ্রতিসন্ধানাদ্ভবতি* লিঙ্গমাত্মনঃ। নিয়তবিষয়ে হি বুদ্ধিভেদমাত্রে ন সম্ভবতি দেহান্তরবদিতি।

এবমেকস্যানেকার্থদর্শিনো দর্শনপ্রতিসন্ধানাদ্দুঃখহেতৌ দ্বেষঃ। যজ্জাতীয়োঽস্যার্থঃ সুখহেতুঃ প্রসিদ্ধস্তজ্জাতীয়মর্থং পশ্যন্নাদাতুং প্রযততে, সোঽয়ং প্রযত্ন একমনেকার্থদর্শিনং দর্শনপ্রতিসন্ধাতারমন্তরেণ ন স্যাৎ। নিয়তবিষয়ে হি বুদ্ধিভেদমাত্রে ন সম্ভবতি দেহান্তরবদিতি। এতেন দুঃখহেতৌ প্রযত্নো ব্যাখ্যাতঃ।

সুখদুঃখস্মৃত্যা চায়ং তৎসাধনমাদদানঃ সুখমুপলভতে, দুঃখমুপলভতে, সুখদুঃখে বেদয়তে, পূর্ব্বোক্ত এব হেতুঃ। বুভুৎসমানঃ খল্বয়ং বিমৃশতি কিং স্বিদিতি। বিমৃশংশ্চ জানীতে ইদমিতি। তদিদং জ্ঞানং বুভুৎসাবিমর্শাভ্যামভিন্নকর্ত্তৃকং গৃহ্যমাণমাত্মলিঙ্গং, পূর্ব্বোক্ত এব হেতুরিতি।

* কোন কোন পুস্তকে এখানে "ভবন্তী লিঙ্গমাত্মনঃ" এইরূপ পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত পাঠে 'ভবন্তী উৎপদ্যমানা সেয়মুপাদাতুমিচ্ছা আত্মনো লিঙ্গং' এইরূপ ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ইচ্ছার বিশেষণরূপে এখানে পরে "ভবন্তী" এই পদের প্রয়োগ সমীচীন হয় না এবং উহার প্রয়োজনও কিছু নাই। বার্ত্তিকাদি গ্রন্থের দ্বারাও উক্ত পাঠ প্রকৃত বলিয়া বুঝা যায় না।

তত্র 'দেহান্তরব'দিতি বিভজ্যতে। যথা অনাত্মবাদিনো দেহান্তরেষু নিয়তবিষয়া বুদ্ধিভেদা ন প্রতিসন্ধীয়ন্তে, তথৈকদেহ-বিষয়া অপি ন প্রতিসন্ধীয়েরন্, অবিশেষাৎ। সোঽয়মেকসত্ত্বস্য সমাচারঃ স্বয়ংদৃষ্টস্য স্মরণং, নান্যদৃষ্টস্য নাদৃষ্টস্যেতি। এবং খলু নানাসত্ত্বানাং সমাচারোঽন্যদৃষ্টমন্যো ন স্মরতীতি। তদেতদুভয়মশক্যমনাত্মবাদিনা ব্যবস্থাপয়িতুমিতি এবমুপপন্নম-স্ত্যাত্মেতি।

অনুবাদ—যজ্জাতীয় পদার্থের সন্নিকর্ষজন্য আত্মা অর্থাৎ অহং জ্ঞানের বিষয় পদার্থ পূর্ব্বে সুখ উপলব্ধি করে, তজ্জাতীয় পদার্থকেই দর্শন করতঃ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করে। সেই এই গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা অনেকার্থদর্শী অর্থাৎ বিভিন্ন কালে অনেক পদার্থের দর্শনকর্ত্তা একই ব্যক্তির দর্শনের 'প্রতিসন্ধান'বশতঃ আত্মার লিঙ্গ (অনুমাপক) হয়। নিয়ত বিষয় বুদ্ধিবিশেষমাত্রে অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধসম্মত ক্ষণিক বিজ্ঞানবিশেষে (পূর্ব্বোক্ত দর্শন-প্রতিসন্ধান) সম্ভব হয় না, যেমন অন্য দেহে সম্ভব হয় না [অর্থাৎ কোন সুখজনক পদার্থকে পূর্ব্বে দেখিয়া, সুখের উপলব্ধি করিলে, পরে আবার তজ্জাতীয় পদার্থের দর্শন হইলে, তাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যে ইচ্ছা জন্মে, তদ্দ্বারা সিদ্ধ হয়—সেই দ্রষ্টা পূর্ব্বাপরকালস্থায়ী এক। কারণ, সেখানে 'যে আমি পূর্ব্বে এই জাতীয় পদার্থকে দর্শন করিয়াছিলাম, সেই আমিই এখন ইহা দর্শন করিয়া গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছি'—এইরূপে সেই দর্শনের প্রতিসন্ধান বা প্রত্যভিজ্ঞারূপ মানস প্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু ক্ষণকালমাত্রস্থায়ী বিজ্ঞানবিশেষ আত্মা হইলে, পরে সেই আত্মা না থাকায় উক্তরূপ প্রতিসন্ধান হইতে পারে না]।

এইরূপ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উৎপন্ন দুঃখজনক পদার্থ বিষয়ে দ্বেষ, অনেকার্থদর্শী এক ব্যক্তির দর্শনের প্রতিসন্ধানবশতঃ আত্মার লিঙ্গ হয়। যজ্জাতীয় পদার্থ এই আত্মার সুখজনক বলিয়া প্রসিদ্ধ বা নিশ্চিত, তজ্জাতীয় পদার্থকে দর্শন করতঃ সেই আত্মা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রযত্ন করে। সেই এই প্রযত্ন অনেকার্থদর্শী এক দর্শন-প্রতিসন্ধাতা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দর্শনের মানস প্রত্যভিজ্ঞাকারী এক ব্যক্তি ব্যতীত হইতে পারে না। নিয়তবিষয় বিজ্ঞানবিশেষমাত্রে (সেই দর্শনের প্রতিসন্ধান) সম্ভব হয় না, যেমন অন্য দেহে

সম্ভব হয় না। ইহার দ্বারা দুঃখজনক পদার্থে প্রযত্ন ব্যাখ্যাত হইল, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপে দুঃখজনক পদার্থবিষয়ে প্রযত্নও আত্মার লিঙ্গ বা অনুমাপক হয়।

এবং সুখ ও দুঃখের স্মরণবশতঃ এই আত্মাই সেই সুখ ও দুঃখের সাধনকে গ্রহণ করতঃ সুখ উপলব্ধি করে, দুঃখ উপলব্ধি করে, সুখ ও দুঃখ উভয়কে অনুভব করে, পূর্ব্বোক্তই হেতু [অর্থাৎ যে আমি পূর্ব্বে সুখ-দুঃখের অনুভব করিয়াছিলাম সেই আমিই সেই সুখ-দুঃখের স্মরণ করিয়া তাহার সাধনকে গ্রহণ করায় তজ্জন্য সুখ-দুঃখের উপলব্ধি করিতেছি, এইরূপে সুখদুঃখানুভবের প্রতিসন্ধানই পূর্ব্বাপরকালস্থায়ী এক আত্মার সাধক হেতু]। বুভুৎসমান হইয়া অর্থাৎ কোন পদার্থকে বুঝিতে ইচ্ছা করিয়া, এই আত্মাই "কিং স্বিৎ" ? অর্থাৎ এই পদার্থ ইহা কি ? এইরূপে সংশয় করে, সংশয় করিয়া "ইহা" এইরূপে নিশ্চয়ও করে, সেই এই জ্ঞান অর্থাৎ পরে উৎপন্ন নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান, বুঝিবার ইচ্ছা ও সংশয়ের সহিত অভিন্নকর্ত্তৃকরূপে জ্ঞায়মান হইয়া অর্থাৎ যে আমি পূর্ব্বে বুঝিবার ইচ্ছা করিয়া সংশয় করিয়াছিলাম, সেই আমিই এখন নিশ্চয় করিতেছি, এইরূপ মানস প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হইয়া আত্মার লিঙ্গ (অনুমাপক) হয়, পূর্ব্বোক্তই হেতু অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপে প্রতিসন্ধানই পূর্ব্বাপরকালস্থায়ী এক আত্মার সাধক হেতু।

সেই বাক্যে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "নিয়তবিষয়ে" ইত্যাদি বাক্যের অন্তর্গত "দেহান্তরবৎ" এই পদ ব্যাখ্যাত হইতেছে। যেমন অনাত্মবাদী অর্থাৎ ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতে দেহান্তরসমূহে নিয়তবিষয় বুদ্ধিবিশেষসমূহ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণিক বিজ্ঞান, প্রতিসংহিত (প্রত্যভিজ্ঞার বিষয়) হয় না। তদ্রূপ এক দেহস্থ বুদ্ধিভেদ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণিক বিজ্ঞানবিশেষও প্রতিসংহিত হইতে পারে না ; কারণ, বিশেষ নাই [অর্থাৎ ক্ষণিক বিজ্ঞানবিশেষকে আত্মা বলিলে উহা পরদেহের ন্যায় নিজদেহেও প্রতিক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা হইবে, তাহা হইলে যে আমি পূর্ব্বে সেই পদার্থকে দেখিয়াছিলাম, সেই আমিই এখন সেই পদার্থ বা তজ্জাতীয় পদার্থকে দেখিতেছি, ইত্যাদিপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভবই হয় না] সেই এই এক আত্মার সমাচার, স্বয়ংদৃষ্ট পদার্থেরই স্মরণ হয়, অন্যদৃষ্ট পদার্থের স্মরণ হয় না, অজ্ঞাত পদার্থেরও স্মরণ হয় না। এইরূপই নানা আত্মার সমাচার, অন্য কর্ত্তৃক দৃষ্ট পদার্থ অন্য ব্যক্তি স্মরণ করে না। সেই এই উভয় অর্থাৎ স্বয়ংদৃষ্ট পদার্থের স্মরণ এবং অন্যদৃষ্ট পদার্থের অস্মরণ

অনাত্মবাদী ব্যবস্থাপন করিতে পারেন না, এইরূপে আত্মা অর্থাৎ চিরস্থায়ী অহংজ্ঞানের বিষয় পদার্থ আছে, ইহা উপপন্ন হয়।

টিপ্পনী—ন্যায়দর্শনের পরম প্রয়োজন অপবর্গ জীবাত্মারই পরম পুরুষার্থ। সুতরাং প্রমেয় পদার্থমধ্যে জীবাত্মাই প্রধান। তাই মহর্ষি প্রথমে জীবাত্মারই উল্লেখ করিয়া, প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা তাঁহার সম্মত জীবাত্মার অস্তিত্বপ্রতিপাদক লিঙ্গ বলিয়াছেন।* তদ্দ্বারা তাঁহার বক্তব্য জীবাত্মার লক্ষণও সূচিত হইয়াছে। কারণ, তাঁহার মতে সূত্রোক্ত ইচ্ছা প্রভৃতি জীবাত্মাতেই উৎপন্ন হয়। উহা জীবাত্মারই বিশেষ গুণ। নচেৎ উহাকে জীবাত্মার লিঙ্গ বলা যায় না। সুতরাং ইচ্ছাবত্ত্ব ও দ্বেষবত্ত্ব প্রভৃতি জীবাত্মার লক্ষণ, ইহাও এই সূত্রের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। কিন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রে প্রথমে আত্মার উদ্দেশ করায় এই সূত্রের দ্বারা আত্মার লক্ষণই তাঁহার বক্তব্য। আত্মার পরীক্ষা এখানে তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং এই সূত্রে "লিঙ্গ" শব্দের অর্থ লক্ষণ। ইচ্ছাবত্ত্ব ও দ্বেষবত্ত্ব প্রভৃতি আত্মার লক্ষণ, ইহাই সূত্রার্থ। তন্মধ্যে ইচ্ছাবত্ত্ব, প্রযত্নবত্ত্ব ও জ্ঞানবত্ত্ব, এই তিনটি জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এই দ্বিবিধ আত্মারই সামান্য লক্ষণ। কারণ, পরমেশ্বরেও নিত্য ইচ্ছা, নিত্য প্রযত্ন ও নিত্যজ্ঞান আছে। কিন্তু দ্বেষবত্ত্ব, সুখবত্ত্ব ও দুঃখবত্ত্ব কেবল জীবাত্মারই লক্ষণ। কারণ, পরমেশ্বরে সুখ, দুঃখ ও দ্বেষ নাই। বিশ্বনাথ "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী"তে পরে পরমেশ্বরের নিত্য সুখও স্বীকার করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টও উহা সমর্থন করিয়াছেন। তাহা হইলে সুখবত্ত্ব পরমাত্মারও লক্ষণ বলা যায়। পরমেশ্বরের জ্ঞানাদি গুণ বিষয়ে মতভেদ ও আলোচনা চতুর্থ খণ্ডে (৭২-৭৩ পৃঃ) দ্রষ্টব্য। ফলকথা, বৃত্তিকার বিশ্বনাথের মতে মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রে প্রথমোক্ত "আত্মন্" শব্দের দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এই দ্বিবিধ আত্মারই উল্লেখ করিয়াছেন। আত্মত্বরূপে দ্বিবিধ আত্মাই "আত্মন্" শব্দের বাচ্য,

* বৈশেষিক দর্শনে (৩।২।৪) মহর্ষি কণাদও সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্নকে এবং তৎপূর্ব্বে (৩।১।১৮) জ্ঞানকে জীবাত্মার সাধক লিঙ্গ বলিয়াছেন। তদনুসারে প্রশস্তপাদও বলিয়াছেন,—"সুখ-দুঃখেচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্নৈশ্চ গুণৈর্গুণ্যনুমীয়তে।" 'ন্যায়কন্দলী'কার শ্রীধর ভট্ট প্রভৃতি সেই অনুমানের ব্যাখ্যা করিতে "সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমানই প্রদর্শন করিয়াছেন। "সূক্তি" টীকাকার জগদীশ তর্কালঙ্কারও সেই অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন,—"সুখাদিকং দ্রব্যসমবেতং গুণত্বাৎ।" "জ্ঞানং কচিদাশ্রিতং কার্য্যত্বাদ্গন্ধবৎ।' কণাদের মতে উক্ত জ্ঞানাদি যে জীবাত্মারই গুণ, ইহা বুঝাইতে জগদীশ পরে বলিয়াছেন,—"বুদ্ধ্যাদীনাং তদ্গুণত্বাভাবে তল্লিঙ্গবচনানুপপত্তেরিতি ভাবঃ।"

সুতরাং মহর্ষি গোতম প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে প্রমেয়রূপে ঈশ্বরেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ উক্তরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। এই স্থত্রে "লিঙ্গ" শব্দের লক্ষণ অর্থ এবং উহার সার্থকতাও বুঝা যায় না। মহর্ষি অন্যান্য পদার্থের লক্ষণ বলিতেও "লিঙ্গ" শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। "লিঙ্গ" শব্দের দ্বারা অনুমাপক হেতু বুঝা যায়। যদিও ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ আত্মার অনুমানে হেতু নহে, কিন্তু উহার দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় উহাকে আত্মার অনুমাপক বলা যায়। তাই অনুমাপক অর্থেই মহর্ষি এই স্থত্রে "লিঙ্গ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। তাই পূর্ব্বে অনুমানস্থত্র ভাষ্যে ভাষ্যকারও বলিয়াছেন,—"যথেচ্ছাদিভিরাত্মা"। কিরূপে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ আত্মার লিঙ্গ হয়, ইহাও ভাষ্যকার সেখানে বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের মতে "সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমানের দ্বারাই যে ইচ্ছাদি গুণের আধার আত্মা সিদ্ধ হয়, ইহা পূর্ব্বে (১৭৭ পৃঃ) বলিয়াছি। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মত-খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই মহর্ষির এই স্থত্রের দ্বারা চিরস্থায়ী নিত্য আত্মার অস্তিত্বের সাধক অনুমানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় 'অহং, মম' অর্থাৎ 'আমি ও আমার' এইরূপ বুদ্ধি বা বিজ্ঞান ব্যতীত অতিরিক্ত কোন আত্মা মানেন নাই। কিন্তু উক্তরূপ বিজ্ঞান আত্মা নহে। সুতরাং ভাষ্যকার উক্ত মতবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়কে **অনাত্মবাদী** বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহারা চিরস্থির নিত্য আত্মা মানিয়াছেন, তাঁহারাই **আত্মবাদী**।

ভাষ্যকার যথাক্রমে এই স্থত্রোক্ত ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞানকে চিরস্থায়ী নিত্য আত্মার লিঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, যজ্জাতীয় পদার্থের সন্নিকর্ষজন্য অর্থাৎ চক্ষুঃসন্নিকর্ষজন্য যজ্জাতীয় পদার্থের দর্শন করিয়া কোন আত্মা পূর্ব্বে সুখের উপলব্ধি করে, পরে তজ্জাতীয় পদার্থকে দর্শন করিলে সেই আত্মারই তাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা জন্মে। সেই যে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা, তাহার দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, সেই প্রথম দ্রষ্টা ও পরে ইচ্ছার কর্ত্তা আত্মা এক। কারণ, পরে সেখানে অনেকার্থদর্শী এক আত্মারই সেই দর্শনের প্রতিসন্ধান জন্মে। "প্রতিসন্ধান" শব্দের দ্বারা এখানে প্রত্যভিজ্ঞারূপ মানস প্রত্যক্ষই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বুঝা যায়। অর্থাৎ যে আমি পূর্ব্বে এই জাতীয় পদার্থকে দর্শন করিয়া সুখের উপলব্ধি করিয়াছিলাম,

সেই আমিই এখন ইহা দর্শন করিয়া গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছি,—এইরূপ মানস প্রত্যক্ষরূপ প্রতিসন্ধান হওয়ায় তদ্দ্বারা সেই ইচ্ছা পূর্ব্বাপরকাল-স্থায়ী আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক হয়। ভাষ্যকারের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে উদ্দ্যোতকরও প্রথমে বলিয়াছেন,—"তত্রেচ্ছাদীনাং প্রতিসন্ধান-মাত্মাস্তিত্ব-প্রতিপাদকং।" বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে,* সেই আত্মা তখন তাহার সেই দৃষ্ট পদার্থের সুখজনকত্বের অনুমান করিয়া তাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করে। সুতরাং তাহার সেই ইচ্ছা পূর্ব্বোৎপন্ন ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং সেই ব্যাপ্তির স্মরণ, পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান, (লিঙ্গপরামর্শ) অনুমান ও ইচ্ছা প্রভৃতির এককর্তৃকত্ব সূচনা করে। কারণ, ঐ সমস্ত বিভিন্নকর্তৃক হইলে উক্তরূপ প্রতিসন্ধান হইতে পারে না। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—"**নিয়তবিষয়ে হি বুদ্ধিভেদমাত্রে ন সম্ভবতি দেহান্তরবদিতি।**"

ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীর সম্মত যে বুদ্ধিভেদ অর্থাৎ 'অহং মম' এইরূপ বিজ্ঞানবিশেষ, তাহা নিয়তবিষয় অর্থাৎ তাহা বিষয়-বিশেষেরই জ্ঞাতা হইতে পারে, কিন্তু তাহা পরে বিদ্যমান না থাকায় পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বিষয়ে জ্ঞাতা হইতে পারে না। সুতরাং তাহাতে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিসন্ধান হইতে পারে না। কিন্তু বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতে "আলয়বিজ্ঞান" নামক বিজ্ঞানবিশেষের সন্তানই আত্মা, উহারই নাম চিত্ত। সেই বিজ্ঞানের সন্তানী অর্থাৎ প্রত্যেক বিজ্ঞান ক্ষণিক হইলেও উহার সেই সন্তানের স্থায়িত্ববশতঃ তাহাতে উক্তরূপ প্রতিসন্ধান হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে পারে। কারণ, সেই বিজ্ঞানসন্তানই তাহার পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয়ের স্মরণ করে। তাই ভাষ্যকার "**বুদ্ধিভেদমাত্রে**" এই পদে "মাত্র" শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন যে,† পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানের সমষ্টিরূপ যে সন্তান, তাহাও সেই

---

* "ইচ্ছায়া আত্ম-লিঙ্গত্বকথনপরং ভাষ্যং "যজ্জাতীয়স্যে"তি। যজ্জাতীয়স্যেতি ব্যাপ্তি-স্মৃতিকথনং। তজ্জাতীয়ং পশ্যন্নিতি পক্ষধর্ম্মোপনয়ঃ। তস্মাদয়ং সুখহেতুরিত্যনুমায়াদাতুমিচ্ছতি। সেয়মিচ্ছেদৃশী ব্যাপ্তিগ্রহণতৎস্মরণপক্ষধর্ম্মতাগ্রহণানুমানেচ্ছাদীনামেককর্তৃকত্বং সূচয়তি। ভেদে প্রতিসন্ধানাভাবেন তদনুপপত্তেঃ। তদিদমুক্ত"মেকস্যে"তি। যশ্চাসাবেকোঽনুভবিতা চ স্মর্ত্তা চানুমাতা চেষিতা চ স আত্মা।" তাৎপর্য্যটীকা।

† "নিয়তবিষয়" ইতি বুদ্ধিভেদস্য প্রতিসন্ধানমপাকরোতি। 'মাত্র'গ্রহণেন চ সন্তানং সন্তানিব্যতিরিক্তমপাকরোতি। তদভ্যুপগমে বা স এবাত্মেতি সিদ্ধং নঃ সমীহিতম্।"—'তাৎপর্য্যটীকা'।

বিজ্ঞানমাত্র অর্থাৎ প্রত্যেক বিজ্ঞান হইতে তাহা কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে। সুতরাং ক্ষণিকত্ববশতঃ প্রত্যেক বিজ্ঞানবিশেষে যখন উক্তরূপ প্রতিসন্ধান সম্ভব হয় না, তখন সেই বিজ্ঞানের সন্তানেও তাহা সম্ভব হইতে পারে না। আর যদি সেই প্রত্যেক বিজ্ঞান হইতে তাহার সেই সন্তানকে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়াই স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমাদিগের ন্যায় অতিরিক্ত আত্মাই স্বীকৃত হইবে।

ভাষ্যকার পরে দুঃখজনক পদার্থে আত্মার দ্বেষ এবং সুখজনক ও দুঃখজনক পদার্থে প্রযত্ন এবং সুখ ও দুঃখ কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসার পরে সংশয় ও পরে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানও যে, পূর্ব্বোক্তরূপে চিরস্থায়ী আত্মার লিঙ্গ হয়, ইহার ব্যাখ্যা করিয়া পরে বলিয়াছেন,—"**পূর্ব্বোক্ত এব হেতুঃ।**" অর্থাৎ যে আমি পূর্ব্বে সেই পদার্থকে দর্শন করিয়া দুঃখের অনুভব করিয়াছিলাম, সেই আমি তজ্জাতীয় পদার্থকে দর্শন করিয়া দ্বেষ করিতেছি—ইত্যাদিরূপে পরে সেই আত্মার যে প্রতিসন্ধান জন্মে, তদ্দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, সেই আত্মা পূর্ব্বাপরকালস্থায়ী এক। কারণ, একের অনুভূত বিষয় অন্য আত্মা স্মরণ করিতে পারে না। স্মরণ ব্যতীতও প্রত্যভিজ্ঞারূপ প্রতিসন্ধান হইতে পারে না।* সুতরাং বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের সম্মত ক্ষণিক বিজ্ঞানবিশেষে উক্তরূপ প্রতিসন্ধান হইতে পারে না। ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বাক্যে "**দেহান্তরবৎ**" এই পদের ব্যাখ্যা করিয়া ইহা বুঝাইয়াছেন।

ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, অনাত্মবাদীর অর্থাৎ ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতেও ভিন্ন ভিন্ন দেহে সেই সমস্ত বিজ্ঞানবিশেষের প্রতিসন্ধান হয় না। কারণ, এক দেহগত বিজ্ঞান হইতে অন্য দেহগত বিজ্ঞান ভিন্ন পদার্থ

---

* "ন্যায়বার্ত্তিকে" উদ্দ্যোতকর উক্ত বিষয়ে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সমাধানের খণ্ডন করিতে বহু বিচারপূর্ব্বক বলিয়াছেন,—"বিশেষিতঞ্চৈতৎ প্রতিসন্ধানং স্মৃত্যা সহ পূর্ব্বাপরপ্রত্যয়ৈকবিষয়ত্বেন প্রতিসন্ধানং, সাচ স্মৃতির্ভবৎপক্ষেঽনুপপন্না কস্মাৎ? অন্যেনানুভূতস্যান্যেনাস্মরণাৎ"। অর্থাৎ ইচ্ছাদি উৎপন্ন হইলে পরে পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের স্মরণের সহিত পূর্ব্বজাত জ্ঞান ও পরজাত জ্ঞানের একবিষয়ত্বরূপে যে প্রতিসন্ধান জন্মে, তাহাই পূর্ব্বাপরকালস্থায়ী আত্মার অনুমানে ব্যতিরেকী হেতু। টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র সেই অনুমানের আকার বলিয়াছেন,—"স্মৃতিঃ পূর্ব্বাপর-প্রত্যয়াভ্যামেককর্ত্তৃকা, উভাভ্যাং সহ একবিষয়ত্বেন প্রতিসন্ধীয়মানত্বাৎ। যা পুনর্নাভ্যা-মেককর্ত্তৃকা, সা ন তথা প্রতিসন্ধীয়তে, যথা দেবদত্তস্য স্মৃতির্যজ্ঞদত্তপ্রত্যয়াভ্যাং, ন তিয়ং ন তথা, তস্মাত্তথেতি।" উদ্দ্যোতকর পরে অন্বয় দৃষ্টান্তও গ্রহণ করিয়া উক্ত বিষয়ে অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমানই প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন, "অথবা অন্বয়েনাস্তঃ সূত্রার্থোঽভিধীয়তে।" ইত্যাদি।

বলিয়া এক বিজ্ঞানের অনুভূত বিষয় অন্য বিজ্ঞান স্মরণ করিতে পারে না। তাহা হইলে তুল্য ন্যায়ে একদেহগত যে সমস্ত বিজ্ঞানবিশেষ, তাহাও পরস্পর ভিন্ন বলিয়া এক দেহেও এক বিজ্ঞানের অনুভূত বিষয় অন্য বিজ্ঞান স্মরণ করিতে না পারায় তাহার প্রতিসন্ধান হইতে পারে না। কারণ, একদেহগত বিজ্ঞান-সমূহের কোন বিশেষ নাই। তাহারাও ভিন্ন ভিন্ন দেহগত বিজ্ঞানসমূহের ন্যায় পরস্পর ভিন্ন পদার্থ। কিন্তু স্বয়ংদৃষ্ট পদার্থেরই স্মরণ হয়, অন্য কর্তৃক দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট পদার্থের স্মরণ হয় না, ইহাই 'এক সত্বে'র অর্থাৎ এক আত্মার পক্ষে সমাচার বা সিদ্ধান্ত আছে। এইরূপ অন্য কর্তৃক দৃষ্ট বিষয় অন্য কেহ স্মরণ করিতে পারে না, ইহাই 'নানাসত্ব' অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন আত্মার পক্ষে সমাচার বা সিদ্ধান্ত আছে। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী উক্ত উভয় সিদ্ধান্তের ব্যবস্থাপন করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহার মতে প্রত্যেক জীবদেহেই ক্ষণিক বিজ্ঞানবিশেষরূপ আত্মা প্রতি ক্ষণে ভিন্ন। তন্মধ্যে একের অনুভূত বিষয় অন্য আত্মাই স্মরণ করে ইহা বলিলে উক্ত সিদ্ধান্ত-হানি হইবে। কিন্তু তিনিও উক্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে বাধ্য। নচেৎ তাঁহার মতে সেই বিজ্ঞানবিশেষরূপ আত্মা অন্য দেহগত বিজ্ঞানবিশেষরূপ আত্মার দৃষ্ট বিষয় স্মরণ করে না কেন?—ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী নিজে যাহা কখনও অনুভব করেন নাই, এমন অন্যের অনুভূত বিষয় স্মরণ করেন না কেন?

পরে বসুবন্ধু ও দিঙনাগ প্রভৃতি বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্যগণ সূক্ষ্ম বিচার করিয়া উক্ত মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মতে এক দেহগত সেই সমস্ত বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে কার্য্যকারণ ভাব সম্বন্ধ থাকায় অন্য দেহগত বিজ্ঞান-সমূহ হইতে তাহার বিশেষ আছে। একদেহগত সেই সমস্ত বিজ্ঞানবিশেষের সন্তানরূপ চিত্তপ্রবাহই সেই দেশের পক্ষে আত্মা। সেই আত্মা জন্মান্তরে ও তাহার পূর্ব্বজন্মে অনুভূত বিষয়ের স্মরণ করিতে পারে। কিন্তু উক্ত বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের প্রবল প্রতিবাদী উদ্দ্যোতকর "ন্যায়বার্ত্তিকে" নানা স্থানে তাঁহাদিগের কথার উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করিয়া বিচার দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। পরে বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতিও সেই সমস্ত বিচারের ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহাদিগের কথার খণ্ডন করিয়াছেন। সংক্ষেপে সে সমস্ত বিচার ব্যক্ত করা যায় না। উক্ত বিজ্ঞান-বাদের ব্যাখ্যায় বসুবন্ধুর মতে বিশেষও আছে। বসুবন্ধুর "বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি" প্রভৃতি গ্রন্থ এবং স্থিরমতিকৃত ভাষ্য বুঝিলে তাহা বুঝা যাইবে। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা পঞ্চম খণ্ডে (১৫৮-৮০ পৃঃ) দ্রষ্টব্য ॥ ১০ ॥

ভাষ্য। তস্য ভোগাধিষ্ঠানম্—

অনুবাদ—সেই আত্মার ভোগের অর্থাৎ সুখ-দুঃখানুভবের অধিষ্ঠান (স্থান)—

সূত্র। চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—চেষ্টার আশ্রয় এবং ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় এবং অর্থের (সুখ-দুঃখের) আশ্রয় শরীর। (অর্থাৎ চেষ্টাশ্রয়ত্ব, ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব ও অর্থাশ্রয়ত্ব, এই তিনটি শরীরের লক্ষণ)।

ভাষ্য। কথং চেষ্টাশ্রয়ঃ? ঈপ্সিতং জিহাসিতং বাঽর্থমধিকৃত্য ঈপ্সা-জিহাসা-প্রযুক্তস্য তদুপায়ানুষ্ঠানলক্ষণা সমীহা চেষ্টা, সা যত্র বর্ততে, তচ্ছরীরম্। কথমিন্দ্রিয়াশ্রয়ঃ? যস্যানুগ্রহেণানুগৃহীতানি উপঘাতে চোপহতানি স্ববিষয়েষু সাধ্বসাধুষু প্রবর্ত্তন্তে, স এষামাশ্রয়স্তচ্ছরীরম্। কথমর্থাশ্রয়ঃ? যস্মিন্নায়তনে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাদুৎপন্নয়োঃ সুখদুঃখয়োঃ প্রতিসংবেদনং প্রবর্ত্ততে, স এষামাশ্রয়স্তচ্ছরীরমিতি।

অনুবাদ—(পূর্ব্বপক্ষ) চেষ্টাশ্রয় কিরূপে? (অর্থাৎ ক্রিয়ারূপ চেষ্টা শরীর ভিন্ন পদার্থেও থাকে, আবার কোন শরীরবিশেষেও থাকে না, সুতরাং চেষ্টাশ্রয়ত্ব শরীরের লক্ষণ বলা যায় না)। (উত্তর) প্রাপ্তির ইচ্ছার বিষয়ীভূত অথবা পরিত্যাগের ইচ্ছার বিষয়ীভূত পদার্থকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রাপ্তির ইচ্ছা বা পরিত্যাগের ইচ্ছাবশতঃ "প্রযুক্ত" অর্থাৎ কৃতযত্ন ব্যক্তির তাহার (প্রাপ্তি বা পরিহারের) উপায়ানুষ্ঠানরূপ সমীহা 'চেষ্টা'; তাহা যেখানে থাকে, তাহা "শরীর"। (পূর্ব্বপক্ষ) 'ইন্দ্রিয়াশ্রয়' কিরূপে? অর্থাৎ ঘটাদি দ্রব্যে চক্ষুঃসংযোগকালে সেই সমস্ত দ্রব্যও ইন্দ্রিয়াশ্রয় হয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব শরীরের লক্ষণ বলা যায় না। (উত্তর) যাহার অনুগ্রহের দ্বারা অনুগৃহীত অর্থাৎ যাহার সত্তাবশতঃ সত্তাবিশিষ্ট এবং যাহার বিনাশে বিনষ্ট হয়, এমন (ইন্দ্রিয়বর্গ) সাধু ও অসাধু নিজবিষয়সমূহে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ যথাক্রমে গন্ধাদি বিষয়ের গ্রাহক হয়, সেই পদার্থ এই ইন্দ্রিয়বর্গের আশ্রয়,—তাহা শরীর। (পূর্ব্বপক্ষ) 'অর্থাশ্রয়' কিরূপে? অর্থাৎ ঘটাদি দ্রব্য ও গন্ধাদি অর্থের আশ্রয় হওয়ায় অর্থাশ্রয়ত্ব

শরীরের লক্ষণ বলা যায় না। (উত্তর) যে অধিষ্ঠানে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষহেতুক উৎপন্ন সুখ ও দুঃখের অনুভব জন্মে, সেই পদার্থ এই সুখ-দুঃখরূপ অর্থসমূহের আশ্রয়,—তাহা শরীর।

টিপ্পনী—আত্মার পরে ক্রমানুসারে এই সূত্রের দ্বারা দ্বিতীয় প্রমেয় শরীরের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। ভাষ্যকার প্রথমে "তস্য ভোগাধিষ্ঠানং" এই বাক্যের দ্বারা শরীরই আত্মার সুখদুঃখ ভোগের স্থান অর্থাৎ শরীরাবচ্ছেদেই জীবাত্মার সুখ দুঃখ ভোগ হয়, সুতরাং শরীর ব্যতীত তাহা হইতে পারে না, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া আত্মার পরে শরীরের লক্ষণই বক্তব্য, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা শরীরের তিনটি লক্ষণ বলিয়াছেন,—(১) চেষ্টাশ্রয়ত্ব, (২) ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব, (৩) অর্থাশ্রয়ত্ব। ক্রিয়া মাত্রই "চেষ্টা" শব্দের অর্থ হইলে চেষ্টাশ্রয়ত্ব শরীরের লক্ষণ বলা যায় না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, হিতপ্রাপ্তি ও অহিত পরিহারের ইচ্ছাবশতঃ যত্নবান্ জীবের তাহার উপায়ের অনুষ্ঠানরূপ যে সমীহা, তাহাকে বলে চেষ্টা। তাহা হইলে কোন চেতনের প্রযত্নজন্য উক্তরূপ ক্রিয়াবিশেষই চেষ্টা, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং ঘটাদি পদার্থে উহা নাই, উহা জীবের শরীরেরই ধর্ম্ম। শরীরবিশেষে উহা না থাকিলেও উহার যোগ্যতা আছে। বৃক্ষাদিতেও উহা আছে।* ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব দ্বিতীয় লক্ষণ। "ইন্দ্রিয়াশ্রয়" বলিতে ইন্দ্রিয়সংযুক্ত বা যে কোন সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের অধিকরণ নহে। কিন্তু শরীরের সত্তাপ্রযুক্তই তাহাতে ইন্দ্রিয়ের সত্তা এবং শরীরের বিনাশ হইলে ইন্দ্রিয়ও অবশ্য বিনষ্ট হয়, এ জন্য শরীর ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়।

* বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ, "ন্যায়কন্দলী"কার শ্রীধর ভট্ট, "তাৎপর্য্যটীকা"কার বাচস্পতি মিশ্র, "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্ট এবং "ন্যায়বিন্দু"কার বৌদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রভৃতির মতে বৃক্ষাদি শরীর নহে। কিন্তু "কিরণাবলী" টীকায় উদয়নাচার্য্য বৃক্ষাদিরও জীবনমরণাদি সমর্থন করিয়া সজীবত্ব সমর্থন করিয়াছেন। "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী"তে বিশ্বনাথও উক্ত মতই সমর্থন করিয়াছেন। জৈনসম্প্রদায়ও স্থাবর জীব স্বীকার করিয়া, তাহাদিগের ত্বক্ই একমাত্র ইন্দ্রিয় বলিয়াছেন। জৈন দার্শনিক উমাস্বামী বলিয়াছেন,—"পৃথিব্যপ্তেজোবায়ু-বনস্পতয়ঃ" ("তত্ত্বার্থসূত্র", ২।১৩)। বস্তুতঃ বৃক্ষাদির সজীবত্ব ও সুখদুঃখাদি শাস্ত্রসিদ্ধ। ছান্দোগ্য উপনিষদেও (৬।১১।১) ইহা বর্ণিত হইয়াছে। মনুও স্পষ্ট বলিয়াছেন,—"অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ।" (১।৪৯)। মনু পরে বলিয়াছেন,—"শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ" (১২।৯) অর্থাৎ শারীরিক পাপবিশেষের ফলেই মনুষ্য স্থাবরজন্ম লাভ করে। কিন্তু বাচিক পাপবিশেষের ফলে যে নিকৃষ্ট বৃক্ষজন্ম লাভ হয়, ইহাও শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। "গুরুং ত্বংকৃত্য হুংকৃত্য…শ্মশানে জায়তে বৃক্ষঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রবচন দ্রষ্টব্য।

সুতরাং উক্তরূপ অর্থে 'ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব' শরীরের লক্ষণ বলা যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, "চক্ষুষ্মান্ দেবদত্তোঽয়ং" ইত্যাদি প্রতীতিবশতঃ দেবদত্তাদি-শরীর যে চক্ষুরিন্দ্রিয়বিশিষ্ট, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং সেই শরীরে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের "অবচ্ছেদকতা" নামক স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ স্বীকার্য্য। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সেই বিলক্ষণ স্বরূপ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ত্বই শরীরের দ্বিতীয় লক্ষণ। 'অর্থাশ্রয়ত্ব'ই শরীরের তৃতীয় লক্ষণ। অর্থ শব্দের দ্বারা এখানে মহর্ষি-কথিত চতুর্থ প্রমেয় গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থ বুঝা যায় না। কিন্তু সেই গন্ধাদি অর্থপ্রযুক্ত জীবদেহে আত্মাতে যে সুখ ও দুঃখ জন্মে, তাহাতেই উক্ত "অর্থ" শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। যেমন "অন্নং বৈ প্রাণিনঃ প্রাণাঃ" এই শ্রুতিবাক্যে অন্নসাধ্য অর্থে "অন্ন" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। শরীর না থাকিলে আত্মাতে সুখ দুঃখ জন্মে না, এবং শরীরাবচ্ছেদেই আত্মাতে সেই সুখ দুঃখের মানস প্রত্যক্ষরূপ অনুভব জন্মে। সুতরাং জীবের শরীরই তাহার সুখ দুঃখ ও তাহার অনুভবের অবচ্ছেদক। তাহা হইলে অবচ্ছেদকতা সম্বন্ধে সুখ-দুঃখরূপ অর্থের আশ্রয়ত্ব শরীরের লক্ষণ বলা যায়॥ ১১॥

ভাষ্য। ভোগসাধনানি পুনঃ,—

অনুবাদ—আর ভোগসাধন অর্থাৎ সুখদুঃখভোগের পরম্পরায় সাধন—

সূত্র। ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্রাণীন্দ্রিয়াণি ভূতেভ্যঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ভূতবর্গজন্য অর্থাৎ যথাক্রমে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতমূলক ঘ্রাণ, রসন, চক্ষুঃ, ত্বক্ ও শ্রোত্র ইন্দ্রিয়।

ভাষ্য। জিঘ্রত্যনেনেতি ঘ্রাণং গন্ধং গৃহ্লাতীতি। রসয়ত্যনেনেতি রসনং, রসং গৃহ্লাতীতি। চষ্টেঽনেনেতি চক্ষুঃ, রূপং পশ্যতীতি। ত্বক্‌স্থানমিন্দ্রিয়ং ত্বক্, তদুপচারঃ স্থানাদিতি। শৃণোত্যনেনেতি শ্রোত্রং, শব্দং গৃহ্লাতীতি। এবং সমাখ্যানির্ব্বচন-সামর্থ্যাদ্‌বোধ্যং স্ববিষয়গ্রহণলক্ষণানীন্দ্রিয়াণীতি। ভূতেভ্য ইতি নানাপ্রকৃতীনামেষাং সতাং বিষয়নিয়মো নৈকপ্রকৃতীনাং, সতি চ বিষয়নিয়মে স্ববিষয়গ্রহণলক্ষণত্বং ভবতীতি।

অনুবাদ—'জিঘ্রতি অনেন' এইরূপ ব্যুৎপত্তিবশতঃ ইহার দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে, এ জন্য "ঘ্রাণ" অর্থাৎ গন্ধগ্রাহক ইন্দ্রিয়ই 'ঘ্রাণ' নামক ইন্দ্রিয়। 'রসয়তি অনেন' এইরূপ ব্যুৎপত্তিবশতঃ ইহার দ্বারা রস গ্রহণ করে, এ জন্য "রসন" অর্থাৎ রসগ্রাহক ইন্দ্রিয়ই 'রসন' নামক ইন্দ্রিয়। 'চষ্টেঽনেন' এইরূপ ব্যুৎপত্তিবশতঃ ইহার দ্বারা রূপ দর্শন করে, এ জন্য চক্ষুঃ, অর্থাৎ 'চক্ষ' ধাতুর অর্থ এখানে রূপদর্শন, রূপদর্শনের সাধন ইন্দ্রিয়ই চক্ষুরিন্দ্রিয়। 'ত্বক্‌স্থান' অর্থাৎ চর্ম্ম যাহার স্থান বা আধার, এমন ইন্দ্রিয় ত্বক্, স্থানবশতঃ তাহাতে 'উপচার' হইয়াছে। অর্থাৎ চর্ম্মই 'ত্বচ্' শব্দের মুখ্য অর্থ হইলেও সেই চর্ম্মস্থ ইন্দ্রিয়বিশেষে "ত্বচ্" শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ হইয়াছে। কারণ, চর্ম্ম সেই ইন্দ্রিয়ের স্থান বা আধার। 'শৃণোতি অনেন' এইরূপ ব্যুৎপত্তিবশতঃ ইহার দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, এ জন্য শ্রোত্র অর্থাৎ শব্দের গ্রাহক ইন্দ্রিয়ই 'শ্রোত্র' নামক ইন্দ্রিয়। এইরূপ সমাখ্যার অর্থাৎ ঘ্রাণাদি পাঁচটি সংজ্ঞার নির্ব্বচনসামর্থ্য-বশতঃ ইন্দ্রিয়বর্গ নিজবিষয়গ্রহণলক্ষণ, ইহা বুঝা যায় অর্থাৎ যথাক্রমে গন্ধাদি স্ব স্ব বিষয়ের প্রত্যক্ষসাধনত্বই ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের লক্ষণ। 'নানাপ্রকৃতি' অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতরূপ ভিন্ন ভিন্ন উপাদানমূলক হইলেই এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ব্যবস্থা হয়, 'একপ্রকৃতি' অর্থাৎ কোন একমাত্র উপাদানসম্ভূত হইলে ইহাদিগের বিষয়ব্যবস্থা হয় না (অর্থাৎ তাহা হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই সমস্ত বিষয়ের গ্রাহক হইতে পারে)। বিষয়ব্যবস্থা হইলেই স্ববিষয়গ্রহণলক্ষণত্ব হয় অর্থাৎ তাহা হইলেই নিজ নিজ বিষয়ের গ্রাহকত্বই সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ বলা যায়, এ জন্যে (সূত্রে) "ভূতেভ্যঃ" এই পদ উক্ত হইয়াছে।

টিপ্পনী—শরীরের পরে তৃতীয় প্রমেয় ইন্দ্রিয়ের নিরূপণ কর্ত্তব্য। মহর্ষি গোতমের মতে মন ইন্দ্রিয় হইলেও উহাকে তিনি পৃথক্‌ভাবে ষষ্ঠ প্রমেয় বলিয়াছেন। এই সূত্রে ইন্দ্রিয়মধ্যে মনের অনুল্লেখের হেতু ভাষ্যকার পূর্ব্বেই চতুর্থ সূত্র-ভাষ্যশেষে ব্যক্ত করিয়াছেন। ফলকথা, মহর্ষি ঘ্রাণাদি পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়কেই তৃতীয় প্রমেয় বলিয়াছেন। ভাষ্যকার এই সূত্রের অবতারণা করিতে "ভোগসাধনানি" এই বাক্যের দ্বারা উক্ত পঞ্চেন্দ্রিয়ের সামান্যলক্ষণও সূচনা করিয়াছেন। শরীর জীবের সুখদুঃখ ভোগের স্থান। ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় তাহার সাধন। মনই সেই ভোগের সাক্ষাৎ সাধন হইলেও ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় তাহার পরম্পরায় সাধন হয়। বাচস্পতি মিশ্র এই ভাবেই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার এই সূত্রোক্ত ঘ্রাণাদি শব্দের ব্যুৎপত্তির ব্যাখ্যা

করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যদিও এই সূত্রের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিভাগ অর্থাৎ বিশেষ নামকীর্ত্তনই হইয়াছে, তথাপি ঘ্রাণাদি শব্দের উক্তরূপ ব্যুৎপত্তির দ্বারা উহাদিগের বিশেষ লক্ষণও বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ গন্ধগ্রাহক ইন্দ্রিয়ত্ব, রসগ্রাহক ইন্দ্রিয়ত্ব ইত্যাদি পাঁচটি বিশেষ লক্ষণও ইহার দ্বারা সূচিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা সামান্য লক্ষণও সূচিত হইয়াছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, মহর্ষি ঘ্রাণাদিকে ইন্দ্রিয় বলিয়া প্রকাশ করায় ঘ্রাণ, রসন, চক্ষুঃ, ত্বক্ ও শ্রোত্র, ইহাদিগের অন্যতমত্বই বহিরিন্দ্রিয়ের সামান্য লক্ষণ, ইহা সূচিত হইয়াছে। ভাষ্যকার সূত্রোক্ত ত্বগিন্দ্রিয়ের বোধক "ত্বচ্" শব্দের ব্যুৎপত্তির ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, উপচারবশতঃ শরীরস্থ চর্ম্মে অবস্থিত যে স্পর্শগ্রাহক ইন্দ্রিয়, তাহাতেই উক্ত "ত্বচ্" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। বস্তুতঃ মহর্ষি নিজেই পরে উক্ত "উপচারে"র কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যকারও পরে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দ্বিতীয় আহ্নিকের চতুর্দ্দশ সূত্রভাষ্য এবং পরে দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় আহ্নিকের ৫৯ম সূত্রভাষ্য দ্রষ্টব্য।

সাংখ্যমতে "বুদ্ধি"র পরিণাম এক "অহঙ্কার" হইতে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়, এ জন্য ইন্দ্রিয়বর্গকে বলা হইয়াছে,—'আহঙ্কারিক'। কিন্তু মহর্ষি গোতমের মতে ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় 'ভৌতিক'। অর্থাৎ যথাক্রমে পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতই উহার প্রকৃতি বা মূল। মহর্ষি তাঁহার এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেই এই সূত্রের শেষে বলিয়াছেন,—"ভূতেভ্যঃ।"* মহর্ষি পরে তৃতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্রিয়-পরীক্ষার বিচারদ্বারা সাংখ্যমত খণ্ডনপূর্ব্বক তাঁহার ঐ নিজসিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে শেষে সংক্ষেপে মহর্ষির অভিমত যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন যে ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় যথাক্রমে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত-প্রকৃতি হইলেই

* মহর্ষি গোতমের মতে কর্ণগোলকাবচ্ছিন্ন আকাশই শ্রবণেন্দ্রিয়। কিন্তু আকাশের মূল কোন পরমাণু নাই। আকাশ নিত্যপদার্থ ও এক। মহর্ষি পরে (৪।২।২২শ সূত্রে) আকাশকে বিভু বলিয়াই তাঁহার ঐ সিদ্ধান্তকে ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশ নামক পঞ্চম ভূত হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা বলা যায় না। তাই বাচস্পতি মিশ্র এখানে বলিয়াছেন,—"অত্র চ কর্ণশষ্কুলীসংযোগোপাধিনা শ্রোত্রস্য নভসঃ কথঞ্চিদ্ ভেদং বিবক্ষিত্বা 'ভূতেভ্য' ইতি পঞ্চম্যর্থো ব্যাখ্যাতঃ।" কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপাধি উৎপন্ন হইলেও শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্বরূপকে আকাশ হইতে উৎপন্ন বলা যায় না। সূত্রে "ভূতেভ্যঃ" এই পদে পঞ্চমী বিভক্তির প্রযোজ্যত্ব অর্থ বুঝিলে উপপত্তি হইতে পারে। কারণ, শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশজন্য না হইলেও আকাশপ্রযোজ্য। কারণ, পঞ্চম ভূত আকাশের সত্তা ব্যতীত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সত্তা সিদ্ধ হয় না। পরে এ বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যাইবে।

উহাদিগের বিষয়ব্যবস্থার উপপত্তি হয়। "অহঙ্কার" নামক একপ্রকৃতি হইলে তাহার উপপত্তি হয় না। কারণ, তাহা হইলে রূপাদিও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয় বা গ্রাহ্য হইতে পারে এবং গন্ধাদিও অন্য ইন্দ্রিয়ের বিষয় বা গ্রাহ্য হইতে পারে। সাংখ্যমতে উপাদান-কারণ ও তাহার কার্য্য অভিন্ন। সুতরাং যে "অহঙ্কার" হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়, সেই অহঙ্কার হইতেই অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হওয়ায় সমস্ত ইন্দ্রিয়ই তাহার মূল অহঙ্কারাত্মক। সুতরাং সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই সমস্ত বিষয়গ্রহণে সামর্থ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু ঘ্রাণেন্দ্রিয় কেবল গন্ধ-গ্রহণেই সমর্থ, রূপাদি গ্রহণে সমর্থ নহে, ইত্যাদিরূপে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের যে বিষয়নিয়ম আছে, ইহা সর্ব্বসম্মত। তাই ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন,—**"সতি চ বিষয়নিয়মে স্ববিষয়গ্রহণলক্ষণত্বং ভবতীতি।"** নিজ নিজ বিষয়ের গ্রহণ বা প্রত্যক্ষ যাহাদিগের লক্ষণ অর্থাৎ লিঙ্গ বা অনুমাপক, এই অর্থে উক্ত ইন্দ্রিয়বর্গকে "স্ববিষয়গ্রহণলক্ষণ" বলা যায়। বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় অতীন্দ্রিয়। সুতরাং নিজ নিজ বিষয়ের গ্রহণ বা প্রত্যক্ষের কারণত্বরূপেই উহা অনুমেয়। তাহা হইলে গন্ধাদি নিজ নিজ বিষয়ের প্রত্যক্ষসাধনত্বই ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সামান্য লক্ষণ বলা যায়। ভাষ্যকারের ঐ শেষ কথার দ্বারা ইহাও ব্যক্ত হইয়াছে। আর সূত্রোক্ত ঘ্রাণাদি শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রকাশের দ্বারা উক্ত পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিশেষ লক্ষণও ব্যক্ত হইয়াছে। উক্ত ঘ্রাণাদি শব্দ পঙ্কজাদি শব্দের ন্যায় যোগরূঢ় ॥ ১২ ॥

ভাষ্য। কানি পুনরিন্দ্রিয়কারণানি ?

অনুবাদ—(প্রশ্ন) ইন্দ্রিয়বর্গের কারণ অর্থাৎ মূলভূতসমূহ কি ? (উত্তর)

সূত্র। পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশমিতি ভূতানি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, এই সমস্ত অর্থাৎ এই পঞ্চ দ্রব্য ভূতবর্গ।

ভাষ্য। সংজ্ঞাশব্দৈঃ পৃথগুপদেশো ভূতানাং বিভক্তানাং সুবচং কার্য্যং ভবিষ্যতীতি।

অনুবাদ—বিভক্ত ভূতবর্গের কার্য্য সুবচ হইবে, অর্থাৎ সহজে বলা যাইবে, এ জন্য সংজ্ঞাশব্দগুলির দ্বারা (ভূতবর্গের) পৃথক্ উপদেশ করিয়াছেন।

টিপ্পনী—পূর্ব্বসূত্রে ইন্দ্রিয়ের কারণরূপে ভূতবর্গের উপদেশ করিলেও ভূতবর্গের বিশেষ সংজ্ঞাগুলি বলা হয় নাই। তাই মহর্ষি পরে ভূতবর্গের বিশেষ বিশেষ কার্য্য যাহা বলিবেন, তাহা সুখবোধ্য করিবার জন্য এই প্রমেয়-লক্ষণ-প্রকরণেও এই সূত্রের দ্বারা ভূতবর্গের সংজ্ঞাগুলি বলিয়াছেন। বার্ত্তিককার এই সূত্রের ও ভাষ্যের কোন উল্লেখ না করায় অনেকে বলেন, এইটি সূত্র নহে। "কানি পুনরিন্দ্রিয়কারণানি" এইরূপ প্রশ্ন করিয়া, ভাষ্যকার নিজেই তাহার উত্তরবাক্য বলিয়াছেন অর্থাৎ ঐ অংশ সমস্তই ভাষ্য। কিন্তু শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার "ন্যায়সূচীনিবন্ধ" গ্রন্থে এইটিকে সূত্রমধ্যেই গ্রহণ করিয়া, ন্যায়সূত্রের ৫২৮ সংখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন। "সংজ্ঞাশব্দৈঃ পৃথগুপদেশঃ" ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা ইহার প্রয়োজন কথিত হওয়ায় ভাষ্যকারের মতেও এইটি সূত্র বলিয়াই বুঝা যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এইটিকে সূত্ররূপেই গ্রহণ করিয়াছেন ॥১৩॥

ভাষ্য। ইমে তু খলু—

অনুবাদ—এই সমস্তই অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ সূত্রোক্ত—

সূত্র। গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণাস্তদর্থাঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—পৃথিব্যাদির গুণ (পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ ভূতের গুণ) গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ, "তদর্থ" (ইন্দ্রিয়ার্থ)।

ভাষ্য। পৃথিব্যাদীনাং যথাবিনিয়োগং গুণা ইন্দ্রিয়াণাং যথাক্রমমর্থা বিষয়া ইতি।

অনুবাদ—পৃথিবী প্রভৃতির ব্যবস্থানুসারে গুণসমূহ অর্থাৎ পঞ্চ ভূতের মধ্যে যাহার যে যে গুণ ব্যবস্থিত আছে, সেই গুণসমূহ (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ) যথাক্রমে ইন্দ্রিয়বর্গের অর্থ—কি না বিষয়।

টিপ্পনী—ইন্দ্রিয়ের পরে চতুর্থ প্রমেয় "অর্থ"। বৈশেষিকদর্শনে মহর্ষি কণাদ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম, এই পদার্থত্রয়ের সংজ্ঞা বলিয়াছেন,—"অর্থ"। কিন্তু মহর্ষি গোতমোক্ত চতুর্থ প্রমেয় যে অর্থ, তাহা ইন্দ্রিয়ার্থ, ইহা প্রকাশ করিতেই তিনি এই সূত্রে বলিয়াছেন,—"তদর্থাঃ"। "তেষামিন্দ্রিয়াণামর্থা বিষয়াস্তদর্থাঃ।" যথাক্রমে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ, এই পঞ্চ গুণই ইন্দ্রিয়ার্থ। ঐ তাৎপর্য্যে মহর্ষি কণাদও বলিয়াছেন,—"প্রসিদ্ধা

ইন্দ্রিয়ার্থাঃ" (৩।১।১)। এই সূত্রে "পৃথিব্যাদিগুণাঃ" এই পদে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসই ভাষ্যকারের সম্মত। উক্ত পদের দ্বারা পৃথিব্যাদি গুণী দ্রব্য এবং তাহার গুণ যে ভিন্ন পদার্থ, ইহাই সূচিত হইয়াছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও ইহাই সূচিত হইয়াছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও ইহাই বলিয়াছেন। গন্ধাদি পঞ্চ গুণই পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতের গুণ নহে। গোতমের মতে উহার মধ্যে গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ পৃথিবীর গুণ; রস, রূপ ও স্পর্শ জলের গুণ; রূপ ও স্পর্শ তেজের গুণ; স্পর্শ বায়ুর গুণ; শব্দ কেবল আকাশের গুণ। তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে অর্থ-পরীক্ষায় মহর্ষি বিচারপূর্ব্বক উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার উক্ত পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"পৃথিব্যাদীনাং যথাবিনিয়োগং গুণাঃ।" কিন্তু বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর এখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "পৃথিব্যাদয়শ্চ গুণাশ্চ" এইরূপ বিগ্রহে উক্ত পদে দ্বন্দ্ব সমাসই মহর্ষির অভিপ্রেত। উক্ত "পৃথিব্যাদি" শব্দের দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষিতি, জল ও তেজ এবং "গুণ" শব্দের দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অন্যান্য সমস্ত গুণই বুঝিতে হইবে। কারণ, সেই সমস্তও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া ইন্দ্রিয়ার্থ। সুতরাং ইন্দ্রিয়ার্থ বলিতে সেই সমস্তও মহর্ষির বক্তব্য। কেবল গন্ধাদি পঞ্চ গুণকেই তিনি ইন্দ্রিয়ার্থ বলিতে পারেন না। উদ্দ্যোতকর ইহা সমর্থন করিতে পরে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে "দর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণাৎ" এই সূত্রে ঘটাদি পদার্থকেও "অর্থ" শব্দের দ্বারা উল্লেখ করায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থমাত্রই যে, তাঁহার মতে "অর্থ," ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

কিন্তু উদ্দ্যোতকর তাঁহার উক্তরূপ ব্যাখ্যার সমর্থন করিতে বহু কথা বলিলেও সূত্রকার মহর্ষির উক্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। কারণ, মহর্ষি পরে তৃতীয় অধ্যায়ে অর্থপরীক্ষায় এই সূত্রোক্ত গন্ধাদি পঞ্চ গুণেরই পরীক্ষা করিয়াছেন। সুতরাং তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ণিত প্রমেয়পদার্থের অন্তর্গত চতুর্থ প্রমেয় যে "অর্থ", তাহা গন্ধাদি পঞ্চ গুণ। সেই অর্থে উক্ত "অর্থ" শব্দটি পারিভাষিক। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম সূত্রে তিনি সেই পারিভাষিক "অর্থ" শব্দের প্রয়োগ করেন নাই; কিন্তু বস্তুমাত্রবোধক "অর্থ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুমাত্রকেই মহর্ষি চতুর্থ প্রমেয় "অর্থ" বলিলে এই সূত্রে আরও অনেক পদার্থের উল্লেখ কর্ত্তব্য, ইহাও বুঝা আবশ্যক। বস্তুতঃ গন্ধাদি পঞ্চ গুণের তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার অপবর্গের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া মহর্ষি বিশেষ করিয়া প্রমেয়মধ্যে "অর্থ" নামে উক্ত পঞ্চ গুণেরই উল্লেখ

করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকারও প্রথমে এই সূত্রের অবতারণায় "ইমে তু খলু" এই বাক্যে "তু" শব্দের দ্বারা অন্যান্য অর্থের ব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন। "তাৎপর্য্যটীকা"কার বাচস্পতি মিশ্রও সেখানে উক্ত "তু" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্যই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ গন্ধাদি পঞ্চ গুণই প্রাচীন কালে "ইন্দ্রিয়ার্থ" বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তাই বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদও উক্ত পঞ্চ গুণকেই গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন,—"প্রসিদ্ধা ইন্দ্রিয়ার্থাঃ" ॥১৪॥

ভাষ্য। অচেতনস্য করণস্য বুদ্ধের্জ্ঞানং বৃত্তিঃ, চেতনস্যাকর্ত্তুরুপলব্ধিরিতি যুক্তিবিরুদ্ধমর্থং প্রত্যাচক্ষাণক ইবেদমাহ।

অনুবাদ—অচেতন করণ বুদ্ধির (জড় অন্তঃকরণের) বৃত্তি (পরিণামবিশেষ) জ্ঞান. অকর্ত্তা চেতনের (পুরুষের) উপলব্ধি, অর্থাৎ অন্তঃকরণের জ্ঞান হয়, পুরুষের উপলব্ধি হয়, জ্ঞান ও উপলব্ধি ভিন্ন পদার্থ, এই যুক্তিবিরুদ্ধ অর্থ অর্থাৎ সাংখ্যসিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যানকারীর ন্যায় (মহর্ষি) এই সূত্রটি বলিয়াছেন।

সূত্র। বুদ্ধিরুপলব্ধির্জ্ঞানমিত্যনর্থান্তরম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—বুদ্ধি, উপলব্ধি, জ্ঞান, ইহা অর্থান্তর নহে, অর্থাৎ একই পদার্থ।

ভাষ্য। নাচেতনস্য করণস্য বুদ্ধের্জ্ঞানং ভবিতুমর্হতি, তদ্ধি চেতনং স্যাৎ, একশ্চায়ং চেতনো দেহেন্দ্রিয়সংঘাতব্যতিরিক্ত ইতি। প্রমেয়লক্ষণার্থস্য বাক্যস্যান্যার্থপ্রকাশনমুপপত্তিসামর্থ্যাদিতি।

অনুবাদ অচেতন করণ "বুদ্ধি"র অর্থাৎ জড় অন্তঃকরণের জ্ঞান হইতে পারে না। যেহেতু (তাহা হইলে) সেই অন্তঃকরণও চেতন হয়, [অর্থাৎ জ্ঞানাশ্রয় পদার্থই চেতন, সুতরাং অন্তঃকরণে জ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করিলে তাহাও চেতন পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়] কিন্তু দেহেন্দ্রিয়সংঘাত হইতে ভিন্ন এই চেতন এক। প্রমেয়লক্ষণার্থ বাক্যের অন্যার্থ-প্রকাশন অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "বুদ্ধি"নামক পঞ্চম প্রমেয়ের লক্ষণরূপ উদ্দেশ্যে কথিত এই সূত্রবাক্যের সাংখ্যমতনিষেধরূপ অন্যার্থপ্রকাশকত্ব উপপত্তির সামর্থ্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ যুক্তির সামর্থ্যবশতঃই এই সূত্রের দ্বারা উক্ত সাংখ্যমতও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

টিপ্পনী—মহর্ষি গোতমের মতে জন্য জ্ঞান জীবাত্মারই বিশেষ গুণ। কারণ, উহা জীবাত্মাতেই জন্মে। ঐ জন্য জ্ঞানই "বুদ্ধি" নামক পঞ্চম প্রমেয়।

পূর্ব্বোক্ত জীবাত্মা এবং তাহার শরীর, ইন্দ্রিয় ও গন্ধাদি অর্থ সেই বুদ্ধির কারণ। সুতরাং সেই প্রমেয়চতুষ্টয়ের নিরূপণপূর্ব্বক মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা "বুদ্ধির নিরূপণ করিতে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান একই পদার্থ অর্থাৎ ঐ তিনটী একার্থক পর্য্যায় শব্দ। জ্ঞান সর্ব্বজীবের প্রসিদ্ধ পদার্থ। সুতরাং যাহাকে জ্ঞান বলে অর্থাৎ যাহা অনুভবসিদ্ধ জ্ঞানত্বরূপ জাতিবিশিষ্ট, তাহা বুদ্ধি, ইহা বলিলে বুদ্ধির লক্ষণ বলা হয়। সেই বুদ্ধিরই নামান্তর উপলব্ধি। 'জ্ঞা' ধাতু এবং 'বুধ' ধাতু ও উপপূর্ব্বক 'লভ' ধাতু সমানার্থ। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, উক্তরূপে প্রসিদ্ধ পর্য্যায় শব্দের দ্বারাও পদার্থের লক্ষণ বলা যায়। ফলকথা, মহর্ষি গোতমের মতে জ্ঞানই বুদ্ধি ও উপলব্ধি; জ্ঞান, বুদ্ধি ও উপলব্ধি ভিন্ন পদার্থ নহে। যদিও পূর্ব্বোক্ত "বুদ্ধি" নামক প্রমেয়ের লক্ষণোদ্দেশ্যেই মহর্ষি এই সূত্রটি বলিয়াছেন, তাহা হইলেও ইহার দ্বারা যুক্তির সামর্থ্যবশতঃ সাংখ্যমতও নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার প্রথমে সাংখ্যমতের উল্লেখ করিয়া এবং তাহাকে যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া, এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন এবং উক্ত সাংখ্যমতের প্রত্যাখ্যান বা নিরাকরণই যে, এই সূত্রের প্রকৃত প্রয়োজন নহে, ইহা ব্যক্ত করিবার জন্যই পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যসন্দর্ভে "প্রত্যাচক্ষাণক ইব" এই স্থলে "ইব" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

সাংখ্যমতে বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান ভিন্ন পদার্থ। মূল প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বুদ্ধি, উহারই নাম অন্তঃকরণ। উহা জড় পদার্থ। তাই ভাষ্যকার উহাকে বলিয়াছেন,—অচেতন করণ। জ্ঞান ঐ বুদ্ধিরই পরিণামবিশেষ; সুতরাং বুদ্ধিরই ধর্ম্ম; উহা চেতন আত্মার ধর্ম্ম নহে। আত্মার কোন পরিণাম বা বিকার নাই, সুতরাং আত্মা অপরিণামী, অকর্ত্তা, নিত্য, চৈতন্যস্বরূপ। পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধি বা অন্তঃকরণে সেই আত্মা প্রতিবিম্বিত হওয়ায় সেই বুদ্ধিস্থ জ্ঞানের সহিত সেই আত্মার যে অবাস্তব সম্বন্ধ হয়, তাহাকে সেই আত্মার উপলব্ধি বলে। মহর্ষি তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে বিচারপূর্ব্বক উক্ত সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে উক্ত সাংখ্যমতের খণ্ডন করিতে সংক্ষেপে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি বা অন্তঃকরণে জ্ঞান জন্মে, ইহা বলিলে সেই অন্তঃকরণও চেতন পদার্থ হয়। কিন্তু দেহাদি ভিন্ন চেতন পদার্থ এক। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞান ও চৈতন্য একই পদার্থ; সুতরাং যাহাতে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে চেতন পদার্থই বলিতে হইবে। তাহা হইলে প্রত্যেক জীবদেহে অন্তঃকরণ এবং আত্মা, এই উভয়কেই চেতন বলিতে হয়। তাহা

হইলে অন্তঃকরণরূপ চেতন কর্তৃক জ্ঞাত বিষয় আত্মা জানিতে পারেন না। এবং একই দেহে উভয় চেতন পদার্থের মতভেদপ্রযুক্ত অনেক অনর্থ ঘটে। সুতরাং দেহাদি ভিন্ন একই চেতন পদার্থ স্বীকার্য্য। সুতরাং অন্তঃকরণে জ্ঞান জন্মে না, ইহাও স্বীকার্য্য। অবশ্য সাংখ্যমতে বুদ্ধি বা অন্তঃকরণে যে জ্ঞান জন্মে, তাহা সেই বুদ্ধিরই পরিণামবিশেষ, তাহা চৈতন্য পদার্থ নহে। চৈতন্য নিত্য পদার্থ এবং তাহাই পুরুষস্বরূপ। বুদ্ধিতে চৈতন্যরূপ সেই পুরুষের প্রতিবিম্ববশতঃ উহা অচেতন হইয়াও তখন চেতনের ন্যায় হয়। কিন্তু মহর্ষি গোতম ইহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে নিরাকার নির্ব্বিকার আত্মার প্রতিবিম্ব অসম্ভব। অন্য কোনরূপেও ঐ প্রতিবিম্বের ব্যাখ্যা করা যায় না। আত্মাতে জ্ঞানশক্তি আছে বলিয়াই উহা চৈতন্য ও চিতিশক্তি নামে কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ সেই চৈতন্যই আত্মা নহে। কিন্তু আত্মাতে উৎপন্ন বিশেষ গুণ জ্ঞানই তাহার চৈতন্য। সেই চৈতন্যের আশ্রয়ই চেতন। সুতরাং অচেতন অন্তঃকরণে সেই চৈতন্যরূপ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। জড়পদার্থের পরিণামবিশেষকেও জ্ঞান বলা যায় না। ॥ ১৫ ॥

ভাষ্য। স্মৃত্যনুমানাগম-সংশয়-প্রতিভা-স্বপ্নজ্ঞানোহাঃ সুখাদি-প্রত্যক্ষমিচ্ছাদয়শ্চ মনসো লিঙ্গানি। তেষু সৎসু ইয়মপি—

অনুবাদ—স্মৃতি, অনুমান, আগম (শব্দবোধ), সংশয়, “প্রতিভা”, (ইন্দ্রিয়াদি-নিরপেক্ষ জ্ঞানবিশেষ), স্বপ্নজ্ঞান’ “উহ” (তর্ক), সুখাদির প্রত্যক্ষ এবং ইচ্ছা প্রভৃতি মনের লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক। সেই সমস্ত লিঙ্গ থাকিতে ইহাও (অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ সূত্রোক্ত যুগপৎ জ্ঞানের অনুৎপত্তিও মনের লিঙ্গ)।

সূত্র। যুগপজ্‌জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্ ॥১৬॥

অনুবাদ—একই সময়ে জ্ঞানের অর্থাৎ বিজাতীয় নানা প্রত্যক্ষের অনুৎপত্তি, মনের লিঙ্গ (অনুমাপক)।

ভাষ্য। অনিন্দ্রিয়নিমিত্তাঃ স্মৃত্যাদয়ঃ করণান্তরনিমিত্তা ভবিতুমর্হন্তীতি। যুগপচ্চ খলু ঘ্রাণাদীনাং গন্ধাদীনাঞ্চ সন্নিকর্ষেষু সৎসু যুগপজ্‌জ্ঞানানি নোৎপদ্যন্তে। তেনানুমীয়তে, অস্তি তত্তদিন্দ্রিয়সংযোগি সহকারি নিমিত্তান্তরমব্যাপি, যস্যাহ-

সন্নিধের্নোৎপদ্যতে জ্ঞানং, সন্নিধেশ্চোৎপদ্যত ইতি। মনঃ-সংযোগানপেক্ষস্য হীন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষস্য জ্ঞানহেতুত্বে যুগপদুৎ-পদ্যেরন্ জ্ঞানানীতি।

অনুবাদ—"অনিন্দ্রিয়নিমিত্ত" অর্থাৎ ঘ্রাণাদি বহিরিন্দ্রিয় যাহাদিগের নিমিত্ত নহে, এমন "স্মৃতি" প্রভৃতি (পূর্ব্বোক্ত স্মৃতি প্রভৃতি জ্ঞান এবং ইচ্ছাদি) "করণান্তরনিমিত্ত" অর্থাৎ অন্য কোন ইন্দ্রিয়নিমিত্তক হইবার যোগ্য। এবং একই সময়ে ঘ্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ও গন্ধ প্রভৃতি বিষয়ের সন্নিকর্ষসমূহ হইলে একই সময়ে অনেক জ্ঞান (অনেক ইন্দ্রিয়জন্য অনেক প্রত্যক্ষ) উৎপন্ন হয় না; তদ্দ্বারা অনুমিত হয়, সেই সেই ইন্দ্রিয়সংযুক্ত, অব্যাপক অর্থাৎ অণুপরিমাণ (প্রত্যক্ষের) সহকারী কারণান্তর আছে, যাহার অসন্নিধিবশতঃ (অন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত অসংযোগবশতঃ) "জ্ঞান" (সেই অন্য ইন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষ) উৎপন্ন হয় না এবং সন্নিধিবশতঃ (সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগবশতঃ) উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সেই ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। মনঃসংযোগ-নিরপেক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের প্রত্যক্ষহেতুত্ব হইলে অর্থাৎ মনঃসংযোগশূন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের কারণ হইলে, একই সময়ে অনেক জ্ঞান অর্থাৎ অনেক ইন্দ্রিয়জন্য অনেক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হউক ?

টিপ্পনী—"বুদ্ধির" পরে ষষ্ঠ প্রমেয় মনের লক্ষণ বক্তব্য। মন অন্তরিন্দ্রিয়। তাই মহর্ষি গোতমের মতে মনেরই নাম অন্তঃকরণ। উক্ত "করণ" শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। প্রত্যেক জীবদেহে এক একটি মন থাকে, উহা পরমাণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম নিত্যদ্রব্য। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা নিজ সিদ্ধান্তানুসারে উক্তরূপ মনের সাধক লিঙ্গ বলিয়া, তদ্দ্বারা উহার লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। মহর্ষি সেই লিঙ্গ বলিয়াছেন,—যুগপৎ জ্ঞানের অনুৎপত্তি। যুগপৎ অর্থাৎ একই ক্ষণে নানা ইন্দ্রিয়জন্য নানা বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মে না। ইহাই মনের সাধক লিঙ্গ। কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্ত সর্ব্বসম্মত না হওয়ায় উহা সর্ব্বসম্মত লিঙ্গ হইতে পারে না। সুতরাং মনের সাধক অন্যান্য লিঙ্গও বলা আবশ্যক। তাই ভাষ্যকার প্রথমে এই সূত্রের অবতারণা করিতে সেই সমস্ত লিঙ্গও বলিয়াছেন এবং পরে "অনিন্দ্রিয়নিমিত্তাঃ স্মৃত্যাদয়ঃ করণান্তরনিমিত্তা ভবিতুমর্হন্তি" এই সন্দর্ভের দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বকথিত স্মৃতিপ্রভৃতি যে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়নিমিত্তক নহে, সুতরাং তাহাতে ঐরূপ অন্য কোন করণ (ইন্দ্রিয়) আবশ্যক, ইহা বলিয়া, মনের

অস্তিত্বে অনুমানপ্রমাণের সূচনা করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র সেই অনুমানপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলকথা, জীবদেহে বহিরিন্দ্রিয় ভিন্ন উক্তরূপ একটি অন্তরিন্দ্রিয় না থাকিলে পূর্ব্বোক্ত স্মৃতি প্রভৃতি জন্মিতে পারে না। সুতরাং উক্ত স্মৃতি প্রভৃতির দ্বারা অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ হয় যে, মন নামে অন্তরিন্দ্রিয় আছে, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যে যে "প্রতিভা"র উল্লেখ করিয়াছেন, উহা ইন্দ্রিয়াদিনিরপেক্ষ মানস জ্ঞানবিশেষ। ভাষ্যকার পরেও "প্রাতিভ" জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন। বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ আর্ষ জ্ঞানকে "প্রাতিভ" বলিয়াছেন এবং কদাচিৎ উহা যে লৌকিক ব্যক্তিদিগেরও জন্মে, ইহাও বলিয়াছেন। যেমন কন্যা বলে,—"কল্য আমার ভ্রাতা আসিবে, ইহা আমার মন বলিতেছে।" কন্যার ঐরূপ জ্ঞান যথার্থ হইলে উহাও "প্রাতিভ" জ্ঞান। "ন্যায়কন্দলী"কার শ্রীধর ভট্ট উক্ত "প্রতিভা"কেই "প্রাতিভ" বলিয়াছেন। কিন্তু যোগদর্শনে পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—"প্রাতিভাদ্বা সর্ব্বং" (৩।৩৩)। সেখানে ভাষ্যকার ব্যাসদেব বলিয়াছেন,—"প্রাতিভং নাম-তারকং।" যোগীদিগের প্রতিভাজন্য জ্ঞানবিশেষই প্রাতিভ। তৃতীয় খণ্ডে (২৫৩ পৃঃ) উক্ত বিষয়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যকার পরে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, যুগপৎ অর্থাৎ একই ক্ষণে ঘ্রাণাদি অনেক ইন্দ্রিয় এবং তাহার গ্রাহ্য গন্ধাদি অনেক বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইলেও সেই একই ক্ষণে সেই সমস্ত বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মে না। ইহার দ্বারা অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ হয় যে, জীবদেহে সেই সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, এমন অব্যাপক অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম বাহ্য প্রত্যক্ষের কোন সহকারী কারণান্তর আছে, কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত যাহার সন্নিধি বা সংযোগ হইলে সেই ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ জন্মে এবং যাহার সংযোগের অভাবে অন্য ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ জন্মে না। উক্তরূপ অতি সূক্ষ্ম দ্রব্যের নাম মন। মহর্ষি মনের উক্তরূপ লিঙ্গ বলিয়া, তদ্দ্বারা মনের লক্ষণও ব্যক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম যে দ্রব্যের সহিত বহিরিন্দ্রিয়বিশেষের সংযোগ সেই ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের কারণ, তাহা মন। সেই মনঃসংযোগের অপেক্ষা না করিয়া, গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সেই ইন্দ্রিয়-বিশেষের সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের কারণ হইলে যুগপৎ অনেক বিষয়ের সহিত অনেক ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষস্থলে যুগপৎ সেই অনেক ইন্দ্রিয়জন্য অনেক প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু মহর্ষি গোতমের মতে তাহা হয় না। তাঁহার মতে সেইরূপ স্থলে তৎকালে যে ইন্দ্রিয়ের সহিত সেই অতিসূক্ষ্ম মনের সংযোগ থাকে, তখন সেই

ইন্দ্রিয়জন্যই প্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু সেই মনের অতি দ্রুতগতিপ্রযুক্ত পরক্ষণেই অন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগ হওয়ায় পরক্ষণেই সেই ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু মন বিভু অথবা সর্ব্বশরীরব্যাপী হইলে যুগপৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিতই তাহার সংযোগ থাকায় যুগপৎ নানাপ্রত্যক্ষও হইতে পারে। সুতরাং মন যে পরমাণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম, ইহাও স্বীকার্য্য। মহর্ষি পরে তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে মনঃপরীক্ষা প্রকরণে বিচারপূর্ব্বক তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। পরে গুরু প্রভাকর ও কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি অনেকে মনের বিভুত্ববাদ সমর্থন করিলেও "কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থের তৃতীয় স্তবকের প্রথম কারিকার বিবরণে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য তাঁহাদিগের যুক্তি খণ্ডন করিয়া শেষ কথা বলিয়াছেন যে, "ব্যাসঙ্গ" স্থলে যখন সর্ব্বমতেই সেই এক ইন্দ্রিয়জন্যই প্রত্যক্ষ জন্মে, তখন তদ্দৃষ্টান্তে সর্ব্বত্রই নানা প্রত্যক্ষের অযৌগপদ্যই অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ।

বস্তুতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।৫।৩) "অন্যত্রমনা অভূবং নাদর্শমন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষং মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি" এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারাও কথিত হইয়াছে যে, অন্যমনস্ক হইলে দর্শন ও শ্রবণাদি প্রত্যক্ষ জন্মে না। মহর্ষি গোতমের মতে মনের অণুত্ববশতঃ কোন এক ইন্দ্রিয়ে মন স্থির থাকিলে তখন অন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগ সম্ভব না হওয়ায় সেই ব্যক্তিকে তখন অন্যমনস্ক বলা যায়। সেই অন্যমনস্কতাই "ব্যাসঙ্গ" বলিয়া কথিত হইয়াছে। সেই ব্যাসঙ্গস্থলে যে, অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ জন্মে না, ইহা সর্ব্বসম্মত। কিন্তু মনের বিভুত্ববাদে উহার উপপত্তি হয় না। পরন্তু ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে,—"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং" (৬।৩৪)। কিন্তু মন বিভু হইলে বায়ুর ন্যায় তাহার চঞ্চলত্ব সম্ভব হয় না। মহর্ষি গোতমও পরে বলিয়াছেন,—"ন গত্যভাবাৎ" (৩।২।৮) অর্থাৎ বিভু পদার্থের গতি না থাকায় গতিশীল মনকে বিভু বলা যায় না। গোতমের মতে মনের অতি দ্রুতগতিবশতঃ পরক্ষণেই অন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগ হওয়ায় তখন সেই ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ জন্মে। সুতরাং সেইরূপ স্থলে বস্তুতঃ যুগপৎ অনেক ইন্দ্রিয়জন্য অনেক প্রত্যক্ষ না হইলেও তাহাতে যৌগপদ্য ভ্রম জন্মে। মহর্ষি পরে এ বিষয়ে প্রাচীন দৃষ্টান্তও প্রদর্শন করিয়াছেন। তৃতীয় খণ্ড, ৩২৩-২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ॥ ১৬॥

ভাষ্য। ক্রমপ্রাপ্তা তু—

সূত্র। প্রবৃত্তির্ব্বাগ্‌বুদ্ধিশরীরারম্ভঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ক্রমপ্রাপ্ত "প্রবৃত্তি" কিন্তু বাগারম্ভ, বুদ্ধ্যারম্ভ ও শরীরারম্ভ অর্থাৎ বাচিক, মানসিক ও শারীরিক শুভাশুভ কর্ম্মই "প্রবৃত্তি"।

ভাষ্য। মনোঽত্র বুদ্ধিরিত্যভিপ্রেতম্‌। বুধ্যতেঽনেনেতি বুদ্ধিঃ। সোঽয়মারম্ভঃ শরীরেণ বাচা মনসা চ পুণ্যঃ পাপশ্চ দশবিধঃ। তদেতৎ কৃতভাষ্যং দ্বিতীয়সূত্র ইতি।

অনুবাদ—এই সূত্রে "বুদ্ধি" এই শব্দের দ্বারা "মন" অভিপ্রেত। ইহার দ্বারা (মনের দ্বারা) বুঝা যায়, এ জন্য "বুদ্ধি"। [অর্থাৎ ভাবার্থনিষ্পন্ন "বুদ্ধি" শব্দের "জ্ঞান" অর্থ হইলেও "বুধ্যতেঽনেন" এই ব্যুৎপত্তিতে করণার্থনিষ্পন্ন "বুদ্ধি" শব্দের মন অর্থ হইতে পারে, মহর্ষির এখানে তাহাই অভিপ্রেত]। শরীরের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা এবং মনের দ্বারা পুণ্য ও পাপ অর্থাৎ ধর্ম্মজনক ও অধর্ম্মজনক সেই এই আরম্ভ (কর্ম্মরূপ "প্রবৃত্তি") দশ প্রকার। সেই ইহা দ্বিতীয় সূত্রে কৃতভাষ্য হইয়াছে (অর্থাৎ শুভ ও অশুভ দশ প্রকার প্রবৃত্তি দ্বিতীয় সূত্র-ভাষ্যেই বলা হইয়াছে)।

টিপ্পনী—"প্রবৃত্তি"র লক্ষণ বলিতে মনোজন্য প্রবৃত্তিও বলিতে হইবে। কিন্তু মন নিরূপিত না হইলে তাহা বলা যায় না,—এ জন্য মহর্ষি মনের নিরূপণের পরে ক্রমপ্রাপ্ত সপ্তম প্রমেয় "প্রবৃত্তি"র নিরূপণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে "ক্রমপ্রাপ্তা তু" এই বাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক সূত্রের অবতারণা করিয়া ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মজনক শুভাশুভ কর্ম্মই "প্রবৃত্তি" নামক প্রমেয়। তাই মহর্ষি কর্ম্মবোধক "আরম্ভ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। "তাৎপর্য্য-টীকা"কার বলিয়াছেন যে, "আরম্ভ" অর্থাৎ কর্ম্মই "প্রবৃত্তি"। উহা দ্বিবিধ,—জ্ঞানজনক এবং ক্রিয়াজনক। তন্মধ্যে যাহা জ্ঞানোৎপত্তির দ্বারা পুণ্য বা পাপের কারণ, তাহা "বাক্‌প্রবৃত্তি"। সূত্রস্থ "বাচ্‌" শব্দের দ্বারা জ্ঞানজনক পদার্থমাত্রই গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং মনের দ্বারা ইষ্টদেবতাদির চিন্তা ও চক্ষুরাদির দ্বারা সাধু ও অসাধু পদার্থের জ্ঞান প্রভৃতিও "বাক্‌প্রবৃত্তি"র মধ্যে গণ্য। ক্রিয়াজনক প্রবৃত্তি দ্বিবিধ,—'শরীরজন্য' এবং 'মনোজন্য'। শরীরের দ্বারা পরিত্রাণ, পরিচর্য্যা এবং দান; বাক্যের দ্বারা সত্য, হিত, প্রিয় ও স্বাধ্যায়। মনের দ্বারা দয়া, অস্পৃহা ও শ্রদ্ধা, এই দশ প্রকার পুণ্যপ্রবৃত্তি অর্থাৎ পুণ্যজনক প্রবৃত্তি। এইরূপ উহার বিপরীত ভাবে পাপপ্রবৃত্তিও দশ প্রকার।

পূর্ব্বে দ্বিতীয় সূত্রভাষ্যেই ভাষ্যকার ইহা বলিয়াছেন এবং সেই সূত্রে "প্রবৃত্তি" শব্দের অর্থ যে, এই সূত্রোক্ত কর্ম্মরূপ প্রবৃত্তিজন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, ইহাও সেখানে বলিয়াছেন। এই সূত্রে "বাচ্", "বুদ্ধি" ও "শরীর" শব্দের পরে উক্ত "আরম্ভ" শব্দের সহিত পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেকের সম্বন্ধবশতঃ 'বাগারম্ভ', 'বুদ্ধ্যারম্ভ', ও 'শরীরাম্ভ' এই ত্রিবিধ প্রবৃত্তি বুঝা যায়। মানসিক প্রবৃত্তিও বক্তব্য বলিয়া তাহাকেই মহর্ষি "বুদ্ধ্যারম্ভ" বলিয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে পূর্ব্বোক্ত "বুদ্ধি" বা জ্ঞান অর্থে "বুদ্ধি" শব্দের প্রয়োগ হয় নাই। কিন্তু যদ্দ্বারা বুঝা যায়, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে উক্ত "বুদ্ধি" শব্দের দ্বারা মননই মহর্ষির অভিপ্রেত। অনেক পুস্তকে এই সূত্রের শেষে "ইতি" শব্দ দেখা যায়। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র "ইতি" শব্দান্ত সূত্রপাঠ গ্রহণ করেন নাই। এখানে "ইতি" শব্দের কোন প্রয়োজনও নাই ॥ ১৭ ॥

সূত্র। প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষাঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—"প্রবর্ত্তনালক্ষণ" অর্থাৎ প্রবৃত্তিজনকত্ব যাহাদিগের লক্ষণ এবং অনুমাপক, সেই সমস্ত "দোষ" অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহ।

ভাষ্য। প্রবর্ত্তনা প্রবৃত্তিহেতুত্বং, জ্ঞাতারং হি রাগাদয়ঃ প্রবর্ত্তয়ন্তি পুণ্যে পাপে বা, যত্র মিথ্যাজ্ঞানং তত্র রাগদ্বেষাবিতি। প্রত্যাত্মবেদনীয়া হীমে দোষাঃ কস্মাল্লক্ষণতো নির্দিশ্যন্ত ইতি। কর্ম্মলক্ষণাঃ খলু রক্তদ্বিষ্টমূঢ়াঃ, রক্তো হি তৎ কর্ম্ম কুরুতে যেন কর্ম্মণা সুখং দুঃখং বা লভতে, তথা দ্বিষ্টস্তথা মূঢ় ইতি। রাগদ্বেষমোহা ইত্যুচ্যমানে বহু নোক্তং ভবতীতি।

অনুবাদ—"প্রবর্ত্তনা" বলিতে প্রবৃত্তিজনকত্ব। রাগাদি (রাগ, দ্বেষ ও মোহ) আত্মাকে পুণ্য বা পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। যে আত্মাতে মিথ্যাজ্ঞান (মোহ) জন্মে, সেই আত্মাতে রাগ (বিষয়ে অভিলাষ) ও দ্বেষ জন্মে। (পূর্ব্বপক্ষ) প্রত্যাত্মবেদনীয় অর্থাৎ সর্ব্বজীবের মানস-প্রত্যক্ষসিদ্ধ এই দোষগুলি (রাগ, দ্বেষ ও মোহ) লক্ষণের দ্বারা অর্থাৎ অনুমানের দ্বারা কেন নির্দ্দিষ্ট হইতেছে? (উত্তর) যেহেতু রক্ত (অনুরক্ত), দ্বিষ্ট (দ্বেষযুক্ত) এবং মূঢ় (ভ্রান্ত) জীবগণ "কর্ম্মলক্ষণ" অর্থাৎ কর্ম্মই তাহাদিগের সেইরূপে অনুমাপক।

যেহেতু রক্ত ব্যক্তিই সেই কর্ম্ম করে, যে কর্ম্মের দ্বারা সুখ বা দুঃখ লাভ করে। সেইরূপ দ্বিষ্ট ব্যক্তিই সেই কর্ম্ম করে, যে কর্ম্মের দ্বারা সুখ বা দুঃখ লাভ করে। তদ্রূপ মূঢ় ব্যক্তিই সেই কর্ম্ম করে, যে কর্ম্মের দ্বারা সুখ বা দুঃখ লাভ করে। "রাগদ্বেষমোহাঃ" এই মাত্র বলিলে অর্থাৎ "দোষা রাগদ্বেষমোহা" এইরূপ সূত্র বলিলে অধিক বলা হয় না।

টিপ্পনী—"রাগ", "দ্বেষ" ও "মোহ", এই তিনটির নাম "দোষ"। উহা পূর্ব্বোক্ত "প্রবৃত্তি"র প্রযোজক, এ জন্য মহর্ষি "প্রবৃত্তি"র পরে অষ্টম প্রমেয় দোষের নিরূপণ করিয়াছেন। 'দোষের' মধ্যে মোহই প্রধান। কারণ, মোহশূন্য ব্যক্তির রাগ ও দ্বেষ জন্মে না। মহর্ষি পরে চতুর্থ অধ্যায়ে নিজেই ইহা বলিয়াছেন। উক্ত রাগ, দ্বেষ ও মোহ, পুণ্যজনক ও পাপজনক কর্ম্মে প্রবৃত্তির কারণ। সুতরাং প্রবৃত্তিজনকত্ব উক্ত দোষত্রয়ের লক্ষণ। সূত্রে "লক্ষণ" শব্দের দ্বারা এক পক্ষে লিঙ্গ বা অনুমাপক অর্থও মহর্ষির বিবক্ষিত বুঝা যায়। অর্থাৎ কর্ম্মপ্রবৃত্তির দ্বারা উক্ত রাগাদি দোষত্রয় অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার পরে পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন যে, রাগ, দ্বেষ ও মোহ, এই দোষত্রয় "প্রত্যাত্মবেদনীয়"। অর্থাৎ ঐ সমস্ত মনোগ্রাহ্য গুণ বলিয়া প্রত্যেক আত্মাই মনের দ্বারা উহার প্রত্যক্ষ করে। তথাপি মহর্ষি লক্ষণ দ্বারা উহাদিগের নির্দ্দেশ করিয়াছেন কেন? এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত দোষ নিজ আত্মাতে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও অন্য আত্মাতে অনুমেয়। কোন ব্যক্তি সুখজনক বা দুঃখজনক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে সেই কর্ম্ম দ্বারা অনুমানসিদ্ধ হয় যে, সেই ব্যক্তি রক্ত, দ্বিষ্ট ও মূঢ়। কারণ, মোহ ব্যতীত কাহারও রাগ ও দ্বেষ জন্মে না। রাগ ও দ্বেষ ব্যতীতও কাহারও সুখজনক দুঃখজনক কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না। পরন্তু উক্ত রাগ, দ্বেষ ও মোহ নিজ নিজ আত্মাতে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও ঐ সমস্ত যে কর্ম্মপ্রবৃত্তির জনক, ইহা অনেকের অজ্ঞাত। সুতরাং মহর্ষি বলিয়াছেন,—"প্রবর্ত্তনালক্ষণাঃ।" কিন্তু "দোষা রাগদ্বেষমোহাঃ" এইরূপ সূত্র বলিলে অধিক বলা হয় না॥ ১৮॥

সূত্র। পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ॥ ১৯॥

অনুবাদ—পুনরুৎপত্তি অর্থাৎ মরণের পরে পুনর্জ্জন্ম "প্রেত্যভাব"।

ভাষ্য। **উৎপন্নস্য ক্বচিৎসত্ত্বনিকায়ে মৃত্বা যা পুনরুৎপত্তিঃ**

স প্রেত্যভাবঃ। উৎপন্নস্য সম্বদ্ধস্য। সম্বন্ধস্তু দেহেন্দ্রিয়-বুদ্ধিবেদনাভিঃ। পুনরুৎপত্তিঃ পুনর্দ্দেহাদিভিঃ সম্বন্ধঃ। পুনরিত্য-ভ্যাসাভিধানম্। যত্র ক্বচিৎ প্রাণভৃন্নিকায়ে বর্ত্তমানঃ পূর্ব্বো-পাত্তান্ দেহাদীন্ জহাতি তৎ প্রৈতি। যত্তত্রান্যত্র বা দেহাদীন-ন্যানুপাদত্তে তদ্ভবতি। প্রেত্যভাবো মৃত্বা পুনর্জ্জন্ম। সোঽয়ং জন্মমরণপ্রবন্ধাভ্যাসোঽনাদিরপবর্গান্তঃ প্রেত্যভাবো বেদিতব্য ইতি।

অনুবাদ—কোন প্রাণি-নিকায়ে অর্থাৎ মনুষ্য, পশু প্রভৃতি কোন এক-জাতীয় জীবকুলে উৎপন্নের মরণের পরে যে পুনরুৎপত্তি, তাহা "প্রেত্যভাব"। উৎপন্নের কি না —সম্বন্ধ-বিশিষ্টের। সম্বন্ধ কিন্তু দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও বেদনার অর্থাৎ সুখ-দুঃখের সহিত। "পুনরুৎপত্তি" বলিতে পুনর্ব্বার দেহাদির সহিত সম্বন্ধ। "পুনঃ" এই শব্দের দ্বারা অভ্যাসের অর্থাৎ জন্মের পৌনঃপুন্যের কথন হইয়াছে। যে কোনও প্রাণিনিকায়ে (একজাতীয় জীবকুলে) বর্ত্তমান হইয়া (জীব) পূর্ব্বপরিগৃহীত দেহাদিকে যে ত্যাগ করে, তাহা প্রেত হয়, অর্থাৎ সেই পূর্ব্বগৃহীত দেহাদির ত্যাগই জীবের প্রেতত্ব বা মরণ। সেই প্রাণিনিকায়ে অথবা অন্য প্রাণিনিকায়ে যে অন্য দেহাদিকে গ্রহণ করে, তাহা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সেই অভিনব দেহাদির গ্রহণই জীবের উৎপত্তি বা জন্ম। ফলিতার্থ—মরণোত্তর পুনর্জ্জন্মই "প্রেত্যভাব"। সেই এই জন্ম-মরণ-প্রবাহের অভ্যাস অর্থাৎ মরণের পরে পুনঃ পুনঃ জন্মরূপ প্রেত্যভাব অনাদি (এবং) মোক্ষান্ত জানিবে।

টিপ্পনী—"দোষে"র পরে নবম প্রমেয় "প্রেত্যভাবে"র লক্ষণ বক্তব্য। প্রপূর্ব্বক "ইণ্" ধাতুর উত্তর ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় যোগে "প্রেত্য" শব্দ এবং "ভূ" ধাতু হইতে "ভাব" শব্দ নিষ্পন্ন। প্রপূর্ব্বক "ইণ্" ধাতুর অর্থ এখানে মরণ। ভূ ধাতুর অর্থ উৎপত্তি। তাহা হইলে "প্রেত্য" অর্থাৎ মরণের পরে "ভাব" অর্থাৎ উৎপত্তি, ইহাই "প্রেত্যভাব" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার শেষে ফলিতার্থ বলিয়াছেন,—"প্রেত্যভাবো মৃত্বা পুনর্জ্জন্ম।" ভাষ্যকার প্রথমে উক্ত "প্রেত্য" এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"উৎপন্নস্য ক্বচিৎ সত্ত্বনিকায়ে মৃত্বা।" এখানে "সত্ত্বনিকায়" শব্দের দ্বারা মনুষ্যাদি একজাতীয় জীবদেহই

ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বুঝা যায়। কোষকার অমর সিংহ বলিয়াছেন,— "সধর্ম্মিণাং স্যান্নিকায়ঃ।" অর্থাৎ সমানধর্ম্মী জীবসমূহই "নিকায়" শব্দের অর্থ। ভাষ্যকার দ্বিতীয়সূত্র-ভাষ্যে জন্মের লক্ষণ বলিতে "নিকায়" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সেখানে বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে। নিত্য আত্মার উৎপত্তি হইতে পারে না। তাই ভাষ্যকার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "উৎপন্নস্য" এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"সম্বদ্ধস্য"। পরে সেই সম্বন্ধের ব্যাখ্যা করিতে দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বেদনা অর্থাৎ সুখ-দুঃখের সহিত সম্বন্ধ বলিয়া সেই সম্বন্ধকেই আত্মার উৎপত্তি বলিয়াছেন। পরে সূত্রোক্ত "পুনরুৎপত্তি"র ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—"পুনরুৎপত্তিঃ পুনর্দ্দেহাদিভিঃ সম্বন্ধঃ।" "পুনর্" শব্দের দ্বারা আত্মার উক্তরূপ উৎপত্তির অভ্যাস বা আবৃত্তি কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে মরণের পরে আত্মার পুনঃ পুনঃ উক্তরূপ উৎপত্তি বা জন্ম হইতেছে। অপবর্গ ব্যতীত উহার আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। ভাষ্যকার পরে ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, আত্মা কোন একজাতীয় জীবদেহে বর্ত্তমান হইয়া পূর্ব্বগৃহীত দেহাদির যে পরিত্যাগ করেন, তাহাই তাঁহার মরণ এবং পরে তজ্জাতীয় অথবা অন্যজাতীয় জীবকুলে পুনর্ব্বার যে দেহাদি পরিগ্রহ করেন, তাহাই সেই আত্মার পুনর্জ্জন্ম। মরণের পরে সেই পুনর্জ্জন্মের নামই "প্রেত্যভাব"। উহা অনাদি ও অপবর্গান্ত। মহর্ষি পরে ইহা যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন ॥১৯॥

সূত্র। প্রবৃত্তিদোষজনিতোঽর্থঃ ফলম্ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—প্রবৃত্তি এবং দোষ-জনিত পদার্থ "ফল"।

ভাষ্য। সুখদুঃখসংবেদনং ফলম্। সুখবিপাকং কর্ম্ম দুঃখবিপাকঞ্চ। তৎ পুনর্দ্দেহেন্দ্রিয়বিষয়বুদ্ধিষু সতীষু ভবতীতি সহ দেহাদিভিঃ ফলমভিপ্রেতম্। তথাহি প্রবৃত্তিদোষজনিতোঽর্থঃ ফলমেতৎ সর্ব্বং ভবতি। তদেতৎ ফলমুপাত্তমুপাত্তং হেয়ং, ত্যক্তং ত্যক্তমুপাদেয়মিতি। নাস্য হানোপাদানয়োর্নিষ্ঠা পর্য্যবসানং বাঽস্তি। স খল্বয়ং ফলস্য হানোপাদানস্রোতসোহ্যতে লোক ইতি।

অনুবাদ—সুখ ও দুঃখের অনুভব ফল। কর্ম্ম সুখফলক এবং দুঃখফলক। তাহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সুখ-দুঃখ-ভোগরূপ ফল কিন্তু দেহ, ইন্দ্রিয়, বিষয় ও বুদ্ধি থাকিলেই হয়, এ জন্য দেহাদির সহিত "ফল" অভিপ্রেত, অর্থাৎ মহর্ষি দেহাদিকেও "ফল" বলিয়াছেন। ফলিতার্থ এই যে, প্রবৃত্তিও দোষজনিত পদার্থ—এই সমস্ত (সুখদুঃখভোগ এবং তাহার সাধন দেহাদি সমস্ত) "ফল" হয়। সেই এই ফল গৃহীত হইয়া গৃহীত হইয়া ত্যাজ্য হয়, ত্যক্ত হইয়া ত্যক্ত হইয়া গ্রাহ্য হয়। এই ফলের ত্যাগ ও গ্রহণের "নিষ্ঠা" অর্থাৎ সমাপ্তি অথবা "পর্য্যবসান" অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে অবসান নাই। ফলের ত্যাগ ও গ্রহণরূপ স্রোত অর্থাৎ ভোগের দ্বারা এক ফলের ত্যাগ এবং কর্ম্মের দ্বারা অন্য ফলের গ্রহণ, এই ভাবে অবিশ্রান্ত ফল-ত্যাগ ও ফল-গ্রহণের প্রবাহ সেই এই লোককে (জীবকুলকে) বহন করিতেছে। অর্থাৎ জীবকুল ফলের ত্যাগ ও গ্রহণরূপ স্রোতে নিরন্তর ভাসিতেছে।

টিপ্পনী—প্রেত্যভাব পরে দশম প্রমেয় লক্ষণ বক্তব্য। ফল দ্বিবিধ,—মুখ্য ও গৌণ। সুখ-দুঃখের উপভোগই মুখ্য ফল। দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি তাহার সাধনগুলি গৌণ ফল। "ফল" শব্দের দ্বারা দ্বিবিধ ফলই মহর্ষির বিবক্ষিত। সূত্রে অতিরিক্ত "অর্থ" শব্দের প্রয়োগ করিয়া মহর্ষি ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। যদিও শরীরাদি ফল-পদার্থের পরিচয় পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, তথাপি ফলমাত্রই "প্রবৃত্তি-দোষজনিত"—ইহা জানিলে নির্ব্বেদ লাভ হয়, এ জন্য মহর্ষি বলিয়াছেন, —"প্রবৃত্তি-দোষজনিতঃ।" প্রবৃত্তি বলিতে এখানে পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তি-সাধ্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। দোষজনিত ঐ ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলমাত্রেরই জনক। সুতরাং ফলমাত্রই প্রবৃত্তি ও দোষজনিত। "তাৎপর্য্যটীকা"কার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, কেবল প্রবৃত্তির প্রতিই দোষ কারণ নহে, কিন্তু প্রবৃত্তিজন্য সুখ ও দুঃখের প্রতিও দোষ কারণ, ইহা প্রকাশ করিতেই মহর্ষি ফলকে "প্রবৃত্তিদোষজনিত" বলিয়াছেন। দোষরূপ জলের দ্বারা সিক্ত আত্মরূপ ক্ষেত্রেই প্রবৃত্তি অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ বীজ সুখদুঃখরূপ ফল উৎপন্ন করে। প্রলয়কালেও জীবের ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম থাকায় তজ্জন্য পুনঃ সৃষ্টিতে আবার দেহাদি ফলের গ্রহণ ও ত্যাগ হয়। সুতরাং প্রলয়কালে উহার পর্য্যবসান অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে অবসান হয় না। মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা হইতে পারে না। এই তাৎপর্য্যেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"নাস্য হানোপাদানয়োর্নিষ্ঠা পর্য্যবসানং বাঽস্তি" ॥ ২০ ॥

ভাষ্য। অথৈতদেব—

সূত্র। বাধনালক্ষণং দুঃখম্ ॥২১॥*

অনুবাদ—এই সমস্তই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শরীর হইতে ফল পর্য্যন্ত সমস্ত প্রমেয়ই "বাধনালক্ষণ" অর্থাৎ দুঃখানুষক্ত দুঃখ।

ভাষ্য। বাধনা পীড়া তাপ ইতি। তয়াঽনুবিদ্ধমনুষক্তমবিনির্ভাগেণ বর্ত্তমানং দুঃখযোগাদ্দুঃখমিতি। সোঽয়ং সর্ব্বং দুঃখেনানুবিদ্ধমিতি পশ্যন্ দুঃখং জিহাসুর্জন্মনি দুঃখদর্শী নির্ব্বিদ্যতে, নির্ব্বিণ্ণো বিরজ্যতে, বিরক্তো বিমুচ্যতে।

অনুবাদ—"বাধনা" বলিতে পীড়া, তাপ। সেই "বাধনার" সহিত অনুবিদ্ধ কি না অনুষক্ত অর্থাৎ অবিনির্ভাগবিশিষ্ট হইয়া (নিয়তসম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া) বর্ত্তমান. (পূর্ব্বোক্ত শরীরাদি সমস্তই) দুঃখসম্বন্ধপ্রযুক্ত দুঃখ। সেই এই ব্যক্তি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দুঃখবোদ্ধা ব্যক্তি সমস্তই দুঃখানুবিদ্ধ, ইহা দর্শন করতঃ দুঃখ পরিহার করিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হওয়ায় জন্মে দুঃখদর্শী হইয়া নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হন, নির্বিণ্ণ হইয়া বিরক্ত হন, বিরক্ত হইয়া বিমুক্ত হন।

টিপ্পনী—মহর্ষি অপবর্গের অব্যবহিত পূর্ব্বে একাদশ প্রমেয় দুঃখের উদ্দেশ করিয়া ক্রমানুসারে এই সূত্রের দ্বারা তাহার লক্ষণ বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের মতে পূর্ব্বোক্ত শরীরাদি ফল পর্য্যন্ত সমস্তই দুঃখ, ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত। তাই ভাষ্যকার এই সূত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—"**অথৈতদেব**"। উক্ত "অথ" শব্দের অর্থ এখানে সাকল্য বা সমস্ত।† "অথ সমস্তং এতদেব বাধনালক্ষণং দুঃখং" এইরূপ ব্যাখ্যাই ভাষ্যকারের অভিপ্রেত। "বাধনা" শব্দের অর্থ দুঃখ, উহারই নাম পীড়া ও তাপ। যাহা সর্ব্বজীবের প্রতিকূলবেদনীয়, সেই দুঃখপদার্থ সর্ব্বজীবেরই সুপরিচিত। কিন্তু যে সমস্ত পদার্থ সেই দুঃখের সহিত অনুষক্ত, তাহাও এই সূত্রে দুঃখ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত "অনুবিদ্ধং" এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"অনুষক্তং"।

* অনেক পুস্তকে এবং মুদ্রিত ন্যায়বার্ত্তিকেও এই সূত্রশেষে "ইতি" শব্দ দেখা যায়। অনেক স্থানে উক্তরূপ সূত্রপাঠই প্রচলিত ছিল, ইহাও বুঝা যায়। কারণ, "ভাষ্যচন্দ্র"কার রঘূত্তম উক্ত "ইতি" শব্দেরও একটা ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন বাচস্পতি মিশ্র উক্তরূপ পাঠ গ্রহণ করেন নাই।

† "মঙ্গলানন্তরারম্ভ-প্রশ্নকার্ৎস্ন্যেষ্বথো অথ"।—অমরকোষ, নানার্থবর্গ।

পরে উহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"অবিনির্ভাগেণ বর্ত্তমানং।" "অবিনির্ভাগ" বলিতে অপৃথগ্‌ভাব, অর্থাৎ নিয়তসম্বন্ধ। দুঃখসম্বন্ধশূন্য কোন দেহাদি নাই। তাই পরে বলিয়াছেন,—"দুঃখযোগাদ্ দুঃখমিতি।" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দেহাদি ফল পর্য্যন্ত সমস্তই দুঃখানুষক্ত বলিয়া দুঃখ। সূত্রে "লক্ষণ" শব্দের দ্বারা অনুষঙ্গরূপ সম্বন্ধই বিবক্ষিত। বাধনার লক্ষণ অর্থাৎ দুঃখের অনুষঙ্গরূপ সম্বন্ধ যাহাতে আছে, তাহা দুঃখ। মুখ্য দুঃখের সহিত দুঃখের অভেদরূপ সম্বন্ধ। শরীরে দুঃখের নিমিত্তত্ব সম্বন্ধ। ইন্দ্রিয়াদিতে দুঃখের সাধনত্ব সম্বন্ধ। সুখে দুঃখের অবিনাভাব সম্বন্ধ। উদ্দ্যোতকরোক্ত দুঃখানুষঙ্গের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে দ্বিতীয় সূত্রভাষ্য-ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। উদ্দ্যোতকর একবিংশতি প্রকার দুঃখ বলিয়াছেন। যথা—ষট্‌প্রকার ইন্দ্রিয় এবং তাহার গ্রাহ্য ষট্‌প্রকার বিষয় এবং সেই বিষয়ে ষট্‌প্রকার প্রত্যক্ষরূপ বুদ্ধি (১৮)। (১৯) শরীর, (২০) সুখ ও (২১) মুখ্য দুঃখ। (চতুর্থ খণ্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সুখ ও দুঃখ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মনের বিষয়ের অন্তর্গত হইলেও উহা পৃথক্‌রূপে দুঃখের বিভাগে উক্ত হইয়াছে। কারণ, যাহা মুখ্য দুঃখ, তাহার সম্বন্ধপ্রযুক্তই পূর্ব্বোক্ত সমস্তই দুঃখ। আর মুমুক্ষু প্রকৃত সুখকেও দুঃখ বলিয়া ভাবনা করিবেন, এজন্য সুখও দুঃখের বিভাগে পৃথক্‌রূপে কথিত হইয়াছে। ফলকথা, দুঃখসম্বন্ধশূন্য কোন জন্ম নাই, এজন্য জীবের জন্মমাত্রই দুঃখ। ভাষ্যকার পরে মহর্ষির ঐরূপ উক্তির কারণ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত শরীরাদি অর্থাৎ জন্মমাত্রই দুঃখানুবিদ্ধ বলিয়া দুঃখ, ইহা বুঝিলে জন্মে দুঃখদর্শী হইয়া নির্ব্বেদ ও পরে বৈরাগ্য লাভ করে। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, সুখ ও তাহার সাধনে কোন প্রয়োজন নাই, এইরূপ বুদ্ধিই "নির্ব্বেদ"। আর ভোগ্য বিষয় উপস্থিত হইলেও তাহাতে বিতৃষ্ণা উপেক্ষাবুদ্ধিই বৈরাগ্য। জন্মে বৈরাগ্য ব্যতীত তাহার উচ্ছেদের জন্য প্রবৃত্তি হইতে পারে না এবং বৈরাগ্য ব্যতীত মুক্তি লাভ কখনই সম্ভব নহে। যাহার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, তাহাকে বলে বিরক্ত। বিরক্ত ব্যক্তিরই সাধনার ফলে কালে মুক্তি হয়। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,- **"বিরক্তো বিমুচ্যতে"** ॥ ২১ ॥

ভাষ্য। যত্র তু নিষ্ঠা যত্র তু পর্য্যবসানং সোঽয়ং—

অনুবাদ—যাহাতে কিন্তু নিষ্ঠা (সমাপ্তি), যাহাতে কিন্তু সর্ব্বতোভাবে অবসান, সেই এই—

সূত্র। তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—তাহার সহিত (পূর্ব্বোক্ত মুখ্য গৌণ সর্ব্ববিধ দুঃখের সহিত) অত্যন্ত মুক্তি অপবর্গ।

ভাষ্য। তেন দুঃখেন জন্মনাঽত্যন্তং বিমুক্তিরপবর্গঃ। কথম্? উপাত্তস্য জন্মনো হানমন্যস্য চানুপাদানম্। এতামবস্থাম-পর্য্যন্তামপবর্গং বেদয়ন্তেঽপবর্গবিদঃ। তদভয়মজরমমৃত্যুপদং ব্রহ্ম ক্ষেমপ্রাপ্তিরিতি।

অনুবাদ—সেই জন্মরূপ দুঃখের সহিত অর্থাৎ জায়মান শরীরাদি সর্ব্বদুঃখের সহিত অত্যন্ত বিমুক্তি "অপবর্গ"। (প্রশ্ন) কি প্রকার? অর্থাৎ জন্মরূপ দুঃখের সহিত অত্যন্ত বিমুক্তি কিরূপ? (উত্তর) গৃহীত জন্মের ত্যাগ এবং অপর জন্মের অগ্রহণ। অবধিশূন্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী এই অবস্থাকে (আত্মার শরীরাদি সর্ব্বদুঃখশূন্য কৈবল্যাবস্থাকে) অপবর্গবিদ্‌গণ অপবর্গ বলিয়া জানেন। তাহা অভয়, অজর, অমৃত্যুপদ. ব্রহ্ম, ক্ষেমপ্রাপ্তি।

টিপ্পনী—দুঃখের স্বরূপ না বুঝিলে চরম প্রমেয় অপবর্গের স্বরূপ বুঝা যায় না। তাই মহর্ষি দুঃখের লক্ষণ বলিয়াই এই সূত্রের দ্বারা অপবর্গের লক্ষণ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে উহার পরিচয় প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন, "যত্র তু নিষ্ঠা"। অর্থাৎ যাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত দেহাদি ফলের ত্যাগ ও পুনর্গ্রহণের সমাপ্তি হয়। প্রলয়কালেও জীবের দেহাদি পরিগ্রহ হয় না, সুতরাং কোন দুঃখভোগও হয় না। কিন্তু সেই অবস্থা মুক্তি নহে। তাই ভাষ্যকার পরে তাঁহার পূর্ব্বকথারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"যত্র তু পর্য্যবসানং।" প্রলয়কালে জীবের দুঃখের অবসান হইলেও তাহা সর্ব্বতোভাবে অবসান নহে। কারণ, পরে পুনঃ সৃষ্টিতে আবার সেই সমস্ত জীবের দেহাদিপরিগ্রহ ও নানা দুঃখ-ভোগ হয়। কিন্তু অপবর্গ হইলে আর তাহার জন্ম হয় না। সুতরাং আর কখনও কোন দুঃখভোগ হইতেই পারে না। জীবের প্রলয়কালীন সর্ব্বদুঃখশূন্যাবস্থার পর্য্যন্ত অর্থাৎ সীমা আছে। কিন্তু মোক্ষাবস্থার সীমা নাই। মোক্ষ হইলে আর কখনও তাহার পুনরাবৃত্তি হয় না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—"ন চ পুনরাবর্ত্ততে।" ভাষ্যকার ইহাও ব্যক্ত করিতে পরে বলিয়াছেন, "এতামবস্থামপর্য্যন্তামপবর্গং বেদয়ন্তেঽপবর্গবিদঃ।" "বেদয়ন্তে" এই পদে চুরাদিগণীয় জ্ঞানার্থ "বিদ্" ধাতুর প্রয়োগ হইয়াছে।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা কেবল সর্ব্বজীবের মানস অনুভবসিদ্ধ

মুখ্য দুঃখেরই ব্যাখ্যা করায় এই সূত্রেও “তদ্” শব্দের দ্বারা সেই মুখ্য দুঃখই গ্রহণ করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা দুঃখানুষক্ত শরীরাদি সমস্ত গৌণ দুঃখেরও ব্যাখ্যা করায় এই সূত্রে “তদ্” শব্দের দ্বারা সর্ব্ববিধ দুঃখেরই গ্রহণ করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“তেন দুঃখেন জন্মনা অত্যন্তং বিমুক্তিরপবর্গঃ।” বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, সূত্রস্থ “তদ্” শব্দের দ্বারা কেবল মুখ্য দুঃখই বোধ্য, এইরূপ ভ্রম না হয়, এই জন্যই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“জন্মনা”। অর্থাৎ “জায়তে” এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে উক্ত “জন্মন্” শব্দের দ্বারা জীবের সম্বন্ধে জায়মান শরীরাদি গৌণ ও মুখ্য সর্ব্ববিধ দুঃখই উক্ত “তদ্” শব্দের দ্বারা বোধ্য। তাই উদ্দ্যোতকরও পূর্ব্বোক্ত একবিংশতিপ্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই অপবর্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উক্তরূপ অপবর্গের নামই নির্ব্বাণ মুক্তি।

ভাষ্যকার পরে জীবের উক্তরূপ অবস্থাকে অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তিকে অভয়, অজর, অমৃত্যুপদ, ব্রহ্ম ও ক্ষেমপ্রাপ্তি বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন যে, উহা ব্রহ্মতুল্য। বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, উক্তরূপ নির্ব্বাণ হইলে আর সংসারভয় থাকে না, সুতরাং উহা অভয়। শ্রুতিও পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মকে অভয় বলিয়াছেন। যাঁহাদিগের মতে ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন, “অজরং”। অর্থাৎ নিত্য নির্ব্বিকার ব্রহ্মের কোনরূপে জরা বা পরিণাম হইতে পারে না। উক্তরূপ নির্ব্বাণ মুক্তিরও কখনও কোনরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে। আর যাঁহাদিগের মতে প্রদীপের ন্যায় চিত্তের চির-নির্ব্বাণই মোক্ষ, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন, “অমৃত্যুপদং”। অর্থাৎ ব্রহ্ম অমৃত্যুপদ, এবং ব্রহ্মের ন্যায় মুক্তিও অমৃত্যুপদ। উহা প্রদীপের নির্ব্বাণের তুল্য নহে। কারণ, নিত্য জীবাত্মার নির্ব্বাণ মুক্তি হইলেও তাহার মৃত্যু বা বিনাশ হয় না, তাহা হইতেই পারে না। ফলকথা, ব্রহ্মের সহিত পূর্ব্বোক্তরূপ নির্ব্বাণ মুক্তির ঐ সমস্ত সাদৃশ্য প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই শাস্ত্রে উক্তরূপ মুক্তি ‘ব্রহ্ম’ বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং উক্তরূপ মুক্তিপ্রাপ্তিই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও ক্ষেমপ্রাপ্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। এই মতে মুক্ত আত্মা ব্রহ্মই হন না, কিন্তু ব্রহ্মের সহিত তাঁহার পরম সাদৃশ্য লাভ হয়। মুণ্ডক উপনিষদে “নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” এই শ্রুতিবাক্যে এবং ভগবদ্গীতায় “ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ”

এই ভগবদ্‌বাক্যে "সাম্য" ও "সাধর্ম্য" শব্দের দ্বারা ইহাই কথিত হইয়াছে। নচেৎ "সাম্য" ও "সাধর্ম্য" শব্দের প্রয়োগ সার্থক হয় না। এ বিষয়ে অন্যান্য কথা ও বিচার চতুর্থ খণ্ডে পাওয়া যাইবে।

ভাষ্য। নিত্যং সুখমাত্মনো মহত্ত্ববন্মোক্ষেঽভিব্যজ্যতে, তেনাভিব্যক্তেনাত্যন্তং বিমুক্তঃ সুখী ভবতীতি কেচিন্মন্যন্তে। তেষাং প্রমাণাভাবাদনুপপত্তিঃ। ন প্রত্যক্ষং নানুমানং নাগমো বা বিদ্যতে, নিত্যং সুখমাত্মনো মহত্ত্ববন্মোক্ষেঽভিব্যজ্যত ইতি।

অনুবাদ—মহত্ত্বের ন্যায় অর্থাৎ আত্মার পরম মহৎপরিমাণের ন্যায় আত্মার নিত্যসুখ মোক্ষকালে অভিব্যক্ত (অনুভূত) হয়। সেই অভিব্যক্ত নিত্যসুখের দ্বারা বিমুক্ত আত্মা অত্যন্ত সুখী হন, ইহা কোন সম্প্রদায় স্বীকার করেন। তাঁহাদিগের প্রমাণাভাববশতঃ উক্ত মতের উপপত্তি হয় না। মহত্ত্বের ন্যায় মোক্ষে আত্মার নিত্য সুখ অভিব্যক্ত হয়, এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, অনুমানপ্রমাণ নাই, আগমপ্রমাণও নাই।

টিপ্পনী—ভাষ্যকার মহর্ষির সূত্রানুসারে চরম প্রমেয় অপবর্গের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া, পরে উক্ত বিষয়ে মতান্তর বলিয়াছেন যে, সর্ব্বব্যাপী জীবাত্মাতে নিত্য মহৎপরিণামের ন্যায় যে নিত্যসুখ বিদ্যমান আছে, সংসারকালে তাহার অভিব্যক্তি বা অনুভূতি হয় না, কিন্তু মুক্তিকালে তাহার অভিব্যক্তি হয়। সুতরাং মুক্ত আত্মা সেই অভিব্যক্ত নিত্যসুখে অত্যন্ত সুখী হন। অর্থাৎ তখন হইতে তিনি চিরকাল সেই নিত্যসুখের উপভোগ করেন, ইহা কোন সম্প্রদায়ের মত। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এখানে উক্ত মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে যে সুখস্বরূপ বলা হইয়াছে, সেই সুখ নিত্য। কারণ, ব্রহ্ম নিত্য। জীবাত্মা বস্তুতঃ সেই নিত্য সুখরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। সুতরাং উক্ত সন্দর্ভে "রাহোঃ শিরঃ" এই প্রয়োগের ন্যায় "নিত্যং সুখমাত্মনঃ" এই প্রয়োগে ভাষ্যকার অভেদার্থেই ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, মুক্তিতে আত্মস্বরূপ নিত্যসুখের অভিব্যক্তি হয় অর্থাৎ মুক্তি সেই নিত্যানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ। কিন্তু ভাষ্যকারের উক্ত সন্দর্ভের দ্বারা আমরা তাঁহার উক্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না। কারণ, উক্ত সন্দর্ভে ভাষ্যকারের "আত্মনঃ" এই পদে অভেদার্থে ষষ্ঠী বিভক্তি প্রয়োগের কোন প্রয়োজন বুঝা যায় না। এবং

"মহত্ত্ববৎ" এই পদও উক্ত মতে অনাবশ্যক। পরন্তু বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যাত বেদান্তমতে আত্মা মহান্ হইলেও মহত্ত্ব বা মহৎপরিমাণ তাঁহার ধর্ম্ম নহে এবং নিত্যসুখও তাঁহার ধর্ম নহে, কিন্তু তিনি নিত্যসুখস্বরূপ। ভাষ্যকার কিন্তু মুক্ত আত্মার সম্বন্ধেই বলিয়াছেন,—"অত্যন্তং সুখী ভবতি।" পরন্তু ভাষ্যকার পরে মুক্ত আত্মার নিত্যসুখভোগের খণ্ডন করিতে যেরূপ বিচার করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই তাঁহার পূর্ব্বককথিত খণ্ডনীয় মত পরিস্ফুট হইয়াছে। পরে তাহা বুঝা যাইবে।

আত্মাতে বিদ্যমান নিত্যসুখের অভিব্যক্তি মোক্ষ, ইহা পরে অনেক গ্রন্থে ভট্টমত বলিয়া কথিত হওয়ায় উহা কুমারিল ভট্টের মত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু "শ্লোকবার্ত্তিকে" কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন,—"সুখোপভোগরূপশ্চ যদি মোক্ষঃ প্রকল্প্যতে। স্বর্গ এব ভবেদেষ পর্য্যায়েণ ক্ষয়ী চ সঃ॥" ইত্যাদি (সম্বন্ধাক্ষেপপরিহারপ্রকরণ, ১০৫—১০) অর্থাৎ মোক্ষ সুখভোগরূপ হইলে তাহা স্বর্গের ন্যায় ক্রমশঃ কোন কালে বিনষ্ট হইবেই। সুতরাং মোক্ষ অভাবাত্মক অর্থাৎ সর্ব্বদুঃখের আত্যন্তিক অভাবই মোক্ষ। "শাস্ত্রদীপিকা"র তর্কপাদে মীমাংসক পার্থসারথি মিশ্র 'আনন্দমোক্ষবাদী'র মতের ব্যাখ্যা করিলেও পরে বিশেষ বিচার করিয়া কুমারিল ভট্টের উক্তরূপ মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। অনেকের মতে কুমারিল ভট্টের পূর্ব্বে মীমাংসক তুতাতভট্ট নিত্যসুখের অভিব্যক্তিকে মুক্তি বলিয়া সমর্থন করেন। কুমারিল ভট্ট উক্ত মতের উল্লেখ বরিলেও তিনি নিজে উহা গ্রহণ করেন নাই। "কিরণাবলী" টীকায় উদয়নাচার্য্যও উক্ত মতের উল্লেখ করিতে বলিয়াছেন, "তৌতাতিকাস্তু।" এ বিষয়ে অন্যান্য কথা চতুর্থ খণ্ডে (৩৪৫-৫০ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

বস্তুতঃ নানা কারণে আমরা বুঝিতে পারি যে, ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের পূর্ব্বেও কোন নৈয়ায়িকসম্প্রদায় বলিতেন যে, কণাদের মতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিমাত্রই মুক্তি, কিন্তু গোতমের মতে মুক্তিকালে নিত্যসুখের অনুভূতিও থাকে। সুতরাং গোতমের মতে নিত্যসুখের অনুভববিশিষ্ট আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি। কাশ্মীরের ভাসর্ব্বজ্ঞের গুরুসম্প্রদায়ে উক্তরূপ মত প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি যে, ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন গোতমোক্ত মুক্তির স্বরূপবিষয়ে পূর্ব্বপ্রচলিত উক্ত মতান্তরের খণ্ডন দ্বারা তাঁহার গুরুসম্প্রদায়ের সম্মত মতের প্রতিষ্ঠার জন্যই এখানে পূর্ব্বোক্ত মতান্তরেরই উল্লেখ করিয়াছেন এবং পরে উহার অনুপপত্তি বুঝাইবার জন্য বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন। অতঃপর তাহাই বুঝিতে হইবে।

ভাষ্য। **নিত্যস্যাভিব্যক্তিঃ সংবেদনং, তস্য হেতুবচনম্।** নিত্যস্যাভিব্যক্তিঃ সংবেদনং জ্ঞানমিতি তস্য হেতুর্ব্বাচ্যো যতস্তদুৎপদ্যত ইতি। **সুখবন্নিত্যমিতি চেৎ, সংসারস্থস্য মুক্তেনাবিশেষঃ।** যথা মুক্তঃ সুখেন তৎসংবেদনেন চ সন্নিত্যেনোপপন্নস্তথা সংসারস্থোঽপি প্রসজ্যেত ইতি উভয়স্য নিত্যত্বাৎ। **অভ্যনুজ্ঞানে চ ধর্ম্মাধর্ম্মফলেন সাহচর্য্যং যৌগপদ্যং গৃহ্যেত।** যদিদমুৎপত্তিস্থানেষু ধর্ম্মাধর্ম্মফলং সুখং দুঃখং বা সংবেদ্যতে পর্য্যায়েণ, তস্য চ নিত্যসংবেদনস্য চ সহভাবো যৌগপদ্যং গৃহ্যেত, ন সুখাভাবো নানভিব্যক্তিরস্তি, উভয়স্য নিত্যত্বাৎ।

অনুবাদ—নিত্যের অর্থাৎ নিত্যসুখের অভিব্যক্তি সংবেদন, তাহার হেতু-বচন কর্ত্তব্য। (বিশদার্থ) নিত্যের (নিত্যসুখের) অভিব্যক্তি বলিতে সংবেদন কি না জ্ঞান, তাহার হেতু বলিতে হইবে—যাহা হইতে তাহা উৎপন্ন হয়। সুখের ন্যায় নিত্য, অর্থাৎ ঐ নিত্যসুখের সংবেদনও নিত্য পদার্থ, ইহা যদি বল, (তাহা হইলে) মুক্ত আত্মার সহিত সংসারী আত্মার অবিশেষ হয়। (বিশদার্থ) যেমন মুক্ত আত্মা সৎ নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তিবিনাশশূন্য চিরবিদ্যমান সুখের দ্বারা এবং তাহার সৎ নিত্য সংবেদনের দ্বারা বিশিষ্ট; সংসারী আত্মাও তদ্রূপ প্রসক্ত হয়, যেহেতু উভয়ের নিত্যত্ব [অর্থাৎ উক্ত মতে সেই সুখ ও তাহার সংবেদন বা অনুভব, এই উভয়ই যখন সৎ নিত্য অর্থাৎ সতত সত্তাবিশিষ্ট নিত্য, তখন সমস্ত সংসারী আত্মাও সতত সেই সুখের অনুভববিশিষ্ট, ইহা স্বীকার্য্য] কিন্তু স্বীকার করিলে অর্থাৎ স্বমত-রক্ষার্থ সংসারী আত্মাও নিত্যসুখসম্ভোগী, ইহা বলিলে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফলের সহিত অর্থাৎ সাংসারিক সুখ-দুঃখের সহিত সহভাব কি না যৌগপদ্য গৃহীত হউক? (বিশদার্থ) উৎপত্তিস্থানসমূহে (চতুর্দ্দশ ভুবনে) এই যে ধর্ম্মও অধর্ম্মের ফল সুখ ও দুঃখ যথাক্রমে (সংসারিগণ কর্ত্তৃক) অনুভূত হইতেছে, সেই সাংসারিক সুখদুঃখানু-ভবের এবং "নিত্যসংবেদনে"র অর্থাৎ নিত্যসুখের নিত্যানুভবের সহভাব কি না যৌগপদ্য অনুভূত হউক? অর্থাৎ সংসারী জীবগণ সুখ ও দুঃখ-ভোগকালে

সেই নিত্যসুখভোগও কেন অনুভব করে না? উভয়ের (সুখ ও তাহার অভিব্যক্তির) নিত্যতাবশতঃ সুখের অভাব নাই, অভিব্যক্তিরও অভাব নাই।

ভাষ্য। **অনিত্যত্বে হেতুবচনম্।** অথ মোক্ষে নিত্যস্য সুখস্য সংবেদনমনিত্যং, যত উৎপদ্যতে স হেতুর্ব্বাচ্যঃ। **আত্মমনঃসংযোগস্য নিমিত্তান্তরসহিতস্য হেতুত্বম্।** আত্মমনঃ সংযোগো হেতুরিতি চেৎ, এবমপি তস্য সহকারিনিমিত্তান্তরং বচনীয়মিতি। **ধর্ম্মস্য কারণবচনম্।** যদি ধর্ম্মো নিমিত্তান্তরং, তস্য হেতুর্ব্বাচ্যো যত উৎপদ্যত ইতি। **যোগসমাধিজস্য কার্য্যাবসায়বিরোধাৎ প্রক্ষয়ে সংবেদননিবৃত্তিঃ।** যদি যোগসমাধিজো ধর্ম্মো হেতুস্তস্য কার্য্যাবসায়বিরোধাৎ প্রক্ষয়ে সংবেদনমত্যন্তং নিবর্ত্তেত। **অসংবেদনে চাবিদ্যমানেনাবিশেষঃ।** যদি ধর্ম্মক্ষয়াৎ সংবেদনোপরমো নিত্যং সুখং ন সংবেদ্যতে ইতি কিং বিদ্যমানং ন সংবেদ্যতেঽথাবিদ্যমানমিতি নানুমানং বিশিষ্টেঽস্তীতি।

অনুবাদ—অনিত্যত্ব হইলে হেতুবচন কর্ত্তব্য। (বিশদার্থ) যদি মোক্ষে নিত্যসুখের অনুভব অনিত্য হয়, (তাহা হইলে) যাহা হইতে তাহা উৎপন্ন হয়, সেই হেতু বলিতে হইবে। নিমিত্তান্তর সহিত আত্মমনঃসংযোগেরই (সুখানুভবে) হেতুত্ব। (বিশদার্থ) আত্মমনঃসংযোগ (নিত্যসুখানুভবে) হেতু, ইহা যদি বল, এইরূপ হইলেও তাহার সহকারী কারণান্তর বলিতে হইবে। ধর্ম্মের কারণবচন কর্ত্তব্য। (বিশদার্থ) যদি ধর্ম্ম নিমিত্তান্তর হয় অর্থাৎ সংসারাবস্থায় সুখানুভবে যখন ধর্ম্মই আত্মমনঃসংযোগের সহকারী কারণ, তখন ঐ দৃষ্টান্তে মোক্ষে নিত্যসুখানুভবেও ধর্ম্মই যদি সহকারী কারণ বল, (তাহা হইলে) তাহার কারণ বলিতে হইবে, যাহা হইতে (সেই ধর্ম্ম) উৎপন্ন হয়। যোগসমাধিজাত ধর্ম্মের কার্য্য সমাপ্তির সহিত বিরোধবশতঃ 'প্রক্ষয়' হইলে সংবেদনের নিবৃত্তি হয়। (বিশদার্থ) যদি যোগসমাধিজাত ধর্ম্ম

(মোক্ষে নিত্যসুখানুভবের) কারণ অর্থাৎ সহকারী কারণ হয়, তাহা হইলে তাহার কার্য্য সমাপ্তির সহিত বিরোধবশতঃ অর্থাৎ ধর্ম্মমাত্রই তাহার চরম কার্য্য বা চরমফল-নাশ্য, ধর্ম্মের কার্য্য বা ফলের সমাপ্তি হইলে ধর্ম্ম থাকে না, এ জন্য প্রক্ষয় হইলে অর্থাৎ সেই ধর্ম্মের সম্পূর্ণ ক্ষয় হইলে সংবেদন (নিত্যসুখানুভব) অত্যন্ত নিবৃত্ত হইবে। সংবেদন না হইলে কিন্তু অবিদ্যমানের সহিত অবিশেষ হয়। (বিশদার্থ) যদি ধর্ম্মের ক্ষয়বশতঃ সংবেদনের (নিত্যসুখানুভবের) নিবৃত্তি হয়, নিত্যসুখ অনুভূত না হয়, তাহা হইলে কি বিদ্যমান সুখ অনুভূত হয় না? অথবা অবিদ্যমান সুখ অনুভূত হয় না? বিশিষ্টে অর্থাৎ একতর বিশেষ পক্ষে অনুমানপ্রমাণ (যুক্তি) নাই।

ভাষ্য। **অপ্রক্ষয়শ্চ ধর্ম্মস্য নিরনুমান উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ।** যোগসমাধিজো ধর্ম্মো ন ক্ষীয়ত ইতি নাস্ত্যনুমানমুৎপত্তিধর্ম্মকমনিত্যমিতি বিপর্য্যয়স্য ত্বনুমানম্। যস্য তু সংবেদনোপরমো নাস্তি, তেন সংবেদনহেতুর্নিত্য ইত্যনুমেয়ম্। নিত্যে চ মুক্তসংসারস্থয়োরবিশেষ ইত্যুক্তম্। যথা মুক্তস্য নিত্যং সুখং তৎসংবেদনহেতুশ্চ, সংবেদনস্য তূপরমো নাস্তি, কারণস্য নিত্যত্বাৎ, তথা সংসারস্থস্যাপীতি, এবঞ্চ সতি ধর্ম্মাধর্ম্মফলেন সুখদুঃখসংবেদনেন সাহচর্য্যং গৃহ্যেতেতি।

শরীরাদিসম্বন্ধঃ প্রতিবন্ধহেতুরিতি চেৎ? ন, শরীরাদীনামুপভোগার্থত্বাৎ, বিপর্যয়স্য চাননুমানাৎ। স্যান্মতং, সংসারাবস্থস্য শরীরাদিসম্বন্ধো নিত্যসুখসংবেদনহেতোঃ প্রতিবন্ধকস্তেনাবিশেষো নাস্তীতি। এতচ্চাযুক্তং, শরীরাদয় উপভোগার্থাস্তে ভোগপ্রতিবন্ধং করিষ্যন্তীত্যনুপপন্নম্। ন চাস্ত্যনুমানমশরীরস্যাত্মনো ভোগঃ কশ্চিদস্তীতি।

অনুবাদ—ধর্ম্মের 'অপ্রক্ষয়' অর্থাৎ অত্যন্তবিনাশের অভাব কিন্তু 'নিরনুমান' (অনুমানপ্রমাণশূন্য)। যেহেতু, উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব আছে। (বিশদার্থ) যোগসমাধিজাত ধর্ম্ম বিনষ্ট হয় না, এ বিষয়ে অনুমানপ্রমাণ নাই,

উৎপত্তিধর্ম্মক অনিত্য, এ জন্য অর্থাৎ উৎপত্তিবিশিষ্ট ভাবপদার্থমাত্রই বিনাশী, এইরূপ যথার্থব্যাপ্তিনিশ্চয়বশতঃ বিপর্য্যয়েরই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মের বিনাশিত্বেরই অনুমান আছে। কিন্তু যাহার মতে সংবেদনের উপরম (নিবৃত্তি) নাই অর্থাৎ যাহার মতে সেই নিত্যসুখের সংবেদন বা অনুভব উৎপন্ন পদার্থ হইলেও কখনও তাহার নিবৃত্তি হয় না, তৎকর্ত্তৃক সংবেদনের কারণ নিত্য, ইহা অনুমেয়। নিত্য হইলে কিন্তু মুক্ত ও সংসারস্থ আত্মার অবিশেষ হয়, ইহা (পূর্ব্বে) উক্ত হইয়াছে। (বিশদার্থ) যেমন মুক্ত আত্মার সুখ নিত্য এবং তাহার অনুভবের কারণও নিত্য, কারণের নিত্যত্বপ্রযুক্ত সংবেদনের অর্থাৎ সেই সুখানুভবের কিন্তু নিবৃত্তি নাই, সংসারস্থ আত্মারও তদ্রূপ হউক? আর এইরূপ হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল সুখ-দুঃখানুভবের অর্থাৎ সাংসারিক অনিত্য সুখ-দুঃখ ভোগের সহিত (সেই নিত্যসুখানুভবের) যৌগপদ্য গৃহীত হউক?

শরীরাদি-সম্বন্ধ প্রতিবন্ধের হেতু, ইহা যদি বল? না, অর্থাৎ তাহা বলা যায় না, যেহেতু শরীরাদি উপভোগার্থ এবং বিপর্য্যয়ের অর্থাৎ অশরীর আত্মার উপভোগের অনুমান নাই। (বিশদার্থ) যদি বল, সংসারী আত্মার শরীরাদি সম্বন্ধ নিত্যসুখানুভবের কারণের প্রতিবন্ধক, এ জন্য (সংসারী ও মুক্ত আত্মার) অবিশেষ নাই, ইহা মত হউক, অর্থাৎ ইহা স্বীকার কর? (উত্তর) ইহাও অযুক্ত। কারণ, শরীরাদি উপভোগার্থ, অর্থাৎ সুখভোগের কারণ, তাহারা ভোগের প্রতিবন্ধ করিবে অর্থাৎ নিত্যসুখানুভবের নিত্যকারণ সত্ত্বেও তাহার প্রতিবন্ধক হইবে, ইহা অযুক্ত। অশরীর আত্মার কোন ভোগ আছে, এ বিষয়েও অনুমানপ্রমাণ নাই, অর্থাৎ শরীর ব্যতীতও আত্মা সুখ ভোগ করেন, ইহাও নির্যুক্তিক।

ভাষ্য। **ইষ্টাধিগমার্থা প্রবৃত্তিরিতি চেৎ? ন, অনিষ্টোপরমার্থত্বাৎ।** ইদমনুমানং, ইষ্টাধিগমার্থো মোক্ষোপদেশঃ প্রবৃত্তিশ্চ মুমুক্ষূণাং নোভয়মনর্থকমিতি। এতচ্চাযুক্তং, অনিষ্টোপরমার্থো মোক্ষোপদেশঃ প্রবৃত্তিশ্চ মুমুক্ষূণামিতি, নেষ্টমনিষ্টেনানুবিদ্ধং সম্ভবতীতি ইষ্টমপ্যনিষ্টং সম্পদ্যতে। অনিষ্টহানায় ঘটমান ইষ্টমপি জহাতি। বিবেক-হানস্যাশক্যত্বাদিতি।

দৃষ্টাতিক্রমশ্চ দেহাদিষু তুল্যঃ। যথা দৃষ্টমনিত্যং সুখং পরিত্যজ্য নিত্যং সুখং কাময়তে, এবং দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধীরনিত্যা দৃষ্টা অতিক্রম্য মুক্তস্য নিত্যা দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধয়ঃ কল্পয়িতব্যাঃ, সাধীয়শ্চৈবং মুক্তস্য চৈকাত্ম্যং কল্পিতং ভবতীতি। **উপপত্তি-বিরুদ্ধমিতি চেৎ, সমানম্।** দেহাদীনাং নিত্যত্বং প্রমাণ-বিরুদ্ধং কল্পয়িতুমশক্যমিতি সমানং সুখস্যাপি নিত্যত্বং প্রমাণ-বিরুদ্ধং কল্পয়িতুমশক্যমিতি।

অনুবাদ—প্রবৃত্তি ইষ্টলাভার্থ, ইহা যদি বল ? না, অর্থাৎ ইহা বলা যায় না। যেহেতু, (মুমুক্ষুদিগের প্রবৃত্তি) অনিষ্টনিবৃত্ত্যর্থ। (বিশদার্থ) মোক্ষের উপদেশ ও মুমুক্ষুদিগের প্রবৃত্তি ইষ্টলাভার্থ অর্থাৎ সুখ লাভের জন্য, উভয় অর্থাৎ মোক্ষের উপদেশ ও মুমুক্ষুদিগের প্রবৃত্তি নিরর্থক নহে, এই অনুমান আছে অর্থাৎ উপদেশমাত্র এবং প্রবৃত্তিমাত্রই যখন সুখলাভার্থ, তখন মোক্ষের উপদেশ এবং মুমুক্ষুদিগের প্রবৃত্তিও সুখলাভার্থ ; সুতরাং মোক্ষে নিত্যসুখের অভিব্যক্তি হয়, এ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকার অনুমানপ্রমাণই আছে, উহা নিষ্প্রমাণ হইবে কেন ? (উত্তর) ইহাও অযুক্ত। মোক্ষের উপদেশ ও মুমুক্ষুদিগের প্রবৃত্তি অনিষ্টনিবৃত্ত্যর্থ অর্থাৎ কেবল দুঃখনিবৃত্তির জন্য। অনিষ্টের সহিত (দুঃখের সহিত) অননুবিদ্ধ (সম্বন্ধহীন) ইষ্ট (সুখ) সম্ভব নহে ; এ জন্য (মুমুক্ষুর) সুখও দুঃখ হয়। সুতরাং (মুমুক্ষু) দুঃখ-পরিহারের জন্য প্রবর্ত্তমান হইয়া সুখও ত্যাগ করেন। যেহেতু "বিবেকহান" অর্থাৎ পৃথক্ করিয়া ত্যাগ অশক্য। (অর্থাৎ দুঃখ-সংবলিত সুখের সুখ মাত্র গ্রহণ করিয়া, কেবল দুঃখাংশকে ত্যাগ করা যায় না ; দুঃখ-পরিহার করিতে হইলে একেবারে সুখকেও পরিত্যাগ করিতে হয়)।

দৃষ্টের অতিক্রমও দেহাদিবিষয়ে তুল্য। (বিশদার্থ) যেমন দৃষ্ট অনিত্য সুখ পরিত্যাগ করিয়া (মুমুক্ষু) নিত্যসুখ কামনা করেন, এইরূপ দৃষ্ট অনিত্য দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া মুক্ত ব্যক্তির নিত্য দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি কল্পনা করিতে হয় অর্থাৎ মুক্ত ব্যক্তি যদি নিত্যসুখ-ভোগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিত্য দেহাদিও কল্পনা করিতে হইবে। এইরূপ হইলে মুক্ত ব্যক্তির ঐকাত্ম্যও অর্থাৎ কৈবল্যও সাধুতররূপেই কল্পিত হয়। (পূর্ব্বপক্ষ) উপপত্তি-বিরুদ্ধ, ইহা যদি বল ? (উত্তর) সমান। (বিশদার্থ), দেহাদির প্রমাণবিরুদ্ধ

নিত্যত্ব কল্পনা করা যায় না, ইহা বলিলে সুখেরও প্রমাণবিরুদ্ধ নিত্যত্ব কল্পনা করা যায় না, ইহা সমান।

ভাষ্য। **আত্যন্তিকে চ সংসারদুঃখাভাবে সুখবচনা দাগমেঽপি সত্যবিরোধঃ।** যদ্যপি কশ্চিদাগমঃ স্যাৎ, মুক্তস্যাত্যন্তিকং সুখমিতি সুখশব্দ আত্যন্তিকে দুঃখাভাবে প্রযুক্ত ইত্যেবমুপপদ্যতে, দৃষ্টো হি দুঃখাভাবে সুখশব্দপ্রয়োগো বহুলং লোক ইতি।

নিত্যসুখরাগস্যাপ্রহাণে মোক্ষাধিগমাভাবো রাগস্য বন্ধনসমাজ্ঞানাৎ। যদ্যয়ং মোক্ষে নিত্যং সুখমভিব্যজ্যতে ইতি নিত্যসুখরাগেণ মোক্ষায় ঘটমানো ন মোক্ষমধিগচ্ছেন্নাধিগন্তুমর্হতীতি বন্ধনসমাজ্ঞাতো হি রাগঃ। ন চ বন্ধনে সত্যপি কশ্চিন্মুক্ত ইত্যুপপদ্যত ইতি। **প্রহীণনিত্যসুখরাগস্যাপ্রতিকূলত্বম্।** অথাস্য নিত্যসুখরাগঃ প্রহীয়তে তস্মিন্ প্রহীণে নাস্য নিত্যসুখরাগঃ প্রতিকূলো ভবতি। যদ্যেবং, মুক্তস্য নিত্যং সুখং ভবতি, অথাপি ন ভবতি, নাস্যোভয়োঃ পক্ষয়োর্মোক্ষাধিগমো বিকল্প্যত ইতি।

অনুবাদ—আত্যন্তিক সংসার-দুঃখাভাবে 'সুখবচন' অর্থাৎ "সুখ" শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় আগম থাকিলেও বিরোধ নাই। (বিশদার্থ) যদিও মুক্ত আত্মার আত্যন্তিক সুখ, এইরূপ কোন আগম (শাস্ত্রবাক্য) থাকে, (তাহাতে) সুখ শব্দ আত্যন্তিক দুঃখাভাব অর্থে প্রযুক্ত, এইরূপে উপপন্ন হয়। দুঃখাভাব অর্থে সুখশব্দের প্রয়োগ লোকেও অর্থাৎ লৌকিক বাক্যেও বহু দৃষ্ট হয়।

পরন্তু নিত্যসুখে রাগের অপরিত্যাগে মোক্ষলাভ হয় না, যেহেতু রাগের "বন্ধনসমাজ্ঞান" অর্থাৎ বন্ধনরূপেই সম্যক্ উপদেশ হইয়াছে। (বিশদার্থ) যদি ইনি অর্থাৎ মুমুক্ষু, মোক্ষে নিত্য সুখ অভিব্যক্ত হয়, এজন্য নিত্যসুখে রাগ বা আকাঙ্ক্ষাবশতঃ মোক্ষের নিমিত্ত প্রবর্ত্তমান হন, তাহা হইলে মোক্ষকে লাভ করেন না, লাভ করিতে যোগ্য হন না, যেহেতু রাগ বন্ধন-সমাজ্ঞাত অর্থাৎ

বন্ধনরূপেই উপদিষ্ট। কিন্তু বন্ধন থাকিলেও কেহ মুক্ত হয়, ইহা উপপন্ন হয় না। (পূর্ব্বপক্ষ) পরিত্যক্ত নিত্যসুখরাগের প্রতিকূলত্ব নাই। (বিশদার্থ) যদি ইহার নিত্যসুখরাগ প্রহীণ হয় অর্থাৎ পরে স্বয়ং ইহাকে পরিত্যাগ করে, তাহা প্রহীণ হইলে ইহার নিত্যসুখরাগ প্রতিকূল অর্থাৎ মোক্ষলাভের প্রতিবন্ধক হয় না। (উত্তর) যদি এইরূপ হয় অর্থাৎ পরে যদি তাঁহার নিত্যসুখে রাগ না থাকে, তাহা হইলে নিত্যসুখ হউক, অথবা না হউক, উভয় পক্ষেই ইহার মোক্ষলাভ সন্দিগ্ধ হয় না।

টিপ্পনী—ভাষ্যকার পরে বিচারদ্বারা পূর্ব্বোক্ত মতের অনুপপত্তি বুঝাইতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, নিত্যপদার্থের অভিব্যক্তি বলিতে তাহার সংবেদন অর্থাৎ অনুভব। সুতরাং মুক্ত আত্মার সেই নিত্যসুখানুভবের উৎপাদক কারণ কি, তাহা বক্তব্য। যদি বল, সেই সুখের ন্যায় তাহার সেই অনুভবও নিত্য অর্থাৎ তাহার কোন কারণ নাই, তাহা হইলে সংসারী সমস্ত আত্মাও সর্ব্বদা সেই নিত্যসুখের অনুভববিশিষ্ট, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা স্বীকার করিলে চতুর্দ্দশ ভুবনে যে সমস্ত আত্মা যথাক্রমে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফল সুখ ও দুঃখের অনুভব করিতেছে, তাহাদিগের সেই অনুভব এবং নিত্য সুখের অনুভবের যৌগপদ্য গৃহীত হউক? অর্থাৎ একই সময়ে তাহারা সাংসারিক সুখভোগ অথবা দুঃখভোগ এবং সেই নিত্যসুখ-ভোগ করিতেছে, ইহা তাহারা কেন বুঝে না? কারণ, নিত্যত্ববশতঃ তাহাদিগের সেই সুখও আছে এবং তাহার অনুভবও আছে। কিন্তু সংসারী আত্মা কখনই নিত্যসুখের অনুভব করে না। দুঃখের অনুভবকালে সুখের অনুভবও হয় না। সুতরাং সেই নিত্য সুখের অনুভবকে অনিত্যই বলিতে হইবে। তাহা হইলে উহার উৎপাদক কারণ বক্তব্য। আত্ম-মনঃসংযোগকে উহার কারণ বলিলে তাহার সহকারী কোন কারণও বক্তব্য। কারণ, সহকারিকারণ-সহিত আত্ম-মনঃসংযোগই সুখানুভবের কারণ হইয়া থাকে। ধর্ম্মকে তাহার সহকারী কারণ বলিলে সেই ধর্ম্মের উৎপাদক কারণ বক্তব্য। যদি বল, মুমুক্ষুর যোগসমাধিজাত ধর্ম্মই তাহার সহকারী কারণ, কিন্তু ইহা বলিলে সেই নিত্যসুখানুভব চিরস্থায়ী হইতে পারে না। কারণ, কার্য্যের "অবসায়" অর্থাৎ সমাপ্তির সহিত ধর্ম্মের বিরোধবশতঃ ফল-সমাপ্তি হইলেই ধর্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে। সুতরাং স্বর্গাদিজনক ধর্ম্মের ক্ষয়ে যেমন স্বর্গাদি ফলের নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ যোগসমাধিজাত ধর্ম্মের সম্পূর্ণ ক্ষয় হইয়া গেলে সেই নিত্য সুখানুভবেরও অত্যন্ত নিবৃত্তি হইবেই। সেই নিত্যসুখের

কোন সময়ে সংবেদন বা অনুভব না হইলেও উহা সেই আত্মাতে বিদ্যমান থাকে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, তখন কি বিদ্যমান নিত্যসুখ অনুভূত হয় না, অথবা অবিদ্যমান নিত্যসুখ অনুভূত হয় না, এইরূপে বিশিষ্টে অর্থাৎ ঐ উভয় পক্ষের মধ্যে কোন বিশেষ পক্ষে অনুমানপ্রমাণ নাই। অননুভূত সুখের অস্তিত্বে কোন প্রমাণ নাই।

যোগসমাধিজাত ধর্ম্মের কখনও ক্ষয় না, ইহা কিন্তু নিরনুমান। কারণ, ঐ ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। কিন্তু উৎপত্তিধর্ম্মক ভাবপদার্থমাত্রই বিনাশী। সুতরাং ঐ ধর্ম্মের বিনাশিত্বই অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ হয়। কিন্তু যাঁহার মতে সেই নিত্যসুখানুভবের কখনও নিবৃত্তি হয় না, তিনি সেই নিত্যসুখানুভবের কারণকে নিত্য পদার্থ বলিয়াই অনুমান করিবেন। কিন্তু সেই কারণ নিত্য হইলে সংসারী আত্মাতেও সতত তাহার কার্য্য নিত্যসুখানুভব জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে মুক্ত আত্মা ও সংসারী আত্মার অবিশেষ হয়, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। যদি বল, কারণ থাকিলেও প্রতিবন্ধকবশতঃ তাহার কার্য্য হয় না। সংসারী আত্মার শরীরাদিসম্বন্ধই নিত্যসুখানুভবের প্রতিবন্ধক। কিন্তু ইহাও অযুক্ত। কারণ, শরীরাদি উপভোগার্থ। সুতরাং যে সমস্ত পদার্থ সুখভোগের সহায় বা সাধন, তাহাই সুখভোগের প্রতিবন্ধক হইবে, ইহা উপপন্ন হয় না। আর শরীরাদিশূন্য কেবল আত্মার যে, কোন ভোগ আছে, এ বিষয়েও অনুমান বা যুক্তি নাই।

যদি বল, মুমুক্ষুদিগের মোক্ষ-সাধনে যে প্রবৃত্তি হয় এবং শাস্ত্রে মোক্ষবিষয়ে যে সমস্ত উপদেশ আছে, তাহা ইষ্টলাভার্থ। সুখই ইষ্ট পদার্থ। সুতরাং নিত্যসুখের অনুভবই যে, সেই প্রবৃত্তি ও উপদেশের প্রয়োজন, ইহা অনুমান-প্রমাণসিদ্ধ। কিন্তু ইহাও বলা যায় না। কারণ, কেবল দুঃখ-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেও অনেক প্রবৃত্তি এবং অনেক উপদেশ হওয়ায় প্রবৃত্তিমাত্র এবং উপদেশমাত্রই যে, সুখলাভার্থ, এইরূপ ব্যাপ্তি বা নিয়ম নাই। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই মুমুক্ষুদিগের মোক্ষ-সাধনে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কারণ, একেবারে দুঃখসম্বন্ধশূন্য সুখ সম্ভবই নহে, ইহা বুঝিয়া প্রকৃত মুমুক্ষু সমস্ত সুখকেও দুঃখ বলিয়া বুঝেন। সুতরাং তিনি সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই প্রবর্ত্তমান হইয়া সমস্ত সুখকেও পরিত্যাগ করেন। আর যদি বল, তিনি দৃষ্ট অর্থাৎ লৌকিক অনিত্য সুখ পরিত্যাগ করিয়া নিত্যসুখভোগেরই কামনা করেন, তাহা হইলে দৃষ্ট অনিত্য দেহাদি পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিকালে

তাঁহার নিত্যদেহাদিও কল্পনীয়। তাহা হইলে তাঁহার "ঐকাত্ম্য"ও সাধুতরই কল্পিত হয়। (ইহা ভাষ্যকারের সোপহাস উক্তি বুঝা যায়।) অর্থাৎ মুক্ত আত্মার দেহাদি কিছুই থাকে না, তখন সেই এক আত্মাই স্ব-স্বরূপে থাকেন, এই অর্থেই মুক্তিকে "ঐকাত্ম্য" বলা হইয়াছে। কিন্তু মুক্তিকালেও তাহার নিত্যদেহাদি কল্পনা করিলে তাহার ঐকাত্ম্যও উক্তরূপে কল্পিতই হয় এবং প্রকৃত ঐকাত্ম্য হইতে উহা সাধুতরই হয়। কারণ, দেহাদিশূন্য আত্মার নিত্য-সুখভোগরূপ মোক্ষ হইতে দেহাদিবিশিষ্ট আত্মার নিত্যসুখভোগরূপ কল্পিত মোক্ষই সাধুতর। সুতরাং মুক্ত পুরুষের নিত্যদেহাদিও কল্পনীয়। যদি বল, দেহাদির নিত্যত্ব প্রমাণবিরুদ্ধ বলিয়া তাহা কল্পনা করা যায় না, এতদুত্তরে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন, **"সমানম্,"** অর্থাৎ তাহা হইলে সুখেরও নিত্যত্ব প্রমাণবিরুদ্ধ বলিয়া উহাও কল্পনা করা যায় না, ইহা সমান উত্তর।

পূর্ব্বপক্ষবাদী অবশ্যই বলিবেন যে, মুক্ত পুরুষের নিত্যসুখভোগ বিষয়ে আগমপ্রমাণ থাকায় উহা নিষ্প্রমাণ বলা যায় না। "ন্যায়সার" গ্রন্থের শেষ ভাগে ভাসর্ব্বজ্ঞও বলিয়াছেন, "কুতো মুক্তস্য সুখোপভোগ ইতি চেৎ? আগমাৎ। উক্তং হি, "সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ং। তঞ্চ মোক্ষং বিজানীয়াদ্ দুষ্প্রাপমকৃতাত্মভিঃ॥" তথা—"আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষেঽভিব্যজ্যতে।" "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি।" আগমবিরুদ্ধ অনুমান যে, প্রমাণ নহে, ইহা ভাষ্যকার বাৎস্যায়নেরও সম্মত। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, যদিও মুক্ত আত্মার আত্যন্তিক সুখবোধক কোন আগম বা শাস্ত্রবাক্য থাকে, তাহা হইলেও বিরোধ নাই। কারণ, সেই শাস্ত্রবাক্যে মুক্ত পুরুষের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিকেই আত্যন্তিক সুখ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ দুঃখাভাব অর্থেই "সুখ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। লোকেও দুঃখাভাব অর্থে "সুখ" শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ বহু দৃষ্ট হয়। যেমন সাময়িক জ্বরবিরামের পরে রোগী বলে,—"আমি সুখী হইলাম।" গুরুতর ভার নামাইয়া ভারবাহী বলে, —"সুখী হইলাম।" উক্তরূপ প্রয়োগে সেই রোগী ও ভারবাহীর জ্বর ও ভারবহনজন্য দুঃখের নিবৃত্তি বা অত্যন্তাভাবই উক্ত "সুখ" শব্দের লাক্ষণিক অর্থ। এখানে ভাষ্যকারের "যদ্যপি কশ্চিদাগমঃ স্যাৎ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে, ভাষ্যকার পরবর্ত্তী ভাসর্ব্বজ্ঞের উদ্ধৃত "সুখমাত্যন্তিকং" ইত্যাদি বচনকেই বুদ্ধিস্থ করিয়া ঐ কথা বলিয়াছেন এবং ভাষ্যকারের সময়ে সম্প্রদায়বিশেষে উক্ত বচন প্রচলিত থাকিলেও উহার আগমত্ব অনেকে স্বীকার

করেন নাই। ভাষ্যকার "যদ্যপি" এই উক্তির দ্বারা ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন। সে যাহা হউক, ভাষ্যকারের মতে "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং" ইত্যাদি অন্যান্য শ্রুতিবাক্যেও "আনন্দ" শব্দের আত্যন্তিক দুঃখাভাব অর্থেই প্রয়োগ হইয়াছে, ইহাও তাঁহার ঐ কথার দ্বারা বুঝিতে হইবে। অবশ্য মুখ্য অর্থে বাধক না থাকিলে লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করা যায় না। পূর্ব্বোক্ত মত সমর্থন করিতে ভাসর্ব্বজ্ঞও পরে বলিয়াছেন,—"মুখ্যার্থে বাধকাভাবান্নোপচারকল্পনা।" কিন্তু ভাষ্যকার পূর্ব্বে বিচারপূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মুক্ত পুরুষের নিত্যসুখের অনুভবকে নিত্যও বলা যায় না এবং অনিত্যও বলা যায় না। সুতরাং মুক্ত পুরুষের নিত্যসুখের অনুভব অলীক, অতএব উহা আগমার্থ হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত সুখবাচক শব্দের আত্যন্তিক দুঃখাভাবরূপ লাক্ষণিক অর্থই গ্রাহ্য। ভাষ্যকারের মতানুসারী পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণও উহাই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

ভাষ্যকার পরে তাঁহার শেষ কথা বলিয়াছেন যে, মুমুক্ষুর নিত্যসুখে রাগ বা কামনা থাকিলে মোক্ষলাভ হইতেই পারে না। কারণ, রাগ বা কামনা যে বন্ধন, ইহা সর্ব্বসম্মত। বন্ধন থাকিলে কাহাকেও মুক্ত বলা যায় না। "তাৎপর্য্যটীকা"কার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, মুমুক্ষু নিত্যসুখের কামনায় মোক্ষ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে কামনাপিশাচী কখনও উপস্থিত বিষয়সুখেও তাঁহাকে প্রবৃত্ত করাইয়া তাঁহার অভীষ্ট মোক্ষকে সুদূরপরাহত করিবে। অতএব মুমুক্ষু কখনই কোন কামনাকে কিছুমাত্র স্থান দিবেন না। এইরূপ রাগের ন্যায় দ্বেষও বন্ধন। সুতরাং সর্ব্ববিষয়ে দ্বেষও তিনি পরিত্যাগ করিবেন। সুখের কামনা পরিত্যাগ করিলে সুখকে দ্বেষ করা হয় না। দুঃখ-পরিহারে ইচ্ছা করিলেও দুঃখে দ্বেষ করা হয় না। বৈরাগ্যবশতঃই জন্মাদি সমস্ত দুঃখ-পরিহারে ইচ্ছা জন্মে। বৈরাগ্য ও দ্বেষ এক পদার্থ নহে। মূল কথা, মুমুক্ষুর নিত্যসুখভোগের কামনা থাকিলে বন্ধন থাকায় তাহার মুক্তি হইতে পারে না। সুতরাং মুক্ত পুরুষের নিত্য সুখের প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যে সুখবাচক শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করা যায় না। ভাষ্যকারের উক্তরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া বাচস্পতি মিশ্রও পরে বলিয়াছেন,—"তস্মান্নিত্যানন্দপ্রতিপাদকশ্রুতিরাত্যন্তিকে দুঃখবিয়োগে ভাক্তীতি যুক্তমিতি ভাবঃ।"

পূর্ব্বপক্ষবাদী অবশ্যই বলিবেন যে, মুমুক্ষুর প্রথমে নিত্যসুখে রাগ জন্মিলেও পরে উৎকট বৈরাগ্যবশতঃ সেই রাগও "প্রহীণ" অর্থাৎ পরিত্যক্ত হয়। তাহার সেই নিত্যসুখ-রাগ পরে স্বয়ংই তাহাকে পরিত্যাগ করে। সুতরাং তখন

তাহার কোন বন্ধনই না থাকায় মোক্ষলাভের প্রতিকূল কিছুই থাকে না। ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে এই কথারও উল্লেখ করিয়া, তদুত্তরে বলিয়াছেন,— "যত্ত্বেবং" ইত্যাদি। বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "যদি নিত্যং সুখং ভবতি, কামং ভবতু মাভূৎ, উভয়োরপি পক্ষয়োর্ব্বীতরাগপ্রবৃত্তৌ ন মোক্ষাধিগমো বিকল্প্যতে, ন সন্দিগ্ধো ভবতীত্যর্থঃ।"—(তাৎপর্য্যটীকা)। অর্থাৎ উৎকট বৈরাগ্যবশতঃ মুমুক্ষু সর্ব্ববিষয়েই বীতরাগ হইলে অর্থাৎ তাহার সেই নিত্যসুখভোগেও কিছুমাত্র রাগ না থাকিলে শেষাবস্থায় তাহার সেই নিত্যসুখভোগ হউক বা না হউক, তাহার মোক্ষলাভ বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। কারণ, চরম তত্ত্ব-জ্ঞানের ফলে তাহার জন্মপ্রবাহের অত্যন্ত উচ্ছেদবশতঃ সর্ব্বদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হওয়ায় তাহাকে তখন মুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। যে নিত্যসুখভোগে রাগও বহু পূর্ব্বেই তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই নিত্যসুখভোগ না হইলেও তাহার মুক্তির অভাব বলা যায় না। কিন্তু সর্ব্ববিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি না হইলে কোন মতেই "অপবর্গ" অর্থাৎ চরম মুক্তি হয় না। সুতরাং মহর্ষি গোতম এই সূত্রের দ্বারা অপবর্গের উক্তরূপ লক্ষণই বলিয়াছেন। শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন,— "জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখৈর্ব্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥"—গীতা।

কিন্তু শৈবাচার্য্য ভাসর্ব্বজ্ঞ "ন্যায়সারে"র শেষভাগে পূর্ব্বোক্ত কথার প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছেন যে, মুক্ত পুরুষের নিত্যসুখভোগের প্রতিপাদক শাস্ত্রবাক্যে সুখবাচক শব্দের মুখ্য অর্থে কোন বাধক নাই। সেই নিত্যসুখের ভোগ বা অনুভবও নিত্য-পদার্থ। কিন্তু তাহা হইলেও সংসারী আত্মা ও মুক্ত আত্মার অবিশেষের আপত্তি হয় না। কারণ, সংসারকালে আত্মগত সেই নিত্যসুখ ও তাহার নিত্য অনুভবের বিষয়-বিষয়িভাগ সম্বন্ধ ঘটে না। যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং তাহার গ্রাহ্য বিষয় নিকটস্থ হইলেও মধ্যে ভিত্তি প্রভৃতি কোন ব্যবধান থাকিলে তখন সেই বিষয়ের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগসম্বন্ধ ঘটে না। কিন্তু সেই ব্যবধান অপগত হইলে তখন সেই দৃশ্য বিষয়ের সহিত তাহার সংযোগসম্বন্ধ ঘটে, তদ্রূপ আত্মাতে সেই নিত্যসুখ ও তাহার নিত্য অনুভব চিরবিদ্যমান হইলেও সংসারাবস্থায় পাপাদি প্রতিবন্ধকবশতঃ ঐ উভয়ের বিষয়-বিষয়িভাব সম্বন্ধ জন্মে না। কিন্তু মুক্তিকালে কোন প্রতিবন্ধক না থাকায় তখন সেই সুখ ও তাহার অনুভবের বিষয়-বিষয়িভাব সম্বন্ধ জন্মে অর্থাৎ তখনই সেই সুখ তাহার নিত্য অনুভবের বিষয় হয়, সংসারকালে তাহা হইতে পারে

না। আর মুক্তিকালে সেই নিত্যসুখ ও তাহার নিত্য অনুভবের যে বিষয়-বিষয়িভাব সম্বন্ধ, তাহা জন্য পদার্থ হইলেও তাহার বিনাশের কোন কারণ না থাকায় কখনও বিনাশ হইতে পারে না। উৎপন্ন পদার্থমাত্রই যে বিনাশী, এইরূপ ব্যাপ্তি বা নিয়ম নাই। কারণ, যে কোন পদার্থের ধ্বংস উৎপন্ন পদার্থ হইলেও কখনও সেই ধ্বংসের ধ্বংস হয় না। সুতরাং ধ্বংসের ন্যায় নিত্যসুখ ও তাহার নিত্য অনুভবের সেই সম্বন্ধ উৎপন্ন পদার্থ হইলেও অবিনাশী বলা যায়। কারণ, উহার বিনাশের কোন কারণ নাই। এ বিষয়ে ভাসর্ব্বজ্ঞ আরও বিচার করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন যে, উক্ত নিত্যসুখ নিত্যসংবেদ্য। এই নিত্যসুখবিশিষ্ট আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই পুরুষের অর্থাৎ জীবাত্মার মোক্ষ।*

এখানে বলা আবশ্যক যে, উদয়নাচার্য্যেরও পূর্ব্ববর্ত্তী ভাসর্ব্বজ্ঞ উক্ত মত সমর্থন করিতে গোতমের কোন সূত্র প্রদর্শন করেন নাই। তবে প্রাচীনকালে তাঁহার গুরুসম্প্রদায়ে যে, উক্তরূপ মতই প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহা বুঝিবার আরও কারণ আছে। (চতুর্থ খণ্ড, ৩৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু "ন্যায়সার" গ্রন্থে কোন কোন বিষয়ে ভাসর্ব্বজ্ঞের ব্যাখ্যাত ন্যায়মত প্রাচীন কালেও ন্যায়ৈক-দেশিমত বলিয়াই কথিত হইয়াছে। তাই আচার্য্য শঙ্করের শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্যও "মানসোল্লাস" গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবং।" অর্থাৎ ন্যায়ৈকদেশী সম্প্রদায়ও প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ, এই প্রমাণত্রয়বাদী। ভাসর্ব্বজ্ঞও মহর্ষি গোতমের মতে উপমানপ্রমাণ যে শব্দপ্রমাণের অন্তর্গত, সুতরাং প্রমাণ ত্রিবিধ, ইহা সমর্থন করিতে অনেক কষ্টকল্পনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ গোতমের মতে প্রমাণ চতুর্ব্বিধ, ইহাই সত্য। সুতরাং সুরেশ্বরও উক্ত প্রমাণত্রয়বাদকে নৈয়ায়িক মত বলেন নাই। কিন্তু ন্যায়ৈকদেশিমত বলিয়াছেন। এইরূপ গোতমোক্ত মুক্তির স্বরূপ বিষয়েও ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের সমর্থিত মতই নৈয়ায়িকমত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণও বিচার দ্বারা উক্ত মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তাই মাধবাচার্য্যও "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" ("অক্ষপাদদর্শনে") বহু বিচারপূর্ব্বক অক্ষপাদের উক্তরূপ মতেরই ব্যাখ্যা ও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। মুক্তির স্বরূপাদি বিষয়ে অন্যান্য

---

* "তস্মাৎ কৃতকত্বেঽপি সুখসংবেদনসম্বন্ধস্য বিনাশকারণাভাবান্নিত্যত্বং স্থিতং। তৎ সিদ্ধমেতন্নিত্যসংবেদ্যং। অনেন সুখেন বিশিষ্টা আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিঃ পুরুষস্য মোক্ষ ইতি।" —"ন্যায়সারে"র শেষ।

কথা ও বিচার পরে লিখিত হইয়াছে। চতুর্থ খণ্ড, ৩৩৩-৬২ পৃষ্ঠা অবশ্য দ্রষ্টব্য ॥ ২২ ॥

প্রমেয়লক্ষণ-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

ভাষ্য। স্থানবত এব তর্হি সংশয়স্য লক্ষণং বাচ্যমিতি তদুচ্যতে।

অনুবাদ—তৎকালে অর্থাৎ প্রথম সূত্রে পদার্থের উদ্দেশ-সময়ে ক্রমপ্রাপ্ত সংশয়েরই লক্ষণ (এখন) বক্তব্য, এ জন্য তাহা উক্ত হইতেছে।

সূত্র। সমানানেকধর্ম্মোপপত্তের্ব্বিপ্রতিপত্তে-রুপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতশ্চ বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—(১) সাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞানজন্য, (২) অসাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞানজন্য, (৩) বিপ্রতিপত্তিজন্য অর্থাৎ এক পদার্থে বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক বাক্যজন্য, (৪) উপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য, এবং (৫) অনুপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য "বিশেষাপেক্ষ" অর্থাৎ যাহাতে পূর্ব্বে বিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধি হয় না, কিন্তু বিশেষ ধর্ম্মের স্মৃতি আবশ্যক, এমন "বিমর্শ" অর্থাৎ একই পদার্থে নানা বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান—"সংশয়"।

টিপ্পনী—প্রমেয় পদার্থের লক্ষণের পরে এখন তৃতীয় "সংশয়" পদার্থের লক্ষণই বক্তব্য। কারণ, প্রথম সূত্রে প্রমেয় পদার্থের পরেই সংশয় পদার্থ উদ্দিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং উহা স্থানবান্ অর্থাৎ ক্রমপ্রাপ্ত। ভাষ্যকার ইহাই প্রকাশ করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—"স্থানবত এব তর্হি" ইত্যাদি।* পরে এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

এই সূত্রে সর্ব্বশেষে "সংশয়ঃ" এই পদের দ্বারা লক্ষ্য নির্দ্দেশ হইয়াছে এবং তৎপূর্ব্বে "বিমর্শঃ" এই পদের দ্বারা সংশয়ের সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে "বিশেষাপেক্ষঃ" এই পদের দ্বারা বিশেষধর্ম্মের উপলব্ধি যে সংশয়মাত্রেরই প্রতিবন্ধক, কিন্তু সংশয়বিষয়ীভূত সেই বিশেষ ধর্ম্মের স্মরণ তাহাতে আবশ্যক, ইহাই সূচিত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে "সমানানেকধর্ম্মোপপত্তেঃ" ইত্যাদি পঞ্চম্যন্ত পদত্রয়ের দ্বারা সূচিত হইয়াছে যে, পঞ্চবিধ বিশেষ কারণজন্য সংশয় পঞ্চবিধ।

---

* "স্থানং ক্রমঃ, তদ্বত এব। তর্হি তদানীমুদ্দেশসময়ে ক্রমবতঃ সংশয়স্য প্রমেয়ানন্তরমুদ্দিষ্টস্য প্রমেয়লক্ষণানন্তরং স্থানং ক্রমো লক্ষণস্য ইত্যর্থঃ।"—তাৎপর্য্যটীকা।

বিশেষ কারণজন্য সংশয় বিশিষ্ট হওয়ায় এই পক্ষে সূত্রোক্ত "বিমর্শ" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে, বিশিষ্ট মর্শ অর্থাৎ বিশেষ সংশয়। ভাষ্যকার সংশয়াত্মক জ্ঞানকেই বলিয়াছেন বিমর্শমাত্র এবং অনবধারণরূপ জ্ঞান। সংশয়স্থলে ইদন্ত্বাদি কোন ধর্ম্মরূপে সংশয়ের বিশেষ্য বা ধর্ম্মীর অবধারণ নিশ্চয় হইলেও সেই সংশয়ের কোটিরূপ বিশেষ ধর্ম্মের অবধারণ না হওয়ায় সেই অংশেই উহা অনবধারণ বা সংশয় বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং সামান্যতঃ নিশ্চয় ভিন্ন জ্ঞানত্বই সংশয়ের সামান্য লক্ষণ বলা যায় না এবং সংশয়ত্বকে সেই জ্ঞানগত জাতিবিশেষও বলা যায় না। কারণ, ধর্ম্মী অংশে সেই জ্ঞানে সংশয়ত্ব থাকে না। আংশিক জাতি স্বীকার করা যায় না। বৈশেষিক দর্শনের "উপস্কার" টীকায় (২।২।১৭) শঙ্কর মিশ্রও পরে ইহাই বলিয়া সংশয়ের সামান্য লক্ষণ বলিয়াছেন, "একস্মিন্ ধর্ম্মিণি বিরোধি নানাপ্রকারকং জ্ঞানং সংশয়ঃ।"

বস্তুতঃ "মৃশ" ধাতুর জ্ঞান অর্থ এবং "বি" শব্দের বিরোধ অর্থ গ্রহণ করিয়া সূত্রোক্ত "বিমর্শ" শব্দের দ্বারাও নানা বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান বুঝা যায়। একই ধর্ম্মীতে নানা বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞানই সংশয়াত্মক হয়। সুতরাং সূত্রোক্ত "বিমর্শ" শব্দের দ্বারাও সেইরূপ জ্ঞানবিশেষই মহর্ষির বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ একধর্ম্মিক নানা বিরুদ্ধধর্ম্মপ্রকারক জ্ঞানত্বই সংশয়ের সামান্য লক্ষণ। কোন এক ধর্ম্মীতে নানা বিরুদ্ধ পদার্থের 'সমূহালম্বন' জ্ঞান হইলে সেখানে সেই সমস্ত বিশেষণভেদে সেই ধর্ম্মিগত বিশেষ্যতাও ভিন্ন হয়। কিন্তু সংশয়স্থলে সেই ধর্ম্মিগত বিশেষ্যতা এক। সেই সমস্ত বিভিন্নপ্রকারতানিরূপিত একবিশেষ্যতা-বিশিষ্ট জ্ঞানই সংশয়। যেমন ইহা কি স্থাণু? অথবা পুরুষ? এইরূপে যে সংশয় জন্মে, তাহাতে সম্মুখীন সেই একই পদার্থ মুখ্য বিশেষ্য এবং সেই বিশেষ্য পদার্থে বিশেষ্যতারূপ বিষয়তা এক। স্থাণুত্ব ও পুরুষত্বরূপ দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সেই একই বিশেষ্যে মুখ্য বিশেষণরূপে বিষয় হয়। সুতরাং তাহাতে প্রকারতানামক পৃথক্ দুইটি বিষয়তা থাকায় উহাকে বলে একবিশেষ্যতানিরূপক নানাবিরুদ্ধধর্ম্মপ্রকারতাশালি জ্ঞান। এ বিষয়ে মতভেদও আছে। মতান্তরে সংশয়জ্ঞানে কোটিদ্বয়ের বিরোধও বিষয় হয়। নব্য নৈয়ায়িকগণ সংশয়-বিষয়ীভূত কোটিদ্বয়স্থ বিষয়তার বিশেষ নাম বলিয়াছেন "কোটিতা"।

অনেক নব্য নৈয়ায়িক সর্ব্বত্র কোন ভাব পদার্থ এবং তাহার অভাবকেই সংশয়ের কোটি বলিয়া ভাবমাত্রকোটিক সংশয় স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে উক্ত স্থলে 'অয়ং স্থাণুর্ন বা' অথবা 'অয়ং পুরুষো ন বা' এইরূপ

আকারেই সংশয় জন্মে অর্থাৎ স্থাণুত্ব ও তাহার অভাব অথবা পুরুষত্ব ও তাহার অভাবই উক্তরূপ সংশয়ের কোটি হয়। কিন্তু নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ "ভাষা-পরিচ্ছেদে" প্রথমে "নরো বা স্থাণুর্ব্বা" এইরূপ জ্ঞানকেও সংশয় বলিয়াছেন। উক্ত স্থানে "বা" শব্দের দ্বারাই অভাব বুঝা গেলে "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ন বা" ইত্যাদি বাক্যে "নঞ্" শব্দের প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। বস্তুতঃ যে কোটিদ্বয়বিষয়ে সংশয় জন্মে, তদ্বিষয়ে পূর্ব্বসংস্কারজন্য তাহার স্মরণ সংশয়মাত্রেরই কারণ। সুতরাং যে স্থলে কাহারও তখন স্থাণুত্ব ও পুরুষত্ব, এই বিরুদ্ধ ভাবরূপ কোটিদ্বয়েরই স্মরণ জন্মে, তাহার ঐ ভাবদ্বয়কোটিক সংশয়ই জন্মিবে। উক্তরূপ ভাবকোটিক সংশয়ের সেখানে অন্য কোন বাধকও নাই। তাই প্রাচীনগণ ভাবকোটিক সংশয়ও প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষ্যকার বহুভাবপদার্থকোটিক সংশয়ও প্রদর্শন করিয়াছেন। "অভিজ্ঞানশকুন্তল" নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে কালিদাসের "স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু" ইত্যাদি শ্লোকে এবং "কিমিন্দুঃ কিং পদ্মং" ইত্যাদি শ্লোকেও বহুভাবপদার্থমাত্রকোটিক সংশয়ই বর্ণিত হইয়াছে।*

ভাষ্য। সমানধর্ম্মোপপত্তের্ব্বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয় ইতি। স্থাণুপুরুষয়োঃ সমানং ধর্ম্মমারোহপরিণাহৌ পশ্যন্ পূর্ব্বদৃষ্টঞ্চ তয়োর্ব্বিশেষং বুভুৎসমানঃ কিং স্বিদিত্যন্যতরং নাবধারয়তি, তদনবধারণং জ্ঞানং সংশয়ঃ। সমানমনয়োর্দ্ধর্ম্মমুপলভে, বিশেষমন্যতরস্য নোপলভে ইত্যেষা বুদ্ধিরপেক্ষা সংশয়স্য প্রবর্ত্তিকা বর্ত্ততে, তেন বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয়ঃ।

"অনেকধর্ম্মোপপত্তে"রিতি। সমানজাতীয়মসমানজাতীয়ঞ্চা-

---

* কিমিন্দুঃ কিং পদ্মং কিমু মুকুরবিম্বং কিমু মুখং
কিমব্জে কিং মীনৌ কিমু মদনবাণৌ কিমু দৃশৌ।
খগৌ বা গুচ্ছৌ বা কনককলসৌ বা কিমু কুচৌ
তড়িদ্বা তারা বা কনকলতিকা বা কিমবলা॥

বিক্রমাদিত্যের প্রশ্নোত্তরে তখনই কালিদাসের রচিত কবিতা বলিয়া প্রাচীন পণ্ডিতসমাজে এই কবিতাটি প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার চারি চরণে চারিটি সংশয় প্রকটিত। এই চারিটি সংশয়ের প্রত্যেকটি চতুষ্কোটিক এবং কেবল ভাবকোটিক। ইহার মধ্যে অভাব বুঝিলে কবিতার ভাব বুঝা হইবে না।

নেকম্। তস্যানেকস্য ধর্ম্মোপপত্তেঃ। বিশেষস্য উভয়থা দৃষ্টত্বাৎ। সমানজাতীয়েভ্যোঽসমানজাতীয়েভ্যশ্চার্থা বিশিষ্যন্তে। গন্ধবত্ত্বাৎ পৃথিব্যবাদিভ্যো বিশিষ্যতে গুণকর্ম্মভ্যশ্চ। অস্তি চ শব্দে বিভাগজত্বং বিশেষঃ, তস্মিন্ দ্রব্যং গুণঃ কর্ম্ম বেতি সন্দেহঃ। বিশেষস্য উভয়থাদৃষ্টত্বাৎ কিং দ্রব্যস্য সতো গুণকর্ম্মভ্যো বিশেষঃ? আহোস্বিৎ গুণস্য সত ইতি, অথ কর্ম্মণঃ সত ইতি। বিশেষাপেক্ষা —অন্যতমস্য ব্যবস্থাপকং ধর্ম্মং নোপলভে ইতি বুদ্ধিরিতি।

অনুবাদ—সমান ধর্ম্মের উপপত্তিজন্য অর্থাৎ কোন সাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞানজন্য 'বিশেষাপেক্ষ' অর্থাৎ যাহার পূর্ব্বে বিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধি হয় না, কিন্তু স্মরণ হয়, এমন "বিমর্শ" সংশয় অর্থাৎ উহা প্রথম প্রকার সংশয়। (যথা) স্থাণু ও পুরুষের সমান ধর্ম্ম আরোহ এবং পরিণাহ অর্থাৎ ঐ উভয়ের তুল্যরূপ দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতি দর্শন করতঃ এবং সেই স্থাণু ও পুরুষের পূর্ব্বদৃষ্ট বিশেষ ধর্ম্ম বুঝিতে ইচ্ছা করতঃ "কিংস্বিৎ" এইরূপে অর্থাৎ ইহা কি স্থাণু? অথবা পুরুষ? এইরূপে অন্যতরকে অবধারণ করে না অর্থাৎ উক্ত উভয়কোটি বিষয়েই অনবধারণরূপ জ্ঞান সংশয়। এই পদার্থদ্বয়ের সমান ধর্ম্ম উপলব্ধি করিতেছি, একতরের বিশেষ ধর্ম্ম উপলব্ধি করিতেছি না, এইরূপ বুদ্ধি "অপেক্ষা" (অর্থাৎ) সংশয়ের প্রবর্ত্তিকা হয় অর্থাৎ উক্ত সংশয়ের পূর্ব্বে ঐরূপ বুদ্ধি আবশ্যক, অতএব "বিশেষাপেক্ষ" বিমর্শ সংশয়।

অনেকধর্ম্মোপপত্তেঃ,—এই পদ ব্যাখ্যা করিতেছি। সমান জাতীয় এবং অসমান জাতীয় "অনেক" অর্থাৎ এই সূত্রে "অনেক" শব্দের অর্থ সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থ। সেই অনেকের ধর্ম্মের অর্থাৎ উহার বিশেষক বা ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মের উপপত্তি বা জ্ঞানজন্য (অর্থাৎ উক্তরূপ অসাধারণধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞানজন্য দ্বিতীয় প্রকার সংশয় জন্মে)। যেহেতু উভয় প্রকারেই বিশেষ ধর্ম্মের দর্শন বা জ্ঞান হয়। সজাতীয় পদার্থবর্গ হইতে এবং বিজাতীয় পদার্থবর্গ হইতে পদার্থসমূহ বিশিষ্ট হয়, (যেমন) গন্ধবত্ত্বহেতুক পৃথিবী জলাদি পদার্থ হইতে বিশিষ্ট হয়। (দ্বিতীয় প্রকার সংশয়ের উদাহরণ) কিন্তু শব্দে বিভাগজন্যত্বরূপ বিশেষ ধর্ম্ম আছে, (অতএব) সেই শব্দে দ্রব্য, গুণ অথবা কর্ম্ম, এইরূপ সংশয় জন্মে। যেহেতু উভয় প্রকারে বিশেষের জ্ঞান হয়, (যথা) কি দ্রব্য হইয়া

শব্দের গুণ ও কর্ম্ম হইতে বিশেষ? অথবা গুণ হইয়া দ্রব্য ও কর্ম্ম হইতে বিশেষ? অথবা কর্ম্ম হইয়া দ্রব্য ও গুণ হইতে বিশেষ? অন্যতমের অর্থাৎ শব্দে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্ম্মত্ব, ইহার মধ্যে একতরের ব্যবস্থাপক (নিশ্চায়ক) ধর্ম্ম উপলব্ধি করিতেছি না,—এইরূপ বুদ্ধি 'বিশেষাপেক্ষা' অর্থাৎ উক্তরূপ বুদ্ধি পূর্ব্বোক্ত সংশয়ের পূর্ব্বে জন্মে, এ জন্য উহাও 'বিশেষাপেক্ষ'।

টিপ্পনী—এই সূত্রের প্রথমোক্ত **"সমানানেকধর্ম্মোপপত্তেঃ"** এই পদে একই "ধর্ম্ম" শব্দের উভয়ত্র সম্বন্ধবশতঃ উহার দ্বারা **"সমানধর্ম্মোপপত্তেঃ"** এবং **"অনেকধর্ম্মোপপত্তেঃ"** এই পদদ্বয়ই মহর্ষির বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার প্রথমে "সমানধর্ম্মোপপত্তেঃ" এবং পরে "অনেকধর্ম্মোপপত্তেঃ" এই পদদ্বয়েরই উল্লেখপূর্ব্বক উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথমোক্ত পদের দ্বারা সমান ধর্ম্মের জ্ঞানজন্য প্রথম প্রকার সংশয় এবং দ্বিতীয় পদের দ্বারা অসাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞানজন্য দ্বিতীয় প্রকার সংশয় কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সমান ধর্ম্ম বলিতে তুল্য ধর্ম্ম বা সাধারণ ধর্ম্ম। যেমন স্থাণু অর্থাৎ দণ্ডায়মান শাখাপল্লবশূন্য বৃক্ষ এবং দণ্ডায়মান কোন পুরুষের সমান ধর্ম্ম আরোহ ও পরিণাহ অর্থাৎ তুল্য দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতি। কোন ধর্ম্মীতে সমান ধর্ম্মের জ্ঞানই সমান ধর্ম্মের উপপত্তি। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর বহু বিচারপূর্ব্বক "সমানো ধর্ম্মো যস্য" এইরূপ বিগ্রহে "সমানধর্ম্মা"র অর্থাৎ সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট কোন ধর্ম্মীর উপপত্তিজন্য সংশয় জন্মে, এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা কর্ম্মধারয় সমাসই তাঁহার অভিমত বুঝা যায়। ভাষ্যকার সূত্রোক্ত প্রথম প্রকার সংশয়ের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন,—**"স্থাণুপুরুষয়োঃ সমানং ধর্ম্মমারোহপরিণাহৌ পশ্যন্"** ইত্যাদি। অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে কাহারও দূর হইতে পুরুষের ন্যায় স্থির ভাবে দণ্ডায়মান কোন স্থাণুর সহিত অথবা ঐরূপ কোন পুরুষের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে, সেই ব্যক্তি যদি তাহাতে স্থাণুর কোন বিশেষ ধর্ম্ম এবং পুরুষেরও কোন বিশেষ ধর্ম্ম দর্শন না করে, কিন্তু তাহাতে স্থাণু ও পুরুষের সমান ধর্ম্ম বা সাধারণ ধর্ম্ম তুল্য দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতি দর্শন করে, তাহা হইলে তাহার সেই সম্মুখীন ধর্ম্মীতে ইহা কি স্থাণু? অথবা পুরুষ? এইরূপ সংশয় জন্মে। উক্তরূপে তাহাতে সাধারণ ধর্ম্ম দর্শনই তাহার উক্তরূপ সংশয়ে বিশেষ কারণ। কিন্তু বিশেষাপেক্ষা সংশয় মাত্রেই আবশ্যক। তাই মহর্ষি সংশয়মাত্রকেই বলিয়াছেন বিশেষাপেক্ষ। "তাৎপর্য্যটীকা"কার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকার এখানে "বিশেষং

বুভুৎসমানঃ” এই কথার দ্বারা সূত্রোক্ত “বিশেষাপেক্ষঃ” এই পদেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু “অপেক্ষা” শব্দের ইচ্ছা অর্থ গ্রহণ করিয়া, উহার দ্বারা জ্ঞানের ইচ্ছা পর্য্যন্ত বুঝা গেলেও সেই ইচ্ছাকে সংশয়ের কারণ বলা যায় না। কারণ, সংশয়ের পরেই সেই বিশেষ নিশ্চয়ের ইচ্ছা জন্মে। তাই ভাষ্যকার উক্ত বিশেষাপেক্ষার ফলিতার্থ ব্যাখ্যা করিতে পরে বলিয়াছেন,—**“সমানমনয়োর্দ্ধর্ম্মমুপলভে”** ইত্যাদি। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, সূত্রে “বিশেষাপেক্ষঃ” এই পদের দ্বারা সংশয়ের পূর্ব্বে একতর পদার্থের বিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধি থাকিবে না, কিন্তু সেই সমস্ত বিশেষ ধর্ম্মের স্মৃতি আবশ্যক, ইহাই মহর্ষি ব্যক্ত করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে আবার উক্ত পদেরই ফলিতার্থ বলিয়াছেন, **“বিশেষস্মৃত্যপেক্ষঃ”**। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

ভাষ্যকার পরে “অনেকধর্ম্মোপপত্তেঃ” এই দ্বিতীয় পদের উল্লেখপূর্ব্বক উহার ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে উক্ত “অনেক” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থ। ভাষ্যকারের মতে “অনেকস্য ধর্ম্মঃ” এইরূপ বিগ্রহে অনেকধর্ম্ম বলিতে বুঝিতে হইবে, সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থের বিশেষক বা ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, সূত্রোক্ত “অনেক” শব্দের লক্ষণার দ্বারা সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থের বিশেষক, এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে এবং ভাষ্যকারোক্ত “অনেকস্য” এই পদেও ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা বিশেষকত্বরূপ সম্বন্ধই বুঝিতে হইবে। ফলকথা, সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থের ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মই এখানে অনেক ধর্ম্ম। তাহা হইলে ফলিতার্থ বুঝা যায় যে, অসাধারণ ধর্ম্মের উপপত্তি বা জ্ঞানই সূত্রোক্ত “অনেকধর্ম্মোপপত্তি”। কারণ, পদার্থের অসাধারণ ধর্ম্মই তাহাকে সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থসমূহ হইতে বিশিষ্ট বা ব্যাবৃত্ত করে অর্থাৎ তাহাতে সেই সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করে। ভাষ্যকার পরে ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, গন্ধবত্ত্ব পৃথিবীর অসাধারণ ধর্ম্ম। কারণ, উহা আর কোন পদার্থে থাকে না। সুতরাং উহা দ্রব্যত্বরূপে পৃথিবীর সজাতীয় জলাদি দ্রব্য হইতে এবং বিজাতীয় গুণ ও কর্ম্মপদার্থ হইতে পৃথিবীকে বিশিষ্ট করে। কিন্তু পৃথিবীনামক দ্রব্যমাত্রেই গন্ধবত্ত্ববশতঃ পৃথিবীত্বরূপ বিশেষ ধর্ম্মের পূর্ব্বেই নিশ্চয় হওয়ায় তাহাতে অসাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞানজন্য সংশয় জন্মিতে পারে না। তবে কোথায় কিরূপে সেই দ্বিতীয় প্রকার সংশয় জন্মে, ইহা বলা আবশ্যক। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—**“অস্তি চ শব্দে বিভাগজত্বং বিশেষঃ”** ইত্যাদি।

ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, কোনও বংশখণ্ডের অগ্রভাগ বিদীর্ণ করিয়া, দুই হস্তের দ্বারা তাহাকে জোরে আকর্ষণ করিলে তখন যে শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা ঐ বংশখণ্ডের দুই ভাগের বিভাগ এবং ঐ দুই অংশের সহিত আকাশের যে বিভাগ হয়, তজ্জন্য। ঐ স্থলে যে শব্দ জন্মে, তাহার প্রতি আকাশের সহিত পূর্ব্বোক্ত বিভাগ অসমবায়ি কারণ। এইরূপ কোন বস্ত্রখণ্ডকে দুই হস্তের দ্বারা ছিঁড়িয়া ফেলিবার সময়ে যে শব্দ জন্মে, তাহাও পূর্ব্বোক্ত প্রকার বিভাগজন্য। ফলতঃ বিভাগ যাহার অসমবায়ি কারণ, তাহাই ভাষ্যোক্ত বিভাগজন্য পদার্থ। এইরূপ বিভাগজন্যত্ব শব্দ ভিন্ন আর কোন পদার্থে নাই, সুতরাং উহা শব্দের অসাধারণ ধর্ম্ম। আপত্তি হইতে পারে যে, এক বিভাগ হইতে যে অপর বিভাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই দ্বিতীয় বিভাগের প্রতিও প্রথম বিভাগ অসমবায়ি কারণ, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বিভাগজন্যত্ব যখন বিভাগেও থাকে, তখন উহা শব্দের অসাধারণ ধর্ম্ম হইবে কিরূপে? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, কোন বিভাগজন্য অপর বিভাগ জন্মে, ইহা সর্ব্বসম্মত নহে। সর্ব্বত্র পূর্ব্বজাত ক্রিয়াই বিভাগের কারণ। আর যদি বৈশেষিক মতানুসারে বিভাগজন্য বিভাগ স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও সেই বিভাগজন্য যে দ্বিতীয় বিভাগ, তাহা আর কোন বিভাগের অসমবায়ি কারণ না হওয়ায় উহা কেবল পূর্ব্বোক্ত শব্দেরই অসমবায়ি কারণ। অর্থাৎ বিভাগজন্য যে বিভাগ, তজ্জন্যত্ব ধর্ম্মটি শব্দ ভিন্ন আর কোন পদার্থে না থাকায় উহা শব্দের অসাধারণ ধর্ম্ম। তাহা হইলে ভাষ্যকার যে "বিভাগজন্যত্ব"কে শব্দের অসাধারণ ধর্ম্ম বলিয়াছেন, উহার অর্থ বিভাগজন্য যে দ্বিতীয় বিভাগ, সেই বিভাগজন্যত্বই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে বৈশেষিক মতেও ভাষ্যকারের ঐ কথা সংগত হয়। এখন প্রকৃত কথা এই যে, শব্দে বিভাগজন্যত্বরূপ অসাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞানজন্য শব্দ কি দ্রব্য? অথবা গুণ? অথবা কর্ম্ম? এইরূপ সংশয় জন্মে। কারণ, গুণপদার্থসমূহের মধ্যে রূপাদি গুণ বিভাগজন্য না হইলেও একমাত্র শব্দ যেমন বিভাগজন্য হয়, তদ্রূপ দ্রব্যপদার্থ এবং কর্ম্মপদার্থের মধ্যে অন্যান্য দ্রব্য ও কর্ম্ম বিভাগজন্য না হইলেও শব্দরূপ দ্রব্য অথবা কর্ম্ম বিভাগজন্য হইতে পারে। তাহা হইলেও বিভাগজন্যত্বরূপ অসাধারণ ধর্ম্ম শব্দকে সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থসমূহ হইতে বিশিষ্ট বা ব্যাবৃত্ত করিতে পারে। কারণ, সেই বিভাগজন্যত্ব শব্দ ভিন্ন আর কোন পদার্থে থাকে না। ভাষ্যকার পঞ্চমসূত্র-ভাষ্যে "শেষবৎ" অনুমানের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে শব্দে উক্তরূপ সংশয়ের পরে

পরিশেষানুমানের দ্বারা শব্দে গুণত্বসিদ্ধি বুঝাইয়াছেন। এখানে শব্দে উক্ত বিভাগজন্যত্বরূপ অসাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞান হইলে তজ্জন্যও যে শব্দে উক্তরূপ সংশয় জন্মে, ইহাই তাঁহার বক্তব্য। মহর্ষি গোতমোক্ত দ্বিতীয়প্রকার সংশয়ের উদাহরণ প্রদর্শনই এখানে তাঁহার উদ্দেশ্য। ইহার আরও অনেক উদাহরণ আছে।

ভাষ্য। 'বিপ্রতিপত্তে'রিতি। ব্যাহতমেকার্থদর্শনং বিপ্রতিপত্তিঃ। ব্যাঘাতো বিরোধোঽসহভাব ইতি। অস্ত্যাত্মেত্যেকং দর্শনং, নাস্ত্যাত্মেত্যপরম্। ন চ সদ্‌ভাবাসদ্ভাবৌ সহৈকত্র সম্ভবতঃ। ন চান্যতরসাধকো হেতুরুপলভ্যতে, তত্র তত্ত্বানবধারণং সংশয় ইতি।

"উপলব্ধ্যব্যবস্থাতঃ" খল্বপি,—সচ্চোদকমুপলভ্যতে তড়াগাদিষু, মরীচিষু চাবিদ্যমানমুদকমিতি। অতঃ ক্বচিদুপলভ্যমানে তত্ত্বব্যবস্থাপকস্য প্রমাণস্যানুপলব্ধেঃ কিং সদুপলভ্যতে, অথাসদিতি সংশয়ো ভবতি।

"অনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতঃ" খল্বপি, সচ্চ নোপলভ্যতে মূলকীলকোদকাদি, অসচ্চানুৎপন্নং নিরুদ্ধং বা, ততঃ ক্বচিদনুপলভ্যমানে, কিং সন্নোপলভ্যতে ? উতাসদিতি সংশয়ো ভবতি। বিশেষাপেক্ষা পূর্ব্ববৎ। পূর্ব্বঃ সমানোঽনেকশ্চ ধর্ম্মো জ্ঞেয়স্থ উপলব্ধ্যনুপলব্ধী পুনর্জ্ঞাতৃস্থে, এতাবতা বিশেষেণ পুনর্ব্বচনম্। সমানধর্ম্মাধিগমাৎ সমানধর্ম্মোপপত্তের্ব্বিশেষস্মৃত্যপেক্ষো বিমর্শ ইতি।

অনুবাদ—"বিপ্রতিপত্তেঃ" এই পদ অর্থাৎ সূত্রোক্ত দ্বিতীয় পদ (ব্যাখ্যা করিতেছি)। ব্যাঘাতবিশিষ্ট একার্থদর্শন অর্থাৎ একই পদার্থে পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থের বোধক দর্শন বা বাক্য "বিপ্রতিপত্তি।" ব্যাঘাত বলিতে বিরোধ, অসহভাব অর্থাৎ "ব্যাহত" শব্দের দ্বারা যে ব্যাঘাত কথিত হইয়াছে, তাহা পদার্থদ্বয়ের সহানবস্থানরূপ বিরোধ। (যথা)—'অস্তি আত্মা' ইহা এক দর্শন, 'নাস্তি আত্মা' ইহার অপর দর্শন। কিন্তু সদ্ভাব ও অসদ্ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব একাধারে সম্ভব হয় না, অন্যতরের অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব

ইহার কোন পক্ষের সাধক হেতুও উপলব্ধ হইতেছে না। সেই স্থলে (অর্থাৎ যেখানে আত্মার অস্তিত্ব অথবা নাস্তিত্বরূপ একতর পক্ষের নিশ্চয় জন্মে না, সেখানে মধ্যস্থ ব্যক্তিদিগের) তত্ত্বের অনবধারণরূপ সংশয় জন্মে।

উপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য সংশয়, যথা – তড়াগাদিতে 'সৎ' অর্থাৎ বিদ্যমান জলই উপলব্ধ হয়, কিন্তু মরীচিকায় অবিদ্যমান জল উপলব্ধ হয়। অতএব কোনও বস্তু উপলভ্যমান হইলে তত্ত্বের ব্যবস্থাপক অর্থাৎ সেই বিষয়ের সত্ত্ব অথবা অসত্ত্বরূপ তত্ত্বের নিশ্চায়ক প্রমাণের অনুপলব্ধিজন্য কি 'সৎ' অর্থাৎ এই স্থানে বিদ্যমান বস্তু উপলব্ধ হইতেছে ? অথবা 'অসৎ' অর্থাৎ অবিদ্যমান বস্তু উপলব্ধ হইতেছে ? এইরূপ সংশয় জন্মে।

অনুপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য সংশয়, যথা—'সৎ' অর্থাৎ ভূগর্ভাদিতে বিদ্যমান মূল, কীলক ও জলাদিও উপলব্ধ হয় না, 'অসৎ' (অর্থাৎ) অনুৎপন্ন অথবা 'নিরুদ্ধ' অর্থাৎ বিনষ্ট বস্তুও উপলব্ধ হয় না, অতএব কোনও বস্তু অনুপলভ্যমান হইলে অর্থাৎ উপলব্ধ না হইলে কি বিদ্যমান বস্তু উপলব্ধ হইতেছে না ? অথবা অবিদ্যমান বস্তু উপলব্ধ হইতেছে না ? এইরূপ সংশয় জন্মে। 'বিশেষাপেক্ষা' পূর্ব্ববৎ, অর্থাৎ বিশেষ ধর্ম্মের অনুপলব্ধি পূর্ব্ববৎ এই সংশয়েও আবশ্যক।

"পূর্ব্ব" অর্থাৎ প্রথমোক্ত 'সমান ধর্ম্ম' এবং 'অনেক ধর্ম্ম' জ্ঞেয়বিষয়স্থ, কিন্তু উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি জ্ঞাতৃস্থ অর্থাৎ উহা জ্ঞাতা আত্মার ধর্ম্ম, এইমাত্র বিশেষ-হেতুক পুনরুক্তি হইয়াছে [অর্থাৎ উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থা স্থলে প্রথমোক্ত সাধারণ ধর্ম্ম অথবা অসাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞানজন্য সংশয় সম্ভব হইলেও উক্ত বিশেষ গ্রহণ করিয়াই মহর্ষি উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থাকে যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকার সংশয়ের বিশেষ কারণ বলিয়াছেন]। সমান ধর্ম্মের জ্ঞানরূপ সামানধর্ম্মোপপত্তি জন্য বিশেষ স্মৃত্যপেক্ষ অর্থাৎ যাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে বিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধি থাকে না, কিন্তু সংশয়-বিষয়ীভূত সেই বিশেষ ধর্ম্মের স্মরণ আবশ্যক, এমন বিমর্শ (সংশয়) জন্মে।

টিপ্পনী। এই সূত্রে পরে "বিপ্রতিপত্তেঃ" এই দ্বিতীয় পদের দ্বারা তৃতীয় প্রকার এবং তাহার পরে "উপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতঃ" এই তৃতীয় পদের দ্বারা চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকার সংশয় সূচিত হইয়াছে। ভাষ্যকার পরে সূত্রোক্ত "বিপ্রতিপত্তেঃ" এই পদের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন, **"ব্যাহতমেকার্থ-দর্শনং বিপ্রতিপত্তিঃ।"** ইহার দ্বারা সরলভাবে বুঝা যায় যে, এক পদার্থে বিরুদ্ধ দর্শন অর্থাৎ একই পদার্থে নানা বিরুদ্ধ ধর্ম্মের নিশ্চয় বিপ্রতিপত্তি।

বস্তুতঃ "বিরুদ্ধা প্রতিপত্তিঃ (নিশ্চয়)" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে "বিপ্রতিপত্তি" শব্দের মুখ্য অর্থ—বিরুদ্ধ নিশ্চয় অর্থাৎ কোন একই পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন বাদীর বিরুদ্ধ নানা পদার্থের নিশ্চয়। যেমন কোন বাদীর নিশ্চয় এই যে, নিত্য আত্মা আছে। এবং কোন বাদীর নিশ্চয় এই যে, নিত্য আত্মা নাই। অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। সুতরাং একাধারে ঐ ধর্ম্মদ্বয় থাকিতে পারে না। এইরূপ আত্মপদার্থে আরও বহু বিশেষ ধর্ম্ম বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন বাদীর বিপ্রতিপত্তি আছে। তাই শারীরক ভাষ্যে (১।১।১) আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন, "তদ্বিশেষং প্রতি বিপ্রতিপত্তেঃ" ইত্যাদি। কিন্তু বাদী ও প্রতিবাদীর আত্মগত সেই বিরুদ্ধার্থনিশ্চয়রূপ বিপ্রতিপত্তি মধ্যস্থগণের সংশয়ের কারণ হইতে পারে না। তাই "তাৎপর্য্যটীকা"কার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, বাদী ও প্রতিবাদীর সেই নিশ্চয়াত্মক বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত বাক্যই উক্ত "বিপ্রতিপত্তি" শব্দের দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ভাষ্যকারও পরে (২য় অঃ, ১ম আঃ, ষষ্ঠ সূত্র-ভাষ্যে) ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—**"সমানেঽধিকরণে ব্যাহতার্থৌ প্রবাদৌ বিপ্রতিপত্তিশব্দস্যার্থঃ।"** অর্থাৎ কোন একই আধারে বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধার্থ বাক্যদ্বয়ই উক্ত সূত্রে "বিপ্রতিপত্তি" শব্দের অর্থ। তাহা হইলে ভাষ্যকার এখানে বাক্য অর্থেই "দর্শন" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যাইতে পারে। 'দৃশ্যতে জ্ঞায়তেঽনেন,' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রাচীন কালে বাক্যরূপ শাস্ত্রবিশেষ অর্থেও "দর্শন" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে (বঙ্গবাসী সং, ৩০০ অঃ) "এতদাহুর্মহাপ্রাজ্ঞাঃ সাংখ্যং বৈ মোক্ষদর্শনং" এবং পরে (৩০৭ অঃ) "যদেব শাস্ত্রং সাংখ্যোক্তং যোগদর্শনমেব তৎ", এই শ্লোকে শাস্ত্রবিশেষ অর্থে "দর্শন" শব্দের প্রয়োগ বুঝা যায়। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও পরে (৪।২।৪৯শ সূত্রভাষ্যে) বলিয়াছেন, "অন্যোন্যপ্রত্যনীকানি প্রাবাদুকানাং দর্শনানি।" প্রশস্তপাদও বলিয়াছেন, "ত্রয়ীদর্শনবিপরীতেষু শাক্যাদিদর্শনেষু" (১৭৭ পৃঃ)। অন্য কথা তৃতীয় খণ্ডে (১৮৩ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

কিন্তু পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণ উক্তরূপ বিরুদ্ধার্থবোধক একবাক্যকেই 'বিপ্রতিপত্তিবাক্য' বলিয়াছেন। যেমন শব্দের নিত্যানিত্যত্ব-বিচারে **"শব্দো নিত্যো ন বা"** এইরূপ বাক্য বিপ্রতিপত্তিবাক্য। কিন্তু উক্তরূপ বাক্যশ্রবণাদিজন্য শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয়াত্মক শাব্দ বোধ জন্মিতে পারে না। কারণ, একই শব্দে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ বিরুদ্ধ

ধর্ম্মের সত্তা না থাকায় যোগ্যতাজ্ঞান সম্ভব হয় না। সুতরাং উক্তরূপ শাব্দ বোধের সামগ্রীই সম্ভব হয় না। কিন্তু উক্তরূপ অযোগ্য বাক্যের শ্রবণাদিজন্য শব্দরূপ ধর্ম্মী এবং নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ কোটিদ্বয়ের স্মরণ হওয়ায় মনের দ্বারাই শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয় জন্মে। ফলকথা, বাহ্য ও আভ্যন্তর দ্বিবিধ সংশয়ই সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষরূপ সংশয়। কারণ, পরোক্ষ জ্ঞান কখনও সংশয়াত্মক হয় না। উক্ত মতানুসারে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে বলিয়াছেন,—"যদ্যপি শব্দস্য ন সংশায়কত্বং, তথাপি শব্দাৎ কোটিদ্বয়োপস্থিতৌ মানসঃ সংশয় ইতি বদন্তি।" বিশ্বনাথ "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী"তে সংশয়ের কারণ ব্যাখ্যায় উক্ত মতই গ্রহণ করিয়াছেন। এই মতে বিপ্রতিপত্তিবাক্যশ্রবণাদিজন্য শাব্দ সংশয় জন্মে না। কিন্তু কোন সাধারণ বা অসাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞানজন্য সেই কোটিদ্বয় বিষয়ে মানস সংশয়ই জন্মে। তাহাতে সেই বিপ্রতিপত্তিবাক্য সেই কোটিদ্বয়ের স্মারক হইয়া প্রযোজক হয়। সূত্রে "বিপ্রতিপত্তেঃ" এই পদে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ প্রযুক্তত্ব। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি জ্ঞায়মান বিপ্রতিপত্তি-বাক্যজন্য শাব্দ সংশয়ই সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, উহা মহর্ষি গোতমেরও সম্মত। নচেৎ উক্ত সূত্রে তৃতীয় প্রকার সংশয়ের কারণ বলিতে তাঁহার "বিপ্রতিপত্তেঃ" এই পদের উল্লেখ অনাবশ্যক। সুতরাং বিপ্রতিপত্তিবাক্যের অন্তর্গত পদসমূহের জ্ঞান ও সেই সমস্ত পদার্থজ্ঞান এবং সংশয়াত্মক যোগ্যতা-জ্ঞান প্রভৃতি কারণজন্য সেই বিপ্রতিপত্তিবাক্য হইতে সংশয়াত্মক শব্দবোধই জন্মে।*

ভাষ্যকারের মতে যে, বাদী ও প্রতিবাদীর সেই বাক্যদ্বয়ই "বিপ্রতিপত্তি" শব্দের অর্থ, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কণাদ-সূত্রের "উপস্কারে" (২।২।১৭) নব্য বৈশেষিক শঙ্কর মিশ্রও বলিয়াছেন,—"বিপ্রতিপত্তিরপি বিরুদ্ধপ্রতিপত্তিদ্বয়জন্যং বাক্যদ্বয়ং।" সে যাহা হউক, বস্তুতঃ যাহাদিগের একতর পক্ষের নিশ্চয় জন্মে নাই, তাহাদিগের পক্ষে নানা বিরুদ্ধ মতবাদীদিগের বিপ্রতিপত্তিবাক্য যে ভাবেই হউক, সে বিষয়ে সংশয়ের প্রযোজক হয় এবং সেই সংশয়জন্য প্রকৃত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা জন্মে এবং তাহার ফলে বিচারের আরম্ভ হয়, ইহা প্রাচীন

---

* "পদজন্যধর্ম্মি-কোটিদ্বয়-তদুভয়বিরোধ-জ্ঞান-সংশয়াত্মকযোগ্যতাজ্ঞানসহিতাৎ শব্দাদাহত্যৈব সংশয়ঃ। "সমানানেকে"ত্যাদি সূত্রং প্রণয়তো মহর্ষেরপি সম্মতমিদং।" —শিরোমণিকৃত "পদার্থতত্ত্বনিরূপণ" (কাশীসংস্করণ, ৬৭-৭০ পৃঃ)। টীকাকার রামভদ্র সার্ব্বভৌম ও রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার এখানে উক্ত মতের যুক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সিদ্ধান্ত। সংশয় ব্যতীত যে, বিচার হয় না, ইহা উদ্দ্যোতকর প্রভৃতিও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। "ভামতী" টীকায় বাচস্পতি মিশ্রও আচার্য্য শঙ্করের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে স্পষ্ট বলিয়াছেন,—তদনেন বিপ্রতিপত্তিঃ সাধকবাধক-প্রমাণাভাবে সংশয়বীজমুক্তং, ততশ্চ সংশয়াজ্জিজ্ঞাসোপপদ্যত ইতি ভাবঃ।" —(ভামতী, ১।১।১)। অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের প্রথমসূত্রোক্ত ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কারণও সংশয়, সেই সংশয়ের বীজ নানাবিধ বিপ্রতিপত্তি। বিপ্রতিপত্তিবাক্য কিরূপে বিচারের অঙ্গ হয়, এ বিষয়েও পরে অনেক সূক্ষ্ম বিচার হইয়াছে। সে বিষয়ে "অদ্বৈতসিদ্ধি"র প্রারম্ভে নব্য বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতীর বিচার ও সিদ্ধান্ত দ্বিতীয় খণ্ডে চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যকার পরে সূত্রোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থাপ্রযুক্ত চতুর্থপ্রকার সংশয় এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থাপ্রযুক্ত পঞ্চম প্রকার সংশয়ের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন, **"উপলব্ধ্যব্যবস্থাতঃ খল্বপি"** ইত্যাদি।*

"উপলব্ধি" শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষরূপ উপলব্ধিই এখানে বুঝিতে হইবে এবং "অনুপলব্ধি" শব্দের দ্বারা তাহার অভাব বুঝিতে হইবে। সূত্রে "উপলব্ধি" ও "অনুপলব্ধি" শব্দের দ্বন্দ্বসমাসের পরে কথিত "অব্যবস্থা" শব্দের পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেকের সহিত সম্বন্ধবশতঃ উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থা বুঝা যায়। "ব্যবস্থা" শব্দের অর্থ নিয়ম, সুতরাং "অব্যবস্থা" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, অনিয়ম। বিদ্যমান পদার্থেরই অথবা অবিদ্যমান পদার্থেরই উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি হয়, এমন নিয়ম নাই। কারণ, যেমন বিদ্যমান পদার্থের প্রত্যক্ষ হইতেছে, তদ্রূপ অনেক স্থলে অবিদ্যমান পদার্থেরও ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ হইতেছে। এবং যেমন ভূগর্ভাদি স্থানে বিদ্যমান মূল, কীলক ও জলাদি দৃশ্য দ্রব্যেরও প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্রূপ যাহা অবিদ্যমান অর্থাৎ যাহা উৎপন্নই হয় নাই, অথবা নিরুদ্ধ বা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, এমন পদার্থেরও প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং

* ভাষ্যে পরে "অনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতঃ" এইরূপ পাঠই সমস্ত পুস্তকে দেখা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার পূর্ব্বে সমুচ্চয়ার্থ "খল্বপি" বলিলে পরেও উহা তাঁহার বক্তব্য। উদাহরণ প্রকাশার্থ ,'খল্বপি" বলিলেও উক্ত স্থলে পরেও উহা বক্তব্য। বস্তুতঃ "খল্বপি" এই শব্দটি নিপাত, উহার অর্থ উদাহরণ প্রদর্শন। প্রাচীন কালে উক্ত অর্থে উহার অনেক প্রয়োগ হইয়াছে। যথা—'কুসুমাঞ্জলি'র পঞ্চম স্তবকে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন, "আয়োজনাৎ খল্বপি"। সেখানে "প্রকাশটীকা"কার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "খল্বপীতি নিপাতসমুদায়ঃ, উদাহ্রিয়তে ইত্যর্থে বর্ত্ততে, ন সমুচ্চয়ার্থঃ"।

যিনি উক্তরূপ "অব্যবস্থা" জানেন, তাঁহার কোন স্থানে কোন পদার্থের প্রত্যক্ষ হইলে তাহাতে তখন যদি বিদ্যমানত্ব অথবা অবিদ্যমানত্বরূপ একতর বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয় না জন্মে, তাহা হইলে তখন তাঁহার মনের দ্বারা এইরূপ সংশয় জন্মে যে, আমি কি বিদ্যমান পদার্থবিষয়ক উপলব্ধি করিতেছি? অথবা অবিদ্যমান পদার্থবিষয়ক উপলব্ধি করিতেছি? এইরূপ কোন পদার্থের প্রত্যক্ষ না হইলে তখন তাহার সংশয় জন্মে যে, কি বিদ্যমান পদার্থেরই প্রত্যক্ষ করিতেছি না? অথবা অবিদ্যমান পদার্থের প্রত্যক্ষ করিতেছি না? যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত অব্যবস্থাদ্বয়ের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান উক্তরূপ দ্বিবিধ সংশয়ের বিশেষ কারণ হওয়ায় এই সূত্রে উক্ত অব্যবস্থাদ্বয় সেই সংশয়ের প্রয়োজকরূপে কথিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত স্থলদ্বয়েই সদ্বিষয়ক ও অসদ্বিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞানত্বাদি কোন সমান ধর্ম্ম বা সাধারণ ধর্ম্মের মানস জ্ঞানজন্যই উক্তরূপ মানস সংশয় সম্ভব হওয়ায় মহর্ষি পৃথক্ করিয়া উক্তরূপ সংশয়দ্বয়ের বিশেষ কারণ বলিয়াছেন কেন? এইরূপ প্রশ্ন অবশ্যই হইবে। তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, সূত্রোক্ত সমানধর্ম্ম ও অনেক ধর্ম্ম, জ্ঞেয় বিষয়ের ধর্ম্ম, কিন্তু উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি জ্ঞাতা আত্মার ধর্ম্ম, এইমাত্র বিশেষ গ্রহণ করিয়াই মহর্ষি উহার পুনরুক্তি করিয়াছেন। ভাষ্যকার পরে **"সমানধর্ম্মাধিগমাৎ"** ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা শেষোক্ত স্থলে সমান ধর্ম্মের জ্ঞানরূপ সমানধর্ম্মোপপত্তিজন্য যে সংশয় জন্মে, ইহাও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিশেষ জন্যই মহর্ষি চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকার সংশয় বলিয়াছেন, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যায়।

কিন্তু বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর বহু বিচারপূর্ব্বক ভাষ্যকারের উক্তরূপ ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞানজন্য এবং অনেক ধর্ম্ম বা অসাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞানজন্য এবং বিপ্রতিপত্তিজ্ঞানজন্য সংশয় ত্রিবিধ, পঞ্চবিধ নহে। কিন্তু উক্ত ত্রিবিধ সংশয়ের সামান্য কারণরূপেই মহর্ষি পরে উপলব্ধির অব্যবস্থা অর্থাৎ একতর কোটির সাধক প্রমাণের অভাব এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থা অর্থাৎ বাধক প্রমাণের অভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, একতর কোটির সাধক প্রমাণ অথবা বাধক প্রমাণ উপস্থিত হইলে তখন আর সে বিষয়ে সংশয় জন্মে না। সুতরাং সাধক প্রমাণ ও বাধক প্রমাণের অভাব থাকিলে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বিশেষ কারণজন্য ত্রিবিধ সংশয় জন্মে, ইহাই সূত্রার্থ। "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজও

এই মত গ্রহণ করিয়া উক্তরূপই সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।* পরন্তু উদ্দ্যোতকর পরে বৈশিষিক দর্শনে কণাদের "সামান্যপ্রত্যক্ষাদ্বিশেষাপ্রত্যক্ষাদ্বিশেষস্মৃতেশ্চ সংশয়ঃ" (২।২।১৭)—এই সূত্রেরও নিজ মতানুসারে ব্যাখ্যা করিয়া গোতমোক্ত অসাধারণ ধর্ম্মজ্ঞানজন্য দ্বিতীয় প্রকার সংশয়ও যে, কণাদের সম্মত, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। পরে নবীন "বিবৃতি"কারও উক্ত কণাদসূত্রে "চ" শব্দের দ্বারা গোতমোক্ত অসাধারণ ধর্ম্মজ্ঞান এবং বিপ্রতিপত্তিকে গ্রহণ করিয়া কণাদের মতেও সংশয় ত্রিবিধ বলিয়াছেন।

কিন্তু ইহা যে. বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মত, তাহা বুঝি না। কারণ, প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ উহা বলেন নাই। পরন্তু তিনি সংশয় ভিন্ন "অনধ্যবসায়" নামক একপ্রকার জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন। অসাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞানজন্য সেই জ্ঞানই জন্মে, সংশয় জন্মে না। "ন্যায়কন্দলী" টীকায় (১৮৩ পৃঃ) শ্রীধর ভট্ট বিশেষ বিচার করিয়া উক্ত "অনধ্যবসায়" নামক জ্ঞান যে, সংশয় হইতে ভিন্ন, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। "সপ্তপদার্থী" গ্রন্থে শিবাদিত্য মিশ্র তাহা না বলিলেও এবং কণাদের কোন সূত্রে উহার উল্লেখ না পাইলেও উহা বৈশেষিকসম্প্রদায়ের প্রাচীন সিদ্ধান্ত। তাই উক্ত কণাদসূত্রের "উপস্কার" টীকায় সম্প্রদায়বেত্তা মহামনীষী শঙ্কর মিশ্র ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, সমানতন্ত্র গৌতমীয় ন্যায়দর্শনে "অনধ্যবসায়" নামক পৃথক্ জ্ঞান স্বীকৃত না হওয়ায় গোতম মতে উহাও সংশয়বিশেষ এবং উহা অসাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞানজন্য। কিন্তু কণাদের উক্ত সূত্রের দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহার মতে সর্ব্বত্র সংশয়মাত্রই সাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞানজন্য। বিশেষ ধর্ম্মের অপ্রত্যক্ষ এবং বিশেষ ধর্ম্মের স্মরণও তাহাতে কারণ। শঙ্কর মিশ্র সেখানে বিচারপূর্ব্বক উপসংহারে স্পষ্ট বলিয়াছেন,—"তথাচ সংশয়ো ন ত্রিবিধো ন বা পঞ্চবিধঃ, কিন্তু একবিধ এব।"

পরন্তু গোতমের মতে সংশয় পঞ্চবিধ, ইহা উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি স্বীকার না করিলেও উহাই প্রাচীন সিদ্ধান্ত। কারণ, মহর্ষি গোতম পরে দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রারম্ভে 'সংশয়পরীক্ষাপ্রকরণে' সংশয়ের পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ কারণেরই যেরূপ পরীক্ষা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি পূর্ব্বে এই সূত্রে পঞ্চবিধ বিশেষ কারণজন্য পঞ্চবিধ সংশয়ই বলিয়াছেন। তদনুসারে ভাসর্ব্বজ্ঞও

---

* 'অত্র উপলব্ধ্যনুপলব্ধিশব্দাভ্যাং সাধকবাধকপ্রমাণয়োর্গ্রহণং, তয়োরব্যবস্থা অভাবঃ, তস্মিন্ সতি বিশেষস্মরণাপেক্ষঃ সমানানেকধর্ম্মবিপ্রতিপত্তিভ্যঃ সংশয়ো ভবতীতি সূত্রার্থঃ।"
—"তার্কিকরক্ষা"।

"ন্যায়সারে"র প্রথম ভাগে গোতমোক্ত সংশয় পদার্থকে পঞ্চবিধই বলিয়াছেন। সেখানে টীকাকার জয়সিংহ সূরিও ভাষ্যকারের শেষ কথানুসারেই উহা সমর্থন করিয়াছেন এবং পরে তিনি সে বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী "ভূষণ"কারের কথাও বলিয়াছেন।* ভাসর্ব্বজ্ঞের "ন্যায়সারে"র অষ্টাদশ টীকার মধ্যে প্রধান টীকার নাম "ভূষণ"।

পরবর্ত্তী কোন সম্প্রদায় মহর্ষির এই সূত্রে "চ" শব্দের অনুক্ত সমুচ্চয় অর্থ গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, কোন স্থানে ব্যাপ্য পদার্থের সংশয় জন্মিলে, তজ্জন্য তাহার ব্যাপক পদার্থের সংশয় জন্মে, ইহাই "চ" শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। যেমন কোন স্থানে ধূমের সংশয় হইলে তজ্জন্য তাহার ব্যাপক বহ্নির সংশয় জন্মে। "তত্ত্বচিন্তামণি"র 'উপাধি বিভাগে'র "দীধিতি" টীকায় রঘুনাথ শিরোমণিও উক্ত ব্যাখ্যার সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি গোতমের এই সংশয়সূত্র-ব্যাখ্যায় প্রাচীন কালে বহু বিচার ও মতভেদ হইয়াছে। উদ্দ্যোতকর অনেক মতের বিচার ও খণ্ডন করিয়াছেন। সংক্ষেপে তাহা ব্যক্ত করা যায় না। উদ্দ্যোতকর ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা-খণ্ডনেও বহু কথা বলিয়াছেন। তাঁহার কথার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা এবং ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য এবং "সংশয়" পদার্থ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগে অবশ্য দ্রষ্টব্য ॥ ২৩ ॥

ভাষ্য। স্থানবতাং লক্ষণমিতি সমানং।

অনুবাদ—ক্রমবিশিষ্ট পদার্থবর্গের লক্ষণ, ইহা সমান (অর্থাৎ যেমন দ্বিতীয় প্রমেয় পদার্থের সমস্ত বিশেষ লক্ষণের পরে পূর্ব্বসূত্র দ্বারা ক্রমপ্রাপ্ত তৃতীয় 'সংশয়' পদার্থের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ পরে এই সূত্র দ্বারা চতুর্থ 'প্রয়োজন' পদার্থের লক্ষণ এবং পরে ক্রমানুসারে 'দৃষ্টান্ত' প্রভৃতি দ্বাদশ পদার্থের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে)।

সূত্র। যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে তৎ প্রয়োজনম্ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—যে পদার্থকে অধিকার করিয়া অর্থাৎ গ্রাহ্য বা ত্যাজ্যরূপে নিশ্চয় করিয়া (জীব) প্রবৃত্ত হয়, তাহা প্রয়োজন।

* "ভূষণকারস্তু যে উপলব্ধিমাত্রেণ শব্দে স্থায়িত্বমনুপলব্ধিমাত্রেণ স্বর্গেশ্বরাদীনামসত্ত্বঞ্চেচ্ছন্তি, তন্মতপ্রতিক্ষেপার্থমুপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যোঃ পৃথক্ সংশয়হেতুত্বমিত্যাচিবান্।" —"ন্যায়সারটীকা", সোসাইটী সং, ৬৪ পৃঃ।

ভাষ্য। যমর্থমাপ্তব্যং হাতব্যং বা ব্যবসায় তদাপ্তি-হানোপায়মনুতিষ্ঠতি, প্রয়োজনং তদ্বেদিতব্যম্। প্রবৃত্তিহেতুত্বাদি-মমর্থমাপ্স্যামি হাস্যামি বেতি ব্যবসায়োঽর্থস্যাধিকারঃ। এবং ব্যবসীয়মানোঽর্থোঽধিক্রিয়ত ইতি।

অনুবাদ—যে পদার্থকে প্রাপ্য বা ত্যাজ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়া (জীব) তাহার প্রাপ্তি বা ত্যাগের উপায় অনুষ্ঠান করে অর্থাৎ তাহার উপায় বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহা প্রয়োজন জানিবে। প্রবৃত্তির কারণত্ববশতঃ এই পদার্থ পাইব অথবা ত্যাগ করিব, এইরূপ ব্যবসায় (নিশ্চয়) পদার্থের "অধিকার"। এইরূপে (পূর্ব্বোক্তরূপে) নিশ্চীয়মান পদার্থ অধিকৃত হয়।

টিপ্পনী— 'সংশয়" পদার্থের ন্যায় "প্রয়োজন" পদার্থও "ন্যায়ে"র পূর্ব্বাঙ্গ। কারণ, প্রয়োজন ব্যতীত বিচার দ্বারা তত্ত্ব পরীক্ষা হয় না। উদ্দ্যোতকর ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন,—"যা খলু নিষ্প্রয়োজনা চিন্তা, সা ন ন্যায়াঙ্গমিতি, পরীক্ষাবিধেস্তু প্রধানাঙ্গং প্রয়োজনমেব, তন্মূলত্বাৎ পরীক্ষাবিধেঃ।" ভাষ্যকারও প্রথমসূত্র-ভাষ্যে ইহা সমর্থন করিতে বিতণ্ডাও যে সপ্রয়োজন, ইহা বিচারপূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উক্ত প্রয়োজন পদার্থ দ্বিবিধ, মুখ্য ও গৌণ। যে বিষয়ে জীবের স্বতঃই ইচ্ছা জন্মে, তাহাকেই বলে মুখ্য প্রয়োজন বা "স্বতঃপ্রয়োজন"। যেমন সুখ ও দুঃখনিবৃত্তি বিষয়ে জীবের স্বতঃই ইচ্ছা জন্মে অর্থাৎ সেই ইচ্ছা অন্য কোন বিষয়ে ইচ্ছাপ্রযুক্ত নহে, এজন্য সুখ ও দুঃখনিবৃত্তিই জীবের মুখ্য প্রয়োজন। কিন্তু সেই সুখ বা দুঃখ-নিবৃত্তি বিষয়ে ইচ্ছাপ্রযুক্ত তাহার যে সমস্ত উপায় বিষয়ে ইচ্ছা জন্মে, তাহা গৌণ প্রয়োজন। উক্ত দ্বিবিধ প্রয়োজন-পদার্থ সূচনার জন্য মহর্ষি এই সূত্রে "অর্থ" শব্দের প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন, "**যমর্থমধিকৃত্য**"। ভাষ্যকার উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"**যমর্থমাপ্তব্যং হাতব্যং বা ব্যবসায়।**" এই পদার্থকে প্রাপ্ত হইব অথবা ত্যাগ করিব, এইরূপ যে ব্যবসায় বা নিশ্চয়, তাহাই সেই অর্থের অধিকার। অর্থাৎ কোন পদার্থে গ্রাহ্যত্ব অথবা ত্যাজ্যত্বের নিশ্চয়ই এই সূত্রে "অধিকৃত্য" এই পদের দ্বারা বিবক্ষিত। কারণ, উক্তরূপ নিশ্চয়ের পরে সমর্থ জীব সেই পদার্থের প্রাপ্তি অথবা পরিত্যাগের উপায়ের অনুষ্ঠান করে অর্থাৎ সেই উপায় বিষয়ে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে। যে পদার্থ বিষয়ে যে জীবের ইহা গ্রাহ্য অথবা ত্যাজ্য, এইরূপ ব্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয় জন্মে, সেই পদার্থ তখন তৎকর্ত্তৃক

উক্তরূপে অধিকৃত হওয়ায় সেই পদার্থ বিষয়ে ইচ্ছাজন্য তাহা সেই জীবের কর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রযোজক হয়, এ জন্য উক্তরূপ পদার্থকে বলে "প্রয়োজন"। "প্রযুজ্যতেঽনেন" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে পদার্থ উক্তরূপে জীবের কর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রয়োজক, তাহাই ভাষ্যকারের মতে **"প্রয়োজন"** পদার্থ ॥ ২৪ ॥

সূত্র। লৌকিকপরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধি-সাম্যং স দৃষ্টান্তঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—লৌকিকদিগের এবং পরীক্ষকদিগের যে পদার্থে বুদ্ধির সাম্য (অবিরোধ) হয়, তাহা দষ্টান্ত।

ভাষ্য। লোকসামান্যমনতীতা লৌকিকাঃ, নৈসর্গিকং বৈনয়িকং বুদ্ধ্যতিশয়মপ্রাপ্তাঃ। তদ্বিপরীতাঃ পরীক্ষকাস্তর্কেন প্রমাণৈরর্থং পরীক্ষিতুমর্হন্তীতি। যথা যমর্থং লৌকিকা বুধ্যন্তে, তথা পরীক্ষকা অপি, সোঽর্থো দৃষ্টান্তঃ। দৃষ্টান্তবিরোধেন হি প্রতিপক্ষাঃ প্রতিষেদ্ধব্যা ভবন্তীতি। দৃষ্টান্তসমাধিনা চ স্বপক্ষাঃ স্থাপনীয়া ভবন্তীতি। অবয়বেষু চোদাহরণায় কল্পত ইতি।*

অনুবাদ—লোক-সমানতাকে অনতিক্রান্ত অর্থাৎ যাঁহারা সাধারণ লোকের তুল্যতাকে অতিক্রম করেন নাই, এমন ব্যক্তিগণ "লৌকিক"। স্বাভাবিক এবং বৈনয়িক অর্থাৎ শাস্ত্রপরিশীলনজন্য বুদ্ধিপ্রকর্ষকে অপ্রাপ্ত। তদ্বিপীরতগণ অর্থাৎ স্বাভাবিক এবং বৈনয়িক বুদ্ধিপ্রকর্ষপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ পরীক্ষক। (যেহেতু,

* ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেই বাচস্পতি মিশ্র এখানে বলিয়াছেন, "লক্ষিতশ্চ দৃষ্টান্ত উদাহরণলক্ষণায় কল্পতে ঘটতে ইতি ভাষ্যং"। উহা ভাষ্যসন্দর্ভ নহে। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে পূর্ব্বে "অবয়বেষু" এই পদের প্রয়োগ করায় শেষোক্ত "উদাহরণ" শব্দের দ্বারা অবয়বের অন্তর্গত উদাহরণবাক্যই বুঝা যায়, উহার লক্ষণ বুঝা যায় না। 'লক্ষিতো দৃষ্টান্ত উদাহরণায় কল্পতে সমর্থো ভবতি,'—এইরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝা যায় যে, দৃষ্টান্ত পদার্থ তৃতীয় অবয়ব উদাহরণবাক্যের অনুকূল হয়। ভাষ্যে "কল্পতে" এই পদে সামর্থ্যবাচক "কৃপ" ধাতুর প্রয়োগ হওয়ায় "উদাহরণায়" এই পদে অলং শব্দার্থযোগে চতুর্থী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। যথা মেঘদূতে—"কল্পিষ্যন্তে স্থিরগণপদ-প্রাপ্তয়ে শ্রদ্দধানাঃ" (৩৬শ শ্লোক)। টীকাকার মল্লিনাথ লিখিয়াছেন,—"কৃপেঃ পর্য্যাপ্তিবচনস্য অলমর্থত্বাৎ তদযোগে 'নমঃস্বস্তী'ত্যাদিনা চতুর্থী। 'অল'মিতি পর্য্যাপ্ত্যর্থগ্রহণমিতি ভাষ্যকারঃ।"

তাঁহারা) তর্কের দ্বারা এবং প্রমাণসমূহের দ্বারা অর্থাৎ পঞ্চাবয়বের দ্বারা পদার্থকে পরীক্ষা করিতে সমর্থ হন। যে পদার্থকে লৌকিকগণ যে প্রকার বুঝেন, পরীক্ষকগণও সেইরূপ বুঝেন, সেই পদার্থ দৃষ্টান্ত। দৃষ্টান্ত-বিরোধের দ্বারা অর্থাৎ দৃষ্টান্তের সাধ্যশূন্যতা প্রভৃতি দোষের দ্বারা প্রতিপক্ষসমূহ অর্থাৎ প্রতিপক্ষ-সাধনসমূহ খণ্ডনীয় হয় অর্থাৎ খণ্ডন করা যায় এবং দৃষ্টান্ত-সমাধির দ্বারা অর্থাৎ দৃষ্টান্তের অসত্য দোষারোপের প্রতিষেধের দ্বারা স্বপক্ষ স্থাপনীয় হয় অর্থাৎ স্থাপন করা যায়। এবং (দৃষ্টান্ত পদার্থ) অবয়বসমূহের মধ্যে উদাহরণের নিমিত্ত সমর্থ হয় অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের অন্তর্গত তৃতীয় অবয়ব উদাহরণবাক্যের সম্পাদক হয় [অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থ বুঝিলেই ন্যায়প্রয়োগে সেই দৃষ্টান্তবোধক উদাহরণবাক্য বলা যায়। সুতরাং দৃষ্টান্ত-পদার্থের লক্ষণ বক্তব্য]।

টিপ্পনী—ভাষ্যকার এই সূত্রের প্রথমোক্ত "লৌকিক" শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—"লোকসামান্যমনতীতা লৌকিকাঃ।" পরে উহার ফলিতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "নৈসর্গিকং বৈনয়িকং বুদ্ধ্যতিশয়মপ্রাপ্তাঃ।" অর্থাৎ যাহাদিগের স্বাভাবিক বুদ্ধিপ্রকর্ষ নাই এবং "বৈনয়িক" অর্থাৎ বিনয়জন্য বুদ্ধিপ্রকর্ষও নাই, তাহারা "লৌকিক" বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যানুসারে* বুঝা যায়, শাস্ত্রপরিশীলনই উক্ত "বিনয়" শব্দের অর্থ। কিন্তু "পরিশুদ্ধি" টীকায় (৬৯ পৃঃ) উদয়নাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "বিশিষ্টো নয়ঃ শাস্ত্রং ন্যায়শাস্ত্রং, তজ্জন্যবুদ্ধিবিরহিণ ইত্যর্থঃ।" বস্তুতঃ ন্যায়শাস্ত্রের পরিশীলনজন্য বুদ্ধিপ্রকর্ষ ব্যতীত ন্যায় দ্বারা কোন তত্ত্ব পরীক্ষা করা যায় না। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন, "তদ্বিপরীতাঃ পরীক্ষকাঃ।" অর্থাৎ যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ বুদ্ধিপ্রকর্ষবিশিষ্ট, তাঁহারাই পরীক্ষক। ভাষ্যকার পরে ইহার হেতু প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন, "তর্কেণ প্রমাণৈরর্থং পরীক্ষিতুমর্হন্তীতি।" বস্তুতঃ উক্তরূপ পরীক্ষক ব্যক্তিগণই উক্তরূপ লৌকিক ব্যক্তিদিগকে তত্ত্ব বুঝাইতে সমর্থ। সুতরাং এখানে "লৌকিক" শব্দের দ্বারা বোদ্ধা এবং "পরীক্ষক" শব্দের দ্বারা বোধয়িতা, ইহাই বুঝিতে হইবে। কিন্তু তাহারা উভয়েই বিচারসমর্থ বাদী ও প্রতিবাদী না হইলে বিচার হইতে পারে না।

* "শাস্ত্রপরিশীলনলব্ধজন্মা বুদ্ধ্যতিশয়ো বৈনয়িকঃ, তদ্রহিতা লৌকিকাঃ প্রতিপাদ্যা ইতি যাবৎ। তদ্বিপরীতাস্তদুভয়সম্পন্নাশ্চ পরীক্ষকাঃ প্রতিপাদকা ইতি যাবৎ। কথাবহুত্বাচ্চ বহুবচনং। তদনেন বাদিপ্রতিবাদিনৌ দর্শিতৌ।"—তাৎপর্য্য টীকা।

তাই বাচস্পতি মিশ্র পরে বলিয়াছেন, "তদনেন বাদি-প্রতিবাদিনৌ দর্শিতৌ।" তাহা হইলে বুঝা যায় যে, যে পদার্থে বাদী ও প্রতিবাদীর বুদ্ধির সাম্য হয় অর্থাৎ তাহারা উভয়েই যে পদার্থকে একরূপ বুঝে, সেই পদার্থ দৃষ্টান্ত। ফলকথা, বাদী বা প্রতিবাদীর প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ ন্যায়বাক্যের প্রয়োগ স্থলে তৃতীয় অবয়ব উদাহরণবাক্যের দ্বারা যে পদার্থে তাঁহাদিগের গৃহীত হেতুতে সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্তির প্রদর্শন করা হয়, সেই পদার্থই দৃষ্টান্ত। পরে তৃতীয় অবয়ব উদাহরণবাক্যের লক্ষণ-সূত্রের দ্বারা মহর্ষির উক্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝা যায়। তদনুসারে বাচস্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে "অর্থ" শব্দের দ্বারা তৃতীয় অবয়ব উদাহরণবাক্যবোধ্য পদার্থবিশেষই মহর্ষির বিবক্ষিত। পরে উদাহরণবাক্যের লক্ষণ ব্যাখ্যায় ইহা বুঝা যাইবে। পরন্তু ইহাও বুঝা যাইবে যে, মহর্ষি গোতমের মতে দৃষ্টান্ত পদার্থ দ্বিবিধ—(১) সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত, (২) বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত। পরে দ্বিবিধ উদাহরণবাক্যের দুইটী লক্ষণসূত্র দ্বারা ইহাও সূচীত হইয়াছে। তদনুসারে "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজও বলিয়াছেন, "ব্যাপ্তিসংবেদনস্থানং দৃষ্টান্ত ইতি গীয়তে। স চ সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্য-ভেদেন দ্বিবিধো ভবেৎ॥"

সূত্রোক্ত লৌকিক ও পরীক্ষক ব্যক্তিদিগের বুদ্ধির সাম্যের ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন, "**যথা যমর্থং লৌকিকা বুধ্যন্তে**" ইত্যাদি। বস্তুতঃ সর্ব্বত্রই যে, লৌকিকবেদ্য বা লোকসিদ্ধ পদার্থই দৃষ্টান্ত হইবে, ইহা মহর্ষির বিবক্ষিত নহে। কারণ, তাহা হইলে আকাশাদি অলৌকিক পদার্থ দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। তাই উদ্দ্যোতকরও প্রথমেই বলিয়াছেন, "বুদ্ধিসাম্য-বিষয়ো দৃষ্টান্ত ইতি সূত্রার্থঃ, এবঞ্চাকাশাদ্যবরোধঃ" ইত্যাদি। বস্তুতঃ মহর্ষি নিজেও পরে (দ্বিতীয় অঃ, ১ম আং, শেষ সূত্রে) মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের প্রামাণ্যকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ আরও অনেক পদার্থ দৃষ্টান্তরূপে কথিত হইয়াছে, যাহা সাধারণ লোকের জ্ঞাত নহে, কিন্তু কেবল পণ্ডিত-জনবোধ্য। সুতরাং প্রমাণসিদ্ধ পূর্ব্বোক্তরূপ পদার্থই দৃষ্টান্ত, ইহাই উক্ত সূত্রের দ্বারা মহর্ষির বিবক্ষিত। "ভামতী" টীকায় বাচস্পতি মিশ্রও ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন।* ভাষ্যকার পরে "**দৃষ্টান্তবিরোধেন হি**" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা

---

* "লৌকিকপরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্ত" ইতি চাক্ষপাদসূত্রং প্রমাণসিদ্ধো দৃষ্টান্ত ইত্যেতৎপরং, ন পুনর্লৌকিকসিদ্ধত্বমত্র বিবক্ষিতং। অন্যথা তেষাং পরমাণ্বাদির্ন দৃষ্টান্তঃ স্যাৎ, নহি পরমাণ্বাদির্নৈসর্গিকবৈনয়িকবুদ্ধ্যাতিশয়রহিতানাং লোকানাং সিদ্ধ ইতি।" —"ভামতী", ২।১।১৪।

দৃষ্টান্তলক্ষণের প্রয়োজন বলিয়াছেন। ফলকথা, "দৃষ্টান্ত" পদার্থও ন্যায়ের পূর্ব্বাঙ্গ। দৃষ্টান্ত পদার্থের স্বরূপ জানিলেই পঞ্চাবয়বের মধ্যে তৃতীয় অবয়ব "উদাহরণ" বাক্য বলা যায়, নচেৎ তাহা সম্ভব হয় না ॥ ২৫ ॥

ন্যায়-পূর্ব্বাঙ্গলক্ষণপ্রকরণ ॥ ৪ ॥

ভাষ্য। অথ সিদ্ধান্তঃ, ইদমিত্থম্ভূতঞ্চেত্যভ্যনুজ্ঞায়মানমর্থজাতং সিদ্ধং, সিদ্ধস্য সংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ, সংস্থিতিরিত্থম্ভাবব্যবস্থা ধর্ম্মনিয়মঃ। স খল্বয়ম্—

সূত্র। তন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ ॥২৬॥

অনুবাদ—অনন্তর অর্থাৎ দৃষ্টান্ত-নিরূপণের পরে সিদ্ধান্ত (নিরূপিত হইয়াছে)। ইহা এবং "এই প্রকার", এইরূপে স্বীক্রিয়মাণ পদার্থসমূহ "সিদ্ধ"। সিদ্ধের সংস্থিতি 'সিদ্ধান্ত'। "সংস্থিতি" বলিতে ইত্থম্ভাবের ব্যবস্থা কি না—ধর্ম্মনিয়ম। [অর্থাৎ এই পদার্থ এই ধর্ম্মবিশিষ্ট নহে, এইরূপ প্রমাণসিদ্ধ নিয়ম]। (সূত্রার্থ) সেই এই সিদ্ধান্ত "তন্ত্রসংস্থিতি", "অধিকরণসংস্থিতি" ও "অভ্যুপগমসংস্থিতি"। (মতান্তরে সূত্রার্থ) "তন্ত্রাধিকরণে"র অর্থাৎ প্রমাণবোধিত পদার্থসমূহের স্বীকার-সংস্থিতি-সিদ্ধান্ত।

টিপ্পনী—মহর্ষি "দৃষ্টান্ত"পদার্থের লক্ষণ বলিয়া, পৃথক্ প্রকরণের দ্বারা ক্রমপ্রাপ্ত সিদ্ধান্তপদার্থের নিরূপণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার ইহা প্রকাশ করিতেই প্রথমে বলিয়াছেন, "অর্থ সিদ্ধান্তঃ।" পরে "সিদ্ধান্ত" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া "স খল্বয়ং" এই বাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। "স খলু অয়ং সিদ্ধান্তঃ" এইরূপে সূত্রের সহিত উক্ত বাক্যের যোজনা বুঝিতে হইবে। উক্ত "খলু" শব্দটি বাক্যালঙ্কারের জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছে। "খলু স্যাদ্বাক্যভূষায়াং জিজ্ঞাসায়ঞ্চ সান্ত্বনে।"—মেদিনীকোষ।

মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা "সিদ্ধান্ত"পদার্থের সামান্য লক্ষণ সূচনা করিয়া, পরে **"স চতুর্ব্বিধঃ"** ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা সিদ্ধান্তপদার্থ যে, চতুর্ব্বিধ, ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। **কিন্তু এখানে এই প্রথম সূত্রটিকে সিদ্ধান্তপদার্থের লক্ষণার্থও বলা যায় না এবং বিভাগার্থও বলা যায় না, ইহা সমর্থন করিয়া প্রথম বা দ্বিতীয় সূত্র ব্যর্থ, সুতরাং উক্ত দুইটি সূত্রই ঋষিসূত্র নহে, তন্মধ্যে একটিই ঋষিসূত্র,**

এইরূপ আশঙ্কা প্রাচীন কালেও হইয়াছিল, ইহা উদ্দ্যোতকরের বিচার দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। উদ্দ্যোতকর উক্তরূপ আশঙ্কার ব্যাখ্যা করিয়া সমাধান করিয়াছেন যে, উক্ত দুইটিই মহর্ষি গোতমের সূত্র। প্রথমটি সিদ্ধান্তপদার্থের সামান্যলক্ষণসূত্র এবং দ্বিতীয়টি বিভাগসূত্র। সামান্য লক্ষণের জ্ঞান ব্যতীত বিশেষ লক্ষণ বুঝা যায় না। সুতরাং মহর্ষি এখানে প্রথম সূত্রের দ্বারা সিদ্ধান্তের সামান্য লক্ষণ বলিয়াই দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা সিদ্ধান্তের বিভাগ করিয়াছেন। সিদ্ধান্তপদার্থ বহু প্রকারে বিভিন্ন হইলেও সমস্ত সিদ্ধান্তই উক্ত চতুর্ব্বিধ সিদ্ধান্তেরই অন্তর্গত, এইরূপ নিয়ম জ্ঞাপনের জন্যই মহর্ষি উক্তরূপে সিদ্ধান্তের বিভাগ করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত বিভাগসূত্রও সার্থক হওয়ায় উহাও মহর্ষির সূত্র, উহা "অনার্ষ" নহে।

প্রথম সূত্রটি কিরূপে লক্ষণার্থ হয়? কিরূপে উহার দ্বারা সিদ্ধান্তের সামান্য লক্ষণ বুঝা যায়? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর পরে বলিয়াছেন,—তন্ত্রাধিকরণা-নামর্থানামভ্যুপগম ইতি সূত্রার্থঃ। তন্ত্রমধিকরণং যেষামর্থানাং ভবতি, তে তন্ত্রাধিকরণাস্তেষামভ্যুপগমসংস্থিতিরিত্থম্ভাবব্যবস্থা ধর্ম্মনিয়মঃ সিদ্ধান্তো ভবতি।" বৃত্তিকার বিশ্বনাথও "তন্ত্রং শাস্ত্রং, তদেবাধিকরণং জ্ঞাপকতয়া যস্য" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া, এই সূত্রে "তন্ত্রাধিকরণ" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—শাস্ত্রবোধিত পদার্থ। উদ্দ্যোতকর পরে ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, "যোঽর্থো ন শাস্ত্রিতস্তস্যা-ভ্যুপগমো ন সিদ্ধান্ত ইতি।" অর্থাৎ যে পদার্থ কোন শাস্ত্রবোধিত নহে, তাহার স্বীকার সিদ্ধান্ত নহে, ইহাই এই সূত্রে "তন্ত্রাধিকরণ" শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। "তার্কিকরক্ষা"র টীকায় মল্লিনাথও উক্তরূপ সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া, উহা সমর্থন করিতে উদ্দ্যোতকরের উক্ত বার্ত্তিকসন্দর্ভও উদ্ধৃত করিয়াছেন। বস্তুতঃ "তন্ত্র" শব্দের শাস্ত্র অর্থই প্রসিদ্ধ। পরবর্ত্তী তিন সূত্রে মহর্ষিও শাস্ত্র অর্থেই "তন্ত্র" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র ও জয়ন্ত ভট্ট এই সূত্রে "তন্ত্র" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—প্রমাণ।* তন্ত্র যাহার জ্ঞাপকরূপ অধিকরণ অর্থাৎ যে পদার্থ কোন প্রমাণবোধিত, তাহার 'অভ্যুপগমসংস্থিতি'ই

---

* "তন্ত্র্যন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে প্রমেয়াণ্যনেনেতি তন্ত্রং প্রমাণং" ('তাৎপর্য্যটীকা')। "তন্ত্র্যতেঽনেন পদার্থস্থিতিরিতি তন্ত্রং প্রমাণমুচ্যতে।" "প্রমাণমূলাভ্যুপগমবিষয়ীকৃতঃ সামান্য-বিশেষবানর্থঃ সিদ্ধান্ত ইতি সামান্যলক্ষণমুক্তং ভবতি।" ("ন্যায়মঞ্জরী")। "অভ্যুপেতঃ প্রমাণৈঃ স্যাদাভিমানিকসিদ্ধিতিঃ। সিদ্ধান্তঃ সর্ব্বতন্ত্রাদিভেদাৎ সোঽপি চতুর্ব্বিধঃ ॥"—"তার্কিকরক্ষা।" "আভিমানিকঞ্চ প্রামাণিকত্বং" ইত্যাদি—তাৎপর্য্যটীকা।

সিদ্ধান্ত, ইহাই সূত্রার্থ। বস্তুতঃ শাস্ত্রবোধক "তন্ত্র" শব্দের দ্বারা শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ প্রমাণমাত্রই লক্ষিত হইতে পারে। যদিও বাদী ও প্রতিবাদীর পরস্পরবিরুদ্ধ উভয় পক্ষই প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না, কিন্তু বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই নিজ নিজ পক্ষকে শাস্ত্রসিদ্ধ বা প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া অভিমান করায় তদনুসারেই উভয় পক্ষই "তন্ত্রাধিকরণ" শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র এবং বরদরাজও ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন।

উদ্দ্যোতকরের সূত্রার্থব্যাখ্যানুসারে বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের মতেও উক্তরূপ সূত্রার্থ গ্রহণ করিয়া, পরে বলিয়াছেন,—"তদেবং ভাষ্যকারেণ ব্যাখ্যায় সামান্যলক্ষণসূত্রং পঠিতমেবং ব্যাখ্যানপূর্ব্বকমেব বিভাগসূত্রং পঠতি। অর্থাৎ ভাষ্যকার এখানে পূর্ব্বেই উক্ত সামান্যলক্ষণসূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া সূত্রপাঠ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি যে, ভাষ্যকার প্রথমে "সিদ্ধান্ত" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া এই সামান্যলক্ষণসূত্র পাঠ করিয়াছেন এবং পরে "তন্ত্রার্থসংস্থিতিঃ" ইত্যাদি ভাষ্য সন্দর্ভের দ্বারা এই সূত্রেরই অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। "সিদ্ধান্ত" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, "ইদং" এবং "ইত্থম্ভূতং" অর্থাৎ "ইহা" এবং "এই প্রকার" এইরূপে স্বীক্রিয়মাণ যে সমস্ত পদার্থ, তাহাকে বলে "সিদ্ধ"। সেই সিদ্ধের যে 'সংস্থিতি', তাহাকে বলে "সিদ্ধান্ত"। "সংস্থিতি" বলিতে ইত্থম্ভাবের ব্যবস্থা। "ইত্থম্ভাব" বলিতে সেই পদার্থের বিশেষ ধর্ম্ম। "ব্যবস্থা" শব্দের অর্থ নিয়ম। তাই পরে উহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"**ধর্ম্মনিয়মঃ**।" তাৎপর্য্য এই যে, পদার্থমাত্রেরই সামান্য ধর্ম্ম ও বিশেষ ধর্ম্ম আছে। যেমন শব্দের সামান্য ধর্ম্ম ইদন্ত্ব ও শব্দত্ব এবং বিশেষ ধর্ম্ম নিত্যত্ব বা অনিত্যত্ব। কাহারও ইদন্ত্বরূপে শব্দের নিশ্চয়ের পরে এই শব্দ "ইত্থম্ভূত" অর্থাৎ নিত্য বা অনিত্যই, এইরূপে তাহাতে কোন নিয়ত বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয় হইলে তাঁহার পক্ষে শব্দ তদ্রূপেই সিদ্ধ। যেমন শব্দনিত্যতাবাদী মীমাংসকসম্প্রদায়ের মতে শব্দ নিত্যত্বরূপেই সিদ্ধ। সুতরাং বর্ণাত্মক শব্দের নিত্যত্বরূপ বিশেষ ধর্ম্মের যে নিয়ম অর্থাৎ উক্তরূপে স্বীকৃত যে নিত্যত্বরূপ ধর্ম্ম, তাহাই মীমাংসকসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। নিশ্চিত ধর্ম্ম অর্থেও "অন্ত" শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় "সিদ্ধান্ত" শব্দের দ্বারা উক্তরূপ অর্থ বুঝা যায়। এইরূপ নিশ্চয় অর্থেও "অন্ত" শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় উক্তরূপে সিদ্ধ পদার্থের স্বীকাররূপ নিশ্চয়কেও "সিদ্ধান্ত" বলা হইয়াছে।

জয়ন্ত ভট্ট প্রমাণসিদ্ধ সামান্যবিশেষধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থকেই সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। ভাষ্যকারও প্রথমসূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন,—**"অস্ত্যয়মিত্যভ্যনুজ্ঞায়মানোঽর্থঃ সিদ্ধান্তঃ।"** সূত্রকার মহর্ষিও পরে সিদ্ধান্তের বিশেষ-লক্ষণসূত্রে স্বীকৃত পদার্থবিশেষকেই সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। কিন্তু উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র সেই পদার্থবিশেষের "অভ্যুপগম" অর্থাৎ স্বীকারকেও সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" টীকায় উদয়নাচার্য্য ইহার সমাধানের জন্য বলিয়াছেন যে,* পদার্থ ও তাহার অভ্যুপগমের গৌণ মুখ্য ভাব বক্তার বিবক্ষাপ্রযুক্ত। সুতরাং কেহ সেই পদার্থের অভ্যুপগমের প্রাধান্যবিবক্ষাবশতঃ তাহাকেই সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। পদার্থের স্বীকাররূপ নিশ্চয় অথবা স্বীকৃত সেই পদার্থ, এই উভয়ই সিদ্ধান্ত। সুতরাং সূত্র, ভাষ্য, বার্ত্তিক ও তাৎপর্য্যটীকায় পরস্পর বিরোধ নাই। "পরিশুদ্ধিপ্রকাশে" বর্দ্ধমান উপাধ্যায় উক্ত স্থলে উদয়নের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে "সিদ্ধান্ত" শব্দের উক্ত উভয় অর্থই বাচ্য বলিয়া, "সিদ্ধান্ত" শব্দকে নানার্থই বলিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে "ত্রিসূত্রী নিবন্ধ" বলিয়া উদয়নাচার্য্যের "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি"র সন্দর্ভই উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" টীকারই নামান্তর "ন্যায়নিবন্ধ" ও "নিবন্ধ"। ন্যায়দর্শনের প্রথম তিন সূত্রের "নিবন্ধ"ই "ত্রিসূত্রী নিবন্ধ"।

ভাষ্য। তন্ত্রার্থসংস্থিতিস্তন্ত্রসংস্থিতিঃ। তন্ত্রমিতরেতরাভিসম্বদ্ধস্যার্থসমূহস্যোপদেশঃ শাস্ত্রম্। অধিকরণানুষক্তার্থসংস্থিতিরধিকরণসংস্থিতিঃ। অভ্যুপগমসংস্থিতিরনবধারিতার্থপরিগ্রহঃ। তদ্বিশেষপরীক্ষণায়াভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ।

অনুবাদ—"তন্ত্রার্থে"র (শাস্ত্রপ্রতিপাদিত পদার্থের) "সংস্থিতি" "তন্ত্রসংস্থিতি"। "তন্ত্র" বলিতে পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থসমূহের উপদেশরূপ শাস্ত্র। অধিকরণানুষক্ত অর্থের অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা কোন সিদ্ধান্তের সিদ্ধিতে তাহার আশ্রয়ের অনুষঙ্গবিশিষ্ট বা আনুষঙ্গিক পদার্থের সংস্থিতি "অধিকরণ-সংস্থিতি"। অনবধারিত পদার্থের পরিগ্রহ অর্থাৎ নিজের অসম্মত পরমতের

* "অত্রার্থাভ্যুপগময়োর্গুণপ্রধানভাবস্য বিবক্ষাতন্ত্রত্বাদর্থাভ্যুপগমোঽভ্যুপগম্যমানো বাঽর্থঃ সিদ্ধান্তত্বেন সূত্র-ভাষ্য-বার্ত্তিক-টীকাসু মিথো ন বিরোধঃ।"—'তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি' (২৯৭ পৃঃ)। "অভ্যুপগমস্যাপ্যর্থনিরূপ্যত্বাদ্বিনিগমকাভাবাদ্ দ্বয়োরপি তুল্যত্বাদ্ বাচ্যতয়া সিদ্ধান্তপদং নানার্থং।" প্রকাশটীকা।

বিনা বিচারে স্বীকার "অভ্যুপগম-সংস্থিতি"। সেই পদার্থের বিশেষ ধর্ম্মের পরীক্ষার নিমিত্ত 'অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত' হয়।

ভাষ্য। তন্ত্রভেদাত্তু খলু—

সূত্র। স চতুর্ব্বিধঃ সর্ব্বতন্ত্র-প্রতিতন্ত্রাধিকরণা-ভ্যুপগমসংস্থিত্যর্থান্তরভাবাৎ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—কিন্তু তন্ত্রে'র ভেদপ্রযুক্ত সেই সিদ্ধান্ত পদার্থ চতুর্ব্বিধ; যেহেতু (১) সর্ব্বতন্ত্রসংস্থিতি, (২) প্রতিতন্ত্রসংস্থিতি, (৩) অধিকরণসংস্থিতি ও (৪) অভ্যুপগমসংস্থিতির 'অর্থান্তরভাব' (পরস্পর ভেদ) আছে।

ভাষ্য। তত্রৈতাশ্চতস্রঃ সংস্থিতয়োঽর্থান্তরভূতাঃ।

অনুবাদ—তন্মধ্যে অর্থাৎ সংস্থিতি বা সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে এই চারিটী সংস্থিতি পরস্পর ভিন্ন।

টিপ্পনী—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন,—"**ব্যাখ্যান-পূর্ব্বকমেব বিভাগসূত্রং পঠতি।**" অর্থাৎ ভাষ্যকার "**তন্ত্রার্থসংস্থিতিঃ**" ইত্যাদি ভাষ্যসন্দর্ভের দ্বারা পূর্ব্বেই এই বিভাগসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াই এই সূত্র পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার যে, পূর্ব্বসূত্রপাঠের পরে তাহার ব্যাখ্যা করেন নাই, পূর্ব্বোক্ত "তন্ত্রার্থসংস্থিতিঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভ যে, এই বিভাগসূত্রেরই ভাষ্য, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু উক্ত সন্দর্ভের দ্বারা ভাষ্যকারের মতে পূর্ব্বসূত্রেরই ব্যাখ্যা বুঝিতে পারি যে, "তন্ত্রসংস্থিতি", "অধিকরণসংস্থিতি" ও "অভ্যুপগমসংস্থিতি" সিদ্ধান্ত। শেষোক্ত 'সংস্থিতি' শব্দের পূর্ব্বোক্ত 'তন্ত্র', 'অধিকরণ' ও 'অভ্যুপগম" শব্দের সহিত সম্বন্ধবশতঃ উক্তরূপ অর্থ বুঝা যায়। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত 'তন্ত্রসংস্থিতি'র ব্যাখ্যা "তন্ত্রার্থসংস্থিতি"। "তন্ত্র" শব্দের অর্থ শাস্ত্র। সুতরাং তন্ত্রার্থসংস্থিতি বলিলে বুঝা যায়, শাস্ত্রপ্রতিপাদিত পদার্থের সংস্থিতি। "অধিকরণ সংস্থিতি" বলিতে বুঝিতে হইবে, অধিকরণের সহিত অনুষক্ত অর্থাৎ আনুষঙ্গিক পদার্থের সংস্থিতি। পরে অধিকরণ-সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যায় ইহা সুব্যক্ত হইবে। শেষোক্ত "অভ্যুপগমসংস্থিতি" বলিতে প্রমাণ দ্বারা অপরীক্ষিত পরমতের স্বীকার। কোন পদার্থে বাদীর সম্মত ধর্ম্মবিশেষকে বিনা বিচারে স্বীকার করিয়া, তাহাতে অপর বিশেষ ধর্ম্মের পরীক্ষা করিলে, সেই স্থলে বিনা বিচারে স্বীকৃত সেই ধর্ম্মই ভাষ্যকারের মতে "অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত"।

ফলকথা, আমরা বুঝিতে পারি, যে ভাষ্যকার "তন্ত্রার্থসংস্থিতিঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রেরই ব্যাখ্যা করিয়া, তন্ত্রসংস্থিতি, অধিকরণসংস্থিতি ও অভ্যুপগমসংস্থিতি, ইহাদিগের অন্যতমত্বই সিদ্ধান্তের সামান্য লক্ষণ, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও তাহাই বুঝিয়া বলিয়াছেন,—"অত্র চ ভাষ্যানুসারাৎ সর্ব্বতন্ত্রপ্রতিতন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমসিদ্ধান্তান্যতমঃ সিদ্ধান্ত ইতি সূত্রার্থ ইতি তু ন যুক্তং, অগ্রিমসূত্রানুত্থানাপত্তেঃ। অর্থাৎ ভাষ্যানুসারে উক্তরূপ সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিলে দ্বিতীয় বিভাগসূত্রটি ব্যর্থ হয়। বৃত্তিকারের বহু পূর্ব্বে "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্টও নিজ মতে পূর্ব্বসূত্রের ব্যাখ্যার পরে "অন্যে তু ব্যাচক্ষতে" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা ভাষ্যকারের উক্তরূপ ব্যাখ্যারই ব্যাখ্যা করিয়া, উহাকে অপব্যাখ্যাই বলিয়া গিয়াছেন। তিনিও বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যসন্দর্ভকে এই বিভাগসূত্রেরই ভাষ্য বলিয়া সমাধান করেন নাই।

কিন্তু বৃত্তিকারের কথায় ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য এই যে, উক্তরূপ ব্যাখ্যানুসারে পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা সিদ্ধান্তপদার্থের উক্তরূপ সামান্যলক্ষণ ও ভেদ বুঝা গেলেও 'সিদ্ধান্ত'পদার্থ যে চতুর্ব্বিধ, ত্রিবিধ নহে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। তাই মহর্ষি পরে "স চতুর্ব্বিধঃ" ইত্যাদি বিভাগসূত্রটি বলিয়াছেন।* এবং তাহাতে চতুর্ব্বিধত্বের সাধক হেতুও বলিয়াছেন। ভাষ্যকার পরে সেই হেতুরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্ব্বসূত্রোক্ত ত্রিবিধ সিদ্ধান্ত চতুর্ব্বিধ হয় কিরূপে? ইহাই ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার এই সূত্রপাঠের পূর্ব্বে বলিয়াছেন,— "তন্ত্রভেদাত্তু খলু।" বাচস্পতি মিশ্রও ইহা সুব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,— "তন্ত্রগ্রহণেন চ সর্ব্বতন্ত্র-প্রতিতন্ত্রয়োরুপাদানং তয়োরপি তন্ত্রত্বাৎ, তদিদমুক্তং

---

* এখানে স্মরণ করা আবশ্যক যে, মহর্ষি বাক্যসংক্ষেপে অনিচ্ছাপ্রযুক্ত এই সূত্রের প্রথমে "স চতুর্ব্বিধঃ" এই স্পষ্টার্থ বাক্য বলিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে পঞ্চমসূত্রভাষ্যে ভাষ্যকারের কথার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ তাহা লক্ষ্য না করিয়া, "সর্ব্বতন্ত্র" ইত্যাদি সূত্রপাঠই গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "স চতুর্ব্বিধ ইতি শেষঃ।" অর্থাৎ এই সূত্রের শেষে উক্ত বাক্য উহ্য। আরও অনেক পুস্তকে "সর্ব্বতন্ত্র" ইত্যাদি সূত্রপাঠই দেখা যায়। কিন্তু "স চতুর্ব্বিধঃ" ইত্যাদি সূত্রপাঠই প্রকৃত। বাচস্পতি মিশ্র, জয়ন্ত ভট্ট, উদয়নাচার্য্য ও বরদরাজ প্রভৃতিও উক্তরূপ সূত্রপাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" টীকায় (২২৪ পৃঃ) উদয়নাচার্য্যের কথার দ্বারাও উক্তরূপ সূত্রপাঠই বুঝা যায়। সেখানে "প্রকাশ"টীকাকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ও স্পষ্ট বলিয়াছেন,—"স চতুর্ব্বিধ ইতি সূত্র-প্রতীকেনেত্যর্থঃ।"

তন্ত্রভেদাত্ত্বিতি।" তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বসূত্রে শাস্ত্রবোধক "তন্ত্র" শব্দের দ্বারা সর্ব্বতন্ত্র, ও প্রতিতন্ত্র এই উভয়েই গৃহীত হইয়াছে। কারণ, বিভিন্ন মত-প্রতিপাদক যে সমস্ত শাস্ত্র, তাহাও তন্ত্র, তাহাকে বলে **প্রতিতন্ত্র**। কিন্তু সেই সমস্ত তন্ত্রপ্রতিপাদিত পদার্থের যে সংস্থিতি অর্থাৎ প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তসমূহ, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত না হওয়ায় সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত হইতে ভিন্নপ্রকার। সুতরাং তন্ত্রের ভেদপ্রযুক্ত পূর্ব্বসূত্রোক্ত যে, "তন্ত্রসংস্থিতি" বা তন্ত্রসিদ্ধান্ত, তাহা **"সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত"** ও **"প্রতি তন্ত্রসিদ্ধান্ত"** নামে দ্বিবিধ হওয়ায় (১) 'সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত', (২) 'প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত', (৩) 'অধিকরণসিদ্ধান্ত' ও (৪) 'অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত' নামে সিদ্ধান্তপদার্থ চতুর্ব্বিধই। উদ্দ্যোতকরও পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, সিদ্ধান্তপদার্থ বহু প্রকারে বিভিন্ন হইলেও সমস্ত সিদ্ধান্তই উক্ত চতুর্ব্বিধ সিদ্ধান্তেরই অন্তর্গত, এইরূপ নিয়ম প্রদর্শনই উক্তরূপ সিদ্ধান্ত বিভাগের উদ্দেশ্য। সুতরাং এই বিভাগসূত্রটীও ব্যর্থ নহে, ইহা অনার্য নহে ॥ ২৬ ২৭ ॥

ভাষ্য। তাসাং—

সূত্র। সর্ব্বতন্ত্রাবিরুদ্ধস্তন্ত্রেঽধিকৃতোঽর্থঃ সর্ব্ব-তন্ত্রসিদ্ধান্তঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ, শাস্ত্রে কথিত পদার্থ "সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত"।

ভাষ্য। যথা ঘ্রাণাদীনীন্দ্রিয়াণি, গন্ধাদয় ইন্দ্রিয়ার্থাঃ, পৃথিব্যাদীনি ভূতানি, প্রমাণৈরর্থস্য গ্রহণমিতি।

অনুবাদ—যেমন ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়, গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থ, ক্ষিতি প্রভৃতি ভূত, প্রমাণের দ্বারা পদার্থের যথার্থ জ্ঞান হয়, ইত্যাদি (সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত)।

টিপ্পনী—মহর্ষি ক্রমানুসারে পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ সিদ্ধান্তের বিশেষ লক্ষণ বলিতে প্রথমে এই সূত্র দ্বারা প্রথমোক্ত **"সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তে"**র লক্ষণ বলিয়াছেন। পূর্ব্বসূত্রে সিদ্ধান্তবোধক স্ত্রীলিঙ্গ **"সংস্থিতি"** শব্দের প্রয়োগ করায় ভাষ্যকার স্ত্রীলিঙ্গ "তদ্" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ সংস্থিতিকে গ্রহণ করিয়া, এই সূত্রের প্রথমে বলিয়াছেন,—**"তাসাং"**। উক্ত পদের সহিত যোগ করিয়া সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ সংস্থিতির মধ্যে অর্থাৎ সিদ্ধান্তের মধ্যে যাহা সর্ব্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রে অধিকৃত বা কথিত, এমন

পদার্থই প্রথমোক্ত **"সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত"**। যাহা সর্ব্বশাস্ত্রে কথিত, তাহাই "সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত", ইহা বলিলে কেবল ন্যায়শাস্ত্রে কথিত **"ছল"** ও **"জাতি"** নামক পদার্থের যে অসদুত্তরত্ব, তাহা সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কিন্তু উহা সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত বলিয়া বাদী, প্রতিবাদী ও মধ্যস্থ, সকলের স্বীকার্য্য। তাই মহর্ষি বলিয়াছেন,—**"সর্ব্বতন্ত্রাবিরুদ্ধঃ"**। অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্রে কথিত না হইলেও যাহা কোন শাস্ত্রে বিরুদ্ধ নহে। কিন্তু যাহা কোন শাস্ত্রেই কথিত হয় নাই, এমন পদার্থ সর্ব্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ হইলেও তাহা সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত নহে, ইহা ব্যক্ত করিতে মহর্ষি পরে বলিয়াছেন,—**"তন্ত্রেঽধিকৃতঃ"**। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, উক্ত পদ না বলিলে মনের ইন্দ্রিয়ত্বও সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু উহা ন্যায়শাস্ত্রে কথিত না হওয়ায় সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত নহে, ইহাই মহর্ষির তাৎপর্য্য। কিন্তু উক্ত "তন্ত্র" শব্দের দ্বারা কেবল ন্যায়শাস্ত্রই বুঝা যায় না, পরন্তু ভাষ্যকারের মতে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব যে সর্ব্বসিদ্ধান্ত, ইহাই বুঝা যায় (পূর্ব্ব ১৩৮-১৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্যকার এই সরলার্থ সূত্রের ব্যাখ্যা না করিয়া "সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্তে"র কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সর্ব্বশেষে আদি অর্থে "ইতি" শব্দের প্রয়োগ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ঐরূপ আরও বহু "সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত" আছে। বস্তুতঃ "সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত" কিছুই না থাকিলে বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারই হইতে পারে না। কারণ, কোন ধর্ম্মীই সিদ্ধ না থাকিলে তাহাতে নানা বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সংশয় ও তন্মূলক বিচার সম্ভব হয় না, সুতরাং কোন প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তও সিদ্ধ হয় না। বাদী ও প্রতিবাদীর স্বীকৃত "দৃষ্টান্ত" পদার্থ হইতে "সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তে"র ভেদ বুঝাইতে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, দৃষ্টান্ত পদার্থ পূর্ব্বে কেবল বাদী ও প্রতিবাদীরই নিশ্চিত, কিন্তু "সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত" সকলেরই নিশ্চিত। পরন্তু দৃষ্টান্তপদার্থ কেবল অনুমান ও শব্দপ্রমাণের আশ্রয়, কিন্তু সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত মাত্রই ঐরূপ নহে। সুতরাং দৃষ্টান্তপদার্থ হইতে "সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্তে"র ভেদ থাকায় পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

সূত্র। সমানতন্ত্রসিদ্ধঃ পরতন্ত্রাসিদ্ধঃ প্রতিতন্ত্র-সিদ্ধান্তঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—একশাস্ত্রসিদ্ধ অর্থাৎ স্বশাস্ত্রসিদ্ধ, (কিন্তু) পরতন্ত্রে (অন্য শাস্ত্রে) অসিদ্ধ (পদার্থ) "প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত"।

ভাষ্য। যথা নাসত আত্মলাভঃ, ন সত আত্মহানং, নিরতিশয়াশ্চেতনাঃ, দেহেন্দ্রিয়মনঃসু বিষয়েষু তত্তৎকারণে চ বিশেষ ইতি সাংখ্যানাম্। পুরুষকর্ম্মাদিনিমিত্তো ভূতসর্গঃ, কর্ম্মহেতবো দোষাঃ প্রবৃত্তিশ্চ, স্বগুণবিশিষ্টাশ্চেতনাঃ, অসদুৎপদ্যতে উৎপন্নং নিরুধ্যত ইতি যোগানাম্।

অনুবাদ—যেমন অসতের উৎপত্তি হয় না, সতের অত্যন্ত বিনাশ হয় না। চেতনগণ অর্থাৎ সমস্ত আত্মা নিরতিশয় (অপরিণামী নির্গুণ)। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনে, বিষয়সমূহে এবং তত্তৎকারণে অর্থাৎ "মহৎ", "অহঙ্কার" এবং "পঞ্চতন্মাত্র"-রূপ সূক্ষ্ম ভূতে "বিশেষ" (পরিণামবিশেষ) আছে, ইহা সাংখ্যসম্প্রদায়েরই (প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত)। ভূতসৃষ্টি (দ্ব্যণুকাদিব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি) পুরুষের কর্ম্মাদিজন্য অর্থাৎ জীবের অদৃষ্ট এবং পরমাণুদ্বয়-সংযোগাদি কারণজন্য। দোষসমূহ অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহ এবং প্রবৃত্তি, কর্ম্মের (অদৃষ্টের) হেতু। সমস্ত চেতন স্বগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ জ্ঞানাদি-নিজগুণবিশিষ্ট। অসৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে যাহার কোনরূপ সত্তা থাকে না, তাহাই উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন বস্তু (সৎপদার্থ) নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ অত্যন্ত বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ইহা "যোগ" সম্প্রদায়েরই (প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত)।

টিপ্পনী—এই সূত্রের দ্বারা দ্বিতীয় "প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তে"র লক্ষণ কথিত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্রের মতে এই সূত্রে "সমান" শব্দের অর্থ এক। তিনি বলিয়াছেন,—"সমানশব্দ একপর্য্যায়ঃ। নৈয়ায়িকানাং হি সমানং তন্ত্রং ন্যায়শাস্ত্রং, পরতন্ত্রঞ্চ সাংখ্যাদিশাস্ত্রম্।" এইরূপ সাংখ্যাদি সম্প্রদায়ের পক্ষে ন্যায়শাস্ত্র পরতন্ত্র, কিন্তু সাংখ্যাদিশাস্ত্র সমানতন্ত্র। তাহা হইলে এই সূত্র দ্বারা বুঝা যায় যে, যে সম্প্রদায়ের পক্ষে যাহা নিজতন্ত্রে সিদ্ধ, কিন্তু পরতন্ত্রে অসিদ্ধ, তাহা সেই সম্প্রদায়ের প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত। ভাষ্যকার ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন,—"**যথা নাসত আত্মলাভঃ**" ইত্যাদি। এখানে "আত্মন্" শব্দের অর্থ স্বস্বরূপ। 'আত্মলাভ' বলিতে স্বস্বরূপ লাভ অর্থাৎ উৎপত্তি। 'আত্মহান' বলিতে স্বস্বরূপ ত্যাগ অর্থাৎ বিনাশ। সাংখ্যসম্প্রদায়ের মতে যাহা পূর্ব্বে অসৎ, তাহার উৎপত্তি হয় না এবং যাহা সৎ, তাহার অত্যন্ত বিনাশ হয় না। এবং চৈতন্যস্বরূপ আত্মা বা পুরুষ নির্গুণ অপরিণামী, কিন্তু

দেহাদি ও তাহার কারণ সমস্ত জড় পদার্থ পরিণামী। ভাষ্যকার এই সমস্ত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—**"ইতি সাংখ্যানাম্"**।

কিন্তু অসৎকার্য্যবাদী ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে পুরুষের (জীবাত্মার) স্বগত অদৃষ্ট এবং নিত্য পরমাণু প্রভৃতি কারণজন্য ভূত সৃষ্টি হয় এবং জীবাত্মার রাগাদি দোষ ও শুভাশুভ কর্ম্মরূপ প্রবৃত্তি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টের জনক এবং সমস্ত আত্মাই সগুণ, এবং উৎপত্তির পূর্ব্বে যাহা অসৎ, তাহার উৎপত্তি হয় এবং সেই সমস্ত উৎপন্ন পদার্থ যথাকালে নিরুদ্ধ অর্থাৎ অত্যন্ত বিনষ্ট হয়। ভাষ্যকার প্রথমোক্ত সাংখ্যসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ শেষোক্ত সিদ্ধান্তসমূহের উল্লেখ করিয়া, পরে বলিয়াছেন,—**"ইতি যোগানাম্"**। 'যোগ' শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে অচ্ প্রত্যয়নিষ্পন্ন "যোগ" শব্দের দ্বারা যোগী বুঝা যায়, এবং উক্তরূপ প্রয়োগও প্রসিদ্ধ আছে। যেমন ভগবদ্গীতায় "যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে"। (৫।৫)—এই বাক্যে "যোগ" শব্দের অর্থ যোগী। (টীকাকার আনন্দগিরি ও মধুসূদন সরস্বতীও উক্ত অর্থের ব্যাখ্যা করিতে লিখিয়াছেন,— "অর্শ আদিত্বাদ্ মত্বর্থীয়োঽচ্ প্রত্যয়ঃ)।" কিন্তু এখানে ভাষ্যকারোক্ত **"যোগানাম্"** এই পদের দ্বারা প্রসিদ্ধ যোগশাস্ত্রবিৎ পাতঞ্জল যোগীদিগকে বুঝা যায় না। কারণ, তাঁহারাও সাংখ্যসম্প্রদায়ের ন্যায় পরিণামবাদী। তাঁহাদিগের মতেও অসতের উৎপত্তি এবং সতের অত্যন্ত বিনাশ হয় না। সুতরাং এখানে ভাষ্যকারোক্ত "যোগ" শব্দের দ্বারা শৈব যোগী নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক সম্প্রদায়ই বুঝিতে হইবে। কারণ, ভাষ্যকারের শেষোক্ত ঐ সমস্ত সিদ্ধান্ত তাঁহাদিগের "প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত।" প্রাচীন কালে তাঁহাদিগেরও গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত পৃথক্ যোগশাস্ত্র এবং বিশিষ্ট যোগানুষ্ঠানের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তাঁহারাও শৈব যোগী ও পাশুপত যোগী ছিলেন। "ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ের" টীকায় গুণরত্ন সূরির বর্ণনার দ্বারাও ইহা বুঝা যায়।

বস্তুতঃ যে কারণেই হউক্, প্রাচীন কালে বৈশেষিক শাস্ত্রও **"যোগ"** নামে কথিত হইত। তাহা হইলে সেই "যোগ"বিৎ সম্প্রদায়ও "যোগ" নামে কথিত হইতেন, ইহা বুঝা যায়। জৈন দার্শনিকগণ বৈশেষিক শাস্ত্র এবং সেই শাস্ত্রজ্ঞ সম্প্রদায়কেও **"যোগ"** নামে উল্লেখ করিয়াছেন* এবং তাঁহারা

---

* "যোগস্য সদকারণবন্নিত্যমিত্যাদিবৎ।"

"সদকারণবন্নিত্যমিতি যোগবচো যথা।"—বিদ্যানন্দ স্বামিকৃত "পত্রপরীক্ষা" (জৈন ন্যায়)। "সদকারণবন্নিত্যং", এইটী বৈশেষিকদর্শনের চতুর্থাধ্যায়ের প্রথম সূত্র। ইহার

নৈয়ায়িকসম্প্রদায়কে বলিয়াছেন—"যৌগ।"* তাহা হইলে প্রাচীন সংজ্ঞানুসারে ভাষ্যকারও এখানে "যোগানাম্" এই পদের দ্বারা বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিতে পারেন। কোন কোন প্রাচীন পণ্ডিত বলিতেন যে, মহর্ষি কণাদ কোন বিশিষ্ট যোগবিভূতির দ্বারা মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়া, তাহার ফলে বৈশেষিক শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ইহা প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও বলিয়া গিয়াছেন (প্রশস্তপাদভাষ্যশেষে—"যোগাচারবিভূত্যা যস্তোষয়িত্বা মহেশ্বরং" ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য)। অতএব বুঝা যায়, কণাদপ্রোক্ত বৈশেষিক শাস্ত্র তাঁহার বিশিষ্ট যোগলব্ধ বলিয়া ঐ তাৎপর্য্যে প্রাচীন কালে উহা "যোগ" নামেও কথিত হইত এবং ঐ শাস্ত্রবিৎ সম্প্রদায়ও "যোগ" নামে কথিত হইতেন। তদনুসারেই ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন,—"যোগানাম্"। উহার ব্যাখ্যা—'বৈশেষিকাণাম্।'†

কিন্তু উক্ত ব্যাখ্যায় প্রথম বক্তব্য এই যে, ভাষ্যকারের শেষোক্ত ঐ সমস্ত

উল্লেখ করিয়া বিদ্যানন্দ স্বামী ইহাকে "যোগ"-বচন বলিয়াছেন। অন্যত্র বলিয়াছেন,—"সৌগতসাংখ্যযোগানাং তথাভূতপরিণাম-বিশেষাসিদ্ধেঃ।"—(বিদ্যানন্দস্বামিকৃত পত্রপরীক্ষা)।

* সৌগত-সাংখ্যযোগ-প্রাভাকর-জৈমিনীয়ানাং প্রত্যক্ষানুমানাগমোপমানার্থাপত্ত্যভাবৈরেকৈকাধিকৈর্ব্যাপ্তিবৎ।—("পরীক্ষামুখ", ৬ সমুদ্দেশ, ৫৭ সূত্র)। এই সূত্রোক্ত প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণগুলির যথাক্রমে এক একটী অতিরিক্ত গ্রহণ করিলে "যৌগ" পক্ষে প্রত্যক্ষাদি চারিটী প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈশেষিক যখন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বয়বাদী, তখন এই সূত্রে "যৌগ" শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচতুষ্টয়বাদী নৈয়ায়িককেই গ্রহণ করা হইয়াছে, বলিতে হইবে। "ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ে"র টীকাকার গুণরত্ন সূরি স্পষ্টই লিখিয়াছেন—"অথাদৌ নৈয়ায়িকানাং যৌগাপরাভিধানানাং।"—নৈয়ায়িক মত ব্যাখ্যারম্ভে গুণরত্নকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

† সুবিখ্যাত বৈদান্তিক লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় মহোদয় কাশী চৌখাম্বা হইতে প্রথম প্রকাশিত 'বিদ্যাসাগরী' টীকা সহিত "খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যে"র ভূমিকায় (১৯শ পৃঃ) নিজ মন্তব্য সমর্থন করিতে এখানে ভাষ্যকারোক্ত "যোগানাং" এই পদের উক্তরূপ ব্যাখ্যাকেই আশ্রয় করিয়া লিখিয়াছেন,—"তেন জ্ঞায়তে, ভাষ্যকারস্য নেদং স্বকীয়ং মতং, পরমতমেব উদাহরণপ্রদর্শনায় উপন্যস্তমিতি ন তত্র তাৎপর্য্যম্।" কিন্তু ন্যায়দর্শনে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে সূত্রকার ও ভাষ্যকার উক্ত যে সমস্ত মতকে তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, তাহা যে নৈয়ায়িকমত নহে, কিন্তু বৈশেষিকমত, ইহা কি এখানে কেবল ভাষ্যকারোক্ত "যোগানাং" এই পদের দ্বারাই নির্ণীত হইতে পারে? শাস্ত্রিমহাশয়ের ঐরূপ অসম্ভব নির্ণয় নিতান্ত বিস্ময়জনকই বটে। আচার্য্য শঙ্করশিষ্য সুরেশ্বরও ত "মানসোল্লাস" গ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেন,—"ইতি বৈশেষিকাঃ প্রাহুস্তথা নৈয়ায়িকা অপি।" শাস্ত্রিমহাশয় উক্ত ভূমিকায় বাৎস্যায়নের মতেও যে, ন্যায়দর্শন অধ্যাত্মবিদ্যাই নহে, ইহাও প্রতিপন্ন করিতে বহু কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

সিদ্ধান্ত ন্যায়দর্শনেরও সিদ্ধান্ত। 'বার্ত্তিক'কার উদ্দ্যোতকরও এখানে "প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তে"র উদাহরণ প্রদর্শন করিতে সংক্ষেপে বলিয়াছেন—"ভৌতিকানীন্দ্রিয়াণীতি যোগানামভৌতিকানীতি সাংখ্যানাম্।" কিন্তু কণাদের ন্যায় গোতমও বিচারপূর্ব্বক বহিরিন্দ্রিয়বর্গের ভৌতিকত্ব সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ঐ সমস্ত সিদ্ধান্ত যে কেবল বৈশেষিকসম্প্রদায়েরই সিদ্ধান্ত, ইহা ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার বলিতে পারেন না। "বার্ত্তিক"-ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্রও "যোগানামেব" এই বাক্যে "এব" শব্দের দ্বারা সাংখ্য-সম্প্রদায়েরই ব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন। অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়বর্গের ভৌতিকত্ব সাংখ্যসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত নহে, ইহাই "বার্ত্তিক"কারের বিবক্ষিত। পরন্তু উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি বৈশেষিকসম্প্রদায়ের উল্লেখ করিতে অন্যত্র "বৈশেষিক" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে ভাষ্যকারের তাহাই বক্তব্য হইলে তিনি স্পষ্টার্থ **"বৈশেষিকাণাম্"** এইরূপ প্রয়োগ করেন নাই কেন? ইহাও ত বলা আবশ্যক। যদি বলা যায় যে, ভাষ্যকার "যোগানাম্" এই পদের দ্বারা নিত্যপরমাণুদ্বয়ের যোগবাদী বা যৌগিক সৃষ্টিবাদী অর্থাৎ আরম্ভবাদী বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক, এই উভয় সম্প্রদায়েরই উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইলে ঐরূপ প্রয়োগ সার্থক হয়। বস্তুতঃ "যোগ" শব্দের সংযোগ অর্থই যে প্রসিদ্ধ, ইহা "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" যোগ পদার্থের ব্যাখ্যায় মাধবাচার্য্যও বলিয়াছেন। তাহা হইলে "যোগ" শব্দের দ্বারা তাৎপর্য্যবশতঃ কণাদ ও গোতমের সম্মত আরম্ভবাদের মূল পরমাণুসংযোগরূপ বিশেষ অর্থ গ্রহণ করিয়া "যোগাঃ সন্তি যেষাং মতে" এইরূপ কোন ব্যুৎপত্তি অনুসারে এখানে ভাষ্যকারোক্ত "যোগ" শব্দের দ্বারা আরম্ভবাদী পূর্ব্বোক্ত উভয় সম্প্রদায়কেই বুঝা যাইতে পারে। যেমন দ্বৈতবাদীদিগকে "দ্বৈতী" বলা হইয়াছে, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত যোগবাদীদিগকে "যোগী" বা "যোগ" বলা যাইতে পারে। সুধীগণ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথারই বিচার করিয়া এখানে প্রকৃতার্থ নির্ণয় করিবেন ॥ ২৯ ॥

কিন্তু বাৎস্যায়নও ত প্রথমসূত্রভাষ্যশেষে স্পষ্ট বলিয়াছেন, "ইহ ত্বধ্যাত্মবিদ্যায়াং" ইত্যাদি (পূর্ব্ব ৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ন্যায়মতের খণ্ডনকার বৈদান্তিকচূড়ামণি শ্রীহর্ষও "নৈষধীয় চরিতে"র দশম সর্গের ৮১ শ্লোকে মহর্ষি গোতমপ্রকাশিত "আন্বীক্ষিকী" বিদ্যাকে অধ্যাত্মবিদ্যারূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। আর ন্যায়দর্শন অধ্যাত্মবিদ্যাই না হইলে তাহাতে "দুঃখ-জন্ম" ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্রটি কেন বলা হইয়াছে? বেদান্তদর্শনের চতুর্থসূত্রভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করও ত বহু সম্মানপূর্ব্বক ঐ সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সূত্র। যৎসিদ্ধাবন্যপ্রকরণসিদ্ধিঃ সোঽধিকরণ-সিদ্ধান্তঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—যে পদার্থের সিদ্ধিবিষয়ে অন্য "প্রকরণে"র অর্থাৎ অন্য আনুষঙ্গিক পদার্থের সিদ্ধি হয়, সেই পদার্থ অধিকরণসিদ্ধান্ত।

ভাষ্য। যস্যার্থস্য সিদ্ধাবন্যেঽর্থা অনুষজ্যন্তে, ন তৈর্ব্বিনা সোঽর্থঃ সিধ্যতি, তেঽর্থা যদধিষ্ঠানাঃ সোঽধিরণসিদ্ধান্তঃ। যথেন্দ্রিয়ব্যতিরিক্তো জ্ঞাতা "দর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণা"দিতি। অত্রানুষঙ্গিণোঽর্থা ইন্দ্রিয়নানাত্বম্; নিয়তবিষয়াণীন্দ্রিয়াণি, স্ববিষয়-গ্রহণলিঙ্গানি, জ্ঞাতুর্জ্ঞানসাধনানি, গন্ধাদিগুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যং গুণাধিকরণং, অনিয়তবিষয়াশ্চেতনা ইতি, পূর্ব্বার্থ-সিদ্ধাবেতেঽর্থাঃ সিধ্যন্তি, ন তৈর্ব্বিনা সোঽর্থঃ সম্ভবতীতি।

অনুবাদ—যে পদার্থের অর্থাৎ সাধ্য অথবা হেতুভূত যে পদার্থের সিদ্ধিবিষয়ে অন্য পদার্থসমূহ অনুষক্ত হয়, (অর্থাৎ) সেই সমস্ত অন্য পদার্থ ব্যতীত সেই পদার্থ (পূর্ব্বোক্ত পদার্থ) সিদ্ধ হয় না, সেই অন্য পদার্থসমূহ "যদধিষ্ঠান" অর্থাৎ যে পদার্থের আশ্রিত, সেই পদার্থ অর্থাৎ সেই সমস্ত আনুষঙ্গিক পদার্থের সহিত তাহার অধিকরণ বা আশ্রয়ভূত পদার্থ 'অধিকরণসিদ্ধান্ত।' (উদাহরণ) যেমন জ্ঞাতা অর্থাৎ আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন, যেহেতু চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা এক পদার্থের জ্ঞান হয়। এই স্থলে অর্থাৎ উক্তরূপ অনুমানস্থলে ইন্দ্রিয়ের নানাত্ব এবং ইন্দ্রিয়বর্গ নিয়তবিষয় (অর্থাৎ ঘ্রাণাদি বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ের নিয়ম আছে) এবং 'স্ববিষয়-গ্রহণলিঙ্গ' (অর্থাৎ যথাক্রমে গন্ধাদি নিজ নিজ বিষয়ের প্রত্যক্ষই ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের লিঙ্গ বা অনুমাপক) এবং জ্ঞাতার (জীবাত্মার) জ্ঞানের অর্থাৎ গন্ধাদি নিজ নিজ বিষয়ের প্রত্যক্ষের সাধন এবং দ্রব্য পদার্থ গন্ধাদি গুণ হইতে ভিন্ন ও গুণের আধার এবং চেতনসমূহ 'অনিয়তবিষয়' অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়ের ন্যায় জীবাত্মার গ্রাহ্য বিষয়ের উক্তরূপ নিয়ম নাই,—এই সমস্ত (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের নানাত্ব, নিয়তবিষয়ত্ব, স্ববিষয়গ্রহণলিঙ্গত্ব, জ্ঞানসাধনত্ব, দ্রব্যের গন্ধাদি গুণভিন্নত্ব ও গুণাধারত্ব ও জ্ঞাতা চেতনসমূহের অনিয়তবিষয়ত্ব) অনুষঙ্গী পদার্থ। পূর্ব্বার্থের সিদ্ধিবিষয়ের অর্থাৎ সাক্ষাৎকথিত সেই পূর্ব্ব পদার্থের সিদ্ধিতে

অন্তর্গত এই সমস্ত পদার্থ সিদ্ধ হয়, সেই সমস্ত পদার্থ ব্যতীত সেই অর্থ অর্থাৎ সেই পূর্ব্বার্থ সম্ভব হয় না।

টিপ্পনী—এই সূত্রের দ্বারা তৃতীয় "অধিকরণসিদ্ধান্তে"র লক্ষণ কথিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার স্বরূপ ব্যাখ্যায় মতভেদ আছে। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র সূত্রোক্ত "যদ্" শব্দের দ্বারা সাধ্য এবং হেতু পদার্থকে গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "যস্যার্থস্য সাধ্যস্য বা হেতোর্ব্বা সিদ্ধাবিতি বিষয়সপ্তমী, ন তু নিমিত্তসপ্তমী।" পরে অধিকরণসিদ্ধান্তের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে পদার্থটি সিদ্ধ হইলে তাহার অনুষঙ্গী পদার্থগুলি তাহার অন্তর্গতরূপেই সিদ্ধ হয়, সাক্ষাৎ অধিক্রিয়মাণ সেই পদার্থ তাহার অনুষঙ্গী সেই সমস্ত পদার্থের অধিকরণ বা আশ্রয় ; কারণ, তাহাকে আশ্রয় করিয়া সেই সমস্ত পদার্থ সিদ্ধ হয়, সেই আশ্রয়ভূত পদার্থ পক্ষ বা সাধ্যই হউক, অথবা হেতুই হউক, সেইরূপে অধিকরণসিদ্ধান্ত হয়। বাচস্পতি মিশ্র পরে সাধ্যরূপ 'অধিকরণসিদ্ধান্তে'র উদাহরণ বলিয়াছেন যে, সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন দ্ব্যণুকাদি কার্য্যে চেতনকর্তৃকত্বরূপ সাধ্য সিদ্ধ হইলে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট চেতনকর্তৃত্বই সিদ্ধ হয়। কারণ, সেই কর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট না হইলে তিনি দ্ব্যণুকাদির কর্ত্তা হইতে পারেন না। সুতরাং সেই চেতন কর্ত্তার সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি উক্ত সাধ্যসিদ্ধির অন্তর্গত হওয়ায় উহা ঐ সাধ্যের অনুষঙ্গী পদার্থ। সুতরাং সেই অনুষঙ্গী পদার্থের সহিতই সেই সাধ্য সিদ্ধ হওয়ায় তদ্রূপে উহা অধিকরণসিদ্ধান্ত।

ভাষ্যকার ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন,—**"যথেন্দ্রিয়ব্যতিরিক্তো জ্ঞাতা"** ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে, জীবাত্মা ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন, ইহা অনুমানপ্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিতে মহর্ষি তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভের সূত্র বলিয়াছেন,—**"দর্শন-স্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণাৎ।"** অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা একই পদার্থের প্রত্যক্ষ হইলে পরে যে আমি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা এই পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, সেই আমি ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা ইহাকে প্রত্যক্ষ করিতেছি, এইরূপে সেই একই জ্ঞাতার যে প্রতিসন্ধান জন্মে, তদ্দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, সেই জ্ঞাতা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন। কারণ, চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয় ভিন্ন পদার্থ বলিয়া তাহার উক্তরূপ প্রতিসন্ধান হইতে পারে না। সুতরাং উক্তরূপে একার্থের প্রতিসন্ধানরূপ যে হেতু, তাহা সিদ্ধ হইলে উহা ইন্দ্রিয়নানাত্ব প্রভৃতি আনুষঙ্গিক পদার্থের সহিতই সিদ্ধ হইবে। কারণ, জীবদেহে একটিমাত্র

ইন্দ্রিয় থাকিলে এবং তাহার বিষয়নিয়ম না থাকিলে উক্তরূপ প্রতিসন্ধান সম্ভব হয় না। বাচস্পতি মিশ্র এইভাবে ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণে ইন্দ্রিয়নানাত্বাদি সহিত উক্ত প্রতিসন্ধানরূপ হেতুকেই অধিকরণসিদ্ধান্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভাষ্যকার হেতুরূপ অধিকরণসিদ্ধান্তেরই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু বার্ত্তিককার উদ্দোতকর ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"বাক্যার্থসিদ্ধৌ তদনুষঙ্গী যোঽর্থঃ সোঽধিকরণসিদ্ধান্ত ইতি, তস্যোদাহরণং ভাষ্যে" ইত্যাদি। ইহার দ্বারা বুঝা যায় উদ্দ্যোতকর ভাষ্যকারের মতেও পূর্ব্বোক্ত স্থলে ইন্দ্রিয়নানাত্ব প্রভৃতি আনুষঙ্গিক পদার্থকেই অধিকরণসিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজও বলিয়াছেন,—"অনুমেয়স্য সিদ্ধ্যর্থো যোঽনুষঙ্গেণ সিধ্যতি। স স্যাদাধারসিদ্ধান্তো জগৎকর্ত্তা যথেশ্বরঃ॥" বৃত্তিকার বিশ্বনাথও জগৎকর্ত্তার সর্ব্বজ্ঞত্বকে অধিকরণসিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। কারণ, জগৎকর্ত্তার সর্ব্বজ্ঞত্ব ব্যতীত সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন দ্ব্যণুকাদির সকর্তৃকত্ব সিদ্ধ হয় না। যে পদার্থ ব্যতীত যাহা সিদ্ধ হয় না, সেই পদার্থই তাহার সিদ্ধিতে "অনুষঙ্গী" পদার্থ। অবশ্য ভাষ্যকারের মতেও উক্তরূপ অনুষঙ্গী পদার্থও সেখানে সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হইবে। কিন্তু উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি সেই অনুষঙ্গী পদার্থকেই 'অধিকরণসিদ্ধান্ত' বলিয়াছেন।

মহানৈয়ায়িক উদায়নাচার্য্য "আত্মতত্ত্ববিবেক"গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"**সোঽয়মধিকরণসিদ্ধান্তন্যায়েন স্থূলত্বসিদ্ধৌ ক্ষণভঙ্গভঙ্গঃ।**" তাৎপর্য্য এই যে, বৌদ্ধসম্প্রদায় সৎ-পদার্থের ক্ষণভঙ্গবাদী। অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতে সমস্তই ক্ষণমাত্রস্থায়ী, ক্ষণকালমাত্র পরেই পূর্ব্বক্ষণোৎপন্ন সৎ পদার্থের অত্যন্ত বিনাশ হয়। উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে দৃশ্যমান ঘটাদি দ্রব্যে যে স্থূলত্বের প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহা হইতে পারে না। কারণ, সেই দ্রব্যে চক্ষুঃ-সংযোগের পরে তাহাতে স্থূলত্বের প্রত্যক্ষকাল পর্য্যন্ত তাহা স্থায়ী না হইলে সেই প্রত্যক্ষ অসম্ভব। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা ঐ সমস্ত দ্রব্যে স্থূলত্বসিদ্ধি হওয়ায় তাহার অনুষঙ্গী "ক্ষণভঙ্গভঙ্গও" অর্থাৎ স্থায়িত্ব "অধিকরণসিদ্ধান্ত"রূপে সিদ্ধ হয়। কারণ, তাহার 'ক্ষণভঙ্গভঙ্গ' ব্যতীত তাহাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা স্থূলত্বসিদ্ধি হয় না। উদয়নাচার্য্যের উক্ত কথানুসারে বুঝা যায় যে, তাঁহার মতে তুল্য যুক্তিতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা বস্তুসিদ্ধি স্থলেও 'অধিকরণ-সিদ্ধান্ত' হয়। উদ্দ্যোতকর কিন্তু বলিয়াছেন,—"বাক্যার্থসিদ্ধৌ"। বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "এবং হেতুরীদৃশঃ পক্ষশ্চ বাক্যার্থঃ।" কিন্তু নব্য

নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি "আত্মতত্ত্ববিবেকে"র টীকায় উক্ত স্থলে উদ্দ্যোতকরের উক্ত বার্ত্তিকসন্দর্ভের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"যেন কেনাপি প্রমাণেন বাক্যার্থসিদ্ধৌ জায়মানায়াং যোঽন্যার্থঃ সিধ্যতি, স তথেত্যর্থঃ।" বাচস্পতি মিশ্র উদ্দ্যোতকরোক্ত বাক্যার্থ যাহা বলিয়াছেন, তাহা উপলক্ষণ, ইহাও শিরোমণি বলিয়াছেন। ফলকথা, যে পদার্থের সিদ্ধি ব্যতীত যাহা কোন প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হয় না, সেই পদার্থই প্রকৃত সিদ্ধিতে আনুষঙ্গিকরূপে অধিকরণসিদ্ধান্ত, ইহাই উদয়নাচার্য্যের উক্ত কথানুসারে রঘুনাথ শিরোমণি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও তাঁহার উক্তরূপ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য সূত্রোক্ত "যদ্" শব্দের দ্বারা উক্তরূপ অনুষঙ্গী পদার্থই মহর্ষির বুদ্ধিস্থ হইলে তাঁহার উক্তরূপ তাৎপর্য্য সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"**তেঽর্থা যদধিষ্ঠানাঃ সোঽধিকরণসিদ্ধান্তঃ।**" সুতরাং ভাষ্যকারের মতেও যে, তাঁহার উদাহৃত স্থলে ইন্দ্রিয়নানাত্ব প্রভৃতি অনুষঙ্গী পদার্থই অধিকরণসিদ্ধান্ত, ইহা অনেকে বলিলেও আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন, "**পূর্ব্বার্থসিদ্ধাবেতেঽর্থাঃ সিধ্যন্তি, ন তৈর্ব্বিনা সোঽর্থঃ সম্ভবতি।**" বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"পূর্ব্বোঽর্থো যঃ সাক্ষাদধিকৃতস্তস্য সিদ্ধাবন্তর্গতা ইতি ভাষ্যার্থঃ।" বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যানুসারেই পূর্ব্বে ভাষ্যার্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

সূত্র। অপরীক্ষিতাভ্যুপগমাৎ তদ্বিশেষপরীক্ষণমভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—(যে স্থলে) অপরীক্ষিত পদার্থের স্বীকারপ্রযুক্ত অর্থাৎ প্রমাণাদির দ্বারা বিচারপূর্ব্বক অনির্ণীত কোন পরসিদ্ধান্তের স্বীকার করিয়া, সেই ধর্ম্মীর বিশেষধর্ম্মের পরীক্ষা অর্থাৎ বিচার করা হয়, (সেই স্থলে সেই স্বীকৃত পরসিদ্ধান্ত) অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত।

ভাষ্য। যত্র কিঞ্চিদর্থজাতমপরীক্ষিতমভ্যুপগম্যতে—অস্তু দ্রব্যং শব্দঃ, স তু নিত্যোঽথানিত্য ইতি দ্রব্যস্য সতো নিত্যতাঽনিত্যতা বা তদ্বিশেষঃ পরীক্ষ্যতে, সোঽভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ স্ববুদ্ধ্যতিশয়চিখ্যাপয়িষয়া পরবুদ্ধ্যবজ্ঞানায় চ প্রবর্ত্তত ইতি।

অনুবাদ—যে স্থলে অপরীক্ষিত কোন পদার্থ সামান্য অর্থাৎ কোন ধর্ম্মীতে বিচার দ্বারা অনির্ণীত কোন সামান্য ধর্ম্ম স্বীকৃত হয়, (যথা) শব্দ দ্রব্যপদার্থ হউক, কিন্তু তাহা নিত্য অথবা অনিত্য, ইহা বলিয়া দ্রব্যরূপে সৎ অর্থাৎ পরমতে দ্রব্যপদার্থরূপে স্বীকৃত শব্দের নিত্যত্ব অথবা অনিত্যত্বরূপ "তদ্বিশেষ" অর্থাৎ সেই শব্দের বিশেষ ধর্ম্ম (প্রতিবাদিকর্ত্তৃক) পরীক্ষিত হয়, সেই স্থলে সেই অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত অর্থাৎ উক্ত স্থলে শব্দে দ্রব্যত্বের স্বীকার নিজবুদ্ধির উৎকর্ষ খ্যাপনের ইচ্ছাপ্রযুক্ত এবং পরবুদ্ধির (বাদীর বুদ্ধির) অবজ্ঞার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হয়। অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্তরূপ উদ্দেশ্যে প্রথমে বিনা বিচারে নিজের অসম্মত পরমতও স্বীকার করেন।

টিপ্পনী—চতুর্থ সিদ্ধান্তের নাম "অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত"। ইহার ব্যাখ্যাতেও মতভেদ আছে। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে যে স্থলে প্রতিবাদী নিজের অসম্মত কোন সিদ্ধান্তকে মানিয়া লইয়াই কোন পদার্থের বিশেষ ধর্ম্মের পরীক্ষা বা বিচার করেন, সেই স্থলে তাঁহার স্বীকৃত সেই পরসিদ্ধান্তই তাঁহার পক্ষে "**অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত**"। ভাষ্যকার সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতেই ইহার একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কোন বাদী শব্দকে নিত্য ও দ্রব্যপদার্থ বলিলে, তখন প্রতিবাদী নৈয়ায়িক যদি বলেন যে, আচ্ছা, শব্দ দ্রব্যপদার্থই হউক, কিন্তু উহা নিত্য অথবা অনিত্য, ইহা পরীক্ষণীয়। উক্তরূপে নৈয়ায়িক শব্দের দ্রব্যত্ব মানিয়া লইয়াই তাহার বিশেষ ধর্ম্ম নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিষয়ে বিচার করিলে সেই স্থলে তাঁহার স্বীকৃত ঐ পরসিদ্ধান্ত তাঁহার পক্ষে "অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত।" ভাষ্যকারের এই উদাহরণের দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহার সময়েও কোন মীমাংসকসম্প্রদায় শব্দকে দ্রব্যপদার্থই বলিতেন। পরে কুমারিল ভট্ট উক্ত মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী চতুর নৈয়ায়িকের অভিসন্ধি এই যে, শব্দের দ্রব্যত্বসিদ্ধান্ত খণ্ডনের জন্য বিচার করা অনাবশ্যক। কারণ, উহা স্বীকার করিয়াও শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিলে বাদী মীমাংসক পরে আর শব্দের দ্রব্যত্বসিদ্ধান্তের স্থাপন করিবেন না। কারণ, তখন তাহা করা তাঁহার পক্ষে নিষ্ফল। উক্তরূপ গূঢ় উদ্দেশ্যে তৎকালে প্রতিবাদী নৈয়ায়িক বিনা বিচারে নিজের অসম্মত শব্দের দ্রব্যত্বসিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াও শব্দের নিত্যত্বসিদ্ধান্তের খণ্ডন করায় তাঁহার নিজ বুদ্ধির উৎকর্ষ খ্যাপন হয় এবং বাদীর বুদ্ধির অবজ্ঞা অর্থাৎ অপকর্ষ প্রকাশ হয়। সুতরাং নিজ বুদ্ধির উৎকর্ষ খ্যাপনের ইচ্ছাবশতঃ এবং বাদিবুদ্ধির অবজ্ঞার নিমিত্তও

উক্তরূপ অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত প্রবৃত্ত বা প্রকটিত হয়। ভাষ্যশেষে "পরবুদ্ধ্যবজ্ঞানায় চ" এইরূপ পাঠই কোন প্রাচীন পুস্তকে পাওয়া যায়। উহাই প্রকৃত পাঠ বুঝিয়া গৃহীত হইয়াছে।

কিন্তু 'বার্ত্তিক'কার উদ্দ্যোতকর ভাষ্যকারের উক্তরূপ ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছেন যে, বিচার স্থলে অজ্ঞ এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি বাদীকেও উক্তরূপে অবজ্ঞা করা যায় না, ঐরূপ পরাবজ্ঞা অযুক্ত। "তস্মান্নায়ং সূত্রার্থোঽশাস্ত্রিতাভ্যুপগমঃ সিদ্ধান্ত ইতি।" অর্থাৎ এখানে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাত উক্তরূপ অর্থ সূত্রার্থ নহে, কিন্তু এই সূত্রে **"অপরীক্ষিত"** শব্দের অর্থ অশাস্ত্রিত বা অসূত্রিত। অর্থাৎ যাহা সূত্রে সাক্ষাৎ কথিত হয় নাই, তাহার "অভ্যুপগম" বা স্বীকারই **"অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত"**—ইহাই সূত্রার্থ। যেমন মহর্ষি গোতমের কোন সূত্রে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব কথিত না হইলেও মহর্ষি মনের যে বিশেষ ধর্ম্মপরীক্ষা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, মনের ইন্দ্রিয়ত্ব তাঁহার স্বীকৃত সিদ্ধান্ত। উক্তরূপ সিদ্ধান্তকে বলে—'অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত'। বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্য প্রভৃতিও উদ্দ্যোতকরের উক্তরূপ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়া, মনের ইন্দ্রিয়ত্বকে 'অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত'ই বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের মতে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সর্ব্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ বলিয়া, উহা সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তের লক্ষণাক্রান্তই হয়। **"তর্কভাষা"** গ্রন্থে কেশব মিশ্র বলিয়াছেন যে, সমানতন্ত্র বৈশেষিক শাস্ত্রে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব কথিত হওয়ায় উহা নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের **'প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত'**। কিন্তু ইহা অভিনব ব্যাখ্যা। পরন্তু বৈশেষিক সূত্রেও মনের ইন্দ্রিয়ত্বের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। কেশব মিশ্রও তাহা প্রদর্শন করেন নাই।

বস্তুতঃ এই সূত্রে **"অপরীক্ষিত"** শব্দের দ্বারা যাহা বিচারপূর্ব্বক নির্ণীত নহে, এই অর্থই সরলভাবে বুঝা যায়। পরন্তু অশাস্ত্রিত বা অসূত্রিত, এই অর্থই মহর্ষির বিবক্ষিত হইলে তিনি স্বল্পাক্ষর "অসূত্রিত" শব্দেরই প্রয়োগ করিতেন। সুতরাং ভাষ্যকার "যত্র" এই পদের অধ্যাহার করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—**"যত্র কিঞ্চিদর্থজাতমপরীক্ষিতমভ্যুপগম্যতে"**। অর্থাৎ যে স্থলে প্রতিবাদী কোন পদার্থে 'অপরীক্ষিত' অর্থাৎ নিজের অসম্মত কোন ধর্ম্মের 'অভ্যুপগম' বা স্বীকার করায় সেই পদার্থে তাহার নিজসম্মত কোন বিশেষ ধর্ম্মের পরীক্ষা অর্থাৎ বিচার দ্বারা নির্ণয় করেন, সেই স্থলে পূর্ব্বে বিনাবিচারে স্বীকৃত সেই পরসিদ্ধান্তই তখন সেই প্রতিবাদীর পক্ষে **"অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত"**। উক্তরূপ স্থলে ঐরূপ প্রতিবাদীকে **"প্রৌঢ়িবাদী"**

বলে। পূর্ব্বে তাঁহার সেই পরমতের স্বীকার তখন তাঁহার সেই বিশেষ ধর্ম্মপরীক্ষার প্রযোজক হয়, ইহা ব্যক্ত করিতেই মহর্ষি প্রথমোক্ত পদে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টও ইহা সমর্থন করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন,—"তস্মাদ্বিশেষপরীক্ষার্থোঽপরীক্ষিতাভ্যুপগমঃ প্রৌঢ়িবাদিনা ক্রিয়মাণোঽভ্যুপগমসিদ্ধান্ত ইতি সূত্রার্থঃ। ইত্থমেব চ তত্র প্রাবাদুকানাং ব্যবহারঃ।" অনেক স্থলে প্রতিবাদী প্রৌঢ়িবাদী হইয়া বিনাবিচারে নিজের অসম্মত বাদীর মতবিশেষ মানিয়া লইয়াই তাহার মুখ্য মত খণ্ডন করেন, এইরূপ ব্যবহার চিরপ্রসিদ্ধ আছে। জয়ন্ত ভট্ট প্রথমে ব্যাখ্যান্তর খণ্ডন করিয়া ভাষ্যকারের মতেই এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—"তস্মাদেবং ব্যাখ্যায়তে, অপরীক্ষিতাভ্যুপগম এব স্বমতিকৌশলেন ক্রিয়মাণোঽভ্যুপগমসিদ্ধান্তো-ঽস্তু দ্রব্যং শব্দ ইতি।" পরে কেশব মিশ্রও ভাষ্যকারের ভাবেই ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন। "চরকসংহিতা"তেও চতুর্থ "অভ্যুপগমসিদ্ধান্তে"র উক্তরূপ ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়।* সুতরাং উহাই যে প্রাচীন ব্যাখ্যা, ইহা বুঝিতে পারা যায় ॥ ৩১ ॥

ন্যায়াশ্রয়সিদ্ধান্তলক্ষণপ্রকরণ ॥ ৫ ॥

ভাষ্য। অথাবয়বাঃ।

অনুবাদ—অনন্তর অর্থাৎ সিদ্ধান্তনিরূপণের পরে (ক্রমপ্রাপ্ত) অবয়বসমূহ (নিরূপিত হইয়াছে)।

সূত্র। প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনান্যবয়বাঃ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—(১) প্রতিজ্ঞা, (২) হেতু, (৩) উদাহরণ, (৪) উপনয় ও (৫) নিগমন, অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদিনামক পঞ্চবাক্য অবয়ব।

টিপ্পনী—মহর্ষি "সিদ্ধান্ত" পদার্থ নিরূপণের পরে পৃথক প্রকরণের দ্বারা ক্রমপ্রাপ্ত "অবয়ব"পদার্থ নিরূপণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার ইহাই ব্যক্ত করিতে প্রথমে বলিয়াছেন, "অথাবয়বাঃ।" এই প্রকারণের নাম **"ন্যায়প্রকরণ।"** কারণ, যথাক্রমে উচ্চারিত প্রতিজ্ঞাদিনামক পঞ্চাবয়বরূপ

* "অভ্যুপগমসিদ্ধান্তো নাম যমর্থমসিদ্ধমপরীক্ষিতমনুপদিষ্টমহেতুকং বাদকালেঽভ্যুপগচ্ছন্তি ভিষজঃ।" —'বিমানস্থান', অষ্টম অঃ।

বাক্যসমষ্টিও "ন্যায়" নামে কথিত হইয়াছে। তাই ভাষ্যকারও পূর্ব্বে (৪১শ পৃঃ) বলিয়াছেন, "সোহয়ং পরমো ন্যায়ঃ"। উক্তরূপে যথাক্রমে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চবাক্য-প্রয়োগকেই "ন্যায়প্রয়োগ" বলে। তাই 'ন্যায়বিদ্যা'র প্রকাশক মহর্ষি গোতম এই প্রকরণের দ্বারা সেই 'ন্যায়'নামক মহাবাক্যের 'প্রতিজ্ঞাদি' নামক পঞ্চাবয়ব নিরূপণ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অনুমানপ্রমাণ যে 'স্বার্থ' ও 'পরার্থ' নামে দ্বিবিধ, ইহাও সূচিত হইয়াছে। কারণ, নিজের তত্ত্বনিশ্চয়ার্থ যে অনুমানপ্রমাণ, তাহাকে বলে 'স্বার্থানুমান'। তাহাতে অপরের তত্ত্বনিশ্চয় অনাবশ্যক। সুতরাং তাহাতে অপরকে নিজমত বুঝাইবার জন্য কোন বাক্যপ্রয়োগ হয় না। কিন্তু যে স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তিবশতঃ মধ্যস্থগণের সেই বিবাদবিষয় পদার্থে সংশয় জন্মে, সেই স্থলে সেই বাদী ও প্রতিবাদী সেই মধ্যস্থগণের একতর পক্ষনিশ্চয়োদ্দেশ্যে তাঁহাদিগের নিকটে ন্যায় প্রয়োগ করিয়া নিজ মতের সাধক অনুমানপ্রমাণ প্রদর্শন করেন। সেই অনুমানপ্রমাণ পরার্থ। ন্যায় প্রয়োগ ব্যতীত তাহা সম্ভব হয় না। সুতরাং সেই ন্যায়ের নিরূপণ অবশ্য কর্ত্তব্য। তাই "তত্ত্বচিন্তামণি"কার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও অবয়ব গ্রন্থের প্রারম্ভে বলিয়াছেন,—"তচ্চানুমানং পরার্থং ন্যায়সাধ্যমিতি ন্যায়স্তদবয়বাশ্চ প্রতিজ্ঞা-হেতূদাহরণোপনয়-নিগমনানি নিরূপ্যন্তে।" মূল কথা, মহর্ষি এই প্রকরণের দ্বারা প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব নিরূপণ করায় পূর্ব্বোক্ত অনুমানপ্রমাণ যে, স্বার্থ ও পরার্থভেদে দ্বিবিধ, ইহাও সূচিত হইয়াছে। তাই ভাসর্ব্বজ্ঞও "ন্যায়সারে" ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—"তৎ পুনর্দ্বিবিধং, স্বার্থং পরার্থঞ্চেতি। পরোপদেশানপেক্ষং স্বার্থং, পরোপদেশাপেক্ষং পরার্থমিতি। পরপোদেশস্তু পঞ্চাবয়ববাক্যম্।"

প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও বলিয়াছেন,—পঞ্চাবয়বেন বাক্যেন স্বনিশ্চিতার্থপ্রতিপাদনং পরার্থানুমানং।"—(২৩১ পৃঃ)। কিন্তু "ন্যায়কন্দলী"কার শ্রীধর ভট্ট নিজ মতানুসারে উক্ত সন্দর্ভের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"... পঞ্চাবয়বেন বাক্যেন প্রতিপাদনং তৎপ্রতিপত্তিজননসমর্থপঞ্চাবয়ববাক্যপ্রয়োগঃ পরার্থানুমানং।" কোন সম্প্রদায় বলিতেন যে, 'পরার্থানুমান' বলাই যায় না। কারণ, অনুমিতির হেতু বা তজ্জনিত জ্ঞানবিশেষকে অনুমান বলা হইয়াছে কিন্তু "তয়োশ্চ ন পরার্থত্বং প্রসিদ্ধং লোকবেদয়োঃ।" অর্থাৎ সেই হেতু এবং জ্ঞানের পরার্থত্ব লোকসিদ্ধও নহে, শাস্ত্রসিদ্ধও নহে অর্থাৎ উক্ত উভয়কে পরার্থ বলাই যায় না। যদি বল, "বচনস্তু পরার্থত্বাদনুমানপরার্থতা", অর্থ সেই

অনুমানের বোধক বাক্যের পরার্থত্ববশতঃই অনুমানকে পরার্থ বলা হয়, তাহা হইলে "প্রত্যক্ষস্যাপি পারার্থ্যং তদ্দ্বারং কিং ন কল্প্যতে।" অর্থাৎ কেহ অপরের নিকটে নিজের প্রত্যক্ষবোধক বাক্য প্রয়োগ করিলে, সেই বাক্যের পরার্থত্ববশতঃ সেই প্রত্যক্ষকেও কেন পরার্থ বলা হয় না? এতদুত্তরে শ্রীধর ভট্ট বলিয়াছেন যে, আমরা প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের পরার্থত্ববশতঃ সেই অনুমান-প্রমাণকে পরার্থ অনুমান বলি না। কিন্তু সেই পরার্থ বাক্যসমূহ সেই স্থলে পরম্পরায় মধ্যস্থগণের অনুমিতির হেতু হওয়ায় ঐ অর্থে সেই বাক্যসমূহকেই পরার্থ অনুমান বলি।

বস্তুতঃ "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্টও বলিয়াছেন,—"তমেব পরার্থানুমানমাচক্ষতে নীতিবিদঃ।"—(৫৬৮ পৃঃ)। উক্ত মতানুসারে পরে নব্য নৈয়ায়িক অন্নং ভট্টও **"তর্কসংগ্রহে"** পঞ্চাবয়বরূপ বাক্যকেই পরার্থানুমান বলিয়াছেন। কিন্তু নব্য ন্যায়ের প্রবর্ত্তক গঙ্গেশ উপাধ্যায় বলিয়াছেন,—"তচ্চানুমানং পরার্থং ন্যায়সাধ্যং।" তদনুসারে "তর্কসংগ্রহদীপিকা"র টীকায় নীলকণ্ঠ ভট্ট অনুমান-প্রমাণের পরার্থত্ব সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন,—"তথাপি পরার্থানুমানপ্রয়োজকে পঞ্চাবয়ববাক্যে 'পরার্থানুমান'শব্দস্যৌপচারিকঃ প্রয়োগ ইতি মনসি কৃত্য মূলমবতারয়তি।" তাৎপর্য্য এই যে, বাদী বা প্রতিবাদীর প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব বাক্য-শ্রবণাদির পরে মধ্যস্থগণের যে **"লিঙ্গপরামর্শ"** জন্মে, তাহাই অন্নং ভট্টের মতেও বস্তুতঃ পরার্থানুমান। কিন্তু সেই পঞ্চাবয়ব বাক্য সেই পরার্থানুমানের প্রযোজক হওয়ায় তাহাতে "পরার্থানুমান" শব্দের ঔপচারিক প্রয়োগ হয়, এই অভিপ্রায়েই অন্নং ভট্ট পঞ্চাবয়ব বাক্যকে পরার্থানুমান বলিয়াছেন। অন্নং ভট্টের অভিপ্রায় যাহাই হউক, "ন্যায়বিন্দু" গ্রন্থে বৌদ্ধাচার্য্য **ধর্ম্মকীর্ত্তি** কিন্তু নিজ মতানুসারে স্পষ্ট বলিয়াছেন,—ত্রিরূপলিঙ্গাখ্যানং পরার্থানুমানং, কারণে কার্য্যোপচারাৎ।"* অর্থাৎ পক্ষ সত্ত্বাদি ধর্ম্মত্রয়বিশিষ্ট হেতুর যে বচন, তাহা পরম্পরায় অনুমানপ্রমাণের কারণ হওয়ায় তাহাতে "অনুমান" শব্দের ঔপচারিক প্রয়োগ হয়। কিন্তু সেই বচনই মুখ্য অনুমান

---

* "কারণে কার্য্যোপচারা"দিতি। ত্রিরূপলিঙ্গাভিধানাৎ ত্রিরূপলিঙ্গ-স্মৃতিরুৎপদ্যতে, স্মৃতেশ্চানুমানং। তস্যানুমানস্য পরম্পরয়া ত্রিরূপলিঙ্গাভিধানং কারণং। তস্মিন্ কারণে বচনে কার্য্যস্যানুমানস্যোপচারঃ সমারোপঃ ক্রিয়তে। ততঃ সমারোপাৎ কারণং বচনমনুমান-শব্দেনোচ্যতে। ঔপচারিকং বচনমনুমানং ন মুখ্যমিত্যর্থঃ।—ধর্ম্মোত্তরকৃত 'ন্যায়বিন্দু' টীকা, ৩য় পঃ।

নহে। বস্তুতঃ ন্যায়প্রয়োগ স্থলে মধ্যস্থগণের **"লিঙ্গপরামর্শ"** রূপ অনুমান-প্রমাণকেও **পরার্থ** বলা যায়। উক্ত "পরার্থ" শব্দের অনেক প্রকার ব্যাখ্যা হইয়াছে। নীলকণ্ঠ ভট্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"পরস্য মধ্যস্থস্য অর্থঃ প্রয়োজনং সাধ্যানুমিতিরূপং যস্মাদিতি ব্যুৎপত্ত্যা পরসমবেতানুমিতি-করণলিঙ্গ-পরামর্শোঽর্থঃ।"

এখন বুঝা আবশ্যক যে, এই সূত্রের দ্বারা **অবয়ব** পদার্থের বিভাগ হইলেও ইহার দ্বারা অবয়বসমূহের সামান্য লক্ষণও সূচিত হইয়াছে। কারণ, সামান্য লক্ষণ ব্যতীত বিশেষ লক্ষণ বুঝা যায় না। প্রথম সূত্রভাষ্যে (৪৯-৫০শ পৃঃ) ভাষ্যকারের অবয়বপদার্থ ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায়, ন্যায়বাক্যের অন্তর্গত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বাক্যের অন্যতমত্বই অবয়বপদার্থের সামান্য লক্ষণ। "দীধিতি" টীকায় রঘুনাথ শিরোমণিও প্রথমে বলিয়াছেন,—"অবয়বত্বন্তু ন্যায়ান্তর্গতত্বে সতি প্রতিজ্ঞাদ্যন্যতমত্বং।"* বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এখানে বলিয়াছেন,—"অনেন বিভাগেন প্রতিজ্ঞাদ্যন্যতমত্বমবয়বত্বমিতি সামান্যলক্ষণং সূচিতং।" পরে বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বই কথিত হওয়ায় 'দশাবয়ববাদ' নিরস্ত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, কোন সম্প্রদায় দশাবয়ববাদী. কোন সম্প্রদায় অবয়বত্রয়বাদী। কিন্তু প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বাক্যই অবয়ব. অবয়বপদার্থ ইহার অধিকও নহে, ন্যূনও নহে, এইরূপ নিয়মার্থই মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা অবয়বপদার্থের উক্তরূপ বিভাগ করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার ঐরূপ কথা বলেন নাই। তিনি কেবল 'দশাবয়ববাদে'র উল্লেখপূর্ব্বক তাহার ব্যাখ্যা করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। অতঃপর তাহাই বুঝিতে হইবে।

ভাষ্য। দশাবয়বানেকে নৈয়ায়িকা বাক্যে সঞ্চক্ষতে।

---

* প্রাচীন মতে যথাক্রমে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চবাক্য মিলিত হইয়া একবাক্যতাবশতঃ একটি বিশিষ্টার্থের বোধক হয়। উক্ত মতানুসারেই গঙ্গেশ উপাধ্যায় 'অবয়ব' গ্রন্থে 'ন্যায়' ও 'অবয়বে'র লক্ষণ বলিয়াছেন। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা উক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া ন্যায় ও অবয়বের অন্যরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন। তিনি প্রথমে ন্যায়ের লক্ষণ বলিয়াছেন,—"উচিতানুপূর্ব্বকপ্রতিজ্ঞাদিপঞ্চক-সমুদায়ত্বং ন্যায়ত্বং'। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বাক্যের অন্তর্গত ক্রমিক বর্ণসমূহের যথাযথ আনুপূর্ব্বী ক্রমে উচ্চারিত সেই পঞ্চবাক্যসমষ্টিই ন্যায়। এ বিষয়ে অতি সূক্ষ্ম বিচার বুঝিতে হইলে রঘুনাথের "দীধিতি" ও তাহার টীকা পড়া আবশ্যক।

জিজ্ঞাসা, সংশয়ঃ, শক্যপ্রাপ্তিঃ, প্রয়োজনং, সংশয়ব্যুদাস ইতি। তে কস্মান্নোচ্যন্ত ইতি।

তত্রাপ্রতীয়মানেঽর্থে প্রত্যয়ার্থস্য প্রবর্ত্তিকা জিজ্ঞাসা। অপ্রতীয়মানমর্থং কস্মাজ্জিজ্ঞাসতে? তং তত্ত্বতো জ্ঞাতং হাস্যামি বা উপাদাস্যে, উপেক্ষিষ্যে বেতি। তা এতা হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধয়স্তত্ত্বজ্ঞানস্যার্থস্তদর্থময়ং জিজ্ঞাসতে। সা খল্বিয়মসাধনমর্থস্যেতি। জিজ্ঞাসাধিষ্ঠানাং সংশয়শ্চ ব্যাহতধর্ম্মোপসংঘাতাৎ তত্ত্বজ্ঞানে প্রত্যাসন্নঃ। ব্যাহতয়োর্হি ধর্ম্ময়োরন্যতরৎ তত্ত্বং ভবিতুমর্হতীতি। স পৃথগুপদিষ্টোঽপ্যসাধনমর্থস্যেতি। প্রমাতুঃ প্রমাণানি প্রমেয়াধিগমার্থানি, সা শক্যপ্রাপ্তির্ন সাধকস্য বাক্যস্য ভাগেন যুজ্যতে প্রতিজ্ঞাদিবদিতি। প্রয়োজনং তত্ত্বাবধারণমর্থসাধকস্য বাক্যস্য ফলং নৈকদেশ ইতি। সংশয়ব্যুদাসঃ প্রতিপক্ষোপবর্ণনং, তৎপ্রতিষেধে তত্ত্বজ্ঞানাভ্যনুজ্ঞানার্থং ন ত্বয়ং সাধকবাক্যৈকদেশ ইতি। প্রকরণে তু জিজ্ঞাসাদয়ঃ সমর্থা অবধারণীয়ার্থোপকারাৎ। অর্থসাধকভাবাত্তু প্রতিজ্ঞাদয়ঃ সাধকবাক্যস্য ভাগা একদেশা অবয়বা ইতি।

অনুবাদ—অন্য নৈয়ায়িকসম্প্রদায় বাক্যে অর্থাৎ ন্যায়বাক্যে দশ অবয়ব বলেন। (১) জিজ্ঞাসা, (২) সংশয়, (৩) শক্যপ্রাপ্তি, (৪) প্রয়োজন ও (৫) সংশয়ব্যুদাস, অর্থাৎ তাঁহারা উক্ত জিজ্ঞাসা প্রভৃতি অতিরিক্ত পঞ্চাবয়বও স্বীকার করিয়া দশাবয়ববাদী। (প্রশ্ন) সেই সমস্ত কেন উক্ত হয় নাই? অর্থাৎ মহর্ষি গোতম উক্ত 'জিজ্ঞাসা' প্রভৃতি অবয়বও কেন বলেন নাই? (উত্তর) তন্মধ্যে অপ্রতীয়মান পদার্থে অর্থাৎ সামান্যতঃ জ্ঞায়মান, কিন্তু বিশেষ ধর্ম্মরূপে অজ্ঞায়মান পদার্থবিষয়ে "প্রত্যয়ার্থে"র অর্থাৎ সেই পদার্থের তত্ত্বাবধারণরূপ প্রত্যয় বা জ্ঞানের অর্থের (প্রয়োজনের) অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত হানাদি বুদ্ধিরূপ ফলের প্রবর্ত্তিকা (উৎপাদিকা) জিজ্ঞাসা। (প্রশ্নোত্তরমুখে উক্ত বাক্যের বিশদার্থ ব্যাখ্যা করিতেছেন।) অজ্ঞায়মান পদার্থকে কেন জিজ্ঞাসা করে? (উত্তর) যথার্থ রূপে জ্ঞাত সেই পদার্থকে ত্যাগ করিব অথবা গ্রহণ

করিব অথবা উপেক্ষা করিব। সেই এই হানবুদ্ধি, উপাদানবুদ্ধি ও উপেক্ষাবুদ্ধি, তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ কিনা প্রয়োজন, তন্নিমিত্ত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত হানাদিবুদ্ধিরূপ ফল লাভের জন্য এই জ্ঞাতা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু সেই জিজ্ঞাসা পদার্থের সাধন নহে অর্থাৎ উহা কোন পদার্থপ্রতিপাদক বাক্য নহে, সুতরাং উহা ন্যায়বাক্যের "অবয়ব" হইতে পারে না।

জিজ্ঞাসার অধিষ্ঠান অর্থাৎ কারণরূপ আশ্রয় সংশয় কিন্তু বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের 'উপসংঘাত'বশতঃ অর্থাৎ তাহার সহিত বিষয়-বিষয়িভাব সম্বন্ধবশতঃ তত্ত্বজ্ঞানে 'প্রত্যাসন্ন' অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী। যেহেতু বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একতর তত্ত্ব হইবার নিমিত্ত যোগ্য। সেই সংশয় (প্রথম সূত্রে) পৃথক্ উপদিষ্ট হইলেও অর্থের সাধন নহে অর্থাৎ কোন পদার্থপ্রতিপাদক বাক্য নহে। প্রমাণসমূহ প্রমাতার প্রমেয়বোধার্থ, সেই "শক্যপ্রাপ্তি" অর্থাৎ প্রমাণসমূহের প্রমেয়বোধ-জননে সামর্থ্য প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের ন্যায় সাধক বাক্যের অর্থাৎ 'ন্যায়'নামক মহাবাক্যের অংশের সহিত যুক্ত হয় না অর্থাৎ উহাও পরপ্রতিপাদক বাক্য নহে। আর তত্ত্বের অবধারণরূপ প্রয়োজন অর্থপ্রতিপাদক বাক্যের অর্থাৎ ন্যায়বাক্যের ফল, একদেশ অর্থাৎ অংশ নহে। অর্থাৎ উক্ত প্রয়োজনও পরপ্রতিপাদক বাক্য নহে।

"সংশয়ব্যুদাস" বলিতে 'প্রতিপক্ষোপবর্ণন' অর্থাৎ প্রতিপক্ষরূপ সাধ্য ধর্ম্মে হেতুর অভাবের বর্ণন। সেই 'প্রতিপক্ষোপবর্ণন', প্রতিষেধে অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপক্ষের খণ্ডনে তত্ত্বজ্ঞানের (প্রমাণের) অভ্যনুজ্ঞানার্থ, অর্থাৎ তত্ত্বসাধক প্রমাণের অনুগ্রহই উহার প্রয়োজন এবং সংশয়-নিরাসই উহার ফল। কিন্তু এই "সংশয়ব্যুদাস" (তর্ক) সাধক বাক্যের অর্থাৎ ন্যায়বাক্যের অংশ নহে। অর্থাৎ উহাও ন্যায়বাক্যের অবয়ব হইতে পারে না। কিন্তু প্রকরণে অর্থাৎ পক্ষ ও প্রতিপক্ষের সংস্থাপনে অবধারণীয় পদার্থের উপকারিত্বপ্রযুক্ত (পূর্ব্বোক্ত) "জিজ্ঞাসা" প্রভৃতি সমর্থ হয় অর্থাৎ ন্যায়ের দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয়ে ঐ সমস্ত আবশ্যক হয়। কিন্তু অর্থের সাধকত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ অর্থবিশেষের বোধক হওয়ায় প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি (পঞ্চবাক্য) সাধক বাক্যের অর্থাৎ তত্ত্বসাধক 'ন্যায়' নামক মহাবাক্যের ভাগ (অর্থাৎ) একদেশ অবয়ব।

টিপ্পনী—ভাষ্যকার কোন নৈয়ায়িক সম্প্রদায়কেই দশাবয়ববাদী বলিয়াছেন। তদনুসারে "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ বলিয়াছেন,—"কেচন **জরন্নৈয়ায়িকাস্তু** জিজ্ঞাসা-সংশয়-শক্যপ্রাপ্তি-প্রয়োজন-সংশয়ব্যুদাসৈঃ সহ

দশাবয়বা ইত্যাচক্ষতে।" কিন্তু দশাবয়ববাদী সেই বৃদ্ধ নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। 'সাংখ্যকারিকা'র নবপ্রকাশিত প্রাচীন ব্যাখ্যা **"যুক্তিদীপিকা"** পাঠে বুঝিতেছি যে, প্রাচীন কোন সাংখ্যসম্প্রদায় দশাবয়ববাদী ছিলেন।* কিন্তু তাঁহারাও কি নৈয়ায়িক? অবশ্য "ন্যায়তন্ত্রাণ্যনেকানি",—সাংখ্যশাস্ত্রও ন্যায়তন্ত্রের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। আর "অর্থশাস্ত্রে" কৌটিল্য সাংখ্যশাস্ত্রকেও 'আন্বীক্ষিকী' বিদ্যার মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। পরন্তু প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণও গোতমোক্ত ত্রিবিধ অনুমানকেই গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন,—"ত্রিবিধমনুমানমাখ্যাতং"। ব্যাখ্যাকারগণ সকলেই সাংখ্যমতেও উক্ত ত্রিবিধ অনুমানের ব্যাখ্যাদি করিয়াছেন। সুতরাং অনুমানের ব্যাখ্যাতা উক্ত দশাবয়ববাদী সাংখ্যসম্প্রদায়কেও নৈয়ায়িক বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা গৌতম মতাবলম্বী প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকসম্প্রদায় নহেন, ইহা ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—**"একে নৈয়ায়িকাঃ"** অর্থাৎ অন্য নৈয়ায়িকগণ দশাবয়ববাদী। উক্ত "এক" শব্দের অর্থ অন্য। ("একে মুখ্যান্যকেবলাঃ")। তাহা হইলে উক্ত সর্ব্বনাম "এক" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সাংখ্যসম্প্রদায়ও ভাষ্যকারের বিবক্ষিত হইতে পারেন।

কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, "যুক্তিদীপিকা"কার পূর্ব্বোক্ত সাংখ্যমতে জিজ্ঞাসাদির বোধক বাক্যবিশেষকেই ব্যাখ্যাঙ্গ অবয়ব বলিয়াছেন এবং বিচারপূর্ব্বক **'বীত'** হেতুকেই দশাবয়ব বলিয়াছেন। ("তস্মাৎ সূক্তং দশাবয়বো বীতঃ"—৫১ পৃঃ)। ভাষ্যকার কিন্তু দশাবয়ববাদের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, উক্ত জিজ্ঞাসা ও সংশয় প্রভৃতি বাক্য না হওয়ায় ন্যায়বাক্যের অবয়ব হইতে পারে না। কিন্তু উহা ন্যায়প্রবৃত্তির অঙ্গরূপে উপযোগী হয়। বস্তুতঃ ন্যায়প্রয়োগস্থলে প্রথমে উক্ত জিজ্ঞাসা প্রভৃতির বোধক বাক্য প্রয়োগ অনাবশ্যক। "যুক্তিদীপিকা"কারও পরে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন,—"কিঞ্চ নিয়মানভ্যুপগমাৎ। নহি বয়মেষামাবশ্যকমভিধানমাচক্ষ্মহে"। "যস্তু ন পর্য্যনুযুঙ্‌ক্তে, ন তং প্রত্যেতে বাচ্যাঃ" (৪৯-৫০ পৃঃ)। অর্থাৎ জিজ্ঞাসাদি বিষয়ে প্রশ্ন হইলেই সেই স্থলে তাহার বোধক বাক্য প্রয়োগ কর্ত্তব্য। কিন্তু

---

* ..."তদা অবয়ববিবাক্যং পরিকল্প্যতে। তস্য পুনরবয়বা জিজ্ঞাসা-সংশয়-প্রয়োজন-শক্যপ্রাপ্তি-সংশয়-ব্যুদাসলক্ষণাশ্চ ব্যাখ্যাঙ্গং। প্রতিজ্ঞা-হেতু-দৃষ্টান্তোপসংহার-নিগমনানি পরপ্রতিপাদনাঙ্গমিতি,"—ইত্যাদি "যুক্তিদীপিকা" (কলিকাতা সংস্কৃত সিরীজ), ৪৭-৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যিনি বাদীর জিজ্ঞাসাদি বিষয়ে প্রশ্ন করেন না, তাঁহার নিকটে উক্ত জিজ্ঞাসাদি বক্তব্য নহে। পরন্তু "যুক্তিদীপিকা"কারও উক্ত জিজ্ঞাসাদিকে পরপ্রতিপাদক অবয়ব বলেন নাই। স্থলবিশেষে ব্যাখ্যার অঙ্গরূপ অবয়ব বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার উক্ত মতের ঐরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই।

ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত **'জিজ্ঞাসা'**র প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—**"তত্রাপ্রতীয়মানেঽর্থে প্রত্যয়ার্থস্য প্রবর্ত্তিকা জিজ্ঞাসা"**। একেবারে অজ্ঞাত পদার্থে জিজ্ঞাসা হইতে পারে না। কিন্তু যাহা সামান্যতঃ জ্ঞায়মান, কিন্তু বিশেষ ধর্ম্মরূপে অজ্ঞায়মান, এমন পদার্থে সেই বিশেষধর্ম্ম বিষয়ে সংশয় জন্মিলে তজ্জন্য তদ্বিষয়ে যে জিজ্ঞাসা জন্মে, সেই তত্ত্বজিজ্ঞাসাই এখানে "জিজ্ঞাসা" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে। কারণ, সেই তত্ত্বজিজ্ঞাসার ফলে প্রমাণাদির দ্বারা তত্ত্বনিশ্চয় জন্মিলে সেই নিশ্চিত পদার্থ বিষয়ে **"হানবুদ্ধি"** অথবা **"উপাদানবুদ্ধি"** অথবা **"উপেক্ষাবুদ্ধি"** জন্মে, তজ্জন্য সেই নিশ্চিত পদার্থের ত্যাগ অথবা গ্রহণ অথবা উপেক্ষা হয়। সুতরাং উক্ত হানাদি বুদ্ধিই সেই জিজ্ঞাসার চরম ফল, তজ্জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "প্রত্যয়ার্থস্য প্রবর্ত্তিকা জিজ্ঞাসা"। এখানে জ্ঞানার্থক "প্রত্যয়" শব্দের দ্বারা তত্ত্বনিশ্চয়রূপ তত্ত্বজ্ঞান এবং প্রয়োজনার্থ "অর্থ" শব্দের দ্বারা **'হানাদিবুদ্ধি'**রূপ প্রয়োজনই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত। ভাষ্যকার পরে নিজেই ব্যাখ্যার দ্বারা ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। **"হানাদিবুদ্ধি"**র ব্যাখ্যা পূর্ব্বে তৃতীয়সূত্র-ভাষ্যব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। মূল কথা, পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসা পরম্পরায় প্রমাণের চরম ফল 'হানাদিবুদ্ধি'র কারণ হওয়ায় ভাষ্যকার উহাকে "প্রত্যয়ার্থে"র (হানাদিবুদ্ধির) 'প্রবর্ত্তিকা' বলিয়া উহার প্রয়োজন ব্যক্ত করিয়াছেন। ভাষ্যকার পরে উক্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসার কারণ "সংশয়"কে তত্ত্বজ্ঞানে প্রত্যাসন্ন বলিয়া উহারও প্রয়োজন ব্যক্ত করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, পরস্পর বিরুদ্ধ যে ধর্ম্মদ্বয় বিষয়ে প্রথমে সংশয় জন্মে, তন্মধ্যে একতর ধর্ম্ম প্রকৃত তত্ত্ব হয়। সুতরাং সেই ধর্ম্মদ্বয়বিষয়ক যে সংশয়, তাহা তত্ত্ববিষয়কও হওয়ায় সেই সংশয় তত্ত্বজ্ঞানে প্রত্যাসন্ন বা নিকটবর্ত্তী অর্থাৎ উহা নিশ্চয়াত্মক না হওয়ায় প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান না হইলেও তাহার সদৃশ। কারণ, প্রকৃত তত্ত্ববিষয়ে যাহার সংশয় জন্মে, তিনি এক পক্ষে সেই তত্ত্বকেও গ্রহণ করায় তাহার নিশ্চয়ে তিনি অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু যাহার যে বিষয়ে সংশয় জন্মে নাই, তাহার সংশয়জন্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা জন্মিতে পারে না। সুতরাং ন্যায়ের পূর্ব্বাঙ্গ বলিয়া উক্তরূপ সংশয়পদার্থ প্রথম সূত্রে পৃথক্ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু

তাহা হইলেও জিজ্ঞাসার ন্যায় সংশয়ও কোন অর্থপ্রতিপাদক বাক্য না হওয়ায় উহাকেও ন্যায়বাক্যের অবয়ব বলা যায় না।

ভাষ্যকার পরে তৃতীয় **"শক্যপ্রাপ্তি"**র ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, প্রমাণসমূহ প্রমেয়বোধার্থ। অর্থাৎ প্রমাণসমূহে প্রমেয়বোধের যে শক্তি বা কারণত্ব আছে, তাহাই "শক্যপ্রাপ্তি"। বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"শক্যং প্রমেয়ং, তস্মিন্ প্রাপ্তিঃ শক্ততা প্রমাণানাং প্রমাতুশ্চ।" প্রমাণ ও প্রমাতার যে শক্তি, তাহা স্বরূপশক্তি ও সহকারিশক্তি, ইহাও তিনি পরে বলিয়াছেন। কিন্তু উহাও প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের ন্যায় পরপ্রতিপাদক ন্যায়বাক্যের অংশ না হওয়ায় উহাকেও ন্যায়ের অবয়ব বলা যায় না। এইরূপ ন্যায়ের দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় ও তজ্জন্য হানাদিবুদ্ধিরূপ যে **"প্রয়োজন"**, তাহাও সেই ন্যায়বাক্যের অংশ না হওয়ায় তাহাকেও ন্যায়ের অবয়ব বলা যায় না এবং পঞ্চম **"সংশয়ব্যুদাস"**কেও ন্যায়ের অবয়ব বলা যায় না। কারণ, তাহাও ন্যায়-বাক্যের অংশ নহে। "সংশয়ো ব্যুদস্যতেঽনেন" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে যদ্দ্বারা সংশয় ব্যুদস্ত বা নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ সংশয়নিবর্ত্তক তর্কই উক্ত **"সংশয়ব্যুদাস"** শব্দের অর্থ। ভাষ্যকার উহার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—**"প্রতিপক্ষোপবর্ণনম্"**। বাচস্পতি মিশ্র উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রতিপক্ষে হেতুর অভাবের বর্ণন। যেমন শব্দ যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে উচ্চারণের পূর্ব্বেও শ্রুত হউক? এইরূপে শব্দে অনিত্যত্বের প্রতিপক্ষ নিত্যত্বে হেতুর অভাবের সমর্থন করিলে শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয় নিবৃত্ত হয়। ফলকথা, সংশয়নিবর্ত্তক তর্কই "সংশয়ব্যুদাস"। বাচস্পতি মিশ্রও পরে বলিয়াছেন,—"সংশয়ব্যুদাসস্তর্কাপরনামা।" প্রমাণের দ্বারা একতর পক্ষের প্রতিষেধ হইলে তর্ক সেই তত্ত্বনিশ্চায়ক প্রমাণের অনুজ্ঞা করে। পরে তর্কসূত্রভাষ্যে ইহা ব্যক্ত হইবে। এখানে কোন কোন ভাষ্য পুস্তকে "তত্ত্বাভ্যনুজ্ঞানার্থং" এইরূপ স্পষ্টার্থ পাঠই আছে। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন, "তত্ত্বজ্ঞানাভ্যনুজ্ঞানার্থং"—তত্ত্বং জ্ঞায়তেঽনেনেতি তত্ত্বজ্ঞানং প্রমাণং তদভ্যনুজ্ঞানার্থং।"

ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—**"প্রকরণে তু জিজ্ঞাসাদয়ঃ সমর্থাঃ"**। উদ্দ্যোতকর ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"প্রকরণমেতে উত্থাপয়ন্তীতি। নহি জিজ্ঞাসাদীনন্তরেণ প্রকরণস্যোত্থানমস্তীতি প্রকরণোত্থাপকা নাবয়বা জিজ্ঞাসাদয় ইতি।" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত জিজ্ঞাসাদি ব্যতীত পক্ষপ্রতিপক্ষ-স্থাপনরূপ ন্যায়প্রবৃত্তি

সম্ভব হয় না, সুতরাং উক্ত জিজ্ঞাসাদি ন্যায়প্রবৃত্তির অঙ্গরূপে আবশ্যক হইলেও অর্থসাধক বাক্য না হওয়ায় অবয়ব হইতে পারে না। কিন্তু প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চবাক্যই অর্থসাধক হওয়ায় ন্যায়নামক মহাবাক্যের অংশরূপ অবয়ব। তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন,—**"অর্থসাধকভাবাত্তু"** ইত্যাদি। এখানে অনেক ভাষ্যপুস্তকে "তত্ত্বার্থসাধকভাবাত্তু" এবং "তত্ত্বসাধকভাবাত্তু" এইরূপ পাঠও আছে। "তত্ত্বচিন্তামণি"কার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও পঞ্চাবয়বের ব্যাখ্যা করিয়া সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন,—"সংশয়াদয়স্তু অবয়বলক্ষণাভাবাদেব নাবয়বাঃ, কিন্তু ন্যায়াঙ্গতয়া উপযুজ্যন্তে। কণ্টকোদ্ধারস্য চ ন সার্ব্বত্রিকত্বং, সময়বিশেষোপযোগিত্বাদিতি।" বাদী বা প্রতিবাদী নিজের প্রযুক্ত হেতু যে, হেত্বাভাস নহে, ইহা প্রকাশ করিতে "নায়ং হেত্বাভাসঃ" এইরূপ যে বাক্য বলেন, তাহার প্রাচীন নাম **"কণ্টকোদ্ধার"**। কিন্তু উহা সময়বিশেষে উপযোগী হওয়ায় সার্ব্বত্রিক নহে। সুতরাং উহা ন্যায়াঙ্গ নহে ॥ ৩২ ॥

ভাষ্য। তেষান্তু যথাবিভক্তানাং—

সূত্র। সাধ্যনির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞা ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—যথাবিভক্ত সেই পঞ্চাবয়বের মধ্যে কিন্তু "সাধ্য-নির্দ্দেশ" অর্থাৎ সাধনীয় ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মিমাত্রের বোধক বাক্য প্রতিজ্ঞা।

ভাষ্য। প্রজ্ঞাপনীয়েন ধর্ম্মেণ ধর্ম্মিণো বিশিষ্টস্য পরিগ্রহবচনং প্রতিজ্ঞা সাধ্যনির্দ্দেশঃ। অনিত্যঃ শব্দ ইতি।

অনুবাদ—প্রজ্ঞাপনীয় অর্থাৎ বাদী বা প্রতিবাদীর নিজমতানুসারে প্রতিপাদনীয় ধর্ম্মের দ্বারা বিশিষ্ট ধর্ম্মীর 'পরিগ্রহবচন' অর্থাৎ বোধক বাক্য প্রতিজ্ঞা সাধ্য নির্দ্দেশ, (যথা) 'অনিত্যঃ শব্দঃ'—এই বাক্য।

টিপ্পনী—পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা বিভক্ত পঞ্চাবয়বের মধ্যে প্রথম অবয়ব 'প্রতিজ্ঞা'র লক্ষণই প্রথম বক্তব্য। তাই মহর্ষি পরে বলিয়াছেন,—"সাধ্যনির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞা।" 'সাধ্যস্য নির্দ্দেশঃ সাধ্যনির্দ্দেশঃ।' ভাষ্যকার উক্তরূপ বিগ্রহবাক্যের অন্তর্গত "সাধ্যস্য" এই পদেরই অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"প্রজ্ঞাপনীয়েন ধর্ম্মেণ ধর্ম্মিণো বিশিষ্টস্য।" পরে "নির্দ্দেশঃ" এই পদেরই অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—**"পরিগ্রহবচনং"**। বাচস্পতি মিশ্র উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "পরিগৃহ্যতেঽনেনেতি পরিগ্রহঃ, স চ বচনঞ্চেতি পরিগ্রহবচনং।" অর্থাৎ যদ্দ্বারা

পরিগ্রহ বা বোধ জন্মে, এমন বচন বা বাক্যই ভাষ্যকারোক্ত "পরিগ্রহবচন"। 'নির্দ্দিশ্যতে পরিগৃহ্যতেঽনেন' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে সূত্রোক্ত "নির্দ্দেশ" শব্দের দ্বারা উক্তরূপ বাক্যই বুঝিতে হইবে। সাধ্য ধর্ম্ম এবং সাধ্যধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মী, এই উভয় অর্থেই ন্যায়সূত্রে "সাধ্য" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। (পরে ইহা ব্যক্ত হইবে)। কিন্তু এই সূত্রে বাদী বা প্রতিবাদীর প্রজ্ঞাপনীয় অর্থাৎ সাধনীয় ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীই "সাধ্য" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে।* তাহা হইলে সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, সাধনীয় ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর বোধক বাক্যবিশেষই 'প্রতিজ্ঞা'। যেমন শব্দমাত্রের অনিত্যত্ববাদী নৈয়ায়িকের শব্দমাত্রে অনিত্যত্বরূপ ধর্ম্মই সাধনীয়। অর্থাৎ অনিত্যত্ববিশিষ্ট শব্দই তাঁহার সাধ্য ধর্ম্মী। সুতরাং মীমাংসকের সহিত বিচারে মধ্যস্থগণের নিকটে তিনি প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্য বলেন,—**"অনিত্যঃ শব্দঃ"**। উক্ত বাক্যের দ্বারা অনিত্যত্বরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট শব্দরূপ ধর্ম্মীর বোধ হওয়ায় উহা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণানুসারে প্রতিজ্ঞাবাক্য।

ভাষ্যকার মহর্ষিসূত্রের উক্তরূপ ব্যাখ্যানুসারেই "অনিত্যঃ শব্দঃ" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও প্রতিজ্ঞাবাক্যের উদাহরণ বলিয়াছেন,—"দ্রব্যং বায়ুঃ।" কারণ, তিনিও সাধনীয় ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীকেই "অনুমেয়" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়া প্রতিজ্ঞার লক্ষণ বলিয়াছেন, "অনুমেয়োদ্দেশোঽবিরোধী প্রতিজ্ঞা"। কিন্তু উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ "শব্দোঽনিত্যঃ" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যই বলিয়াছেন। কারণ, তাঁহাদিগের মতে প্রথমে উদ্দেশ্যবোধক পদের প্রয়োগ করিয়া, পরে বিধেয়বোধক পদের প্রয়োগ কর্ত্তব্য।† বস্তুতঃ ভাষ্যকারের মতেও উক্ত স্থলে

---

* "তত্ত্বচিন্তামণি"র 'অবয়ব' গ্রন্থের "দীধিতি" টীকায় রঘুনাথ শিরোমণিও এই সূত্র উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"সাধ্যো বিধেয়বিশিষ্টো ধর্ম্মী। তথাচ পক্ষতাবচ্ছেদক-পর্ব্বতত্বাদিবিশিষ্টে সাধ্যতাবচ্ছেদকবহ্নিত্বাদিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যজ্ঞানজনকো ন্যায়াবয়ব ইতি পর্য্যবসিতোঽর্থঃ।" এই সূত্রের যথাশ্রুতার্থ গ্রহণ করিলে প্রতিজ্ঞালক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হয়, এই তাৎপর্য্যেই গঙ্গেশ বলিয়াছেন,—"তত্র প্রতিজ্ঞা ন সাধ্য-নির্দ্দেশঃ, সাধ্যপদেঽতিব্যাপ্তেঃ।" কিন্তু তিনি যে এই সূত্রের প্রকৃতার্থ না বুঝিয়া এই সূত্রোক্ত প্রতিজ্ঞালক্ষণেরই খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা আমরা বলিতে পারি না। টীকাকার গদাধর এইরূপ কথা বলিলেও জগদীশ সে ভাবের কথা কিছুই বলেন নাই।

† "কুসুমাঞ্জলি"র দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম কারিকার বিবরণে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন,—"অনুমানমপ্যুচ্যতে, শব্দোঽনিত্যঃ, উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ, ঘটবৎ।" পরে বরদরাজ ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—"ধর্ম্মিনির্দ্দেশপূর্ব্বকং সাধ্যনির্দ্দেশঃ কার্য্যঃ, শব্দোঽনিত্য ইতি। যথাহুঃ, "সিদ্ধধর্ম্মিণমুদ্দিশ্য সাধ্যধর্ম্মো বিধীয়তে" ইত্যাদি। "তার্কিকরক্ষা।"

শব্দরূপ ধর্ম্মীতে অনিত্যত্বরূপ ধর্ম্মই অনুমেয়। সুতরাং উহাই অনুমিতির বিধেয়রূপ সাধ্য। উদ্দ্যোতকর অনুমেয় বিষয়ে পূর্ব্বে অন্যরূপ মত সমর্থন করিলেও এখানে এই সূত্রোক্ত সাধ্যপদার্থ ব্যাখ্যায় সমর্থন করিয়াছেন যে, কেবল ধর্ম্মী বা ধর্ম্ম সাধ্য নহে। কিন্তু ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীই সাধ্য। বৌদ্ধসম্প্রদায় উহাকেই বলিয়াছেন **"পক্ষ"** এবং বহুবিধ পক্ষদোষের উল্লেখ করিয়া, সেই সমস্ত "পক্ষাভাসে"র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর সে বিষয়েও অনেক প্রতিবাদ করিয়াছেন।* প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও প্রতিজ্ঞার লক্ষণে শেষে "অবিরোধী" এই পদের প্রয়োগ করিয়া, তদ্দ্বারা 'প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ', 'অনুমানবিরুদ্ধ', 'আগমবিরুদ্ধ', 'স্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ' ও 'স্ববচনবিরুদ্ধ' প্রতিজ্ঞাভাস নিরস্ত হইয়াছে অর্থাৎ ঐ সমস্ত প্রতিজ্ঞার লক্ষণাক্রান্ত হয় না, ইহা বলিয়া, পরে উক্ত পঞ্চবিধ 'প্রতিজ্ঞাভাসে'র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কুমারিল ভট্ট প্রভৃতিও অনেকপ্রকার 'প্রতিজ্ঞাভাসে'র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি গোতমের মতে ঐ সমস্ত স্থলেই সমস্ত হেতুই দুষ্ট বলিয়া হেত্বাভাস। তাই তিনি পৃথক্ করিয়া 'পক্ষাভাস' বা 'প্রতিজ্ঞাভাসা'দির উল্লেখ করেন নাই। "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্ট বিচারপূর্ব্বক ইহা সমর্থন করিয়া, উপসংহারে বলিয়াছেন,—"অতএব চ শাস্ত্রেঽস্মিন্ মুনিনা তত্ত্বদর্শিনা। পক্ষাভাসাদয়ো নোক্তা হেত্বাভাসাস্তু দর্শিতাঃ" ॥ ৩৩ ॥

---

* "প্রমাণসমুচ্চয়"কার ভদন্ত দিঙ্‌নাগ পক্ষবিষয় প্রতিজ্ঞার দোষকেই 'পক্ষদোষ' বলিয়া পক্ষের লক্ষণ বলিয়াছেন,—"সাধ্যত্বেনেপ্সিতঃ পক্ষো বিরুদ্ধার্থো নিরাকৃতঃ।" উদ্দ্যোতকর ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, তাহা হইলে হেতু প্রভৃতির দোষকেও পক্ষদোষ বলিতে হয়। কারণ, হেতু প্রভৃতিও উক্তরূপ পক্ষাশ্রিত। আর উক্ত পক্ষলক্ষণে "ঈপ্সিতঃ" এই পদ অথবা শেষোক্ত পদ ব্যর্থ। আর শেষোক্ত পদও অবশ্য বক্তব্য হইলে বসুবন্ধুর লক্ষণেও উহা বক্তব্য। কিন্তু বসুবন্ধু বলিয়াছেন,—"পক্ষো যঃ সাধয়িতুমিষ্টঃ।" উদ্দ্যোতকর পরে "যদপি বাদবিধানটীকায়াং" ইত্যাদি-সন্দর্ভে যে 'বাদবিধান টীকা'র কথার খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা বসুবন্ধুর গ্রন্থের টীকাই বুঝা যায়। আর উদ্দ্যোতকরের মতেও "বাদবিধি" নামক গ্রন্থ যে, বসুবন্ধুর রচিত, ইহা পরে তাঁহার "যদপি বাদবিধৌ সাধ্যাভিধানং প্রতিজ্ঞেতি প্রতিজ্ঞা-লক্ষণমুক্তং" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা বুঝা যায়। কারণ, উক্ত লক্ষণ খণ্ডন করিতে প্রথমে তিনি বলিয়াছেন যে, গ্রন্থকারের পূর্ব্বোক্ত পক্ষপদার্থকেই গ্রহণ করিয়া ঐ লক্ষণ উক্ত হইলে "তদ্" শব্দের দ্বারাই উহাকে গ্রহণ করিয়া "তদভিধানং প্রতিজ্ঞা" ইহাই বক্তব্য। পূর্ব্বে ১৪৬-১৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সূত্র। উদাহরণসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতুঃ ॥৩৪॥

অনুবাদ—উদাহরণের সহিত সমান ধর্ম্মপ্রযুক্ত অর্থাৎ কেবল দৃষ্টান্ত-পদার্থের সহিত সাধ্য ধর্ম্মীর যাহা কেবল সমান ধর্ম্ম, তৎপ্রযুক্ত সাধ্যের সাধন অর্থাৎ সাধনীয় পদার্থের সাধনত্ববোধক বাক্যবিশেষ "হেতু"।

ভাষ্য। উদাহরণেন সামান্যাৎ সাধ্যস্য ধর্ম্মস্য সাধনং প্রজ্ঞাপনং হেতুঃ। সাধ্যে প্রতিসন্ধায় ধর্ম্মমুদাহরণে চ প্রতিসন্ধায় তস্য সাধনতা-বচনং হেতুঃ। 'উৎপত্তিধর্ম্মকত্বা'দিতি। উৎপত্তি-ধর্ম্মকমনিত্যং দৃষ্টমিতি।

অনুবাদ—দৃষ্টান্তপদার্থের সহিত সমান ধর্ম্মপ্রযুক্ত সাধ্য ধর্ম্মের সাধন কি না প্রজ্ঞাপন, অর্থাৎ সাধ্য ধর্ম্মের সাধনতাবোধক বাক্যবিশেষ হেতু। (বিশদার্থ) 'সাধ্যে' অর্থাৎ সাধনীয় ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীতে ধর্ম্মকে (হেতুপদার্থরূপ ধর্ম্মবিশেষকে) প্রতিসন্ধান করিয়া এবং দৃষ্টান্তপদার্থেও (সেই ধর্ম্মকে) প্রতিসন্ধান করিয়া অর্থাৎ তুল্যভাবে বুঝিয়া, সেই ধর্ম্মের সাধনতাবচন (সাধনত্ব বা জ্ঞাপকত্বের বোধক বাক্যবিশেষ) হেতু। যথা—"উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বাৎ" এই বাক্য। উৎপত্তিধর্ম্মক (ঘটাদি বস্তু) অনিত্য দৃষ্ট হয়। (অর্থাৎ ঘটাদি পদার্থকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, পরে উদাহরণবাক্য প্রয়োগ করিলে পূর্ব্বোক্ত হেতুবাক্য হইবে। ঐ স্থলে সাধর্ম্ম্য হেতু।)

টিপ্পনী—প্রথম অবয়ব 'প্রতিজ্ঞা'র লক্ষণের পরে দ্বিতীয় অবয়ব 'হেতু'র লক্ষণই বক্তব্য। সেই 'হেতু' দ্বিবিধ—সাধর্ম্ম্য হেতু ও বৈধর্ম্ম্য হেতু। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা সাধর্ম্ম্য হেতুর লক্ষণ বলিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—**"উদাহরণসাধর্ম্ম্যাৎ"**। ভাষ্যকার উক্ত পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—**"উদাহরণেন সামান্যাৎ"**। উদাহ্রিয়তে দৃষ্টান্তরূপেণ প্রদর্শ্যতে যৎ' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে এই সূত্রে "উদাহরণ" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে দৃষ্টান্ত-পদার্থ। বাচস্পতি মিশ্রও পরে বলিয়াছেন,—'উদাহ্রিয়ত ইত্যুদাহরণং দৃষ্টান্তধর্ম্মী'। তাহা হইলে বুঝা যায়, দৃষ্টান্তপদার্থের সহিত সাধ্য ধর্ম্মীর যে সামান্য অর্থাৎ সমান ধর্ম্ম, তাহাই এই সূত্রোক্ত 'উদাহরণসাধর্ম্ম্য'। সাধর্ম্ম্য-দৃষ্টান্ত বা অন্বয়দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইলে সেই স্থলে প্রকৃত হেতুপদার্থই পূর্ব্বোক্ত 'উদাহরণ-সাধর্ম্ম্য' হয়। সেই সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত যাহা সাধ্য ধর্ম্মের সাধন, তাহা

'সাধর্ম্যহেতু'। কিন্তু দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাক্যের লক্ষণই এখানে মহর্ষির বক্তব্য, এ জন্য ভাষ্যকার পরে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কথার ব্যাখ্যা করিতে শেষে ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন—"**তস্য সাধনভাবচনং হেতুঃ।**" অর্থাৎ সূত্রোক্ত "সাধ্যসাধন" শব্দের দ্বারা এখানে হেতুপদার্থের সাধ্যসাধনত্ববোধক বাক্যই বুঝিতে হইবে। উক্তরূপ লাক্ষণিক প্রয়োগের দ্বারা সাধ্য ধর্ম্মের সাধনত্বই যে, হেতুপদার্থের সামান্য লক্ষণ, ইহাও সূচিত হইয়াছে।

কিন্তু দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাক্যের লক্ষণ বলিতে হইলে তাহার সামান্য লক্ষণ পূর্ব্বে বক্তব্য। তাই বাচস্পতি মিশ্র প্রথমেই বলিয়াছেন,—"শ্রুত্যর্থাভ্যামুভয়লক্ষণ-সূচনাৎ সূত্রম্।" অর্থাৎ এই সূত্রপাঠের দ্বারা সাধর্ম্য হেতুর লক্ষণ সূচিত হইলেও ইহার অর্থ পর্য্যালোচনার দ্বারা হেতুবাক্যের সামান্য লক্ষণও বুঝা যায়। সুতরাং ইহার দ্বারা উভয় লক্ষণই সূচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সামান্য লক্ষণটি "আর্থ" লক্ষণ। অর্থ পর্য্যালোচনার দ্বারা যে লক্ষণ বুঝা যায়, তাহাকে বলে "আর্থ" লক্ষণ। মহর্ষির "সাধ্য-সাধনং" এই পদের দ্বারা সেই সামান্য লক্ষণ বুঝা যায় যে, ন্যায়বাক্যের অন্তর্গত সাধ্যসাধনত্ব-বোধক যে বাক্য, তাহাই দ্বিতীয় অবয়ব হেতু। আর "উদাহরণসাধর্ম্যাৎ" এই পদের যোগে উহার দ্বারা বিশেষ লক্ষণ বুঝা যায় যে, দৃষ্টান্তপদার্থের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত উক্তরূপ সাধ্যসাধনত্ববোধক যে বাক্য, তাহা সাধর্ম্য হেতু। এই পক্ষে সূত্রোক্ত "হেতু" শব্দের অর্থ "সাধর্ম্য হেতু"। সূত্রোক্ত "সাধ্য" শব্দের অর্থ এখানে সাধ্য ধর্ম্ম। ভাষ্যকার ইহা ব্যক্ত করিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"সাধ্যস্য ধর্ম্মস্য সাধনং"। পরে "সাধ্যে প্রতিসন্ধায়" এই সন্দর্ভে ভাষ্যকারোক্ত "সাধ্য" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে সাধ্যধর্ম্মী। কারণ, সাধ্য ধর্ম্মীতে হেতুপদার্থের জ্ঞান না হইলে হেতুবাক্যের প্রয়োগ করা যায় না। কেবল সাধ্য ধর্ম্মীতে হেতুপদার্থের জ্ঞান হইলেও হেতুবাক্য প্রয়োগ করা যায় না। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—"উদাহরণে চ প্রতিসন্ধায়।" সাধ্য ধর্ম্মী ও দৃষ্টান্ত পদার্থে একই ধর্ম্ম না থাকিলেও তুল্য ধর্ম্ম থাকে। সেই তুল্য ধর্ম্মের সেইরূপে জ্ঞানই তাহার 'প্রতিসন্ধান'। সেই প্রতিসন্ধানজন্য সেই ধর্ম্মের সাধ্যসাধনত্ববোধক যে বাক্য কথিত হয়, অর্থাৎ যে পঞ্চম্যন্ত বাক্যের দ্বারা সেই ধর্ম্মে সাধ্য ধর্ম্মের জ্ঞাপকত্ব বুঝা যায়, সেই বাক্যকে বলে—সাধর্ম্য হেতুবাক্য। যেমন পূর্ব্বোক্ত **'অনিত্যঃ শব্দঃ'** এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরে নৈয়ায়িক হেতুবাক্য বলেন—**"উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ'**। এখানে উৎপত্তি-

ধর্ম্মকত্বরূপ ধর্ম্মই হেতুপদার্থ, উহা স্থালী প্রভৃতি দৃষ্টান্তপদার্থ এবং অনিত্যত্বরূপে সাধ্যধর্ম্মী শব্দের সাধর্ম্ম্য বা সমান ধর্ম্ম। সুতরাং বাদী নৈয়ায়িক ঐ উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বকে স্থালী প্রভৃতি এবং শব্দের সাধর্ম্ম্য বুঝিয়া সেই সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত "উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ" এই বাক্য বলিলে তাহা হইবে সাধর্ম্ম্য হেতুবাক্য। কিন্তু উহার পরে "সাধর্ম্ম্যোদাহরণ" বলিলেই সেই স্থলে উহা 'সাধর্ম্ম্য হেতুবাক্য' হইবে। তাই ভাষ্যকার এখানে সেই উদাহরণ প্রকাশ করিতেই পরে বলিয়াছেন,—"উৎপত্তিধর্ম্মকমনিত্যং দৃষ্টমিতি।" পরে ইহা ব্যক্ত হইবে ॥৩৪॥

ভাষ্য। কিমেতাবদ্ধেতুলক্ষণমিতি? নেত্যুচ্যতে। কিং তর্হি?

অনুবাদ—হেতুর লক্ষণ কি এইমাত্র? (উত্তর) ইহা উক্ত হয় নাই। (প্রশ্ন) তবে কি? অর্থাৎ তবে হেতুর অন্য লক্ষণ কি? (উত্তর)—

সূত্র। তথা বৈধর্ম্ম্যাৎ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—সেইরূপ অর্থাৎ উদাহরণবিশেষের বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্তও সাধ্যসাধন অর্থাৎ সাধ্য ধর্ম্মের সাধনত্ববোধক বাক্যবিশেষ হেতু (বৈধর্ম্ম্যহেতু)।

ভাষ্য। উদাহরণ-বৈধর্ম্ম্যাচ্চ সাধ্যসাধনং হেতুঃ। কথং? অনিত্যঃ শব্দঃ, উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ, অনুৎপত্তিধর্ম্মকং নিত্যং, যথা আত্মাদি দ্রব্যমিতি।

অনুবাদ—"উদাহরণের" অর্থাৎ বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত পদার্থের বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্তও সাধ্য সাধন অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ সাধ্যধর্ম্ম-সাধনত্ববোধক বাক্য হেতু (প্রশ্ন) কিরূপ? অর্থাৎ উক্ত দ্বিতীয় প্রকার হেতু কিরূপ? (উত্তর) "অনিত্যঃ শব্দঃ", "উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ", "অনুৎপত্তিধর্ম্মকং নিত্যং, যথা আত্মাদি দ্রব্যং" অর্থাৎ উক্তরূপ প্রতিজ্ঞাদি প্রয়োগ স্থলে পরে উদাহরণবাক্যের দ্বারা আত্মাদি দ্রব্যরূপ বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত "উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ" এই বাক্যই "বৈধর্ম্ম্য হেতু" হয়।

টিপ্পনী—কেবল সাধর্ম্ম্য হেতুই হেতু নহে, তাই মহর্ষি পরে বলিয়াছেন,—"**তথা বৈধর্ম্ম্যাৎ।**" এই সূত্রে সমুচ্চয়ার্থ "**তথা**" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বসূত্র হইতে "**উদাহরণ**" শব্দের এবং "**সাধ্যসাধনং হেতুঃ**" এই অংশের অনুবৃত্তি বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"উদাহরণ-বৈধর্ম্ম্যাচ্চ

সাধ্যসাধনং হেতুঃ।" "বৈধর্ম্ম্য" শব্দের যোগবশতঃ এখানে 'উদাহরণ' শব্দের অর্থ বুঝা যায়, বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত। তাহা হইলে সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত পদার্থের যাহা কেবল বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ যাহা বৈধর্ম্ম্য হেতুপদার্থ, তৎপ্রযুক্ত সাধ্য ধর্ম্মের সাধনত্ববোধক যে বাক্য, তাহাও হেতু। উক্ত দ্বিতীয় প্রকার হেতুর নাম বৈধর্ম্ম্য হেতুবাক্য। ভাষ্যকার ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পূর্ব্বোক্ত "অনিত্যঃ শব্দঃ" এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরে '**উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ**" এইরূপ হেতুবাক্যেরই উল্লেখ করিয়া, পরে "অনুৎপত্তিধর্ম্মকং নিত্যং যথা আত্মাদি দ্রব্যং", এইরূপ বৈধর্ম্ম্যোদাহরণবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি নাই, উৎপত্তি যাহাদিগের ধর্ম্ম নহে, সেই সমর্থ পদার্থ অনুৎপত্তিধর্ম্মক। সেই সমস্ত পদার্থ নিত্য, যেমন আত্মা প্রভৃতি দ্রব্য। পূর্ব্বোক্ত অনুমানে বাদী যদি পরে উক্তরূপে আত্মা প্রভৃতি বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তই গ্রহণ করিয়া উক্তরূপ উদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ" এই হেতুবাক্যই হইবে—বৈধর্ম্ম্যোদাহরণবাক্য। পরে উদাহরণসূত্রভাষ্যে ইহা সুব্যক্ত হইয়াছে।

কিন্তু 'বার্ত্তিক'কার উদ্দ্যোতকর ভাষ্যকারোক্ত এই উদাহরণ খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত স্থলে পরে উক্তরূপ 'বৈধর্ম্ম্যোদাহরণবাক্য' বলিলে প্রয়োগ মাত্রেরই ভেদ হয়, কিন্তু তাহাতে উক্ত হেতুবাক্যের বাস্তব ভেদ হয় না। আর যদি উদাহরণ-বাক্যের ভেদ-প্রযুক্তই হেতুবাক্যের উক্তরূপ ভেদ মহর্ষির সম্মত হয়, তাহা হইলে এখানে এই দ্বিতীয় সূত্রটি বলা অনাবশ্যক। কারণ পরে দ্বিতীয় উদাহরণসূত্রের দ্বারাই তাঁহার উক্তরূপ মত বুঝা যায়। সুতরাং মহর্ষির এই দ্বিতীয় হেতুলক্ষণসূত্রের দ্বারাও তাঁহার মত বুঝা যায় যে, বৈধর্ম্ম্য হেতুবাক্যের উদাহরণ অন্যরূপ। ভাষ্যকারোক্ত ঐ উদাহরণ ন্যায্য নহে। তাই পরে ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—"তস্মান্নেদমুদাহরণং ন্যায্যমিতি, উদাহরণন্তু নেদং নিরাত্মকং জীবচ্ছরীরমপ্রাণাদিমত্ত্বপ্রসঙ্গাদিতি।" তাৎপর্য্য এই যে, নৈরাত্ম্যবাদীর মতে কোন জীবদেহেই অতিরিক্ত নিত্য আত্মা না থাকায় সমস্ত জীবদেহই নিরাত্মক। সুতরাং তাহাতে সাত্মকত্বের অনুমানে তাঁহার নিকটে কোন জীবদেহকেই সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত বা অন্বয় দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করা যায় না। সুতরাং উক্ত অনুমানে সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত সম্ভব না হওয়ায় নিরাত্মক ঘটাদি বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তই প্রদর্শন করিতে হইবে। জীবিত জীবের শরীরমাত্রেই প্রাণাদি আছে, কিন্তু ঘটাদি পদার্থে তাহা নাই, ইহা প্রতিবাদীরও

স্বীকৃত। সুতরাং যদি জীবিত জীবের শরীরও ঘটাদি পদার্থের ন্যায় নিরাত্মক হয়, তাহা হইলে উহাও প্রাণাদিশূন্য, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু নৈরাত্ম্যবাদীও তাহা স্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং জীবিত ব্যক্তির শরীর মাত্রই নিরাত্মক নহে, (সাত্মক), যেহেতু তাহাতে প্রাণাদিমত্ত্ব আছে, যে সমস্ত পদার্থ নিরাত্মক, তাহা প্রাণাদিশূন্য, যেমন ঘটাদি, এইরূপে প্রাণাদিমত্ত্ব হেতুর দ্বারা জীবিত ব্যক্তির শরীরমাত্রেই সাত্মকত্ব সিদ্ধ হয়। উক্ত স্থলে প্রাণাদিমত্ত্বরূপ যে হেতুপদার্থ, তাহা ঘটাদি বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তের বৈধর্ম্ম্য হওয়ায় উহাকে বলে বৈধর্ম্ম্যহেতু বা ব্যতিরেকী হেতু। সুতরাং "প্রাণাদিমত্ত্বাৎ" এইরূপ হেতুবাক্য হইবে—'বৈধর্ম্ম্য হেতুবাক্য।'* "তত্ত্ব-চিন্তামণি"কার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও উদ্দ্যোতকরের পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ গ্রহণ করিয়া উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং যে স্থলে সপক্ষ অর্থাৎ অন্বয় দৃষ্টান্ত নাই, সেই স্থলেই কেবল ব্যতিরেক দৃষ্টান্তে ব্যতিরেক ব্যাপ্তিনিশ্চয়জন্য অনুমানকেই "কেবলব্যতিরেকী" বলিয়াছেন।

কিন্তু ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য এই যে, দৃষ্টান্তপদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য-প্রযুক্তই যথাক্রমে মহর্ষি হেতুবাক্যকে দ্বিবিধ বলায় সেই দৃষ্টান্তের বোধক উদাহরণবাক্যের ভেদপ্রযুক্ত যে, হেতুবাক্যের উক্তরূপ ভেদ, ইহাই মহর্ষির সূত্রের দ্বারা সরলভাবে বুঝা যায়। পরে দ্বিতীয় উদাহরণসূত্রের দ্বারাও উহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু তাহা বুঝা গেলেও দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাক্য যে, দ্বিবিধই, এইরূপ নিয়মার্থ মহর্ষি এখানে পরে দ্বিতীয় সূত্র বলিয়াছেন,— "তথা বৈধর্ম্ম্যাৎ"। সুতরাং উহা ব্যর্থ বলা যায় না। পরে হেত্বাভাসের বিভাগসূত্রের প্রয়োজন সমর্থন করিতে উদ্দ্যোতকরও ত বলিয়াছেন,— "বিভাগোদ্দেশো নিয়মার্থ ইত্যুক্তং।" ফলকথা, উদাহরণের ভেদপ্রযুক্তই হেতুবাক্যের ভেদ হয়, ইহাই মহর্ষির সূত্রের দ্বারা বুঝিয়া ভাষ্যকার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সাধর্ম্ম্যহেতুকেও উক্ত স্থলে বৈধর্ম্ম্যহেতু বলিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরের প্রদর্শিত উদাহরণও তাঁহার সম্মত। অবশ্য পরে অনেকে বলিয়াছেন,—

* উদ্দ্যোতকর উক্তরূপ "কেবলব্যতিরেকী" হেতুকেই প্রাচীন সংজ্ঞানুসারে "অবীত" হেতু বলিয়া বিচারপূর্ব্বক উহা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"তাবেতৌ বীতাবীতহেতু লক্ষণাভ্যাং পৃথগভিহিতাবিতি।' অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা 'বীত" হেতুর এবং এই সূত্রের দ্বারা "অবীত" হেতুর লক্ষণ পৃথক্ কথিত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্রও উক্ত মত সমর্থন করিয়া গোতমোক্ত "শেষবৎ" অনুমানকেই বলিয়াছেন,—"অবীত" অনুমান। এ বিষয়ে পূর্ব্বে (১৮২-১৮৫ পৃষ্ঠায়) আলোচনা দ্রষ্টব্য।

"ঋজুমার্গেণ সিধ্যন্তং কো হি বক্রেণ সাধয়েৎ।" অর্থাৎ সরল পথে অন্বয় দৃষ্টান্তের সাহায্যে যাহা সিদ্ধ হয়, তাহা বক্র পথে ব্যতিরেক দৃষ্টান্তের সাহায্যে কে সিদ্ধ করে অর্থাৎ তাহা কেহই সিদ্ধ করেন না। কিন্তু কখনই যে, কেহই তাহা সিদ্ধ করেন না বা করিবেন না, ইহাও শপথ করিয়া বলা যায় না। যে স্থলে অন্বয় দৃষ্টান্ত সম্ভব হইলেও ব্যতিরেক দৃষ্টান্তই প্রথমে বাদীর বুদ্ধির বিষয় হয় অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, স্বেচ্ছানুসারে বাদী যদি ব্যতিরেক দৃষ্টান্তই গ্রহণ করিয়া প্রকৃত হেতুবাক্যের পরে বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্যেরই প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেই স্থলে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সেই হেতুবাক্য যে, বৈধর্ম্ম্য হেতু, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। তিনি পরে সাধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগ করেন নাই বলিয়া তাঁহার সেই হেতুকে দুষ্ট বলাও যায় না। ভাষ্যকার সেইরূপ স্থলেই বৈধর্ম্ম্য হেতুবাক্যের উক্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তদ্দ্বারা অন্যরূপ স্থলে যে বৈধর্ম্ম্য হেতু হইবে না, ইহাও বুঝিবারও কোন কারণ নাই।

"ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, মহর্ষি এখানে পূর্ব্বসূত্রে **"সাধ্যসাধনং হেতুঃ"** এই বাক্যের দ্বারা সাধ্য ধর্ম্মের সাধনত্বই হেতুপদার্থের সামান্য লক্ষণ, ইহা বলিয়াছেন। কারণ, হেতুপদার্থের স্বরূপ না বুঝিলে দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাক্য এবং বক্ষ্যমাণ **"হেত্বাভাসে"র** স্বরূপ বুঝা যায় না। সুতরাং হেতুপদার্থের লক্ষণই মহর্ষির প্রথম বক্তব্য। তন্মধ্যে প্রথম সূত্রের দ্বারা **"অন্বয়ব্যতিরেকী"** হেতুর এবং দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা **"কেবলব্যতিরেকী"** হেতুর লক্ষণ বলিয়াছেন। তদ্দ্বারা প্রকরণানুসারে তাদৃশ হেতুপদার্থের সাধ্য-সাধনত্ববোধক যে বাক্য, তাহাই দ্বিতীয় অবয়ব হেতু এবং তাহা পূর্ব্বোক্ত নামদ্বয়ে দ্বিবিধ, ইহা পরে বুঝা যায়। সুতরাং তাহাও উক্ত হেতুলক্ষণ দ্বারা সূচিত হইয়াছে। "কেবলান্বয়ী" নামে কোন হেতু নাই। জয়ন্ত ভট্ট আরও বলিয়াছেন যে, মহর্ষি পূর্ব্বে অনুমানসূত্রে **"তৎপূর্ব্বকং"** এই পদের দ্বারা হেতুপদার্থে ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের উপায়মাত্র সূচনা করিয়া, পরে পূর্ব্বোক্ত হেতুলক্ষণসূত্রে **"সাধ্য-সাধনং"** এই পদের দ্বারা হেতুপদার্থে সাধ্য ধর্ম্মের সাধনত্বই যে, ব্যাপ্তির স্বরূপ, ইহার সূচনা করিয়াছেন এবং পরে দ্বিতীয় আহ্নিকে পঞ্চবিধ **'হেত্বাভাস'** বলিয়া, সেই ব্যাপ্তিপদার্থ যে পঞ্চবিধ, ইহাও সূচনা করিয়াছেন। কারণ, অব্যভিচারিত্ব ও অবিরুদ্ধত্ব প্রভৃতি পঞ্চবিধ ব্যাপ্তির মধ্যে এক একটির অভাব গ্রহণ করিয়াই মহর্ষি হেত্বাভাসকে পঞ্চবিধ

বলিয়াছেন। পরে ইহা বুঝা যাইবে। জয়ন্ত ভট্ট পরে অপরের মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মহর্ষির উক্ত দুই সূত্রের একবাক্যতাবশতঃ উহার দ্বারা বুঝা যায় যে, "সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য হেতু" নামে হেতু একই প্রকার, উহাকেই বলে **"অন্বয়ব্যতিরেকী"** হেতু। ভাষ্যকারেরও উহাই মত। তাই তিনি দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণা করিতে বলিয়াছেন,—"কিমেতাবদ্ধেতুলক্ষণমিতি নেত্যুচ্যতে।"

কিন্তু জয়ন্ত ভট্টের কথিত উক্ত মতান্তর কোনরূপেই সমর্থন করা যায় না। কারণ, মহর্ষির উহাই সম্মত হইলে এক সূত্রের দ্বারাই তিনি সেই "সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যহেতু"র লক্ষণ বলিতেন। আর কেবল 'সাধর্ম্ম্য হেতু' বা 'অন্বয়ী' হেতু যে নাই, ইহাও বলা যায় না। আর ভাষ্যকারের ঐ কথারও উক্তরূপ তাৎপর্য্য কোনরূপে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, উদাহরণভেদে হেতু যে দ্বিবিধ, ইহা ভাষ্যকার পরে (৩৯শ সূত্রভাষ্যে) স্পষ্ট বলিয়াছেন। পরন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি মহর্ষির উক্ত দুই সূত্রের দ্বারা দ্বিবিধ হেতুবাক্যেরই লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, হেতুপদার্থের লক্ষণ ব্যাখ্যা করেন নাই। কারণ, এখানে প্রকরণানুসারে দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাক্যের লক্ষণই মহর্ষির মুখ্য বক্তব্য। তদ্দ্বারা হেতুপদার্থের স্বরূপও সূচিত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পরন্তু "উদাহরণসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্য-সাধনং হেতু"—এই সূত্রবাক্যের দ্বারা হেতুপদার্থের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিলে পঞ্চমী বিভক্তির সংগতি হয় না। কারণ, যাহা সূত্রোক্ত উদাহরণ-সাধর্ম্ম্য, তাহা বস্তুতঃ সেই হেতুপদার্থই। সুতরাং তাহাকে সেই সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত বলা যায় না। কারণ, কোন পদার্থ নিজেই তাহার প্রযোজক হয় না। সুতরাং হেতুপদার্থের লক্ষণই বক্তব্য হইলে "উদাহরণসাধর্ম্ম্যং সাধ্যসাধনং হেতুঃ"—এইরূপ সূত্রই বক্তব্য।

জয়ন্ত ভট্ট নিজের ব্যাখ্যা সমর্থন করিতে সূত্রোক্ত পঞ্চমী বিভক্তিরও কথঞ্চিৎ উপপাদন করিয়াছেন এবং কোন সম্প্রদায় যে, "উদাহরণসাধর্ম্ম্যে সাধ্য-সাধর্ম্ম্যং হেতুঃ" এইরূপ সূত্রপাঠ করিয়া, তদ্দ্বারা হেতুপদার্থের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিতেন, ইহাও তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু "উদাহরণসাধর্ম্ম্যাৎ" ইত্যাদি সূত্রপাঠই প্রকৃত। তাই বৌদ্ধাচার্য্য **দিঙ্নাগ** "প্রমাণসমুচ্চয়" গ্রন্থে প্রতিবাদ করিয়াছেন,—"সাধর্ম্ম্যং যদি হেতুঃ স্যান্ন বাক্যাংশো ন পঞ্চমী।" তাৎপর্য্য এই যে, দৃষ্টান্তপদার্থের সাধর্ম্ম্য যদি হেতু হয়, তাহা হইলে উহা ন্যায়বাক্যের অংশরূপ অবয়ব হইতে পারে না। কারণ, সেই সাধর্ম্ম্য বাক্য নহে, কিন্তু

হেতুপদার্থ। যদি বল, উক্ত সূত্রের দ্বারা হেতুপদার্থের লক্ষণই কথিত হইয়াছে, তাহা হইলে "ন পঞ্চমী" অর্থাৎ উক্ত সূত্রে "উদাহরণসাধর্ম্ম্যাৎ" এই পদে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হইতে পারে না। দিঙ্‌নাগের প্রবল প্রতিবাদী উদ্দ্যোতকর এবং পরে জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি দিঙ্‌নাগের ঐ কথারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। বস্তুতঃ মহর্ষির উক্ত দুই সূত্রে পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাক্যের লক্ষণই বলিয়াছেন। উক্ত পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ প্রযুক্তত্ব। যাহা হেতুপদার্থ, তাহা দৃষ্টান্তপদার্থের সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্যরূপ হইলেও সেই সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্যের জ্ঞানজন্য বিবক্ষাদিবশতঃই উক্তরূপ হেতুবাক্যের প্রয়োগ হয়। সুতরাং সেই সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্য পরম্পরায় সেই হেতুবাক্যের প্রয়োজকরূপ নিমিত্ত হয়। সুতরাং সেই হেতুবাক্যকে তৎপ্রযুক্ত বলা যায়। পূর্ব্বসূত্রবার্ত্তিকে উদ্দ্যোতকরও উক্তরূপে উদাহরণ-সাধর্ম্ম্যে হেতুবাক্যের নিমিত্তত্ব সমর্থন করিয়া, পরে বলিয়াছেন,— "তস্মাৎ পঞ্চম্যভিধানমেব জ্যায়ঃ।" তৎপূর্ব্বে বলিয়াছেন,—"উদাহরণসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্য-সাধনবচনং হেতরিত্যেবং ব্যাচক্ষাণেন সমস্ত এব দোষোঽপাকৃতো ভবতীতি।" উদ্দ্যোতকর পরে এই সূত্রের 'বার্ত্তিকে' দিঙ্‌নাগ এবং অন্য কোন কোন বৌদ্ধ নৈয়ায়িকের উক্ত হেতুলক্ষণেরও বিশেষ বিচারপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়া, উপসংহারে বলিয়াছেন,—"তদেবমেতানি ন হেতুলক্ষণানি সম্ভবন্তীদমেবার্ষং হেতুলক্ষণং ন্যায্যমিতি॥"৩৫॥

সূত্র। সাধ্যসাধর্ম্ম্যাত্তদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণং ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—সাধ্য ধর্ম্মীর সহিত সমানধর্ম্মবত্তাপ্রযুক্ত সেই সাধ্য ধর্ম্মীর ধর্ম্মের (সাধ্য ধর্ম্মের) ভাববিশিষ্ট পদার্থ দৃষ্টান্ত, সেই দৃষ্টান্তের বোধক বাক্য উদাহরণ অর্থাৎ তৃতীয় অবয়ব "সাধর্ম্ম্যোদাহরণ"।

ভাষ্য। সাধ্যেন সাধর্ম্ম্যং সমানধর্ম্মতা, সাধ্যসাধর্ম্ম্যাৎ কারণাৎ তদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত ইতি। তস্য ধর্ম্মস্তদ্ধর্ম্মঃ। তস্য সাধ্যস্য। সাধ্যঞ্চ দ্বিবিধং,—ধর্ম্মিবিশিষ্টো বা ধর্ম্মঃ শব্দস্যানিত্যত্বং, ধর্ম্মবিশিষ্টো বা ধর্ম্মী, অনিত্যঃ শব্দ ইতি। ইহোত্তরং

তদ্‌গ্রহণেন গৃহ্যত ইতি। কস্মাৎ? পৃথগ্‌ধর্ম্মবচনাৎ। তদ্ধর্ম্মস্য ভাবস্তদ্ধর্ম্মভাবঃ, স যস্মিন্ দৃষ্টান্তে বর্ত্ততে স দৃষ্টান্তঃ সাধ্যসাধর্ম্ম্যাত্তদ্ধর্ম্মভাবী ভবতি, স চোদাহরণমিষ্যতে। (স্থাল্যাদি-দ্রব্যমুৎপত্তিধর্ম্মকমনিত্যং দৃষ্টামিতি।) *

তত্র যদুৎপদ্যতে তদুৎপত্তিধর্ম্মকং, তচ্চ ভূত্বা ন ভবতি, আত্মানং জহাতি নিরুধ্যত ইত্যনিত্যম্। এবমুৎপত্তিধর্ম্মকত্বং সাধনমনিত্যত্বং সাধ্যং, সোঽয়মেকস্মিন্ দ্বয়োর্দ্ধর্ম্মযোঃ সাধ্য-সাধনভাবঃ সাধর্ম্ম্যাদ্‌ব্যবস্থিত উপলভ্যতে, তং দৃষ্টান্তে উপলভমানঃ শব্দেঽপ্যনুমিনোতি, শব্দোঽপ্যুৎপত্তিধর্ম্মকত্বাদনিত্যঃ স্থাল্যাদিবদিতি।

উদাহ্রিয়তে তেন ধর্ম্ময়োঃ সাধ্যসাধনভাব ইত্যুদাহরণম্।

অনুবাদ—সাধ্য ধর্ম্মীর সহিত সাধর্ম্ম্য সমানধর্ম্মতা। সাধ্য ধর্ম্মীর সহিত সাধর্ম্ম্যরূপ প্রযোজকবশতঃ "তদ্ধর্ম্মভাবী" পদার্থ দৃষ্টান্ত হয়। (সূত্রোক্ত "তদ্ধর্ম্মভাবী" এই পদের ব্যাখ্যা) তাহার ধর্ম্ম তদ্ধর্ম্ম। তাহার কি না সাধ্যের অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সাধ্য ধর্ম্মীর। সাধ্য কিন্তু দ্বিবিধ, (১) ধর্ম্মিবিশিষ্ট ধর্ম্মী, (যেমন) শব্দের অনিত্যত্ব, অথবা (২) ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মী; (যেমন) অনিত্যত্ব-বিশিষ্ট শব্দ। এই সূত্রে "তদ্‌গ্রহণ" অর্থাৎ 'তদ্' শব্দের দ্বারা "উত্তর" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ সাধ্যের মধ্যে শেষোক্ত সাধ্যই বুঝা যায়। (প্রশ্ন) কেন? অর্থাৎ কি কারণে তাহা বুঝা যায়? (উত্তর) "ধর্ম্ম" শব্দের পৃথগ্‌বচনপ্রযুক্ত [অর্থাৎ উক্ত "তদ্" শব্দের দ্বারা ধর্ম্মরূপ সাধ্যই গৃহীত হইলে উহার পরে আবার

* এখানে বন্ধনীর মধ্যে যে পাঠ লিখিত হইল, তাহা কোন ভাষ্যপুস্তকে দেখিতে পাই না। কিন্তু উদ্দ্যোতকরের "উদাহরণং স্থাল্যাদিদ্রব্যমিতি" এই উক্তির দ্বারা তিনি যে, উক্তরূপ ভাষ্যপাঠই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। বস্তুতঃ এখানে সূত্রার্থ ব্যাখ্যার পরে ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত স্থলে তাঁহার উদাহরণ-বাক্য প্রদর্শনও কর্ত্তব্য। পরবর্ত্তী সূত্রভাষ্যেও তিনি তাহা করিয়াছেন। আর এখানে উক্ত উদাহরণ-বাক্য বলিলেই পরে তাঁহার "তত্র যদুৎপদ্যতে" ইত্যাদি সন্দর্ভও সুসংগত হয়, ইহাও বুঝা আবশ্যক। মুদ্রিত তাৎপর্য্য টীকায় দেখা যায়,— "সাধ্যসাধর্ম্ম্যাদুৎপত্তিধর্ম্মকত্বাদিতি ভাষ্যং।" তদনুসারে প্রথম সংস্করণে উক্তরূপ ভাষ্যপাঠই গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু এখানে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকারের "উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ" এই পদের উক্তি সংগত বুঝা যায় না। অনেক পুস্তকে উক্তরূপ ভাষ্যপাঠ নাই।

"ধর্ম্ম" শব্দের প্রয়োগ অনাবশ্যক, সুতরাং বুঝা যায় যে, উহার দ্বারা সাধ্য ধর্ম্মীই গৃহীত হইয়াছে]। 'তদ্ধর্ম্মে'র ভাব অর্থাৎ বিদ্যমানতা "তদ্ধর্ম্মভাব", সেই "তদ্ধর্ম্মভাব" যে দৃষ্টান্তপদার্থে থাকে, তাহা "তদ্ধর্ম্মভাবী" হয় এবং তাহা উদাহরণ বলিয়া কথিত হয় অর্থাৎ উক্তরূপ দৃষ্টান্তপদার্থ "সাধর্ম্ম্যোদাহরণ" বলিয়া কথিত হওয়ায় তদ্বোধক বাক্যবিশেষই তৃতীয় অবয়ব সাধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্য, ইহা বুঝা যায়। (যেমন "স্থাল্যাদিদ্রব্যমুৎপত্তিধর্ম্মকমনিত্যং দৃষ্টং"—এইরূপ বাক্য)।

সেই উদাহরণ-বাক্যে—যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা "উৎপত্তিধর্ম্মক" অর্থাৎ উক্ত স্থলে উদাহরণ-বাক্যে "উৎপত্তিধর্ম্মক" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে—যাহার উৎপত্তি হয়। কিন্তু তাহা (পূর্ব্বে) বিদ্যমান থাকিয়া উৎপন্ন হয় না অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার কোনরূপে সত্তা থাকে না এবং তাহা স্বস্বরূপকে ত্যাগ করে (অর্থাৎ) নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ কোন কালে অত্যন্ত বিনষ্ট হয়—এ জন্য অনিত্য। এইরূপ হইলে অর্থাৎ উৎপত্তিধর্ম্মক বস্তুমাত্রই অনিত্য হইলে 'উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব' সাধন, 'অনিত্যত্ব' সাধ্য ধর্ম্ম অর্থাৎ অনিত্যত্ব ও উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বের সাধ্য-সাধনভাব স্বীকার্য্য। সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত ব্যবস্থিত সেই এই (পূর্ব্বোক্ত) ধর্ম্মদ্বয়ের সাধ্য-সাধনভাব এক পদার্থে উপলব্ধ হয়। (অর্থাৎ) সেই সাধ্য-সাধনভাবকে দৃষ্টান্তপদার্থে উপলব্ধি করায় শব্দেও অনুমান করে অর্থাৎ শব্দগত উৎপত্তিধর্ম্মকত্বও যে, তদ্গত অনিত্যত্বের সাধন বা ব্যাপ্য, ইহা অনুমানসিদ্ধ হয়। (সুতরাং) শব্দও উৎপত্তিধর্ম্মকত্বহেতুক স্থালী প্রভৃতির ন্যায় অনিত্য।

তদ্দ্বারা ধর্ম্মদ্বয়ের সাধ্য-সাধনভাব উদাহৃত (প্রদর্শিত) হয়, এই অর্থে "উদাহরণ" অর্থাৎ এই সূত্রে "উদাহরণ" শব্দের উক্তরূপ ব্যুৎপত্তিবশতঃ উহার দ্বারা তৃতীয় অবয়ব উদাহরণবাক্য বুঝিতে হইবে।

টিপ্পনী—তৃতীয় অবয়বের নাম **'উদাহরণ'**। উহা দ্বিবিধ—'সাধর্ম্ম্যো-দাহরণ' এবং 'বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ'। মহর্ষি প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা 'সাধর্ম্ম্যোদাহরণে'র লক্ষণ বলিয়াছেন। সুতরাং এই সূত্রে শেষোক্ত "উদাহরণ" শব্দের দ্বারা 'সাধর্ম্ম্যোদাহরণই' বুঝা যায়। কিন্তু "উদাহরণে"র সামান্য লক্ষণ না বুঝিলে বিশেষ লক্ষণ বুঝা যায় না। এই ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে এই সূত্রোক্ত "উদাহরণ" শব্দের ব্যুৎপত্তির ব্যাখ্যা করিয়া তদ্দ্বারা সামান্য লক্ষণও ব্যক্ত করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, "উদাহরণ" শব্দের দৃষ্টান্ত

অর্থ প্রসিদ্ধ হইলেও এবং মহর্ষি পূর্ব্বে হেতুলক্ষণসূত্রে সেই অর্থে "উদাহরণ" শব্দের প্রয়োগ করিলেও এই সূত্রে "উদাহরণ" শব্দের দ্বারা তৃতীয় অবয়ব উদাহরণ-বাক্য বুঝিতে হইবে। কারণ, তাহাই এখানে লক্ষ্য। "উদাহ্রিয়তে ধর্ম্ময়োঃ সাধ্য-সাধনভাবো যেন বাক্যেন" এইরূপ ব্যুৎপত্তিবশতঃ "উদাহরণ" শব্দের দ্বারা সেই বাক্য বুঝা যায়। সুতরাং ন্যায়বাক্যে ধর্ম্মদ্বয়ের সাধ্য-সাধনভাব-প্রদর্শক বাক্যত্বই উদাহরণ-বাক্যের সামান্য লক্ষণ, ইহাও উহার দ্বারা সূচিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। বাচস্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন,—"সমাখ্যানির্ব্বচনসামর্থ্যাৎ সামান্যলক্ষণমপ্যনেন সূচিতমিত্যাশয়বতা ভাষ্যকৃতা সমাখ্যানিরুক্তিঃ কৃতা।" "উদাহরণ" এই সমাখ্যার অর্থাৎ নামের ব্যুৎপত্তি-প্রদর্শনই এখানে ভাষ্যকারের "সমাখ্যানিরুক্তি"।

কিন্তু মহর্ষি এই সূত্রে বলিয়াছেন,—**"দৃষ্টান্ত উদাহরণং"**। উহার দ্বারা দৃষ্টান্তপদার্থ ই উদাহরণ, ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু যাহা দৃষ্টান্তপদার্থ, তাহা বাক্য না হওয়ায় তাহাকে কিরূপে তৃতীয় অবয়ব "উদাহরণ" বলা যায়? ইহার সমাধানের জন্য প্রাচীনকালে অনেক বিবাদ ও মতভেদ হইয়াছে। কোন সম্প্রদায় এখানে অন্যরূপ সূত্র-পাঠ কল্পনা করিয়াছেন এবং অন্য সম্প্রদায় সেই সূত্রপাঠের খণ্ডন করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর তাহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—অস্মাকন্তু নায়ং সূত্রপাঠস্তস্মান্নায়ং দোষঃ।" তবে উক্ত সূত্রে মহর্ষি দৃষ্টান্ত-পদার্থকে কিরূপে উদাহরণবাক্য বলিয়াছেন, এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—"নৈষঃ দোষঃ বচনবিশেষণত্বেন দৃষ্টান্তস্যোপাদানান্ন স্বতন্ত্রো দৃষ্টান্ত উদাহরণং, কিন্তু সাধ্য-সাধর্ম্ম্যাত্তদ্ধর্ম্মভাবিত্বে সত্যভিধীয়মান ইতি।" তাৎপর্য্য এই যে, মহর্ষি এই সূত্রে "দৃষ্টান্ত" শব্দের দ্বারা স্বতন্ত্র দৃষ্টান্ত-পদার্থের গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বচনের বিশেষণরূপে উহার গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ কিরূপ বচন বা বাক্য উদাহরণ হইবে, ইহা বলিতেই দৃষ্টান্ত-পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ন্যায়প্রয়োগস্থলে "অভিধীয়মান" বা কথ্যমান দৃষ্টান্তই উক্ত দৃষ্টান্ত-শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। তাহা হইলে প্রকরণানুসারে ফলতঃ বুঝা যায় যে, দৃষ্টান্ত-পদার্থের বোধক বাক্যবিশেষই তৃতীয় অবয়ব "উদাহরণ"। কিরূপ দৃষ্টান্তের বোধক বাক্য **"সাধর্ম্ম্যোদাহরণ"**, ইহা ব্যক্ত করিতেই মহর্ষি বলিয়াছেন,—**"সাধ্য-সাধর্ম্ম্যাত্তদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্তঃ।"**

ভাষ্যকার সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—**"সাধ্যেন সাধর্ম্ম্যং সমানধর্ম্মতা"** ইত্যাদি। সমানো ধর্ম্মো যস্য, এইরূপ বিগ্রহে "সমানধর্ম্মা"

এইরূপ পদও হয়। সুতরাং 'সমানধর্ম্মণো ভাবঃ' এই অর্থে নিষ্পন্ন "সমানধর্ম্মতা" এই পদের দ্বারা সমানধর্ম্ম বুঝা যায়। ইহাই সূত্রোক্ত "সাধর্ম্ম্য" শব্দের অর্থ। সূত্রে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ এখানে ব্যাপ্যত্বরূপ প্রযোজকত্ব। অর্থাৎ সাধ্য ধর্ম্মীর সহিত দৃষ্টান্ত-পদার্থের যে সাধর্ম্ম্য তদ্ধর্ম্মের ব্যাপ্য, সেই সাধর্ম্ম্যই এই সূত্রে "সাধ্যসাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার উক্তরূপ প্রযোজক অর্থে "কারণ" শব্দের প্রয়োগ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—**"সাধ্যসাধর্ম্ম্যাৎ কারণাৎ।"** বাচস্পতি মিশ্র ইহা সুব্যক্ত করিয়াছেন। সূত্রোক্ত **"তদ্ধর্ম্মভাবী"** এই পদের ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, সাধ্য পদার্থ দ্বিবিধ। ধর্ম্মিবিশিষ্ট ধর্ম্মকেও সাধ্য বলে এবং ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীকেও সাধ্য বলে। কিন্তু এই সূত্রে "তদ্" শব্দের দ্বারা শেষোক্ত সাধ্যই বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন,—**"পৃথগ্‌ধর্ম্মবচনাৎ"।** ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, এই সূত্রে প্রথমে "সাধ্য" শব্দের দ্বারা ধর্ম্মরূপ সাধ্যই গৃহীত হইলে, পরে "তদ্ভাবী" এই পদ বলিলেই 'তদ্' শব্দের দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত সাধ্য ধর্ম্ম বুঝা যায়। কিন্তু মহর্ষি যখন 'তদ্' শব্দের পরে আবার 'ধর্ম্ম' শব্দের প্রয়োগ করিয়া **"তদ্ধর্ম্মভাবী"** বলিয়াছেন, তখন বুঝা যায় যে, তিনি উক্ত 'তদ্' শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সাধ্য ধর্ম্মীই গ্রহণ করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"তস্য ধর্ম্মস্তদ্ধর্ম্মঃ, তস্য সাধ্যস্য।"

ভাষ্যকার পরে "তদ্ধর্ম্মভাবী" এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"তদ্ধর্ম্মস্য ভাবস্তদ্ধর্ম্মভাবঃ, স যস্মিন্ দৃষ্টান্তে বর্ত্ততে, স দৃষ্টান্তঃ সাধ্যসাধর্ম্ম্যাত্তদ্ধর্ম্মভাবী ভবতি।" উদ্দ্যোতকর উক্ত 'ভবতি' এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন "বিদ্যতে"। বাচস্পতি মিশ্র ইহার কারণ বলিয়াছেন যে, ভূ ধাতুর উৎপত্তি অর্থ এখানে উপপন্ন হয় না, এ জন্য উহার বিদ্যমানত্ব অর্থই এখানে বুঝিতে হইবে। অবশ্য বিদ্যমানত্ব অর্থেও ভূ ধাতুর প্রয়োগ হওয়ায় উক্ত বিষয়ে বিবাদের কারণ নাই। কিন্তু এই সূত্রোক্ত "তদ্ধর্ম্মভাবী" এই পদের ব্যাখ্যায় অনেক বিবাদ ও মতভেদ হইয়াছে। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় "ভাব" শব্দ ব্যর্থ বুঝিয়া বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"তং সাধ্যরূপং ধর্ম্মং ভাবয়তি তদ্ধর্ম্মভাবী।" কিন্তু পরিবর্ত্তী সূত্র-বার্ত্তিকে উদ্দ্যোতকর অন্য সম্প্রদায়ের প্রতিবাদের খণ্ডন করিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"তদ্ধর্ম্মশ্চাসৌ ভাবশ্চেতি তদ্ধর্ম্মভাবঃ, স যস্যাস্তি স ভবতি তদ্ধর্ম্মভাবী।" উদ্দ্যোতকরের কথা এই যে, সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তপদার্থে যে তদ্ধর্ম্মবত্তা উক্ত হইয়াছে, সেই তদ্ধর্ম্ম ভাবরূপ অর্থাৎ বিধীয়মান, কিন্তু

নিষিধ্যমান তদ্ধর্ম্ম নহে, ইহাই ব্যক্ত করিতে উক্ত "ভাব" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত স্থালী প্রভৃতি সাধর্ম্ম্য-দৃষ্টান্ত-পদার্থে অনিত্যত্বরূপ যে তদ্ধর্ম্ম, তাহা ভাবরূপ অর্থাৎ বিধীয়মান তদ্ধর্ম্ম। উদ্দ্যোতকরের ব্যাখ্যানুসারেই বাচস্পতি মিশ্রও ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"তদনিত্যত্বং তদ্ধর্ম্মঃ, স এব ভাবস্তদ্ধর্ম্মভাবঃ, সোঽস্যাস্তীতি তদ্ধর্ম্মভাবী, স্থাল্যাদিরনিত্যত্বধর্ম্মবানিতি যাবৎ।" কিন্তু ভাষ্যকার উক্তরূপ ব্যাখ্যা না করিলেও বাচস্পতি মিশ্র উক্তরূপ ব্যাখ্যার প্রারম্ভে বলিয়াছেন,—"সাধ্যেন সাধর্ম্ম্যমিত্যাদি ভাষ্যং, তস্যার্থঃ।" সুধীগণ ভাষ্যাদি দেখিয়া এ বিষয়ে বিচার করিবেন।

এখন পূর্ব্বোক্ত স্থলে **"সাধর্ম্ম্যোদাহরণবাক্য"** কিরূপ, তাহা বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার পরে নিগমন-সূত্র-ভাষ্যে বলিয়াছেন,—"উৎপত্তিধর্ম্মকং স্থাল্যাদিদ্রব্যমনিত্যমিত্যুদাহরণং।" তাহার পূর্ব্বে উপনয়-সূত্র-ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন,—"স্থাল্যাদিদ্রব্যমুৎপত্তিধর্ম্মকমনিত্যং দৃষ্টং।"* 'বার্ত্তিক'কারও এখানে পরে বলিয়াছেন,—"উদাহরণং স্থাল্যাদিদ্রব্যমিতি।" তদনুসারে আমরা বুঝিতে পারি যে, ভাষ্যকারই এখানে পরে বলিয়াছেন,—"স্থাল্যাদিদ্রব্যমুৎপত্তি-ধর্ম্মকমনিত্যং দৃষ্টং।" তাই উক্ত বাক্যে "উৎপত্তিধর্ম্মক" শব্দের অর্থ কি, এবং উৎপত্তিধর্ম্মক হইলে তাহা অনিত্য হইবে কেন, ইহা বক্তব্য হওয়ায় পরে তিনি বলিয়াছেন,—**"তত্র যদুৎপদ্যতে, তদুৎপত্তিধর্ম্মকং"** ইত্যাদি। অর্থাৎ যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা পূর্ব্বে কোনরূপে বিদ্যমান থাকে না এবং কোন কালে তাহার অত্যন্ত বিনাশ হয়, এ জন্য তাহা অনিত্য। কিন্তু ধ্বংসনামক অভাব-পদার্থ উৎপন্ন হইলেও তাহার বিনাশ নাই। সুতরাং সমবায়িকারণে যাহা

---

* মহর্ষির সূত্রানুসারে ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণের মতে উদাহরণ-বাক্যে সর্ব্বত্রই দৃষ্টান্তবোধক শব্দ প্রয়োগ কর্ত্তব্য, ইহা তাঁহাদিগের প্রদর্শিত উদাহরণ-বাক্য দ্বারা বুঝা যায়। 'তাৎপর্য্যটীকা'য় দেখা যায়,—"তদ্যথা অনিত্যঃ শব্দঃ, উৎপত্তিমত্ত্বাৎ, ঘটবদিতি। যো যোঽনিত্যঃ স স উৎপত্তিমান, যথা ঘট ইতি।" কিন্তু এখানে "যো য উৎপত্তিমান্, সোঽনিত্যঃ" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বুঝা যায়। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও বলিয়াছেন,—"বীপ্সা চ যৎপদে ন তু তৎপদেঽপি।" কিন্তু তিনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—"দৃষ্টান্তপ্রয়োগস্য সাময়িকত্বেনাসার্ব্বত্রিকত্বাৎ।" অর্থাৎ তাঁহার মতে সময়বিশেষে উদাহরণ-বাক্যে দৃষ্টান্তবোধক শব্দ প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু উহা সর্ব্বত্র অবশ্যকর্ত্তব্য নহে। কারণ, 'যো যো ধূমবান, স বহ্নিমান্', এই পর্য্যন্ত বাক্য বলিলেই তদ্দ্বারা ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিবোধ হয়। এই নব্যমতানুসারেই বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—"দৃষ্টান্তো দৃষ্টান্তবচনং দৃষ্টান্তকথনযোগ্যাবয়ব ইত্যর্থঃ" ইত্যাদি।

উৎপন্ন হয় অর্থাৎ জন্য ভাবপদার্থমাত্রই এখানে "উৎপত্তিধর্ম্মক" শব্দের দ্বারা ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বুঝা যায়। জন্য ভাবপদার্থমাত্রেই উক্তরূপ অনিত্যত্ব থাকায় উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব সাধন এবং অনিত্যত্ব সাধ্য, অর্থাৎ উক্ত উভয় ধর্ম্মের ব্যাপ্যব্যাপক-ভাব স্বীকার্য্য। সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত কোন পদার্থে ব্যবস্থিত উক্ত ব্যাপ্যব্যাপক-ভাবের উপলব্ধি হয়। অর্থাৎ স্থালী প্রভৃতি কোন সাধর্ম্ম্য-দৃষ্টান্তে উক্ত ধর্ম্মদ্বয়ের সেই ব্যাপ্যব্যাপক-ভাবের উপলব্ধি করায় শব্দেও তাহার অনুমান করে। তাহার ফলে পরে শব্দে অনিত্যত্বরূপ সাধ্য ধর্ম্মের অনুমিতি জন্মে। পরবর্ত্তী সূত্র-ভাষ্যে ইহা ব্যক্ত হইবে ॥৩৬॥

সূত্র। তদ্বিপর্য্যয়াদ্বা বিপরীতং ॥৩৭॥

অনুবাদ—'তদ্বিপর্য্যয়'প্রযুক্ত অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত সাধ্যসাধর্ম্ম্যের বিপর্য্যয় বা অভাবরূপ সাধ্যবৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত 'বিপরীত' অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত 'তদ্ধর্ম্মভাবী'র বিপরীত (অতদ্ধর্ম্মভাবী) দৃষ্টান্তও অর্থাৎ তাদৃশ দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষও উদাহরণ (বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ)।

ভাষ্য। দৃষ্টান্ত উদাহরণমিতি প্রকৃতং। সাধ্যবৈধর্ম্ম্যাদতদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণমিতি। অনিত্যঃ শব্দঃ, উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ, অনুৎপত্তিধর্ম্মকং নিত্যমাত্মাদি। সোঽয়মাত্মাদির্দৃষ্টান্তঃ সাধ্যবৈধর্ম্ম্যাদনুৎপত্তিধর্ম্মকত্বাদতদ্ধর্ম্মভাবী, যোঽসৌ সাধ্যস্য ধর্ম্মোঽনিত্যত্বং, স তস্মিন্ ন ভবতীতি। অত্রাত্মাদৌ দৃষ্টান্তে উৎপত্তিধর্ম্মকত্বস্যাভাবাদনিত্যত্বং ন ভবতীতি উপলভমানঃ শব্দে বিপর্য্যয়মনুমিনোতি, উৎপত্তিধর্ম্মকত্বস্য ভাবাদনিত্যঃ শব্দ ইতি।

সাধর্ম্ম্যোক্তস্য হেতোঃ সাধ্যসাধর্ম্ম্যাৎ তদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্। বৈধর্ম্ম্যোক্তস্য হেতোঃ সাধ্যবৈধর্ম্ম্যাদতদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্। পূর্ব্বস্মিন্ দৃষ্টান্তে যৌ তৌ ধর্ম্মৌ সাধ্যসাধনভূতৌ পশ্যতি, সাধ্যেঽপি তয়োঃ সাধ্যসাধনভাবমনুমিনোতি। উত্তরস্মিন্ দৃষ্টান্তে যয়োর্ধর্ম্ময়োরেকস্যাভাবাদিতরস্যাভাবং পশ্যতি, তয়োরেকস্য ভাবাদিতরস্য ভাবং সাধ্যেঽনু-

মিনোতীতি।* তদেতদ্ধেত্বাভাসেষু ন সম্ভবতীত্যহেতবো হেত্বাভাসাঃ। তদিদং হেতূদাহরণয়োঃ সামর্থ্যং পরমসূক্ষ্মং দুঃখবোধং পণ্ডিতরূপবেদনীয়মিতি।

অনুবাদ—"দৃষ্টান্ত উদাহরণম্" এই বাক্য প্রকৃত অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্র হইতে অনুবৃত্ত বুঝিতে হইবে। (সূত্রার্থ) সাধ্যধর্ম্মীর বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত "অতদ্ধর্ম্মভাবী" দৃষ্টান্ত অর্থাৎ তাদৃশ দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যও উদাহরণ। যথা—"অনিত্যঃ শব্দঃ, উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ, অনুৎপত্তিধর্ম্মকং নিত্যমাত্মাদি"। [অর্থাৎ উক্ত স্থলে "উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ" এই হেতুবাক্যের পরে "অনুৎপত্তিধর্ম্মকং নিত্যমাত্মাদি" এইরূপ বাক্য বলিলে তাহা বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ হইবে] সেই এই আত্মাদি দৃষ্টান্ত সাধ্যধর্ম্মীর অর্থাৎ অনিত্যত্ববিশিষ্ট শব্দের বৈধর্ম্ম্য অনুৎপত্তিধর্ম্মকত্বপ্রযুক্ত "অতদ্ধর্ম্মভাবী"। (কারণ) এই যে সাধ্যধর্ম্মীর অনিত্যত্বরূপ ধর্ম্ম, তাহা সেই আত্মাদি দৃষ্টান্তে থাকে না। এই স্থলে আত্মাদি দৃষ্টান্তে উৎপত্তিধর্ম্মকত্বের অভাবপ্রযুক্ত অনিত্যত্বের অভাব (নিত্যত্ব) থাকে, ইহা উপলব্ধি করতঃ অর্থাৎ উক্তরূপ নিশ্চয়ের ফলে শব্দে বিপর্য্যয়কে অর্থাৎ নিত্যত্বের অভাব অনিত্যত্বকে অনুমান করে—উৎপত্তিধর্ম্মকত্বের সত্তাপ্রযুক্ত শব্দ অনিত্য।

সাধর্ম্ম্যোক্ত অর্থাৎ সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত উক্ত হেতুবাক্যের সম্বন্ধে সাধ্যধর্ম্মীর সহিত সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত 'তদ্ধর্ম্মভাবী' দৃষ্টান্ত অর্থাৎ তদ্বোধক বাক্য উদাহরণ হইবে। বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত উক্ত হেতুবাক্যের সম্বন্ধে সাধ্যধর্ম্মীর বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত 'অতদ্ধর্ম্মভাবী' দৃষ্টান্ত অর্থাৎ তদ্বোধক বাক্য উদাহরণ হইবে। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তপদার্থে সেই যে ধর্ম্মদ্বয়কে সাধ্যসাধনভূত দর্শন করে অর্থাৎ সেই উভয় ধর্ম্মের সাধ্যসাধনভাবের

---

* পূর্ব্বপ্রচলিত পুস্তকে এখানে "তয়োরেকস্যাভাবাদিতরস্যাভাবং সাধ্যেঽনুমিনোতি" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু উক্ত স্থলে সাধ্য ধর্ম্মী শব্দে উৎপত্তিধর্ম্মকত্বের অভাবপ্রযুক্ত অনিত্যত্বের অভাবের অনুমান হয়, ইহা বলাই যায় না। কিন্তু উৎপত্তিধর্ম্মকত্বের সত্তাপ্রযুক্ত অনিত্যত্বের অনুমান হয়, ইহাই বক্তব্য। তাই ভাষ্যকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—"শব্দে বিপর্য্যয়মনুমিনোতি উৎপত্তিধর্ম্মকত্বস্য ভাবাদনিত্যঃ শব্দ ইতি।" সুতরাং এখানেও "তয়োরেকস্য ভাবাদিতরস্য ভাবং সাধ্যেঽনুমিনোতি" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বুঝা যায়। আর ভাষ্যশেষে "পণ্ডিতরূপবেদনীয়ং" এইরূপ পাঠই প্রকৃত। বাচস্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন, "ভাষ্যে পণ্ডিতরূপবেদনীয়মিতি, "প্রশস্তপণ্ডিতরূপবেদনীয়মিত্যর্থঃ।" "প্রশংসায়াং রূপং" এই পাণিনি-সূত্রানুসারে "পণ্ডিত" শব্দের উত্তর প্রশংসার্থে "রূপ" প্রত্যয়ে "পণ্ডিতরূপ" শব্দের দ্বারা প্রশস্ত পণ্ডিত বুঝা যায়।

উপলব্ধি করে, সাধ্যধর্ম্মীতেও সেই উভয় ধর্ম্মের সাধ্যসাধনভাবকে অনুমান করে। শেষোক্ত দৃষ্টান্তে যে ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একের অভাবপ্রযুক্ত অপরের অভাবকে উপলব্ধি করে, সেই ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একের সত্তাপ্রযুক্ত অপরের সত্তাকে সাধ্যধর্ম্মীতে অনুমান করে। সেই ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত উদাহরণবোধ্য সাধ্যসাধনত্ব "হেত্বাভাস"সমূহে সম্ভব হয় না। এ জন্য "হেত্বাভাস"সমূহ অহেতু। হেতু ও উদাহরণের সেই এই অতিসূক্ষ্ম (অর্থাৎ) দুর্ব্বোধ সামর্থ্য প্রশস্ত-পণ্ডিতগণ-বোধ্য।

টিপ্পনী—এই সূত্রে সমুচ্চয়ার্থ "বা" শব্দ এবং পরে "বিপরীতং" এইরূপ ক্লীবলিঙ্গ প্রয়োগের দ্বারা বুঝা যায় যে, মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা দ্বিতীয় প্রকার উদাহরণের লক্ষণ বলিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—"**দৃষ্টান্ত উদাহরণমিতি প্রকৃতং।**" অর্থাৎ এই সূত্রে পূর্ব্বসূত্র হইতে "দৃষ্টান্ত উদাহরণং" এই বাক্য অনুবৃত্ত বুঝিতে হইবে। এবং "বিপরীতমুদাহরণং" এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। পূর্ব্বসূত্রোক্ত "**তদ্বিপর্য্যয়াৎ**" এই পদের ব্যাখ্যা "সাধ্যবৈধর্ম্ম্যাৎ"। "বিপরীতং" এই পদের ব্যাখ্যা "অতদ্ধর্ম্মভাবী"। ভাষ্যকার ইহাই ব্যক্ত করিতে পরে বলিয়াছেন,—"**সাধ্যবৈধর্ম্ম্যাদতদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণমিতি।**" ভাষ্যকার পরে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত স্থলেই এই সূত্রোক্ত দ্বিতীয় প্রকার বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন,—"**অনুৎপত্তিধর্ম্মকং নিত্যমাত্মাদি।**" পরে উক্ত স্থলে আত্মাদি নিত্য পদার্থ কিরূপে বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্ত হয়, ইহাই বুঝাইতে বলিয়াছেন, "সোহয়মাত্মাদিদৃষ্টান্তঃ" ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত স্থলে "উৎপত্তিধর্ম্মকত্বরূপ" যে হেতুপদার্থ, তাহাই পূর্ব্বসূত্রোক্ত 'সাধ্যসাধর্ম্ম্য'। সুতরাং তাহার 'বিপর্য্যয়' অর্থাৎ অভাব যে অনুৎপত্তিধর্ম্মকত্ব, তাহা উক্ত স্থলে 'সাধ্যবৈধর্ম্ম্য'। আত্মাদি অনুৎপন্ন পদার্থে সেই অনুৎপত্তিধর্ম্মকত্ব থাকায় তাহা পূর্ব্বসূত্রোক্ত 'তদ্ধর্ম্মভাবী'র বিপরীত অর্থাৎ 'অতদ্ধর্ম্মভাবী'। কারণ, উক্ত স্থলে সাধ্যধর্ম্মী অনিত্যত্ববিশিষ্ট শব্দের ধর্ম্ম যে অনিত্যত্ব, তাহা আত্মাদি পদার্থে নাই। কারণ, অনুৎপত্তিধর্ম্মক ভাবপদার্থমাত্রই নিত্য। সুতরাং উক্ত স্থলে সেই আত্মাদি বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্তের বোধক যে পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্য, তাহা 'বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ'বাক্য হইবে।

ভাষ্যকার পরে উক্তরূপ উদাহরণ-বাক্যের চরম ফল প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,—"**অত্রাত্মাদৌ দৃষ্টান্তে**" ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত

স্থলে আত্মাদি দৃষ্টান্তপদার্থে উৎপত্তিধর্ম্মকত্বের অভাবপ্রযুক্ত অনিত্যত্বের অভাব বুঝিলে উৎপত্তিধর্ম্মকত্বের অভাব যে, অনিত্যত্বের অভাবের ব্যাপ্য অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থে উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব নাই, তাহাতে অনিত্যত্ব নাই, এইরূপ নিশ্চয় জন্মে। উহাকে 'ব্যতিরেকব্যাপ্তিনিশ্চয়' বলে। "ব্যতিরেক" শব্দের অর্থ অভাব। উৎপত্তিধর্ম্মকত্বের অভাবে অনিত্যত্বের অভাবের যে ব্যাপ্তি, তাহা **'ব্যতিরেকব্যাপ্তি'**। ভাষ্যে **"উপলভমানঃ"** এই পদে হেত্বর্থে 'শানচ্' প্রত্যয়ের দ্বারা উক্তরূপ ব্যতিরেকব্যাপ্তিনিশ্চয় উক্ত স্থলে শব্দে অনিত্যত্বের অনুমিতির হেতু, ইহা ব্যক্ত হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,— **"শব্দে বিপর্য্যয়মনুমিনোতি—উৎপত্তিধর্ম্মকত্বস্য ভাবাদনিত্যঃ শব্দ ইতি।"** ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যায় যে, নিত্যপদার্থমাত্রই অনুৎপত্তিধর্ম্মক, এইরূপ বোধ ব্যতীত আত্মাদি পদার্থে উৎপত্তিধর্ম্মকত্বের অভাবপ্রযুক্ত অনিত্যত্ব নাই, ইহা বুঝা যায় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ-বাক্যের দ্বারা যাহার উক্তরূপ ব্যতিরেকব্যাপ্তিনিশ্চয় জন্মে, তাহার অনুৎপত্তিধর্ম্মকত্ব যে নিত্যত্বের ব্যাপক পদার্থ, এইরূপ জ্ঞান অবশ্যই জন্মে। তাহা হইলে শব্দে সেই অনুৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বের অভাব যে উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব অর্থাৎ যাহা নিত্যত্বের ব্যাপক পদার্থের অভাব, তৎপ্রযুক্ত নিত্যত্বের অভাব (অনিত্যত্ব) অনুমানসিদ্ধ হইবে। কারণ, ব্যাপক পদার্থের অভাব থাকিলে সেই হেতুর দ্বারা তাহার ব্যাপ্য পদার্থের অভাব সিদ্ধ হয়, ইহা সর্ব্বসম্মত।

কোন সম্প্রদায়ের মতে পূর্ব্বোক্ত স্থলে অনিত্যত্বরূপ সাধ্যধর্ম্মের অভাবে উৎপত্তিধর্ম্মকত্বরূপ হেতুর অভাবের যে সামানাধিকরণ্যজ্ঞান অর্থাৎ নিত্য পদার্থে উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব নাই, এইরূপ যে জ্ঞান, তাহাকে 'ব্যতিরেক-সহচার-জ্ঞান' বলে। সেই সহচারজ্ঞানজন্য উক্ত স্থলে হেতুপদার্থে সাধ্যধর্ম্মের অন্বয়ব্যাপ্তিরই জ্ঞান জন্মে এবং পরে সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্যই শব্দে অনিত্যত্বের অনুমিতি জন্মে। "কেবলান্বয়ি-দীধিতি"র টীকায় জগদীশ তর্কালঙ্কার উক্ত মতকে আচার্য্যমত বলিয়াছেন এবং পরে উক্ত মতে 'কেবলব্যতিরেকী' অনুমানের লক্ষণ বলিয়াছেন, —"ব্যতিরেকসহচারমাত্রগৃহীতান্বয়ব্যাপ্তিকত্বং কেবলব্যতিরেকিত্বম্।" কোন সম্প্রদায়ের মতে "ব্যতিরেকব্যাপ্ত্যা অন্বয়ব্যাপ্তিমনুমায় যত্রানুমিতিঃ স এব ব্যতিরেকীত্যুচ্যতে।" অর্থাৎ ব্যতিরেকব্যাপ্তির নিশ্চয় হইলে তদ্দ্বারা প্রকৃত হেতুপদার্থে প্রকৃত সাধ্যধর্ম্মের অন্বয়ব্যাপ্তির অনুমান হওয়ায় পরে সেই অন্বয়-ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুমত্তার নিশ্চয়-(অন্বয়পরামর্শ) জন্যই অনুমিতি জন্মে এবং সেই

স্থলীয় অনুমানই "ব্যতিরেকী" এই নামে কথিত হয়। কিন্তু গঙ্গেশ উপাধ্যায় "অনুমানচিন্তামণি"র 'ব্যতিরেক্যনুমান' গ্রন্থে উক্ত প্রাচীন মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যে স্থলে অন্বয়দৃষ্টান্ত নাই, সেই স্থলে ব্যতিরেক-দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রকৃত হেতুপদার্থে সাধ্যধর্ম্মের ব্যতিরেকব্যাপ্তিনিশ্চয়জন্যই অনুমিতি জন্মে। সাধ্যধর্ম্মের অভাবের ব্যাপক যে অভাব, তাহার প্রতিযোগিত্বই সেই 'ব্যতিরেকব্যাপ্তি'। যে সমস্ত পদার্থ সেই সাধ্যধর্ম্মশূন্য, তাহা সেই হেতুশূন্য, ইহা বুঝিলে সেই হেতুর অভাব যে, সেই সাধ্যাভাবের ব্যাপক, ইহা নিশ্চিত হয়। সেই হেতুর অভাবের প্রতিযোগিত্ব, সেই হেতুপদার্থেই থাকায় তাহাতে উক্তরূপ ব্যতিরেকব্যাপ্তির নিশ্চয় জন্মে।

বাচস্পতি মিশ্র এখানে বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকারোক্ত **'অন্বয়ব্যতিরেকী'** হেতু স্থলে **'ব্যতিরেকী'** উদাহরণ সম্ভব হইলেও কেবল **'অন্বয়ী'** উদাহরণই বক্তব্য। কারণ, সরল পথে যাহা সিদ্ধ হয়, তাহা বক্র পথে সিদ্ধ করা অনুচিত। তাই বলিয়াছেন,—"ঋজুমার্গেণ সিধ্যতোঽর্থস্য বক্রেণ সাধনাযোগাৎ।" কিন্তু উক্ত যুক্তি সর্ব্বসম্মত নহে। এ বিষয়ে ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য পূর্ব্বে (৩০৩-৩০৪ পৃঃ) লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে আত্মাদি বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তে উৎপত্তিধর্ম্মকত্বরূপ হেতুর অভাবপ্রযুক্ত অনিত্যত্বরূপ সাধ্যধর্ম্মের অভাব কেন বলিয়াছেন, ইহা অবশ্য চিন্তনীয়। বাচস্পতি মিশ্র ঐ কথারও উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—"তচ্চাযুক্তং"। কারণ, হেতুপদার্থ সাধ্যধর্ম্মের অন্বয়ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট হইলেও সেই হেতুশূন্য পদার্থমাত্রই সাধ্যধর্ম্মশূন্য, ইহা সর্ব্বত্র বলা যায় না। সুতরাং যে সমস্ত পদার্থে সাধ্যধর্ম্ম নাই, তাহাতে প্রকৃত হেতুপদার্থ নাই, এইরূপেই ব্যতিরেকদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে হইবে। অর্থাৎ যাহাতে সাধ্যধর্ম্মের অভাবপ্রযুক্ত হেতুর অভাব থাকে, তাহাই বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্ত বা ব্যতিরেকদৃষ্টান্ত, ইহাই বক্তব্য। উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে জয়ন্ত ভট্টও এই সূত্রে "তদ্বিপর্য্যায়াৎ" এই পদের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"সাধ্যাভাবাৎ"। এবং "বিপরীত" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—হেতুশূন্য।*

কিন্তু ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বসূত্রে **'তদ্ধর্ম্ম'** শব্দের দ্বারা

---

* "তদিতি সাধ্যধর্ম্মপরামর্শঃ। তচ্চ যদ্যপি পূর্ব্বসূত্রে লিঙ্গসামান্যং, তথাপাত্র সাধ্যসাধর্ম্ম্যং দ্রষ্টব্যং। 'তদ্বিপর্য্যয়াৎ' সাধ্যাভাবাদ্বিপরীতোঽতদ্ধর্ম্মভাবী সাধনরহিতো যো দৃষ্টান্তঃ স বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্তঃ পূর্ব্ববদ্বচসঃ কর্ম্মতামাপদ্যমানো বৈধর্ম্ম্যোদাহরণং ভবতি।"— 'ন্যায়মঞ্জরী', ৫০৯ পৃঃ।

সাধ্যধর্ম্মই গৃহীত হইয়াছে, ইহা সর্ব্বসম্মত। সুতরাং **'তদ্ধর্ম্মভাবী'** এই পদের দ্বারা সেই সাধ্যধর্ম্মবিশিষ্ট, ইহাই বুঝা যায়। তাহা হইলে এই সূত্রে **"বিপরীত"** শব্দের দ্বারা হেতুশূন্য, ইহা বুঝা যায় না। কিন্তু 'তদ্ধর্ম্মভাবী'র বিপরীত **'অতদ্ধর্ম্মভাবী'** অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মশূন্য, ইহাই বুঝা যায়। সুতরাং এই সূত্রে **"তদ্বিপর্য্যয়াৎ"** এই পদের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত সাধ্যসাধর্ম্ম্যরূপ হেতুর বিপর্য্যয় অর্থাৎ অভাবপ্রযুক্ত, ইহাই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে এই সূত্রের দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রকৃত হেতুপদার্থের বিপর্য্যয় বা অভাবপ্রযুক্ত যাহা 'তদ্ধর্ম্মভাবী'র **'বিপরীত'** ('অতদ্ধর্ম্মভাবী') অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মশূন্য, তাহা বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত, সুতরাং সেইরূপ দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষ বৈধর্ম্ম্যোদাহরণবাক্য। তদনুসারেই ভাষ্যকার এখানে আত্মাদি বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্তকে উৎপত্তিধর্ম্মকত্বরূপ হেতুর অভাবপ্রযুক্ত অনিত্যত্বরূপ সাধ্যধর্ম্মশূন্য বলিয়াছেন। অবশ্য উক্ত স্থলে আত্মাদি দৃষ্টান্তে অনিত্যত্বের অভাবপ্রযুক্ত উৎপত্তিধর্ম্মকত্বের অভাব প্রদর্শন করিয়াও বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ বলা যায়; ভাষ্যকার তাহার নিষেধ করেন নাই। পরন্তু তিনি পরে বলিয়াছেন, "উত্তরস্মিন্ দৃষ্টান্তে যয়োর্দ্ধর্ম্ময়োরেকস্যাভাবাদিতরস্যাভাবং পশ্যতি, তয়োরেকস্য ভাবাদিতরস্য ভাবং সাধ্যেঽনুমিনোতীতি।" এখানে শেষোক্ত "এক" শব্দের দ্বারা হেতুপদার্থই গৃহীত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রথমোক্ত "এক" শব্দের দ্বারা যথাসম্ভব হেতু বা সাধ্যধর্ম্ম, এই উভয়ই গৃহীত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। নচেৎ ভাষ্যকার এখানে "যয়োর্দ্ধর্ম্ময়োঃ সাধনস্যাভাবাৎ সাধ্যস্যাভাবং পশ্যতি" এইরূপ বলেন নাই কেন, ইহা চিন্তা করা আবশ্যক।

বস্তুতঃ যে স্থলে সাধ্যধর্ম্ম ও হেতু সমদেশবর্ত্তী, সেই স্থলীয় হেতুকে 'সমব্যাপ্ত' হেতু বলে। সেইরূপ স্থলে যে সমস্ত পদার্থ সেই সাধ্যধর্ম্মশূন্য, তাহা প্রকৃত হেতুশূন্য, ইহা যেমন বলা যায়, তদ্রূপ যে সমস্ত পদার্থ সেই হেতুশূন্য, তাহা সেই সাধ্যধর্ম্মশূন্য, ইহাও বলা যায়। ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত স্থলে উৎপত্তিধর্ম্মকত্বরূপ যে হেতু, তাহা অনিত্যত্বের **'সমব্যাপ্ত'**। কারণ, যেমন উৎপত্তিধর্ম্মক বস্তুমাত্রই অনিত্য, তদ্রূপ অনিত্য বস্তুমাত্রই উৎপত্তিধর্ম্মক। সমবায়িকারণজন্যত্বই এখানে উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব এবং বিনাশিভাবত্বই অনিত্যত্ব। প্রশস্তপাদভাষ্যের **"সূক্তি"** টীকায় জগদীশ তর্কালঙ্কারও ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"কার্য্যত্বং সমবায়াবচ্ছিন্নজন্যত্বং, অনিত্যত্বং বিনাশিভাবত্বং।" সুতরাং আত্মাদি নিত্য পদার্থে উৎপত্তিধর্ম্মকত্বের অভাবপ্রযুক্ত অনিত্যত্ব নাই অর্থাৎ নিত্যত্ব আছে,

ইহাও অবশ্য বলা যায়। তাই ভাষ্যকার মহর্ষির এই সূত্রের পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যানুসারে তাহাই বলিয়াছেন এবং পূর্ব্বে উদাহরণবাক্য বলিয়াছেন,— **'অনুৎপত্তিধর্ম্মকং নিত্যমাত্মাদি।'** কিন্তু **'বিষমব্যাপ্ত'** হেতু স্থলে ঐরূপ বলা যায় না। যেমন যে সমস্ত পদার্থ ধূমশূন্য, তাহা বহ্নিশূন্য, ইহা বলা যায় না। কিন্তু যে সমস্ত পদার্থ বহ্নিশূন্য, তাহা ধূমশূন্য বা বিশিষ্ট ধূমশূন্য, ইহাই বলা যায়। সুতরাং উক্তরূপ স্থলে বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে হইলে তাহাতে সাধ্যধর্ম্মের অভাবপ্রযুক্ত হেতুর অভাবই বলিতে হইবে। ভাষ্যকার তাহা ব্যক্ত না করিলেও পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে উহা তাঁহারও সম্মত বুঝা যায়। আর মহর্ষির এই সূত্রে সমুচ্চয়ার্থ 'বা' শব্দের দ্বারা তাহাও সূচিত হইয়াছে, ইহাও বুঝা যায়। সূত্রের দ্বারা বহু অর্থ সূচিত হয়, ইহা সূত্রের লক্ষণেও কথিত হইয়াছে। তদনুসারে বাচস্পতি মিশ্রও অন্যত্র বলিয়াছেন,—"সূত্রঞ্চ বহ্বর্থ-সূচনাদ্ভবতি।"—("ভামতী")।

ভাষ্যকার পরে যথাক্রমে দ্বিবিধ হেতুর সম্বন্ধে দ্বিবিধ উদাহরণের লক্ষণ ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রথমোক্ত দৃষ্টান্তে যে ধর্ম্মদ্বয়কে সাধ্যসাধনভাবাপন্ন দর্শন করে, **"সাধ্যেঽপি তয়োঃ সাধ্য-সাধনভাবমনুমিনোতি।"** ভাষ্যকারের এই কথার দ্বারা তাঁহার মত বুঝা যায় যে, পাকশালাদি কোন স্থানে প্রথমে ধূম ও বহ্নির দর্শন হইলে তখন সেই ধূমে সেই বহ্নিরই ব্যাপ্তিনিশ্চয় জন্মে। পরে পর্ব্বতে ধূম দর্শন করিলে সেই ধূমে পূর্ব্বদৃষ্ট ধূমের তুল্যতা বা সজাতীয়ত্বের প্রত্যক্ষ হওয়ায় সেই হেতুর দ্বারা অনুমানসিদ্ধ হয় যে, এই ধূমও বহ্নির সাধন বা ব্যাপ্য। পরে সেই ধূম হেতুর দ্বারা পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতি জন্মে। এইরূপ ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত স্থলেও প্রথমে স্থালী প্রভৃতি দৃষ্টান্তে অনিত্যত্ব ও উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বের সাধ্যসাধন ভাবের বোধ হইলে পরে **'সাধ্যেঽপি'** অর্থাৎ উক্ত স্থলে অনিত্যত্বরূপে সাধ্যধর্ম্মী শব্দেও তদ্গত অনিত্যত্ব ও উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব, এই ধর্ম্মদ্বয়ের সাধ্যসাধনভাবের অনুমান হয়। সুতরাং পরে শব্দে ঐ হেতুর দ্বারা অনিত্যত্বের অনুমিতি জন্মে। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি ঐরূপ কথা বলেন নাই। গঙ্গেশ উপাধ্যায় বিচারপূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন যে, প্রথমে **'অন্বয়দৃষ্টান্তে'** সামান্যব্যাপ্তিরই নিশ্চয় জন্মে। যেমন পাকশালাদি কোন স্থানে ধূমবিশেষ ও বহ্নিবিশেষের দর্শন হইলে সকল ধূমস্থ ধূমত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মের প্রত্যক্ষজন্য এবং সকল বহ্নিস্থ বহ্নিত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মের প্রত্যক্ষজন্য যথাক্রমে সমস্ত ধূম ও সমস্ত বহ্নিরই প্রত্যক্ষ

হওয়ায়* ধূমত্বরূপে ধূমমাত্রেই বহ্নিত্বরূপে বহ্নিসামান্যের অন্বয় ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ জন্মে। সুতরাং তখন পর্ব্বতীয় ধূমেও বহ্নির ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ হয়। পরে পর্ব্বতে ধূম দর্শন করিলে পূর্ব্বসংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়ায় তজ্জন্য সেই ধূমেও পূর্ব্বনিশ্চিত সামান্য ব্যাপ্তির স্মরণ হয়। সুতরাং তজ্জন্য পরে পর্ব্বতে সামান্যতঃ ধূম হেতুর দ্বারাই সামান্যতঃ বহ্নির অনুমিতি জন্মে। এ বিষয়ে বহু সূক্ষ্ম বিচার হইয়াছে। সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করা যায় না।

ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্তরূপে দ্বিবিধ উদাহরণ-বাক্যবোধ্য যে সাধ্য-সাধনত্ব, তাহা প্রকৃত হেতুপদার্থেই সম্ভব হয়, কিন্তু **'হেত্বাভাস'**-সমূহে অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ পঞ্চবিধ দুষ্ট হেতুতে সম্ভব হয় না। কারণ, বস্তুতঃ তাহা সাধ্যসাধনই হয় না। সুতরাং সেই সমস্ত 'হেত্বাভাসে' প্রকৃত হেতুর লক্ষণ না থাকায় কোন উদাহরণ-বাক্যের দ্বারাই তাহার হেতুত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব 'হেত্বাভাস'সমূহ অহেতু। ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, হেতু ও উদাহরণ-বাক্যের পূর্ব্বোক্ত এই অতিদুর্ব্বোধ সামর্থ্য অর্থাৎ ফলের সহিত সম্বন্ধ প্রশস্ত পণ্ডিতগণেরই বোধ্য। অর্থাৎ কিরূপে উহার দ্বারা চরম ফল সম্পন্ন হয়, ইহা সকলে বুঝিতে পারেন না। সুতরাং উহা সম্যক্ বুঝিবার জন্য বিশেষ প্রযত্ন কর্ত্তব্য। উদাহরণ-বাক্যের প্রয়োজনাদি বিষয়ে অন্যান্য কথা পরে ব্যক্ত হইবে। কোন মতে **"অন্বয়ব্যতিরেকী"** নামে তৃতীয় প্রকার উদাহরণও স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও উদাহরণ-বাক্যকে দ্বিবিধই বলিয়াছেন। "দীধিতি"কার রঘুনাথ শিরোমণিও তাহাই বলিয়াছেন। সেখানে টীকাকার জগদীশ তর্কালঙ্কারও ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন,—"বস্তুতঃ শিরোমণিমতে ব্যাপ্তিদ্বয়বোধকমুদাহরণমেব নাস্তি, কুতোঽস্য গমকত্বমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াঃ প্রথমোক্তব্যাপ্ত্যবগমাদেব নিবৃত্তৌ ব্যাপ্ত্যন্তরাভিধানস্য নিরাকাঙ্ক্ষতয়াঽনৌচিত্যাৎ।" ॥৩৭॥

---

* গঙ্গেশ অলৌকিক প্রত্যক্ষবিশেষের জনকরূপে উক্তরূপ সামান্য ধর্ম্মের প্রত্যক্ষকে এক প্রকার অলৌকিক সন্নিকর্ষ বলিয়াছেন। উহারই নাম 'সামান্যলক্ষণা প্রত্যাসত্তি।' তৃতীয় খণ্ডে (১৩২ পৃঃ) উহার ব্যাখ্যাদি দ্রষ্টব্য। উক্ত 'সামান্যলক্ষণা প্রত্যাসত্তি' বাচস্পতি মিশ্রেরও সম্মত। তাই 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে 'ব্যাপ্তিবাদ' খণ্ডন করিতে শ্রীহর্ষ বলিয়াছেন,—"ইন্দ্রিয়েণ সামান্যলক্ষণয়া প্রত্যাসত্ত্যা ব্যাপ্তিগ্রহণকালে সর্ব্বাস্তজ্জাতীয়-ব্যক্তয়ো গৃহ্যন্তে, যদনভ্যুপগমে ষণ্ডকমুদ্বাহ্য মুগ্ধায়াঃ পুত্রপ্রার্থনামিবেতি বাচস্পতিরবাদীদিতি চেৎ?" মুদ্রিত তাৎপর্য্যটীকায় দেখা যায়,—"তদেতৎ ষণ্ডকমুদ্বাহ্য মুগ্ধায়াঃ পুত্রপ্রার্থনমিব। তস্মাদন্তর্ব্বহির্ব্বা সর্ব্বোপসংহারেণাবিনাভাবোঽবগন্তব্যঃ।"—(ঐ, প্রথম সং, ২৯ পৃঃ)।

সূত্র। উদাহরণাপেক্ষস্তথেত্যুপসংহারো ন তথেতি বা সাধ্যস্যোপনয়ঃ ॥৩৮॥

অনুবাদ—সাধ্য ধর্ম্মীর সম্বন্ধে উদাহরণানুসারী "তথা" এইরূপে অথবা 'ন তথা' এইরূপে উপসংহার অর্থাৎ হেতুপদার্থের উপন্যাস (তাদৃশ হেতুবোধক বাক্য) 'উপনয়'।

ভাষ্য। উদাহরণাপেক্ষ উদাহরণতন্ত্র উদাহরণবশঃ।* বশঃ সামর্থ্যং। সাধ্যসাধর্ম্ম্যযুক্তে উদাহরণে স্থাল্যাদিদ্রব্যমুৎপত্তিধর্ম্মকমনিত্যং দৃষ্টং, তথা শব্দ উৎপত্তিধর্ম্মক ইতি সাধ্যস্য শব্দস্যোৎপত্তিধর্ম্মকত্বমুপসংহ্রিয়তে। সাধ্যবৈধর্ম্ম্যযুক্তে পুনরুদাহরণে আত্মাদিদ্রব্যমনুৎপত্তিধর্ম্মকং নিত্যং দৃষ্টং, ন চ তথাঽনুৎপত্তিধর্ম্মকঃ শব্দ ইতি অনুৎপত্তিধর্ম্মকত্বস্যোপসংহারপ্রতিষেধেনোৎপত্তিধর্ম্মকত্বমুপসংহ্রিয়তে। তদিদমুপসংহারদ্বৈতমুদাহরণদ্বৈতাদ্ভবতি। উপসংহ্রিয়তেঽনেনেতি চোপসংহারো বেদিতব্য ইতি।

অনুবাদ—উদাহরণাপেক্ষ" (অর্থাৎ) 'উদাহরণতন্ত্র' উদাহরণবশ। 'বশ' অর্থাৎ উপনয়বাক্যে উদাহরণের বশ্যতা—'সামর্থ্য', অর্থাৎ তাহার ফলের সহিত সম্বন্ধ। "স্থাল্যাদিদ্রব্যমুৎপত্তিধর্ম্মকমনিত্যং দৃষ্টং"—এইরূপ সাধ্যসাধর্ম্ম্যযুক্ত উদাহরণ প্রযুক্ত হইলে "তথা শব্দ উৎপত্তিধর্ম্মকঃ" এই উপনয়বাক্যের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মী শব্দের সম্বন্ধে উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব উপসংহৃত হয়। কিন্তু "আত্মাদিদ্রব্যমনুৎপত্তিধর্ম্মকং নিত্যং দৃষ্টং"—এইরূপ সাধ্যবৈধর্ম্ম্যযুক্ত উদাহরণ প্রযুক্ত হইলে "ন চ তথাঽনুৎপত্তিধর্ম্মকঃ শব্দঃ"—এইরূপ অনুৎপত্তিধর্ম্মকত্বের উপসংহারপ্রতিষেধের দ্বারা অর্থাৎ শব্দে অনুৎপত্তিধর্ম্মকত্বের নিষেধক উক্তরূপ উপনয়বাক্যের দ্বারা (সাধ্যধর্ম্মী শব্দের সম্বন্ধে) উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব উপসংহৃত হয়। সেই এই 'উপসংহার'-দ্বৈত অর্থাৎ উপনয়বাক্যের দ্বিবিধত্ব উদাহরণবাক্যের দ্বিবিধত্ব-

---

* "অপেক্ষাপদং ভাষ্যকৃদ্ব্যাচষ্টে,—"উদাহরণতন্ত্র"ইতি। উদাহরণবশঃ,—বশ্যতে ইতি বশঃ, বশিন উদাহরণস্য বশ ইত্যর্থঃ। "বশঃ সামর্থ্যং" বশ্যেন উদাহরণস্য ফলেনোপনয়েস্যাভিসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ।"—তাৎপর্য্যটীকা।

প্রযুক্ত হয়। ইহার দ্বারা উপসংহৃত হয় অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-হেতুমত্ত্বরূপে সাধ্যধর্ম্মী নিশ্চিত হয়, এই অর্থে 'উপসংহার' বুঝিবে।

টিপ্পনী—এই সূত্রে "উদাহরণাপেক্ষঃ সাধ্যস্যোপসংহারঃ" এই বাক্যের দ্বারা চতুর্থ অবয়ব "উপনয়ে"র সামান্য লক্ষণ এবং মধ্যে "তথেতি" ও "ন তথেতি বা" এই দুইটি বাক্যের উল্লেখ করিয়া যথাক্রমে দ্বিবিধ "উপনয়ে"র বিশেষ লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। মহর্ষি উপনয়বাক্যকে "উপসংহার" বলিয়াছেন। সুতরাং "উপসংহ্রিয়তেঽনেন" অর্থাৎ যে বাক্যের দ্বারা শাব্দনিশ্চয়রূপ উপসংহার জন্মে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে এখানে সূত্রোক্ত **"উপসংহার"** শব্দের দ্বারা শাব্দ নিশ্চয়জনক বাক্য বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকারও এখানে সর্ব্বশেষে ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু কোন্ পদার্থের 'উপসংহার' উপনয় হইবে, ইহা বলা আবশ্যক। তাই মহর্ষি বলিয়াছেন,—**"সাধ্যস্য"**। 'সাধ্য' শব্দের দ্বারা এখানে সাধ্যধর্ম্মী অর্থাৎ যে ধর্ম্মীতে কোন ধর্ম্ম অনুমেয়, সেই ধর্ম্মীই বুঝিতে হইবে। নব্য নৈয়ায়িকগণ উহাকে 'পক্ষ' বলিয়াছেন। তাই বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"সাধ্যস্য পক্ষস্য"। তাহা হইলে সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, উদাহরণানুসারে 'তথা' অথবা 'ন তথা' এইরূপে অর্থাৎ উদাহরণ-বাক্য-বোধিত সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুমত্ত্বরূপে সাধ্যধর্ম্মী বা পক্ষের যে উপসংহার অর্থাৎ শাব্দ নিশ্চয়জনক বাক্য, তাহা "উপনয়"। ভাষ্যকার উক্ত স্থলে প্রথম প্রকার 'উপনয়'বাক্য বুঝাইতে প্রথমে সাধর্ম্ম্যোদাহরণোদাহরণ-বাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক বলিয়াছেন,—**"তথা শব্দ উৎপত্তিধর্ম্মক ইতি সাধ্যস্য শব্দস্যোৎপত্তিধর্ম্মকত্বমুপসংহ্রিয়তে।"***

ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত স্থলে বাদী তাঁহার পূর্ব্বোক্ত উৎপত্তিধর্ম্মকত্বরূপ হেতুতে অনিত্যত্বের ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিতে সাধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্য বলিলে পরে তদনুসারে তিনি উপনয়বাক্য বলিবেন,—**"তথাচোৎপত্তিধর্ম্মকঃ শব্দঃ"**। উক্ত বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, শব্দও স্থালী প্রভৃতির

* বাচস্পতি মিশ্র এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"উদাহরণসিদ্ধ-ব্যাপ্তিহেতুমত্তয়া সাধ্যমুপসংহ্রিয়তে ন স্বরূপেণেত্যর্থঃ।" অর্থাৎ উপনয়বাক্যের দ্বারা কেবল সাধ্যধর্ম্মীর উপসংহার হয় না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ-বাক্যের দ্বারা যে হেতুতে ব্যাপ্তি সিদ্ধ হইয়াছে, তাদৃশ হেতুবিশিষ্টত্বরূপেই সেই সাধ্যধর্ম্মীর উপসংহার (শাব্দ নিশ্চয়) হয়। জয়ন্ত ভট্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"সেয়ং সাধ্যস্যেতি সপ্তম্যর্থে ষষ্ঠী মন্তব্যা। সাধ্যে ধর্ম্মিণি হেতোরুপসংহার উপনয় ইতি।" এই ব্যাখ্যায় সরলভাবেই সূত্রার্থ বুঝা যায়। বস্তুতঃ সম্বন্ধার্থ ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা সপ্তমী বিভক্তির অর্থও বুঝা যায় এবং সপ্তমী বিভক্তির অর্থেও ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ হয়।

ন্যায় উৎপত্তিধর্ম্মক অর্থাৎ তাহাতেও অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বরূপ হেতু আছে। সুতরাং উক্ত সাধর্ম্ম্যোদাহরণের পরে উক্তরূপ "উপনয়"বাক্যের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মী শব্দে উৎপত্তিধর্ম্মকত্বরূপ হেতুর নিশ্চয়রূপ উপসংহার হওয়ায় উক্ত "উপনয়" **"সাধর্ম্ম্যোপনয়"** হইবে। কিন্তু উক্ত স্থলে বাদী যদি পূর্ব্বোক্ত বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তদনুসারে তিনি পরে উপনয়বাক্য বলিবেন,—**"ন চ তথাঽনুৎপত্তিধর্ম্মকঃ শব্দঃ।"** ভাষ্যকার উক্তরূপ বাক্যকে বলিয়াছেন,—অনুৎপত্তিধর্ম্মকত্বের "উপসংহার-প্রতিষেধ" অর্থাৎ তাহার নিষেধবোধক বাক্য। ইহার দ্বারাও সাধ্যধর্ম্মী শব্দে উৎপত্তিধর্ম্মকত্বরূপ হেতুর নিশ্চয়রূপ উপসংহার জন্মে। কারণ, শব্দ আত্মাদি দ্রব্যের ন্যায় অনুৎপত্তিধর্ম্মক নহে, ইহা বলিলে শব্দ যে উৎপত্তিধর্ম্মক, ইহাই বুঝা যায়। কারণ, অনুৎপত্তিধর্ম্মকত্বের যে অভাব, তাহা বস্তুতঃ উৎপত্তিধর্ম্মকত্বই। সুতরাং উক্তরূপে শেষোক্ত "উপনয়"-বাক্যকে "বৈধর্ম্ম্যোপনয়" বা ব্যতিরেকী উপনয় বলে। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণের দ্বিবিধত্ব-প্রযুক্তই "উপনয়" দ্বিবিধ। কারণ, উপনয়বাক্য উদাহরণ-বাক্যকে অপেক্ষা করে। তাই মহর্ষি প্রথমেই বলিয়াছেন,—**"উদাহরণাপেক্ষঃ"**। ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—**"উদাহরণতন্ত্র উদাহরণবশঃ"**। অর্থাৎ দ্বিবিধ উদাহরণানুসারেই দ্বিবিধ উপনয়ের প্রয়োগ হয়, এ জন্য উপনয়বাক্য উদাহরণের অধীন, উদাহরণের বশ্য। উপনয়বাক্যে উদাহরণ-বাক্যের বশ্যতা কিরূপ? তাই পরে বলিয়াছেন—**"বশঃ সামর্থ্যাৎ"**। এখানে "বশ" শব্দের অর্থ বশ্যতা। "সামর্থ্য" বলিতে ফলের সহিত সম্বন্ধ। তাৎপর্য্য এই যে, উদাহরণ-বাক্যের ফলভূত উপনয়বাক্যের সহিত উদাহরণ-বাক্যের যে উক্তরূপ সম্বন্ধ, তাহাই উপনয়বাক্যে উদাহরণ-বাক্যের বশ্যতা।

"তত্ত্ব-চিন্তামণি"কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় 'উপনয়'বাক্যের সামান্য লক্ষণ বলিয়াছেন,—"অনুমিতিকারণতৃতীয়লিঙ্গপরামর্শজনকাবয়বত্বম্।' অর্থাৎ ন্যায়া-স্তর্গত যে অবয়বের দ্বারা মধ্যস্থগণের অনুমিতির চরম কারণ লিঙ্গপরামর্শ জন্মে, সেই অবয়ব 'উপনয়'। সেই লিঙ্গপরামর্শ দ্বিবিধ—'অন্বয়পরামর্শ' ও 'ব্যতিরেক পরামর্শ'। অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞানপূর্ব্বক যে লিঙ্গপরামর্শ, তাহাকে বলে **'অন্বয়পরামর্শ'**। ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানপূর্ব্বক যে লিঙ্গপরামর্শ, তাহাকে বলে **'ব্যতিরেকপরামর্শ'**। তন্মধ্যে অন্বয়পরামর্শজনক 'উপনয়'কে বলে 'অন্বয়ী' উপনয় এবং ব্যতিরেকপরামর্শজনক 'উপনয়'কে বলে 'ব্যতিরেকী' উপনয়। এই

মতে অন্বয়ী উপনয়বাক্যে "তথা" এবং ব্যতিরেকী উপনয়বাক্যে "ন তথা" এইরূপ শব্দ প্রয়োগ অনাবশ্যক। উক্ত মতানুসারে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন.—"অত্র চ 'তথা'শব্দপ্রয়োগাবশ্যকত্বে ন তাৎপর্য্যং, কিন্তু ব্যাপ্তিবিশিষ্টহেতুমত্ত্ববোধে।" অর্থাৎ উপনয়বাক্যে "তথা" শব্দের প্রয়োগ যে, অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা মহর্ষির তাৎপর্য্য নহে। কিন্তু অনুমানের ধর্ম্মীতে সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুমত্ত্বের বোধজনক বাক্যই উপনয়, ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত। তাহা হইলে উক্তরূপ বোধজনক "তথাচায়ং" এইরূপ বাক্যও এবং ব্যতিরেকী হেতুস্থলে "নচ তথায়ং" এইরূপ বাক্যও 'উপনয়'-বাক্য হয় এবং উক্তরূপ উপনয়বাক্যও বলা যায়। এই তাৎপর্য্যেই মহর্ষি এই সূত্রে বলিয়াছেন,—'তথেতি' 'ন তথেতি বা'। কিন্তু ভাষ্যকার মহর্ষিসূত্রানুসারে "তথা" শব্দযুক্ত উপনয়বাক্যই বলিয়াছেন। বার্ত্তিককার "তথা" শব্দের সমানার্থক 'এবং' শব্দযুক্ত উপনয়বাক্য বলিয়াছেন। পরবর্ত্তী অনেক প্রাচীন নৈয়ায়িক কেবল "তথাচায়ং" এইরূপ উপনয়বাক্যই বলিয়াছেন। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের 'প্রতিজ্ঞা' লক্ষণের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে 'দীধিতি'কার রঘুনাথ শিরোমণিও উক্ত প্রাচীন মতেরই প্রশংসা করিয়াছেন।* তিনি গঙ্গেশের মতকে নব্য মতই বলিয়াছেন॥ ৩৮॥

ভাষ্য। দ্বিবিধস্য পুনর্হেতোর্দ্বিবিধস্য চোদাহরণস্যোপসংহারদ্বৈতে চ সমানম্,—

অনুবাদ—দ্বিবিধ "হেতু"র সম্বন্ধে এবং দ্বিবিধ "উদাহরণে"র সম্বন্ধে এবং উপসংহারদ্বয়ে অর্থাৎ দ্বিবিধ "উপনয়ে" 'সমান' অর্থাৎ সর্ব্বত্রই এক প্রকার—

সূত্র। হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ব্বচনং নিগমনম্॥ ৩৯॥

অনুবাদ—হেতুবাক্যের কথনপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনঃ কথন "নিগমন" অর্থাৎ "নিগমন" নামক পঞ্চম অবয়ব।

ভাষ্য। সাধর্ম্ম্যোক্তে বা বৈধর্ম্ম্যোক্তে বা যথোদাহরণমুপ-

* ......"তথাচায়মিত্যাকারঃ সুবচ এব প্রাচামুপনয়ঃ। নব্যানাং পুনরয়নঙ্গগতিকত্তয়া তদ্ব্যাপ্যহেতুমাংস্তথান্ বা ইত্যাকারঃ। যোগ্যতাদিবশাচ্চ তদা (তচ্ছদেন) সাধ্যস্য তদ্ব্যাপ্যস্য বা পরামর্শঃ।"—'অবয়বদীধিতি'।

সংহ্রিয়তে 'তস্মাদুৎপত্তিধর্ম্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দ' ইতি নিগমনম্। নিগম্যন্তেঽনেনেতি প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়া একত্রেতি নিগমনম্। নিগম্যন্তে সমর্থ্যন্তে সম্বধ্যন্তে। তত্র সাধর্ম্ম্যোক্তে তাবদ্ধেতৌ বাক্যং—"অনিত্যঃ শব্দঃ" ইতি প্রতিজ্ঞা। "উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বা" দিতি হেতুঃ। "উৎপত্তি-ধর্ম্মকং স্থাল্যাদি দ্রব্যমনিত্য"-মিত্যুদাহরণম্। "তথা চোৎপত্তিধর্ম্মকঃ শব্দঃ" ইত্যুপনয়ঃ। "তস্মাদুৎপত্তিধর্ম্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দঃ" ইতি নিগমনম্। বৈধর্ম্ম্যোক্তেঽপি "অনিত্যঃ শব্দঃ", "উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ", "অনুৎপত্তিধর্ম্মকমাত্মাদি দ্রব্যং নিত্যং দৃষ্টং", "ন চ তথাঽনুৎ-পত্তিধর্ম্মকঃ শব্দঃ", "তস্মাদুৎপত্তিধর্ম্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দঃ" ইতি।

অনুবাদ—উদাহরণানুসারে হেতু সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত উক্ত হইলে অথবা বৈধর্ম্ম্য-প্রযুক্ত উক্ত হইলে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ হেতুস্থলেই উপসংহৃত অর্থাৎ সর্ব্বশেষে কথিত হয়,—"তস্মাদুৎপত্তিধর্ম্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দঃ"। এইরূপ বাক্য "নিগমন", ইহার দ্বারা 'প্রতিজ্ঞা', হেতু, 'উদাহরণ' ও 'উপনয়' অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত চারিটি বাক্য এক অর্থে নিগমিত হয়, এজন্য ইহা "নিগমন"। নিগমিত হয় অর্থাৎ সামর্থ্যযুক্ত হয়, সম্বন্ধযুক্ত হয়। অর্থাৎ শেষোক্ত নিগমনবাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বাক্যচতুষ্টয়ের সামর্থ্য বা পরস্পর সম্বন্ধের জ্ঞান জন্মে, এজন্য উক্তরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে উহার নাম "নিগমন"। তন্মধ্যে সাধর্ম্ম্যোক্ত হেতুস্থলে বাক্য অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ ন্যায়বাক্য যথা—(১) "অনিত্যঃ শব্দঃ", এইরূপবাক্য 'প্রতিজ্ঞা'। (২) "উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ" এইরূপ বাক্য 'হেতু'। (৩) "উৎপত্তি-ধর্ম্মকং স্থাল্যাদি দ্রব্যমনিত্যং"—এইরূপ বাক্য 'উদাহরণ'। (৪) "তথাচোৎপত্তি-ধর্ম্মকঃ শব্দঃ"—এইরূপ বাক্য 'উপনয়'। (৫) "তস্মাদুৎপত্তিধর্ম্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দঃ"—এইরূপ বাক্য 'নিগমন'। এবং বৈধর্ম্ম্যোক্ত হেতুস্থলে যথাক্রমে পঞ্চাবয়ব বাক্য যথা—(১) "অনিত্যঃ শব্দঃ"। (২) "উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ"। (৩) "অনুৎপত্তিধর্ম্মকমাত্মাদি দ্রব্যং নিত্যং দৃষ্টং"। (৪) "নচ তথাঽনুৎপত্তি-ধর্ম্মকঃ শব্দঃ"। (৫) "তস্মাদুৎপত্তিধর্ম্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দঃ"।

টিপ্পনী—পঞ্চম অবয়বের নাম '**নিগমন**'। ভাষ্যকার "নিগম্যন্তে" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উক্ত 'নিগমন' শব্দের ব্যুৎপত্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যে

"নিগম্যন্তে" এই পদের ব্যাখ্যা "সমর্থ্যন্তে"। পরে উহারই ব্যাখ্যা "সম্বধ্যন্তে"। তাৎপর্য্য এই যে, চরম অবয়ব 'নিগমন'-বাক্যে পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাদি বাক্য-চতুষ্টয়ের পরস্পর সম্বন্ধ ব্যক্ত করিয়া উহাদিগকে একটি বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদনে সমর্থ করে, এজন্য উহার নাম "নিগমন"। পরে ইহা বুঝা যাইবে। ভাষ্যকার "নিগমন" শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রকাশ করিয়া, পরে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত স্থলে যথাক্রমে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে দ্বিবিধ হেতুস্থলেই সর্ব্বশেষে সমানাকার নিগমনবাক্য বলিয়াছেন,—"**তস্মাদুৎপত্তিধর্ম্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দঃ।**"

এই সূত্রের ব্যাখ্যাভেদে নিগমনবাক্যের আকার বিষয়েও মতভেদ হইয়াছে। পরবর্ত্তী বহু নৈয়ায়িকের মতে এই সূত্রে 'হেতু'শব্দের দ্বারা প্রকৃত হেতুপদার্থ এবং 'প্রতিজ্ঞা' শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রতিপাদ্য অর্থই বুঝিতে হইবে। তদনুসারেই বৃত্তিকার বিশ্বনাথ সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"হেতোর্ব্ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম্মস্য, অপদেশঃ কথনং, তদুত্তরং প্রতিজ্ঞায়াঃ প্রতিজ্ঞার্থস্য সাধ্যবিশিষ্টপক্ষস্য পুনর্ব্বচনং নিগমনং।" এই মতে নিগমন-বাক্যের প্রথমে কেবল 'তস্মাৎ' এই পদের প্রয়োগ হইয়াছে। যেমন "তস্মাৎ পর্ব্বতো বহ্নিমান্", "তস্মাৎ শব্দোঽনিত্যঃ" ইত্যাদি নিগমন-বাক্য। * কিন্তু ভাষ্যকার নিগমনবাক্যে "তস্মাৎ" এই পদের পরে পূর্ব্বোক্ত হেতুবাক্যেরও উল্লেখ করায় তাঁহার মতে সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত হেতুবাক্যের কথনপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনঃ কথন নিগমন।† বাচস্পতি মিশ্রও পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা-

---

* প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ এবং ভাসর্ব্বজ্ঞ নিগমনবাক্যে পরে অবধারণার্থ "এব" শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে "তস্মাদ্ দ্রব্যমেব",—"তস্মাদনিত্য এব" এইরূপ বাক্য "নিগমন"। কোন সম্প্রদায় "তস্মাত্তথা" এইরূপ বাক্যকেই নিগমন বলিতেন। কিন্তু গঙ্গেশ উপাধ্যায় উক্ত মতের খণ্ডন করিতে বিচারপূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, উক্ত বাক্যে "তথা" শব্দের 'তৎস্বরূপ' অথবা 'তৎপ্রকার' অথবা 'তৎসদৃশ' এই ত্রিবিধ অর্থের মধ্যে কোন অর্থই প্রকৃত স্থলে উপপন্ন হয় না। সুতরাং উক্তরূপ নিগমনবাক্য গ্রহণ করা যায় না।

† "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্টও "তস্মাৎ" এই পদের পরে "কৃতকত্বাৎ" এই হেতুবাক্যের উল্লেখ করিয়া নিগমনবাক্য বলিয়াছেন,—"তস্মাৎ কৃতকত্বাদনিত্যঃ শব্দঃ।" কিন্তু তিনি 'হেতুরপদিশ্যতেঽনেন বাক্যেন' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে এই সূত্রোক্ত "হেত্বপদেশ" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—উপনয়বাক্য। কিন্তু তাহা হইলে নিগমনবাক্যে যে, হেতুবাক্যও বক্তব্য, ইহা কিরূপে এই সূত্রের দ্বারা বুঝা যায় এবং জয়ন্ত ভট্টের উক্তরূপ ব্যাখ্যার কারণ কি, তাহা চিন্তনীয়।

বাক্যের পুনর্ব্বচনকেই 'নিগমন' বলিয়া, উহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, যদিও নিগমনবাক্য সিদ্ধ নির্দ্দেশ, কিন্তু প্রতিজ্ঞাবাক্য সাধ্য নির্দ্দেশ, অর্থাৎ নিগমনবাক্যের পরভাগ প্রতিজ্ঞার লক্ষণাক্রান্তই হয় না, তথাপি প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্য দ্বারা যাহা সাধ্যরূপে বোধিত হয়, পরে নিগমনবাক্যের দ্বারা তাহাই সিদ্ধরূপে বোধিত হয়। সুতরাং সাধ্যত্ব ও সিদ্ধত্বরূপ অবস্থাভেদবিশিষ্ট একই পদার্থ প্রতিজ্ঞাবাক্য ও নিগমনবাক্যের পরভাগের প্রতিপাদ্য হওয়ায় মহর্ষি নিগমনবাক্যকে প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনর্ব্বচন বলিয়াছেন। অর্থাৎ নিগমন-বাক্যের পরভাগে "প্রতিজ্ঞা" শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে।

বস্তুতঃ মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারাও সরলভাবে বুঝা যায় যে, নিগমনবাক্যে হেতুবাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনর্ব্বচনই কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই হেতুবাক্যবোধ্য হেতুপদার্থ যে, পূর্ব্বোক্ত সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট এবং সেই সাধ্যধর্ম্মীতে বর্ত্তমান, ইহা প্রকাশ করিতে প্রথমে "তস্মাৎ" এই পদের প্রয়োগও কর্ত্তব্য। কারণ, নিগমনবাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বাক্যচতুষ্টয়ের যাহা প্রতিপাদ্য, তাহাই এক কথায় বলা হয়। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ-বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত হেতুপদার্থ যে, সেই সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য, ইহা প্রতিপাদিত হয় এবং তাদৃশ হেতুপদার্থ যে, পক্ষধর্ম্ম, ইহা উপনয়বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়। নিগমনবাক্যে প্রথমে "তস্মাৎ" এই পদের দ্বারা তাহাই প্রকটিত হয় এবং পরে হেতুবাক্য দ্বারা ও প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত হেতুবাক্যার্থ ও প্রতিজ্ঞাবাক্যার্থ প্রকটিত হয়। সুতরাং নিগমনবাক্য দ্বারা যে পূর্ব্বোক্ত বাক্য-চতুষ্টয়ের প্রতিপাদ্যই বুঝা যায়, ইহা আবশ্যক। আর ইহাও বুঝা আবশ্যক যে, 'নিগমন'-বাক্যশেষে পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনর্ব্বচনই কর্ত্তব্য হইলে প্রতিজ্ঞাবাক্যের ন্যায় নিগমনবাক্যও সর্ব্বত্র একরূপই হইবে অর্থাৎ হেতুবাক্য প্রভৃতির ন্যায় সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যভেদে 'নিগমন'বাক্যও দ্বিবিধ হইতে পারে না। ভাষ্যকার ইহাই ব্যক্ত করিতে প্রথমে এই সূত্রের অবতারণায় বলিয়াছেন,— "সমানং।" অর্থাৎ নিগমনবাক্য সর্ব্বত্রই একরূপ। বাচস্পতি মিশ্র ও জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণও ইহাই বলিয়াছেন। কিন্তু ভাসর্ব্বজ্ঞ তাঁহার গুরুসম্প্রদায়ের মতানুসারে "ন্যায়সারে" বলিয়াছেন,—"তদপি দ্বিবিধং সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যভেদাৎ।"

ভাষ্য। অবয়বসমুদায়ে চ বাক্যে সম্ভূয়েতরেতরাভিসম্বন্ধাৎ প্রমাণান্যর্থং সাধয়ন্তীতি। সম্ভবস্তাবৎ, শব্দবিষয়া প্রতিজ্ঞা,

আপ্তোপদেশস্য প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং প্রতিসন্ধানাৎ, অনৃষেশ্চ স্বাতন্ত্র্যানুপপত্তেঃ। অনুমানং হেতুঃ, উদাহরণে সংদৃশ্য প্রতিপত্তেঃ;* তচ্চোদাহরণভাষ্যে ব্যাখ্যাতম্। প্রত্যক্ষবিষয়মুদাহরণং, দৃষ্টেনাদৃষ্টসিদ্ধেঃ। উপমানমুপনয়ঃ, তথেত্যুপসংহারাৎ, ন চ তথেতি চোপমানধর্ম্মপ্রতিষেধে বিপরীতধর্ম্মোপসংহারসিদ্ধেঃ। সর্ব্বেষামেকার্থপ্রতিপত্তৌ সামর্থ্যপ্রদর্শনং নিগমনমিতি।

ইতরেতরাভিসম্বন্ধোঽপ্যসত্যাং প্রতিজ্ঞায়ামনাশ্রয়া হেত্বাদয়ো ন প্রবর্ত্তেরন্। অসতি হেতৌ কস্য সাধনভাবং প্রদর্শ্যেত। উদাহরণে সাধ্যে চ কস্যোপসংহারঃ স্যাৎ, কস্য চাপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ব্বচনং নিগমনং স্যাদিতি। অসত্যুদাহরণে কেন সাধর্ম্ম্যং বৈধর্ম্ম্যং বা সাধ্যসাধনমুপাদীয়েত, কস্য বা সাধর্ম্ম্যবশাদুপসংহারঃ প্রবর্ত্তেত। উপনয়ঞ্চান্তরেণ সাধ্যেঽনুসংহৃতঃ সাধকো ধর্ম্মো নার্থং সাধয়েৎ, নিগমনাভাবে চানভিব্যক্তসম্বন্ধানাং প্রতিজ্ঞাদীনামেকার্থেন প্রবর্ত্তনং তথেতি প্রতিপাদনং কস্যেতি।

অনুবাদ—অবয়বসমূহরূপ বাক্যে প্রমাণসমূহ (যথাক্রমে শব্দ, অনুমান, প্রত্যক্ষ ও উপমান প্রমাণ) মিলিত হইয়া পরস্পর সম্বন্ধবশতঃ অর্থকে অর্থাৎ সাধ্য পদার্থকে সিদ্ধ করে। "সম্ভব" অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি অবয়বচতুষ্টয়ে যথাক্রমে শব্দাদি প্রমাণচতুষ্টয়ের সমবায় বা সম্মেলন যথা,—

* এখানে বহু পুস্তকে মুদ্রিত "সাদৃশ্যপ্রতিপত্তেঃ" এইরূপ পাঠ এবং 'তাৎপর্য্যটীকা'য় "উদাহরণে দৃষ্টান্তধর্ম্মিণি সাধ্য-সাধনয়োঃ প্রতিবন্ধং সাদৃশ্যং সম্যগ্ দৃষ্ট্বা লিঙ্গস্য প্রতীতেঃ" এইরূপ পাঠ প্রকৃত বলিয়া বুঝিতে পারি না। কারণ, "সাদৃশ্যপ্রতিপত্তেঃ" এইরূপ ভাষ্যপাঠ হইলে বাচস্পতি মিশ্রের "সাদৃশ্যং সম্যগ্ দৃষ্ট্বা লিঙ্গস্য প্রতীতেঃ" এইরূপ ব্যাখ্যা সংগত হয় না। পরন্তু এখানে "সাদৃশ্য" শব্দের প্রয়োগও অনাবশ্যক। কোন কোন প্রাচীন পুস্তকে এখানে "উদাহরণে সংদৃশ্য প্রতিপত্তেঃ" এইরূপ ভাষ্যপাঠ আছে। সুতরাং তাৎপর্য্যটীকাতেও "সংদৃশ্য সম্যগ্ দৃষ্ট্বা" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বুঝা যায়। বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারোক্ত "সংদৃশ্য" এই পদেরই অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "সম্যগ্ দৃষ্ট্বা" এবং তৎপূর্ব্বে উক্ত সন্দর্শনক্রিয়ার কর্ম্মকারক প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,—"সাধ্যসাধনয়োঃ প্রতিবন্ধং।" ("প্রতিবন্ধ" শব্দের অর্থ ব্যাপ্তিসম্বন্ধ)। পরে ভাষ্যকারোক্ত "প্রতিপত্তেঃ" এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'লিঙ্গস্য প্রতীতেঃ।"

প্রতিজ্ঞাবাক্য শব্দবিষয় অর্থাৎ আগমরূপ শব্দপ্রমাণমূলক, যেহেতু প্রত্যক্ষ ও অনুমানপ্রমাণের দ্বারা আপ্তবাক্যের প্রতিসন্ধান হয় অর্থাৎ সেই আপ্তবাক্যপ্রতিপাদিত সিদ্ধান্তের দৃঢ়তর জ্ঞান হয় এবং ঋষি ভিন্ন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের উপপত্তি হয় না [অর্থাৎ অলৌকিক বিষয়ে ঋষি ভিন্ন ব্যক্তির আপ্তত্ব সম্ভব না হওয়ায় তাহার কথিত প্রতিজ্ঞাবাক্য শব্দপ্রমাণ হয় না।] হেতুবাক্য অনুমানপ্রমাণ। যেহেতু 'উদাহরণে' সন্দর্শন করিয়া অর্থাৎ কোন দৃষ্টান্তপদার্থে সাধ্যধর্ম্ম ও সাধনপদার্থের ব্যাপ্তিসম্বন্ধকে সম্যক্ নির্ণয় করিয়া (প্রকৃত হেতু-পদার্থের) প্রতিপত্তি অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান জন্মে, তাহা কিন্তু উদাহরণভাষ্যে (৩৬শ ও ৩৭শ সূত্রভাষ্যে) ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

উদাহরণবাক্য 'প্রত্যক্ষবিষয়'। যেহেতু দৃষ্ট পদার্থের দ্বারা অদৃষ্ট পদার্থের সিদ্ধি হয় (অর্থাৎ তৃতীয় অবয়ব উদাহরণবাক্য প্রত্যক্ষপ্রমাণমূলক, এজন্য উহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হইয়াছে)। উপনয়বাক্য উপমানপ্রমাণ। যেহেতু "তথা" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা উপসংহার হয়। "নচ তথা" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা (সাধ্য ধর্ম্মীতে) উপমান ধর্ম্মের অর্থাৎ সেই স্থলে ব্যতিরেক দৃষ্টান্তগত ধর্ম্মবিশেষের প্রতিষেধ হইলেও বিপরীত ধর্ম্মের উপসংহার-সিদ্ধি হয়। [যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলে আত্মাদি ব্যতিরেক দৃষ্টান্তগত ধর্ম্ম অনুৎপত্তিধর্ম্মকত্ব। "নচ তথা" ইত্যাদি উপনয়বাক্যের দ্বারা শব্দে সেই ধর্ম্মের প্রতিষেধ হইলে অর্থাৎ অভাব প্রতিপাদিত হইলে তাহাতে সেই ধর্ম্মের বিপরীত ধর্ম্ম উৎপত্তিধর্ম্মকত্বেরই উপসংহার (শাব্দ নিশ্চয়) হয়। কারণ, অনুৎপত্তিধর্ম্মকত্বের যে অভাব, তাহা উৎপত্তিধর্ম্মকত্বই] সমস্তের অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাদি বাক্যচতুষ্টয়ের একার্থবোধে সামর্থ্যপ্রদর্শক অর্থাৎ পরস্পরাকাঙ্ক্ষারূপ সামর্থ্যের বোধক নিগমন।

পরস্পর সম্বন্ধও অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বাক্যের পরস্পরাপেক্ষারূপ আকাঙ্ক্ষাও (প্রদর্শিত হইতেছে)। 'প্রতিজ্ঞা' না থাকিলে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্য না বলিলে হেতুবাক্য প্রভৃতি নিরাশ্রয় হওয়ায় প্রবৃত্ত হইতে পারে না। হেতুবাক্য না থাকিলে কাহার সাধনত্ব প্রদর্শিত হইবে? দৃষ্টান্ত পদার্থ এবং সাধ্যধর্ম্মীতে কাহার উপসংহার হইবে? কাহারই বা উল্লেখপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনর্ব্বচনরূপ নিগমন হইবে? (অর্থাৎ হেতুবাক্য না বলিলে সাধ্যধর্ম্মের সাধন বলাই হয় না, সুতরাং উপনয়বাক্য ও নিগমনবাক্যও বলা যায় না)। উদাহরণ-বাক্য না থাকিলে কাহার সহিত সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্যকে

সাধ্য-সাধন বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে? কাহারই বা সাধর্ম্ম্যবশতঃ "উপসংহার" অর্থাৎ উপনয়বাক্য প্রবৃত্ত হইবে? (অর্থাৎ উদাহরণ-বাক্য না বলিলে দৃষ্টান্তপদার্থের বোধ না হওয়ায় হেতুপদার্থকে সাধ্যসাধন বলিয়া বুঝা যায় না এবং উপনয়বাক্যও বলা যায় না)। উপনয়বাক্য ব্যতীতও সাধ্যধর্ম্মীতে অনুপসংহৃত (অনিশ্চিত) সাধক ধর্ম্ম অর্থাৎ সেই হেতুপদার্থ অর্থকে (সাধ্যধর্ম্মকে) সিদ্ধ করিতে পারে না। এবং 'নিগমন'বাক্যের অভাবে অর্থাৎ সর্ব্বশেষে নিগমনবাক্য না বলিলে "অনভিব্যক্ত সম্বন্ধ" অর্থাৎ যাহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ অনভিব্যক্ত বা অজ্ঞাত, এমন প্রতিজ্ঞাদি বাক্যচতুষ্টয়ের একার্থ-বিশিষ্টরূপে "প্রবর্ত্তন" (অর্থাৎ) 'তথা' এইরূপ প্রতিপাদন কাহা কর্ত্তৃক হইবে? অর্থাৎ নিগমনবাক্যই পূর্ব্বোক্ত বাক্যচতুষ্টয়ের পরস্পর সম্বন্ধ প্রতিপাদন করে, অন্য কোন বাক্য তাহা করিতে পারে না, সুতরাং সর্ব্বশেষে নিগমনবাক্য অবশ্য বক্তব্য।

টিপ্পনী—ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত স্থলে যথাক্রমে পঞ্চাবয়ব প্রদর্শন করিয়া, পঞ্চাবয়ব ন্যায়বাক্যের চরম ফল প্রকাশ করিতে পরে এখানে বলিয়াছেন যে, সেই ন্যায়বাক্যে প্রমাণচতুষ্টয় মিলিত হইয়া সাধ্য পদার্থ সিদ্ধ করে। স্মরণ করিতে হইবে, ভাষ্যকার প্রথমসূত্রভাষ্যেও (৪১শ পৃঃ) ইহা প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,—"**তেষু প্রমাণসমবায়ঃ**" ইত্যাদি। এখানে সেই পূর্ব্বোক্ত কথারই সহেতুক প্রকাশ করিতে পরে বলিয়াছেন,—"**সম্ভবস্তাবৎ**" ইত্যাদি। ভাষ্যকার পরে অন্যত্র সত্তা অর্থেও "সম্ভব" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে পূর্ব্বে "সম্ভূয়" এই পদের প্রয়োগ করায় পরে মেলনার্থ সংপূর্ব্বক 'ভূ' ধাতুনিষ্পন্ন "সম্ভব" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মেলনই তাঁহার বিবক্ষিত বুঝা যায়। পঞ্চাবয়বরূপ ন্যায়বাক্যে প্রমাণসমূহের মেলনই 'প্রমাণসম্ভব'। ভাষ্যকার উহাকেই পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—'**প্রমাণসমবায়**'। "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" টীকায় উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, যদিও পঞ্চম অবয়ব নিগমনবাক্যের মূলেও প্রমাণ আছে, কিন্তু অতিরিক্ত কোন প্রমাণ না থাকায় ভাষ্যকার তাহা বলেন নাই।

ভাষ্যকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—"আগমঃ প্রতিজ্ঞা"। এখানে তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—'**শব্দবিষয়া প্রতিজ্ঞা**'। অর্থাৎ আগমরূপ শব্দপ্রমাণের প্রতিপাদ্য বিষয়ই প্রতিজ্ঞাবাক্যের বিষয় বা প্রতিপাদ্য হয়। তাৎপর্য্য এই যে, বাদী ও প্রতিবাদী নিজ নিজ মতানুসারে শাস্ত্ররূপ শব্দপ্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদিত বিষয়কে পরে অনুমানপ্রমাণ দ্বারাও সিদ্ধ

করিবার উদ্দেশ্যে সেই বিষয়ের বোধক প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ করেন। কারণ, শব্দপ্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইলেও পরে অনুমানপ্রমাণের দ্বারা এবং সর্ব্বশেষে প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সেই পদার্থের জ্ঞান হইলে আর সে বিষয়ে সংশয় সম্ভবই হয় না, সুতরাং জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয়। ভাষ্যকার পূর্ব্বে তৃতীয়সূত্র-ভাষ্যশেষে অলৌকিক আত্মপদার্থে উক্তরূপে "প্রমাণসংপ্লবে"র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াও ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে যে, বাদীর সেই প্রতিজ্ঞাবাক্যই সে বিষয়ে শব্দপ্রমাণ কেন হইবে না? তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, ঋষি ভিন্ন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য সম্ভব হয় না। অর্থাৎ অলৌকিক বিষয়ে ঋষি ভিন্ন সেই প্রতিজ্ঞাবাদীর আপ্তত্ব সম্ভব না হওয়ায় তাহার সেই প্রতিজ্ঞাবাক্য আপ্তবাক্য নহে, সুতরাং তাহা শব্দপ্রমাণ হইতে পারে না। কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞাবাক্য আগমমূলক, সুতরাং আগমসদৃশ, এই তাৎপর্য্যেই ভাষ্যকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—"আগমঃ প্রতিজ্ঞা"। সেখানে উদ্দ্যোতকরও ঐ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—"য এবার্থ আগমেনাধিগতস্তমেব পরস্মা আচষ্টে ইত্যাগমঃ প্রতিজ্ঞেত্যুচ্যতে।"

অবশ্য প্রতিজ্ঞামাত্রই আগমমূলক নহে। "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" ইত্যাদি অনেক বাক্যও প্রতিজ্ঞা হয়, যাহা কোন আগমমূলক নহে, আগমবিরুদ্ধও নহে। কিন্তু ভাষ্যকার প্রকৃত ন্যায়ের প্রয়োগস্থলেই প্রতিজ্ঞাকে আগম বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র ইহা ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, ন্যায়ের দ্বারা শাস্ত্রসিদ্ধ আত্মাদি প্রমেয় পদার্থের প্রতিপাদনোদ্দেশ্যেই এই ন্যায়শাস্ত্রের প্রকাশ হইয়াছে। বস্তুতঃ শাস্ত্রার্থে বিবাদ হইলে ন্যায়ের দ্বারাও সেই শাস্ত্রার্থ সিদ্ধ করা এবং স্থলবিশেষে সেই শাস্ত্রের প্রামাণ্য সিদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য হয়। সেই 'ন্যায়'ই ন্যায়শাস্ত্রের ব্যুৎপাদ্য প্রকৃত ন্যায়। সুতরাং তাহার প্রথম অবয়ব যে প্রতিজ্ঞাবাক্য, তাহা সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় সেই শাস্ত্রপ্রতিপাদিত পদার্থবিষয়কই হইবে। তাই আগমমূলক উক্তরূপ প্রতিজ্ঞাকেই ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যে আগম বলিয়াছেন। তদ্দ্বারা আগমবিরুদ্ধ কল্পিত বিষয়ের বোধক বাক্য যে, প্রতিজ্ঞা হইবে না, ইহাও সূচিত হইয়াছে।* ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত "অনিত্যঃ শব্দঃ" এই প্রতিজ্ঞাবাক্যও তাঁহার মতে আগমমূলক। কারণ, তাঁহার মতে

---

* "তস্মাদ্ যদ্যপি ন ন্যায়মাত্রবর্ত্তিনী প্রতিজ্ঞা আগমস্তথাপি প্রকৃতন্যায়াভিপ্রায়েণ দ্রষ্টব্যং। তথা চাগমানুসন্ধানেন প্রতিজ্ঞায়াঃ কল্পিতবিষয়ত্বমপি নিরাকৃতং বোদ্ধব্যং।" —তাৎপর্য্যটীকা, ৩৯ পৃঃ।

"তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে" ইত্যাদি অনেক শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বর্ণাত্মক শব্দেরও অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। ন্যায়ের দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন করিতে নৈয়ায়িক প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিয়াছেন,—"**অনিত্যঃ শব্দঃ**"।

ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—'**অনুমানং হেতুঃ, উদাহরণে সংদৃশ্য প্রতিপত্তেঃ।**' তাৎপর্য্য এই যে, প্রথমে কোন উদাহরণ বা দৃষ্টান্তপদার্থে সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্টরূপে যে লিঙ্গজ্ঞান জন্মে, তাহাকে বলে প্রথম লিঙ্গদর্শন। পরে পক্ষভূত কোন পদার্থে যে লিঙ্গজ্ঞান জন্মে, তাহাকে বলে দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শন। সেই দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শন পূর্ব্বনিশ্চিত সেই ব্যাপ্তিসম্বন্ধের স্মারক হওয়ায় পরম্পরায় তাহাও অনুমানপ্রমাণ হয়। প্রথমসূত্রবার্ত্তিকে উদ্দ্যোতকরও এই তাৎপর্য্যে বলিয়াছেন,—"যত্তু দ্বিতীয়ং লিঙ্গদর্শনং, তৎসম্বন্ধ-স্মৃতি-ব্যক্তি-হেতুভাবাদ্ধেতুরিত্যুচ্যতে।" ন্যায়প্রয়োগস্থলে দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাক্য সেই দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শনরূপ অনুমানপ্রমাণমূলক। কারণ, সেই দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শন হইলেই হেতুবাক্যের প্রয়োগ করা যায়। বাচস্পতি মিশ্র এখানে পরে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে,* যদিও প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় লিঙ্গদর্শন এবং পূর্ব্বনিশ্চিত ব্যাপ্তির স্মরণ, এই সমস্তই অনুমানপ্রমাণ অর্থাৎ কেবল দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শন অনুমানপ্রমাণ নহে, তথাপি সেই দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শনেও পূর্ব্বোক্ত সমুদায়ের উপচারবশতঃ 'অনুমান' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। উহাকে ঔপচারিক প্রয়োগ বলে। সুতরাং হেতুবাক্য উক্ত দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শনরূপ অনুমানপ্রমাণমূলক হওয়ায় ঐ তাৎপর্য্যে হেতুবাক্যকেও অনুমান-প্রমাণ বলা হইয়াছে অর্থাৎ হেতুবাক্যেও "অনুমান" শব্দের ঔপচারিক প্রয়োগ হইয়াছে।

ভাষ্যকার প্রথমসূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন,—"**উদাহরণং প্রত্যক্ষং**"। এখানে উহা ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—"**প্রত্যক্ষবিষয়মুদহারণং**"। "প্রত্যক্ষো বিষয়ো যস্য" এইরূপ বিগ্রহবাক্যানুসারে "প্রত্যক্ষবিষয়" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, যাহার প্রতিপাদ্য বিষয় পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ হইয়াছে। প্রকৃত হেতুপদার্থে সাধ্যধর্ম্মের যে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ আছে, তাহাই উদাহরণ-বাক্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। পূর্ব্বে কোন দৃষ্টান্তপদার্থে তাহার প্রত্যক্ষ হইলে উদাহরণ-বাক্যকে পূর্ব্বোক্ত অর্থে 'প্রত্যক্ষবিষয়' বলা যায়। ফলকথা, উদাহরণ-বাক্যটি প্রত্যক্ষমূলক, ইহাই

---

* "এতদুক্তং ভবতি, যদ্যপি ত্রয়াণামপি লিঙ্গদর্শনানাং সস্মৃতীনামনুমানত্বং, তথাপি তদেকদেশে মধ্যমেঽপি লিঙ্গদর্শনে সমুদায়োপচারাদনুমানব্যপদেশ ইতি।"—তাৎপর্য্যটীকা।

ভাষ্যকারের বক্তব্য। ভাষ্যকার ইহা সমর্থন করিতে পরে বলিয়াছেন,—"দৃষ্টেনাদৃষ্টসিদ্ধেঃ"। বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, কোন দৃষ্টান্তপদার্থে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ দৃষ্ট (প্রত্যক্ষ) হইলে তদ্দ্বারা অদৃষ্টের অর্থাৎ সাধ্য-ধর্ম্মীতে অনুমেয় পদার্থের সিদ্ধি হয়। বস্তুতঃ মূল কোন প্রত্যক্ষ স্বীকার না করিলে অনুমান দ্বারা অপ্রত্যক্ষ পদার্থের সিদ্ধি হইতে পারে না, ইহাই ভাষ্যকারের চরম তাৎপর্য্য। অনুমানাদি কোন প্রমাণ দ্বারা ব্যাপ্তিনিশ্চয় স্থলেও তাহার মূল কোন প্রত্যক্ষ স্বীকার্য্য। জয়ন্ত ভট্টও বলিয়াছেন,—"উদাহরণন্তু প্রত্যক্ষেণ, তন্মূলত্বাদ্ব্যাপ্তিপরিচ্ছেদস্য।" অর্থাৎ উদাহরণ-বাক্যটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হয়। কারণ, উদাহরণ-বাক্যবোধ্য ব্যাপ্তিসম্বন্ধের পরিচ্ছেদ বা নিশ্চয় প্রত্যক্ষ-প্রমাণমূলক। ভাষ্যকারও ঐ তাৎপর্য্যে পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—"উদাহরণং প্রত্যক্ষং।"

ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—"উপমানমুপনয়ঃ, তথেত্যুপসংহারাৎ" ইত্যাদি। প্রথমসূত্র-বার্ত্তিকে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন,—"যথাতথেত্যুপমানৈকদেশে উপমানোপচারাদুপমানমুপনয় ইতি।" বাচস্পতি মিশ্র সেখানে প্রথমে বলিয়াছেন যে, "তথা' শব্দযুক্ত উপনয়বাক্য উদাহরণ-বাক্যস্থ 'তথা' শব্দকে অপেক্ষা করে। কিন্তু ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ-বাক্যে 'যথা' শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। তথাপি উক্ত স্থলে 'যথা' শব্দের অধ্যাহার করিয়াই উপনয়বাক্যার্থ বুঝিতে হইবে। কারণ, 'যথা' শব্দের সহিত যোগ ব্যতীত 'তথা' শব্দযুক্ত বাক্যার্থ বুঝা যায় না,—ইহাই বাচস্পতি মিশ্রের তাৎপর্য্য বুঝা যায়। যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলে উদাহরণ-বাক্যের দ্বারা স্থালী প্রভৃতি দ্রব্য উৎপত্তিধর্ম্মক, ইহা বলিয়া, পরে "তথাচোৎপত্তিধর্ম্মকঃ শব্দঃ" এইরূপ 'উপনয়'বাক্য বলিলে তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, 'যথা স্থালী প্রভৃতি দ্রব্য উৎপত্তিধর্ম্মক, তথা শব্দ উৎপত্তিধর্ম্মক'। সুতরাং উক্তরূপ উপনয়বাক্য "যথা গৌস্তথা গবয়ঃ" এইরূপ উপমানবাক্যের সদৃশ। কারণ, উক্ত বাক্যের দ্বারা যেমন গবয়নামক পশুতে গোর সাদৃশ্যবিশেষের বোধ জন্মে, তদ্রূপ উক্ত উপনয়বাক্যের দ্বারা শব্দে স্থালী প্রভৃতি দ্রব্যের সাদৃশ্যবিশেষের বোধ জন্মে। সেই সাদৃশ্য উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব। বাচস্পতি মিশ্র পরে উদ্দ্যোতকরের পূর্ব্বোক্ত কথার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, "যথা গৌস্তথা গবয়ঃ" এইরূপ বাক্য শ্রবণের পরে গবয় পশুতে গোর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ ও সেই পূর্ব্বশ্রুত বাক্যের অর্থস্মরণ উপমানপ্রমাণ হয়। সেই উপমানপ্রমাণের অংশভূত সাদৃশ্যে যে

"যথাতথাভাব" থাকে, তাহা তথাশব্দযুক্ত 'উপনয়'বাক্যেও থাকে। সুতরাং উপনয়বাক্য ঐরূপে উপমান-প্রমাণের সদৃশ হওয়ায় তাহাতে উপমানত্বের উপচার হইয়াছে। অর্থাৎ উপনয়বাক্যে 'উপমান' শব্দের ঔপচারিক প্রয়োগ হইয়াছে।* জয়ন্ত ভট্ট এখানে "যথা গৌস্তথা গবয়ঃ" এইরূপ বনেচর-বাক্যকেই উপমানপ্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া উপনয়বাক্যকে তাহার সদৃশ বলিয়া উপমানপ্রমাণকে উপনয়বাক্যের অনুগ্রাহক বলিয়াছেন।† কিন্তু উক্তরূপ উপমানবাক্যই যে, উপমানপ্রমাণ, ইহা জয়ন্ত ভট্টের নিজ মত নহে। আর ভাষ্যকারের যে উহাই মত, ইহাও তিনি নিঃসন্দেহে বলিতে পারেন নাই। (পূর্ব্বে ১৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

যে যাহা হউক, কিন্তু এখানে চিন্তনীয় এই যে, চতুর্থ অবয়ব 'উপনয়'বাক্য যে কোনরূপে উপমানপ্রমাণের সদৃশ হইলেও উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের মতে অর্থবিশেষে শব্দবিশেষের বাচ্যত্বনির্ণয়ই উপমানপ্রমাণের ফল। কিন্তু উপনয়বাক্যের মূলে উক্তরূপ কোন উপমান আছে, ইহা বলা যায় না। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতিও তাহা বলেন নাই। কিন্তু উপনয়বাক্য উপমানপ্রমাণ-মূলক না হইলে ভাষ্যকার পূর্ব্বে পঞ্চাবয়বরূপ ন্যায়বাক্যকে কিরূপে "পরমন্যায়" বলিয়াছেন? উদ্দ্যোতকরও উহার ব্যাখ্যা করিতে পূর্ব্বে ন্যায়বাক্যকে সর্ব্ব-প্রমাণমূলক বলিয়াছেন (পূর্ব্ব ৫১-৫২শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বাচস্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন,—"সোঽয়ং সর্ব্বপ্রমাণবিনিবেশেন পরমো ন্যায়ঃ স্তূয়তে।" কিন্তু উপনয়বাক্যের মূলে বস্তুতঃ উপমানপ্রমাণ না থাকিলে পঞ্চাবয়বরূপ ন্যায়-বাক্যে সর্ব্বপ্রমাণের বিনিবেশ কিরূপে সম্ভব হইবে? যদি বলা যায় যে, ভাষ্যকারের মতে কেবল অর্থবিশেষে শব্দবিশেষের বাচ্যত্ব নির্ণয়ই উপমান-প্রমাণের ফল নহে। কিন্তু স্থলবিশেষে উপমানপ্রমাণের দ্বারা অন্য পদার্থেরও বোধ জন্মে, তাহা হইলে উপনয়বাক্যের মূলে তথাবিধ কোন উপমানপ্রমাণ আছে, ইহা বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ভাষ্যকার পূর্ব্বে উপমানসূত্র-ভাষ্যশেষে নিজেই বলিয়াছেন যে, উপমানপ্রমাণের অন্য বিষয়ও আছে।

---

* "তদেতস্যোপমানস্যোপদেশার্থ-স্মরণ-গবয়পিণ্ডগোসারূপ্যপ্রত্যক্ষরূপস্যৈকদেশে সারূপ্যে যো যথা তথাভাবঃ স উপনয়েঽপ্যস্তীত্যেতাবতোপমানত্বোপচার উপনয় ইত্যর্থঃ।" —তাৎপর্য্যটীকা, ৪০ পৃঃ।

† "যথা গৌস্তথা গবয় ইতিচ যথা ঘটস্তথা শব্দ ইত্যনয়া ছায়য়োপমানকরণভূতবনেচরাদি-বচনসদৃশত্বাদুপমানমুপনয়স্যানুগ্রাহকমভিধীয়তে।"—"ন্যায়মঞ্জরী", ৫৮৫ পৃঃ।

বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের ঐ কথার অন্যরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলেও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ভাষ্যকারের ঐ কথার উল্লেখপূর্ব্বক অন্যরূপ উদাহরণ বলিয়া ভাষ্যকারের উক্তরূপ মতই ব্যক্ত করিয়াছেন (পূর্ব্ব ১৮৮-১৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বৃত্তিকার উক্ত স্থলে বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যা কেন গ্রহণ করেন নাই এবং তিনি নব্যনৈয়ায়িকমতানুসারে ভাষ্যকারের উক্ত মতের প্রতিবাদ কেন করেন নাই, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। এ বিষয়ে অন্যান্য কথা দ্বিতীয় খণ্ডে (২৭২-৭৫ পৃঃ) অবশ্য দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যকার পরে পঞ্চম অবয়ব "**নিগমন**"-বাক্যের প্রয়োজন বুঝাইতে বলিয়াছেন, "**সর্ব্বেষামেকার্থ-প্রতিপত্তৌ সামর্থ্যপ্রদর্শনং নিগমনমিতি।**" বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞাদি উপনয় পর্য্যন্ত চারিটি বাক্যের প্রতিপাদ্য এক অর্থ যে, সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য হেতু, অথবা সেই সাধ্যধর্ম্ম, তাহা বুঝিতে যে উক্ত বাক্যচতুষ্টয়ের সামর্থ্য অর্থাৎ পরস্পরাপেক্ষা আবশ্যক, নিগমনবাক্য তাহারই বোধক। অর্থাৎ বাদীর শেষোক্ত নিগমনবাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বাক্যচতুষ্টয়ের পরস্পর সম্বন্ধ অভিব্যক্ত হয়। নিগমনবাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, বাদীর পূর্ব্বোক্ত বাক্যচতুষ্টয় পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ, অর্থাৎ একটি বিশিষ্টার্থ-বোধনের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত। ভাষ্যকার প্রথমসূত্র-ভাষ্যেও (৩৯শ পৃঃ) এই কথাই বলিয়াছেন। সেখানে বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞাদি বাক্যচতুষ্টয় মিলিত হইয়া যে একটি বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদন করে, তাহাতে ঐ বাক্যচতুষ্টয়ের একবাক্যতা-বুদ্ধি আবশ্যক। কিন্তু ঐ বাক্যচতুষ্টয়ের পরস্পর অপেক্ষা না বুঝিলে একবাক্যতা বুঝা যায় না।* বিচ্ছিন্নরূপে উচ্চারিত উক্তবাক্যচতুষ্টয়ের যে পরস্পর সম্বন্ধ,

---

* প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি চারিটি বাক্য বিচ্ছিন্নরূপেই উচ্চারিত হওয়ায় পৃথক্ পৃথক্ বাক্যের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন চারিটি অর্থই বুঝা যাইতে পারে; সুতরাং উহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝা আবশ্যক। উহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধই এখানে উহাদিগের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা বা অপেক্ষা। উহা বুঝিলেই ঐ বাক্যচতুষ্টয়ের "একবাক্যতা" বুঝা হয় এবং উহারই নাম "বাক্যৈকবাক্যতা"। মহর্ষি জৈমিনি ইহার লক্ষণ বলিয়াছেন,—"অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যং সাকাঙ্ক্ষঞ্চেদ্বিভাগে স্যাৎ" (পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শন, ২ অঃ, ১ পাদ, ৪৬ সূত্র)। অর্থাৎ বিচ্ছিন্নরূপে পঠিত বাক্যগুলি যদি পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ হয়, তাহা হইলে একার্থের প্রতিপাদক হওয়ায় উহারা "একবাক্য" হয়। "অনুমিতিদীধিতি"র টীকায় গদাধর ভট্টাচার্য্য "একবাক্যতা" বুঝাইতে জৈমিনির এই সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়া শেষে ফলিতার্থ বলিয়াছেন যে, পরস্পর মিলিত হইয়া বিশিষ্ট একটি অর্থের প্রতিপাদকতাই একবাক্যতা। মীমাংসকগণ উক্ত জৈমিনিসূত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যাও করিয়া উদাহরণ বলিয়াছেন। নব্য মীমাংসক খণ্ডদেবের "ভাট্টদীপিকা" দ্রষ্টব্য।

তাহাই উহাদিগের পরস্পর অপেক্ষা বা আকাঙ্ক্ষা বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং ভাষ্যকার উহাকেই উক্ত বাক্যচতুষ্টয়ের '**সামর্থ্য**" বলিয়াছেন। ভাষ্যকার পরে সেই পরস্পর সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন,—"**ইতরেতরাভিসম্বন্ধোঽপি**" ইত্যাদি।

তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বাগ্রে প্রতিজ্ঞাবাক্য অবশ্য বক্তব্য। কারণ, তাহা না বলিলে নিরাশ্রয় হেতুবাক্যাদির প্রয়োগ হইতে পারে না। বাদী প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিলে তাহার সেই প্রতিজ্ঞাবোধিত সাধ্যধর্ম্মের সাধন কি? ইত্যাদি প্রশ্নানুসারেই ক্রমে হেতুবাক্য প্রভৃতির প্রয়োগ কর্ত্তব্য। প্রতিজ্ঞা-বাক্যের পরে হেতুবাক্য না বলিলে বাদীর সাধ্যধর্ম্মের সাধন কি, তাহা বলা হয় না এবং পরে দৃষ্টান্তপদার্থ ও সাধ্যধর্ম্মীতে হেতুর উপসংহার হয় না এবং সর্ব্বশেষে নিগমনবাক্যও বলা যায় না। কারণ, ঐ সমস্তই হেতুসাপেক্ষ। হেতুবাক্যের পরে উদাহরণবাক্য না বলিলে দৃষ্টান্তপদার্থ কি, তাহার বোধ না হওয়ায় দৃষ্টান্তপদার্থের সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্যকে বাদীর সাধ্যধর্ম্মের সাধন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না এবং উদাহরণ-বাক্যানুসারে উপনয়বাক্যও বলা যায় না। উপনয়বাক্য না বলিলে বাদীর সাধ্যধর্ম্মীতে যে, তাহার সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য সেই হেতুপদার্থ আছে, ইহা বলা হয় না। সুতরাং "লিঙ্গ-পরামর্শ" না হওয়ায় মধ্যস্থগণের সেই সাধ্যধর্ম্ম বিষয়ে অনুমিতি জন্মিতে পারে না। আর সর্ব্বশেষে নিগমনবাক্য না বলিলে পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাদি বাক্যচতুষ্টয়ের পরস্পর সম্বন্ধ ব্যক্ত না হওয়ায় তদ্দ্বারা একটি বিশিষ্টার্থবোধ জন্মিতে পারে না। ভাষ্যে "**একার্থেন প্রবর্ত্তনং**" এই কথার দ্বারা একার্থবিশিষ্টরূপে প্রবর্ত্তন অর্থাৎ প্রতিপাদন বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার পরে ঐ কথারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"**তথেতি প্রতিপাদনং**"। তাৎপর্য্য এই যে, প্রতিজ্ঞাদি বাক্যচতুষ্টয় "তথা" অর্থাৎ একার্থবিশিষ্ট অর্থাৎ পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ হওয়ায় একবাক্যতাপন্ন, এইরূপ যে বোধ, তাহা নিগমনবাক্য ব্যতীত হইতে পারে না। নিগমনবাক্যই উক্ত বাক্য-চতুষ্টয়কে উক্তরূপে প্রতিপাদন করে, নচেৎ আর কে তাহা করিবে? ভাষ্যশেষে "**কস্য**" এই কর্ত্তৃপদে কৃদ্‌যোগে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ বুঝা যায়।

ভাষ্য। অথাবয়বার্থঃ—সাধ্যস্য ধর্ম্মস্য ধর্ম্মিণা সম্বন্ধোপাদানং প্রতিজ্ঞার্থঃ। উদাহরণেন সমানস্য বিপরীতস্য বা সাধ্যস্য ধর্ম্মস্য সাধকভাববচনং হেত্বর্থঃ। ধর্ম্ময়োঃ সাধ্যসাধন-ভাব-প্রদর্শন-

মেকত্রোদাহরণার্থঃ। সাধনভূতস্য ধর্ম্মস্য সাধ্যেন ধর্ম্মেণ সামানাধিকরণ্যোপপাদনমুপনয়ার্থঃ। উদাহরণস্থয়োর্দ্ধর্ম্ময়োঃ সাধ্যসাধনভাবোপপত্তৌ সাধ্যে বিপরীত-প্রসঙ্গপ্রতিষেধার্থং নিগমনম্।

ন চৈতস্যাং হেতূদাহরণ-পরিশুদ্ধৌসত্যাং সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানস্য বিকল্পাজ্জাতিনিগ্রহস্থানবহুত্বং প্রক্রমতে। অব্যবস্থাপ্য খলু ধর্ম্ময়োঃ সাধ্যসাধনভাবমুদাহরণে জাতিবাদী প্রত্যবতিষ্ঠতে। ব্যবস্থিতে হি খলু ধর্ম্ময়োঃ সাধ্য-সাধনভাবে দৃষ্টান্তস্থে গৃহ্যমাণে সাধনভূতস্য ধর্ম্মস্য হেতুত্বেনোপাদানং, ন সাধর্ম্ম্যমাত্রস্য ন বৈধর্ম্ম্যমাত্রস্য বেতি ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর অবয়বসমূহের 'অর্থ' (প্রয়োজন) অর্থাৎ যথাক্রমে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের প্রত্যেকের প্রয়োজন (উক্ত হইতেছে)। ধর্ম্মীর সহিত সাধ্যধর্ম্মের সম্বন্ধের উপাদান অর্থাৎ যে ধর্ম্মীতে যাহা সাধ্যধর্ম্ম, সেই সাধ্যধর্ম্ম-বিশিষ্টরূপে সেই ধর্ম্মীর কথন (১) প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োজন। দৃষ্টান্তপদার্থের সহিত সমান অথবা বিপরীত পদার্থের অর্থাৎ সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্যরূপ কোন পদার্থের সাধ্যধর্ম্মের সাধকত্ব কথন (২) হেতুবাক্যের প্রয়োজন। এক পদার্থে অর্থাৎ দৃষ্টান্তভূত কোন পদার্থে ধর্ম্মদ্বয়ের সাধ্য-সাধনভাব-প্রদর্শন (৩) "উদাহরণ"-বাক্যের প্রয়োজন। সাধনভূত ধর্ম্মের (হেতুপদার্থের) সাধ্যধর্ম্মের সহিত "সামানাধিকরণ্যে"র অর্থাৎ একাধারে বর্ত্তমানতার উপপাদন (৪) "উপনয়"-বাক্যের প্রয়োজন। 'উদাহরণস্থ' অর্থাৎ সেই দৃষ্টান্তপদার্থে স্থিত ধর্ম্মদ্বয়ের সাধ্য-সাধনভাবের উপপত্তি বা জ্ঞান হইলে সাধ্যধর্ম্মীতে 'বিপরীত প্রসঙ্গে'র অর্থাৎ সেই সাধ্যধর্ম্মের বিপরীত অভাবের আপত্তির নিষেধার্থ (৫) নিগমন [অর্থাৎ উপনয়বাক্য পর্য্যন্ত বলিলেও সেই সাধ্যধর্ম্মীতে সেই সাধ্যধর্ম্মের অভাবের আপত্তির নিরাস "নিগমন"-বাক্যের প্রয়োজন।]

"হেতু" ও উদাহরণের এই পরিশুদ্ধি থাকিলে সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য দ্বারা 'প্রত্যবস্থানে'র (দোষ প্রদর্শনের) বিকল্প অর্থাৎ নানাপ্রকারতাবশতঃ "জাতি" ও "নিগ্রহস্থানে"র বহুত্ব সম্ভব হয় না। যেহেতু "জাতি"বাদী অর্থাৎ "জাতি"-নামক অসদুত্তরবাদী দৃষ্টান্তপদার্থে ধর্ম্মদ্বয়ের সাধ্য-সাধনভাবকে ব্যবস্থাপন না

করিয়া “প্রত্যবস্থান” করেন অর্থাৎ নানাবিধ অসত্য দোষ বলেন। কিন্তু ধর্ম্মদ্বয়ের সম্বন্ধে ব্যবস্থিত দৃষ্টান্তস্থ সাধ্য-সাধনভাব জ্ঞায়মান হইলে সাধনভূত ধর্ম্মেরই হেতুত্বরূপে গ্রহণ হয়, সাধর্ম্ম্যমাত্রের হেতুত্বরূপে গ্রহণ হয় না, অথবা বৈধর্ম্ম্যমাত্রের হেতুত্বরূপে গ্রহণ হয় না।

টিপ্পনী—প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের প্রত্যেকের প্রয়োজন পূর্ব্বে উক্ত হইলেও শিষ্যগণের হিতকর বলিয়া ভাষ্যকার পরে আবার তাহার প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং পরে পঞ্চাবয়ব-প্রতিপাদন বিষয়ে প্রযত্নের প্রয়োজনও বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রও এখানে ভাষ্যকারের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—“অবয়বানাং প্রাতিস্বিকং প্রয়োজনমুক্তমপি শিষ্যহিততয়া ভাষ্যকারঃ প্রতিপাদয়তি ‘অথে’তি। পঞ্চাবয়ব-প্রতিপাদনপ্রযত্নস্য প্রয়োজনং দর্শয়তি “ন চৈতস্যা”মিতি।” অর্থাৎ ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, হেতু ও উদাহরণের পরিশুদ্ধি থাকিলে অর্থাৎ বিশুদ্ধ হেতু ও বিশুদ্ধ উদাহরণ গ্রহণ করিলে ‘জাতি’ ও ‘নিগ্রহস্থানে’র বহুত্ব সম্ভব হয় না। কারণ, “জাতিবাদী” অর্থাৎ যে প্রতিবাদী গোতমোক্ত ‘জাতি’নামক কোন অসদুত্তর বলেন, তিনি প্রকৃত ‘হেতু’ গ্রহণ করিলে তাহা বলিতে পারেন না। কিন্তু তিনি কোন দৃষ্টান্তে ধর্ম্মদ্বয়ের সাধ্যসাধনভাবকে ব্যবস্থাপনা না করিয়া যাহা প্রকৃত হেতু নহে, এমন কোন সাধর্ম্ম্যমাত্র অথবা বৈধর্ম্ম্যমাত্রকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া “প্রত্যবস্থান” করেন অর্থাৎ বাদীর হেতুতে অসত্যদোষ বলেন। সেই প্রত্যবস্থানের নানাপ্রকারতাবশতঃ “জাতি” ও “নিগ্রহস্থান” বহু হয়। কিন্তু যে ধর্ম্মদ্বয়ের সাধ্যসাধনভাব কোন দৃষ্টান্তপদার্থে ব্যবস্থিত, সেই সাধ্যসাধনভাব বুঝিলে তন্মধ্যে প্রকৃত সাধনভূত ধর্ম্মকেই হেতুরূপে গ্রহণ করিতে হয়। কেবল কোন সাধর্ম্ম্যমাত্র অথবা বৈধর্ম্ম্যমাত্রকে হেতুরূপে গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং পঞ্চাবয়বের স্বরূপ ও তাহার প্রয়োগ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান সম্পাদনের জন্য তাহার প্রতিপাদন অবশ্য কর্ত্তব্য। “জাতি” ও “নিগ্রহস্থানে”র লক্ষণাদি এই অধ্যায়ের শেষে দ্রষ্টব্য।

অবয়বের সংখ্যা বিষয়ে মতভেদ ও পঞ্চাবয়ববাদের যুক্তি

মীমাংসকসম্প্রদায় বলিয়াছেন,—বয়ং ত্রয়ং। উদাহরণপর্য্যন্তং যদ্বোদাহরণাদিকং।” অর্থাৎ আমরা প্রতিজ্ঞাদিত্রয় অথবা উদাহরণাদিত্রয়ই অবয়বরূপে স্বীকার করি। উক্ত মতে প্রথম কল্পে হেতুবাক্যের দ্বারাই উপনয়বাক্যের

এবং দ্বিতীয় কল্পে উপনয়বাক্যের দ্বারাই হেতুবাক্যের ফলসিদ্ধি হয় এবং নিগমনবাক্যের দ্বারাই প্রতিজ্ঞাবাক্যের ফলসিদ্ধি হয়। কিন্তু গঙ্গেশ উপাধ্যায় উক্ত মতের প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছেন যে, 'উপনয়'বাক্য ব্যতীত অন্য কোন অবয়বের দ্বারা মধ্যস্থগণের অনুমিতির চরম কারণ 'তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ' জন্মিতে পারে না। (পূর্ব্ব ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। উক্ত 'তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ'কে অনাবশ্যক বলিলেও অনুমানের ধর্ম্মিরূপ সেই পক্ষপদার্থ সেই হেতুবিশিষ্ট, এইরূপ জ্ঞান (যেমন "ধূমবান্ পর্ব্বতঃ" এইরূপ জ্ঞান) অনুমিতির কারণরূপে সকলেরই স্বীকার্য্য। উহারই নাম হেতুর **'পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান'**। সুতরাং মধ্যস্থগণের উক্তরূপ "পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞানে"র জন্যও উপনয়বাক্য প্রয়োগ অবশ্য কর্ত্তব্য। বাদী ও প্রতিবাদীর হেতুবাক্যের দ্বারাই সেই 'পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান'ও জন্মে, ইহা বলা যায় না। কারণ, হেতুবাক্যের দ্বারা সেই পদার্থ যে হেতু, এই মাত্রই বুঝা যায়। এবং তাহাই বলিবার জন্য মধ্যস্থের প্রশ্নানুসারে হেতুবাক্য বলা হয়। ভাষ্যকারও এখানে ঐ তাৎপর্য্যে বলিয়াছেন,—..."সাধ্যস্য ধর্ম্মস্য সাধকভাববচনং হেত্বর্থঃ।" অর্থাৎ দৃষ্টান্তপদার্থের সমান অথবা বিপরীত যে ধর্ম্ম (সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্য), তাহাতে যে, সেই সাধ্যধর্ম্মের সাধকত্ব আছে, ইহা বলাই হেতুবাক্যের প্রয়োজন। সুতরাং তদ্দ্বারা সেই হেতুর পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান হইতে পারে না।

গঙ্গেশ পরে বলিয়াছেন যে, বাদীর প্রতিজ্ঞাবাক্যার্থ পূর্ব্বে সিদ্ধ না হওয়ায় তদ্দ্বারা হেতুবাক্যবোধিত হেতুপদার্থে পক্ষধর্ম্মতার অনুমানও হইতে পারে না। অন্যথা প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়াই অনুমানের দ্বারা বাদীর অন্যান্য বক্তব্যের বোধ হইলে অন্যান্য অবয়ব প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। আর বাদীর প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতুবাক্যের দ্বারা অর্থতঃই সেই হেতুপদার্থে পক্ষধর্ম্মতার বোধ জন্মে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, মধ্যস্থগণ সর্ব্বত্রই সমান ব্যুৎপন্ন নহেন এবং সর্ব্বত্রই বাদীর নিজ কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করাই উচিত। সুতরাং সর্ব্বত্রই উপনয়বাক্য অবশ্য বক্তব্য। এবং প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরে মধ্যস্থের প্রশ্নানুসারে হেতুবাক্যও অবশ্য বক্তব্য। হেতুবাক্যে পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারাই সেই হেতুপদার্থে সেই সাধ্যধর্ম্মের সাধকত্বরূপ হেতুত্ব বুঝা যায়। কিন্তু উপনয়বাক্যের দ্বারা তাহা বুঝা যায় না। এইরূপ হেতুবাক্যের পরে সেই সাধ্যধর্ম্ম ও সেই হেতুপদার্থে সাধ্য-সাধনভাব প্রদর্শনের জন্য উদাহরণবাক্যও বক্তব্য। ভাষ্যকারও এখানে উদাহরণবাক্যের উক্তরূপ প্রয়োজনই বলিয়াছেন। পরে নব্য

নৈয়ায়িকগণের মধ্যে অনেকে বলিয়াছেন যে, যে স্থলে বাদী বা প্রতিবাদীর কথিত হেতুপদার্থে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তি সর্ব্বসিদ্ধ, সেইরূপ স্থলে উদাহরণবাক্য প্রয়োগ অনাবশ্যক। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি সমর্থন করিয়াছেন যে, সেইরূপ স্থলেও উদাহরণবাক্য প্রয়োগ কর্ত্তব্য। 'অবয়বদীধিতি'র টীকায় প্রথমে জগদীশ তর্কালঙ্কারও ইহা করিতে বলিয়াছেন,—"শিরোমণিমতে তত্রাপি বাদিনঃ স্বকর্ত্তব্যনির্ব্বাহার্থমুদাহরণস্যাবশ্যকত্বাৎ" ইত্যাদি।

কিন্তু জৈন নৈয়ায়িকগণ 'বহির্ব্ব্যাপ্তি'-প্রদর্শনের জন্য উদাহরণ-বাক্যকে ব্যর্থ বলিয়াছেন। প্রাচীন জৈনাচার্য্য **সিদ্ধসেন দিবাকর** 'ন্যায়াবতার' গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"অন্তর্ব্ব্যাপ্ত্যৈব সাধ্যস্য সিদ্ধের্ব্বহিরুদাহৃতিঃ। ব্যর্থা স্যাৎ, তদসদ্ভাবেঽপ্যেবং ন্যায়বিদো বিদুঃ॥" জৈন নৈয়ায়িক **বাদিদেবসূরিও** "প্রমাণনয়তত্ত্বালোকালঙ্কার" গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"অন্তর্ব্যাপ্ত্যা হেতোঃ সাধ্য-প্রত্যায়নে শক্তাবশক্তৌ চ বহির্ব্ব্যাপ্তেরুদ্ভাবনং ব্যর্থম্॥" "পক্ষীকৃত এব বিষয়ে সাধনস্য সাধ্যেন ব্যাপ্তিরন্তর্ব্যাপ্তিরন্যত্র তু বহির্ব্যাপ্তিঃ।"—(তৃতীয় পঃ, ৩৭-৩৮ সূত্র)। অর্থাৎ যে ধর্ম্মীতে কোন ধর্ম্মের অনুমিতি হইবে, সেই ধর্ম্মিরূপ পক্ষপদার্থে সাধ্যধর্ম্মের সহিত সাধনভূত ধর্ম্মের যে ব্যাপ্তি, তাহা "**অন্তর্ব্যাপ্তি**"। কিন্তু অন্যত্র সেই ধর্ম্ম বা তত্তুল্য ধর্ম্মের যে ব্যাপ্তি, তাহা '**বহির্ব্যাপ্তি**'। যেমন পর্ব্বতকে পক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া, তাহাতে ধূম হেতুর দ্বারা বহ্নির অনুমিতি স্থলে সেই পর্ব্বতে ধূমে বহ্নির যে ব্যাপ্তির নিশ্চয় জন্মে, তাহাই '**অন্তর্ব্যাপ্তি**'। কিন্তু তৎপূর্ব্বে পাকশালাদি স্থানে ধূমে বহ্নির যে ব্যাপ্তির নিশ্চয় জন্মে, তাহা 'বহির্ব্যাপ্তি'। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত 'অন্তর্ব্যাপ্তি'র নিশ্চয় ব্যতীত 'বহির্ব্যাপ্তি' নিশ্চয়ের দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি বা অনুমিতি হইতে পারে না। এইরূপ সর্ব্বত্র 'অন্তর্ব্যাপ্তি' নিশ্চয় জন্যই সাধ্যসিদ্ধি হয়। সুতরাং 'বহির্ব্যাপ্তি' প্রদর্শনের জন্য উদাহরণ-বাক্য প্রয়োগ ব্যর্থ। আর 'অন্তর্ব্ব্যাপ্তি' নিশ্চয় জন্য সাধ্যসিদ্ধি সম্ভব না হইলেও 'বহির্ব্ব্যাপ্তি' প্রদর্শন ব্যর্থ। তাই কথিত হইয়াছে, "অন্তর্ব্যাপ্তেঃ সাধ্য-সংসিদ্ধি-শক্তৌ বাহ্যব্যাপ্তের্ব্বর্ণনং বন্ধ্যমেব। অন্তর্ব্যাপ্তেঃ সাধ্যসংসিদ্ধ্যশক্তৌ বাহ্যব্যাপ্তের্ব্বর্ণনং বন্ধ্যমেব॥" এই মতে 'উপনয়' এবং 'নিগমন'বাক্যও বক্তব্য নহে। কারণ, 'প্রতিজ্ঞা' ও 'হেতু'বাক্যের দ্বারাই অবয়ব প্রয়োগের ফল-সিদ্ধি হয়। তাই জৈন নৈয়ায়িক **ধর্ম্মভূষণ যতিও** "ন্যায়দীপিকা"য় বলিয়াছেন,—"দ্বাববয়বৌ প্রতিজ্ঞা হেতশ্চ।"

কিন্তু অনেক বৌদ্ধ নৈয়ায়িক 'প্রতিজ্ঞা'র লক্ষণ বলিলেও তাঁহারা প্রতিজ্ঞা-

বাক্যরূপ অবয়ব স্বীকার করেন নাই। কারণ, প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি না হওয়ায় উহা তাঁহাদিগের মতে সাধনের অঙ্গ নহে।* এই মতানুসারেই প্রাচীন আলঙ্কারিক ভামহ "কাব্যালঙ্কার" গ্রন্থে (৫ম পঃ) বলিয়াছেন,—"ন্যূনং নেষ্টং প্রতিজ্ঞয়া।" অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাবাক্য না বলিলে "প্রতিজ্ঞান্যূন" নামক নিগ্রহস্থান স্বীকৃত হয় নাই। আর উক্ত মতে 'উপনয়'-বাক্যের দ্বারাই হেতুর বোধ হওয়ায় 'হেতু'বাক্য-প্রয়োগও অনাবশ্যক এবং সর্ব্বশেষে নিগমনবাক্যপ্রয়োগও অনাবশ্যক। তাই "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে **বরদরাজ** বলিয়াছেন,—'সৌগতাস্তু সোপনীতিমুদাহৃতিং।" অর্থাৎ বৌদ্ধ-সম্প্রদায় 'উদাহরণ' ও 'উপনয়' এই অবয়বদ্বয় বলেন। বস্তুতঃ বৌদ্ধাচার্য্য **রত্নকীর্ত্তি** "ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি" গ্রন্থে সৎপদার্থমাত্রের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ করিতে 'উদাহরণ' ও 'উপনয়'বাক্যেরই প্রয়োগ করিয়াছেন—"যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং, যথা ঘটঃ, সন্তশ্চামী বিবাদাস্পদীভূতাঃ পদার্থা ইতি।" **'জ্ঞানশ্রী'**ও বলিয়াছেন,—**"যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং, যথা জলধরঃ, সন্তশ্চ ভাবা অমী।"** কিন্তু বৌদ্ধাচার্য্য **রত্নাকরশান্তি** "অন্তর্ব্যাপ্তিসমর্থন" নামক গ্রন্থে বহু সূক্ষ্ম বিচারপূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন যে, সর্ব্বত্র অন্তর্ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের দ্বারাই সাধ্যসিদ্ধি হয়। সুতরাং 'বহির্ব্যাপ্তি' প্রদর্শনের জন্য দৃষ্টান্ত প্রয়োগ অনাবশ্যক। এই মতে "যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং" এইরূপে 'অন্তর্ব্যাপ্তি নিশ্চয়' জন্যই সৎ পদার্থমাত্রে ক্ষণিকত্ব অনুমান প্রমাণসিদ্ধ হয়। সুতরাং সর্ব্বসম্মত কোন দৃষ্টান্তের অভাবে উক্ত অনুমানকে অসম্ভব বলা যায় না।

কিন্তু "তত্ত্বচিন্তামণি"কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় সামান্য ব্যাপ্তি ও বিশেষ ব্যাপ্তির লক্ষণ বলিলেও তাঁহার মতে কোন দৃষ্টান্তপদার্থে সামান্য ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইলেই বিশেষ ব্যাপ্তিরও নিশ্চয় জন্মে এবং ধূমত্বরূপে• ধূমসামান্যেই বহ্নিত্বরূপে

* উক্ত বৌদ্ধ মতে বাক্য স্বয়ংপ্রমাণ না হইলেও যোগ্য পদার্থের সূচক হওয়ায় তাহার বোধে পরম্পরায় হেতু হয়। কিন্তু প্রতিজ্ঞাবাক্য কোনরূপেই সাধ্য সিদ্ধির হেতু হয় না। তাই কথিত হইয়াছে,—"শক্তস্য সূচকং হেতুর্ব্বচোঽশক্তমপি স্বয়ং। সাধ্যাভিধানাৎ পক্ষোক্তিঃ পারম্পর্য্যেণ নাপ্যলম্॥" "ন্যায়কন্দলী"কার শ্রীধর ভট্ট উক্ত বৌদ্ধকারিকাও উদ্ধৃত করিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ না করিলে প্রথমে হেতুর আশ্রয় ধর্ম্মীরই বোধ হয় না। সুতরাং নিরাশ্রয় হেতুর প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। সুতরাং প্রতিজ্ঞাবাক্যও সাধ্য-সিদ্ধির অঙ্গ। তাই পরে বলিয়াছেন,—......"ইত্যাশ্রয়োপদর্শনদ্বারেণ হেতুং প্রবর্ত্তয়ন্তী প্রতিজ্ঞা সাধ্যসিদ্ধেরঙ্গম্। তথাচ ন্যায়ভাষ্যং—'অসত্যাং প্রতিজ্ঞায়ামনাশ্রয়া হেত্বাদয়ো ন প্রবর্ত্তেরন্নিতি'।"—'ন্যায়কন্দলী', ২০৪ পৃঃ।

বহ্নি-সামান্যের ব্যাপ্তি আছে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বাচস্পতি মিশ্রও "তাৎপর্য্যটীকা"য় বলিয়াছেন,—"তস্মাদন্তর্ব্বহির্ব্বা সর্ব্বোপসংহারেণাবিনা-ভাবোঽবগন্তব্যঃ।" (২৯ পৃঃ)। জয়ন্ত ভট্ট উক্ত বিষয়ে বিচার করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্তরূপ সামান্যব্যাপ্তি বা 'বহির্ব্যাপ্তি' হইতে 'অন্তর্ব্যাপ্তি' পৃথক্ কোন ব্যাপ্তি নহে। প্রথমে অন্যত্র সামান্যতঃ কোন ধর্ম্মে সাধ্যধর্ম্মের যে ব্যাপ্তির নিশ্চয় জন্মে, তাহাই অনুমানের পক্ষভূত পদার্থকে অপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ তাহার অন্তর্ভাবে 'অন্তর্ব্যাপ্তি' নামে কথিত হয়। বস্তুতঃ পর্ব্বতীয় ধূমে পর্ব্বতীয় বহ্নির বিশেষ ব্যাপ্তি থাকিলেও প্রথমে উক্ত সামান্য ব্যাপ্তির নিশ্চয় ব্যতীত সেই বিশেষ ব্যাপ্তির নিশ্চয়ও সম্ভব হয় না। সুতরাং সামান্য ব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্য উদাহরণবাক্যও বক্তব্য। নচেৎ মধ্যস্থগণের অনুমিতির কারণ ব্যাপ্তিনিশ্চয় সম্ভব হয় না। তাই বাদী ও প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপন করিতে প্রতিজ্ঞা ও হেতুবাক্য বলিলে মধ্যস্থগণের প্রশ্নানুসারে পরে উদাহরণবাক্য বলিতে বাধ্য হন। বাদী ও প্রতিবাদীর কথিত হেতুপদার্থে তাঁহাদিগের সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তি বুঝিতে মধ্যস্থগণের কোন প্রশ্নই হইতে পারে না, ইহা কথনই বলা যায় না। তীক্ষ্ণবুদ্ধি **রত্নাকরশান্তি** "অন্তর্ব্যাপ্তি" সমর্থন করিয়া পরে বলিয়াছেন,—

"তস্মাদ্ব্যসনমাত্রং বহির্ব্যাপ্তিগ্রহণে বিশেষেণ সত্ত্বে হেতৌ কেবলং জড়ধিয়ামেব নিয়মেন দৃষ্টান্তসাপেক্ষঃ সাধনপ্রয়োগঃ পরিতোষায় জায়তে, তেষা-মেবানুগ্রহার্থমাচার্য্যো দৃষ্টান্তমুপাদত্তে,—**'যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা ঘট'** ইতি। পটুমতয়স্তু নৈবং দৃষ্টান্তমপেক্ষন্তে।" ("অন্তর্ব্যাপ্তিসমর্থন", সোসাইটী সং, ১১২ পৃঃ)

তাৎপর্য্য এই যে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তিগণ উক্তরূপ দৃষ্টান্ত না বলিলেও উক্ত হেতুতে ক্ষণিকত্বের ব্যাপ্তিনিশ্চয় করিতে পারেন। তাঁহারা দৃষ্টান্তের কোন অপেক্ষাই করেন না। কিন্তু জড়বুদ্ধি ব্যক্তিদিগকে বুঝাইবার জন্যই আচার্য্য **রত্নকীর্ত্তি** পরে **"যথা ঘটঃ"** এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রয়োগও করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বক্তব্য এই যে, আচার্য্য রত্নকীর্ত্তি কি জড়বুদ্ধি ব্যক্তিদিগকে বুঝাইবার জন্যই ঐরূপ সূক্ষ্ম বিচারপূর্ব্বক **"ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি"** গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন? আর সেই সমস্ত ব্যক্তি কি উক্তরূপ দৃষ্টান্ত বলিলেও সৎপদার্থমাত্রে ক্ষণিকত্বের নিশ্চয় করিতে পারেন? আর তীক্ষ্ণবুদ্ধিগণ যে, উক্তরূপ দৃষ্টান্তের অপেক্ষাই করেন না, ইহাও কি শপথ করিয়া বলা যায়? পরন্তু বিচারস্থলে বাদী ও

প্রতিবাদী পূর্ব্বেই কিরূপে অপরকে তীক্ষ্ণবুদ্ধি বা মন্দবুদ্ধি বলিয়া নিশ্চয় করিবেন,—ইহাও ত আমরা বুঝিতে পারি না।

শ্বেতাম্বর জৈনাচার্য্য **বাদিদেবসূরিও** পরে বলিয়াছেন,—"মন্দমতীংস্তু ব্যুৎপাদয়িতুং দৃষ্টান্তোপনয়-নিগমনান্যপি প্রযোজ্যানি।" **কুমারনন্দীও** বলিয়াছেন,—"প্রয়োগপরিপাটী তু প্রতিপাদ্যানুসারতঃ।" অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বা বোদ্ধা অনুসারেই প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের প্রয়োগ কর্ত্তব্য। শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব বৈদান্তিক শ্রীনিবাস দাসও **"যতীন্দ্রমতদীপিকা"** গ্রন্থে উক্তরূপ মত ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—"অস্মাকন্তনিয়মঃ, ক্বচিৎ পঞ্চাবয়বাঃ·· মৃদুমধ্যমকঠোরধিয়াং ইত্যাদি। অর্থাৎ কোমলবুদ্ধি বা মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের নিকটে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বই বক্তব্য। আর মধ্যমবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের নিকটে "উদাহরণ", "উপনয়"ও "নিগমন" এই অবয়বত্রয়ই বক্তব্য। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের নিকটে 'উদাহরণ' ও 'উপনয়' এই অবয়বদ্বয়ই বক্তব্য। কারণ, তদ্দ্বারাই তাঁহারা সমস্ত বক্তব্য বুঝিতে পারে।

কিন্তু ইহাতেও বক্তব্য এই যে, উক্ত মতে অবয়ব প্রয়োগের অনিয়ম কথিত হইলেও বিশেষ নিয়মই স্বীকৃত হইয়াছে এবং স্থলবিশেষে 'পঞ্চাবয়ব'বাদই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি মধ্যস্থও যদি বাদীকে তাঁহার সাধ্য কি? এবং তাহার সাধক হেতু কি? এইরূপ প্রশ্ন করেন, তাহা হইলেও কি বাদী সেখানে প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতুবাক্য বলিবেন না? তাহা বলিতে বাধ্য হইলে আর উক্তরূপ বিশেষ নিয়মও সমর্থন করা যায় না। আর যাঁহারা 'অন্তর্ব্যাপ্তি'-নিশ্চয়কেই সর্ব্বত্র অনুমিতির কারণ বলিয়া বহির্ব্যাপ্তিপ্রদর্শনকে ব্যর্থ বলিয়াছেন, তাঁহারাও মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিকে বুঝাইবার নিমিত্ত উদাহরণবাক্য প্রয়োগ কর্ত্তব্য বলিয়াছেন কেন? তাঁহাদিগের পক্ষে বহির্ব্যাপ্তি নিশ্চয় ব্যতীত 'অন্তর্ব্যাপ্তি'র নিশ্চয় সম্ভব হয় না, ইহা বলিলে যে স্থলে কোন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তিরও যে কোন কারণে তাহা সম্ভব হয় না এবং তজ্জন্য তিনি প্রশ্ন করেন, সেই স্থলে তাঁহাকে বুঝাইতেও উদাহরণবাক্য প্রয়োগ কর্ত্তব্য, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। পরন্তু বাদী ও প্রতিবাদীর জিগীষামূলক বিচারস্থলে তাঁহারা পূর্ব্বেই মধ্যস্থগণের বুদ্ধির তারতম্য নিশ্চয় করিয়া তদনুসারে বাক্যপ্রয়োগ করিতে পারেন না। এই সমস্ত বোদ্ধা 'প্রতিজ্ঞা' ও 'হেতু'বাক্য বলিলেই আমার সমস্ত বক্তব্য বুঝিতে পারিবেন, অথবা ইঁহারা 'উদাহরণ' ও 'উপনয়'-বাক্য বলিলেই আমার সমস্ত বক্তব্য বুঝিতে পারিবেন, আমার অনুক্ত বিষয়ে পরে কোন প্রশ্ন করিবেন না—

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কখনই তাঁহারা বাক্যসংক্ষেপ করিতে পারেন না। কারণ, তাহা করিলে পরে 'নিগ্রহস্থানে'র আশঙ্কা থাকে। সুতরাং জিগীষু বাদী ও প্রতিবাদীর নিজকর্ত্তব্যনির্ব্বাহের জন্য সর্ব্বত্রই প্রতিজ্ঞাদি নিগমন পর্য্যন্ত বাক্য প্রয়োগ কর্ত্তব্য, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ।

স্মরণ করিতে হইবে, ভাষ্যকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন,— **"সর্ব্বেষামেকার্থ-প্রতিপত্তৌ সামর্থ্য-প্রদর্শনং নিগমনম্।"** প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও 'নিগমন'বাক্যের উক্তরূপ প্রয়োজনই সমর্থন করিয়াছেন।* কিন্তু ভাষ্যকার নিগমনবাক্যের অন্য বিশেষ প্রয়োজনও ব্যক্ত করিতে পরে বলিয়াছেন,—…**"সাধ্যে বিপরীতপ্রসঙ্গ-প্রতিষেধার্থং নিগমনম্।"** অর্থাৎ 'উপনয়'বাক্য পর্য্যন্ত বলিলেও প্রতিজ্ঞাবাক্যবোধিত সাধ্যধর্ম্মীতে মধ্যস্থগণের সেই সাধ্য ধর্ম্মের বিপরীত ধর্ম্মের প্রসঙ্গ বা আশঙ্কার নিরাস নিগমনবাক্যের প্রয়োজন।† **ভাসর্ব্বজ্ঞও** নিগমনবাক্যের উক্তরূপ প্রয়োজনই বলিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, বাদী ও প্রতিবাদী সর্ব্বশেষে 'নিগমন'বাক্যের দ্বারা প্রতিপন্ন করিবেন যে, পূর্ব্বোক্ত সাধ্যধর্ম্মীতে তাঁহাদিগের সাধ্য ধর্ম্মের বিপরীত ধর্ম্মের আশঙ্কা হইতে পারে না। যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলে বাদী নৈয়ায়িক সর্ব্বশেষে **"তস্মাদুৎপত্তিধর্ম্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দঃ"** এই বাক্যের দ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে, যেহেতু উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট এবং তাহা শব্দমাত্রে থাকে, অতএব শব্দমাত্র অনিত্যই, উহা নিত্য হইতে পারে না কিন্তু প্রথমোক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা ঐরূপ অবধারণ হয় না। কারণ

---

* প্রশস্তপাদ হেতুবাক্যকে "অপদেশ" নামে, উদাহরণবাক্যকে "নিদর্শন" নামে উপনয়বাক্যকে "অনুসন্ধান" নামে এবং 'নিগমন'বাক্যকে "প্রত্যাম্নায়" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। "অবয়বাঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞাপদেশ-নিদর্শনানুসন্ধান-প্রত্যাম্নায়াঃ।"

—প্রশস্তপাদভাষ্য, ২৩৩ পৃঃ।

† 'তাৎপর্য্যটীকা'কার বাচস্পতি মিশ্র এখানে উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, যেহেতু 'বাধিত' অথবা 'সৎপ্রতিপক্ষ', তাহাও প্রকৃত হেতু নহে, কিন্তু হেত্বাভাস। সুতরাং 'অবাধিতত্ব' এবং 'অসৎপ্রতিপক্ষত্ব'ও হেতুর লক্ষণ হওয়ায় কথিত হেতুপদার্থে 'অবাধিতত্ব' ও 'অসৎপ্রতিপক্ষত্ব' বোধনের জন্য সর্ব্বশেষে নিগমনবাক্যও বক্তব্য। অর্থাৎ বাদী সর্ব্বশেষে 'নিগমন'বাক্যের দ্বারা প্রতিপন্ন করিবেন যে, তাঁহার কথিত হেতুপদার্থ 'বাধিত' এবং 'সৎপ্রতিপক্ষ' হইতে পারে না, সুতরাং তাহাতে হেতুর সমস্ত লক্ষণই আছে। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও 'নিগমন'বাক্যের উক্তরূপ প্রয়োজনই সমর্থন করিয়াছেন। পরে 'হেত্বাভাসের' ব্যাখ্যায় ইহা বুঝা যাইবে।

শব্দমাত্র যে, অনিত্যত্ববিশিষ্ট, ইহা প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা সাধ্যরূপেই কথিত হয়। প্রথমেই উহা সিদ্ধরূপে কথিত হইতে পারে না। কারণ, কেবল প্রতিজ্ঞার দ্বারা কোন সাধ্য সিদ্ধ হয় না, ইহা সর্ব্বসম্মত। তাই কথিত হইয়াছে,—"একাকিনী প্রতিজ্ঞা হি প্রতিজ্ঞাতং ন সাধয়েৎ।"

ফলকথা, প্রথমোক্ত 'প্রতিজ্ঞা'বাক্যের দ্বারা 'নিগমন'-বাক্যের ফলসিদ্ধি হইতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বশেষে 'নিগমন'বাক্য বলিলেই ন্যায়বাক্যের পরিসমাপ্তি হয় এবং তদ্দ্বারাই প্রতিপাদ্য পদার্থের পরিসমাপ্তি বা নিশ্চয় বুঝা যায়। তাই প্রশস্তপাদও পরে বলিয়াছেন,—"তস্মাদনিত্যঃ শব্দ ইত্যনেনানিত্য এব শব্দ ইতি প্রতিপিপাদয়িষিতার্থপরিসমাপ্তির্গম্যতে।" পরন্তু 'চরক-সংহিতা'র বিমানস্থানেও (অষ্টম অঃ) প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বই উদাহরণের সহিত কথিত হইয়াছে। 'বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর' স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে,"— প্রতিজ্ঞা হেতুদৃষ্টান্তাবুপসংহার এবচ। তথা নিগমনঞ্চৈব পঞ্চাবয়বমিষ্যতে।।" (৩।৫।৫)। 'মহাভারতে'র সভাপর্ব্বেও নারদের গুণ বর্ণনায় কথিত হইয়াছে,—"পঞ্চাবয়বযুক্তস্য বাক্যস্য গুণদোষবিৎ।" (৫।৫) অর্থাৎ নারদ মুনি গোতমক্ত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বযুক্ত বাক্যের (ন্যায়বাক্যের) সম্বন্ধে অনুকূল তর্কাদি গুণ এবং সর্ব্বপ্রকার দোষবেত্তা। টীকাকার নীলকণ্ঠও সেখানে উক্ত শ্লোকার্দ্ধের উক্তরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। সুতরাং গোতমোক্ত পঞ্চাবয়ববাদই যে, বহুসম্মত ও সুপ্রাচীন মত, এ বিষয়ে সংশয় নাই।। ৩৯।।

ন্যায়-প্রকরণ সমাপ্ত।। ৬।।

ভাষ্য। অত ঊর্দ্ধং তর্কো লক্ষণীয় ইতি অথেদমুচ্যতে।

অনুবাদ—অতঃপর তর্ক লক্ষণীয়, অর্থাৎ তর্কের লক্ষণ বক্তব্য, এ জন্য অনন্তর এই সূত্র বলিয়াছেন।

সূত্র। অবিজ্ঞাত-তত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিতস্তত্ত্ব-জ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ ।। ৪০ ।।

অনুবাদ—'অবিজ্ঞাততত্ত্ব' পদার্থে অর্থাৎ সামান্যতঃ জ্ঞাত যে পদার্থের তত্ত্ব অবিজ্ঞাত, এমন পদার্থ বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত, কারণের উপপত্তি অর্থাৎ প্রমাণের সম্ভবপ্রযুক্ত "ঊহ" (জ্ঞানবিশেষ) তর্ক।

টিপ্পনী—মহর্ষি পঞ্চাবয়ব বাক্যরূপ ন্যায় নিরূপণ করিয়া, ক্রমানুসারে এই সূত্রের দ্বারা "তর্ক" পদার্থের এবং পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা "নির্ণয়" পদার্থের লক্ষণ বলিয়াছেন। কারণ, "তর্ক" ও "নির্ণয়" ন্যায়ের পূর্ব্বাঙ্গ। অনুমানপ্রমাণ অর্থে এবং 'মনন' অর্থেও "তর্ক" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। 'অমৃতনাদ' উপনিষদে কথিত হইয়াছে,—····"তর্কশ্চৈব সমাধিশ্চ ষড়ঙ্গো যোগ উচ্যতে।" অর্থাৎ ষড়ঙ্গ যোগের পঞ্চম অঙ্গ "তর্ক"। এইরূপ আরও অনেক অর্থে 'তর্ক' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু ন্যায়দর্শনে গোতমোক্ত ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত যে 'তর্ক'পদার্থ, তাহা কোন প্রমাণ নহে, কিন্তু প্রমাণের সহকারী 'ঊহ'রূপ জ্ঞানবিশেষ। তাই মহর্ষি এই সূত্রে বলিয়াছেন,—**"ঊহস্তর্কঃ"**। তৎপূর্ব্বে উক্ত তর্কের প্রয়োজন ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—**"তত্ত্ব-জ্ঞানার্থং"**। তৎপূর্ব্বে উহার প্রযোজক প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,—**"কারণোপপত্তিতঃ"**। ভাষ্যকারের মতে উক্ত "কারণ" শব্দের অর্থ প্রমাণ, "উপপত্তি" শব্দের অর্থ সম্ভব। অর্থাৎ প্রমাণের সম্ভবপ্রযুক্ত যে ঊহ, তাহা 'তর্ক'। কিরূপ বিষয়ে উক্তরূপ ঊহ তর্ক হইবে অর্থাৎ উহার বিষয় কি, ইহাই ব্যক্ত করিতে মহর্ষি প্রথমে বলিয়াছেন,—**"অবিজ্ঞাত-তত্ত্বেঽর্থে"**।

উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞাততত্ত্ব বিষয়ে শুশ্রূষা, শ্রবণ ও ধারণ প্রভৃতিও সাংখ্যশাস্ত্রে বুদ্ধিধর্ম্মরূপ 'ঊহ' বলা হইয়াছে। কিন্তু সেই 'ঊহ' এই সূত্রোক্ত 'তর্ক' পদার্থ নহে। তাই মহর্ষি বলিয়াছেন,—"অবিজ্ঞাততত্ত্বে"। যে পদার্থ সর্ব্বথা অজ্ঞাত, তাহার তত্ত্ব নিশ্চয়ের জন্য তর্ক হইতে পারে না। সুতরাং "অবিজ্ঞাতে" এইরূপ পদ বলা যায় না। তাই মহর্ষি "তত্ত্ব" শব্দের প্রয়োগ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যে পদার্থ সামান্যতঃ জ্ঞাত, কিন্তু তাহার তত্ত্ব অবিজ্ঞাত, এমন পদার্থ বিষয়ে উক্তরূপ 'ঊহ'ই তর্ক। কিন্তু 'অবিজ্ঞাতং তত্ত্বং যেন পুরুষেণ' এইরূপ বিগ্রহবাক্যানুসারে "অবিজ্ঞাততত্ত্ব" শব্দের দ্বারা তাদৃশ জ্ঞাতা পুরুষও বুঝা যায়। কিন্তু তাহা বুঝিলে এখানে অর্থসঙ্গতি হয় না। তাই মহর্ষি পরে বলিয়াছে, "অর্থে"। অর্থাৎ পরে 'অর্থ' শব্দ প্রয়োগ দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, "অবিজ্ঞাততত্ত্ব" শব্দের দ্বারা অতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ বিবক্ষিত নহে। কিন্তু "অবিজ্ঞাতং তত্ত্বং যস্য অর্থস্য" এইরূপ বিগ্রহবাক্যানুসারে তাদৃশ পদার্থই বিবক্ষিত। কিন্তু তাদৃশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানার্থ ঊহই তর্ক। সুতরাং "অবিজ্ঞাততত্ত্বস্যার্থস্য" এইরূপ প্রয়োগই কর্ত্তব্য। উদ্দ্যোতকর পরে ইহাও সমর্থন করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন,—"ষষ্ঠীস্থল এবৈষা সপ্তমী"। অর্থাৎ উক্ত

পদে ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থেই সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। কোন কারণে অন্যত্রও ঐরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন বৈশেষিক দর্শনে "ইষাবযুগপৎ সংযোগবিশেষাঃ কর্ম্মান্যত্বে হেতবঃ" (৫।১।১৬) এই সূত্রে প্রথমে "ইষৌ" এই পদে ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থেই সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। উদ্দ্যোতকরের ন্যায় উক্ত সূত্রের **"উপস্কারে"** শঙ্কর মিশ্রও বলিয়াছেন,—"ইষাবিতি ষষ্ঠ্যর্থে সপ্তমী"।

'তর্ক'পদার্থের স্বরূপবিষয়ে নানা মত

প্রাচীন কাল হইতেই পূর্ব্বোক্ত 'তর্ক'পদার্থের স্বরূপবিষয়ে বহু বিচার ও নানা মত হইয়াছে। কোন সম্প্রদায়ের মতে 'তর্ক', 'সংশয়' ও 'নির্ণয়' হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। কোন সম্প্রদায়ের মতে অনুমানপ্রমাণের নামান্তরই 'তর্ক'। 'হেতু', 'তর্ক', 'ন্যায়' ও 'অন্বীক্ষা' শব্দ অনুমানবোধক পর্য্যায় শব্দ। কোন সম্প্রদায়ের মতে যুক্তিসাপেক্ষ যে অনুমান, তাহারই নাম 'তর্ক'। উদ্দ্যোতকর পূর্ব্বোক্ত সমস্ত মতেরই উল্লেখ করিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন। জৈন দার্শনিকগণের মতে উহ (তর্ক) অনুমান হইতে ভিন্ন পরোক্ষ প্রমাণবিশেষ (পূর্ব্ব ৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। কিন্তু বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ তর্ককে বলিয়াছেন,— 'প্রসঙ্গানুমান'। পরপক্ষে অনিষ্টপ্রসঙ্গমূলক অনুমানই 'প্রসঙ্গানুমান'। "ন্যায়কন্দলী" টীকায় (১৭৩-৭৪ পৃঃ) শ্রীধর ভট্টও বহু বিচারপূর্ব্বক প্রাচীন মতের প্রতিবাদ করিয়া পরিশেষে বৈশেষিক মতে তর্ককে অনুমানই বলিয়াছেন। পরে বৈশেষিক মতে তর্ক সংশয়বিশেষ, ইহা তিনি অন্য সম্প্রদায়ের মত বলিয়াছেন। **'সপ্তপদার্থী'** গ্রন্থে শিবাদিত্য মিশ্রও তর্ককে সংশয়বিশেষই বলিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি গোতম তর্কপদার্থের পৃথক্ উল্লেখ করায় বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর বহু বিচারপূর্ব্বক তর্কের স্বরূপ বলিয়াছেন,—**"ভবেদিত্যেব প্রত্যয় ইত্যস্য স্বরূপমিতি"**। "ভবেৎ" এই পদে সম্ভাবনা অর্থে বিধিলিঙের প্রয়োগ করিয়া উদ্দ্যোতকর ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সংশয় ও নির্ণয় হইতে ভিন্ন সম্ভাবনারূপ জ্ঞানবিশেষই তর্ক। ভাষ্যকারেরও ইহাই মত বুঝা যায়। কিন্তু উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের মতে অনিষ্টপ্রসঙ্গই তর্ক। উহা আপত্তিরূপ মানস জ্ঞান। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

ভাষ্য। অবিজ্ঞায়মানতত্ত্বেঽর্থে জিজ্ঞাসা তাবজ্জায়তে

জানীয়* ইমমিতি। অথ জিজ্ঞাসিতস্য বস্তুনো ব্যাহতৌ ধর্ম্মৌ বিভাগেন বিমৃশতি কিংস্বিদিত্যেবমাহোস্বিন্নৈবমিতি। বিমৃশ্যমানয়োর্দ্ধর্ম্ময়োরেকতরং কারণোপপত্ত্যাঽনুজানাতি, সম্ভবত্যস্মিন্ কারণং প্রমাণং হেতুরিতি। কারণোপপত্ত্যা স্যাদেবমেতন্নেতরদিতি।

তত্র নিদর্শনং—যোঽয়ং জ্ঞাতা জ্ঞাতব্যমর্থং জানীতে তং তত্ত্বতো জানীয়েতি জিজ্ঞাসা। স কিমুৎপত্তিধর্ম্মকোঽথানুৎপত্তিধর্ম্মক ইতি বিমর্শঃ। বিমৃশ্যমানেঽবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে যস্য ধর্ম্মস্যাভ্যনুজ্ঞাকারণমুপপদ্যতে, তমনুজানাতি, যদ্যয়মনুৎপত্তিধর্ম্মকস্ততঃ স্বকৃতস্য কর্ম্মণঃ ফলমনুভবতি জ্ঞাতা। দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যা-জ্ঞানানামুত্তরমুত্তরং পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্য কারণং, উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গ ইতি স্যাতাং সংসারাপবর্গৌ। উৎপত্তিধর্ম্মকে জ্ঞাতরি পুনর্ন স্যাতাম্। উৎপন্নঃ খলু জ্ঞাতা দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিবেদনাভিঃ সম্বধ্যত ইতি নাস্যেদং স্বকৃতস্য কর্ম্মণঃ ফলম্। উৎপন্নশ্চ ভূত্বা ন ভবতীতি, তস্যাবিদ্যমানস্য নিরুদ্ধস্য বা স্বকৃতকর্ম্মণঃ ফলোপভোগো নাস্তি, তদেবমেকস্যানেকশরীর-যোগঃ শরীরবিয়োগশ্চাত্যন্তং ন স্যাদিতি, যত্র কারণমনুপপদ্যমানং পশ্যতি, তন্নানুজানাতি,† সোঽয়মেবংলক্ষণ ঊহস্তর্ক ইত্যুচ্যতে।

---

* ভাষ্যে "জানীয়" এই পদটি বিধিলিঙের আত্মনেপদ বিভক্তির উত্তম পুরুষের একবচনে নিষ্পন্ন। কর্ত্তার ফলবত্ত্ববিবক্ষা স্থলে উপসর্গহীন জ্ঞা ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। "অনুপসর্গাজ্জ্ঞঃ"—পাণিনিসূত্র, ১।৩।৭৬। গাং জানীতে (সিদ্ধান্তকৌমুদী)। ভাষ্যকার পরেও বলিয়াছেন,—"জ্ঞাতব্যমর্থং জানীতে তং তত্ত্বতো জানীয়"।

† ভাষ্যকার এখানে 'তন্ন' শব্দের দ্বারা প্রমাণ বিষয়ের অভ্যনুজ্ঞারূপ ঊহই গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু এখানে কোন পুস্তকই সোঽয়ং" ইত্যাদি পাঠের পূর্ব্বে......"তমনুজানাতি" এইরূপ পাঠ দেখা যায় না। বাচস্পতি মিশ্রও এখানে প্রমাণ বিষয়ের বিপর্য্যয় বা অভাবের অনভ্যনুজ্ঞাকেই প্রমাণ বিষয়ের অভ্যনুজ্ঞা বলিয়া, পরে বলিয়াছেন,......'অতএব ভাষ্যো উপসংহারঃ, "যত্র কারণমনুপপদ্যমানং পশ্যতি তন্নানুজানাতীতি।"

কথং পুনরয়ং তত্ত্বজ্ঞানার্থো ন তত্ত্বজ্ঞানমেবেতি, অনবধারণাৎ, অনুজানাত্যয়মেকতরং ধর্ম্মং কারণোপপত্ত্যা, ত্ববধারয়তি ন ব্যবস্যতি ন নিশ্চিনোতি এবমেবেদমিতি। কথং তত্ত্বজ্ঞানার্থ ইতি, তত্ত্বজ্ঞানবিষয়াভ্যনুজ্ঞালক্ষণাদূহাদ্‌ভাবিতাৎ* প্রসন্নাদনন্তরং প্রমাণস্য সামর্থ্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানমুৎপদ্যত ইত্যেবং তত্ত্বজ্ঞানার্থ ইতি। সোঽয়ং তর্কঃ প্রমাণানি প্রতিসন্দধানঃ প্রমাণাভ্যনুজ্ঞানাৎ প্রমাণসহিতো বাদেঽপদিষ্ট ইতি। 'অবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে' ইতি যথা সোঽর্থো ভবতি তস্য তথাভাবস্তত্ত্বমবিপর্য্যয়ো যাথাতথ্যম্‌।

অনুবাদ—'অবজ্ঞায়মানতত্ত্ব' পদার্থে অর্থাৎ যে পদার্থের তত্ত্ব তৎকালে জ্ঞাত নহে, এমন পদার্থ বিষয়ে "এই পদার্থকে (তত্ত্বতঃ) জানিব",—এইরূপ জিজ্ঞাসা জন্মে। অনন্তর জিজ্ঞাসিত পদার্থের সম্বন্ধে 'ব্যাহত' অর্থাৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়কে পৃথক্‌ভাবে 'ইহা এইরূপ কি? অথবা এইরূপ নহে'—এইরূপ সংশয় করে। পরে সন্দিহ্যমান ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একতর ধর্ম্মকে কারণের উৎপত্তিপ্রযুক্ত অনুজ্ঞা করে। এই পদার্থেই 'কারণ' কি না 'প্রমাণ' 'হেতু' সম্ভব হয়,—অর্থাৎ এইরূপ জ্ঞানই "কারণোপপত্তি"। কারণের উপপত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ 'প্রমাণসম্ভব' প্রযুক্ত এই পদার্থ এইরূপ হইতে পারে, অন্যরূপ অর্থাৎ ইহার বিপরীত হইতে পারে না—অর্থাৎ এইরূপ জ্ঞানই সেই একতর ধর্ম্মের অনুজ্ঞা এবং উহাই তর্কপদার্থ।

তদ্বিষয়ে 'নিদর্শন' অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত তর্কের উদাহরণ যথা—'এই যে জ্ঞাতা (আত্মা) জ্ঞাতব্য পদার্থকে জানিতেছে, সেই জ্ঞাতাকে তত্ত্বতঃ জানিব, এইরূপ

---

* এখানে বহু পুস্তকে মুদ্রিত......"লক্ষণানুগ্রহভাবিতাৎ" এইরূপ পাঠ এবং "লক্ষণানুগ্রহোদ্ভাবিতাৎ" এইরূপ পাঠ প্রকৃত বলিয়া বুঝিতে পারি না। কোন কোন প্রাচীন ভাষ্যপুস্তকে......"লক্ষণাদূহাদ্‌ভাবিতাৎ" এইরূপ পাঠ আছে। বস্তুতঃ উহরূপ তর্ককেই ভাষ্যকার তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ীভূত তত্ত্বের অভ্যনুজ্ঞারূপ বলিয়াছেন। সুতরাং এখানে "ঊহাৎ" এইরূপ বিশেষ্য পদের প্রয়োগই সঙ্গত হয়। পরন্তু বাচস্পতি মিশ্রও এখানে শেষোক্ত "ভাবিতাৎ" এই বিশেষণ পদ গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,--"ভাবিতাচ্চিন্তিতাৎ অতএব প্রসন্নান্নির্ম্মলাদিতি"। কিন্তু শুদ্ধ্যর্থ চুরাদিগণীয় ভূ ধাতুনিষ্পন্ন 'ভাবিত' শব্দের দ্বারা বিশুদ্ধ এই অর্থও বুঝা যায়। ভাষ্যকার সেই অর্থই ব্যক্ত করিতে পরে বলিয়াছেন—"প্রসন্নাৎ"।

জিজ্ঞাসা জন্মে। (পরে) সেই জ্ঞাতা কি উৎপত্তিধর্ম্মক? অথবা অনুৎপত্তি-ধর্ম্মক? এইরূপ সংশয় জন্মে। (পরে) সন্দিহ্যমান অবিজ্ঞাততত্ত্ব পদার্থে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত জ্ঞাতৃপদার্থে যে ধর্ম্মটির অনুজ্ঞার কারণ (প্রমাণ) উপপন্ন হয়, সেই ধর্ম্মকে অনুজ্ঞা করে। (উক্ত স্থলে কিরূপে সেই অনুজ্ঞা করে, তাহা বলিতেছেন) যদি এই জ্ঞাতা অনুৎপত্তিধর্ম্মক হয় অর্থাৎ নিত্য পদার্থ হয়, তাহা হইলে স্বকৃত কর্ম্মের ফল অনুভব করে অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে পারে। (এবং) দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যাজ্ঞানের পরপরটি পূর্ব্বপূর্ব্বটির কারণ, (সুতরাং) পরপরটির অপায় বা নিবৃত্তি হইলে তাহাদিগের অনন্তরের অর্থাৎ অব্যবহিত পূর্ব্বপূর্ব্বটির নিবৃত্তি-প্রযুক্ত অপবর্গ হয়—এ জন্য সংসার ও অপবর্গ হইতে পারে। কিন্তু জ্ঞাতা উৎপত্তিধর্ম্মক হইলে সংসার ও অপবর্গ হইতে পারে না। কারণ, জ্ঞাতা উৎপন্ন হইয়াই দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বেদনার (সুখদুঃখের) সহিত সম্বন্ধ হয়, এ জন্য ইহা অর্থাৎ সেই দেহাদিসম্বন্ধ ইহার স্বকৃত কর্ম্মের ফল হয় না। কারণ, উৎপন্ন জ্ঞাতা (পূর্ব্বে) বিদ্যমান থাকিয়া উৎপন্ন হয় না। অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার সত্তাই থাকে না, অতএব পূর্ব্বে অবিদ্যমান অথবা নিরুদ্ধ অর্থাৎ দেহাদি নাশকালে অত্যন্ত বিনষ্ট সেই জ্ঞাতার নিজকৃত কর্ম্মের ফলভোগ নাই অর্থাৎ তাহা সম্ভবই হয় না। সুতরাং এইরূপ হইলে এক জ্ঞাতার অনেক শরীরের সহিত সম্বন্ধ এবং আত্যন্তিক ভাবে শরীরের সহিত বিয়োগ (চিরকালের জন্য জন্মের উচ্ছেদ) হইতে পারে না অর্থাৎ সংসার ও মোক্ষ হইতে পারে না,—এইরূপে (পূর্ব্বোক্ত সংশয়কারী) যে বিষয়ে "কারণ" অর্থাৎ প্রমাণকে অনুপপদ্যমান বুঝেন, সেই বিষয়কে অর্থাৎ উক্ত স্থলে আত্মাতে সংশয়বিষয়ীভূত উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বকে অনুজ্ঞা করেন না। সেই এই অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ণিত এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট 'উহ' 'তর্ক' এই নামে কথিত হয়।

(প্রশ্ন) এই তর্ক তত্ত্বজ্ঞানার্থ কেন? তত্ত্বজ্ঞানই কেন নহে? (উত্তর) যেহেতু অবধারণ করে না (বিশদার্থ) এই তর্ক প্রমাণের উপপত্তিপ্রযুক্ত একতর ধর্ম্মকে অনুজ্ঞা করে, কিন্তু এই পদার্থ এইরূপই, ইহা অবধারণ করে না, ব্যবসায় করে না, নিশ্চয় করে না। (প্রশ্ন) তত্ত্বজ্ঞানার্থ কিরূপে? অর্থাৎ উক্ত তর্কপদার্থ তত্ত্বনিশ্চায়ক না হইলে উহা 'তত্ত্বজ্ঞানার্থ', ইহা কিরূপে বলা যায়? (উত্তর) তত্ত্ব-জ্ঞানবিষয়ের অর্থাৎ প্রমাণজন্য জ্ঞানের

বিষয় সেই তত্ত্বের অভ্যনুজ্ঞারূপ "ভাবিত" অর্থাৎ বিশুদ্ধ, (অতএব) "প্রসন্ন" অর্থাৎ নির্দ্দোষ উহের (তর্কের) অনন্তর প্রমাণের সামর্থ্য-প্রযুক্ত তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এইরূপে তর্ক তত্ত্বজ্ঞানার্থ। সেই এই তর্ক প্রমাণের অভ্যনুজ্ঞাবশতঃ প্রমাণকে প্রতিসন্ধান করে অর্থাৎ সংশয় নিবৃত্ত করিয়া প্রমাণকে নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত করে, এজন্য প্রমাণ-সহিত হইয়া বাদে অর্থাৎ পরবর্ত্তী বাদলক্ষণসূত্রে কথিত হইয়াছে। (সূত্রে) "অবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে" এই স্থলে সেই পদার্থ যে প্রকার হয়, তাহার তথাভাব (অর্থাৎ) অবিপর্য্যয় যাথাতথ্য তত্ত্ব। অর্থাৎ উহাই উক্ত পদে "তত্ত্ব" শব্দের অর্থ।

টিপ্পনী—ভাষ্যকার এই সূত্রোক্ত 'তর্ক'পদার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে যেরূপে তর্কের প্রবৃত্তি হয়, তাই ব্যক্ত করিবার জন্য বলিয়াছেন যে, প্রথমে অবিজ্ঞায়মানতত্ত্ব কোন পদার্থ বিষয়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসা জন্মে, পরে তজ্জন্য সেই পদার্থের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় বিষয়ে সংশয় জন্মে। বাচস্পতি মিশ্র এখানে বলিয়াছেন যে, যদিও প্রায়শঃ সংশয়ের পরেই তত্ত্বজিজ্ঞাসা জন্মে, তথাপি অনেক স্থলে তত্ত্বজিজ্ঞাসার পরেও সংশয় জন্মে। সেই সংশয়ই 'তর্ক'-প্রবৃত্তির অঙ্গ। সুতরাং ভাষ্যকার এখানে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার পরেই সংশয় বলিয়াছেন। ভাষ্যকার পরে তর্কপদার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সেই সংশয়কারী পরে সেই সংশয়বিষয়ীভূত বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে কোন এক ধর্ম্মকে কারণের উপপত্তিপ্রযুক্ত অনুজ্ঞা করে। অর্থাৎ তাহার সেই অনুজ্ঞারূপ জ্ঞানবিশেষেই এই সূত্রোক্ত তর্কপদার্থ। ভাষ্যকার পরে পূর্ব্বোক্ত 'কারণোপপত্তি'র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,— "**সম্ভবত্যস্মিন্ কারণং প্রমাণং হেতুরিতি।**" অর্থাৎ এখানে সূত্রোক্ত "কারণ" শব্দের অর্থ প্রমাণ, এবং "উপপত্তি" শব্দের অর্থ সম্ভব। কারণের উপপত্তি অর্থাৎ সেই পদার্থবিশেষেই প্রমাণের সম্ভব বা সত্তা। প্রাচীন কালে হেতুবোধক 'কারণ' শব্দের প্রমাণ অর্থেও প্রয়োগ হইয়াছে। 'কারণ', 'প্রমাণ' ও 'হেতু' শব্দ একার্থবোধক। তাই ভাষ্যকার সূত্রোক্ত 'কারণ' শব্দের অর্থ ব্যক্ত করিতে "প্রমাণ" শব্দের পরে সমানার্থ 'হেতু' শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাষ্যকার পরে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত অনুজ্ঞার স্বরূপ ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—"**কারণোপপত্ত্যা স্যাদেবমেতন্নেতরদিতি।**" তাৎপর্য্য এই যে, এই পদার্থেই প্রমাণের সম্ভব হয়, এজন্য ইহা এইরূপ হইতে পারে, অন্যরূপ হইতে পারে না, এইরূপ সম্ভাবনাত্মক যে জ্ঞান, তাহাই প্রমাণের উপপত্তিপ্রযুক্ত সেই প্রমাণবিষয়ীভূত তত্ত্বের অনুজ্ঞা এবং উহাই এই সূত্রোক্ত 'উহ'রূপ

তর্কপদার্থ। উহা সংশয়ও নহে, নির্ণয়ও নহে। কিন্তু তদ্ভিন্ন উক্তরূপ বিশেষ জ্ঞান। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

ভাষ্যকার পরে পূর্ব্বোক্ত 'তর্কে'র একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, যে, যাহা জ্ঞাতব্য পদার্থের জ্ঞাতা (আত্মা), তাহার তত্ত্ববিষয়ে জিজ্ঞাসা জন্মিলে কোন কারণে সেই জ্ঞাতা কি উৎপত্তিধর্ম্মক? অথবা অনুৎপত্তিধর্ম্মক? এইরূপ সংশয় জন্মিতে পারে। কিন্তু পরে সেই সংশয়কারী তাহার সংশয়বিষয়ীভূত সেই জ্ঞাতৃপদার্থে যে ধর্ম্মের অনুজ্ঞার সম্বন্ধে প্রমাণ উপপন্ন বা সম্ভব হয়, সেই ধর্ম্মকেই অনুজ্ঞা করেন। যেমন, এই জ্ঞাতা 'অনুৎপত্তিধর্ম্মক' হইলেই অর্থাৎ অনাদি নিত্য পদার্থ হইলেই তাহার পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মবশতঃ সংসার এবং তত্ত্ব-জ্ঞানজন্য মোক্ষ হইতে পারে। কিন্তু উৎপত্তিধর্ম্মক হইলে অর্থাৎ দেহাদির উৎপত্তিকালে অভিনব আত্মারই উৎপত্তি হইলে পূর্ব্বে তাহার সত্তা না থাকায় স্বকৃত কর্ম্মজন্য বিচিত্র জন্মাদি সম্ভব হয় না। এবং উৎপন্ন ভাবপদার্থমাত্রেরই বিনাশিত্ববশতঃ সেই আত্মার মোক্ষও হইতে পারে না, এইরূপ বিচার করিয়া পূর্ব্বোক্ত সংশয়কারী আত্মার উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব বিষয়ে প্রমাণকে অনুপপদ্যমান বুঝিয়া তাহার অনুজ্ঞা বা সম্ভবনা করেন না। কিন্তু আত্মার অনুপত্তিধর্ম্মকত্ব বিষয়েই প্রমাণ সম্ভব বুঝিয়া তাহারই অনুজ্ঞা করেন। অর্থাৎ আত্মা অনুপত্তি-ধর্ম্মক হইতে পারেন, এইরূপ সম্ভাবনাত্মক জ্ঞানই উক্ত স্থলে তাহার "তর্ক"। এই মতের ব্যাখ্যা করিতে শ্রীধর ভট্টও বলিয়াছেন,—অনুৎপত্তিধর্ম্মকেণানেন ভবিতব্যমিতি। কিমস্য সম্ভাবনাপ্রত্যয়স্য প্রয়োজনং? তত্ত্বজ্ঞানমেব।" —("ন্যায়কন্দলী," ১৭৩ পৃঃ।) জয়ন্ত ভট্টও বলিয়াছেন,—"তেনয়ং সূত্রার্থঃ, অবিজ্ঞাততত্ত্বে সামান্যতো জ্ঞাতে ধর্ম্মিণ্যেকপক্ষানুকূলকারণদর্শনাত্তস্মিন্ সম্ভাবনাপ্রত্যয়ো ভবিতব্যতাবভাসস্তদিতরপক্ষশৈথিল্যাপাদনে তদ্গ্রাহকপ্রমাণ-মনুগৃহ্ণ তৎসুখং প্রবর্ত্তয়ন্ তত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্ক ইতি।"—("ন্যায়মঞ্জরী", ৫৮৬ পৃঃ)।

উক্ত তর্কপদার্থ যে তত্ত্ব-জ্ঞান নহে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানার্থ, ইহা সমর্থন করিতে ভাষ্যকারও পরে বলিয়াছেন,—**"অনবধারণাৎ"**। পরে ঐ কথারই ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—"অনুজানাত্যয়মেকতরং ধর্ম্মং কারণোপপত্ত্যা, ন ত্ববধারয়তি, ন ব্যবস্যতি, ন নিশ্চিনোতি, এবমেবেতি।" তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত তর্কপদার্থ একতর ধর্ম্মের অনুজ্ঞাই করে, কিন্তু অবধারণ করে না অর্থাৎ ব্যবসায় করে না, অর্থাৎ **"ইদমেবমেব"** (এই পদার্থ এইরূপই) এই প্রকারে নিশ্চয় করে না। তর্কপদার্থ পূর্ব্বোক্ত অনুজ্ঞাস্বরূপ হইলেও তাহাতে অনুজ্ঞার

কর্ত্তৃত্ব বিবক্ষা করিয়াই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—"অনুজানাত্যয়ং।" 'অবধারণ', 'ব্যবসায়' ও নিশ্চয় একই পদার্থ হইলেও উক্ত তর্কপদার্থ যে নিশ্চয় হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, সুতরাং উহাকে তত্ত্ব-জ্ঞান বলাই যায় না, ইহাই ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার পরে আবার বলিয়াছেন,—"**ন ব্যবস্যতি, ন নিশ্চিনোতি।**" বাচস্পতি মিশ্রও এখানে বলিয়াছেন,—"পর্য্যায়ৈর্নিশ্চয়াদত্যন্তভেদ উক্তঃ।"

কিন্তু উক্ত তর্কপদার্থ নিশ্চয়াত্মক ও নিশ্চয়জনক না হইলে কিরূপে উহাকে তত্ত্বজ্ঞানার্থ বলা যায়? এতদুত্তরে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় সেই তত্ত্বের অনুজ্ঞারূপ যে উহ, যাহা ভাবিত অর্থাৎ পরিশুদ্ধ, নির্দ্দোষ অর্থাৎ যাহা তর্কাভাস নহে, কিন্তু প্রকৃত তর্ক, তাহা জন্মিলে পরে প্রমাণের সামর্থ্যপ্রযুক্ত তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। অর্থাৎ তর্ক স্বতন্ত্রভাবে তত্ত্বজ্ঞানের উৎপাদক না হইলেও প্রকৃত তর্কের অনন্তর সেই তর্কানুগৃহীত প্রমাণই তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন করে। সুতরাং তর্করূপ জ্ঞান প্রমাণের অনুগ্রাহক হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের সহায় হয়।* তাই মহর্ষি পরে 'বাদ'লক্ষণসূত্রে প্রমাণসহিত তর্কের উল্লেখ করিয়াছেন, কেবল তর্কের উল্লেখ করেন নাই। ভাষ্যকার প্রথমসূত্রভাষ্যেও বলিয়াছেন যে, তর্ক কোন প্রমাণ নহে, কিন্তু "প্রমাণানামনুগ্রাহকস্তত্ত্বজ্ঞানায় কল্পতে।"

'তাৎপর্য্যটীকা'কার বাচস্পতি মিশ্র এখানে বলিয়াছেন যে, যে বিষয়ে কোন প্রমাণ প্রবৃত্ত হইতে উদ্যত হয়, সেই বিষয়ের বিপর্য্যয়াশঙ্কা উপস্থিত হইলে যে কাল পর্য্যন্ত কোন অনিষ্টাপত্তির দ্বারা সেই বিপর্য্যয়াশঙ্কার নিবৃত্তি না হয়, সেই কাল পর্য্যন্ত সেই বিষয়ে সেই প্রমাণ প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কিন্তু সেই সংশয়ের নিবৃত্তি হইলে তখন সেই প্রমাণই নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া তত্ত্বনিশ্চয়রূপ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন করে। ফলকথা, প্রমাণের নিজ বিষয়ে সংশয় নিবৃত্তিই তর্ককর্ত্তৃক প্রমাণের অভ্যনুজ্ঞা এবং উহাই প্রমাণের অনুগ্রহ বলিয়া কথিত হইয়াছে। বরদরাজও বলিয়াছেন,—"প্রমাণবিষয়ে তদ্বিপর্য্যায়াশঙ্কা-বিঘটনং তর্কসাধ্যোঽনুগ্রহ ইত্যর্থঃ।"

---

* 'ভগবদ্গীতা'য় "মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ" (১৫।১৪) এই ভগবদ্বাক্যে ভাষ্যকার রামানুজ 'অপোহন' শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, উহরূপ তর্ক। তিনিও সেখানে প্রাচীন মতেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "উহো নাম ইদং প্রমাণমিত্থং প্রবর্ত্তিতুমর্হতীতি প্রমাণপ্রবৃত্ত্যর্হতা-প্রয়োজকসামগ্র্যাদিনিরূপণজন্যং প্রমাণানুগ্রাহকং জ্ঞানং।" "ন্যায়পরিশুদ্ধি" গ্রন্থে বেঙ্কটনাথও গোতমোক্ত তর্কপদার্থের ব্যাখ্যা করিতে আচার্য্য রামানুজের ঐ ব্যাখ্যারই উল্লেখ করিয়াছেন।

তর্কের স্বরূপবিষয়ে উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণের মত।

উদয়নাচার্য্যের মতানুসারেই বরদরাজ ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,--

"তর্কোঽনিষ্টপ্রসঙ্গঃ স্যাদনিষ্টং দ্বিবিধং স্মৃতং।
প্রামাণিকপরিত্যাগস্তথেতরপরিগ্রহঃ॥"—তার্কিকরক্ষা।

অর্থাৎ অনিষ্টের প্রসঙ্গ বা আপত্তিই তর্ক। সেই অনিষ্ট (১) প্রামাণিক পদার্থের পরিত্যাগ এবং (২) অপ্রামাণিক পদার্থের স্বীকার। যেমন জলপান পিপাসার নিবর্ত্তক নহে, এই কথা বলিলে আপত্তি হয় যে, তাহা হইলে পিপাসু ব্যক্তিরা জল পান না করুক? উক্ত স্থলে জলপানের পিপাসানিবর্ত্তকত্ব যাহা প্রমাণসিদ্ধ পদার্থ, তাহার পরিত্যাগ বা অপলাপ প্রথম প্রকার অনিষ্ট। আর জলপান অন্তর্দাহ উৎপন্ন করে, ইহা বলিলে আপত্তি হয় যে, তাহা হইলে জলপান আমারও অন্তর্দাহ উৎপন্ন করুক? উক্ত স্থলে জলপানের অন্তর্দ্দাহ-জনকত্ব যাহা অপ্রামাণিক পদার্থ, তাহার স্বীকার দ্বিতীয় প্রকার অনিষ্ট। এইরূপ অন্যান্য স্থলেও পূর্ব্বোক্ত যে কোন প্রকার অনিষ্ট পদার্থের প্রসঙ্গ অর্থাৎ আপত্তিরূপ জ্ঞানই তর্ক। টীকাকার মল্লিনাথ উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন-- অনিষ্ট-ব্যাপকপদার্থের প্রসঙ্গ। বস্তুতঃ সংশয় ও নিশ্চয় হইতে ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত 'সম্ভাবনা'রূপ জ্ঞান উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন নাই। কারণ, তাঁহাদিগের মতে সম্ভাবনারূপ জ্ঞানও সংশয়বিশেষ। কিন্তু তর্ক সংশয়াত্মক জ্ঞান নহে। তাই উদয়নাচার্য্যও অনিষ্টাপত্তিকেই তর্ক বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের মতের ব্যাখ্যা করিতেও অনিষ্টাপত্তিকে তর্ক বলিয়াছেন কেন, ইহাও চিন্তনীয়। ফলকথা, প্রমাণ দ্বারা বাধিত পদার্থই অনিষ্ট পদার্থ এবং তাহার প্রসঙ্গ অর্থাৎ আপত্তিরূপ যে জ্ঞান, তাহাই তর্কপদার্থ। তাই তর্ককে বলা হইয়াছে 'বাধিতার্থপ্রসঙ্গ'। এবং উক্তরূপ তর্ক সংশয়নিবর্ত্তক হওয়ায় উহার অপর প্রাচীন নাম "সংশয়ব্যুদাস"। (পূর্ব্ব ২৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পরে নব্য নৈয়ায়িকগণ বিশদভাবে উক্ত তর্কপদার্থের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যে পদার্থে ব্যাপক পদার্থের অভাব নিশ্চিত, সেই পদার্থে তাহার ব্যাপ্য পদার্থের আরোপপ্রযুক্ত সেই ব্যাপক পদার্থের যে আরোপ, তাহা তর্ক। তাই বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সূত্রে 'কারণ' শব্দের ব্যাপ্য অর্থ এবং 'উপপত্তি' শব্দের আরোপ অর্থ গ্রহণ করিয়া তর্কের উক্তরূপ লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেমন ধূম বহ্নির ব্যাপ্য পদার্থ অর্থাৎ ধূম থাকিলে সেখানে বহ্নি অবশ্য থাকিবে।

সুতরাং বহ্নি ধূপের ব্যাপক পদার্থ। কিন্তু জলে ধূম ও বহ্নি নাই, ইহা নিশ্চিত। সুতরাং জলে ধূমের আরোপ হইলে তৎপ্রযুক্ত বহ্নির যে আরোপ হয় অর্থাৎ "জলং যদি ধূমবৎ স্যাৎ তদা বহ্নিমৎ স্যাৎ"—এইরূপে জলে বহ্নির যে আপত্তি হয়, তাহা উক্ত স্থলে তর্ক। মনের দ্বারাই ঐরূপ আপত্তি হয়, সুতরাং উহা মানস প্রত্যক্ষবিশেষ এবং আহার্য্যভ্রমজ্ঞান। ভ্রমের বাধক নিশ্চয় সত্ত্বেও ইচ্ছাপূর্ব্বক যে আরোপ, তাহাকে বলে আহার্য্যভ্রম।

কিন্তু উক্ত তর্করূপ জ্ঞান ভ্রমজ্ঞান হইলেও উহার সাহায্যে পরে প্রমাণ দ্বারা তত্ত্বনিশ্চয় জন্মে। কারণ, উক্তরূপ তর্কস্থলে সর্ব্বত্রই কোন ব্যাপ্য পদার্থের আরোপপ্রযুক্তই তাহার ব্যাপক পদার্থের আপত্তি হয়। যে কোন পদার্থে আরোপপ্রযুক্ত যে কোন পদার্থের আপত্তি তর্ক হইতে পারে না। এবং যে স্থানে সেই পদার্থ সর্ব্বস্বীকৃত, সেই স্থানে তাহার আপত্তিও তর্ক নহে। কারণ, সেই স্থানে তাহার জ্ঞান আরোপাত্মক নহে, কিন্তু যথার্থ জ্ঞান। যেমন 'পর্ব্বতো যদি ধূমবান্ স্যাৎ তদা বহ্নিমান্ স্যাৎ'—এইরূপে পর্ব্বতে বহ্নির যে আপত্তি, তাহা তর্ক নহে। উহাকে বলে '**ইষ্টাপত্তি**', কিন্তু '**অনিষ্টাপত্তি**'ই তর্ক। সেই তর্ক স্থলে সেই অনিষ্ট পদার্থই আপত্তির বিষয় হওয়ায় তাহাকে বলে '**আপাদ্য**' এবং যাহার সত্তা স্বীকার করিলে সেই আপত্তি হয়, তাহাকে বলে '**আপাদক**'। যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলে ধূম আপাদক এবং বহ্নি আপাদ্য। আপাদ্য পদার্থ হইবে ব্যাপক এবং আপাদক পদার্থ হইবে তাহার ব্যাপ্য। সুতরাং তর্করূপ ভ্রমজ্ঞানেও সেই আপাদক পদার্থে আপাদ্য পদার্থের ব্যাপ্তি স্মরণ আবশ্যক। কারণ, সেই ব্যাপ্তিই উক্তরূপ তর্কের মূল এবং প্রথম অঙ্গ।* সেই ব্যাপ্তির স্মরণ হইলে সেই ব্যাপক পদার্থের অভাবে তাহার ব্যাপ্য পদার্থের অভাবের যে ব্যাপ্তি আছে, তাহারও স্মরণ হয়; সুতরাং পরে সেই আপাদ্যরূপ ব্যাপক পদার্থের অভাবরূপ হেতুর দ্বারা আপাদকরূপ ব্যাপ্য পদার্থের অভাব

* তর্কের আরও চারিটি অঙ্গ আছে। বরদরাজ বলিয়াছেন,—"ব্যাপ্তিস্তর্কাপ্রতিহতিরবসানং বিপর্য্যয়ে। অনিষ্টানমুকূলত্বে ইতি তর্কাঙ্গপঞ্চকং॥" অর্থাৎ (১) আপাদক পদার্থে আপাদ্য পদার্থের ব্যাপ্তি, (২) সেই তর্কের ব্যাঘাতক প্রতিকূল তর্কের দ্বারা অপ্রতিঘাত, (৩) বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ আপাদ্য পদার্থের অভাবে পর্য্যবসান, (৪) আপাদ্য পদার্থের অনিষ্টত্ব এবং (৫) সেই আপত্তির অননুকূলত্ব অর্থাৎ প্রতিপক্ষের অসাধকত্ব, এই পাঁচটি তর্কের অঙ্গ। পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন তর্কই তত্ত্বজ্ঞানের সহায় হয়। উহার মধ্যে কোন এক অঙ্গের অভাব হইলেও তাহা প্রকৃত 'তর্ক' হইবে না, তাহাকে বলে "তর্কাভাস"। "অঙ্গান্যতমবৈকল্যে তর্কস্যাভাসতা ভবেৎ।"—তার্কিকরক্ষা।

অনুমানসিদ্ধ হয়। যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলে জল যদি ধূমবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে বহ্নিবিশিষ্ট হউক? এইরূপ তর্কের ফলে পরে বহ্নির অভাবরূপ হেতুর দ্বারা জলে ধূমের অভাব সিদ্ধ হয়। উক্তরূপ সমস্ত তর্কের ফলে বিষয়পরিশুদ্ধি অর্থাৎ প্রমাণ বিষয়ের যথার্থ নিশ্চয় হওয়ায় উহাকে বলে—**বিষয়পরিশোধক তর্ক**।

কিন্তু যে তর্কের ফলে অনুমানের হেতুতে সাধ্যধর্ম্মের ব্যভিচার সংশয়-নিবৃত্তি হওয়ায় ব্যাপ্তিনিশ্চয় জন্মে, তাহাকে বলে—**'ব্যাপ্তিগ্রাহক তর্ক'**। যেমন "ধূমো বহ্নিব্যভিচারী ন বা"—এইরূপ সংশয় জন্মিলে পরে 'ধূমো যদি বহ্নিব্যভিচারী স্যাৎ, বহ্নিজন্যো ন স্যাৎ'—অর্থাৎ ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী হয় অর্থাৎ বহ্নিশূন্য স্থানেও জন্মে, তাহা হইলে বহ্নিজন্য না হউক? এইরূপ তর্কের ফলে ধূম বহ্নির ব্যভিচারী নহে, ইহা অনুমানসিদ্ধ হয়। উক্ত স্থলে বহ্নির ব্যভিচারিত্ব আপাদক এবং বহ্নিজন্যত্বের অভাব আপাদ্য। ধূমমাত্রই বহ্নিজন্য, বহ্নি ব্যতীত ধূম জন্মে না, এই সিদ্ধান্তানুসারেই উক্তরূপ আপত্তি হয়। তাহার ফলে পরে ('ধূমো ন বহ্নিব্যভিচারী, বহ্নিজন্যত্বাৎ' এইরূপে) বহ্নিজন্যত্ব হেতুর দ্বারা ধূমে বহ্নির ব্যভিচারিত্বের অভাব নিশ্চয় হইলে সেই নিশ্চয়জন্য পূর্ব্বোক্ত ব্যভিচার সংশয়-নিবৃত্তি হওয়ায় ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিনিশ্চয় জন্মে, এজন্য উক্তরূপ তর্ককে বলে **'ব্যাপ্তগ্রাহক তর্ক'**। অনুমানপ্রমাণরূপ ন্যায়ের দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয়ের পূর্ব্বে অনেক স্থলে পূর্ব্বোক্তরূপ তর্ক আবশ্যক হওয়ায় অনেকে উহাকে ন্যায়ের পূর্ব্বাঙ্গও বলিয়াছেন।*

তর্কের প্রকারভেদ

মহানৈয়ায়িক উদায়নাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত 'তর্ক'পদার্থকে (১) 'আত্মাশ্রয়', (২) 'ইতরেতরাশ্রয়', (৩) 'চক্রকাশ্রয়', (৪) 'অনবস্থা' ও (৫) 'অনিষ্ট-প্রসঙ্গ' নামে পঞ্চবিধ বলিয়াছেন। তদনুসারে বরদরাজও বলিয়াছেন,—"আত্মাশ্রয়াদিভেদেন তর্কঃ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ।" কোন পদার্থ নিজের উৎপত্তি অথবা স্থিতি অথবা জ্ঞানে অব্যবধানে নিজেকে অপেক্ষা করিলে তৎপ্রযুক্ত যে

* কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশের (৩৷৭) 'মকরন্দ ব্যাখ্যা'য় পক্ষধরশিষ্য রুচিদত্ত উক্ত মতান্তর সমর্থন করিতে পরে বলিয়াছেন যে, "প্রকাশ"কার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় নিজেই 'প্রমেয়তত্ত্ববোধ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"তর্কো ন্যায়স্য পূর্ব্বাঙ্গং, ন্যায়-বিষয়-পরিশোধকত্বাদ্ ব্যাপ্তিগ্রাহকত্বাচ্চ।" তর্ক "লিঙ্গপরামর্শ"রূপ ন্যায়ের বিষয়ীভূত লিঙ্গের পরিশুদ্ধিসম্পাদক, এই অর্থে উহাকে ন্যায়-বিষয়-পরিশোধক বলা হইয়াছে। তর্কের দ্বারা কিরূপে ব্যাপ্তিনিশ্চয় সম্ভব হয়, এবিষয়ে অন্যান্য কথা ও তাহার প্রতিবাদের খণ্ডন দ্বিতীয় খণ্ডে ২৩৩-৪২ পৃঃ অবশ্য দ্রষ্টব্য।

অনিষ্টাপত্তি হয়, তাহাকে বলে **আত্মাশ্রয়**। আর সেই পদার্থ অপর একটি পদার্থকে অপেক্ষা করিয়া আবার নিজেকেই অপেক্ষা করিলে তৎপ্রযুক্ত যে অনিষ্টাপত্তি হয়, তাহাকে বলে **'ইতরেতরাশ্রয়'** বা **'অন্যোন্যাশ্রয়'**। এইরূপ অপর দুইটি পদার্থ বা ততোঽধিক পদার্থকে অপেক্ষা করিয়া আবার নিজেকেই অপেক্ষা করিলে তৎপ্রযুক্ত যে অনিষ্টাপত্তি হয়, তাহাকে বলে **"চক্রকাশ্রয়"**। আর যেরূপ আপত্তির কুত্রাপি বিশ্রাম বা শেষ নাই, এমন যে ধারাবাহিক আপত্তি, তাহাকে বলে **'অনবস্থা'**। উক্তরূপ অনন্ত আপত্তিমূলক যে অনিষ্টাপত্তি হয়, তাহাও 'অনবস্থা' নামে কথিত হইয়াছে। কিন্তু কোন স্থলে ঐরূপ আপত্তি সর্ব্বমতে প্রমাণসিদ্ধ হইলে তাহা 'অনবস্থা'রূপ তর্ক হইবে না। কারণ, সেইরূপ স্থলে উহা সকল মতেই ইষ্টাপত্তি। পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ তর্ক ভিন্ন সমস্ত তর্কই **'অনিষ্টপ্রসঙ্গ'** নামে পঞ্চম প্রকার তর্ক।†

যদিও তর্কমাত্রই অনিষ্টপ্রসঙ্গ, তথাপি বিশেষ জ্ঞানের জন্য উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি বিশেষ করিয়া 'আত্মাশ্রয়' প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ তর্ক বলিয়া অন্যান্য সমস্ত তর্ককে 'অনিষ্ট প্রসঙ্গ' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ইহাই ব্যক্ত করিতে উক্ত পঞ্চম প্রকার তর্ককে বলিয়াছেন,—**"তদন্যবাধিতার্থ-প্রসঙ্গ"**। বৃত্তিকার উক্ত পঞ্চবিধ তর্কের উদাহরণও বলিয়াছেন; সংক্ষেপে তাহা ব্যক্ত করা যায় না। মূলকথা, অপ্রামাণিক অনিষ্টাপত্তিই তর্ক। তাই বৃত্তিকার পরে বলিয়াছেন,—"প্রথমোপস্থিতত্ব", "উৎসর্গ", "বিনিগমনাবিরহ" এবং "লাঘব" ও "গৌরব" প্রভৃতিকে যে তর্ক বলা হয়, তাহা বস্তুতঃ তর্ক নহে। কারণ, তাহা আপত্তিরূপ জ্ঞান নহে। কিন্তু ঐ সমস্তও প্রমাণ দ্বারা তত্ত্ব-নির্ণয়ে তর্কের ন্যায় প্রমাণের সহকারিত্বরূপ তর্কসাধর্ম্ম্য-প্রযুক্ত তর্কবৎ ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ তাহাতে "তর্ক" শব্দের গৌণ প্রয়োগ হয়।

† সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" (অক্ষপাদদর্শনে) মাধবাচার্য্য 'আত্মাশ্রয়' প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ তর্ক এবং "ব্যাঘাত" প্রভৃতি নামে আরও সপ্তপ্রকার তর্কের উল্লেখ করিয়া গোতমোক্ত তর্কপদার্থকেই একাদশপ্রকার বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি উহার কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। "ন্যায়পরিশুদ্ধি" গ্রন্থে বেঙ্কটনাথ "প্রজ্ঞাপরিত্রাণ" নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া আত্মাশ্রয়াদি চতুর্ব্বিধ তর্ক এবং "বিরোধ" ও "অসম্ভব" এই নামে ষট্‌প্রকার তর্ক বলিয়াছেন। "মানমেয়োদয়" গ্রন্থে নারায়ণ ভট্ট উক্ত চতুর্ব্বিধ তর্ক এবং "গৌরব" ও "লাঘব" এই নামে ষট্‌প্রকার তর্ক বলিয়াছেন। কিন্তু তিনিও উদয়নোক্ত পঞ্চম প্রকার তর্কের গ্রহণ করেন নাই কেন, ইহা চিন্তনীয়।

তর্ক সর্ব্বপ্রমাণেরই অনুগ্রাহক

পূর্ব্বোক্ত তর্কপদার্থ যে কেবল অনুমানপ্রমাণেরই অনুগ্রাহক বা সহকারী, তাহা নহে। কিন্তু অন্যান্য প্রমাণের দ্বারা তত্ত্ব-নির্ণয়েও অনেক স্থলে তর্ক আবশ্যক হয়। তাই বরদরাজ স্পষ্ট বলিয়াছেন,—প্রত্যক্ষাদেঃ প্রমাণস্য তর্কোঽনুগ্রাহকো ভবেৎ।" "আত্মতত্ত্ববিবেক" গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যও যে তর্ককে সর্ব্বপ্রমাণের অনুগ্রাহক বলিয়াছেন এবং মীমাংসকগণও তাহা বলিয়াছেন, ইহাও বরদরাজ পরে প্রদর্শন করিয়াছেন। পরে নব্য মীমাংসক নারায়ণ ভট্টও "মানমেয়োদয়" গ্রন্থে স্পষ্ট বলিয়াছেন,—"যতঃ প্রত্যক্ষশব্দাদিপ্রমাণান্য-খিলান্যপি। তর্কং বিনা ন জীবন্তি প্রত্যক্ষে তাবদীক্ষ্যতাং॥" "তস্মাৎ সর্ব্বপ্রমাণানাং তর্কোঽনুগ্রাহকঃ স্থিতঃ। সাধ্যে বিপর্য্যয়াশঙ্কাবিচ্ছেদস্তদনুগ্রহঃ॥" বস্তুতঃ বেদরূপ শব্দপ্রমাণের দ্বারা ধর্ম্ম নির্ণয়েও প্রকৃত তর্ক আবশ্যক। তাই বেদার্থ নির্ণয়ের জন্য মীমাংসাশাস্ত্র রচিত হইয়াছে। মীমাংসাশাস্ত্রোক্ত সেই সমস্ত তর্ক "মীমাংসা" নামেও কথিত হইয়াছে এবং মীমাংসকগণ তাহাকে বলিয়াছেন, প্রমাণের **"ইতিকর্ত্তব্যতা"**। তাই কথিত হইয়াছে,—"ধর্ম্মে প্রমায়মাণে হি বেদেন করুণাত্মনা। ইতিকর্ত্তব্যতাভাগং মীমাংসা পূরয়িষ্যতি।" বেদাদি শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা ধর্ম্মাদি নির্ণয় করিতে হইলে যাহা সেই সমস্ত বাক্যের প্রকৃতার্থ নহে, কিন্তু 'অর্থাভাস', তাহার নিরাস করিয়া, প্রকৃত বাক্যার্থস্থাপন করিতে প্রকৃত তর্ক অত্যাবশ্যক। তাই নারায়ণ ভট্টও বলিয়াছেন,— "এবং সর্ব্বত্র তর্কৌঘৈরর্থাভাসনিরাসতঃ। বাক্যার্থস্থাপনী সর্ব্বা মীমাংসা তর্করূপিণী॥" ভগবান মনুও বলিয়াছেন,—

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে* স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥"

—'মনুসংহিতা', ১২ অ, ১০৬॥৪০॥

---

* জয়ন্ত ভট্ট উক্ত মনুবচনে "তর্ক" শব্দের অর্থ অনুমান বলিলেও বরদরাজ প্রভৃতি গোতমোক্ত তর্কই বলিয়াছেন। অবশ্য অনুমানপ্রমাণ অর্থেও "তর্ক" শব্দের বহু প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু উক্ত বচনের পূর্ব্বে "প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ" ইত্যাদি বচনে "অনুমান" শব্দের দ্বারাই অনুমানপ্রমাণের উল্লেখ হওয়ায় পরবচনে "তর্ক" শব্দের দ্বারা অনুমান ভিন্ন তর্কপদার্থই আমরা বুঝিতে পারি। শারীরকভাষ্যে (২।১।১১) আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন,—"শ্রুত্যর্থ-বিপ্রতিপত্তৌ চার্থাভাস-নিরাকরণেন সম্যগর্থনির্দ্ধারণং তর্কেণৈব বাক্যবৃত্তিরূপেণ ক্রিয়তে, মনুরপি চৈবং মন্যতে, প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ" ইত্যাদি।

ভাষ্য। এতস্মিংস্তর্কবিষয়ে—

সূত্র। বিমৃশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—এই তর্কবিষয়ে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত তর্কস্থলে—সংশয় করিয়া পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা অর্থাৎ স্বপক্ষের সংস্থাপন এবং পরপক্ষের সাধনের খণ্ডনের দ্বারা পদার্থের অবধারণ "নির্ণয়"।

ভাষ্য। স্থাপনা সাধনং, প্রতিষেধ উপালম্ভঃ। তৌ সাধনোপালম্ভৌ পক্ষপ্রতিপক্ষাশ্রয়ৌ ব্যতিষক্তাবনুবন্ধেন প্রবর্ত্তমানৌ পক্ষপ্রতিপক্ষাবিত্যুচ্যেতে। তয়োরন্যতরস্য নিবৃত্তিরেকতরস্যাবস্থানমবশ্যম্ভাবি, যস্যাবস্থানং তস্যার্থাবধারণং নির্ণয়ঃ।

নেদং পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং সম্ভবতীতি, একো হি প্রতিজ্ঞাতমর্থং তং হেতুতঃ স্থাপয়তি, দ্বিতীয়স্য প্রতিষিদ্ধঞ্চোদ্ধরতীতি, দ্বিতীয়েন স্থাপনাহেতুঃ প্রতিষিধ্যতে, তস্যৈব প্রতিষেধহেতুশ্চোদ্ধ্রিয়তে, স নিবর্ত্ততে, তস্য নিবৃত্তৌ যোঽবতিষ্ঠতে, তেনার্থাবধারণং নির্ণয়ঃ। উভাভ্যামেবার্থাবধারণমিত্যাহ। কয়া যুক্ত্যা? একস্য সম্ভবো দ্বিতীয়স্যাসম্ভবঃ,—তাবেতৌ সম্ভবাসম্ভবৌ বিমর্শং সহ নিবর্ত্তয়তঃ,—উভয়সম্ভবে উভয়াসম্ভবে বাঽনিবৃত্তো বিমর্শ ইতি।

"বিমৃশ্যে"তি বিমর্শং কৃত্বা। সোঽয়ং বিমর্শঃ পক্ষপ্রতিপক্ষাববদ্যোত্য ন্যায়ং প্রবর্ত্তয়তীত্যুপাদীয়ত ইতি। এতচ্চ বিরুদ্ধয়োরেকধর্ম্মিস্থয়োর্ব্বোদ্ধব্যম্। যত্র তু ধর্ম্মিসামান্যগতৌ বিরুদ্ধৌ ধর্ম্মৌ হেতুতঃ সম্ভবতস্তত্র সমুচ্চয়ঃ, হেতুতোঽর্থস্য তথাভাবোপপত্তেঃ, যথা ক্রিয়াবদ্দ্রব্যমিতি লক্ষণবচনে যস্য দ্রব্যস্য ক্রিয়াযোগো হেতুতঃ সম্ভবতি, তৎ ক্রিয়াবৎ, যস্য ন সম্ভবতি তদক্রিয়মিতি। একধর্ম্মিস্থয়োশ্চ বিরুদ্ধয়োর্ধর্ম্ময়োরযুগপদ্ভাবিনোঃ কালবিকল্পঃ,

—যথা তদেব দ্রব্যং ক্রিয়াযুক্তং ক্রিয়াবৎ, অনুৎপন্নোপরতক্রিয়ং পুনরক্রিয়মিতি।

ন চায়ং নির্ণয়ে নিয়মো বিমৃশ্যৈব পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয় ইতি। কিন্ত্বিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নপ্রত্যক্ষেঽর্থাবধারণং নির্ণয় ইতি। পরীক্ষাবিষয়ে—"বিমৃশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ"। বাদে শাস্ত্রে চ বিমর্শবর্জ্জং।

ইতি বাৎস্যায়নীয়ে ন্যায়ভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমাহ্নিকম্।

অনুবাদ—স্থাপনা 'সাধন', প্রতিষেধ 'উপালম্ভ' অর্থাৎ নিজপক্ষ স্থাপনকে "সাধন" বলে, এবং পরপক্ষসাধনের প্রতিষেধ বা খণ্ডনকে "উপালম্ভ" বলে। পক্ষ ও প্রতিপক্ষ যাহার আশ্রয়, এবং "ব্যতিষক্ত" অর্থাৎ উভয় পক্ষে সম্বন্ধবিশিষ্ট, এবং 'অনুবন্ধ'বিশিষ্টরূপে অর্থাৎ পরে একতর পক্ষ নির্ণয়ের অনুকূলভাবে প্রবর্ত্তমান সেই (পূর্ব্বোক্ত) "সাধন" ও "উপালম্ভ" 'পক্ষ' ও 'প্রতিপক্ষ' এই শব্দদ্বয়ের দ্বারা উক্ত হইয়াছে (অর্থাৎ এই সূত্রে "পক্ষ" ও "প্রতিপক্ষ" শব্দের উক্তরূপ 'সাধন' ও 'উপালম্ভ' অর্থে লাক্ষণিক প্রয়োগ হইয়াছে)। সেই সাধন ও উপালম্ভের মধ্যে একতরের নিবৃত্তি এবং একতরের অবস্থান অবশ্য হইবে। যাহার অবস্থান হইবে, তাহার অর্থের অবধারণ অর্থাৎ অবস্থিত সেই সাধনের অথবা উপালম্ভের প্রতিপাদ্য যে পক্ষ বা প্রতিপক্ষরূপ পদার্থ, তাহার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান "নির্ণয়"।

(পূর্ব্বপক্ষ) এই 'অর্থাবধারণ' পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ সাধন ও উপালম্ভ, এই উভয়ের দ্বারা সম্ভব হয় না। যেহেতু এক ব্যক্তি অর্থাৎ প্রথমবাদী সেই প্রতিজ্ঞাত পদার্থকে হেতুর দ্বারা সংস্থাপন করেন এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির (প্রতিবাদীর) প্রতিষেধকে উদ্ধার করেন অর্থাৎ তাঁহার কথিত দোষের খণ্ডন করেন। (পরে) দ্বিতীয় কর্ত্তৃক (বাদীর) স্থাপনার হেতু প্রতিষিদ্ধ হয় এবং তাহারই অর্থাৎ বাদীর প্রতিষেধের হেতু উদ্ধৃত হয় [অর্থাৎ পরে প্রতিবাদী বাদীর পূর্ব্বোক্ত হেতুর দোষ প্রদর্শন করিয়া তাহার হেতুত্ব খণ্ডন করেন, এবং বাদী পূর্ব্বে প্রতিবাদিকথিত দোষের প্রতিষেধক যে হেতু বলিয়াছেন, তাহারও খণ্ডন করেন] ("স নিবর্ত্ততে") তাহা অর্থাৎ বাদীরই হউক অথবা প্রতিবাদীরই হউক, সেই হেতু ও উপালম্ভ নিবৃত্ত হয়। তাহার নিবৃত্তি হইলে যাহা অবস্থিত হয়, তদ্দ্বারাই অর্থাবধারণরূপ নির্ণয় জন্মে।

(উত্তর) উভয়ের দ্বারাই অর্থাবধারণ হয়, এ জন্য (মহর্ষি "পক্ষপ্রতি-পক্ষাভ্যাং" এই পদ) বলিয়াছেন। (প্রশ্ন) কি যুক্তিবশতঃ? (উত্তর) একের সম্ভব, দ্বিতীয়ের অসম্ভব অর্থাৎ বাদীর সাধনের সম্ভব, প্রতিবাদীর উপালম্ভের অসম্ভব এবং প্রতিবাদীর সাধনের সম্ভব, বাদীর উপালম্ভের অসম্ভব। সেই এই সম্ভব ও অসম্ভব মিলিত হইয়াই সংশয়কে নিবৃত্ত করে। উভয়ের সম্ভব হইলে অথবা উভয়ের অসম্ভব হইলে সংশয় নিবৃত্ত হয় না। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে পূর্ব্বোক্তরূপ সাধন ও উপালম্ভ, এই উভয়ের দ্বারাই অর্থাবধারণরূপ নির্ণয় জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য।

"বিমৃশ্য" এই পদের ব্যাখ্যা "বিমর্শং কৃত্বা" অর্থাৎ সংশয় করিয়া। সেই এই সংশয় পক্ষ ও প্রতিপক্ষকে অর্থাৎ একাধারে বিবাদবিষয় বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়কে নিয়মতঃ বিষয় করিয়া ন্যায়কে প্রবৃত্ত করে, অর্থাৎ মধ্যস্থগণের উক্তরূপ সংশয় বাদী ও প্রতিবাদীর ন্যায়প্রবৃত্তির মূল, এ জন্য ('বিমৃশ্য' এই পদের দ্বারা) গৃহীত হইয়াছে। ইহা কিন্তু অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সংশয়রূপ জ্ঞান কিন্তু একধর্ম্মিগত বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় বিষয়ে বুঝিবে। কিন্তু যে স্থলে সামান্যধর্ম্মিগত বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় প্রমাণ দ্বারা সম্ভব হয়, সেই স্থলে 'সমুচ্চয়'। কারণ, প্রমাণ দ্বারা 'অর্থে'র সেই সামান্যধর্ম্মিরূপ পদার্থের 'তথাভাবে'র (সেই ধর্ম্মদ্বয়বত্তার) উপপত্তি হয়। যেমন "ক্রিয়াবদ্‌ দ্রব্যং" এইরূপ লক্ষণ বলিলে (বুঝা যায়) যে দ্রব্যের ক্রিয়াবত্ত্ব প্রমাণ দ্বারা সম্ভব হয়, সেই দ্রব্যই ক্রিয়াবিশিষ্ট, (কিন্তু) যে দ্রব্যের ক্রিয়াবত্ত্ব প্রমাণ দ্বারা সম্ভব হয় না, সেই দ্রব্য নিষ্ক্রিয় [অর্থাৎ সামান্যতঃ 'দ্রব্যং সক্রিয়ং নিষ্ক্রিয়ঞ্চ' এইরূপ জ্ঞান সংশয় নহে, উহাকে বলে 'সমুচ্চয়'] কিন্তু একধর্ম্মিগত 'অযুগপদ্ভাবী' অর্থাৎ যাহা একই সময়ে থাকে না, কিন্তু কালভেদে থাকে, এমন বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় বিষয়ে 'কালবিকল্প' হয়। যেমন সেই দ্রব্যই ক্রিয়াবিশিষ্ট হইয়া সক্রিয়, কিন্তু 'অনুৎপন্নক্রিয়' অথবা 'উপরতক্রিয়' অর্থাৎ যাহাতে ক্রিয়া জন্মে নাই অথবা ক্রিয়া বিনষ্ট হইয়াছে, এমন হইলে নিষ্ক্রিয়। অর্থাৎ একই দ্রব্যে কালভেদে সক্রিয়ত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্বের যে জ্ঞান, তাহাকে বলে "কালবিকল্প"।

সংশয় করিয়াই 'পক্ষ' ও 'প্রতিপক্ষে'র দ্বারা অর্থাবধারণ নির্ণয়, ইহা কিন্তু নির্ণয়ে নিয়ম নহে, অর্থাৎ নির্ণয়মাত্রই সংশয়পূর্ব্বক নহে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজন্য উৎপন্ন প্রত্যক্ষ স্থলে অর্থাবধারণই নির্ণয়। পরীক্ষা-বিষয়ে অর্থাৎ জিগীষু বাদী ও প্রতিবাদীর স্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষখণ্ডনাদির দ্বারা মধ্যস্থগণের তত্ত্ব-নির্ণয়স্থলে 'সংশয় করিয়া পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা অর্থাবধারণ নির্ণয়'।

"বাদে" অর্থাৎ কেবল তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বক্ষ্যমাণ "বাদ" নামক 'কথা'য় এবং শাস্ত্রে সংশয়বর্জ্জিত উক্তরূপ অর্থাবধারণ হয় অর্থাৎ বাদকথা ও শাস্ত্র দ্বারা যে নির্ণয় জন্মে, তাহাও সংশয়পূর্ব্বক নহে।

বাৎস্যায়নপ্রণীত ন্যায়-ভাষ্যে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।

টিপ্পনী—মহর্ষি 'তর্ক'পদার্থের লক্ষণের পরে এই সূত্র দ্বারা 'নির্ণয়'পদার্থের লক্ষণ বলিয়া ন্যায়দর্শনের প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত করিয়াছেন। কারণ, উক্ত 'নির্ণয়'পদার্থ ন্যায়ের উত্তরাঙ্গ এবং তর্কপূর্ব্বক। তাই ভাষ্যকার এই সূত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—**এতস্মিংস্তর্কবিষয়ে**'। অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত তর্কবিষয়ীভূত পদার্থে মধ্যস্থগণের প্রমাণ দ্বারা তর্কের সাহায্যে যে নির্ণয় জন্মে, তাহাই এই সূত্রোক্ত 'নির্ণয়'। উহা মধ্যস্থগণের সংশয়পূর্ব্বক, এজন্য মহর্ষি এই সূত্রের প্রথমে বলিয়াছেন,—'**বিমৃশ্য**'। ভাষ্যকার উক্ত পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"বিমর্শং কৃত্বা"। বিমর্শ বলিতে সংশয়। মধ্যস্থগণ সংশয় করিয়া কিসের দ্বারা অর্থাবধারণরূপ নির্ণয় করিবেন? তাই মহর্ষি পরে বলিয়াছেন,—**"পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যাং"**। ভাষ্যকার উক্ত 'পক্ষ' ও 'প্রতিপক্ষ' শব্দের লাক্ষণিক অর্থের ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—"স্থাপনা সাধনং" ইত্যাদি।

ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, একাধারে বিবাদবিষয় বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ই 'পক্ষ' ও 'প্রতিপক্ষ' শব্দের মুখ্য অর্থ (পরবর্ত্তী সূত্রভাষ্য দ্রষ্টব্য)। কিন্তু সেই বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের দ্বারা অর্থাবধারণ বলা যায় না। সুতরাং এই সূত্রে "পক্ষ" ও "প্রতিপক্ষ" শব্দের লাক্ষণিক অর্থেই প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। সেই লাক্ষণিক অর্থ 'সাধন' ও 'উপালম্ভ'। স্বপক্ষস্থাপনাকে '**সাধন**' বলে এবং পরপক্ষসাধনের খণ্ডনকে '**উপালম্ভ**' বলে। কিন্তু উক্ত লাক্ষণিক অর্থের মুখ্য অর্থের সহিত সম্বন্ধ ব্যতীত উহা গ্রহণ করা যায় না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, '**পক্ষপ্রতিপক্ষাশ্রয়ৌ**'। অর্থাৎ 'পক্ষ' ও 'প্রতিপক্ষ' শব্দের মুখ্য অর্থ যে, সেই বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়, তাহা উক্ত সাধন ও উপালম্ভের আশ্রয়। সুতরাং তাহার সহিত ঐ উভয়ের আশ্রয়াশ্রিতত্ব সম্বন্ধ আছে। বাচস্পতি মিশ্র এখানে বলিয়াছেন যে, যদিও উপালম্ভ বাদীর পক্ষাশ্রিত, তথাপি প্রতিপক্ষকে উদ্দেশ্য করিয়াই সেই উপালম্ভ হওয়ায় উহাকেও ঐ তাৎপর্য্যে প্রতিপক্ষাশ্রিত বলা হইয়াছে। অবশ্যই প্রশ্ন হইবে যে, মহর্ষি "সাধনোপালম্ভাভ্যাং" এইরূপ মুখ্য প্রয়োগ না করিয়া উক্ত অর্থে লাক্ষণিক প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? এ জন্য ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—

'ব্যতিষক্তৌ'। 'ব্যতিষক্ত' বলিতে উভয় পক্ষে সম্বন্ধবিশিষ্ট। তাৎপর্য্য এই যে, মহর্ষি এই সূত্রে "সাধনোপালম্ভাভ্যাং" এইরূপ মুখ্য প্রয়োগ করিলে সেই সাধন ও উপালম্ভ যে 'ব্যতিষক্ত' হওয়া আবশ্যক, ইহা বুঝা যায় না। সুতরাং মহর্ষি উক্ত অর্থে 'পক্ষ' ও 'প্রতিপক্ষ' শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যেরূপ 'সাধন' ও 'উপালম্ভ' পক্ষেও হইবে, প্রতিপক্ষেও হইবে, সেইরূপ 'সাধন' ও 'উপালম্ভই' এখানে বুঝিতে হইবে। কারণ, তদ্দ্বারাই অর্থের অবধারণরূপ নির্ণয় জন্মে। যে স্থলে স্বপক্ষে বাদীর সাধন (স্থাপনা) এবং প্রতিবাদীর উপালম্ভ (সেই স্থাপনার খণ্ডন) হয় এবং প্রতিপক্ষে প্রতিবাদীর সাধন ও বাদীর উপালম্ভ হয়, সেই স্থলে সেইরূপ 'সাধন' ও 'উপালম্ভ'কে বলে 'ব্যতিষক্ত'।

কিন্তু উক্তরূপ 'সাধন' এবং 'উপালম্ভ' হইলেও যে স্থলে তন্মধ্যে একতরের নিবৃত্তি হয় না, সেই স্থলে একতর পক্ষের অবধারণ হয় না। এ জন্য ভাষ্যকার পরে আবার বলিয়াছেন,—"অনুবন্ধেন প্রবর্ত্তমানৌ"। অর্থাৎ পরস্পরানুবন্ধ-বিশিষ্ট হইয়া প্রবর্ত্তমান উক্তরূপ 'সাধন' ও 'উপালম্ভই' এই সূত্রে 'পক্ষ' ও 'প্রতিপক্ষ' শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার পরে সেই পরস্পরানুবন্ধ ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন, "ভয়োরন্যতরস্য নিবৃত্তিরেকতরস্যাবস্থানমবশ্যম্ভাবি"। অর্থাৎ যেরূপ 'সাধন' ও 'উপালম্ভ' হইলে তন্মধ্যে একের নিবৃত্তি ও অপরের অবস্থান অবশ্যই হইবে, সেইরূপ সাধন ও উপালম্ভই পরস্পরানুবন্ধ এবং তাহাই এই সূত্রে "পক্ষ" ও "প্রতিপক্ষ" শব্দের দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। কারণ, উক্তরূপ 'সাধন' ও 'উপালম্ভে'রই চরম ফল নির্ণয়। এই সূত্রে "অর্থ" শব্দের দ্বারাও ইহা সূচিত হইয়াছে। কারণ, "অবধারণং নির্ণয়ঃ" এইরূপ বলিলে কিসের অবধারণ, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। যে কোন পদার্থের অবধারণ হইলেও তাহা উক্তরূপ স্থলে 'নির্ণয়'পদার্থ নহে, কিন্তু বিবাদবিষয় একতর পক্ষের অবধারণই নির্ণয়-পদার্থ। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—"যস্যাবস্থানং তস্যার্থাবধারণং নির্ণয়ঃ"। বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"যস্য সাধনস্য বা উপালম্ভস্য বা অবস্থানং, তস্য সাধনস্য বা উপালম্ভস্য বা যোঽর্থঃ পক্ষঃ প্রতিপক্ষো বা তস্যাবধারণামত্যর্থঃ।"

ভাষ্যকার পরে পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন যে, এই 'অর্থাবধারণ' সাধন ও উপালম্ভ, এই উভয়ের দ্বারা সম্ভব হয় না। কারণ, প্রথমে বাদী তাঁহার প্রতিজ্ঞাত পদার্থকে হেতুর দ্বারা স্থাপন করেন এবং প্রতিবাদীর কথিত

দোষেরও উদ্ধার করেন। পরে প্রতিবাদী বাদীর স্বপক্ষ স্থাপনের হেতুকে খণ্ডন করেন এবং বাদীর পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধক হেতুরও উদ্ধার করেন। এইরূপে যথানিয়মে বিচার হইলে শেষে বাদীরই হউক, অথবা প্রতিবাদীরই হউক, সাধন ও উপালম্ভ নিবৃত্ত হয়। তাহার নিবৃত্তি হইলে যাহার অবস্থান হইবে, তদ্দ্বারাই অর্থাবধারণরূপ নির্ণয় হয়। সুতরাং উক্ত উভয়ের মধ্যে একের দ্বারাই অর্থাবধারণ হওয়ায় মহর্ষির **"পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যাং"** এই উক্তি অযুক্ত। বাচস্পতি মিশ্র উক্ত পূর্ব্বপক্ষভাষ্যের বিশদ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,.........
"স বাদিনো বা প্রতিবাদিনো বা হেতুশ্চোপালম্ভশ্চ নিবর্ত্ততে, তস্মিন্ নিবৃত্তে যোঽবতিষ্ঠতে একস্তেনার্থনির্ণয়ো ন দ্বাভ্যাং, তস্মাদযুক্তং পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামিতি"।

ভাষ্যকার পরে উক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, উক্তরূপ 'সাধন' ও 'উপালম্ভ' এই উভয়ের দ্বারাই অর্থাবধারণ হয়, এজন্য মহর্ষি বলিয়াছেন—"পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যাং"। উভয়ের দ্বারাই অর্থাবধারণ হয়, এ বিষয়ে যুক্তি কি? এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সাধন ও উপালম্ভের মধ্যে একের সম্ভব এবং অপরের অসম্ভব, এই উভয়ই মিলিত হইয়া মধ্যস্থগণের সংশয় নিবৃত্ত করে। তাৎপর্য্য এই যে, যদি বাদীর সাধনের সম্ভব এবং প্রতিবাদীর উপালম্ভের অসম্ভব হয়, অথবা প্রতিবাদীর সাধনের সম্ভব এবং উপালম্ভের অসম্ভব হয় অর্থাৎ প্রতিবাদী যদি বাদীর সাধনকে খণ্ডন করিতে অসমর্থ হইয়া নিবৃত্ত হন অথবা বাদী যদি প্রতিবাদীর সাধনকে খণ্ডন করিতে অসমর্থ হইয়া নিবৃত্ত হন, তাহা হইলেই মধ্যস্থগণের একতর পক্ষের নির্ণয় হওয়ায় তজ্জন্য সংশয় নিবৃত্তি হয়। কিন্তু বাদী ও প্রতিবাদীর সাধন ও উপালম্ভের নিবৃত্তি না হইলে অথবা তাহাদিগের সাধন ও উপালম্ভ, এই উভয়েরই নিবৃত্তি হইলে অর্থাৎ কেহই নিজপক্ষ স্থাপন করিতে না পারিলে মধ্যস্থগণের একতর পক্ষের নির্ণয় না হওয়ায় সংশয় নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ সাধন ও উপালম্ভের সম্ভব ও অসম্ভব মিলিত হইয়াই সংশয়ের নিবর্ত্তক হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত 'সাধন' ও 'উপালম্ভ' এই উভয়ের দ্বারাই অর্থাবধারণরূপ নির্ণয় জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য। তাই মহর্ষি বলিয়াছেন, "পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ"। ভাষ্যে **'উভয়সম্ভবে উভয়াসম্ভবে বা'** এইরূপ পাঠই প্রকৃত।

মহর্ষি এই সূত্রের প্রথমে **"বিমৃশ্য"** এই পদের দ্বারা সংশয়কে গ্রহণ করিয়াছেন কেন? ইহা ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—**"সোঽয়ং বিমর্শঃ পক্ষপ্রতিপক্ষাববদ্যোত্য"** ইত্যাদি। বাচস্পতি মিশ্র **"অবদ্যোত্য"**

এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "নিয়মেন বিষয়ীকৃত্য।" এখানে ভাষ্যকারোক্ত "পক্ষ" ও "প্রতিপক্ষ" শব্দের মুখ্য অর্থই বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, বাদী ও প্রতিবাদীর স্ব স্ব পক্ষে নিশ্চয় থাকিলেও তাহাদিগের "বিপ্রতিপত্তি"বাক্যপ্রযুক্ত মধ্যস্থগণের যে স্থলে সংশয় জন্মে, সেই সংশয় পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়বিষয়কই হয়। সুতরাং তন্মধ্যে একতর ধর্ম্মের নির্ণয় ব্যতীত তাঁহাদিগের সেই সংশয়-নিবৃত্তি সম্ভব না হওয়ায় তাঁহারা একতর পক্ষের অনুমোদন করিতে পারেন না। তাই তাঁহাদিগের সংশয়-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে বাদী ও প্রতিবাদী যে নিজ পক্ষ স্থাপনাদি করেন, তাহাকে বলে 'ন্যায়-প্রবৃত্তি'। মধ্যস্থগণের সেই সংশয়ই সেই ন্যায়প্রবৃত্তির মূল বলিয়া উহাকে ন্যায়প্রবর্ত্তক ও ন্যায়ের পূর্ব্বাঙ্গ বলা হয়। মহর্ষি এই জন্যই এই সূত্রে প্রথমে "বিমৃশ্য" এই পদের দ্বারা মধ্যস্থগণের সেই সংশয়কেই গ্রহণ করিয়াছেন। মধ্যস্থগণের সংশয় যে ন্যায়ের পূর্ব্বাঙ্গ, সুতরাং সংশয়পদার্থের বিশেষ জ্ঞানের জন্য প্রথম সূত্রে সংশয়-পদার্থের পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে, ইহা সমর্থন করিতে ভাষ্যকার পূর্ব্বে (২৭ পৃঃ) মহর্ষির এই সূত্রটিও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মহর্ষি পূর্ব্বে সংশয়লক্ষণসূত্রে "বিমর্শ" শব্দের দ্বারা বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানকে সংশয় বলিয়াছেন। কিন্তু বিরুদ্ধধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানমাত্রই সংশয় নহে। উহা 'সংশয়', 'সমুচ্চয়' ও 'কালবিকল্প' নামে ত্রিবিধ, ইহাই ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার এখানে পরে বলিয়াছেন, 'এতচ্চ' ইত্যাদি। অর্থাৎ একই ধর্ম্মীতে একই কালে বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়বিষয়ক জ্ঞান জন্মিলে তাহা 'সংশয়'। এইরূপ বহু বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানও ভাষ্যকারের মতে সংশয়। কিন্তু কোন সামান্য ধর্ম্মীতে ধর্ম্মিভেদে প্রমাণসিদ্ধ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় বিষয়ে যে জ্ঞান, তাহা সংশয় নহে, তাহাকে বলে **'সমুচ্চয়'**।* ভাষ্যকার পরে ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন,— **"যথা ক্রিয়াবদ্দ্রব্যমিতি লক্ষণবচনে"** ইত্যাদি। ভাষ্যকারের এই কথার

* নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কারও উক্তরূপ 'সমূহালম্বন জ্ঞানকে 'সমুচ্চয়' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সংশয়রূপ জ্ঞানের বিশেষ্যতা এক, কিন্তু সমুচ্চয়রূপ জ্ঞানের বিশেষ্যতা ভিন্ন। তিনি বলিয়াছেন,— 'সংশয়বিশেষ্যতামাত্রস্যৈব প্রকারতাদ্বয়নিরূপিতত্বাদেবঞ্চ 'নির্ব্বহ্নির্ব্বহ্নিমাংশ্চ পর্ব্বত' ইত্যাদিসমুচ্চয়স্যাপি সাধ্যনিশ্চয়ত্বসম্ভবাৎ তৎসত্ত্বেঽপি ন বহ্ন্যনুমিতিঃ, সমুচ্চয়স্থলে প্রকারতাদ্বয়নিরূপিত-বিশেষ্যতাদ্বয়োপগমাৎ" ইত্যাদি।—পক্ষতা-বিচারে জাগদীশী। (পূর্ব্ব ২৫০-২৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু গদাধর ভট্টাচার্য্যের মতে সংশয়াত্মক জ্ঞানেও বিশেষ্যতা ভিন্ন এবং উহা বিরোধবিষয়কও হয়। এ বিষয়ে বিশেষ সূক্ষ্ম বিচার "প্রামাণ্যবাদ—গাদাধরী"তে (১৩৪-৪০ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি 'বৈশেষিক দর্শনে' কণাদের "ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়ি কারণমিতি দ্রব্যলক্ষণম্" (১।১।১৫) এই সূত্রানুসারে "ক্রিয়াবদ্দ্রব্যম্" এইরূপ দ্রব্যলক্ষণবাক্য গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, যে দ্রব্যের ক্রিয়াবত্ত প্রমাণসিদ্ধ, তাহা সক্রিয়, এবং যে দ্রব্যের ক্রিয়াবত্ত প্রমাণসিদ্ধ নহে, তাহা নিষ্ক্রিয়।

বস্তুত কণাদের মতে গগনাদি বিভু দ্রব্যে ক্রিয়াবত্ত প্রমাণসিদ্ধ না হওয়ায় তাহা নিষ্ক্রিয়। সুতরাং তিনি দ্রব্যমাত্রকেই ক্রিয়াবিশিষ্ট বলেন নাই। কিন্তু দ্রব্য ভিন্ন আর কোন পদার্থে ক্রিয়া জন্মে না, এবং গগনাদি বিভু দ্রব্য নিষ্ক্রিয় হইলেও দ্রব্যত্বরূপে সক্রিয় দ্রব্যের সজাতীয়, ইহাই কণাদের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। ফলকথা, 'দ্রব্যং সক্রিয়ং নিষ্ক্রিয়ঞ্চ' এইরূপে সামান্যতঃ দ্রব্যরূপ ধর্ম্মীতে সক্রিয়ত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ববিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা সংশয় নহে। কারণ, তাহা একই দ্রব্যে সক্রিয়ত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ববিষয়ক জ্ঞান নহে। কিন্তু উক্তরূপ জ্ঞানকে বলে 'সমুচ্চয়'। কিন্তু একই দ্রব্যে বিভিন্নকালীন বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাও সংশয় নহে, 'সমুচ্চয়'ও নহে। ভাষ্যকার পরে ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন যে, কোন একই দ্রব্যে যে কালে ক্রিয়া জন্মে, তখন তাহা সক্রিয় এবং যে কালে তাহাতে ক্রিয়া জন্মে নাই, অথবা ক্রিয়া বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তখন তাহা নিষ্ক্রিয়, ইহা সর্ব্বসম্মত। সুতরাং সেই দ্রব্য কদাচিৎ সক্রিয় এবং কদাচিৎ নিষ্ক্রিয়, এইরূপ যে জ্ঞান, তাহা 'সংশয়' বা 'সমুচ্চয়' হইতে পারে না। কিন্তু উহা কালভেদকে বিষয় করায় উহাকে বলে **"কালবিকল্প"**। উক্তরূপ 'সমুচ্চয়' ও 'কালবিকল্পে'র বিষয়ীভূত ধর্ম্মদ্বয় 'পক্ষ' ও 'প্রতিপক্ষ' হয় না, ইহাই ভাষ্যকারের মূল বক্তব্য।

প্রশ্ন হয় যে, সর্ব্বপ্রমাণের দ্বারাই যখন অর্থবিশেষের অবধারণরূপ নির্ণয় জন্মে, তখন মহর্ষি নির্ণয়ের লক্ষণ বলিতে এই সূত্রে 'বিমৃশ্য" এই পদ বলিয়াছেন কেন ? নির্ণয়মাত্রই কি সংশয়পূর্ব্বক ? তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, নির্ণয়মাত্রই সংশয়পূর্ব্বক নহে। কিন্তু প্রত্যক্ষ স্থলে অর্থাবধারণই নির্ণয়। তাৎপর্য্য এই যে, এই সূত্রোক্ত অর্থাবধারণমাত্রই নির্ণয়মাত্রের সামান্য লক্ষণ বুঝিতে হইবে। কিন্তু মধ্যস্থগণের সংশয়ের পরে তাঁহাদিগের পরীক্ষা বিষয়ে যে নির্ণয় জন্মে, তাহাই ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত "নির্ণয়"পদার্থ। সুতরাং মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা তাহারই উক্তরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন। কিন্তু কেবল তত্ত্বনির্ণয়ার্থ জিগীষাশূন্য গুরু শিষ্য প্রভৃতির যে "বাদ"নামক কথা, তাহাতে মধ্যস্থ অনাবশ্যক। সুতরাং তাহাতে যে নির্ণয় জন্মে, তাহা মধ্যস্থের সংশয়-

পূর্ব্বক নহে। এবং বেদাদি শাস্ত্র দ্বারা অথবা কোন শাস্ত্রকারের নিজপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডনাদির দ্বারা যে নির্ণয় জন্মে, তাহাও সংশয়পূর্ব্বক নহে। তাই ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন,—"বাদে শাস্ত্রে চ বিমর্শবর্জ্জং।"* অর্থাৎ বাদকথা ও শাস্ত্রে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা যে অর্থাবধারণ হয়, তাহা সংশয়বর্জ্জিত। সুতরাং এই সূত্রে "বিমৃশ্য" এই পদ পরিত্যাগ করিয়াই তাহার লক্ষণ বুঝিতে হইবে। কিন্তু মধ্যস্থগণের সংশয়পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তরূপ নির্ণয়পদার্থই এখানে মহর্ষির লক্ষ্য। তাই তিনি বলিয়াছেন,—"বিমৃশ্য পক্ষ প্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ" ॥৪১॥

ন্যায়োত্তরাঙ্গ-লক্ষণপ্রকরণ ॥ ৭ ॥

প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত ॥

---

* বাচস্পতি মিশ্র এই কথার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, শাস্ত্র দ্বারা জ্যোতিষ্টোমাদি যাগের স্বর্গাদি-সাধনত্বের যে, নির্ণয় জন্মে, তাহা কাহারও সংশয়পূর্ব্বক নহে। এবং বাদী ও প্রতিবাদীর 'বাদ', 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা'য় তাঁহাদিগের নিজ নিজ সিদ্ধান্তে পূর্ব্বে নিশ্চয়ই থাকে, সংশয় থাকে না। কিন্তু ভাষ্যকার যে, এখানে 'বাদ' শব্দের দ্বারা ত্রিবিধ কথারই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। আর বাদী ও প্রতিবাদীর যে নিজ নিজ সিদ্ধান্তে সংশয় থাকে না, ইহা এখানে বলা অনাবশ্যক। কারণ, মধ্যস্থগণের সংশয় ও নির্ণয়ই এই সূত্রে কথিত হইয়াছে। ত্রিবিধ কথার মধ্যে প্রথমোক্ত "বাদ"কথায় মধ্যস্থ অনাবশ্যক। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এখানে বলিয়াছেন,—"বিমৃশ্যেত্যাদিকং জল্পবিতণ্ডাস্থলীয়নির্ণয়মধিকৃত্য, তদুক্তং ভাষ্যে—শাস্ত্রে বাদে চ বিমর্শবর্জ্জমিতি।" তাৎপর্য্যটীকায় দেখা যায়, "বাদে শাস্ত্রে চেতি।"

দ্বিতীয় আহ্নিক

ভাষ্য। তিস্রঃ কথা ভবন্তি বাদো জল্পো বিতণ্ডা চেতি, তাসাং—

অনুবাদ—(১) 'বাদ', (২) 'জল্প' ও (৩) 'বিতণ্ডা' এই নামে 'কথা' ত্রিবিধ হয়। সেই ত্রিবিধ কথার মধ্যে—

সূত্র। প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভঃ সিদ্ধান্তা-বিরুদ্ধঃ পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ পক্ষপ্রতি-পক্ষপরিগ্রাহো বাদঃ ॥১॥৪২॥

অনুবাদ—যাহাতে প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা 'সাধন' (স্বপক্ষস্থাপন) এবং 'উপালম্ভ' (পরপক্ষখণ্ডন) হয়, এমন 'সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ' ও পঞ্চাবয়বযুক্ত 'পক্ষপ্রতিপক্ষ-পরিগ্রহ' অর্থাৎ যাহাতে বাদী ও প্রতিবাদীর স্বীকৃত বিরুদ্ধ-ধর্ম্মদ্বয়রূপ পক্ষ ও প্রতিপক্ষের পরিগ্রহ হয়, এমন বাক্যসমূহ 'বাদ'।

টিপ্পনী—মহর্ষি প্রথম আহ্নিকের শেষ সূত্রে 'ন্যায়ে'র উত্তরাঙ্গ 'নির্ণয়'-পদার্থের লক্ষণ বলিয়া, ক্রমানুসারে দ্বিতীয় আহ্নিকের এই প্রথমসূত্রে **'বাদ'**-পদার্থের লক্ষণ বলিয়াছেন। পরে যথাক্রমে দুই সূত্রের দ্বারা **'জল্প'**পদার্থ ও **'বিতণ্ডা'** পদার্থের লক্ষণ বলিয়াছেন। এক সূত্রে একটি প্রকরণ হয় না। সুতরাং এখানে তিন সূত্রেই এক প্রকরণ বুঝিতে হইবে। উহার নাম **'কথাপ্রকরণ'**। ভাষ্যকার ইহাই ব্যক্ত করিতে প্রথমে বলিয়াছেন.—"**তিস্রঃ কথা ভবন্তি, বাদো জল্পো বিতণ্ডা চেতি।**" 'বাদ', 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা' নামে কথা ত্রিবিধ হওয়ায় কথাত্বরূপে উহা এক। সুতরাং মহর্ষি তিন সূত্রে এক প্রকরণের দ্বারা সেই 'কথা'র নিরূপণ করিয়াছেন।

"তাৎপর্য্যটীকা"কার বলিয়াছেন যে. যখন **'বৃহৎকথা'** প্রভৃতিও 'কথা', তখন 'কথা' ত্রিবিধ, ইহা বলা যায় না। তাই 'বার্ত্তিক'কার উদ্দ্যোতকর এখানে প্রথমে বলিয়াছেন যে, কথা ত্রিবিধই, এইরূপ নিয়ম এখানে ভাষ্যকারের বিবক্ষিত নহে। কিন্তু বিচারবস্তুর নিয়মই বিবক্ষিত। যে বস্তু বিচারিত হয়, তাহা উক্ত তিনপ্রকারের বিচারিত হয়। তাই পরে বলিয়াছেন, "তত্র বিচারো বাদো জল্পো বিতণ্ডেতি"। অবশ্য উক্ত 'বাদ', 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা'

'বিচার'নামেও কথিত হইয়াছে। এবং 'কথা' শব্দের অন্যান্য অর্থেও প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু এখানে ভাষ্যকারোক্ত "কথা" শব্দটি পারিভাষিক। মহর্ষি নিজেও পরে পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে (১৯শ ও ২৩শ সূত্রে) উক্ত পারিভাষিক "কথা" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডেও (২।৪২) "ন বিগৃহ্য কথারুচিঃ" এই বাক্যে উক্ত পারিভাষিক "কথা" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। বাদী ও প্রতিবাদী "বাদ", "জল্প" ও বিতণ্ডা" নামে ত্রিবিধ কথাই উক্ত "কথা" শব্দের অর্থ। সুতরাং কথা ত্রিবিধ, ইহা অবশ্যই বলা যায়।

এখন সেই কথাত্রয়ের সামান্য লক্ষণ বুঝা আবশ্যক। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন,—"নানাপ্রবক্তৃকাবিচারবিষয়া বাক্যসংদৃষ্টিঃ কথেতি সামান্য-লক্ষণম্।" "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজও 'কথা'র লক্ষণ বলিয়াছেন,— "বিচারবিষয়ো নানাবক্তৃকো বাক্যবিস্তরঃ।" অর্থাৎ বিচার্য্য বিষয়ে অনেক বক্তার যথানিয়মে কথিত বাক্যসমূহই 'কথা'। একই বক্তার অথবা গ্রন্থকারের পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষাদিপ্রতিপাদক তাদৃশ বাক্যসমূহ কথা নহে। তাই বলিয়াছেন,—"নানাবক্তৃকঃ।" ঐ তাৎপর্য্যে ভাষ্যকারও প্রথমসূত্র-ভাষ্যে বলিয়াছেন,—'বাদঃ খলু নানাপ্রবক্তৃকঃ।" বস্তুতঃ তত্ত্ব-নির্ণয় অথবা জয়লাভ, এই দুই উদ্দেশ্যে বাদী ও প্রতিবাদীর 'কথা' হইয়া থাকে। উহার মধ্যে যে কোন উদ্দেশ্যের স্বরূপযোগ্য না হইলে তাহা 'কথা' হইবে না। তাই বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন,—"তত্ত্বনির্ণয়-বিজয়ান্যতর-স্বরূপযোগ্যো ন্যায়ানুগতবচন-সন্দর্ভঃ কথা।" লৌকিক বিবাদস্থলেও বাদী ও প্রতিবাদীর সেই সমস্ত বাক্য একতরের জয়লাভের যোগ্য হয়। কিন্তু সেই সমস্ত লৌকিক বিবাদ ন্যায়ানুগত না হওয়ায় তাহা 'কথা'র লক্ষণাক্রান্ত হয় না।

পূর্ব্বোক্ত "কথা"ত্রয়ের মধ্যে 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা'য় বাদী ও প্রতিবাদীর জয়লাভ মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও তদ্দ্বারা অনেক স্থলে মধ্যস্থগণের তত্ত্ব নির্ণয়ও হয়। কিন্তু প্রথমোক্ত 'বাদ'কথায় তত্ত্ব-নির্ণয়ই একমাত্র উদ্দেশ্য। কারণ, জিগীষাশূন্য বাদী ও প্রতিবাদীর কোন তত্ত্বনির্ণয়রূপ উদ্দেশ্যেই যে 'কথা', তাহার নাম 'বাদ'। অবশ্য জিগীষুর বিচারকেও 'বাদ' বলা হইয়াছে। "ন্যায়মঞ্জরী"র শেষে জয়ন্ত ভট্টও বলিয়াছেন,—"বাদে যেন কিরীটিনেব সমরে।" "বাদেষাপ্ত-জয়ো জয়ন্ত ইতি যঃ।" জৈন নৈয়ায়িকগণও জিগীষুর বিচারকে বাদবিশেষই বলিয়াছেন। কিন্তু গোতমোক্ত ঐ "বাদ" শব্দটি পূর্ব্বোক্ত অর্থে পারিভাষিক।

মহাভারতেও উক্ত পারিভাষিক "বাদ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। উক্তরূপ 'বাদ'ই শ্রীভগবানের বিভূতিবিশেষ। তাই তিনি বলিয়াছেন,—"বাদঃ প্রবদতামহং।"—(গীতা, ১০।৩২)। ভাষ্যকার শঙ্কর প্রভৃতিও উক্ত "বাদ" শব্দের দ্বারা গোতমোক্ত 'বাদ'ই গ্রহণ করিয়াছেন। পর্ণকুটীরে বা বৃক্ষমূলে বসিয়াও তত্ত্বনির্ণয়ার্থী শিষ্যের গুরু প্রভৃতির সহিত উক্ত 'বাদ'কথা হইয়াছে। তাই পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিয়াছেন, "গুর্ব্বাদিভিঃ সহ বাদঃ।" এবং উক্তরূপ 'বাদ'কেই বলা হইয়াছে—'তত্ত্ববুভুৎসুকথা' ও "বীতরাগকথা"। কিন্তু উক্তরূপ 'বাদ'কথাতেও বাদী ও প্রতিবাদিরূপে স্বপক্ষস্থাপনের ন্যায় পরপক্ষখণ্ডনও কর্ত্তব্য। নচেৎ তত্ত্বনির্ণয়রূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। আচার্য্য শঙ্করও ইহা সমর্থন করিয়াছেন।* এখন বাদলক্ষণসূত্রার্থ বুঝিতে হইবে।

ভাষ্য। একাধিকরণস্থৌ বিরুদ্ধৌ ধর্ম্মৌ পক্ষপ্রতিপক্ষৌ, প্রত্যনীকভাবাৎ, অস্ত্যাত্মা নাস্ত্যাত্মেতি। নানাধিকরণস্থৌ বিরুদ্ধৌ ন পক্ষপ্রতিপক্ষৌ, যথা নিত্য আত্মা অনিত্যা বুদ্ধিরিতি। পরিগ্রহোঽভ্যুপগমব্যবস্থা। সোঽয়ং পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ। তস্য বিশেষণং, 'প্রমাণ-তর্কসাধনোপালম্ভ', প্রমাণ-তর্কসাধনঃ প্রমাণতর্কোপালম্ভঃ। প্রমাণৈস্তর্কেণ চ সাধনমুপালম্ভশ্চাস্মিন্ ক্রিয়ত ইতি। সাধনং স্থাপনা, উপালম্ভঃ প্রতিষেধঃ। তৌ সাধনোপালম্ভৌ উভয়োরপি পক্ষয়োর্ব্যতিষক্তাবনুবদ্ধৌ, যাবদেকো নিবৃত্ত একতরো ব্যবস্থিত ইতি, নিবৃত্তস্যোপালম্ভো ব্যবস্থিতস্য সাধনমিতি।

জল্পে নিগ্রহ-স্থানবিনিয়োগাদ্বাদে তৎপ্রতিষেধঃ। প্রতিষেধে কস্যচিদভ্যনুজ্ঞানার্থং "সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ" ইতি বচনম্। "সিদ্ধান্ত-

---

* "নন্থ মুমুক্ষূণাং মোক্ষসাধনত্বেন সম্যগ্‌দর্শননিরূপণায় স্বপক্ষস্থাপনমেব কেবলং কর্ত্তুং যুক্তং, কিং পরপক্ষনিরাকরণেন পরদ্বেষকরেণ? বাঢ়মেবং, তথাপি মহাজনপরিগৃহীতানি মহান্তি সাংখ্যাদিতন্ত্রাণি," ইত্যাদি (শারীরকভাষ্য, ২।২।১)। "তত্ত্বনির্ণয়াবসানা বীতরাগকথা, নচ পরপক্ষদূষণমন্তরেণ তত্ত্বনির্ণয়ঃ শক্যঃ কর্ত্তুমিতি তত্ত্ব-নির্ণয়ায় বীতরাগেণাপি পরপক্ষো দূষ্যতে, নতু পরপক্ষতয়েতি, ন বীতরাগকথাব্যাহতিরিত্যর্থঃ।"—'ভামতী'।

মভ্যুপেত্য তদ্বিরোধী বিরুদ্ধ” ইতি হেত্বাভাসস্য নিগ্রহস্থান-স্যাভ্যনুজ্ঞা বাদে। “পঞ্চাবয়বোপপন্ন” ইতি “হীনমন্যতমেনাপ্যবয়বেন ন্যূনং,” “হেতূদাহরণাধিকমধিক”মিতি চৈতয়োরভ্যনুজ্ঞানার্থমিতি।

অবয়বেষু প্রমাণতর্কান্তর্ভাবে পৃথক্‌প্রমাণতর্কগ্রহণং সাধনোপালম্ভব্যতিষঙ্গজ্ঞাপনার্থং, অন্যথোভাবপি স্থাপনাহেতুনা প্রবৃত্তৌ বাদ ইতি স্যাৎ। অন্তরেণাপি চাবয় বসম্বন্ধং প্রমাণান্যর্থং সাধয়ন্তীতি দৃষ্টং, তেনাপি কল্পেন সাধনোপালম্ভৌ বাদে ভবত ইতি জ্ঞাপয়তি। “ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ভো জল্প” ইতি বচনাদ্‌বিনিগ্রহো জল্প ইতি মাবিজ্ঞায়ি, ছল-জাতি-নিগ্রহ-স্থানসাধনোপালম্ভ এব জল্পঃ, প্রমাণ-তর্কসাধনোপালম্ভো বাদ এবেতি মাবিজ্ঞায়ীত্যেবমর্থং পৃথক্‌প্রমাণ-তর্কগ্রহণমিতি।

অনুবাদ—একাধারস্থ অর্থাৎ একই ধর্ম্মীতে বাদী ও প্রতিবাদীর স্বীকৃত বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় ‘প্রত্যনীকভাব’ অর্থাৎ পরস্পরবিরুদ্ধত্ববশতঃ পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হয়, যথা—আত্মা আছে, আত্মা নাই অর্থাৎ একই আত্মাতে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হয়। বিভিন্ন আধারস্থ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হয় না, যথা—আত্মা নিত্য, বুদ্ধি অনিত্য, অর্থাৎ আত্মাতে নিত্যত্ব এবং বুদ্ধিতে অনিত্যত্ব পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হয় না। “পরিগ্রহ” বলিতে স্বীকারের ব্যবস্থা (নিয়ম) অর্থাৎ এই পদার্থ এই প্রকারই, অন্যপ্রকার নহে, এইরূপে স্বীকার। সেই এই ‘পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহ’ অর্থাৎ যাহাতে পূর্ব্বোক্তরূপ পক্ষ ও প্রতিপক্ষের উক্তরূপে স্বীকার আছে, এমন বাক্যসমূহ ‘বাদ’। সেই ‘বাদে’র বিশেষণ ‘প্রমাণতর্কসাধনোপালম্ভ’ (ব্যাখ্যা) প্রমাণতর্কসাধন এবং প্রমাণ-তর্কোপালম্ভ (অর্থাৎ) প্রমাণের দ্বারা এবং তর্কের দ্বারা এই বাদে সাধন ও উপালম্ভ কৃত হয়। ‘সাধন’ বলিতে স্থাপনা অর্থাৎ স্বপক্ষের সংস্থাপন, ‘উপালম্ভ’ বলিতে প্রতিষেধ অর্থাৎ পরপক্ষের খণ্ডন। সেই সাধন ও উপালম্ভ উভয় পক্ষেই “ব্যতিষক্ত” অর্থাৎ পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট এবং অনুবন্ধবিশিষ্ট হইবে (অর্থাৎ) যে পর্য্যন্ত এক পক্ষ নিবৃত্ত হয়, একতর পক্ষ ব্যবস্থিত হয়। নিবৃত্ত পক্ষের উপালম্ভ হয়, ব্যবস্থিত পক্ষের সাধন হয়।

'জল্পে' নিগ্রহস্থানসমূহের বিনিয়োগবশতঃ 'বাদে' তাহার নিষেধ বুঝা যায়। নিষেধ হইলেও কোনও নিগ্রহস্থানের অভ্যনুজ্ঞার্থ "সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ" এই পদের উল্লেখ হইয়াছে। (তাৎপর্য্য) "সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য তদ্বিরোধী বিরুদ্ধঃ"—এই সূত্রানুসারে 'বাদ'কথায় হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থানের অনুজ্ঞা হইয়াছে। "হীনমন্যতমেনাপ্যবয়বেন ন্যূনং" এবং "হেতূদাহরণাধিকমধিকং" এই (৫।২।১২।১৩) সূত্রোক্ত এই 'ন্যূন' ও 'অধিক'নামক নিগ্রহস্থানের অভ্যনুজ্ঞার নিমিত্ত "পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ" এই পদ উক্ত হইয়াছে। [অর্থাৎ এই সূত্রে উক্ত পদদ্বয়ের দ্বারা সূচিত হইয়াছে যে, 'বাদ' কথাতেও 'হেত্বাভাস' প্রভৃতি কতিপয় নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন কর্তব্য]।

অবয়বসমূহে প্রমাণ ও তর্কের অন্তর্ভাব হইলেও অর্থাৎ "পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ" এই পদের দ্বারাই প্রমাণ ও তর্কের লাভ হইলেও প্রমাণ ও তর্কের পৃথক্ গ্রহণ 'সাধন' ও 'উপালম্ভে'র 'ব্যতিষঙ্গে'র অর্থাৎ উভয় পক্ষে সম্বন্ধের জ্ঞাপনার্থ। অন্যথা স্থাপনা হেতুর দ্বারা প্রবৃত্ত উভয় পক্ষও 'বাদ', ইহা হউক ? [অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদী কেবল স্ব স্ব পক্ষের স্থাপন করিলে তাহা 'বাদ' হইবে না, ইহার জ্ঞাপনই প্রমাণ ও তর্কের পৃথক গ্রহণের অতিরিক্ত প্রথম ফল] এবং অবয়বসম্বন্ধ ব্যতীতও অর্থাৎ পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ না করিলেও প্রমাণসমূহ পদার্থকে সিদ্ধ করে, ইহা দৃষ্ট হয়। সেই কল্প দ্বারাও অর্থাৎ পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ না করিয়াও 'বাদ'কথায় সাধন ও উপালম্ভ হয়, ইহা জ্ঞাপন করিতেছে অর্থাৎ এই সূত্রে প্রমাণ ও তর্কের পৃথক্ গ্রহণ উক্ত দ্বিতীয় কল্পেরও জ্ঞাপক বা সূচক হইয়াছে। এবং (পরবর্ত্তী সূত্রে) "ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ভো জল্পঃ" এই উক্তিবশতঃ 'জল্প' 'বিনিগ্রহ' অর্থাৎ বাদস্থলীয় নিগ্রহস্থানশূন্য,* ইহা বুঝিবে

* এখানে বাচস্পতি মিশ্রের গৃহীত পাঠ ও ব্যাখ্যাই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যে "বিনিগ্রহো বাদ ইতি মাবিজ্ঞায়ি"—এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া মনে হয়। 'জল্পে' নিগ্রহস্থানের বিনিয়োগ হওয়ায় বাদ "বিনিগ্রহ" অর্থাৎ বাদে কোন নিগ্রহস্থানই নাই, ইহা বুঝিবে না, ইহাই ভাষ্যকারের বক্তব্য বুঝা যায়। ভাষ্যকারের শেষোক্ত ব্যাখ্যার দ্বারাও সরল ভাবে ইহা বুঝা যায়। "বিনিগ্রহ" শব্দের দ্বারা বাদগত নিগ্রহস্থানশূন্য, এইরূপ অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। পরন্ত ভাষ্যকারের তাহাই বক্তব্য হইলে তিনি "বিনিগ্রহ" শব্দের প্রয়োগ করিবেন কেন ? কিন্তু বাচস্পতি মিশ্রও "বিনিগ্রহো জল্পঃ" এইরূপ পাঠই গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"বাদগতনিগ্রহস্থানরহিতো মাবিজ্ঞায়ি ইত্যর্থঃ।" "বাদগতো নিগ্রহো ন জল্পে, জল্পগতশ্চ নিগ্রহো ন বাদে ইতি মাবিজ্ঞায়ি, ইষ্যতে হি বাদগতো নিগ্রহো জল্পে" ইত্যাদি—তাৎপর্য্যটীকা।

না, (বিশদার্থ) ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারাই যাহাতে সাধন ও উপালম্ভ হয়, তাহাই 'জল্প' এবং প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা যাহাতে সাধন ও উপালম্ভ হয়, তাহা বাদই, ইহা বুঝিবে না,—এই নিমিত্ত প্রমাণ ও তর্কের পৃথক গ্রহণ হইয়াছে।

টিপ্পনী—ভাষ্যকার সূত্রার্থ-ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে সূত্রোক্ত 'পক্ষ', 'প্রতিপক্ষ' ও 'পরিগ্রহ' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া পরে বলিয়াছেন,— "সোঽয়ং পক্ষপ্রতিপক্ষ-পরিগ্রহো বাদঃ"। কিন্তু বাদী ও প্রতিবাদীর পক্ষ ও প্রতিপক্ষের স্বীকাররূপ পরিগ্রহকে বাক্যরূপ বাদ বলা যায় না। সুতরাং "পক্ষ-প্রতিপক্ষয়োঃ পরিগ্রহো যত্র" এইরূপ বিগ্রহবাক্যানুসারে উক্ত পদে বহুব্রীহি সমাসই বুঝিতে হইবে। একাধারে বাদী ও প্রতিবাদীর স্বীকৃত অর্থাৎ বিবাদবিষয় বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় বিচারের প্রযোজক হওয়ায় উহাকে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বলে। যাহা বাদীর পক্ষ, তাহা প্রতিবাদীর প্রতিপক্ষ এবং যাহা প্রতিবাদীর পক্ষ, তাহা বাদীর প্রতিপক্ষ। যেমন আত্মাতে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব এবং নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় প্রমাণ দ্বারা উপপন্ন হয় না,—এ জন্য উহা বিচারের প্রয়োজক হওয়ায় 'পক্ষ' ও 'প্রতিপক্ষ' হয়। কিন্তু বিভিন্ন আধারে উক্তরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ও প্রমাণদ্বারা উপপন্ন হওয়ায় তাহা পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হয় না। যেমন আত্মা নিত্য হইলেও তাহার বুদ্ধি বা জ্ঞান অনিত্য, ইহা প্রমাণসিদ্ধ। সুতরাং আত্মাতে নিত্যত্ব ও বুদ্ধিতে অনিত্যত্ব পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হয় না। এইরূপ একাধারে কালভেদে বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় প্রমাণসিদ্ধ হইলে তাহাও পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হয় না এবং একতর ধর্ম্ম নির্ণীত হইলে তখন আর সেই ধর্ম্মদ্বয় পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হয় না। তাই উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন,— "এককালৌ অনবসিতৌ"। "অনবসিত" অর্থাৎ অনির্ণীত। পরবর্ত্তী সপ্তসূত্রভাষ্য দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যকার পরে সূত্রোক্ত "পরিগ্রহ" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন,—"অভ্যুপগম-ব্যবস্থা"। 'অভ্যুপগমে'র অর্থাৎ স্বীকারের ব্যবস্থা বা নিয়মই 'অভ্যুপগম-ব্যবস্থা'। উদ্দ্যোতকর উহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—"তয়োঃ পরিগ্রহ ইত্থম্ভাবনিয়মঃ, এবংধর্ম্মায়ং ধর্ম্মী নৈবংধর্ম্মেতি"। তাৎপর্য্য এই যে, এই ধর্ম্মী এইরূপ ধর্ম্মবিশিষ্টই, অন্যরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট নহে—এইরূপে সেই ধর্ম্মীর স্বীকারই পক্ষ-প্রতিপক্ষপরিগ্রহ। যেমন কোন বাদী আত্মা নিত্যত্বরূপ ধর্ম্মবিশিষ্টই, অনিত্যত্ব-রূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট নহে, এইরূপে উক্ত পক্ষ স্বীকার করিলে এবং প্রতিবাদী

নিয়মপূর্ব্বক উহার বিরুদ্ধ পক্ষরূপ প্রতিপক্ষ স্বীকার করিলে উহাই উভয়ের "পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহ"।

কিন্তু যে 'কথা'য় উক্তরূপে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের স্বীকার আছে, তাহাই 'বাদ', এইমাত্র বলিলে 'জল্প' এবং 'বিতণ্ডা' ও উক্ত বাদলক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় অতিব্যাপ্তি দোষ হয়, এ জন্য মহর্ষি প্রথম বিশেষণপদ বলিয়াছেন,—'প্রমাণ-তর্কসাধনোপালম্ভঃ।' 'প্রমাণতর্কাভ্যাং সাধনোপালম্ভৌ যত্র', এইরূপ বিগ্রহবাক্যানুসারে উক্ত পদের দ্বারা বুঝা যায়, যাহাতে প্রমাণ ও তর্কের দ্বারাই স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডন করা হয়। তাৎপর্য্য এই যে, 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা'য় 'ছল', 'জাতি' ও সমস্ত নিগ্রহস্থানের দ্বারাও সাধন ও উপালম্ভ করা যায়, কিন্তু 'বাদে' তাহা করা যায় না। 'বাদে' কেবল প্রমাণ ও তর্কের দ্বারাই সাধন এবং উপালম্ভ কর্ত্তব্য। সুতরাং প্রথমোক্ত "প্রমাণতর্কসাধনোপালম্ভঃ" এই বিশেষণ পদের দ্বারা সূচিত হইয়াছে যে, যাহা উক্ত 'ছল' প্রভৃতির দ্বারা 'সাধন' এবং উপালম্ভের অযোগ্য। সুতরাং উক্ত পদের দ্বারা জল্প ও বিতণ্ডায় বাদলক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ নিরস্ত হইয়াছে।

প্রশ্ন হয় যে, মহর্ষির মতে তর্কপদার্থ যখন কোন প্রমাণ নহে, তখন তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালম্ভ কিরূপে বলা যায়? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, তর্কপদার্থ প্রমাণ না হইলেও প্রমাণের অনুগ্রাহক। প্রমাণের বিষয়কে বিবেচন করিয়া তর্ক প্রমাণকে অনুগ্রহ করে, সুতরাং তর্কের সাহায্যে প্রমাণ নিজবিষয়ের তত্ত্বনির্ণয় উৎপন্ন করায় এই সূত্রে প্রমাণের সহিত তর্কও কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বে তর্কসূত্রভাষ্য-শেষে ভাষ্যকারও ঐ তাৎপর্য্যে বলিয়াছেন,— "প্রমাণাভ্যনুজ্ঞানাৎ প্রমাণসহিতো বাদেঽপদিষ্ট ইতি।"

উদ্দ্যোতকর পরে এই সূত্রে "সাধন" ও "উপালম্ভ" শব্দের অর্থবিষয়ে অনেক বিচার করিয়া নিজমত বলিয়াছেন যে, স্বপক্ষস্থাপনরূপ সাধনেরও বস্তুতঃ উপালম্ভ হয় না। কারণ, প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা বাদীর বাক্যরূপ সাধনের খণ্ডন হইতে পারে না। কিন্তু সেই বাক্যবক্তা পুরুষেরই নিগ্রহরূপ উপালম্ভ হয়। সুতরাং সেই পুরুষের ধর্ম্ম যে উপালম্ভ, তাহা তাঁহার বাক্য দ্বারা উদ্ভাবিত হওয়ায় সেইসমস্ত বাক্যে সেই উপালম্ভের উপচার বা পরম্পরাসম্বন্ধ-বশতঃ বাক্যরূপ সাধনের উপালম্ভ বলা হইয়াছে। কিন্তু কেবল "উপালম্ভ" শব্দের দ্বারা সাধনের উপালম্ভ কিরূপে বুঝা যাইবে? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর পরে বলিয়াছেন,—"প্রমাণতর্কসাধনশ্চ প্রমাণতর্কসাধনোপালম্ভশ্চ প্রমাণ-

তর্কসাধনোপালম্ভঃ, একস্য সাধনশব্দস্য গম্যমানার্থত্বাল্লোপঃ, যথা উষ্ট্রমুখীতি।" অর্থাৎ সূত্রোক্ত 'সাধন' শব্দের পরে কথিত উপালম্ভ শব্দের দ্বারা প্রথমোক্ত সাধনের উপালম্ভই বুঝা যায়। সুতরাং যেমন 'উষ্ট্রমুখী' এই পদে একটি 'মুখ'শব্দের লোপ বুঝিতে হইবে, তদ্রূপ এই সূত্রোক্ত প্রথম পদে একটি 'সাধন' শব্দের লোপ বা অপ্রয়োগ বুঝিতে হইবে।

কিন্তু ভাষ্যকার উক্তরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—"সাধনং স্থাপনা, উপালম্ভঃ প্রতিষেধঃ।" অর্থাৎ স্বপক্ষের সংস্থাপনই এর সূত্রে "সাধন" শব্দের অর্থ এবং প্রতিপক্ষের প্রতিষেধ বা খণ্ডনই "উপালম্ভ" শব্দের অর্থ। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় "প্রমাণতর্কাভ্যাং সাধনোপালম্ভৌ যত্র" এইরূপ বিগ্রহবাক্যানুসারে যাহাতে প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন হয় এবং প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা উপালম্ভ হয়, এইরূপ অর্থই সূত্রোক্ত প্রথম পদের দ্বারা বুঝা যায়।* সুতরাং উক্ত পদে একটি "সাধন" শব্দের লোপ স্বীকার অনাবশ্যক। অবশ্য পরস্পর বিরুদ্ধ উভয় পক্ষেই প্রকৃত প্রমাণ ও প্রকৃত তর্ক সম্ভব হয় না। একতর পক্ষে প্রমাণাভাস এবং তর্কাভাসই হয়। কিন্তু সেই পক্ষবাদীও তাহাকে প্রকৃত প্রমাণরূপে ও প্রকৃত তর্করূপে বুঝিয়াই তদ্দ্বারা সাধন ও উপালম্ভ করায় ঐ তাৎপর্য্যে মহর্ষি উভয় পক্ষেই "প্রমাণতর্কসাধনোপালম্ভ" বলিয়াছেন। সূত্রোক্ত সেই সাধন ও উপালম্ভ ব্যতিষক্ত ও অনুবন্ধবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক, ইহাও ভাষ্যকার পরে এখানে বলিয়াছেন এবং ঐ উভয়ের 'অনুবন্ধ' কি, তাহা ব্যক্ত করিতে পরে বলিয়াছেন,—"যাবদেকো নিবৃত্ত একতরো ব্যবস্থিতঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ উভয় পক্ষেই সাধন এবং উপালম্ভ, এই উভয়ই আবশ্যক এবং যে কাল পর্য্যন্ত এক পক্ষ নিবৃত্ত না হয়, সেই কাল পর্য্যন্ত সাধন ও উপালম্ভ কর্ত্তব্য। নচেৎ তদ্দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় সম্ভব হয় না (পূর্ব্ব ৩৬১-৩৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, 'জল্পে' 'নিগ্রহস্থানে'র বিধান হওয়ায় সেই বিশেষ বিধানবশতঃ 'বাদে' নিগ্রহস্থানের নিষেধ বুঝা যায়। কিন্তু নিষেধ

---

* অনেক প্রাচীন ভাষ্যপুস্তকে এই সূত্রের ভাষ্যে "প্রমাণতর্কসাধনঃ প্রমাণতর্কোপালম্ভঃ" এইরূপ অতিরিক্ত পাঠ আছে। উক্ত পাঠের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা যাহাতে সাধন হয় এবং উপালম্ভ হয়, এইরূপ অর্থই ভাষ্যকারের অভিমত। উহার অব্যবহিত পরে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা দ্বারাও তাহাই বুঝা যায় সুতরাং এবার উক্ত পাঠ ভাষ্যপাঠ বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে। সুধীগণ এ বিষয়ে বিচার করিবেন।

হইলেও "বাদে" কোনও নিগ্রহস্থানের বিধানের জন্য এই সূত্রে মহর্ষি বলিয়াছেন,—"সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ।" উহার দ্বারা বাদেও যে, "হেত্বাভাসরূপ" নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন কর্ত্তব্য, ইহা সূচিত হইয়াছে। আর পরে "পঞ্চাবয়বো-পপন্নঃ" এই পদের দ্বারা সূচিত হইয়াছে যে, 'বাদে'ও 'ন্যূন' ও 'অধিক' নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন কর্ত্তব্য। ভাষ্যকার মহর্ষি-কথিত 'ন্যূন' ও 'অধিক' নামক নিগ্রহস্থানের লক্ষণসূত্রদ্বয় উদ্ধৃত করিয়া ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই সূত্রদ্বয়ের অর্থ এই যে, বাদী ও প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপন করিতে যে কোন একটি অবয়বের প্রয়োগ না করিলেও "ন্যূন"নামক নিগ্রহস্থান হয় এবং হেতু ও উদাহরণবাক্য একের অধিক বলিলে 'অধিক'নামক নিগ্রহস্থান হয়।

কিন্তু উদ্দ্যোতকর ভাষ্যকারের কথার প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছে যে, "পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ" এই পদের দ্বারাই বুঝা যায় যে, 'বাদে'ও 'হেত্বাভাস'রূপ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবনও কর্ত্তব্য। কারণ, বাদী বা প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপনে কোন হেত্বাভাসের প্রয়োগ করিলে তাঁহাদিগের কথিত সেই সমস্ত অবয়ব প্রকৃত অবয়ব হইবে না, তাহা হইবে '**অবয়বাভাস**'। সুতরাং উক্ত পদে "অবয়ব" শব্দ প্রয়োগের দ্বারাই বুঝা যায় যে, বাদেও হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন কর্ত্তব্য। অর্থাৎ বাদী গুরুও যদি ভ্রমবশতঃ কোন হেত্বাভাসের প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদী শিষ্য তাহা অবশ্য বলিবেন। নচেৎ "বাদ"কথার উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। তবে এই সূত্রে "সিদ্ধান্তবিরুদ্ধঃ" এই পদের প্রয়োজন কি? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর পরে বলিয়াছেন যে, "অপসিদ্ধান্ত"নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন যে 'বাদে'ও কর্ত্তব্য, ইহাই সূচনা করিতে মহর্ষি বলিয়াছেন—'সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ।" অর্থাৎ বাদকথাও সিদ্ধান্তের অবিরুদ্ধ হইবে। উহাতে কোন 'অপসিদ্ধান্ত' বলা যাইবে না। বস্তুতঃ উক্ত পদের দ্বারা ঐরূপ অর্থই সরলভাবে বুঝা যায়।

কিন্তু ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য এই যে, "অপসিদ্ধান্ত"নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন যে, 'বাদে'ও কর্ত্তব্য, ইহা তুল্য যুক্তিতে ভাষ্যকারেরও সম্মত। ভাষ্যকার তাহার নিষেধ করেন নাই। পরন্তু প্রথমে "কস্যচিৎ" এই পদের দ্বারা সামান্যতঃ উহারও গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যায়। নচেৎ প্রথমে তাঁহার "কস্যচিদভ্যনুজ্ঞানার্থং" এইরূপ উক্তি অনাবশ্যক। কিন্তু পরে তিনি সূত্রোক্ত "সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ" এই পদের যাহা গূঢ় প্রয়োজন, তাহাই ব্যক্ত করিতে ঐরূপ কথা বলিয়াছেন। কারণ, বাদমাত্রই পঞ্চাবয়বযুক্ত নহে। পঞ্চাবয়বশূন্য

বাদকথাও হয়। সুতরাং সেই 'বাদে'র লক্ষণে পঞ্চাবয়বযুক্তত্ব বিশেষণ বক্তব্য না হওয়ায় সেই 'বাদে'ও যে, হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন কর্ত্তব্য, ইহা উক্ত পদের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু 'বাদ'মাত্রই 'সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ'। সুতরাং ভাষ্যকার "সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ" এই পদের দ্বারাই উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিরূপে উক্ত পদের দ্বারা তাহা বুঝা যায় ? ইহা ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার মহর্ষির পরে কথিত 'বিরুদ্ধ' হেত্বাভাসের লক্ষণসূত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরও পরে উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে সমস্ত হেত্বাভাসকেই 'বিরুদ্ধ' বলিয়াছেন। তাহা হইলে তদনুসারে ভাষ্যকারও এখানে উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারেন। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, "ন্যূন" ও "অধিক"নামক নিগ্রহস্থান হইলে তৎপ্রযুক্ত সেই হেতুর কোন দোষ না হওয়ায় সেখানে তত্ত্ব-নির্ণয় অসম্ভব হয় না। সুতরাং "বাদ"কথায় উক্ত নিগ্রহস্থানদ্বয়ের উদ্ভাবনও উচিত নহে। তাই ভাষ্যকার "বাদ"-কথায় পঞ্চাবয়বপ্রয়োগের আবশ্যকতাও স্বীকার করেন নাই। কিন্তু উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব প্রমাণ না হইলেও প্রমাণমূলকত্ববশতঃ প্রমাণসদৃশ। সুতরাং কোন অবয়বের ন্যূনতা বা আধিক্য কোন প্রমাণভ্রমবশতঃও হইতে পারে। সুতরাং "বাদ"কথাতেও "ন্যূন" ও "অধিক"নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন কর্ত্তব্য। কারণ, প্রমাণের কোন দোষ বুঝিলে তাহা অবশ্য বক্তব্য। নচেৎ তত্ত্ব-নির্ণয়ই সম্ভব হয় না। বস্তুতঃ "বাদ"কথায় "ন্যূন" ও "অধিক"নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবনও যে কর্ত্তব্য, ইহা প্রাচীন মত। তাই ভাষ্যকারও এখানে তাহা বলিয়াছেন। কিন্তু পঞ্চাবয়ব-যুক্ত "বাদ"কথাতেই উক্ত নিগ্রহস্থানদ্বয়ের উদ্ভাবন সম্ভব হয়। সুতরাং সেইরূপ স্থলেই ভাষ্যকার ঐ কথা বলিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই সূত্রে "পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ" এই পদের দ্বারাই বুঝা যায় যে, 'বাদে' প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালম্ভ হয়। কারণ, পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ করিলেই তাহার মূলীভূত প্রমাণকে অবশ্য গ্রহণ করা হয় এবং সেই প্রমাণের অনুগ্রাহক তর্কও আবশ্যক হয়। প্রমাণ ও তর্ক ব্যতীত পঞ্চাবয়বযুক্ত 'বাদ' সম্ভবই হয় না। তথাপি মহর্ষি প্রথমোক্ত পদে প্রমাণ ও তর্কের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন কেন ? তাই ভাষ্যকার পরে উহার তিনটি প্রয়োজন বলিয়াছেন। অবশ্য প্রথমোক্ত পদে প্রমাণ ও তর্কের উল্লেখ না করিলে 'বাদে' প্রমাণ ও তর্কের দ্বারাই সাধন ও উপালম্ভ হয়, ইহা ব্যক্ত না

হওয়ায় 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা' হইতে 'বাদে'র বিশেষ ব্যক্ত হয় না। সুতরাং 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা'য় 'বাদ'লক্ষণের অতিব্যাপ্তিবারণই উহার প্রয়োজন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তথাপি ভাষ্যকার গৌণভাবে উহার আরও তিনটি প্রয়োজন ব্যক্ত করিতে পরে বলিয়াছেন,—"অবয়বেষু প্রমাণতর্কান্তর্ভাবে পৃথক্-প্রমাণতর্কগ্রহণং" ইত্যাদি। (বাচস্পতি মিশ্রও ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"পূর্ব্বস্মিন্ প্রয়োজনে স্থিতে ভাষ্যকারঃ প্রয়োজনান্তরমধ্যাচিনোতি 'অবয়বেম্বিতি')।" ভাষ্যকার উহার প্রথম প্রয়োজন বলিয়াছেন,—'সাধন' ও 'উপালম্ভে'র ব্যতিষঙ্গ-জ্ঞাপন। 'ব্যতিষঙ্গ' বলিতে উভয় পক্ষে সম্বন্ধ। অর্থাৎ বাদী যেমন তাঁহার অভিমত প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা নিজপক্ষের সাধন ও পরপক্ষের খণ্ডন করিবেন, তদ্রূপ প্রতিবাদীও তাঁহার অভিমত প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা নিজপক্ষের সাধন ও পরপক্ষের খণ্ডন করিবেন। নচেৎ বাদী ও প্রতিবাদী যথাক্রমে পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ করিয়া কেবল নিজ নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে তাহা 'বাদ' হইবে না। সুতরাং উক্তরূপ ('ব্যতিষক্ত') সাধন ও উপালম্ভই এই সূত্রে মহর্ষির বিবক্ষিত, ইহা প্রমাণ ও তর্কের পৃথক্ গ্রহণের দ্বারা সূচিত হইয়াছে।

ভাষ্যকার পরে উহার দ্বিতীয় প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ ব্যতীতও প্রমাণের দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় হইয়া থাকে। সুতরাং কেবল তত্ত্বনির্ণয়ার্থ যে "বাদ", তাহা পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ ব্যতীতও হইতে পারে। অর্থাৎ পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ না করিয়াও "বাদ"কথায় প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালম্ভ করা যায়। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"তেনাপি কল্পেন সাধনোপালম্ভৌ বাদে ভবত ইতি জ্ঞাপয়তি।" অর্থাৎ এই সূত্রে প্রথমে "প্রমাণ-তর্কসাধনোপালম্ভঃ" এই পদের উল্লেখ উক্ত দ্বিতীয় কল্পেরও জ্ঞাপক। বাচস্পতি মিশ্রও ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"বাদঃ পঞ্চাবয়বোপপন্ন ইত্যেকঃ কল্পঃ, 'প্রমাণতর্কসাধনোপালম্ভ' ইতি দ্বিতীয় ইত্যর্থঃ।"

ভাষ্যকার পরে তৃতীয় প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, মহর্ষি পরবর্ত্তী সূত্রে "ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানসাধনোপালম্ভঃ" এই কথা বলায় কেহ বুঝিতে পারেন যে, 'ছল', 'জাতি' ও 'নিগ্রহস্থানে'র দ্বারা যাহাতে সাধন ও উপালম্ভ হয়, তাহাই জল্প এবং প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা যাহাতে সাধন ও উপালম্ভ হয়, তাহা বাদই, জল্প নহে। সুতরাং মহর্ষি উক্তরূপ ভ্রম নিবারণের জন্যও এই সূত্রে প্রথম পদে প্রমাণ ও তর্কের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, তাহা হইলে পরবর্ত্তী সূত্রে

"যথোক্ত" শব্দের দ্বারা এই সূত্রোক্ত প্রথম বিশেষণও গৃহীত হওয়ায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'জল্পে'ও প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালম্ভ কর্ত্তব্য। পরন্তু জিগীষু বাদী ও প্রতিবাদী কোন স্থলে "বাদে"র ন্যায় প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সাধন ও উপালম্ভ করিলে তাহাতে কোনরূপ 'ছল' ও 'জাতি'র প্রয়োগ না করিলেও তাহা 'জল্প' হইবে অর্থাৎ জল্পে 'ছল' ও 'জাতি'র প্রয়োগ অকর্ত্তব্য না হইলেও অবশ্য কর্ত্তব্য নহে, ইহাও উক্ত প্রথম পদের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। 'তাৎপর্য্যটীকা'কার বাচস্পতি মিশ্র "বিনিগ্রহো জল্পঃ" এইরূপ ভাষ্যপাঠই গ্রহণ করিয়া যেরূপ তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। অন্যান্য কথা পরে ব্যক্ত হইবে ॥১॥

সূত্র। যথোক্তোপপন্নশ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ভো জল্পঃ ॥২॥৪৩॥

অনুবাদ—"যথোক্তোপপন্ন" অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রে বাদের লক্ষণে কথিত সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট হইয়া 'ছল', জাতি' ও সমস্ত 'নিগ্রহস্থানে'র দ্বারা সাধন ও উপালম্ভবিশিষ্ট অর্থাৎ যাহাতে উক্ত ছল প্রভৃতির দ্বারাও সাধন ও উপালম্ভ করা যায়, তাহা 'জল্প'।

ভাষ্য। যথোক্তোপপন্ন ইতি "প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভঃ," "সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ," "পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ," "পক্ষপ্রতিপক্ষ-পরিগ্রহঃ"। 'ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ভ' ইতি ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানৈঃ সাধনমুপালম্ভশ্চাস্মিন্ ক্রিয়ত ইতি, এবং বিশেষণো জল্পঃ।

ন খলু বৈ ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানৈঃ সাধনং কস্যচিদর্থস্য সম্ভবতি, প্রতিষেধার্থতৈবৈষাং সামান্যলক্ষণে বিশেষলক্ষণে চ শ্রূয়তে। 'বচন-বিঘাতোঽর্থবিকল্পোপপত্ত্যা ছল'মিতি, 'সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতি'রিতি, 'বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহ-স্থান'মিতি, বিশেষলক্ষণেষ্বপি যথাস্বমিতি। ন চৈতদ্-

বিজানীয়াৎ প্রতিষেধার্থতয়ৈবার্থং সাধয়ন্তীতি, ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানোপালম্ভো জল্প ইত্যেবমপ্যুচ্যমানে বিজ্ঞায়ত এতদিতি।

প্রমাণৈঃ সাধনোপালম্ভয়োশ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানামঙ্গভাবঃ স্বপক্ষ-রক্ষণার্থত্বাৎ, ন স্বতন্ত্রাণাং সাধনভাবঃ। যৎ তৎ প্রমাণৈরর্থস্য সাধনং, তত্র ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানামঙ্গভাবঃ স্বপক্ষরক্ষণার্থত্বাৎ, তানি হি প্রযুজ্যমানানি পরপক্ষবিঘাতেন স্বপক্ষং রক্ষন্তি। তথা চোক্তং—"তত্ত্বাধ্যবসায়-সংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডে বীজপ্ররোহসংরক্ষণার্থং কণ্টকশাখাবরণব"দিতি। যশ্চাসৌ প্রমাণৈঃ প্রতিপক্ষস্যোপালম্ভস্তস্য চৈতানি প্রযুজ্যমানানি প্রতিষেধবিঘাতাৎ সহকারীণি ভবন্তি, তদেবমঙ্গীভূতানাং ছলাদীনামুপাদানং জল্পে, ন স্বতন্ত্রাণাং সাধনভাবঃ, উপালম্ভে তু স্বাতন্ত্র্যমপ্যস্তীতি।

অনুবাদ—"যথোক্তোপপন্নঃ", এই পদের অর্থ—'প্রমাণতর্ক-সাধনোপালম্ভ', 'সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ', 'পঞ্চাবয়বোপপন্ন', 'পক্ষ-প্রতিপক্ষপরিগ্রহ', অর্থাৎ পূর্ব্ব-সূত্রোক্ত ঐ সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট। "ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানসাধনোপালম্ভঃ"—এই পদের অর্থ—'ছল', 'জাতি' ও সমস্ত নিগ্রহস্থানের দ্বারা ইহাতে (জল্পে) সাধন ও উপালম্ভ কৃত হয়। এইরূপ বিশেষণবিশিষ্ট জল্প, অর্থাৎ যাহা পূর্ব্ব-সূত্রোক্ত সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট হইয়া উক্ত 'ছল' প্রভৃতির দ্বারা সাধন ও উপালম্ভের যোগ্যতাবিশিষ্ট, তাহা 'জল্প'।

(পূর্ব্বপক্ষ) 'ছল', 'জাতি' ও 'নিগ্রহস্থানে'র দ্বারা কোন পদার্থের সাধন সম্ভবই হয় না। (কারণ) সামান্যলক্ষণসূত্রে এবং বিশেষলক্ষণসূত্রে ইহাদিগের (উক্ত 'ছল' প্রভৃতির) খণ্ডনার্থত্বই শ্রুত হয়। (যথাক্রমে মহর্ষি-কথিত ছলপ্রভৃতির সামান্যলক্ষণসূত্র) যথা—"বচনবিঘাতোঽর্থবিকল্পোপপত্ত্যা ছলং," "সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ", "বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানং।" (২য় আঃ, ১০ম, ১৮শ ও ১৯শ সূত্র)। বিশেষলক্ষণসূত্রসমূহেও যথাযথ ইহাদিগের খণ্ডনার্থত্বই শ্রুত হয় অর্থাৎ বুঝা যায়। খণ্ডনার্থত্বপ্রযুক্তই ইহার অর্থকে (স্বপক্ষকে) সাধন করে, ইহা কিন্তু বুঝা যায় না অর্থাৎ এখানে মহর্ষির উক্তরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যায় না। (কারণ) "ছল-জাতি-নিগ্রহ-

স্থানোপালম্ভো জল্পঃ" এইরূপ বাক্য বলিলেও ইহা বুঝা যায়। অর্থাৎ মহর্ষির উক্তরূপই তাৎপর্য্য হইলে উক্ত পদে "সাধন" শব্দের প্রয়োগ না করিয়া কেবল "উপালম্ভ" শব্দের প্রয়োগ করিলেও ঐরূপ তাৎপর্য্য বুঝা যায়। সুতরাং "সাধন" শব্দের প্রয়োগ ব্যর্থ হয়।

(উত্তর) প্রমাণসমূহের দ্বারা সাধন ও উপালম্ভে 'ছল', 'জাতি' ও 'নিগ্রহস্থানে'র স্বপক্ষরক্ষণার্থত্ববশতঃ অঙ্গত্ব (সহকারিত্ব) আছে। স্বতন্ত্র অর্থাৎ প্রমাণনিরপেক্ষ ইহাদিগের সাধনত্ব অর্থাৎ স্বপক্ষসাধকত্ব নাই। (বিশদার্থ) প্রমাণসমূহের দ্বারা অর্থের (স্বপক্ষের) সেই যে সাধন, তাহাতে স্বপক্ষরক্ষণার্থত্ববশতঃ 'ছল', 'জাতি' ও 'নিগ্রহস্থানে'র সহকারিত্ব আছে। যেহেতু সেই 'ছল', 'জাতি' ও 'নিগ্রহস্থান' প্রযুজ্যমান হইয়া পরপক্ষবিঘাতের দ্বারা স্বপক্ষকে রক্ষা করে। (মহর্ষি কর্ত্তৃক পরে) সেইরূপই উক্ত হইয়াছে, যথা—"তত্ত্বাধ্যবসায়-সংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডে বীজপ্রোরোহসংরক্ষণার্থং কণ্টকশাখাবরণবৎ" (৪।২।৫০শ সূত্র) [অর্থাৎ উক্ত সূত্রের দ্বারা মহর্ষি পরে নিজেই বলিয়াছেন যে, যেমন বীজ হইতে উৎপন্ন অঙ্কুরাদির সংরক্ষণের জন্য কণ্টকযুক্ত শাখার দ্বারা আবরণ কর্ত্তব্য হয়, তদ্রূপ তত্ত্ব-নিশ্চয় রক্ষার নিমিত্তই 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা' কর্ত্তব্য হয়] পরন্তু প্রমাণসমূহের দ্বারা প্রতিপক্ষের এই যে উপালম্ভ হয়, তাহার সম্বন্ধেও এই 'ছল', 'জাতি' ও 'নিগ্রহস্থান' প্রযুজ্যমান হইয়া প্রতিষেধের বিঘাত করায় সহকারী হয়। সুতরাং এইরূপে অঙ্গীভূত 'ছল' প্রভৃতির 'জল্পে' গ্রহণ হইয়াছে। স্বতন্ত্র ইহাদিগের সাধনত্ব অর্থাৎ স্বপক্ষসাধকত্ব নাই। 'উপালম্ভে' অর্থাৎ পরপক্ষখণ্ডনে কিন্তু স্বাতন্ত্র্যও আছে।

টিপ্পনী—'বাদের' পরে 'জল্প' উদ্দিষ্ট হওয়ায় মহর্ষি সেই 'জল্পে'র লক্ষণ বলিতে এই সূত্রের প্রথমে বলিয়াছেন,—"যথোক্তোপপন্ন"। ভাষ্যকার উক্ত পদের অর্থ ব্যক্ত করিতে যথাক্রমে পূর্ব্বসূত্রোক্ত "প্রমাণতর্কসাধনোপালম্ভঃ"—ইত্যাদি পদচতুষ্টয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বসূত্রে বাদের যে সমস্ত বিশেষণ উক্ত হইয়াছে, 'জল্প'ও সেই সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট, ইহাই এই সূত্রে "যথোক্তোপপন্ন" এই পদের দ্বারা বুঝিতে হইবে।* কিন্তু "জল্পে"

---

* 'বার্ত্তিক'কার উদ্দ্যোতকর এখানে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বসূত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদের দ্বারা 'বাদে' নিগ্রহস্থানবিশেষের যে নিয়ম সূচিত হইয়াছে, তাহা 'জল্পে' নাই। কারণ, 'জল্পে' সমস্ত নিগ্রহস্থানেরই উদ্ভাবন করা যায়। সুতরাং পূর্ব্বসূত্রোক্ত সমস্ত বিশেষণের মধ্যে জল্পে যাহা সম্ভব, তাহাই "যথোক্ত" পদের দ্বারা বুঝিতে হইবে। অথবা যেমন 'গোযুক্তো

অতিরিক্ত কোন বিশেষণ থাকায় 'জল্প' বাদলক্ষণাক্রান্ত হয় না, জল্প বাদ হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্ন, ইহাই ব্যক্ত করিতে মহর্ষি পরে বলিয়াছেন,—"**ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ভঃ।**" অর্থাৎ যাহাতে 'ছল', 'জাতি' ও সমস্ত 'নিগ্রহস্থানে'র দ্বারাও সাধন ও উপালম্ভ করা হয় অর্থাৎ করা যায়। তাহা হইলে সম্পূর্ণ সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, পূর্ব্বসূত্রোক্ত সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট হইয়া যাহা এই সূত্রে শেষোক্ত বিশেষণবিশিষ্ট, তাহা "জল্প"। তাই ভাষ্যকার পরে ঐ তাৎপর্য্যেই সূত্রার্থ বলিয়াছেন,—"**এবংবিশেষণো জল্পঃ।**"

ভাষ্যকার পরে "**ন খলু বৈ**" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন যে, "ছল" প্রভৃতির দ্বারা কাহারও স্বপক্ষসাধন হইতে পারে না। কিন্তু পরপক্ষ খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই 'ছল' প্রভৃতির প্রয়োগ হয়। উক্ত ছল প্রভৃতি পদার্থত্রয়ের সামান্যলক্ষণসূত্র এবং বিশেষলক্ষণসূত্রসমূহের দ্বারাও তাহাই বুঝা যায়। ঐ সমস্ত পদার্থ পরপক্ষ খণ্ডনের দ্বারাই স্বপক্ষের সাধক হয়, ইহাও মহর্ষির তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। কারণ, তাহা হইলে এই সূত্রে 'সাধন' শব্দের প্রয়োগ না করিয়া কেবল 'উপালম্ভ' শব্দের প্রয়োগ করিলেও উক্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু মহর্ষি এই সূত্রে "ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ভঃ" এই পদে পৃথক্‌ভাবে 'সাধন' ও 'উপালম্ভ' এই উভয়েরই উল্লেখ করায় জল্পে উক্ত 'ছল' প্রভৃতির দ্বারা স্বপক্ষের সাধনও হয়, ইহাই কথিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা অসম্ভব।

ভাষ্যকার পরে "**প্রমাণৈঃ**" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমাধান করিয়াছেন। ভাষ্যকারের কথা এই যে, 'ছল', 'জাতি' ও 'নিগ্রহস্থান' স্বতন্ত্রভাবে কাহারও স্বপক্ষের সাধক হয় না, ইহা সত্য। কিন্তু প্রমাণের দ্বারা

রথঃ' এইরূপ বিগ্রহে 'গোরথঃ' এইরূপ মধ্যপদলোপী সমাসের প্রয়োগ হয়, তদ্রূপ "যথোক্তোপপন্নেন উপপন্নঃ" এইরূপ বিগ্রহে একটি "উপপন্ন" শব্দের লোপে উক্ত পদে মধ্যপদলোপী সমাসই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে উক্ত পদের দ্বারা বুঝা যায় যে, পূর্ব্বসূত্রোক্ত বিশেষণসমূহের মধ্যে যাহা জল্পে উপপন্ন বা সম্ভব হয়, সেই বিশেষণবিশিষ্ট। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও ঐরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্ব্বসূত্রোক্ত ঐ সমস্ত পদের যাহা শব্দলভ্য অর্থ, তাহাই "যথোক্ত" শব্দের দ্বারা মহর্ষির বিবক্ষিত। কিন্তু যাহা অর্থলভ্য অর্থাৎ যাহা সূচিত অর্থ, তাহা উহার দ্বারা বিবক্ষিত নহে। বস্তুতঃ মহর্ষি "উক্তোপপন্নঃ" এইরূপ স্বল্পাক্ষর পদের প্রয়োগ না করিয়া পূর্ব্বে "যথা" শব্দের প্রয়োগ করায় পূর্ব্বসূত্রোক্ত ঐ সমস্ত পদের যথাশ্রুতার্থই যে, এই সূত্রে "যথোক্ত" শব্দের দ্বারা তাঁহার বিবক্ষিত, ইহা আমরা বুঝিতে পারি।

যে, স্বপক্ষসাধন ও পরপক্ষখণ্ডনরূপ 'উপালম্ভ' হয়, তাহাতে ঐ সমস্ত অঙ্গ অর্থাৎ সহকারী হইয়া থাকে। কারণ, উক্ত 'ছল' প্রভৃতির প্রয়োগ হইলে উহারা পরপক্ষ-খণ্ডনের দ্বারা স্বপক্ষের রক্ষা করে। মহর্ষি নিজেও পরে "তত্ত্বাধ্যবসায়-সংরক্ষণার্থং" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা প্রমাণজন্য তত্ত্ব-নিশ্চয়ের রক্ষার্থ ছলাদিযুক্ত জল্প ও বিতণ্ডাও কর্ত্তব্য, ইহা বলিয়াছেন। সুতরাং বুঝা যায় যে, মহর্ষি এই সূত্রে স্বপক্ষের সাধনে প্রমাণের অঙ্গ বা সহকারিরূপেই উক্ত 'ছল' প্রভৃতির গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রমাণজন্য স্বপক্ষনিশ্চয়ের রক্ষার দ্বারাই পরম্পরায় উক্ত 'ছল' প্রভৃতি স্বপক্ষের সাধন হয়, ইহাই মহর্ষির তাৎপর্য্য। আর প্রমাণের দ্বারা প্রতিপক্ষের উপালম্ভ বা খণ্ডনেও উক্ত 'ছল' প্রভৃতি প্রতিষেধের বিঘাত করায় অর্থাৎ প্রতিবাদীর সেই খণ্ডনের খণ্ডন করায় সহকারী হয়। সুতরাং উহারা স্বপক্ষ সাধনের ন্যায় পরপক্ষখণ্ডনেও অঙ্গ হয়। স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ প্রমাণ ও তর্ককে অপেক্ষা না করিয়া উহারা কখনও স্বপক্ষসাধক হয় না। সুতরাং মহর্ষি এই সূত্রে তাহা বলেন নাই। কিন্তু পরপক্ষ-খণ্ডনে উহাদিগের স্বাতন্ত্র্যও আছে। তাৎপর্য্য এই যে, বাদী প্রমাণাদির দ্বারা নিজপক্ষ সাধন করিলে তখন প্রতিবাদী যদি সদুত্তরের দ্বারা তাহার খণ্ডন করিতে অসমর্থ হইয়া "ছল" ও "জাতি" নামক অসদুত্তরের দ্বারা এবং কোন 'নিগ্রহস্থানে'র উদ্ভাবন করিয়া বাদীর পক্ষের খণ্ডন করেন, তাহা হইলে সেই খণ্ডনে উহারা প্রমাণাদিকে অপেক্ষা করে না। কারণ, সেই স্থলে প্রতিবাদী প্রমাণ দ্বারা কোন পক্ষ স্থাপন করেন না।

কিন্তু 'বার্ত্তিক'কার উদ্দ্যোতকর ভাষ্যকারের উক্ত সমাধানের প্রতিবাদ করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, 'ছল', 'জাতি' ও 'নিগ্রহস্থানে'র দ্বারা কোন পদার্থের সাধন বা খণ্ডন হইতেই পারে না। কারণ, মহর্ষি গোতমোক্ত 'ছল' ও 'জাতি'নামক পদার্থ অসদুত্তরবিশেষ। ঐ সমস্ত অযুক্ত উত্তর। সুতরাং উহাদিগের কোন পদার্থের সাধন বা খণ্ডনে সামর্থ্যই নাই। আর প্রমাণ দ্বারা সাধন ও খণ্ডনে ভাষ্যকারোক্ত প্রকারে উক্ত 'ছল' ও 'জাতি' যে, প্রমাণের অঙ্গ বা সহকারী হয়, ইহাও বলা যায় না। কারণ, যে উত্তর প্রকৃত উত্তরই নহে, তাহা ঐ ভাবে প্রমাণের সহকারীও হইতে পারে না। কারণ, তদ্দ্বারা কাহারও স্বপক্ষরক্ষাও সম্ভব হয় না। বাচস্পতি মিশ্র দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন,—"নহি সহস্রেণাপ্যন্ধৈঃ পাটচ্চরেভ্যো গৃহং রক্ষ্যত ইত্যর্থঃ।" অর্থাৎ সহস্র অন্ধও তস্করগণ হইতে গৃহ রক্ষা করিতে পারে না।

কারণ, অজ্ঞত্ববশতঃ তাহাদিগের সে বিষয়ে সামর্থ্যই নাই। এইরূপ "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি কোন নিগ্রহস্থানের দ্বারাও কোন পদার্থের সাধন হইতে পারে না।

তবে 'জল্পে' 'ছল' প্রভৃতির প্রয়োগ হয় কেন? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর পরে বলিয়াছেন,—"সাধন-বিঘাতার্থং" ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে, বাদী প্রথমে নির্দ্দোষ হেতুর দ্বারা স্বপক্ষ স্থাপন করিলে জিগীষু প্রতিবাদী সদুত্তর দ্বারা তাহার খণ্ডন করিতে অসমর্থ হইয়া পরাজয়ভয়ে ব্যাকুলতাবশতঃ অসদুত্তরের দ্বারাই বাদীর সাধনের খণ্ডনোদ্দেশ্যে উক্ত 'ছল' প্রভৃতির প্রয়োগ করেন। স্থলবিশেষে তদ্দ্বারা তাহার জয়লাভ হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা বস্তুতঃ স্বপক্ষ সাধন বা পরপক্ষ খণ্ডন হয় না। কদাচিৎ 'বাদ'কথায় ভ্রমবশতঃ উক্তরূপ কোন অসদুত্তরেরও প্রয়োগ হইতে পারে। কিন্তু যাহাতে জ্ঞানপূর্ব্বক উক্তরূপ উদ্দেশ্যে 'ছল' প্রভৃতির প্রয়োগ হয়, তাহা 'বাদ' নহে, তাহা 'জল্প' বা 'বিতণ্ডা' হইবে। মহর্ষি ইহাই ব্যক্ত করিতে অর্থাৎ 'বাদ' হইতে 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা'র উক্তরূপ বিশেষ ব্যক্ত করিতেই এই সূত্রে বলিয়াছেন, "ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ভঃ।"

কিন্তু ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য এই যে, উক্ত 'ছল' প্রভৃতির দ্বারা যাহাতে সাধন ও উপালম্ভ হয়, তাহা জল্প, ইহাই উক্ত পদের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। আর মহর্ষির "তত্ত্বাধ্যবসায়সংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডে", ইত্যাদি সূত্রের দ্বারাও বুঝা যায় যে, স্বপক্ষ-রক্ষার্থ যে জল্প ও বিতণ্ডা কর্ত্তব্য, তাহাতে উক্ত 'ছল' প্রভৃতিও প্রমাণের অঙ্গ বা সহকারী হয়। ভাষ্যকারও তাহাই বুঝিয়া এখানে মহর্ষির উক্তরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবশ্য উক্ত 'ছল' প্রভৃতির দ্বারা বস্তুতঃ কোন পদার্থের সাধন বা খণ্ডন হয় না, ইহা সত্য। কিন্তু প্রমাণ-দ্বারা স্বপক্ষ সাধন ও পরপক্ষ খণ্ডনে কোন স্থলে উক্ত ছল প্রভৃতিও কোনরূপে সহকারী সহায় হইতে পারে।

পরন্তু বাদী ও প্রতিবাদীর প্রতিজ্ঞাত সেই পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে কোন একতর পক্ষেই যে, প্রকৃত প্রমাণ এবং অপর পক্ষে প্রমাণাভাস হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ, সেই পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ই প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বসূত্রে "প্রমাণ" ও "তর্ক" শব্দের দ্বারা এক পক্ষে যাহা প্রমাণাভাস ও তর্কাভাস, তাহাও গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সেই 'প্রমাণাভাসে'র দ্বারাও ত বস্তুতঃ কোন পদার্থের সাধন বা উপালম্ভ হইতে পারে না। তথাপি

মহর্ষি যে ভাবে পূর্ব্বসূত্রে 'বাদ'কেও "প্রমাণতর্কসাধনোপালম্ভ" বলিয়াছেন তদ্রূপ এই সূত্রেও 'জল্প'কে "ছলজাতিনিগ্রহস্থানসাধনোপালম্ভ বলিতে পারেন।

অবশ্য উক্ত 'ছল' প্রভৃতি যে, প্রতিবাদীর স্বপক্ষ সাধন বা পরপক্ষ-খণ্ডনে সমর্থই নহে, ইহা সেই প্রতিবাদীও জানেন। কিন্তু যে স্থলে "জল্প"কথায় প্রতিবাদী তাঁহার অভিমত প্রমাণকে 'প্রমাণাভাস' বুঝিয়াও তাহার প্রয়োগ করেন, সেই স্থলে তাহা যে, তাঁহার স্বপক্ষসাধন বা পরপক্ষ-খণ্ডনে সমর্থ নহে, ইহাও ত তিনি জানেন। তথাপি তিনি তাহার প্রয়োগ করেন কেন? ইহাও বুঝা আবশ্যক। কিন্তু "বাদ"কথায় বাদী বা প্রতিবাদী কেহই অপ্রমাণ অর্থাৎ "প্রমাণাভাস" বলিয়া বুঝিলে কখনই তাহার প্রয়োগ করিতে পারেন না। প্রতারক ব্যক্তি "বাদে" অধিকারীই নহে। কিন্তু জিগীষু প্রতিবাদীই প্রকৃত প্রমাণের অভাবে কোন স্থলে অপ্রমাণ বুঝিয়াও তাহাকে প্রমাণরূপে প্রদর্শন করেন এবং কোন স্থলে সদুত্তর বলিতে অসমর্থ হইয়া জয়লাভার্থ 'ছল' ও 'জাতি'নামক অসদুত্তরও বলেন। সুতরাং এই সূত্রে 'ছলজাতি' ইত্যাদি বিশেষণপদের দ্বারা ইহাও সূচিত হইয়াছে যে, 'জল্প' বিজিগীষুর কথা, কিন্তু পূর্ব্বসূত্রোক্ত "বাদ" তত্ত্ববুভুৎসুর কথা। তাই কথিত হইয়াছে,— "তত্ত্ববুভুৎসুকথা বাদঃ।" "বিজিগীষুকথা জল্পঃ।" "প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনা বিজিগীষুকথা বিতণ্ডা।" ২।

সূত্র। স প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো বিতণ্ডা ॥৩॥৪৪॥

অনুবাদ—সেই জল্প, প্রতিপক্ষের স্থাপনাশূন্য হইয়া বিতণ্ডা হয়।

ভাষ্য। স জল্পো বিতণ্ডা ভবতি, কিংবিশেষণঃ? প্রতিপক্ষস্থাপনয়া হীনঃ। যৌ তৌ সমানাধিকরণৌ বিরুদ্ধৌ ধর্ম্মৌ পক্ষপ্রতিপক্ষাবিত্যুক্তং, তয়োরেকতরং বৈতণ্ডিকো ন স্থাপয়তীতি, পরপক্ষপ্রতিষেধেনৈব প্রবর্ত্তত ইতি। অস্তু তর্হি স প্রতিপক্ষহীনো বিতণ্ডা?— যদ্বৈ খলু তৎ পরপক্ষপ্রতিষেধলক্ষণং বাক্যং, স বৈতণ্ডিকস্য পক্ষঃ, ন ত্বসৌ সাধ্যং কঞ্চিদর্থং প্রতিজ্ঞায় স্থাপয়তীতি, তস্মাদ্‌যথান্যাসমেবাস্ত্বিতি।

অনুবাদ—সেই 'জল্প' বিতণ্ডা হয়, (প্রশ্ন) কি বিশেষণবিশিষ্ট হইয়া?

(উত্তর) প্রতিপক্ষস্থাপনাশূন্য হইয়া। (তাৎপর্য্য) সমানাধিকরণ অর্থাৎ একাধারস্থ সেই যে বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় 'পক্ষ' ও 'প্রতিপক্ষ', ইহা উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে বৈতণ্ডিক একতর ধর্ম্মকে অর্থাৎ তাঁহার নিজ পক্ষরূপ প্রতিপক্ষকে স্থাপন করেন না, পরপক্ষপ্রতিষেধক বাক্যের দ্বারাই প্রবৃত্ত হন।

(পূর্ব্বপক্ষ) তাহা হইলে "স প্রতিপক্ষহীনো বিতণ্ডা" এইরূপই সূত্র হউক ? (উত্তর) সেই যে পরপক্ষপ্রতিষেধলক্ষণ বাক্য অর্থাৎ বৈতণ্ডিকের পরপক্ষখণ্ডনার্থ যে সমস্ত বাক্য, তাহা বৈতণ্ডিকের পক্ষ অর্থাৎ সেই সমস্ত বাক্য দ্বারাই প্রতিপন্ন হয় যে, তাঁহারও নিজপক্ষভূত পদার্থ আছে, কিন্তু ইনি কোন সাধ্য পদার্থকে প্রতিজ্ঞা করিয়া স্থাপন করেন না। অতএব এই সূত্র যথান্যাসই (যথাপাঠই) থাকিবে, অর্থাৎ মহর্ষি "স্থাপনা" শব্দযুক্ত যেরূপ সূত্র বলিয়াছেন, তাহাই বক্তব্য।

টিপ্পনী—মহর্ষি 'জল্পে'র লক্ষণের পরে যথাক্রমে এই সূত্রদ্বারা 'বিতণ্ডা'র লক্ষণ বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত সেই "জল্প"ই প্রতিপক্ষের স্থাপনাহীন হইলে 'বিতণ্ডা' হয়।* অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট হইয়া যাহা প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনত্বরূপ বিশেষণবিশিষ্ট, তাহা 'বিতণ্ডা'। বাদীর পক্ষের অপেক্ষায় প্রতিবাদীর নিজপক্ষই এখানে **"প্রতিপক্ষ"** শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে। কারণ, যদিও প্রতিবাদীর পক্ষের অপেক্ষায় বাদীর পক্ষও 'প্রতিপক্ষ' শব্দের বাচ্য হয়, কিন্তু বাদী প্রথমে নিজপক্ষ স্থাপন না করিলে প্রতিবাদী তাহার খণ্ডন করিতে পারেন না। সুতরাং বিতণ্ডাকে বাদীর পক্ষ-স্থাপনাশূন্য বলা যায় না। অতএব এই সূত্রোক্ত "প্রতিপক্ষ" শব্দের দ্বারা প্রতিবাদীর পক্ষই বুঝিতে হইবে। "চরক-সংহিতা"র বিমানস্থানেও (৮ম অঃ) কথিত হইয়াছে,—"জল্পবিপর্য্যয়ো বিতণ্ডা. বিতণ্ডা নাম পরপক্ষদোষবচন-মাত্রমেব।"

---

* বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে প্রথমোক্ত 'তদ্' শব্দের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত 'জল্পে'র উভয়পক্ষ-স্থাপনাবত্ত্বরূপ বিশেষণ পরিত্যাগ করিয়া অন্য অংশই গৃহীত হইয়াছে। কারণ, যাহা উভয়পক্ষস্থাপনাবিশিষ্ট, তাহাকেই প্রতিপক্ষস্থাপনাহীন বলা যায় না। কিন্তু আমাদিগের মনে হয় যে, উক্ত কারণেই মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রে কোন বাক্যদ্বারা 'জল্প'কে উভয়পক্ষস্থাপনাবিশিষ্ট বলেন নাই। কিন্তু উক্তিকৌশলে এই সূত্রেই "প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনঃ" এই পদ বলিয়া জল্প যে, উভয়পক্ষস্থাপনাবিশিষ্ট, ইহা পরে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং 'তদ্' শব্দের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রে কথিত বিশেষণবিশিষ্ট জল্পকেই গ্রহণ করিয়াছেন। তাই বাচস্পতি মিশ্রও উক্ত "তদ্"শব্দের দ্বারা জল্পের একদেশগ্রহণের কথা বলেন নাই।

ভাষ্যকার পরে পূর্ব্বপক্ষরূপে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে "স প্রতিপক্ষহীনো বিতণ্ডা" এইরূপ সূত্রই বক্তব্য। তাৎপর্য্য এই যে, বৈতণ্ডিক প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপন করেন না, ইহা বলিলে তাঁহার নিজপক্ষরূপ প্রতিপক্ষই নাই, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, যাহার স্থাপনা হয় না, তাহাকে পক্ষ বলা যায় না। সুতরাং 'বিতণ্ডা'য় প্রতিপক্ষরূপ পক্ষই না থাকায় প্রতিপক্ষহীন জল্পই বিতণ্ডা, ইহা বলা যায় এবং তাহাই বক্তব্য। অর্থাৎ এই সূত্রে "স্থাপনা" শব্দ ব্যর্থ।* ভাষ্যকার এতদুত্তরে বলিয়াছেন,—"যদ্বৈ খলু" ইত্যাদি। এখানে "বৈ" শব্দ পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের অযুক্ততাদ্যোতক। "খলু" শব্দ হেত্বর্থ। অর্থাৎ উক্ত পূর্ব্বপক্ষ অযুক্ত, যেহেতু বৈতণ্ডিকের পরপক্ষপ্রতিষেধরূপ যে সমস্ত বাক্য, তাহা সেই বৈতণ্ডিকের পক্ষ। অবশ্য সেই সমস্ত বাক্যই পক্ষপদার্থ নহে। 'পক্ষ' ও 'প্রতিপক্ষ' শব্দের যাহা মুখ্য অর্থ, তাহা পূর্ব্বে বাদলক্ষণসূত্রভাষ্যেই উক্ত হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার এখানেও তাহাই স্মরণ করাইতে পূর্ব্বে বলিয়াছেন, "যৌ তৌ...... ইত্যুক্তং।" কিন্তু বৈতণ্ডিক প্রতিবাদীর সেই সমস্ত বাক্য দ্বারাই প্রতিপন্ন হয় যে, তাঁহারও পক্ষ আছে এবং সেই সমস্ত বাক্যের যাহা প্রতিপাদ্য, তাহাও তাঁহার পক্ষ বা সিদ্ধান্তরূপে স্বীকার্য্য। নচেৎ সেই সমস্ত বাক্য নিষ্প্রয়োজন হয় এবং প্রতিপাদ্যহীন হইলে তাহা বাক্যই হয় না। ভাষ্যকার এই তাৎপর্য্যেই এখানে বৈতণ্ডিকের সেই সমস্ত বাক্যে 'পক্ষ' শব্দের গৌণ প্রয়োগ করিয়া তাহাকে পক্ষ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ বৈতণ্ডিক প্রতিবাদীর নিজসিদ্ধান্তই তাঁহার স্বপক্ষ এবং উহা বাদীর প্রতিপক্ষ। বৈতণ্ডিক প্রতিবাদী প্রতিজ্ঞা করিয়া উহার স্থাপনা না করিলেও উহা স্থাপনার যোগ্য, এ জন্য উহাকেও 'পক্ষ' বলা যায়। বাচস্পতি মিশ্র ইহা ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,— "পক্ষত্বন্তু তদ্‌যোগ্যতামাত্রেণ, ন তু স্থাপ্যমানতয়েতি"। সুতরাং বিতণ্ডাকে প্রতিপক্ষহীন বলাই যায় না। অতএব মহর্ষি যেরূপ সূত্র বলিয়াছেন, তাহাই বক্তব্য।

---

* উদ্দ্যোতকর এখানে উক্ত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—"অপরে তু ব্রুবতে, দূষণমাত্রং বিতণ্ডেতি। দূষণমাত্রমিতি মাত্রশব্দপ্রয়োগাদ্বৈতণ্ডিকস্য পক্ষোঽপি নাস্তীতি।" বস্তুতঃ ভাষ্যকারের সময়েও শূন্যবাদী কোন সম্প্রদায় যে, তাঁহাদিগের কোন পক্ষই নাই, সুতরাং স্বপক্ষসিদ্ধি তাঁহাদের বিতণ্ডার প্রয়োজন নহে,—ইহা বলিয়া মহর্ষি গোতমের এই সূত্রে "স্থাপনা" শব্দকে ব্যর্থ বলিতেন, ইহা প্রথমসূত্রভাষ্যে ভাষ্যকারের বিচার দ্বারাও বুঝা যায়। সুতরাং এখানে তাঁহাদিগের কথার খণ্ডন করিতেই পরে উক্তরূপ পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। পূর্ব্ব ৪৯শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বোক্ত কথাত্রয়ের সম্বন্ধে অপর বক্তব্য

এখন এখানে বলা আবশ্যক যে, পূর্ব্বোক্ত "বিতণ্ডা"পদার্থ অজ্ঞতাবশতঃ অনেকেই কলহাদি নিন্দিত অর্থেই "বিতণ্ডা" শব্দের প্রয়োগ করিতেছেন। এবং "বাদবিতণ্ডা" ও "বাগ্‌বিতণ্ডা" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করিতেছেন। কিন্তু প্রাচীন কালে বাঙ্গালা গ্রন্থেও "বিতণ্ডা" শব্দের প্রকৃতার্থে প্রয়োগ হইয়াছে। যথা **শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে**—"বিতণ্ডা ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাল। সব খণ্ডি প্রভু নিজ মত সে স্থাপিল॥" (মধ্য, ষষ্ঠ পঃ)। বস্তুতঃ "বিতণ্ড্যতে ব্যাহন্যতে পরপক্ষোঽনয়া"—এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে 'কথা'র দ্বারা জিগীষু প্রতিবাদী যথানিয়মে কেবল পরপক্ষখণ্ডনই করেন, নিজপক্ষরূপ প্রতিপক্ষের স্থাপন করেন না, তাহাই "বিতণ্ডা" শব্দের প্রকৃতার্থ। কেহ ক্রুদ্ধ বা কলহকারী হইলে তখন তিনি "বিতণ্ডা"রও অধিকারী নহেন। তর্কশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক পূর্ব্বাচার্য্যগণ পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ 'কথা'র অধিকারী নিরূপণ করিতে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন যে,—"যাঁহারা তত্ত্ব-নির্ণয় অথবা জয় লাভের অভিলাষী এবং 'কথা'র নির্ব্বাহক সমস্ত ব্যাপারে সমর্থ এবং বাক্যশ্রবণাদিপটু অর্থাৎ বধির বা প্রমত্ত নহেন এবং যাঁহারা সর্ব্বজন-সিদ্ধ অনুভবের অপলাপ করেন না এবং কলহ করেন না, তাঁহারাই **"কথাধিকারী"**। আর তন্মধ্যে যাঁহারা কেবল তত্ত্ব-নির্ণয়েচ্ছু এবং প্রকৃত বিষয়েই বাক্যবক্তা এবং যথাকালে যাঁহাদিগের উত্তর-স্ফূর্ত্তি হয় এবং যাঁহারা যুক্তিসিদ্ধ তত্ত্ববোদ্ধা এবং জ্ঞাতসত্যের অপলাপ করেন না, অর্থাৎ অপ্রতারক, তাঁহারাই **"বাদাধিকারী"**।

পরন্তু 'কথা'নিয়মের ব্যবস্থাপক ন্যায়াচার্য্যগণ 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা'কথার ছয়টি অথবা (মতান্তরে) চারিটি অঙ্গ বলিয়াছেন।—(১) বাদিনিয়ম, (২) প্রতিবাদিনিয়ম, (৩) সদস্যনিয়ম ও (৪) সভাপতিনিয়ম, এই চারিটি 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা'র সর্ব্বসম্মত অঙ্গ। সুতরাং উহাতে কে বাদী হইবেন এবং কে প্রতিবাদী হইবেন, কাহারা সদস্য হইবেন এবং কে সভাপতি হইবেন, ইহা নির্দ্ধারণ করিতেও পূর্ব্বে তাঁহাদিগের অধিকারনির্ণয় আবশ্যক। সেই বিচার-সভায় কোন রাজা বা তত্তুল্য প্রভাবশালী ব্যক্তি সভাপতি হইবেন। অথবা তিনি সর্ব্বমান্য কোন যোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতি নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং সেখানে উপস্থিত থাকিবেন। সভাপতিই তখন উপযুক্ত মধ্যস্থ সদস্যের নিয়োগ করিয়া জিগীষু বাদী ও প্রতিবাদীর 'কথা'র প্রবর্ত্তন করিবেন। বাদী ও

প্রতিবাদী প্রথম হইতেই যথাক্রমে ও যথানিয়মে মধ্যস্থ সদস্যগণের নিকটেই তাঁহাদিগের সমস্ত বক্তব্য বলিবেন।* সেই 'কথা'কালে বাদী বা প্রতিবাদী যে কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলেও তজ্জন্য তিনি নিগৃহীত হইবেন। পরিশেষে মধ্যস্থ সদস্যগণই তাঁহাদিগের নির্ণয়ানুসারে কাহার জয় ও কাহার পরাজয় হইয়াছে, ইহা ব্যক্ত করিলে সভাপতি জয় পরাজয়ের ঘোষণা করিবেন। কিন্তু সভাপতি অথবা মধ্যস্থ সদস্যগণ কিছুই না বলিলে অথবা একতর পক্ষপাতবশতঃ অসত্য বলিলে পাপী হইবেন। ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন,—"সভাং বা ন প্রবেষ্টব্যং বক্তব্যং বা সমঞ্জসং। **অব্রুবন্ বিব্রুবন্ বাপি নরো ভবতি কিল্বিষী**।।" ৮।২৩

মূলকথা, প্রকৃত সভাপতি এবং প্রকৃত মধ্যস্থ সদস্য না পাইলে 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা' হইতে পারে না। তাই "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ বলিয়াছেন,—"সভাপতিরপি বাদি-প্রতিবাদিনোঃ সদস্যানাঞ্চ সম্মতো রাগাদিরহিতো নিগ্রহানুগ্রহসমর্থঃ স্বীকরণীয়ঃ। তস্য চ নিষ্পন্নকথাফল-প্রতিপাদনাদিকং কর্ম্ম।" টীকাকার মল্লিনাথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"নিষ্পন্নকথাফল-প্রতিপাদনং, বাদিপ্রতিবাদিভ্যাং মিথঃ পণীকৃতদ্রব্যদাপনং, আদিপদাৎ স্বয়ং ছত্র-চামরাদি-দানং।" অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদী পূর্ব্বে কোন দ্রব্য পণরূপে স্বীকার করিলে সভাপতি পরে জয়ী ব্যক্তিকে সেই দ্রব্য দেওয়াইবেন এবং স্বয়ং তাঁহাকে সম্মানার্থ ছত্র চামরাদি দান করিবেন, ইহা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত সভাপতির কর্ম্ম। আর সভাপতি পূর্ব্বে কিরূপ মধ্যস্থ সদস্য গ্রহণ করিবেন, এ বিষয়েও বরদরাজ বলিয়াছেন,—"সদস্যাস্তু বাদিপ্রতিবাদিসম্মতাঃ সিদ্ধান্ত-রহস্য-বেদিনো রাগদ্বেষবিরহিণঃ পরাভিহিতগ্রহণ-ধারণ-প্রতিপাদনকুশলাস্ত্র্যবরা বিষমসংখ্যাঃ স্বীকার্য্যাঃ।" বিষমসংখ্যক মধ্যস্থ নিয়োগের কারণ এই যে, মধ্যস্থগণের পরস্পর মতভেদ হইলে বহুর মতই গ্রহণ করিতে হইবে। তাই কথিত হইয়াছে,—"রাগ-দ্বেষবিনির্ম্মুক্তাঃ সপ্ত পঞ্চ ত্রয়োঽপি বা। যত্রোপবিষ্টা বিপ্রাঃ

---

* ন্যায়সূত্রবৃত্তিকার সংক্ষেপে 'জল্প'কথার ক্রম বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য। কিন্তু মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের 'প্রবোধসিদ্ধি' এবং শঙ্কর মিশ্রের 'বাদিবিনোদ' গ্রন্থে 'কথা' ও তাহার অঙ্গাদি সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বর্ণিত ও সমর্থিত হইয়াছে। জৈন মহানৈয়ায়িক রত্নপ্রভাচার্য্যও তৎকৃত 'রত্নাকরাবতারিকা' টীকার শেষে উক্ত বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু উদয়নাচার্য্যই উক্ত বিষয়ে প্রথম উপদেষ্টা। উক্ত টীকায় (১৮৫ পৃঃ) রত্নপ্রভাচার্য্যও বলিয়াছেন,—'উদয়নোঽপ্যাহ' ইত্যাদি।

স্থ্যঃ সা যজ্ঞসদৃশী সভা ॥" "দ্বৈধে বহূনাং বচনং" ইত্যাদি। কিন্তু এখন আর সেই যজ্ঞসভাসদৃশী বিচারসভা আমরা দেখিতে পাই না। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত সভাপতি এবং মধ্যস্থও দেখিতে পাই না। "তে হি নো দিবসা গতাঃ।"

শ্বেতাম্বর জৈনাচার্য্য **বাদিদেবসূরি**ও সভাপতি ও সদস্যগণের উক্তরূপ লক্ষণই বলিয়াছেন। যদিও জৈন নৈয়ায়িক **হেমচন্দ্র** "প্রমাণমীমাংসা" গ্রন্থে গোতমোক্ত 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা'র কথাত্বের প্রতিবাদ করিয়া কেবল "বাদ"ই স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু জৈনসম্প্রদায় যে, জিগীষু বাদী ও প্রতিবাদীর কোন বিচারই স্বীকার করেন নাই, ইহা সত্য নহে। কারণ, বাদিদেবস্থরি **"প্রমাণ-নয়তত্ত্বালোকালঙ্কার"** গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদে প্রথম সূত্রে বাদের লক্ষণ বলিয়া, দ্বিতীয় সূত্র বলিয়াছেন,—"প্রারম্ভকশ্চাত্র জিগীষুস্তত্ত্বনির্ণিনীষুশ্চ।" অর্থাৎ জিগীষু এবং তত্ত্ব-নির্ণয়েচ্ছু উক্ত বাদের আরম্ভ করেন। যিনি পরিপক্কজ্ঞানশালী এবং যিনি চরম জ্ঞান লাভ করিয়া জৈনমতে **'কেবলী'** হইয়াছেন, তিনিও শিষ্যাদির তত্ত্বনির্ণয় সম্পাদনের জন্য 'বাদ' করেন। কিন্তু যাহাকে বলে **'জিগীষুবাদ'**, সেই বাদেই সভ্য ও সভাপতি আবশ্যক হওয়ায় উহা চতুরঙ্গ। তাই বাদিদেবস্থরি পরে উহারই চারিটী অঙ্গ বলিয়াছেন,— "বাদিপ্রতিবাদি-সভ্য-সভাপতয়শ্চত্বার্য্যঙ্গানি।"—(১৫শ সূত্র)। পরে যথাক্রমে উক্ত বাদিপ্রভৃতির লক্ষণ এবং তাঁহাদিগের কর্ম্ম বলিয়া কিরূপে সেই 'জিগীষুবাদ' কর্ত্তব্য, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। ফলকথা, উক্ত মতে জিগীষু বাদী ও প্রতিবাদীর সেইরূপ বিচারও "বাদ"। উহার নাম 'জিগীষুবাদ'।

বৌদ্ধাচার্য্য **বসুবন্ধু**ও বলিয়াছেন,—"স্বপরপক্ষয়োঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যর্থং বচনং বাদঃ।" উক্ত মতেও কথা ত্রিবিধ নহে; কিন্তু 'বাদ' নামে একবিধ। "এক এবায়ং কথামার্গস্তস্য প্রয়োজনং তত্ত্বাববোধো লাভাদয়শ্চ"—(বার্ত্তিক)। পূর্ব্বোক্ত 'বাদ'লক্ষণ-স্থত্রের 'বার্ত্তিকে' উদ্দ্যোতকর বিস্তৃত বিচারপূর্ব্বক বসুবন্ধুর উক্ত বাদলক্ষণের খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি সেখানে পরে বলিয়াছেন যে, অন্য প্রশ্নকারী (মধ্যস্থ)দিগকে বুঝাইবার জন্য 'বাদ' কর্ত্তব্য, ইহাও বলা যায় না। কারণ, 'বাদ'কথায় সভার অপেক্ষা নাই। অন্য প্রশ্নকারী উপস্থিত না থাকিলেও গুরু প্রভৃতির সহিত তত্ত্ব-নির্ণয়েচ্ছু শিষ্যগণের 'বাদ' হইয়া থাকে। পরন্তু লাভ, পূজা বা খ্যাতির কামনায় উক্ত 'বাদ' নিষিদ্ধ। আর লক্ষণের ভেদপ্রযুক্তও সিদ্ধ হয় যে, 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা' 'বাদ' হইতে ভিন্ন পদার্থ। তাই মহর্ষি গোতম 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা'পদার্থের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং 'কথা' ত্রিবিধই,

একবিধ নহে। বস্তুতঃ ভগবদ্‌গীতাতেও "বাদঃ প্রবদতামহং" এই বাক্যে 'বাদ' শব্দের দ্বারা ন্যায়দর্শনে গোতমোক্ত 'বাদ' পদার্থই গৃহীত হইয়াছে।

প্রশ্ন হয় যে, অধ্যাত্মবিদ্যারূপ ন্যায়শাস্ত্রে পূর্ব্বোক্তরূপ 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা'-পদার্থের উল্লেখ হইয়াছে কেন? মুমুক্ষু ব্যক্তিও অপরকে পরাভূত করিবার জন্য 'জল্প' বা 'বিতণ্ডা' করিবেন কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, মুমুক্ষু ব্যক্তিও প্রথম অবস্থায় তাঁহার অপক্ক তত্ত্ব-নিশ্চয় রক্ষার নিমিত্ত বাধ্য হইয়া সময়বিশেষে 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা' করিবেন। তাই মহর্ষি নিজেই পরে বলিয়াছেন,—"তত্ত্বাধ্যবসায়-সংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডে, বীজপ্ররোহ-সংরক্ষণার্থং কণ্টকশাখাবরণবৎ॥" "তাভ্যাং বিগৃহ্য কথনং।" (৪।২।৫০।৫১) ভাষ্যকার সেখানে বলিয়াছেন, "তদেতদ্বিদ্যা-পরিপালনার্থং, ন তু লাভ-পূজা-খ্যাত্যর্থং।" অর্থাৎ আত্ম-বিদ্যার রক্ষার নিমিত্তই সময়বিশেষে 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা' কর্ত্তব্য। কিন্তু কোন লাভ, পূজা বা খ্যাতির নিমিত্ত উহা কর্ত্তব্য নহে। পরমকারুণিক মহর্ষি গোতম এই অধ্যাত্মশাস্ত্রে ঐ সমস্ত উদ্দেশ্যে পরপরাভবের জন্য উহা কর্ত্তব্য বলেন নাই। "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মশাস্ত্রে "ন বিগৃহ্য কথাং কুর্য্যাৎ" এই বচন দ্বারা 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা'কথার নিষেধ হইলেও মহর্ষি গোতম স্থলবিশেষে উহার বিশেষ বিধান করায়, সেই নিষেধ অন্য অনুচিত উদ্দেশ্যে অন্য স্থলেই বুঝা যায়। "ন্যায়-পরিশুদ্ধি" গ্রন্থে (২য় আঃ) বেঙ্কটনাথও ইহা সমর্থন করিতে রামানুজের মতানুসারে বলিয়াছেন,—"আগমসিদ্ধা চেয়ং ব্যবস্থা, 'বাদ-জল্প-বিতণ্ডাভি'রিত্যাদিবচনাৎ। ভগবদ্‌গীতাভাষ্যেঽপি" ইত্যাদি। মহর্ষি গোতমের পূর্ব্বোক্ত কথার তাৎপর্য্যব্যাখ্যা এবং বাচস্পতি মিশ্রের বিশেষ কথা পঞ্চম খণ্ডে (২১৪-১৯ পৃঃ) দ্রষ্টব্য॥৩॥

কথাপ্রকরণ॥১॥

ভাষ্য। হেতুলক্ষণাভাবাদহেতবো হেতুসামান্যাৎ হেতুবদাভাসমানাঃ। ত ইমে—

সূত্র। সব্যভিচার-বিরুদ্ধ-প্রকরণসম-সাধ্যসম-কালাতীতা হেত্বাভাসাঃ॥৪॥৪৫॥

অনুবাদ—হেতুর সমস্ত লক্ষণ না থাকায় অহেতু অর্থাৎ প্রকৃত হেতু নহে, এবং হেতুর সামান্য বা সাদৃশ্য থাকায় হেতুর ন্যায় প্রকাশমান, অর্থাৎ ইহাই

'হেত্বাভাস' শব্দের অর্থ। সেই এই সমস্ত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত হেত্বাভাস (১) সব্যভিচার, (২) বিরুদ্ধ, (৩) প্রকরণসম, (৪) সাধ্যসম ও (৫) কালাতীত—অর্থাৎ এই পঞ্চ নামে পঞ্চপ্রকার।

টিপ্পনী—পূর্ব্বোক্ত 'বাদ', 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা'য় 'হেত্বাভাসে'র বিশেষ জ্ঞান অত্যাবশ্যক। এ জন্য মহর্ষি প্রথম সূত্রে "বিতণ্ডা"পদার্থের পরেই 'হেত্বাভাস'-পদার্থের উদ্দেশ করিয়া, ক্রমানুসারে এই সূত্রের দ্বারা হেত্বাভাসপদার্থের বিভাগ করিয়াছেন। পরে যথাক্রমে বিভক্ত পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের লক্ষণ বলিয়াছেন। কিন্তু সামান্য লক্ষণ না বুঝিলে বিশেষ লক্ষণ বুঝা যায় না। সুতরাং এই সূত্রে 'হেত্বাভাস' শব্দের দ্বারাই 'হেত্বাভাস'পদার্থের সামান্য লক্ষণ বুঝিতে হইবে। বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতিও ইহাই বলিয়াছেন। বস্তুতঃ মহর্ষি পৃথক্ সূত্রের দ্বারা অনেক পদার্থের সামান্য লক্ষণ না বলিয়াও সেই সমস্ত পদার্থের বিভাগরূপ বিশেষ উদ্দেশ করায় সেই সমস্ত বিভাগসূত্রের দ্বারাই সেই সমস্ত পদার্থের সামান্য লক্ষণও সূচিত হইয়াছে,—ইহাই বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকারও পূর্ব্বে এইরূপ কথা বলিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার এখানে প্রথমেই এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন,—

"হেতু-লক্ষণাভাবাদহেতবো হেতুসামান্যাদ্ধেতুবদাভাসমানাঃ।"

ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, "হেতুবদাভাসন্তে" অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ প্রকৃত হেতু নহে, কিন্তু হেতুর সাদৃশ্যবশতঃ হেতুর ন্যায় প্রতীত হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে "হেত্বাভাস" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, দুষ্ট হেতুসমূহ।* উহা হেতু না হইলেও হেতুর সাদৃশ্যবশতঃ উহাতেও হেতু শব্দের গৌণ প্রয়োগ হয়। 'তর্কসংগ্রহে'র 'ন্যায়বোধিনী' টীকায় **গোবর্দ্ধন মিশ্র**ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"হেতুবদাভাসন্তে ইতি হেত্বাভাসা দুষ্টহেতব ইত্যর্থঃ।" ব্যাভিচারাদি কোন দোষবিশিষ্ট হেতুকেই দুষ্ট হেতু বলে। তাহাতে হেতুর

* "হেতোরাভাসা দোষা হেত্বাভাসাঃ" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে হেতুর পঞ্চবিধ দোষকেই "হেত্বাভাস" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়া "দীধিতি"কার রঘুনাথ শিরোমণি গঙ্গেশোক্ত হেত্বাভাসসামান্য লক্ষণের ব্যাখ্যা করিলেও পরে তিনিও "কেচিত্তু দুষ্টানামেব হেতূনামেতানি লক্ষণানি"—ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা প্রাচীন ব্যাখ্যাও প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিজমতে 'হেত্বাভাসে'র সামান্য লক্ষণে তাঁহার উদ্ভাবিত দোষ-বারণ কিরূপে হইবে, তাহা তিনি ব্যক্ত করিয়া বলেন নাই। কেবল নানা মতেরই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন,—"কেচিত্তু যাদৃশপক্ষকযাদৃশসাধ্যকযাদৃশহেতৌ যাবন্তো দোষাঃ সম্ভবন্তি, তাবদন্যান্যত্বমেকমাত্রদোষস্থলে চ তত্ত্বমেব হেত্বাভাসত্বং।" উক্ত মতই শিরোমণির সম্মত হইলে প্রাচীন মতে উক্তরূপেও দুষ্ট হেতুর সামান্য লক্ষণ বলা যাইতে পারে।

সমস্ত লক্ষণ না থাকায় তাহা প্রকৃত হেতু নহে। তাই ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন,—“হেতুলক্ষণাভাবাদহেতবঃ।”—কিন্তু সেই সমস্ত পদার্থ হেতুর সদৃশ না হইলে তাহা ‘হেত্বাভাস’ নহে, এ জন্য ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“হেতুসামান্যাদ্ধেতুবদাভাসমানাঃ।” ‘হেত্বাভাস’ পদার্থে হেতুর সামান্য বা সাদৃশ্য কি? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর প্রথমে বলিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরে যেমন প্রকৃত হেতুর প্রয়োগ হয়, তদ্রূপ হেত্বাভাস বা দুষ্ট হেতুরও প্রয়োগ হয়,—ইহাই সাদৃশ্য। পরে বলিয়াছেন যে, অথবা দুষ্ট হেতুতেও প্রকৃত হেতুর কোন কোন ধর্ম্ম থাকায় তাহাই উভয়ের সাদৃশ্য। তাহা হইলে “হেত্বাভাস” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, প্রকৃত হেতুর কোন ধর্ম্মশূন্য হইয়া কোন কোন ধর্ম্মবিশিষ্ট। প্রাচীন মতে প্রকৃত হেতুর কোন ধর্ম্মই না থাকিলে তাহা ‘হেত্বাভাস’ নহে। তাই বরদরাজ বলিয়াছেন,—

“হেতোঃ কেনাপি রূপেণ রহিতাঃ কৈশ্চিদন্বিতাঃ।
হেত্বাভাসাঃ পঞ্চধা তে গৌতমেন প্রপঞ্চিতাঃ॥”

এখন অনুমান স্থলে প্রকৃত হেতুপদার্থের লক্ষণ কি, তাহা বুঝিতে হইবে। মহর্ষি পূর্ব্বে দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাক্যের লক্ষণসূত্রে **“সাধ্যসাধনং”** এই পদের প্রয়োগ করিয়া সংক্ষেপে সাধ্যসাধনত্বই যে হেতুপদার্থের লক্ষণ, ইহার সূচনা করিয়াছেন। কিন্তু কিরূপ পদার্থ সাধ্যধর্ম্মের সাধন হয়? ইহাও বুঝা আবশ্যক। মহর্ষি পঞ্চবিধ হেত্বাভাস বলিয়া তাহাও ব্যক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ পঞ্চলক্ষণসম্পন্ন পদার্থই সাধ্যসাধন হয়, উহাকেই অনুমাপক লিঙ্গ বা **‘গমক হেতু’** বলে। পরবর্ত্তী ন্যায়াচার্য্যগণ সেই পঞ্চরূপ বা পঞ্চলক্ষণ বলিয়াছেন, (১) ‘পক্ষসত্ত্ব’, (২) ‘সপক্ষসত্ত্ব’, (৩) ‘বিপক্ষাসত্ত্ব’, (৪) অসৎপ্রতিপক্ষত্ব ও (৫) অবাধিতত্ব। যে স্থলে সপক্ষ নাই, সেই স্থলে “সপক্ষসত্ত্ব”কে ত্যাগ করিয়া এবং যে স্থলে বিপক্ষ নাই, সেই স্থলে “বিপক্ষাসত্ত্ব”কে ত্যাগ করিয়া অন্য চারিটি ধর্ম্মই হেতুর লক্ষণ বুঝিতে হইবে। কিন্তু অন্যত্র পঞ্চলক্ষণসম্পন্ন লিঙ্গই প্রকৃত লিঙ্গ।* নচেৎ তাহা ‘লিঙ্গাভাস’ বা হেত্বাভাস।

---

* অন্যান্য মতে লিঙ্গ ত্রিরূপ বা ত্রিলক্ষণ। কারণ, ‘অসৎপ্রতিপক্ষত্ব’ ও ‘অবাধিতত্ব’ লিঙ্গের লক্ষণ নহে। কিন্তু জৈন নৈয়ায়িকগণের মতে লিঙ্গ একলক্ষণ। তাঁহারা বলিয়াছেন,—“অন্যথানুপপত্ত্যেকলক্ষণং লিঙ্গমূচ্যতে।” অর্থাৎ অন্যথা অনুপপত্তিই হেতুর একমাত্র লক্ষণ। যেমন বহ্নি না থাকিলে ধূমের উপপত্তি বা সত্তা সম্ভব হয় না, এ জন্য ধূম বহ্নির লিঙ্গ। গোতমমতের যুক্তি পরে ব্যক্ত হইবে।

যে পদার্থে সাধ্যধর্ম্ম পূর্ব্বে সন্দিগ্ধ, অথবা যাহাতে সেই সাধ্যধর্ম্মের অনুমিতি হয়, তাহার নাম **পক্ষ**। পক্ষে বিদ্যমানত্বই **'পক্ষসত্ত্ব'**। যে পদার্থে সাধ্যধর্ম্ম পূর্ব্বেই নিশ্চিত অর্থাৎ সর্ব্বসম্মত, তাহার নাম **'সপক্ষ'**। সপক্ষে বিদ্যমানত্বই 'সপক্ষসত্ত্ব'। আর যে পদার্থে সাধ্যধর্ম্মের অভাব পূর্ব্বে নিশ্চিত অর্থাৎ সর্ব্বসম্মত, তাহার নাম 'বিপক্ষ'। বিপক্ষে অবিদ্যমানত্বই 'বিপক্ষাসত্ত্ব'। যেমন পর্ব্বতে বহ্নির অনুমানে পর্ব্বত 'পক্ষ', পাকশালাদি 'সপক্ষ' এবং জলাদি 'বিপক্ষ'। উক্ত স্থলে ধূম হেতু পক্ষভূত পর্ব্বতে থাকায় তাহাতে (১) পক্ষসত্ত্ব এবং সপক্ষ পাকশালাদিতে থাকায় তাহাতে, (২) 'সপক্ষসত্ত্ব'ও আছে। আর বিপক্ষ জলাদিতে ধূম না থাকায় তাহাতে (৩) 'বিপক্ষাসত্ত্ব' অর্থাৎ বিপক্ষে অবিদ্যমানত্বও আছে। আর উক্ত স্থলে ঐ ধূম হেতুর তুল্যবল বিরোধী অপর হেতুরূপ প্রতিপক্ষ হেতু না থাকায় উহাতে (৪) 'অসৎপ্রতিপক্ষত্ব' আছে। এবং পূর্ব্বে কোন বলবৎ প্রমাণের দ্বারা পর্ব্বতে সাধ্যধর্ম্ম বহ্নির অভাব নিশ্চিত না হওয়ায় উক্ত ধূম হেতুতে (৫) অবাধিতত্বও আছে। সুতরাং উহা পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ লক্ষণবিশিষ্ট হওয়ায় বহ্নির সাধক প্রকৃত হেতু হয়। কোন স্থলে চতুর্লক্ষণবিশিষ্ট হেতুও প্রকৃত হেতু হয়। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ লক্ষণের মধ্যে 'বিপক্ষাসত্ত্বে'র অভাবে (১) **'সব্যভিচার'** এবং 'সপক্ষসত্ত্বে'র অভাবে (২) **'বিরুদ্ধ'**, 'অসৎপ্রতিপক্ষত্বে'র অভাবে (৩) **'প্রকরণসম'**, 'পক্ষসত্ত্বে'র অভাবে (৪) **'সাধ্যসম'** এবং 'অবাধিতত্বে'র অভাবে (৫) **কালাতীত'** হেত্বাভাস হয়। অন্যান্য কথা পরে ব্যক্ত হইবে ॥ ৪ ॥

ভাষ্য। তেষাং—

সূত্র। অনৈকান্তিকঃ সব্যভিচারঃ ॥ ৫ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের মধ্যে 'অনৈকান্তিক' অর্থাৎ হেতুরূপে গৃহীত যে পদার্থ প্রকৃত সাধ্যধর্ম্মের সম্বন্ধে ঐকান্তিক (একতর পক্ষে নিয়ত) নহে, তাহা 'সব্যভিচার' অর্থাৎ 'সব্যভিচার' নামক হেত্বাভাস।

ভাষ্য। ব্যভিচার একত্রাব্যবস্থিতিঃ। সহ ব্যভিচারেণ বর্ত্তত ইতি সব্যভিচারঃ। নিদর্শনং—নিত্যঃ শব্দোঽস্পর্শত্বাৎ, স্পর্শবান্ কুম্ভোঽনিত্যো দৃষ্টো ন চ তথা স্পর্শবান্ শব্দস্তস্মাদ-

স্পর্শত্বান্নিত্যঃ শব্দ ইতি। দৃষ্টান্তে স্পর্শবত্ত্বমনিত্যত্বঞ্চ ধর্ম্মৌ ন সাধ্যসাধনভূতৌ গৃহ্যেতে, স্পর্শবাংশ্চাণুর্নিত্যশ্চেতি। আত্মাদৌ চ দৃষ্টান্তে "উদাহরণ-সাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্য-সাধনং হেতু"রিত্য-স্পর্শত্বাদিতি হেতুর্নিত্যত্বং ব্যভিচরতি, অস্পর্শা বুদ্ধিরনিত্যা চেতি। এবং দ্বিবিধেঽপি দৃষ্টান্তে ব্যভিচারাৎ সাধ্য-সাধনভাবো নাস্তীতি লক্ষণাভাবাদহেতুরিতি।

নিত্যত্বমপ্যেকোঽন্তোঽনিত্যত্বমপ্যেকোঽন্তঃ। একস্মিন্নন্তে বিদ্যত ইত্যৈকান্তিকঃ। বিপর্য্যয়াদনৈকান্তিক উভয়ান্ত-ব্যাপকত্বাদিতি।*

অনুবাদ—'ব্যভিচার' বলিতে একতর পক্ষে অব্যবস্থা অর্থাৎ নিয়মের অভাব। 'ব্যভিচারেণ সহ বর্ত্ততে' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'সব্যভিচার' অর্থাৎ যাহা ব্যভিচারসহিত বা ব্যভিচারবিশিষ্ট, তাহা সব্যভিচার।

উদাহরণ যথা—(১) 'নিত্যঃ শব্দঃ', (২) 'অস্পর্শত্বাৎ', (৩) স্পর্শবান্ কুম্ভোঽনিত্যো দৃষ্টঃ', (৪) 'ন চ তথা স্পর্শবান্ শব্দঃ', (৫) 'তস্মাদস্পর্শত্বা-ন্নিত্যঃ শব্দ'। দৃষ্টান্তে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কুম্ভাদি বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তে স্পর্শবত্ত্ব ও অনিত্যত্ব, এই ধর্ম্মদ্বয়কে সাধ্য-সাধনভূত বুঝা যায় না। অর্থাৎ স্পর্শবান্ পদার্থমাত্রই অনিত্য, এইরূপে স্পর্শবত্ত্ব সাধন, অনিত্যত্ব সাধ্য, ইহা উক্ত দৃষ্টান্তে বুঝা যায় না। (কারণ), পরমাণু স্পর্শবান্ হইয়াও নিত্যই। আত্মাদি দৃষ্টান্তেও অর্থাৎ উক্ত স্থলে আত্মাদি নিত্যপদার্থকে সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিলেও "উদাহরণ-সাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্য-সাধনং হেতুঃ" এই সূত্রানুসারে "অস্পর্শত্বাৎ" এই বাক্যবোধ্য হেতু নিত্যত্বের ব্যভিচারী হয়। (কারণ) বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান স্পর্শশূন্য ও অনিত্য। এইরূপ হইলে দ্বিবিধ দৃষ্টান্তেও

* মুদ্রিত তাৎপর্য্যটীকায় এখানে "ভাষ্যকারোক্তমনিত্যত্বমেকোঽন্তঃ" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু পরিদৃষ্ট সমস্ত ভাষ্যপুস্তকেই "নিত্যত্বমপ্যেকোঽন্তঃ" ইত্যাদি পাঠই দেখা যায়। "অন্ত" শব্দের ধর্ম্ম অর্থেও প্রয়োগ হইয়াছে। "অনেকান্তবাদে"র ব্যাখ্যা করিতে জৈন ধর্ম্মভূষণ যতি "ন্যায়দীপিকা"য় বলিয়াছেন,—"অনেকে অন্তা ধর্ম্মাঃ।" জৈনমতে সেই সমস্ত ধর্ম্ম (অস্তিত্ব নাস্তিত্ব প্রভৃতি) সর্ব্বথা বিরুদ্ধ নহে। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে নিজমতানুসারে পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়কেই 'অন্ত' বলিয়াছেন। কোন পুস্তকে এখানে পরে "উভয়ত্র ব্যাপকত্বাৎ" এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু উহা প্রকৃত পাঠ নহে।

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেও ব্যভিচারবশতঃ (উক্ত স্পর্শশূন্যত্বে) সাধ্যসাধনত্ব অর্থাৎ নিত্যত্বের সাধনত্ব নাই, এ জন্য (হেতুর) লক্ষণের অভাবপ্রযুক্ত (উক্ত স্পর্শশূন্যত্ব) অহেতু, অর্থাৎ উহা 'সব্যভিচার' নামক হেত্বাভাস।

নিত্যত্বও এক অন্ত, অনিত্যত্বও এক অন্ত, একই অন্তে (সমানাধিকরণ্য সম্বন্ধে) বিদ্যমান থাকে, এই অর্থে ঐকান্তিক, অর্থাৎ যাহা পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্ম-দ্বয়ের মধ্যে কোন এক ধর্ম্মের আধারেই থাকে, তাহাকে উক্ত অর্থে 'ঐকান্তিক' বলে। বিপর্য্যয়বশতঃ 'অনৈকান্তিক' অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত 'ঐকান্তিকে'র বিপরীত হওয়ায় 'অনৈকান্তিক' বলে। যেহেতু উভয় অন্তেরই ব্যাপকত্ব (সামানাধিকরণ্য) আছে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে স্পর্শশূন্যত্ব হেতু নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, এই উভয় ধর্ম্মের আধারেই থাকায় উহা অনৈকান্তিক।

টিপ্পনী—পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রথম প্রকার হেত্বাভাসের নাম **'সব্যভিচার'**। উহারই অপর প্রসিদ্ধ নাম **'অনৈকান্তিক'**। উহা অনুমানের ধর্ম্মীতে সাধ্য ধর্ম্ম ও তাহার অভাব বিষয়ে সন্দেহের প্রযোজক হওয়ায় উক্ত অর্থে মহর্ষি কণাদ উহাকে **'সন্দিগ্ধ'** নামে উল্লেখ করিলেও পরে তিনিও সুপ্রসিদ্ধ "অনৈকান্তিক" নামেরই গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন,—"যস্মাদ্বিষাণী তস্মাদ্‌গৌরিতি চানৈকান্তি-কস্যোদাহরণম্।"—(৩।১।১৭) অর্থাৎ মহিষকে পক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতে 'অয়ং গৌর্ব্বিষাণিত্বাৎ'--এইরূপে গোত্বের অনুমানে বিষাণিত্ব (শৃঙ্গবত্ত্ব) হেতু 'অনৈকান্তিকে'র উদাহরণ। কারণ, গোত্ববিশিষ্ট পদার্থে যেমন শৃঙ্গবত্ত্ব আছে, তদ্রূপ গোত্বশূন্য মহিষাদিতেও শৃঙ্গবত্ত্ব থাকায় উহা 'অনৈকান্তিক'। উহাতে বিপক্ষে অসত্ত্বরূপ হেতুর লক্ষণ না থাকায় উহা অহেতু। উক্ত সব্যভিচারনামক হেত্বাভাস "অনৈকান্ত" এবং "অনেকান্ত" নামেও কথিত হইয়াছে। মহর্ষি গোতমও পরে (২।১।২০শ সূত্রে) "অনেকান্ত" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।* কিন্তু তিনি পূর্ব্বোক্ত সূত্রে "সব্যভিচার" নামেরই উল্লেখ করিয়া, এই সূত্রে "অনৈকান্তিক" শব্দের দ্বারাই উহার লক্ষণ বলিয়াছেন। যাহা

* "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজও বলিয়াছেন,—"তত্র সব্যভিচারঃ স্যাদনেকান্তঃ স চ দ্বিধা।" "একত্রান্তো নিশ্চয়ো ব্যবস্থিতির্নাস্তীতি।" টীকাকার মল্লিনাথ বলিয়াছেন যে, এখানে নিশ্চয়বাচক "অন্ত" শব্দের দ্বারা ব্যবস্থা অর্থাৎ নিয়মই লক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং সপক্ষ ও বিপক্ষের মধ্যে এক পক্ষে যাহার অন্ত বা নিয়ম নাই, এই অর্থে "অনেকান্ত" শব্দের দ্বারা "সাধারণ" ও "অসাধারণ" এই দ্বিবিধ সব্যভিচারই বুঝা যায়।

অনৈকান্তিক, তাহা পূর্ব্বসূত্রোক্ত 'সব্যভিচার' অর্থাৎ "সব্যভিচার" শব্দের প্রতিপাদ্য, ইহার তাঁহার বিবক্ষিত বুঝা যায়। তাহা হইলে অর্থপুনরুক্তিদোষ হয় না। কারণ, অনৈকান্তিকত্ব ও সব্যভিচারত্ব অভিন্ন ধর্ম্ম হইলেও সব্যভিচার-শব্দপ্রতিপাদ্যত্ব ও অনৈকান্তিকত্বের ভেদ আছে।

কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে সমানার্থ উভয় পদের দ্বারাই লক্ষ্যনির্দ্দেশ ও লক্ষণকথন হইয়াছে। অর্থাৎ যাহা 'অনৈকান্তিক', তাহা সব্যভিচার এবং যাহা 'সব্যভিচার' তাহা অনৈকান্তিক, ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত। "যস্য অনৈকান্তিকপদার্থোঽপ্রসিদ্ধঃ প্রসিদ্ধশ্চ সব্যভিচারপদার্থস্তং প্রতি অনৈকান্তিক ইতি লক্ষ্যনির্দ্দেশঃ সব্যভিচার ইতি লক্ষণম্।" অর্থাৎ "অনৈকান্তিক" শব্দের অর্থ যাহার অপরিজ্ঞাত, কিন্তু "সব্যভিচার" শব্দের অর্থ পরিজ্ঞাত, তাহার সম্বন্ধে মহর্ষি "অনৈকান্তিক" শব্দের দ্বারা লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়া "সব্যভিচার" শব্দের দ্বারা উহার লক্ষণ বলিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টও ঐরূপ কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু উক্ত "অনৈকান্তিক" শব্দের অর্থ কি, তাহা কোন শাস্ত্রে কথিত না হওয়ায় উহার দ্বারা কিরূপে সব্যভিচার হেত্বাভাসের লক্ষণ বলা যায়? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন,—"লোকতস্তদধিগতেঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ "অনৈকান্তিক" শব্দের অর্থ লোকপ্রসিদ্ধ। যাহা কোন একই অন্ত বা পক্ষে নিয়ত নহে, কিন্তু উভয় পক্ষে নিয়ত, তাহাকে বলে "অনৈকান্তিক", ইহা লোকপ্রসিদ্ধই থাকায় শাস্ত্রে উহা কথিত হয় নাই। বাচস্পতি মিশ্রও সেখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"লোকপ্রসিদ্ধত্বেনোক্ত-প্রায়মিত্যর্থঃ।" কিন্তু তাহা হইলে বাচস্পতি মিশ্রের পূর্ব্বোক্ত কথা কিরূপে সংগত হয়, ইহা চিন্তনীয়। যিনি লোকপ্রসিদ্ধ 'অনৈকান্তিক' শব্দার্থও জানেন না, তিনি 'সব্যভিচার' পদার্থ ই বা কিরূপে বুঝিবেন? ফলকথা, উদ্দ্যোতকরের পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যার দ্বারাও আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, তাঁহার মতেও এই সূত্রে "সব্যভিচারঃ" এই পদের দ্বারাই লক্ষ্য নির্দ্দেশ হইয়াছে। বস্তুতঃ মহর্ষি সর্ব্বত্রই লক্ষণসূত্রে লক্ষ্যবোধক শব্দই পরে বলিয়াছেন।

কিন্তু যাহা অনৈকান্তিক, তাহাই "সব্যভিচার" শব্দের প্রতিপাদ্য, ইহা বুঝাইতে অর্থাৎ উক্ত শব্দদ্বয়ের সমানার্থত্ব ব্যক্ত করিতেই ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন,—"**ব্যভিচার একত্রাব্যবস্থিতিঃ**" ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে, কোন এক পক্ষে ব্যবস্থিতি অর্থাৎ নিয়মের অভাবই 'ব্যভিচার' শব্দের অর্থ। সুতরাং 'ব্যভিচারেণ সহ বর্ত্ততে', এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে যাহা উক্ত

ব্যভিচারবিশিষ্ট, তাহাই 'সব্যভিচার' শব্দের অর্থ, ইহা বুঝা যায়। অর্থাৎ যে পদার্থের কোন একই পক্ষে বিদ্যমানত্বের নিয়ম নাই, কিন্তু উভয়পক্ষেই যাহা বিদ্যমান থাকে, তাহাই 'সব্যভিচার' শব্দের দ্বারা বুঝা যায়। ভাষ্যকার পরে "অনৈকান্তিক" শব্দেরও উক্তরূপ অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়া উক্ত শব্দদ্বয়ের সমানার্থত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা ও উদাহরণের দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহার মতে যে হেতু সপক্ষ এবং বিপক্ষ, এই উভয়েই থাকে, তাহাই 'সব্যভিচার' হেত্বাভাস। জয়ন্ত ভট্টও ইহাই সমর্থন করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরও প্রথমে বলিয়াছেন,—"যৎ খলু সাধ্যতজ্জাতীয়বৃত্তিত্বে সতি অন্যত্র বর্ত্ততে, তদব্যভিচারি, তদ্বৃত্তিত্বং ব্যভিচারঃ।" অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মীতে (পক্ষে) এবং তজ্জাতীয় পদার্থে (সপক্ষে) বর্ত্তমান হইয়া যে হেতু বিপক্ষে (সাধ্যধর্ম্ম-শূন্য পদার্থে) বর্ত্তমান হয়, তাহাকে বলে ব্যভিচারী হেতু বা 'সব্যভিচার'। উহার নাম **'সাধারণ** সব্যভিচার'। "যঃ সপক্ষে বিপক্ষে চ ভবেৎ সাধারণস্তু সঃ।"—'ভাষাপরিচ্ছেদ'।

ভাষ্যকার উক্ত 'সব্যভিচার' হেত্বাভাসের উদাহরণ প্রদর্শনের জন্য পরে **"নিত্যঃ শব্দঃ"** ইত্যাদি পঞ্চ বাক্যের প্রয়োগ করিতে "অস্পর্শত্বাৎ" এই হেতুবাক্যের পরে 'বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগ করিয়া 'বৈধর্ম্ম্যোপনয়'-বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। উক্ত স্থলে ঐ সমস্ত বাক্য প্রকৃত অবয়ব নহে, কিন্তু **'অবয়বাভাস'**। কারণ, উক্ত স্থলে 'অস্পর্শত্বাৎ' এই বাক্যবোধ্য যে স্পর্শশূন্যত্বরূপ হেতু, তাহা প্রকৃত হেতু নহে, কিন্তু উহা 'সব্যভিচার' নামক হেত্বাভাস। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে পরে বলিয়াছেন,—**"দৃষ্টান্তে স্পর্শবত্ত্বমনিত্যত্বঞ্চ ধর্ম্মৌ,"** ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে, যে সমস্ত পদার্থে উক্ত স্পর্শশূন্যত্বরূপ হেতু নাই, অর্থাৎ স্পর্শবত্ত্ব আছে, তাহাতে নিত্যত্বরূপ সাধ্য ধর্ম্ম নাই অর্থাৎ অনিত্যত্ব আছে, যেমন কুম্ভ,* এইরূপে কুম্ভকে বৈধর্ম্ম্য

---

* ভাষ্যে "স্পর্শবান্ কুম্ভোঽনিত্যো দৃষ্টঃ"—এই সন্দর্ভের ব্যাখ্যা করিতে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন, "অনিত্যঃ কুম্ভঃ স্পর্শবান্ দৃষ্ট ইতি যোজনা।" অর্থাৎ উক্ত সন্দর্ভে প্রথমোক্ত "স্পর্শবান্" এই পদের শেষোক্ত "দৃষ্টঃ" এই পদের সহিত যোগ করিয়া ভাষ্যকারের বক্তব্য বুঝিতে হইবে যে, কুম্ভে অনিত্যত্বরূপ সাধ্যাভাবপ্রযুক্ত স্পর্শবত্ত্বরূপ হেত্বভাব আছে। কিন্তু ভাষ্যকারের উহাই বিবক্ষিত হইলে তিনি উক্তরূপ উদাহরণবাক্যই বলেন নাই কেন, ইহাও বলা আবশ্যক। বস্তুতঃ ভাষ্যকার পূর্ব্বে (২৬৮ পৃঃ) মহর্ষিসূত্রানুসারে বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা করিতে তাহাতে হেতুর অভাবপ্রযুক্ত সাধ্য ধর্ম্মের অভাব বলায় তদনুসারেই এখানে উক্তরূপ উদাহরণবাক্য বলিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের

দৃষ্টান্ত বলিলে তাহাতে স্পর্শবত্ত্ব ও অনিত্যত্ব, এই ধর্ম্মদ্বয়ের সাধ্যসাধনভাব অর্থাৎ স্পর্শবত্ত্ব সাধন, অনিত্যত্ব তাহার সাধ্য, ইহা বুঝা যায় না। কারণ পরমাণু স্পর্শবিশিষ্ট হইলেও অনিত্য নহে, নিত্য। সুতরাং স্পর্শবিশিষ্ট পদার্থমাত্রই নিত্য না হওয়ায় স্পর্শশূন্যত্বরূপ হেতুর অভাবে (স্পর্শবত্ত্বে) নিত্যত্বরূপ সাধ্যধর্ম্মের অভাবের (অনিত্যত্বের) ব্যাপ্তি নাই। অতএব উক্ত বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তে স্পর্শশূন্যত্বধর্ম্মকে নিত্যত্বের সাধন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। আর যে সমস্ত পদার্থ স্পর্শশূন্য, তাহা নিত্য, যেমন আত্মাদি, এইরূপে বাদী যদি উক্ত স্থলে আত্মাদিকে সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলেও উক্ত স্পর্শশূন্যত্বকে নিত্যত্বের সাধন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ জীবের বুদ্ধি বা জ্ঞান স্পর্শশূন্য হইলেও অনিত্য। সুতরাং স্পর্শশূন্য পদার্থমাত্রই নিত্য না হওয়ায়, উক্ত স্পর্শশূন্যত্বে নিত্যত্বের ব্যাপ্তি নাই। অতএব উহা নিত্যত্বের সাধন হয় না। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলেও স্পর্শশূন্যত্ব যখন নিত্যত্বের ব্যভিচারী, ইহা নিশ্চিত, তখন উহাতে নিত্যত্বের সাধক হেতুর লক্ষণ নাই। সুতরাং উক্ত স্থলে উহা অহেতু। মহর্ষি পরেও "ব্যভিচারাদহেতুঃ" (৪।১।৫) এই সূত্রের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মের ব্যভিচারী হইলে তাহা যে হেতু নহে, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা সাধ্যধর্ম্মের অব্যভিচারই যে, অনুমানের অঙ্গ ব্যাপ্তিপদার্থ, ইহাও সূচিত হইয়াছে। মহর্ষি পরে (২।২।১৫শ সূত্রে) "অব্যভিচার" শব্দের দ্বারাও ফলতঃ ব্যাপ্তিপদার্থেরই প্রকাশ করিয়াছেন। ন্যায়সূত্রে অনুমানাঙ্গ ব্যাপ্তিপদার্থের কোনরূপ উল্লেখ নাই, ইহা নিতান্ত অসত্য।

পূর্ব্বোক্ত স্থলে 'অস্পর্শত্ব'রূপ হেতু যে 'অনৈকান্তিক', ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—**"নিত্যত্বমপ্যেকোঽন্তঃ"** ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে, "অনৈকান্তিক" শব্দের অন্তর্গত "অন্ত" শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্ম্ম এবং তাহার অভাব, এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত স্থলে নিত্যত্ব এবং অনিত্যত্ব, এই উভয়ই 'অন্ত' শব্দের দ্বারা গ্রাহ্য। সুতরাং উক্ত স্থলে স্পর্শশূন্যত্ব হেতু 'ঐকান্তিক' নহে। কারণ, "একস্মিন্নন্তে বিদ্যতে," অর্থাৎ সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে যাহা একই অন্তে বিদ্যমান থাকে, এই অর্থে

উক্তরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ না করিলেও ভাষ্যকার যে, ঐরূপই বলিয়াছেন, ইহা তিনিও সেখানে স্পষ্ট বলিয়াছেন। তথাপি এখানে তিনি নিজ মতানুসারে ভাষ্যকারের উক্ত সরল সন্দর্ভেরও ঐরূপ ব্যাখ্যা কেন করিয়াছেন, ইহা চিন্তনীয়।

'একান্ত' শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন 'ঐকান্তিক' শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, যাহা উভয় অন্তের মধ্যে কোন একই অন্তের আধারে বিদ্যমান থাকে। যেমন বহ্নি এবং তাহার অভাবরূপ অন্তদ্বয়ের মধ্যে বহ্নির আধারেই ধূম থাকে, কিন্তু তাহার অভাবের আধারে অর্থাৎ বহ্নিশূন্য স্থানে ধূম থাকে না, এ জন্য বহ্নির সম্বন্ধে ধূম ঐকান্তিক। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত স্থলে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, এই অন্তদ্বয়ের মধ্যে কেবল নিত্যত্বের আধারে অথবা কেবল অনিত্যত্বের আধারে স্পর্শশূন্যত্ব না থাকায় উহা নিত্যত্বরূপ সাধ্যধর্ম্মের সম্বন্ধে ঐকান্তিক নহে। কিন্তু উহা নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, এই উভয় অন্তের আধারেই অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য, এই উভয় পদার্থেই বিদ্যমান থাকায় ঐকান্তিকের বিপরীত 'অনৈকান্তিক'। —তাই বলিয়াছেন, **"বিপর্য্যয়াদনৈকান্তিক উভয়ান্তব্যাপকত্বাদিতি।"** 'ব্যাপকত্ব' শব্দের দ্বারা এখানে সামানাধিকরণ্যমাত্রই বিবক্ষিত। অর্থাৎ উভয় অন্তের আধারে বিদ্যমানত্বই 'উভয়ান্তব্যাপকত্ব'। তাহা হইলে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে বুঝা যায় যে, তাঁহার মতে "অনৈকান্তিক" হেতুতে 'উভয়ান্তব্যাপকত্ব'ই ঐকান্তিকের বিপর্য্যয় বা বৈপরীত্য। সুতরাং যে হেতু সাধ্যধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থ এবং সাধ্যধর্ম্মশূন্য, এই উভয় পদার্থেই থাকে, তাহা 'অনৈকান্তিক'। পূর্ব্বোক্ত স্থলে স্পর্শশূন্যত্ব হেতু আত্মাদি অনেক নিত্য পদার্থেও থাকে এবং জ্ঞানাদি অনেক অনিত্য পদার্থেও থাকে এজন্য, উহা 'অনৈকান্তিক'।

কিন্তু পরে কোন কোন বৌদ্ধ নৈয়ায়িক উক্ত "অনৈকান্তিক" হেত্বাভাসের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, উক্ত পদে 'নঞ্' শব্দের দ্বারা "পর্য্যুদাস"ও গ্রহণ করা যায় না এবং "প্রসজ্য প্রতিষেধ'ও গ্রহণ করা যায় না। কারণ, পর্য্যুদাস পক্ষে 'নঞ্' শব্দের দ্বারা ভেদ বুঝা যায় এবং প্রসজ্য প্রতিষেধ পক্ষে অত্যন্তাভাব বুঝা যায়। কিন্তু যাহা ঐকান্তিক ভিন্ন, তাহাই অনৈকান্তিক, ইহা বলিলে হেত্বাভাসমাত্রই অনৈকান্তিক হয়। কারণ, কোন হেত্বাভাসই ঐকান্তিক নহে। আর ঐকান্তিকের অত্যন্তাভাবই অনৈকান্তিক, ইহা বলিলে ব্যভিচারবিশিষ্ট হেতু যে, "অনৈকান্তিক" ইহা বুঝা যায় না। জয়ন্ত ভট্টও এ বিষয়ে অনেক বিচার করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর ইহার প্রতিবাদ করিতে কোন কারণে 'প্রসজ্য প্রতিষেধ' পক্ষ গ্রহণ করিলেও বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, পর্য্যুদাসপক্ষই উদ্দ্যোতকরের নিজের সম্মত। কারণ, উদ্দ্যোতকরের

ব্যাখ্যানুসারে 'বিরুদ্ধ' প্রভৃতি অন্যান্য হেত্বাভাস অনৈকান্তিক হয় না।* বস্তুতঃ ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারেও তাহা হয় না।

কিন্তু উদ্দ্যোতকরের মতে উক্ত "অনৈকান্তিক" শব্দের দ্বারাই অসাধারণ সব্যভিচারও বুঝা যায়। তাই তিনি উহা সমর্থন করিতে পরে বলিয়াছেন,— "ব্যাবৃত্তিদ্বারেণাভিধীয়মানোঽয়মুভয়ান্তব্যাবৃত্তেরনৈকান্তিক ইতি।" অর্থাৎ যে হেতু উভয় অন্তের মধ্যে কোন অন্তের আধারেই থাকে না অর্থাৎ সপক্ষ পদার্থেও থাকে না এবং বিপক্ষ পদার্থেও থাকে না, কিন্তু কেবল পক্ষভূত পদার্থেই থাকে, তাহাও ঐকান্তিকের বিপরীত হওয়ায় 'অনৈকান্তিক'। যেমন 'শব্দো নিত্যঃ শব্দত্বাৎ'—এইরূপ প্রয়োগে পক্ষভূত শব্দমাত্রের অসাধারণধর্ম্ম শব্দত্বরূপ হেতু। "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজও "সব্যভিচার"কে 'সাধারণ' ও 'অসাধারণ' নামে দ্বিবিধই বলিয়াছেন। কিন্তু পরে "তত্ত্ব-চিন্তামণি"কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় "অনুপসংহারী" এই নামে তৃতীয় প্রকার সব্যভিচারও সমর্থন করিয়াছেন। যেমন "সর্ব্বং প্রমেয়ং" এইরূপে সমস্ত পদার্থকেই পক্ষরূপে গ্রহণ করিলে সেই স্থলীয় হেতুকে বলে **'অনুপসংহারী'**। মতভেদে ইহার অন্যরূপ উদাহরণও আছে। কিন্তু প্রাচীন **'ভাসর্ব্বজ্ঞ'** অষ্টপ্রকার 'অনৈকান্তিক' বলিয়া তাহার উদাহরণ বলিয়া গিয়াছেন। "ন্যায়সারে"র অনুমান পরিচ্ছেদে তাহা দ্রষ্টব্য ॥ ৫ ॥

সূত্র। সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য তদ্বিরোধী বিরুদ্ধঃ ॥ ৬ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—সিদ্ধান্তরূপে কোন পদার্থ স্বীকার করিয়া, তাহার বিরোধী পদার্থ অর্থাৎ যে পদার্থ স্বীকৃত সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক তাহা বিরুদ্ধ (বিরুদ্ধনামক হেত্বাভাস।)

ভাষ্য। তং বিরুণদ্ধীতি তদ্বিরোধী। অভ্যুপেতং সিদ্ধান্তং ব্যাহন্তীতি। যথা সোঽয়ং বিকারো ব্যক্তেরপৈতি নিত্যত্ব-

---

* "'একস্মিন্নন্তে নিয়ত ঐকান্তিকঃ' বিপর্য্যয়াদনৈকান্তিকঃ।"—ন্যায়বার্ত্তিক। ...'একস্মিন্নন্তে যো নিয়তঃ স ঐকান্তিকস্তদ্বিপর্য্যয়াদনৈকান্তিকোঽনিয়তঃ' অনিত্যত্বে নিত্যত্বে চান্বয়েন ব্যতিরেকেণ বা উভয়পক্ষগামীতি যাবৎ। ন চৈবম্ভূতা বিরুদ্ধাদয়ো হেত্বাভাসা ইত্যভিপ্রায়ঃ।"—'তাৎপর্য্যটীকা'।

প্রতিষেধাৎ, ন নিত্যো বিকার উপপদ্যতে, অপেতোঽপি বিকারোঽস্তি বিনাশপ্রতিষেধাৎ, সোঽয়ং নিত্যত্বপ্রতিষেধাদিতি-হেতুর্ব্যক্তেরপেতোঽপি বিকারোঽস্তীত্যনেন স্বসিদ্ধান্তেন বিরুধ্যতে।

কথম্? ব্যক্তিরাত্মলাভঃ, অপায়ঃ প্রচ্যুতিঃ যদ্যাত্মলাভাৎ প্রচ্যুতো বিকারোঽস্তি, নিত্যত্বপ্রতিষেধো নোপপদ্যতে, যদ্ব্যক্তে-রপেতস্যাপি বিকারস্যাস্তিত্বং, তৎ খলু নিত্যত্বমিতি, নিত্যত্ব-প্রতিষেধো নাম বিকারস্যাত্মলাভাৎ প্রচ্যুতেরুপপত্তিঃ। যদাত্ম-লাভাৎ প্রচ্যবতে তদনিত্যং দৃষ্টং, যদস্তি ন তদাত্মলাভাৎ প্রচ্যবতে। অস্তিত্বঞ্চাত্মলাভাৎ প্রচ্যুতিরিতি বিরুদ্ধাবেতৌ ধর্ম্মৌ ন সহ সম্ভবত ইতি। সোঽয়ং হেতুর্যং সিদ্ধান্তমাশ্রিত্য প্রবর্ত্ততে তমেব ব্যাহন্তীতি।

অনুবাদ—তাহাকে ব্যাহত করে, এই অর্থে 'তদ্বিরোধী' (বিশদার্থ) স্বীকৃত সিদ্ধান্তকে ব্যাহত করে। অর্থাৎ যে হেতু স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী, তাহা 'বিরুদ্ধ'নামক হেত্বাভাস। যথা—সেই এই বিকার (মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র প্রভৃতি) 'ব্যক্তি' অর্থাৎ অভিব্যক্তি হইতে অপগত হয়, অর্থাৎ চিরকালই বিকাররূপে অভিব্যক্ত থাকে না, যেহেতু নিত্যত্বের অভাব আছে, নিত্য বিকার উপপন্ন হয় না, (কিন্তু) অপগত হইয়াও অর্থাৎ সমস্ত বিকার-পদার্থ অভিব্যক্তি হইতে প্রচ্যুত হইয়াও বিদ্যমান থাকে, যেহেতু বিনাশের অভাব (অবিনাশিত্ব) আছে। সেই এই (পূর্ব্বোক্ত) 'নিত্যত্ব-প্রতিষেধাৎ' এই বাক্যবোধ্য হেতু অর্থাৎ অনিত্যত্ব, 'ব্যক্তি' হইতে প্রচ্যুত হইয়াও বিকার বিদ্যমান থাকে—এই নিজ সিদ্ধান্তের সহিত অর্থাৎ পূর্ব্বস্বীকৃত বিকারের নিত্যত্বরূপ সিদ্ধান্তের সহিত বিরুদ্ধ হয়।

(প্রশ্ন) কিরূপে? (উত্তর) 'ব্যক্তি' বলিতে আত্মলাভ (অর্থাৎ বিকারের স্বস্বরূপ-প্রাপ্তিরূপ অভিব্যক্তিই পূর্ব্বোক্ত "ব্যক্তি" শব্দের অর্থ)। "অপায়" বলিতে প্রচ্যুতি (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত 'অপৈতি' এই ক্রিয়াপদে অপপূর্ব্বক ইণ্ ধাতুর অর্থ প্রচ্যুতি)। যদি আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হইয়াও 'বিকার'পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে (সেই সমস্ত পদার্থের) নিত্যত্বের অভাব উপপন্ন

হয় না। (কারণ) ব্যক্তি হইতে প্রচ্যুত হইয়াও বিকারপদার্থের যে বিদ্যমানত্ব, তাহা নিত্যত্বই, আর নিত্যত্বের প্রতিষেধ বলিতে বিকারপদার্থের আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুতির উপপত্তি অর্থাৎ সেই প্রচ্যুতিমত্ত্ব। যে বস্তু আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হয়, তাহা অনিত্য দৃষ্ট হয়, যে বস্তু বিদ্যমান থাকে, তাহা আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হয় না। বিদ্যমানত্ব এবং আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুতি, এই দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম মিলিত হইয়া সম্ভব হয় না অর্থাৎ একাধারে থাকিতে পারে না। সেই এই হেতু (নিত্যত্বের অভাব) যে সিদ্ধান্তকে (বিকারপদার্থের বিদ্যমানত্বকে) আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হয়, সেই সিদ্ধান্তকেই ব্যাহত করে অর্থাৎ তাহারই ব্যাঘাতক হয়।

টিপ্পনী—পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় প্রকার 'হেত্বাভাসে'র নাম **'বিরুদ্ধ'**। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা উহার লক্ষণ বলিয়াছেন যে, কোন সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া তাহার বিরোধী যে হেতু, তাহা 'বিরুদ্ধ'। ভাষ্যকার প্রথমে সূত্রোক্ত 'তদ্বিরোধী' এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'তং বিরুণদ্ধীতি তদ্বিরোধী'। পরে উহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"অভ্যুপেতং সিদ্ধান্তং ব্যাহন্তীতি।" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত 'তং' এই পদের ব্যাখ্যা 'অভ্যুপেতং সিদ্ধান্তং'—এবং 'বিরুণদ্ধি' এই ক্রিয়াপদের ব্যাখ্যা 'ব্যাহন্তি'। পূর্ব্বে 'সিদ্ধান্ত' শব্দের উল্লেখ হওয়ায় পরে 'তদ্' শব্দের দ্বারা সেই সিদ্ধান্তই গৃহীত হইয়াছে। যে বাদী যাহা নিজ সিদ্ধান্তরূপে স্বীকার করেন, তাহাই উক্ত "সিদ্ধান্ত" শব্দের অর্থ। তাই মহর্ষি বলিয়াছেন,—"সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য" (স্বীকৃত্য)। যদিও সেই হেতুবাদী পুরুষই সেই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন, তথাপি তাঁহার উক্ত সেই হেতুপদার্থেই সেই স্বীকারের কর্ত্তৃত্ব বিবক্ষা করিয়া মহর্ষি বলিয়াছেন,—"সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য তদ্বিরোধী।" বাচস্পতি মিশ্রও ইহাই বলিয়াছেন। ফলকথা, স্বীকৃত সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক অর্থাৎ তাহার অভাবের সাধক হেতুই **"বিরুদ্ধ"**নামক দ্বিতীয় প্রকার হেত্বাভাস।

ভাষ্যকার পরে ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন,—**"যথা** সোঽয়ং বিকারো ব্যক্তেরপৈতি, নিত্যত্ব-প্রতিষেধাৎ" ইত্যাদি।*

* যোগদর্শন-বিভূতিপাদের ত্রয়োদশ সূত্র-ভাষ্যে ব্যাসদেব বলিয়াছেন,—"তদেতৎ ত্রৈলোক্যং ব্যক্তেরপৈতি" ইত্যাদি। সেখানে টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যাও দ্রষ্টব্য। উদ্দ্যোতকরও এখানে বলিয়াছেন,—"তদেতৎ ত্রৈলোক্যং" ইত্যাদি। কিন্তু বাৎস্যায়ন এখানে যোগভাষ্যের উক্ত সন্দর্ভই উদ্ধৃত করেন নাই। বাচস্পতি মিশ্র এখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"মহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রৈকাদশেন্দ্রিয় (ভূতসূক্ষ্ম) মহাভূতানি বিকারঃ, তস্য ব্যক্তের্দ্ধর্ম্ম-লক্ষণাবস্থাপরিণামঃ, তস্মাদপায় ইতি।"—তাৎপর্য্যটীকা। পূর্ব্বোক্ত যোগসূত্রভাষ্যে ত্রিবিধ পরিণামের ব্যাখ্যাদি দ্রষ্টব্য।

তাৎপর্য এই যে, সাংখ্যসম্প্রদায়ের মতে 'মহৎ', 'অহঙ্কার' ও 'পঞ্চ তন্মাত্র' প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব 'বিকার'। (মহৎ প্রভৃতি সপ্ত তত্ত্ব প্রকৃতি হইলেও বিকৃতি)। ঐ সমস্ত বিকারভূত পদার্থের সেই সেইরূপে পরিণামরূপ যে আত্মলাভ, তাহা 'ব্যক্তি' বা অভিব্যক্তি বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু সেই অভিব্যক্তি চিরকাল থাকে না। ঐ সমস্ত বিকার কোন কালে সেই ব্যক্তি হইতে প্রচ্যুত হয়, ইহা সিদ্ধ করিতে সাংখ্যসম্প্রদায় হেতু বলিয়াছেন, নিত্যত্বের অভাব। কিন্তু তাঁহারা পরে আবার বলিয়াছেন,—"**অপেতোঽপি বিকারোঽস্তি বিনাশ-প্রতিষেধাৎ।**" অর্থাৎ সেই সমস্ত 'বিকার' ব্যক্তি হইতে প্রচ্যুত হইয়াও বিদ্যমান থাকে। যেহেতু উহাদিগের বিনাশ নাই। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে সাংখ্যসম্প্রদায়ের পূর্ব্বোক্ত "নিত্যত্বপ্রতিষেধাৎ" এই বাক্য দ্বারা কথিত নিত্যত্বাভাবরূপ যে হেতু, তাহা তাঁহাদিগের স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ। কারণ, "অপেতোঽপি বিকারোঽস্তি" এই বাক্য দ্বারা তাঁহারা বিকারপদার্থের যে চিরবিদ্যমানত্ব সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন, তাহা ত বস্তুতঃ নিত্যত্বই। কারণ, যে পদার্থ চিরকালই বিদ্যমান থাকে, তাহাকে কখনই অনিত্য বলা যায় না। নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় ঐ উভয় ধর্ম্ম একাধারে থাকিতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অনিত্যত্বরূপ যে হেতু, তাহা নিত্যত্বরূপ স্বীকৃত সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক হওয়ায় উক্ত স্থলে উহা "বিরুদ্ধ" নামক হেত্বাভাস।

বস্তুতঃ সাংখ্যমতে মূল প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে ভিন্ন সমস্ত পদার্থ অনিত্য হইলেও প্রলয়কালেও সেই সমস্ত পদার্থের অত্যন্ত বিনাশ হয় না। কিন্তু মূল-প্রকৃতিতে লয় বা তিরোভাব হয়। সুতরাং ঐ সমস্ত পদার্থ মূলপ্রকৃতিরূপে তখনও বিদ্যমান থাকায় মূলপ্রকৃতিরূপে উহাদিগের নিত্যত্বও আছে। ঐ সমস্ত পদার্থের কথঞ্চিৎ নিত্যত্ব ও কথঞ্চিৎ অনিত্যত্ব সাংখ্যমতে বিরুদ্ধ না হওয়ায় উহা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু অসৎকার্য্যবাদী ন্যায়বৈশেষিকসম্প্রদায় পরিণামবাদ স্বীকার না করায় তাঁহাদিগের মতে কোন পদার্থেরই মূল কারণরূপে বিদ্যমানতা সম্ভব হয় না। তাই উক্ত মতে জন্য ভাবপদার্থ মাত্রের 'নিরন্বয় বিনাশ' অর্থাৎ অত্যন্তবিনাশই স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং কোন পদার্থের কথঞ্চিৎ নিত্যত্ব ও কথঞ্চিৎ অনিত্যত্ব সম্ভব হইতে পারে না। আর তাহা সম্ভব হইলে জৈন-সম্প্রদায়ের সম্মত উক্তরূপ মতও ('স্যাদ্‌বাদ') কেন স্বীকৃত হয় নাই? বেদান্তদর্শনে বাদরায়ণও ত বলিয়াছেন,—"নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" (২।২।৩৩)।

অবশ্য এ বিষয়ে সাংখ্যসম্প্রদায়ের পক্ষেও অনেক কথা আছে। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে গৌতমমতানুসারেই উক্ত হেতুকে 'বিরুদ্ধ' বলিয়াছেন। 'বার্ত্তিক'কার উদ্দ্যোতকরও এখানে 'বিরুদ্ধ' হেত্বাভাসের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন,—"তদেতৎ ত্রৈলোক্যং ব্যক্তেরপৈতি, নিত্যত্ব-প্রতিষেধাৎ, অপেতমপ্যস্তি, বিনাশপ্রতিষেধাৎ" ইত্যাদি।

কিন্তু উদ্দ্যোতকর এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে পদার্থ স্বীকৃত সিদ্ধান্তকে বাধিত করে অথবা সেই সিদ্ধান্তকর্তৃক বাধিত হয়, এই উভয়ই সেই স্বীকৃত সিদ্ধান্তবিরোধী হওয়ায় 'বিরুদ্ধ' হেত্বাভাস। তাৎপর্য্য এই যে, যে পদার্থ স্বরূপতঃই স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ এবং যে পদার্থে স্বীকৃত সিদ্ধান্তের সাধনত্ব নাই, ইহা নিশ্চিত, তাহা 'বিরুদ্ধ' হেত্বাভাস, ইহাই এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষির বিবক্ষিত। কারণ, তাহা হইলে তাঁহার অনুক্ত অন্যান্য সমস্ত বিরুদ্ধ হেত্বাভাসও উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়। নচেৎ সেই সমস্ত হেত্বাভাস বলা যায় না। কিন্তু ইহাতে প্রশ্ন হয় যে, তাহা হইলে সমস্ত হেত্বাভাসই উক্তরূপ বিরুদ্ধ লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় 'বিরুদ্ধ' নামে একই হেত্বাভাস বক্তব্য। মহর্ষি পঞ্চবিধ হেত্বাভাস বলিয়াছেন কেন? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, একই হেত্বাভাস, ইহা সত্য অর্থাৎ সমস্ত হেত্বাভাসই এই সূত্রোক্ত 'বিরুদ্ধ' হেত্বাভাস। কিন্তু তাহাতে সব্যভিচারত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন পঞ্চ বিশেষ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াই মহর্ষি পঞ্চবিধ হেত্বাভাস বলিয়াছেন। অর্থাৎ সমস্ত হেত্বাভাসেই বিরুদ্ধত্বরূপ সামান্য ধর্ম্ম আছে। কিন্তু তন্মধ্যে যাহাতে সব্যভিচারত্বরূপ বিশেষ ধর্ম্ম থাকে, তাহাকে বলে 'সব্যভিচার বিরুদ্ধ'। এইরূপ প্রকরণসমত্বরূপ বিশেষ ধর্ম্ম থাকিলে তাহাকে বলে 'প্রকরণসমবিরুদ্ধ'। এইরূপ 'সাধ্যসমবিরুদ্ধ' এবং 'কালাতীত বিরুদ্ধ'ও বুঝিতে হইবে। কিন্তু যে হেত্বাভাসে উক্ত সব্যভিচারত্বাদি কোন বিশেষ ধর্ম্ম নাই, কেবল বিরুদ্ধত্বই আছে, তাহাই কেবল 'বিরুদ্ধ' নামে কথিত হইবে। মহর্ষি ইহাই ব্যক্ত করিতে পৃথক্ করিয়া 'বিরুদ্ধ' নামক হেত্বাভাসও বলিয়াছেন। ফলকথা, উদ্দ্যোতকরের মতে হেত্বাভাস বা দুষ্ট হেতুমাত্রেই সাধ্যসাধনত্বরূপ হেতুলক্ষণ না থাকায় সমস্ত হেত্বাভাসই পূর্ব্বোক্ত 'বিরুদ্ধ'লক্ষণাক্রান্ত। ভাষ্যকার এই সূত্রের উক্তরূপ ব্যাখ্যা না করিলেও তিনিও পূর্ব্বে বাদলক্ষণসূত্র-ভাষ্যে এই সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়া সমস্ত হেত্বাভাসেরই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক।

কিন্তু উদ্দ্যোতকরের উক্তরূপ সূত্রার্থ-ব্যাখ্যায় অনেক বক্তব্য আছে।

উদ্দ্যোতকর নিজেও পরে অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"প্রতিজ্ঞাহেত্বোর্ব্বা বিরোধঃ যো বা প্রতিজ্ঞাহেত্বোর্ব্বিরোধঃ স বিরুদ্ধো হেত্বাভাসঃ।" কিন্তু ইহাতেও প্রশ্ন হয় যে, মহর্ষি পরে পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে নিগ্রহ-স্থানের নিরূপণ করিতে প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতুবাক্যের বিরোধকে 'প্রতিজ্ঞা-বিরোধ' নামক তৃতীয় প্রকার 'নিগ্রহস্থান'ই বলিয়াছেন। তাহা হইলে এখানে উহাকেই 'বিরুদ্ধ'নামক হেত্বাভাস কিরূপে বলা যায়? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, বিরোধ উভয়াশ্রিত। সুতরাং মহর্ষি সেই বিরোধের আশ্রয়ভেদ বিবক্ষা করিয়াই উহাকে পরে 'নিগ্রহস্থান'ও বলিয়াছেন। যে স্থলে প্রতিজ্ঞা-বাক্যকে আশ্রয় করিয়া হেতুবাক্যের সহিত তাহার বিরোধ হয়, সেই স্থলেই উহাকে প্রতিজ্ঞাবিরোধ নামক নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন। আর যে স্থলে হেতুবাক্যকে আশ্রয় করিয়া প্রতিজ্ঞাবাক্যের সহিত তাহার বিরোধ হয়, সেই স্থলে উহাকে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস বলিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর পরে হেতু-বিরোধ প্রভৃতির উদাহরণও প্রদর্শন করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রও পরে বলিয়াছেন,—"অত্র চার্থে সুগমং ভাষ্যং।" অর্থাৎ উদ্দ্যোতকরের শেষোক্ত সূত্রার্থেই সরল ভাবে ভাষ্যার্থ বুঝা যায়। কিন্তু এই সূত্রপাঠের দ্বারা সরল ভাবে উক্তরূপ অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সূত্রে 'সিদ্ধান্ত' শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সরল ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে পদার্থ সাধ্যধর্ম্মের বিরোধী অর্থাৎ তাহার অভাবের ব্যাপ্য, সেই পদার্থ 'বিরুদ্ধ'নামক হেত্বাভাস। যেমন বহ্নির অনুমানের জন্য 'জলত্বাৎ' এইরূপে জলত্বকে হেতু বলিলে উহা 'বিরুদ্ধ' হেত্বাভাস। কারণ, উক্ত জলত্ব হেতু বহ্নির অভাবেরই ব্যাপ্য হওয়ায় উহা উক্ত সাধ্যধর্ম্মের অভাবেরই সাধক হয়। সুতরাং উহা বহ্নির সাধক হেতু হয় না। এই 'বিরুদ্ধ' হেত্বাভাস হইতে 'প্রতিজ্ঞাবিরোধ'নামক নিগ্রহস্থান ভিন্ন কেন, এ বিষয়ে বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতির কথা পঞ্চম খণ্ডে (৪২৭ পৃঃ) দ্রষ্টব্য ॥ ৬ ॥

সূত্র। যস্মাৎ প্রকরণচিন্তা স নির্ণয়ার্থমপদিষ্টঃ প্রকরণসমঃ ॥ ৭ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—যৎপ্রযুক্ত 'প্রকরণচিন্তা' জন্মে অর্থাৎ কোন পক্ষেরই নির্ণয় না হওয়ায় সংশয়বিষয়ীভূত পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপ প্রকরণবিষয়ে জিজ্ঞাসা জন্মে,

তাহা নির্ণয়ের নিমিত্ত অপদিষ্ট অর্থাৎ হেতুরূপে কথিত হইলে 'প্রকরণসম' অর্থাৎ "প্রকরণসম" নামক হেত্বাভাস হয়।

ভাষ্য। বিমর্শাধিষ্ঠানৌ পক্ষপ্রতিপক্ষাবুভাবনবসিতৌ প্রকরণং,—তস্য চিন্তা বিমর্শাৎ প্রভৃতি প্রাঙ্‌ নির্ণয়াদ্‌যৎ সমীক্ষণং, সা জিজ্ঞাসা যৎকৃতা, স নির্ণয়ার্থং প্রযুক্ত উভয়পক্ষ-সাম্যাৎ প্রকরণমনতিবর্ত্তমানঃ প্রকরণসমো নির্ণয়ায় ন প্রকল্পতে। প্রজ্ঞাপনন্ত্বনিত্যঃ শব্দো নিত্যধর্ম্মানুপলব্ধেরিত্যনুপলভ্যমান-নিত্যধর্ম্মকমনিত্যং দৃষ্টং স্থাল্যাদি।

যত্র সমানো ধর্ম্মঃ সংশয়কারণং হেতুত্বেনোপাদীয়তে, স সংশয়সমঃ সব্যভিচার এব। যাতু বিমর্শস্যবিশেষাপেক্ষিতা উভয়পক্ষবিশেষানুপলব্ধিশ্চ, সা প্রকরণং প্রবর্ত্তয়তি। যথা শব্দে নিত্যধর্ম্মো নোপলভ্যতে, এবমনিত্যধর্ম্মোঽপি, সেয়মুভয়পক্ষ-বিশেষানুপলব্ধিঃ প্রকরণচিন্তাং প্রবর্ত্তয়তি। কথম্‌? বিপর্য্যয়ে হি প্রকরণনিবৃত্তেঃ, যদি নিত্যধর্ম্মঃ শব্দে গৃহ্যেত, ন স্যাৎ প্রকরণং, যদি বা অনিত্য ধর্ম্মো গৃহ্যেত, এবমপি নিবর্ত্তেত প্রকরণং,—সোঽয়ং হেতুরুভৌ পক্ষৌ প্রবর্ত্তয়ন্নন্যতরস্য নির্ণয়ায় ন প্রকল্পতে।

অনুবাদ—'বিমর্শের অধিষ্ঠান' অর্থাৎ সংশয়বিষয়ীভূত 'অনবসিত' (অনির্ণীত) 'পক্ষ' ও 'প্রতিপক্ষ' এই উভয়ই 'প্রকরণ'। সেই 'প্রকরণে'র 'চিন্তা' সংশয় হইতে নির্ণয়ের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত যে সমীক্ষণ অর্থাৎ আলোচনরূপ জিজ্ঞাসা, সেই জিজ্ঞাসা যৎপ্রযুক্ত হয়, তাহা নির্ণয়ের নিমিত্ত অর্থাৎ কোন সাধ্যধর্ম্মের অনুমিতির নিমিত্ত 'অপদিষ্ট' (হেতুরূপে প্রযুক্ত) হইয়া উভয় পক্ষে সাম্যবশতঃ প্রকরণকে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপ ধর্ম্মদ্বয়কে অতিক্রম না করায় 'প্রকরণসম' হইয়া নির্ণয়ের নিমিত্ত সমর্থ হয় না। প্রজ্ঞাপন অর্থাৎ উদাহরণ কিন্তু—"অনিত্যঃ শব্দঃ, নিত্যধর্ম্মানুপলব্ধেঃ, অনুপলভ্যমাননিত্যধর্ম্মকম-নিত্যং দৃষ্টং স্থাল্যাদি", অর্থাৎ উক্তরূপ প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের প্রয়োগ করিয়া

শব্দের অনিত্যত্ব সাধনের জন্য নিত্যধর্ম্মের অনুপলব্ধিকে হেতু বলিলে, তাহা উক্ত স্থলে 'প্রকরণসম' নামক হেত্বাভাস।

যে স্থলে সংশয়ের প্রয়োজক সমান ধর্ম্ম হেতুস্বরূপে গৃহীত হয়, তাহা 'সংশয়সম' হওয়ায় সব্যভিচারই, অর্থাৎ তাদৃশ হেতু প্রথমোক্ত 'সব্যভিচার' নামক হেত্বাভাসই হয়। কিন্তু যাহা সংশয়ের বিশেষাপেক্ষিতা এবং উভয় পক্ষে বিশেষের অনুপলব্ধি, তাহা প্রকরণকে প্রবৃত্ত করে। (তাৎপর্য্য) যেমন শব্দে নিত্যধর্ম্ম উপলব্ধ হয় না, এইরূপ অনিত্য ধর্ম্মও উপলব্ধ হয় না। সেই এই উভয় পক্ষে বিশেষের অনুপলব্ধি 'প্রকরণ-চিন্তা'কে প্রবৃত্ত করে অর্থাৎ শব্দে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ প্রকরণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা উৎপন্ন করে। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু বিপর্য্যয় হইলে প্রকরণের নিবৃত্তি হয়, (তাৎপর্য্য) যদি শব্দে নিত্যধর্ম্ম উপলব্ধ হয়, তাহা হইলে প্রকরণ (পূর্ব্বোক্ত প্রকরণ-চিন্তা) থাকে না। আর যদি শব্দে অনিত্যধর্ম্ম উপলব্ধ হয়, এইরূপ হইলেও 'প্রকরণ' নিবৃত্ত হইবে। সেই এই হেতু অর্থাৎ নিত্যধর্ম্মের অনুপলব্ধি ও অনিত্যধর্ম্মের অনুপলব্ধিরূপ হেতু উভয় পক্ষকে প্রবৃত্ত করায় অর্থাৎ শব্দে অনিত্যত্ব ও নিত্যত্বরূপ প্রকরণ বিষয়ে চিন্তার প্রবর্ত্তক বা প্রয়োজক হওয়ায় একতর পক্ষের নির্ণয়ের নিমিত্ত সমর্থ হয় না।

টিপ্পনী—মহর্ষি যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত 'প্রকরণসম' হেত্বাভাসের লক্ষণার্থ এই সূত্রে প্রথমে বলিয়াছেন,—"**যস্মাৎ প্রকরণ**চিন্তা।" ভাষ্যকার সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে উক্ত 'প্রকরণ' শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, সংশয়বিষয়ীভূত এবং অনির্ণীত পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপ ধর্ম্মদ্বয়। বস্তুতঃ 'প্রক্রিয়তে সাধ্যত্বেনাধিক্রিয়তে যৎ' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'প্রকরণ' শব্দের দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদীর সাধ্যত্বরূপে গৃহীত ধর্ম্মদ্বয় বুঝা যায়। সেই ধর্ম্মদ্বয় একাধারে পরস্পর বিরুদ্ধ হইলে মধ্যস্থগণের সংশয়বিষয়ীভূত হইয়া 'পক্ষ' ও 'প্রতিপক্ষ' নামে কথিত হয়। ভাষ্যকার ইহাই ব্যক্ত করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—"**বিমর্শাধিষ্ঠানৌ পক্ষপ্রতিপক্ষৌ**"। বিমর্শ বলিতে এখানে মধ্যস্থগণের সংশয়। তাহার অধিষ্ঠান অর্থাৎ সেই সংশয়জ্ঞানে মুখ্যবিশেষণীভূত। কিন্তু একতর ধর্ম্ম নির্ণীত হইলে তখন সেই ধর্ম্মদ্বয় 'পক্ষ' ও 'প্রতিপক্ষ' হয় না। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন, '**অনবসিতৌ**'। নিশ্চয়ার্থ অবপূর্ব্বক 'সো' ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্য 'ক্ত' প্রত্যয়নিষ্পন্ন 'অবসিত' শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, নির্ণীত। যাহা অবসিত নহে, তাহা 'অনবসিত' অর্থাৎ অনির্ণীত। ফলকথা, যাহা 'পক্ষ' ও

'প্রতিপক্ষ' নামে কথিত হইয়াছে, তাহাই এই সূত্রে 'প্রকরণ' শব্দের অর্থ। পূর্ব্বোক্ত বাদলক্ষণসূত্রের ভাষ্য ও বার্ত্তিকে "পক্ষ" ও "প্রতিপক্ষে"র ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যকার পরে সূত্রোক্ত 'প্রকরণ-চিন্তা'র ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "তস্য চিন্তা বিমর্শাৎ প্রভৃতি প্রাঙ্ নির্ণয়াদ্ যৎ সমীক্ষণং।" পরে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন, "সা জিজ্ঞাসা যৎকৃতা" ইত্যাদি। সূত্রোক্ত "যস্মাৎ" এই পদের ব্যাখ্যা 'যৎকৃত' অর্থাৎ যৎপ্রযুক্ত। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপ প্রকরণদ্বয়বিষয়ে মধ্যস্থগণের সংশয় হইতে নির্ণয়ের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত যে সমীক্ষণ, তাহাই এই সূত্রোক্ত প্রকরণচিন্তা। উহা সেই প্রকরণদ্বয়বিষয়ে জিজ্ঞাসারূপ চিন্তা। যে পদার্থ সেই জিজ্ঞাসারই প্রযোজক হয়, তাহা সেই প্রকরণের অনুমিতিরূপ নির্ণয়ের নিমিত্ত অপদিষ্ট অর্থাৎ হেতুরূপে প্রযুক্ত হইলে উভয় পক্ষেই সাম্যবশতঃ তাহা কোন পক্ষকেই অতিক্রম করিতে সমর্থ না হওয়ায় 'প্রকরণসম' নামক হেত্বাভাস হয়। ভাষ্যকার পরে ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন, "প্রজ্ঞাপনন্ত্বনিত্যঃ শব্দো নিত্যধর্ম্মানুপলব্ধেঃ" ইত্যাদি। "প্রজ্ঞাপ্যতে প্রদর্শ্যতেঽনেন" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে উক্ত 'প্রজ্ঞাপন' শব্দের অর্থ উদাহরণ। 'তু' শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে যে, অন্যরূপ উদাহরণ ভাষ্যকারের সম্মত নহে। কোন পুস্তকে এখানে পরে "নিত্যঃ শব্দোঽনিত্যধর্ম্মানুপলব্ধেরনুপলভ্যমানানিত্যধর্ম্মকং নিত্যং দৃষ্টমাকাশাদি" এইরূপ অতিরিক্ত পাঠ দেখা যায় এবং উহা প্রকৃত পাঠ বলিয়াও বুঝা যায়।

ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণ এই যে, শব্দের অনিত্যত্ববাদী নৈয়ায়িক যদি শব্দে অনিত্যত্ব সাধনের জন্য নিত্যধর্ম্মের অনুপলব্ধিকে হেতু বলেন, তাহা হইলে উহা 'প্রকরণসম' নামক হেত্বাভাস হইবে। কারণ, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী মীমাংসকও তুল্যভাবে বলিবেন, "নিত্যঃ শব্দোঽনিত্যধর্ম্মানুপলব্ধেঃ" ইত্যাদি। অবশ্য শব্দে অনিত্য পদার্থের কোন বিশেষ ধর্ম্ম প্রমাণসিদ্ধ হইলে মীমাংসকের ঐ হেতু অসিদ্ধ হয়। কিন্তু তাহা হইলে সেই বাদী নৈয়ায়িক সেই অনিত্যধর্ম্মকে হেতু না বলিয়া নিত্যধর্ম্মের অনুপলব্ধিকে হেতু বলিবেন কেন? সুতরাং শব্দে যে, কোন অনিত্যধর্ম্মের উপলব্ধি হয় না, ইহা তাঁহারও সম্মত বুঝিয়া, প্রতিবাদী মীমাংসক উক্ত হেতুর প্রয়োগ করিতে পারেন। কিন্তু একাধারে পরস্পর বিরুদ্ধ অনিত্যত্ব ও নিত্যত্ব সম্ভব না হওয়ায় উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর

উভয় হেতুই তাহার সাধ্য-নির্ণয়ে সমর্থ হয় না। কিন্তু শব্দে অনিত্যত্ব ও নিত্যত্বরূপ প্রকরণদ্বয়বিষয়ে জিজ্ঞাসারই প্রযোজক হয়। সুতরাং উক্ত স্থলে উভয় হেতুই অহেতু। উহা 'প্রকরণসম' নামক হেত্বাভাস।

কোন সম্প্রদায়ের মতে 'প্রকরণসম'হেতুও প্রকরণ বিষয়ে সংশয়ের প্রযোজক হওয়ায় উহা 'সব্যভিচার' হেত্বাভাসেরই অন্তর্গত। তাই ভাষ্যকার পরে নিজ মতানুসারে বলিয়াছেন, **"যত্র তু"** ইত্যাদি। ভাষ্যকারের কথা এই যে, যে স্থলে সপক্ষ ও বিপক্ষের কোন সমান ধর্ম্ম হেতুরূপে গৃহীত হয়, সেই স্থলে সেই সমান ধর্ম্মের জ্ঞান সেই সাধ্যধর্ম্ম ও তাহার অভাববিষয়ে মধ্যস্থগণের পূর্ব্ববৎ সমান সংশয়ই উৎপন্ন করায়, সেই সমানধর্ম্মরূপ হেতুকে 'সংশয়সম' বলা যায়। সুতরাং উহা প্রথমোক্ত 'সব্যভিচার' নামক হেত্বাভাসই হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত স্থলে নিত্যধর্ম্মের অনুপলব্ধি ও অনিত্যধর্ম্মের অনুপলব্ধিরূপ যে হেতু, তাহা উভয়বাদিসম্মত অনিত্য ও নিত্য পদার্থের সমানধর্ম্ম না হওয়ায় উহা পরে শব্দে অনিত্যত্ব ও নিত্যত্ববিষয়ে সংশয়ের প্রযোজক হয় না, কিন্তু জিজ্ঞাসারই প্রযোজক হয়। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে পরে বলিয়াছেন, **"যা তু বিমর্শস্য"** ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে সংশয়লক্ষণসূত্রে 'বিশেষাপেক্ষঃ' এই পদের দ্বারা যে বিশেষধর্ম্মের অনুপলব্ধি ও স্মৃতি সংশয়মাত্রের কারণরূপে সূচিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত স্থলে থাকিলেও কেবল তাহাই উক্ত স্থলে সংশয় জন্মাইতে পারে না, কিন্তু **"সা প্রকরণং প্রবর্ত্তয়তি।"** ভাষ্যকার পরে ঐ কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"…সেয়মুভয়পক্ষবিশেষানুপলব্ধিঃ প্রকরণচিন্তাং প্রবর্ত্তয়তি" (জনয়তি)। ভাষ্যকার পরে **'কথম্'** এই পদের দ্বারা প্রশ্নপূর্ব্বক তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কথা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, শব্দে নিত্যপদার্থের কোন বিশেষধর্ম্মের অথবা অনিত্য পদার্থের কোন বিশেষধর্ম্মের উপলব্ধি হইলেই তাহাতে নিত্যত্ব অথবা অনিত্যত্বের নিশ্চয় হওয়ায় নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ প্রকরণ বিষয়ে জিজ্ঞাসারূপ চিন্তার নিবৃত্তি হয়। নচেৎ তাহা হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত স্থলে উভয় পক্ষে বিশেষধর্ম্মের অনুপলব্ধিরূপ যে হেতু, তাহা কোন পক্ষেরই নির্ণয়ে সমর্থ না হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত প্রকরণচিন্তার প্রযোজক হয়। অতএব উহা 'প্রকরণসম' নামক পৃথক্ হেত্বাভাস। উহা পরে প্রকরণদ্বয় বিষয়ে সংশয়প্রযোজক না হওয়ায় প্রথমোক্ত 'সব্যভিচার' হেত্বাভাস হইতে পারে না। ভাষ্যে পরে 'প্রকরণ' শব্দের দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত 'প্রকরণচিন্তা'ই বুঝিতে হইবে।

প্রকারণসমের উদাহরণাদি বিষয়ে নানা মত ও বিচার।

প্রাচীন কাল হইতেই নানা গ্রন্থে 'প্রকরণসম' হেত্বাভাসের নানারূপ উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন, "পরেষাং কিলোদাহরণং নিত্য আত্মা শরীরাদন্যত্বাদাকাশবদিতি।" উদ্দ্যোতকর উক্ত উদাহরণ-খণ্ডনার্থই পরে বলিয়াছেন, "শরীরাদন্যত্বস্তু ন সূত্রার্থঃ।" বস্তুতঃ চরকসংহিতাতেও ('বিমানস্থান', অষ্টম অঃ) 'প্রকরণসমে'র উদাহরণ কথিত হইয়াছে যে, আত্মা অনিত্য শরীর হইতে ভিন্ন পদার্থ হওয়ায় শরীরের বৈধর্ম্ম্য-বিশিষ্টই হইবে, অতএব আত্মা নিত্য। অর্থাৎ উক্তরূপ অনুমানে শরীরভিন্নত্বরূপ হেতু "প্রকরণসম" নামক "অহেতু"। কিন্তু উদ্দ্যোতকর উক্ত উদাহরণ খণ্ডন করিতে শেষ কথা বলিয়াছেন যে, শরীরভিন্নত্বরূপ হেতু নিত্যত্বের ব্যভিচারী হওয়ায় উহা 'অনৈকান্তিক'। সুতরাং উহা 'প্রকরণসম' হইতে পারে না। ভাষ্যকারের ন্যায় উদ্দ্যোতকরের মতেও বিশেষধর্ম্মের অনুপলব্ধিরূপ তত্ত্বানুপলব্ধিই হেতুরূপে কথিত হইলে তাহাই 'প্রকরণসম' হেত্বাভাস। কারণ, তাহাই পূর্ব্বোক্তরূপ 'প্রকরণচিন্তা'র প্রযোজক হয়। তাই তিনি মহর্ষির সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—"কস্মাৎ প্রকরণচিন্তা? তত্ত্বানুপলব্ধেঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ সূত্রে 'যস্মাৎ' এই পদে যদ্ শব্দের দ্বারা বিশেষধর্ম্মের অনুপলব্ধিই মহর্ষির বুদ্ধিস্থ।

'ন্যায়মঞ্জরী'কার জয়ন্ত ভট্টও 'প্রকরণসমে'র ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণই গ্রহণ করিয়া ভাসর্ব্বজ্ঞোক্ত উদাহরণ ও অন্যরূপ উদাহরণের খণ্ডন করিয়াছেন।* কিন্তু তাঁহার মতে উক্তরূপ 'প্রকরণসম' হেতুদ্বয়ের প্রয়োগস্থলে পরে সেই প্রকরণদ্বয়বিষয়ে সংশয়ই জন্মে। প্রকরণবিষয়ে সংশয়াত্মক জ্ঞানই এই সূত্রোক্ত প্রকরণ চিন্তা। কোন সম্প্রদায় একত্র তুল্যলক্ষণ বিরুদ্ধ হেতুদ্বয়কে বিরুদ্ধাব্যভিচারী এই নামে উল্লেখ করিয়া উহাকে 'অনৈকান্তিক' হেত্বাভাসেরই প্রকারবিশেষ বলিয়াছেন। কিন্তু জয়ন্ত ভট্ট উক্ত মতের খণ্ডন

---

* "ন্যায়সারে" ভাসর্ব্বজ্ঞ বলিয়াছেন, "প্রকরণসমস্যোদাহরণং যথা—'নিত্যঃ শব্দঃ পক্ষসপক্ষয়োরন্যতরত্বাদ্ গগনবদিতি। অনিত্যঃ শব্দঃ পক্ষসপক্ষয়োরন্যতরত্বাদ্ ঘটবদিতি। একত্র তুল্যলক্ষণবিরুদ্ধহেতুদ্বয়োপনিপাতো বিরুদ্ধাব্যভিচারীত্যেকে।" টীকাকার জয়সিংহ সূরি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "একে ইতি বয়মিত্যর্থঃ।" কিন্তু উহা ভাসর্ব্বজ্ঞের নিজসম্মত হইলে তিনি পরে 'একে' এই পদ বলিয়াছেন কেন, ইহাও চিন্তনীয়। 'একে' এই পদের দ্বারা বুঝা যায় 'অন্যে'।

করিয়া বলিয়াছেন, "এবম্বিধস্য চাস্য প্রকরণসমস্য বিরুদ্ধাব্যভিচারীতি নাম যদি ক্রিয়তে, তদপি ভবতু।" অর্থাৎ তাঁহার মতে উক্তরূপ 'প্রকরণসম' হেতুদ্বয় প্রকরণবিষয়ে সংশয়েরই প্রযোজক হওয়ায় উহারই 'বিরুদ্ধাব্যভিচারী' এই নামকরণে তাঁহার আপত্তি নাই। 'তার্কিকরক্ষা'কার বরদরাজও বলিয়াছেন,— "তমিমং প্রকরণসমং বিরুদ্ধাব্যভিচারীতি কেচিদ্ব্যপদিশন্তি।" কুমারিল ভট্টও 'শ্লোকবার্ত্তিকে' (অনু—প:) বলিয়াছেন,—"যত্রাপ্রত্যক্ষতা বায়োররূপত্বেন সাধ্যতে। স্পর্শাৎ প্রত্যক্ষতা চাসৌ বিরুদ্ধাব্যভিচারিতা॥"—(৯১) অর্থাৎ কোন বাদী বলিলেন,—"বায়ুর্ন প্রত্যক্ষঃ, দ্রব্যত্বে সতি নীরূপত্বাৎ।" পরে প্রতিবাদী বলিলেন,—"বায়ুঃ প্রত্যক্ষঃ, মহত্ত্বে সতি স্পর্শবত্ত্বাৎ।" উক্তরূপ স্থলে উক্ত উভয় হেতুকে বলে **বিরুদ্ধাব্যভিচারী**। মতান্তরে উহা অনৈকান্তিক হেত্বাভাসেরই প্রকারবিশেষ। †

কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি সৎপ্রতিপক্ষ হেতুদ্বয়কেই গোতমোক্ত 'প্রকরণসম' বলিয়াছেন। 'দীধিতি'কার রঘুনাথ শিরোমণি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "সন্ প্রতিপক্ষো বিরোধিপরামর্শো যস্য স তথা।" অর্থাৎ যে হেতুর পরামর্শকালে তাহার তুল্যবলবিরোধী অপর হেতুর পরামর্শ জন্মে, তাদৃশ হেতুদ্বয়ই 'সৎপ্রতিপক্ষ'। উক্তরূপ স্থলে কোন হেতুর দ্বারাই অনুমিতিরূপ নির্ণয় উৎপন্ন না হওয়ায় পূর্ব্বোৎপন্ন সংশয়ের নিবৃত্তি হয় না। প্রশস্তপাদোক্ত মতান্তরের ব্যাখ্যা করিতে 'ন্যায়কন্দলী' টীকায় (২৪১ পৃ:) শ্রীধর ভট্টও বলিয়াছেন,—"অয়মেব চ বিরুদ্ধাব্যভিচারিণঃ প্রকরণসমাদ্ ভেদো যদয়ং সংশয়ং করোতি, প্রকরণসমস্তু সংশয়ং ন নিবর্ত্তয়তি।" তাহা হইলে বুঝা যায় যে, উক্ত মতেও **প্রকরণসম** হেতুদ্বয়ের প্রয়োগস্থলে পরে সেই প্রকরণদ্বয় বিষয়ে সংশয় জন্মে না। কিন্তু সেই হেতুর দ্বারা মধ্যস্থগণের কোন পক্ষেরই অনুমিতিরূপ নির্ণয় না হওয়ায় পূর্ব্বোৎপন্ন সংশয়ের নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং সেই প্রকরণবিষয়ে জিজ্ঞাসাই জন্মে।

নিবন্ধগ্রন্থে ('তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি' টীকায়) উদয়নাচার্য্যও জিজ্ঞাসাবিশেষই

---

† 'মানমেয়োদয়'গ্রন্থে নব্যমীমাংসক নারায়ণভট্টও পরে 'প্রকরণসম'কে 'অনৈকান্তিক' হেত্বাভাসেরই প্রকারবিশেষ বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, "এবং পরোদিতৈরেব পক্ষ-হেতু-নিদর্শনৈঃ। বিরুদ্ধসাধনেঽস্মাকং বিরুদ্ধাব্যভিচারিতা॥" যথা ক্ষিত্যাদিকং সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাদ্ঘটবদিত্যত্র ক্ষিত্যাদিকমীশ্বরকর্ত্তৃকং ন ভবতি কার্য্যত্বাদ্ঘটবদিতি।" অর্থাৎ উক্তরূপে একই হেতু ও দৃষ্টান্তের দ্বারা বিরুদ্ধ পক্ষের অনুমানে সেই হেতু বিরুদ্ধাব্যভিচারী হয়। উহাও পূর্ব্বোক্ত প্রকরণসমেরই প্রকারবিশেষ। কিন্তু এই মত প্রসিদ্ধ নহে।

'প্রকরণসম' হেত্বাভাসের ফল, ইহা বিচারপূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন। তিনি পরে বলিয়াছেন যে, 'সব্যভিচার' বা 'অনৈকান্তিক' হেতুর প্রয়োগস্থলে সেই হেতুর জ্ঞানজন্য অনুমানের ধর্ম্মীতে সাধ্যধর্ম্মবত্ত্ববিষয়ে সংশয় উৎপন্ন হওয়ায় পরে সেই সংশয় দ্বারা তদ্বিষয়েই জিজ্ঞাসা জন্মে। কিন্তু সৎপ্রতিপক্ষ হেতুদ্বয়ের প্রয়োগস্থলে পূর্ব্বোৎপন্ন সংশয়ের নিবৃত্তি না হওয়ায় উভয় হেতুর মধ্যে কোন্ হেতু সমীচীন, এইরূপ জিজ্ঞাসাই জন্মে। সুতরাং 'অনৈকান্তিক' হেত্বাভাস 'সৎপ্রতিপক্ষে'র লক্ষণাক্রান্ত হয় না। 'নিবন্ধ'কার উদয়নাচার্য্য ফল দ্বারাই হেত্বাভাসের লক্ষণ বলিয়াছেন। তাই গঙ্গেশ উপাধ্যায় "অনুমানচিন্তামণি"র **'সৎপ্রতিপক্ষ'** গ্রন্থে উক্ত মতের প্রকাশ করিতে পরে বলিয়াছেন,—"নিবন্ধে তু ফলদ্বারকমেব হেত্বাভাসানাং লক্ষণং" ইত্যাদি। পরন্তু উদয়নাচার্য্যের মতে প্রকৃষ্ট লিঙ্গ বা লিঙ্গপরামর্শ অনুমিতির করণ হওয়ায় ঐ অর্থে তাহাকে 'প্রকরণ' বলা যায়। সেই 'প্রকরণ' উভয় পক্ষেই সম বা তুল্য বলিয়া গৃহীত হইলে তখন সেই উভয় হেতুকে ঐ অর্থেও 'প্রকরণসম' বলা যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও পরে মহর্ষিসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"যদ্বা প্রকৃষ্টং করণং লিঙ্গং পরামর্শো বা, কো হেতুরনয়োঃ সাধক এতয়োঃ কঃ পরামর্শঃ প্রমেতি বা যত্র জিজ্ঞাসা ভবতীত্যর্থঃ।"

কিন্তু উদয়নাচার্য্যের পরে মিথিলার সোন্দড় উপাধ্যায় ন্যায়শাস্ত্রে নব্যভাবে সূক্ষ্ম বিচার করিয়া 'সৎপ্রতিপক্ষ'স্থলে সংশয়াত্মক অনুমিতিই স্বীকার করেন, ইহা 'দীধিতি'র টীকাকার জগদীশ প্রভৃতির কথার দ্বারা জানা যায়। আর **রত্নকোষ** নামক মহাগ্রন্থকার পৃথ্বীধর আচার্য্য সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা উহাই সমর্থন করেন। এবং উহা পরে 'রত্নকোষ'কারের মত বলিয়াই প্রসিদ্ধ হয়। তাই পরে গঙ্গেশ উপাধ্যায় **সৎপ্রতিপক্ষ** গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"রত্নকোষকারস্তু সৎপ্রতি-পক্ষাভ্যাং (হেতুভ্যাং) প্রত্যেকং স্বসাধ্যানুমিতিঃ সংশয়রূপা জায়তে, বিরুদ্ধোভয়সামগ্র্যাঃ সংশয়জনকত্বাৎ। সংশয়দ্বারা অস্য দূষকত্বং" ইত্যাদি। গঙ্গেশ পরে উক্ত মতের যুক্তিরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।*

* "দীধিতি"কার রঘুনাথশিরোমণি "রত্নকোষকৃতাময়মভিপ্রায়ঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা রত্নকোষকারের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। টীকাকার জগদীশ প্রভৃতি উক্ত বিষয়ে আরও সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন। মূলগ্রন্থ পাঠ না করিলে তাহা বুঝা যায় না। 'রত্নকোষ'কারের আরও অনেক বিশিষ্ট মত আছে। সে বিষয়েও পরে বহু সূক্ষ্ম বিচার হইয়াছে। নবদ্বীপের হরিরাম তর্কবাগীশ ও গদাধর ভট্টাচার্য্যের "রত্নকোষমতবিচার" ও "রত্নকোষকারবাদরহস্য" প্রভৃতি গ্রন্থও আছে। কিন্তু উক্ত রত্নকোষাদি গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই।

কিন্তু তিনি পরে উক্ত মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে কোন ধর্ম্মীতে সাধ্যধর্ম্মের অভাব নিশ্চয় হইলে তাহা যেমন সেই ধর্ম্মীতে সেই সাধ্যবত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়, তদ্রূপ সেই ধর্ম্মীতে সেই সাধ্যধর্ম্মের অভাবের ব্যাপ্য কোন ধর্ম্মের অর্থাৎ যে ধর্ম্ম থাকিলে সেখানে সেই সাধ্যধর্ম্মের অভাব অবশ্য থাকে, সেই ধর্ম্মের নিশ্চয় হইলে তাহাও সেই ধর্ম্মীতে সেই সাধ্যবত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়, ইহা যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। সুতরাং সৎপ্রতিপক্ষ হেতুদ্বয়ের পরামর্শ হইলে তজ্জন্য উক্তরূপ সংশয়াত্মক অনুমিতি হইতেই পারে না। কারণ, সেই স্থলে দ্বিতীয় হেতুর যে পরামর্শরূপ জ্ঞান জন্মে, তাহা মধ্যস্থগণের সেই ধর্ম্মীতে সাধ্য-ধর্ম্মের অভাবের ব্যাপ্যধর্ম্মের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। সুতরাং তাহা সেই ধর্ম্মীতে সাধ্যবত্ত্বের সংশয়াত্মক জ্ঞানেরও প্রতিবন্ধক হইবে। অবশ্য 'রত্নকোষ'কারের পক্ষ সমর্থনেও বহু কথা আছে। কিন্তু গঙ্গেশ উপাধ্যায় তাহা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতেও মধ্যস্থগণের সৎপ্রতিপক্ষ হেতুদ্বয়ের পরামর্শরূপ জ্ঞান জন্মিলে পরস্পর প্রতিবন্ধবশতঃ কোন পক্ষেরই অনুমিতিই জন্মিতে পারে না। তাই তিনি বলিয়াছেন,—'পরস্পরপ্রতিবন্ধেনানুমিতেরেবানুৎপত্তেঃ।' অন্যান্য কথা পরে ব্যক্ত হইবে॥ ৭॥

সূত্র। সাধ্যাবিশিষ্টঃ সাধ্যত্বাৎ সাধ্যসমঃ ॥ ৮ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—সাধ্যত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ অসিদ্ধত্বপ্রযুক্ত সাধ্য পদার্থের সহিত অবশিষ্ট 'সাধ্যসম' অর্থাৎ যাহা সাধ্য পদার্থের তুল্য, তাহা 'সাধ্যসম' নামক হেত্বাভাস।

ভাষ্য। দ্রব্যং ছায়েতি সাধ্যং, গতিমত্ত্বাদিতি হেতুঃ সাধ্যেনাবিশিষ্টঃ সাধনীয়ত্বাৎ সাধ্যসমঃ। অয়মপ্যসিদ্ধত্বাৎ সাধ্যবৎ প্রজ্ঞাপয়িতব্যঃ। সাধ্যং তাবদেতৎ—কিং পুরুষবচ্ছায়াঽপি গচ্ছতি ? আহোস্বিদাবরকদ্রব্যে সংসর্পতি আবরণ-সন্তানাদসন্নিধিসন্তানোঽয়ং তেজসো গৃহ্যত ইতি। সর্পতা খলু দ্রব্যেণ যো যস্তেজোভাগ আব্রিয়তে, তস্য তস্যাসন্নিধিরেবা-বিচ্ছিন্নো গৃহ্যত ইতি। আবরণন্তু প্রাপ্তি-প্রতিষেধঃ।

অনুবাদ—'দ্রব্যং ছায়া' এইরূপ সাধ্য অর্থাৎ সাধ্য নির্দ্দেশ (প্রতিজ্ঞা), 'গতিমত্ত্বাৎ' এইরূপ হেতু (হেতুবাক্য) অর্থাৎ উক্তরূপ প্রতিজ্ঞা ও হেতুবাক্যের প্রয়োগ হইলে সেই স্থলে উক্ত গতিমত্ত্বরূপ হেতু সাধনীয়ত্বপ্রযুক্ত সাধ্য ধর্ম্মের সহিত অবিশিষ্ট হওয়ায় 'সাধ্যসম', (কারণ) ইহাও অসিদ্ধত্বপ্রযুক্ত সাধ্যধর্ম্মের ন্যায় বোধনীয়, (তাৎপর্য্য) ইহা সাধ্য,—পুরুষের ন্যায় ছায়াও কি গমন করে অথবা আবরক দ্রব্য গমন করিলে অর্থাৎ আলোকের আচ্ছাদক মনুষ্যাদির গমনকালের আবরণসন্তানপ্রযুক্ত অর্থাৎ সেই মনুষ্যাদি কর্ত্তৃক আবৃত সেই সমস্ত আলোকবিশেষের আবরণসমূহপ্রযুক্ত, ইহা আলোকের অসন্নিধিসমূহই উপলব্ধ হয়। (অর্থাৎ) যে দ্রব্য গমন করিতেছে, সেই দ্রব্যকর্ত্তৃক যে যে আলোকাংশ আবৃত হয়, সেই সেই আলোকাংশের অবিচ্ছিন্ন অসন্নিধিই অর্থাৎ সংযোগাভাবই কি প্রত্যক্ষ হয়? আবরণ কিন্তু প্রাপ্তির (সংযোগের) প্রতিষেধ অর্থাৎ আবরক দ্রব্যকর্ত্তৃক ভূমিতে সেই সমস্ত আলোকের সংযোগের প্রতিঘাতই আলোকের আবরণ।

টিপ্পনী—চতুর্থপ্রকার হেত্বাভাসের নাম **সাধ্যসম**। মহর্ষি এই সূত্রে 'সাধ্যাবিশিষ্টঃ' এই পদের দ্বারা উহার লক্ষণ বলিয়াছেন যে, যে পদার্থ সাধ্যধর্ম্মের সহিত অবশিষ্ট বা তুল্য, তাহা 'সাধ্যসম' হেত্বাভাস। সাধ্যধর্ম্মের সহিত অবিশিষ্ট কেন হইবে? তাই বলিয়াছেন,—'সাধ্যত্বাৎ।' তাৎপর্য্য এই যে, প্রমাণসিদ্ধ পদার্থবিশেষই কোন সাধ্যধর্ম্মের সাধক হেতু হইতে পারে। কিন্তু বাদীর সাধ্যধর্ম্মের ন্যায় সেই হেতুও যদি পূর্ব্বে অসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই হেতুও প্রমাণ দ্বারা সাধনীয়। সুতরাং সাধনীয়ত্বপ্রযুক্ত সেই হেতু সাধ্যধর্ম্মের তুল্য হওয়ায় উহা 'সাধ্যসম' হেত্বাভাস। ভাষ্যকার উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—"দ্রব্যং ছায়েতি সাধ্যং, গতিমত্ত্বাদিতি হেতুঃ।" ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, ছায়াতে দ্রব্যত্ব সাধন করিতে গতিমত্ত্ব হেতু বলিলে ঐ হেতু 'সাধ্যসম' হেত্বাভাস। কারণ, প্রতিবাদীর মতে ছায়াতে গতিমত্ত্ব অসিদ্ধ হওয়ায় উহাও সাধ্যের ন্যায় সাধনীয়। অর্থাৎ গমনকারী পুরুষের ন্যায় তাহার পশ্চাতে ছায়াও কি গমন করে? অথবা সেই মনুষ্যাদি কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত আলোকসমূহের যে অবিচ্ছিন্ন অসন্নিধি অর্থাৎ ভূমিতে তাহার অসংযোগ বা অভাব, তাহারই প্রত্যক্ষ হয় অর্থাৎ তাহারই নাম ছায়া, ইহা সাধনীয়। কারণ, প্রতিবাদীর মতে আলোকবিশেষের অভাবই ছায়া। উহাতে বস্তুতঃ গতিক্রিয়া নাই। কিন্তু

গতিমত্ত্বের ভ্রম হইয়া থাকে। সুতরাং উহা ছায়াতে অসিদ্ধ হওয়ায় দ্রব্যত্বের সাধক হইতে পারে না। 'কিরণাবলী' টীকায় উদয়নাচার্য্যও ছায়ার অভাবত্ব সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন,—"তস্মাদাবরকদ্রব্যে গচ্ছতি যত্র যত্র তেজসোঽসন্নিধিস্তত্র তত্র ছায়াগ্রহণাদন্যদেশতানিবন্ধনো গতিভ্রম ইতি।" পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

'সাধ্যসম' হেত্বাভাসের প্রকারভেদে নানা মত।

ভাষ্যকারের পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণ পূর্ব্বোক্ত 'সাধ্যসম' হেত্বাভাসকে **অসিদ্ধ** নামে উল্লেখ করিয়া উহার নানা প্রকারভেদ ও তাহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন, "সোঽয়মসিদ্ধস্ত্রেধা"। তাঁহার মতে পূর্ব্বোক্ত স্থলে ছায়াতে গতিমত্ত্ব স্বরূপতঃই অসিদ্ধ হইলে উহা হইবে **স্বরূপাসিদ্ধ**। আর যদি উক্ত স্থলে বাদী বলেন যে, এক স্থানে দৃষ্ট দ্রব্যের অন্যত্র দর্শন, তাহার গতিক্রিয়া ব্যতীত সম্ভব হইতে পারে না। ছায়া যখন এক স্থানে দৃষ্ট হইয়া, পরে অন্যত্রও দৃষ্ট হয়, তখন সেই স্থানান্তরদৃষ্টত্ব হেতুর দ্বারা তাহাতে গতিমত্ত্ব সিদ্ধ হয়। কিন্তু ইহা বলিলে উক্ত স্থানান্তরদৃষ্টত্বরূপ হেতু **আশ্রয়াসিদ্ধ**। কারণ, উহার আশ্রয় দ্রব্যরূপ ছায়া ঐ অনুমানের পূর্ব্বে অসিদ্ধ। আর বাদী যদি ঐ হেতুকেই ছায়াতে দ্রব্যত্বের সাধক বলেন, তাহা হইলে উহা হইবে **অন্যথাসিদ্ধ**। কারণ, ছায়া দ্রব্যপদার্থ না হইলেও তাহাতে ঐ হেতু (স্থানান্তরদৃষ্টত্ব) সিদ্ধ হয়।

কিন্তু পরে ন্যায়শাস্ত্রে সূক্ষ্মবিচারক মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য 'ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থে (৩।৭) বলিয়াছেন যে, অনুমানের হেতুরূপে গৃহীত পদার্থে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতার নিশ্চয়রূপ যে সিদ্ধি অর্থাৎ যাহা সেই অনুমিতির চরম কারণ, তাহা সম্ভব না হইলে সেই হেতু অসিদ্ধিদোষবিশিষ্ট হওয়ায় 'অসিদ্ধ' নামে কথিত হয়। সেই অসিদ্ধি তিন প্রকারে সম্ভব হওয়ায় উহা 'অন্যথাসিদ্ধি', 'আশ্রয়াসিদ্ধি' ও 'স্বরূপাসিদ্ধি' নামে ত্রিবিধ। পরে নব্যনৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় হেতুর 'অসিদ্ধি' দোষকে 'আশ্রয়াসিদ্ধি', 'স্বরূপাসিদ্ধি' ও 'ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি' নামে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। অনুমানের ধর্ম্মিরূপ আশ্রয় অলীক হইলে সেই স্থলীয় হেতু আশ্রয়াসিদ্ধ। উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, যে ধর্ম্মীতে যাহা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ, তাহার সাধনের জন্য কোন হেতুর প্রয়োগ করিলে সেই হেতুও আশ্রয়াসিদ্ধ। কারণ, সেই ধর্ম্মীতে সেই

সিদ্ধ পদার্থের সংশয় বা সংশয়যোগ্যতা না থাকায় তাহা পক্ষই হয় না। তাহাতে 'পক্ষতা' না থাকায় পক্ষরূপে সেই আশ্রয় অসিদ্ধ। উক্তরূপ দ্বিতীয় প্রকার 'আশ্রয়াসিদ্ধি'ই **সিদ্ধসাধন** এই নামে কথিত হয়। উক্ত নামে পৃথক্ কোন হেত্বাভাস নাই। এখানে বলা আবশ্যক যে, প্রাচীন মতে অনুমানের ধর্ম্মীতে সাধ্যধর্ম্ম বিষয়ে সংশয়যোগ্যতাই অনুমানের অঙ্গ **পক্ষতা**। গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রথমে পক্ষতাবিচারে উক্ত মতের খণ্ডন করিলেও পরে তিনিও কিন্তু 'কেবলান্বয্যনুমান' গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"যদ্বা সংশয়যোগ্যতৈবানুমানাঙ্গং, সংশয়স্য তদানীং বিনাশাৎ" ইত্যাদি। অবশ্য অনুমানের ইচ্ছা হইলে অন্যান্য কারণ সত্বে প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থেরও অনুমান হয়, ইহা বাচস্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন। কিন্তু সেইরূপ 'স্বার্থানুমান' স্থলে 'সিদ্ধসাধন' দোষ নহে।

উদয়নাচার্য্যের মতে হেতুর সোপাধিত্বই প্রথমোক্ত 'অন্যথাসিদ্ধি'। অর্থাৎ যে হেতুতে কোন 'উপাধি' থাকে, সেই সোপাধি হেতুকে বলে 'অন্যথাসিদ্ধ' এবং উহারই নাম **অপ্রযোজক**। সুতরাং 'অপ্রযোজক' নামে পৃথক্ কোন হেত্বাভাস নাই। তাই উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন, "যত্রানুকূলতর্কো নাস্তি সোঽপ্রযোজকঃ। স চ দ্বিবিধঃ, শঙ্কিতোপাধির্নিশ্চিতোপাধিশ্চ।" তিনি অন্যত্র "অপ্রযোজকে"র লক্ষণ বলিয়াছেন,—

"সমাসমাবিনাভাবাবেকত্র স্তো যদা তদা।
সমেন যদি নো ব্যাপ্তস্তয়োর্হীনোঽপ্রয়োজকঃ ॥"*

পরে 'তর্কসংগ্রহে' অন্নং ভট্টও সোপাধি হেতুকে অসিদ্ধ হেত্বাভাসের অন্তর্গত বলিয়া উহার নাম বলিয়াছেন 'ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ'। তর্কভাষা গ্রন্থে কেশব মিশ্র বলিয়াছেন যে, হেতুতে ব্যাপ্তিনিশ্চায়ক প্রমাণের অভাবপ্রযুক্ত

---

* বরদরাজ প্রভৃতি অনেক গ্রন্থকার উক্ত কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। পরে "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" (চার্ব্বাকদর্শনে) মাধবাচার্য্যও বলিয়াছেন,—"সমাসমেত্যাদিনোক্তমাচার্য্যৈশ্চেতি।" কিন্তু সেখানে আধুনিক টীকাকার উক্ত কারিকার প্রকৃত ব্যাখ্যা করেন নাই। "তার্কিকরক্ষা"র টীকায় (২৩২ পৃঃ) মল্লিনাথ উহার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন,—"যদা একত্র সাধ্যে 'সমাসমাবিনাভাবৌ' (হেতূ) সাধ্যসমব্যাপ্তিকস্তদ্ভিন্নব্যাপ্তিকশ্চ যৌ হেতূ 'স্তঃ' সম্ভবতস্তদা তয়োর্মধ্যে যো 'হীনঃ' হীনব্যাপ্তিকো হেতুঃ সমেন সমব্যাপ্তিকেন অব্যাপ্তশ্চেৎ (দ্বি বিষমব্যাপ্তিকো হেতুঃ সমব্যাপ্তিকেন হেতুনা নো ব্যাপ্তঃ সমব্যাপ্তিকহেতোরব্যাপ্য ইতি যাবৎ) সোঽপ্রযোজক উচ্যতে। তথা চ সোপাধিকস্তৈব (বিষমব্যাপ্তহেতোঃ) অপ্রযোজকব্যপদেশ ইতি ভাবঃ।"

অথবা উপাধির সত্তাপ্রযুক্ত 'ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি' দোষ হয়। সুতরাং 'ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ' দ্বিবিধ। কিন্তু পরে অনেকে সোপাধি হেতুকে 'অনৈকান্তিক' বা 'সব্যভিচার'ই বলিয়াছেন। তদনুসারে 'ভাষাপরিচ্ছেদে' বিশ্বনাথও বলিয়াছেন, "ব্যভিচারস্যানুমানমুপাধেস্তু প্রয়োজনং।" পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে ক্রমে বহু সূক্ষ্ম বিচার ও নানা মতভেদ হইয়াছে। অতিবাহুল্যভয়ে উদাহরণের সহিত তাহা প্রকাশ করা এখানে সম্ভব নহে। অনুমান স্থলে হেতুর 'উপাধি'র লক্ষণ, উদাহরণ ও ব্যভিচার-শঙ্কার নিবর্ত্তক তর্ক এবং উক্ত বিষয়ে চার্ব্বাকের প্রতিবাদ ও তাহার খণ্ডনে বিস্তৃত বিচার দ্বিতীয় খণ্ডে ২১৮-৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের কথিত 'ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি' দোষের ব্যাখ্যা করিতে রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি হেতুপদার্থে অথবা সাধ্যপদার্থে কথিত কোন বিশেষণের অসিদ্ধিকেই 'ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি' বলিয়াছেন। যেমন 'কাঞ্চনময়ধূমাৎ' এইরূপে হেতুপ্রয়োগ করিলে ধূম হেতুতে কাঞ্চনময়ত্বরূপ বিশেষণ অসিদ্ধ। এইরূপ 'কাঞ্চনময়বহ্নিমান্' এইরূপ সাধ্যনির্দ্দেশ করিলে সাধ্যপদার্থ বহ্নিতে কাঞ্চনময়ত্বরূপ বিশেষণ অসিদ্ধ। সুতরাং উক্তরূপ স্থলে হেতুকে বলে 'ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ'। ব্যর্থ বিশেষণবিশিষ্ট হেতুও 'ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ' নামে কথিত হইয়াছে। ব্যোমশিবাচার্য্য প্রভৃতি উহাকে বলিয়াছেন **অসমর্থবিশেষণাসিদ্ধ।** উক্ত মতানুসারেই **'ভাষাপরিচ্ছেদে'** বিশ্বনাথ বলিয়াছেন,—"ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিরপরা নীলধূমাদিকে ভবেৎ।" অর্থাৎ 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ নীলধূমাৎ' এইরূপ প্রয়োগে ধূম হেতুতে নীলত্ব বিশেষণ ব্যর্থ। কারণ, ধূমত্বরূপেই ধূমে বহ্নির ব্যাপ্যত্ব সিদ্ধ। গুরুধর্ম্ম নীলধূমত্বরূপে উহা অসিদ্ধ। অতএব উক্তরূপ হেতু ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি ইহা স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রকৃত হেতুতে উক্তরূপ ব্যর্থ বিশেষণ প্রয়োগ সেই বক্তা পুরুষেরই দোষ। উহার দ্বারা সেই হেতু দুষ্ট হইতে পারে না। পরার্থানুমান স্থলে উহার দ্বারা সেই বাদীই নিগৃহীত হন। সুতরাং উহা পৃথক্ নিগ্রহস্থান, ইহাই স্বীকার্য্য।*

* পরে "অসিদ্ধিদীধিতি"র শেষে শিরোমণি বলিয়াছেন,…"চকারেণ পৃথগেব সমুচ্চিতং নিগ্রহস্থানং।" তাৎপর্য্য এই যে, ন্যায়দর্শনের সর্ব্বশেষ সূত্রে অনুক্ত সমুচ্চয়ার্থক 'চ' শব্দের দ্বারা উক্তরূপ পৃথক্ নিগ্রহস্থানই সমুচ্চিত হইয়াছে। টীকাকার জগদীশ উক্ত স্থলে শিরোমণির উক্তরূপ মতের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তিনি পূর্ব্বেও "বিশেষব্যাপ্তিদীধিতি"র টীকায় ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, "বস্তুতঃ স্বমতে (শিরোমণিমতে) নীলধূমত্বং ব্যাপ্তিরেব। তাদ্রূপ্যেণ হেতুপ্রয়োগে তু অধিকেনৈব নিগ্রহস্থানেন পুরুষো নিগৃহ্যত ইতি ভাবঃ।" অনেক অধ্যাপক উক্ত স্থলে গোতমোক্ত "অধিক" নামক নিগ্রহস্থানই বলিতেন। কিন্তু শিরোমণি তাহা বলেন নাই। তিনি উহাকে পৃথক্ নিগ্রহস্থানই বলিয়াছেন।

বৈশেষিক মতের ব্যাখ্যা করিতে প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন,—'তত্রা-সিদ্ধশ্চতুর্ব্বিধঃ।' তাঁহার মতে (১) 'উভয়াসিদ্ধ', (২) 'অন্যতরাসিদ্ধ', (৩) 'তদ্ভাবাসিদ্ধ' ও (৪) 'অনুমেয়াসিদ্ধ' নামে অসিদ্ধ হেত্বাভাস চতুর্ব্বিধ। অনুমানের ধর্ম্মীতে যে হেতু বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের মতেই অসিদ্ধ, তাহাকে বলে (১) উভয়াসিদ্ধ। আর যে হেতু কেবল প্রতিবাদীর মতে অসিদ্ধ, তাহাকে বলে (২) অন্যতরাসিদ্ধ।† আর ধূমত্বরূপে বাষ্পের ভ্রমাত্মক উপলব্ধি করিয়া, তাহাকে বহ্নির অনুমানে হেতু বলিলে তাহা হইবে (৩) তদ্ভাবাসিদ্ধ। কারণ, ধূমভাব বা ধূমত্বরূপে বাষ্প অসিদ্ধ। বাষ্প বস্তুতঃ ধূম নহে। আর যে হেতুর অনুমেয় ধর্ম্মী অর্থাৎ অনুমানের আশ্রয়ই অসিদ্ধ, সেই হেতুকে বলে (৪) 'অনুমেয়াসিদ্ধ'। প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন,—"অনুমেয়াসিদ্ধো যথা, পার্থিবং দ্রব্যং তমঃ কৃষ্ণরূপবত্ত্বাদিতি।" উক্ত স্থলে কৃষ্ণরূপবত্ত্ব হেতুর অনুমেয় বা আশ্রয়রূপে কথিত পার্থিব দ্রব্যরূপ অন্ধকার অসিদ্ধ অর্থাৎ অলীক। শ্রীধর ভট্ট ইহা বুঝাইতে নিজমতানুসারে বলিয়াছেন,—"তমো নাম দ্রব্যান্তরং নাস্তি, আরোপিতস্য কার্ষ্ণ্যমাত্রস্য প্রতীতেঃ।" শ্রীধর ভট্টের মতে আরোপিত নীল রূপই অন্ধকার।

অন্ধকার কি পদার্থ, এ বিষয়ে নানা মত ও বিচার।

প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় দার্শনিকগণের মধ্যে অন্ধকারের স্বরূপ বিষয়ে বহু বিচার ও নানা মতভেদ হইয়াছে। এখানে এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে তাহাও বক্তব্য। 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে'র **'ঔলূক্যদর্শনে'** মাধবাচার্য্য উক্ত বিষয়ে মতভেদ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,—"দ্রব্যং তম ইতি ভাট্টা বেদান্তিনশ্চ ভণন্তি। আরোপিতং নীলরূপমিতি শ্রীধরাচার্য্যাঃ। আলোকজ্ঞানাভাব ইতি

† বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি "স্বরূপাসিদ্ধ" হেতুকেই উভয়াসিদ্ধ ও অন্যতরাসিদ্ধ প্রভৃতি নামে বিভক্ত করিয়াছেন। ভাষ্যকারোক্ত "দ্রব্যং ছায়া গতিমত্ত্বাৎ" এই উদাহরণে গতিমত্ত্ব হেতু অন্যতরাসিদ্ধ। "শব্দোঽনিত্যশ্চাক্ষুষত্বাৎ" এইরূপ উদাহরণে চাক্ষুষত্ব হেতু উভয়াসিদ্ধ। কারণ, শব্দে চাক্ষুষত্ব উভয় মতেই অসিদ্ধ। বৌদ্ধসম্প্রদায়ও উক্তরূপ উদাহরণ বলিয়াছেন। 'ন্যায়সারে' ভাসর্ব্বজ্ঞ 'স্বরূপাসিদ্ধ', 'ব্যধিকরণাসিদ্ধ', 'বিশেষ্যাসিদ্ধ', 'বিশেষণাসিদ্ধ' ও 'ভাগাসিদ্ধ' প্রভৃতি নামে চতুর্দ্দশ প্রকার অসিদ্ধ বলিয়া তাহার উদাহরণ বলিয়াছেন। বৌদ্ধ এবং জৈন নৈয়ায়িকগণও বহুপ্রকার 'অসিদ্ধ' বলিয়াছেন। কিন্তু প্রশস্তপাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে শ্রীধর ভট্ট বলিয়াছেন,—"বিশেষণাসিদ্ধাদয়োঽন্যতরাসিদ্ধোভয়াসিদ্ধয়োরেবান্তর্ভবন্তীতি পৃথঙ্‌নোক্তাঃ।"

প্রাভাকরৈরেকদেশিনঃ। আলোকাভাব ইতি নৈয়ায়িকাদয়ঃ।" 'পঞ্চপাদিকা-বিবরণে' পরে কথিত হইয়াছে, "রূপদর্শনাভাবমাত্রমিত্যন্যে।" 'বিবরণপ্রমেয়-সংগ্রহে' উহা প্রভাকরমত বলিয়া কথিত হইয়াছে। কুমারিল ভট্টের মতে কণাদোক্ত পৃথিব্যাদি নব দ্রব্য, (১০) অন্ধকার ও (১১) শব্দ, এই একাদশ-প্রকার দ্রব্যবিভাগানুসারে অন্ধকারকে দশম দ্রব্য বলা যায়। তাই কথিত হইয়াছে,—"রূপবত্ত্বাৎ ক্রিয়াবত্ত্বাদ্দ্রব্যং তদ্দশমং তমঃ।।"* কিন্তু মীমাংসক মণ্ডন মিশ্রের 'বিধিবিবেক' গ্রন্থের 'ন্যায়কণিকা' টীকায় শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র মণ্ডনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে কুমারিল ভট্টের মতানু-সারেই বিচারপূর্ব্বক অন্ধকারের দ্রব্যত্ব সমর্থন করিয়া, উপসংহারে বলিয়াছেন, —"তস্মাৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধমসতি বাধকে দ্রব্যান্তরমেকাদশং তমো নবগুণঞ্চেতি সিদ্ধম্।" (৭৯ পৃঃ)।

বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের মতেও অন্ধকার দ্রব্যপদার্থ। অন্ধকার অভাবপদার্থ হইলে শারীরক ভাষ্যের প্রারম্ভে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের "তমঃপ্রকাশবদ্বিরুদ্ধ-স্বভাবয়োঃ" এই বাক্যে অন্ধকার ও আলোকের দৃষ্টান্তত্ব উপপন্ন হয় না। তাই 'পঞ্চপাদিকাবিবরণে' বেদান্তাচার্য্য প্রকাশাত্মযতি ভট্টমতানুসারে অন্ধকারের দ্রব্যত্ব সমর্থন করিয়াই উহার উপপাদন করিয়াছেন। পরে 'বিবরণপ্রমেয়-সংগ্রহে' বিদ্যারণ্য মুনি উহাই সমর্থন করিতে বহু বিচার করিয়াছেন। পরে অদ্বৈতসিদ্ধির প্রথম পরিচ্ছেদে (৩৪০ পৃঃ) মধুসূদন সরস্বতীও "সামান্যলক্ষণা-প্রত্যাসত্তি"র খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন,—"অস্মন্মতে তমসো ভাবান্তরত্বাৎ।" সেখানে "লঘুচন্দ্রিকা" টীকাকার নব্য মহানৈয়ায়িক গৌড়ব্রহ্মানন্দ অন্ধকারের দ্রব্যত্ব সমর্থন করিতেই কোন বিষয়ে নব্য ন্যায়ের রীতিতেও সূক্ষ্ম বিচার

* কুমারিল ভট্টের গ্রন্থে উক্তরূপ শ্লোক দেখিতে পাই না। পরন্তু কুমারিল-মতের ব্যাখ্যাতা নারায়ণ পণ্ডিত "মানমেয়োদয়"গ্রন্থে পরে বলিয়াছেন,—"পৃথিবীগুণস্তম ইতি কৌমারিলেষেব কেচিন্মানকিরণাবলীকারাদয়ঃ প্রাহুঃ। তদপ্যনুমন্যামহে। অতস্তমো দ্রব্যং গুণো বা। গুণপক্ষে নব দ্রব্যাণি।" কিন্তু কুমারিলের সম্প্রদায়ের মধ্যে 'মানকিরণাবলী'কার প্রভৃতি মীমাংসকগণের উক্তরূপ মতান্তর-ব্যাখ্যার মূল কি? এবং নব্য মীমাংসক নারায়ণ পণ্ডিতও কোন বিচার না করিয়া উক্ত মতেরও অনুমোদন করিয়াছেন কেন, ইহা চিন্তনীয়। বস্তুতঃ কুমারিল ভট্টের মতে দ্রব্যপদার্থ যে, একাদশপ্রকার, ইহাই সুপ্রসিদ্ধ। পরন্তু অনেকে নবদ্রব্যবাদী বৈশেষিকসম্প্রদায়ের মত খণ্ডনার্থই অন্ধকারকে দশম দ্রব্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদান্তিক আনন্দজ্ঞানও তৎকৃত 'তর্কসংগ্রহে' বলিয়াছেন,—"দ্রব্যে নবত্বনির্ব্বন্ধো নৈব সিদ্ধিমুপাশ্নুতে। তমসো দশমস্যাপি সংসিদ্ধের্মানযুক্তিতঃ।।"

করিয়াছেন। এইরূপ আরও অনেক মীমাংসক ও বৈদান্তিক গ্রন্থকার এবং জৈন গ্রন্থকারও অন্ধকারের দ্রব্যত্বই সমর্থন করিয়াছেন।†

উক্তমতবাদী মীমাংসক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রথম কথা এই যে, অন্ধকারে নীল রূপ এবং গতিক্রিয়া ও হ্রাস বৃদ্ধি, দূরত্ব নিকটত্ব প্রভৃতি বহু দ্রব্যধর্ম্মই দৃষ্ট হয়। সুতরাং ঐ সমস্ত হেতুর দ্বারা অন্ধকারের দ্রব্যত্বই অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ হয়। অভাব পদার্থে যে, রূপ এবং ক্রিয়া থাকে না, ইহা প্রতিবাদিগণেরও স্বীকৃত। অন্ধকারে বস্তুতঃ কোন রূপ বা কোন ক্রিয়া নাই, কিন্তু তাহাতে রূপবত্তা ও ক্রিয়াবত্তার ভ্রম হইয়া থাকে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, নীল অন্ধকারের কোন সময়ে স্থানান্তরে গমন সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তৎকালে 'নীলং তমশ্চলতি' অর্থাৎ নীলরূপবিশিষ্ট অন্ধকার চলিয়া যাইতেছে, এইরূপে যে প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাকে ভ্রম বলার কোন হেতু নাই। জ্ঞানের বাধক নিশ্চয় ব্যতীত তাহার ভ্রমত্ব নিশ্চয় করা যায় না। কিন্তু অন্ধকারে রূপাভাবের নিশ্চায়ক কোন প্রমাণ নাই। অন্ধকারে কোন স্পর্শ না থাকায় স্পর্শাভাব হেতুর দ্বারা তাহাতে রূপাভাব অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ হয়, ইহাও বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে বায়ুতে রূপ না থাকায় রূপাভাব হেতুর দ্বারা তাহাতেও স্পর্শাভাব কেন সিদ্ধ হইবে না? সুতরাং যেমন স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যমাত্রই রূপবিশিষ্ট, এইরূপ নিয়ম বা ব্যাপ্তি নাই, তদ্রূপ রূপবিশিষ্ট, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করা যায় না। অতএব অন্ধকারে স্পর্শ না থাকিলেও রূপ থাকিতে পারে।

পরন্তু অন্ধকার যে অভাবপদার্থ, ইহা বলাই যায় না। কারণ, ভাবরূপেই উহার বোধ হইয়া থাকে, অভাবরূপে উহার বোধ হয় না। অন্ধকারের বোধক বাক্যেও 'নঞ্' শব্দের প্রয়োগ হয় না। এইরূপ ছায়ারও অভাবরূপে বোধ হয় না। আর আলোকময় রত্নবিশেষের নিকটেও সময়বিশেষে ছায়ার উদ্ভব

† শ্বেতাম্বর জৈনাচার্য্য বাদিদেব সূরিকৃত "প্রমাণনয়তত্ত্বালোকালঙ্কার"গ্রন্থের টীকায় (৬৪-৭২ পৃঃ) জৈন মহাদার্শনিক রত্নপ্রভাচার্য্য উক্ত মত সমর্থন করিতে যে ভাবে বিচার করিয়াছেন, তাহা অন্যত্র দেখিতে পাই না। তিনি ন্যায়ভূষণ ও শ্রীধর ভট্টের সন্দর্ভও উদ্ধৃত করিয়া তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। ছায়া ও অন্ধকারের ভেদ প্রকাশ করিয়া তিনি ঐ উভয়েরই দ্রব্যত্ব সমর্থনপূর্ব্বক উপসংহারে বলিয়াছেন,—"ইতি সিদ্ধে তমশ্ছায়ে দ্রব্যে।" কিন্তু তিনি শ্রীধর ভট্টের কথায় উত্তরে অন্ধকারের স্পর্শও স্বীকার করিয়া উহা সমর্থন করিতে অসংকোচে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা অতি সাহসেরই পরিচায়ক। মীমাংসক প্রভৃতিও নিজমত সমর্থন করিতে অন্ধকারের স্পর্শ স্বীকার করিতে পারেন নাই।

দেখা যায়। সুতরাং সেই ছায়াকে আলোকের অভাব বলাই যায় না। পরন্তু স্মৃতিশাস্ত্রে কোন ছায়ার শুচিত্ব এবং কোন ছায়ার অশুচিত্বও কথিত হওয়ায় উহা যে, দ্রব্যপদার্থ, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ। কারণ, শুচিত্ব ও অশুচিত্ব মূর্ত্ত দ্রব্যেরই ধর্ম্ম। পরন্তু অভাবপদার্থের জ্ঞানে তৎপূর্ব্বে সেই অভাবের প্রতিযোগী পদার্থের স্মরণ আবশ্যক। কারণ, কোন অভাবের জ্ঞানে সেই অভাবের প্রতিযোগী পদার্থ সেই অভাবে বিশেষণরূপে বিষয় হইয়া থাকে। যেমন ঘটাভাবের জ্ঞানে সেই অভাবাংশে ঘটও বিষয় হয়। নচেৎ ঘটাভাবত্বরূপে তাহার জ্ঞান হইতে পারে না। এইরূপ আলোকাভাবই অন্ধকার হইলে তাহার জ্ঞানে সেই অভাবের প্রতিযোগী পদার্থ আলোকও ঐ অভাবে বিশেষণরূপে বিষয় হইবে। কিন্তু অন্ধকারের প্রত্যক্ষের পূর্ব্বে সর্ব্বত্রই আলোকের স্মরণ হয় না। অতএব অন্ধকার অভাবপদার্থ নহে, কিন্তু ভাবপদার্থই।

'ন্যায়কন্দলী'কার শ্রীধর ভট্টও পূর্ব্বোক্ত যুক্তির ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন,—"তস্মান্নাভাবোঽয়ং।" কিন্তু তিনি অন্ধকারের দ্রব্যত্বপক্ষেরও প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন,—"তস্মাদ্রূপবিশেষোঽয়মত্যন্তং তেজোঽভাবে সতি সর্ব্বতঃ সমারোপিতস্তম ইতি প্রতীয়তে।" অর্থাৎ যে স্থানে বিশিষ্ট আলোকের অভাব থাকে, সেই স্থানে সর্ব্বতঃ পার্থিব গুণ নীল রূপের আরোপ বা ভ্রম হয়। সেই আরোপিত নীল রূপই অন্ধকার। কোন কোন মীমাংসকের মতেও যে, অন্ধকার দ্রব্যপদার্থ নহে, কিন্তু পার্থিব গুণবিশেষ, ইহা 'মানমেয়োদয়' গ্রন্থে মীমাংসক নারায়ণ পণ্ডিতও বলিয়া গিয়াছেন। মনে হয়, শ্রীধর ভট্টও সেই মতের যুক্তি গ্রহণ করিয়াই পরে উক্তরূপ সমাধান করিয়াছেন। তাই তিনি উহা সমর্থন করিতে পরে "ন চ ভাসামভাবস্য তমস্ত্বং বৃদ্ধসম্মতং"* ইত্যাদি প্রাচীন শ্লোকদ্বয়ও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বস্তুতঃ "কিরণাবলী" টীকাকার উদয়নাচার্য্যও অন্ধকার বিষয়ে মীমাংসক

---

* কিন্তু শ্রীধর ভট্টের পূর্ব্বে বাচস্পতি মিশ্র মীমাংসকমতে অন্ধকারের দ্রব্যত্ব সমর্থন করিতেই 'ন্যায়কণিকা' টীকায় (৭৬ পৃঃ) বার্ত্তিককারের উক্তি বলিয়া "ননু নাভাবমাত্রস্য তমস্ত্বং বৃদ্ধসম্মতং। ছায়ায়াঃ কার্ষ্ণ্যমিত্যেবং পুরাণে ভূগুণশ্রুতেঃ॥" এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"ভূগুণসা কার্ষ্ণ্যস্য, ছায়ায়া দ্রব্যান্তরশ্রুতেরিত্যর্থঃ।" কিন্তু শ্রীধর ভট্ট উক্তরূপ ব্যাখ্যার কোন সমালোচনা বা উল্লেখ করেন নাই। কুমারিলের "শ্লোকবার্ত্তিকে"ও এখন উক্তরূপ শ্লোক দেখিতে পাই না। আর উক্তরূপ মীমাংসক শ্লোকের দ্বারা দ্বিবিধ মতের ব্যাখ্যার মূল কি, ইহাও চিন্তনীয়।

মতের খণ্ডনপ্রসঙ্গেই বলিয়াছেন,—'পার্থিবমেবেদমারোপিতং রূপমিত্যপি ন সমীচীনং।" সুতরাং তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই উক্তরূপ মীমাংসক মতান্তরও যে, প্রসিদ্ধ ছিল, ইহা বুঝা যায়। উদয়নাচার্য্যের পরে 'ন্যায়লীলাবতী' গ্রন্থে বল্লভাচার্য্যও বিচারপূর্ব্বক উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। পরে কিরণাবলী-ভাস্কর ও প্রশস্তপাদভাষ্যের সেতু টীকাকার পদ্মনাভ মিশ্র 'কন্দলীকার'-মত বলিয়াই উক্ত মতের উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, তৎকালে উহা কন্দলীকার-মত বলিয়াই প্রসিদ্ধ। পরে অন্যান্য অনেক গ্রন্থেও কন্দলীকারের মত বলিয়াই উহার উল্লেখ হইয়াছে।† অনেকে বলিয়াছেন যে, "নীলং তমো নতু নীলিমা" অর্থাৎ অন্ধকার নীল রূপ নহে, এইরূপ প্রতীতি হওয়ায় উক্ত মতের গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু নব্য মহানৈয়ায়িক পদ্মনাভ মিশ্র 'কিরণাবলী'কার উদয়নাচার্য্যের যুক্তির ব্যাখ্যা করিয়া এবং নিজেও নব্যভাবে বহু সূক্ষ্ম বিচার করিয়া উক্ত মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। সংক্ষেপে সে সমস্ত বিচার ব্যক্ত করা যায় না। অনুসন্ধিৎসু পদ্মনাভের গ্রন্থ অবশ্য পাঠ করিবেন। বস্তুতঃ বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদের…"ভাভাবস্তমঃ" এই উক্তি দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁহার মতে 'ভা' অর্থাৎ মহাপ্রভারূপ আলোকের অভাবই অন্ধকার। শ্রীধর ভট্ট

---

† প্রশস্তপাদভাষ্যের "সূক্তি" টীকায় 'কন্দলী'কারের কোন মতের উল্লেখ নাই, ইহা কাশী চৌখাম্বা হইতে প্রকাশিত "সূক্তি" টীকাদিসমন্বিত পুস্তকের ভূমিকায় (৪র্থ পৃঃ) লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ পুস্তকে প্রকাশিত "সূক্তি" টীকাতেও (অন্ধকারের স্বরূপ বিষয়ে মতভেদ বর্ণনে) মুদ্রিত হইয়াছে,—"বাধকং বিনা উক্তপ্রতীতের্ভ্রমত্বাযোগান্নীলরূপবত্ত্বেন তমঃ পৃথিব্যেব; তস্য চালোকাভাবব্যঙ্গ্যত্বান্ন প্রকাশে প্রত্যক্ষমিতি তু কন্দলীকৃতঃ।" কলিকাতা হইতে প্রকাশিত "সূক্তি" টীকার নবীন টীকাতেও (১৩ পৃঃ) উক্ত সন্দর্ভের ব্যাখ্যায় কন্দলীকারের মতে অন্ধকারের পৃথিবীত্বই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু ইহা একেবারেই অসত্য। প্রশস্তপাদও যে, পার্থিব দ্রব্যরূপ অন্ধকার অসিদ্ধ বলিয়াছেন, ইহাও পূর্ব্বে (৪১৮ পৃঃ) বলিয়াছি। কিন্তু "সূক্তি" টীকাকার জগদীশ ভট্টাচার্য্যেরও উক্তরূপ মহাভ্রমের কোন কারণ বুঝি না। আর "সূক্তি" টীকায় উক্তরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াও কেন যে, নব্য নৈয়ায়িক গুরু জগদীশ তর্কালঙ্কারকেই "সূক্তি" টীকাকার বলা হইয়াছে, ইহাও বুঝিতে পারি না। আরও দেখা আবশ্যক, "সূক্তি" টীকাকার জগদীশ গুণ-বিভাগের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "বেগস্থিতিস্থাপক-ভাবনাসু অনুগতসংস্কারত্বজাতের্নিষ্প্রমাণকত্বাৎ।" কিন্তু জগদীশ তর্কালঙ্কারের মতে সংস্কারত্বও গুণবিভাজক জাতিবিশেষ। তিনি "তর্কামৃত" গ্রন্থে রূপাদি চতুর্ব্বিংশতি গুণপদার্থের উল্লেখ করিয়া পরেই স্পষ্ট বলিয়াছেন,—"অত্র রূপত্বাদীনি সর্ব্বাণ্যেব জাতয়ঃ।" অতএব "সূক্তি" টীকাকার জগদীশ ভট্টাচার্য্য কোন্ জগদীশ, এ বিষয়ে পুনর্ব্বিচার আবশ্যক।

নিজমত রক্ষার্থ পরে কণাদের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় নিতান্ত কষ্টকল্পনা করিতেও বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু বৈশেষিক মতের ব্যাখ্যা করিতে কণাদের উক্ত সূত্রানুসারে উদয়নাচার্য্য, ব্যোমশিবাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য, পদ্মনাভ মিশ্র ও শঙ্কর মিশ্র প্রভৃতি আলোকাভাবই অন্ধকার, এই মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। **সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে** মাধবাচার্য্যও বৈশেষিক মতের বর্ণন করিতে অন্ধকার বিষয়ে উদয়নাচার্যের 'কিরণাবলী'র কথাই উদ্ধৃত করিয়া উক্ত মতই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। কারণ, উক্তরূপ বৈশেষিক মতই বহুসম্মত ও প্রতিষ্ঠিত।

উক্ত মতবাদী ন্যায়-বৈশেষিকসম্প্রদায়ের প্রথম কথা এই যে, আলোক ও অন্ধকারের বিরোধ সর্ব্বসম্মত। কিন্তু সেই বিরোধ কিরূপ, ইহা বিচার্য্য। দ্রব্যপদার্থদ্বয়ের নাশ্যনাশকভাবরূপ বিরোধ বলিলে অন্ধকার নামক দ্রব্যান্তর-কল্পনায় মহাগৌরব হয়। অতএব উক্ত উভয়ের ভাবাভাবাত্মকত্বরূপ বিরোধই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, উহার মধ্যে একটি ভাবপদার্থ এবং অপরটি তাহার অভাবপদার্থ। কিন্তু আলোকে উজ্জ্বল শুক্ল রূপ এবং স্পর্শবিশেষ উভয় মতেই প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় উহাকে অভাবপদার্থ বলা যায় না। অতএব অন্ধকারের অভাব আলোক নহে। কিন্তু যাদৃশ আলোক না থাকিলে সেখানে অন্ধকারের উপলব্ধি হয়, তাদৃশ আলোকের সামান্যাভাবই সেখানে অন্ধকারপদার্থ, ইহাই স্বীকার্য্য।* এইরূপ বহু আলোক থাকিলেও তন্মধ্যে যে স্থানে যে সমস্ত আলোকাংশ আবৃত হওয়ায় তাহার সংযোগ সম্ভব হয় না, সেই স্থানে সেই সমস্ত আলোকাংশের অভাবই 'ছায়া' নামে কথিত হয় এবং সেই

---

* কিরূপ আলোকাভাব অন্ধকারপদার্থ, এ বিষয়ে পরে নব্য নৈয়ায়িকগণ বহু সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন। 'সামান্যলক্ষণাপ্রত্যাসত্তি'বাদী পদ্মনাভ মিশ্র "সেতু" টীকায় (৪৩ পৃঃ) বলিয়াছেন,—"প্রৌঢ়প্রকাশকতেজস্ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্বাবচ্ছিন্নস্যাভাবস্য তমস্ত্বাৎ।" পরে তিনি "অস্মৎপিতৃচরণারাধ্যাঃ শ্রীপ্রগল্‌ভভট্টাচার্য্যাস্তু" বলিয়া সগৌরবে তাঁহার পিতা বলভদ্র মিশ্রের অধ্যাপক প্রগল্‌ভ ভট্টাচার্য্যের মতেরও উল্লেখ করিয়াছেন। "তর্কসংগ্রহে"র নীলকণ্ঠী টীকা ও 'ভাস্করোদয়া ব্যাখ্যা'তেও পূর্ব্বোক্ত মতই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু প্রগল্‌ভ ভট্টাচার্য্যের পরে 'দীধিতি' টীকাকার রঘুনাথ শিরোমণি "সামান্যলক্ষণা"র খণ্ডন করিতে নিজমতানুসারে বলিয়াছেন, "অন্ধকারস্তু তেজোবিশেষসামান্যাভাবো নাভাবসমুদায়ঃ" ইত্যাদি। টীকাকার জগদীশ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"তেজোবিশেষেতি, মহাপ্রভাত্বাবচ্ছিন্নাভাব ইত্যর্থঃ।" পরে তিনি তাঁহার অধ্যাপক রামভদ্র সার্ব্বভৌমের মতানুসারে উহার অন্য ব্যাখ্যাও বলিয়াছেন। মূল গ্রন্থ পাঠ না করিলে ঐ সমস্ত কথা বুঝা যায় না। "সামান্যলক্ষণাদীধিতি—জাগদীশী" (চৌখাম্বা সং) ৪৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ছায়াবিশিষ্ট স্থানবিশেষের সহিত মনুষ্যাদিদেহের সংযোগই শাস্ত্রে 'ছায়াস্পর্শ' বলিয়া কথিত হইয়াছে। শাস্ত্রোক্ত ঐরূপ ঔপচারিক বাক্য দ্বারা অথবা কোন কবিবর্ণন দ্বারা ছায়া ও অন্ধকারের দ্রব্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না।

আর রূপবত্তা ও গতিমত্তাদি হেতুর দ্বারাও অন্ধকারের দ্রব্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, অন্ধকারে ঐ সমস্ত হেতু উভয়বাদিসিদ্ধ না হওয়ায় উহা প্রকৃত হেতু হইতে পারে না। উহা 'সাধ্যসম' হেত্বাভাস। অন্ধকারে রূপবত্তাদিবুদ্ধি যে ভ্রমাত্মক নহে, এ বিষয়েও কোন প্রমাণ নাই। "নীলং নভঃ" এইরূপে আকাশেও নীল রূপের ভ্রম জন্মে এবং দ্রুতগামী যানে আরূঢ় ব্যক্তিগণের নদীতীরাদিস্থ বৃক্ষাদিতেও গতিভ্রম জন্মে। এইরূপ বহু বিষয়ে বিজ্ঞ মানবগণেরও এমন বহু ভ্রম জন্মিতেছে, যাহার ভ্রমত্বনিশ্চয় সেই জন্মেও তাঁহাদিগের সম্ভব হয় না। এইরূপ বহু ব্যক্তির ভাবরূপে অন্ধকারের প্রত্যক্ষ জন্মিলেও তদ্দ্বারাও অন্ধকারের ভাবত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, সেই প্রত্যক্ষ যে যথার্থ, ইহা উভয়বাদিসম্মত নহে। উক্ত মতে পূর্ব্বোক্ত আলোক-ভাবত্বরূপে অন্ধকারের প্রত্যক্ষই যথার্থ প্রত্যক্ষ। উক্তরূপে যে, কাহারই অন্ধকারের প্রত্যক্ষ জন্মে না, ইহাও শপথ করিয়া বলা যায় না। অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলে অনেকের পূর্ব্বদৃষ্ট আলোকবিশেষের স্মরণ হওয়ায় **এই গৃহে এখন আলোক নাই,** এইরূপে সেই গৃহস্থিত অন্ধকারেরই প্রত্যক্ষ জন্মে এবং তখন **অত্র আলোকো নাস্তি** এইরূপ 'নঞ্'শব্দযুক্ত বাক্য-প্রয়োগও হয়। **ন্যায়লীলাবতী** গ্রন্থে (৪৪৬ পৃঃ) বল্লভাচার্য্যও পরে বলিয়াছেন,—"কদাচিত্তু আলোকাভাবোঽধুনা ইত্যনেনাকারেণ প্রতীয়ত ইতি।"*

---

* 'কিরণাবলী' টীকায় উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন,—"বিধিমুখস্তু প্রত্যয়োঽসিদ্ধঃ।" অর্থাৎ অন্ধকারের যে বিধিমুখ বোধই জন্মে, ইহা প্রমাণসিদ্ধ হয় না। কারণ, উক্ত "বিধিমুখ" শব্দের কোন অর্থই সমর্থন করা যায় না। উদয়নাচার্য্য ইহা বুঝাইয়া অভাবপদার্থেও যে ভাবপদার্থের ধর্ম্মের আরোপ বা ভ্রম হইতে পারে, ইহাও যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। উক্ত মতে অন্ধকার অভাবপদার্থ হইলেও তাহাতে নীল রূপ ও গতিমত্তাদি ভাবধর্ম্মের ভ্রম হয়। উদয়নাচার্য্য "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" টীকায় অন্য ভাবে অন্ধকারে নীলাদিব্যবহারের উপপাদন করিয়াছেন। "ন্যায়লীলাবতী" গ্রন্থে (৪৪৫ পৃঃ) বল্লভাচার্য্য উদয়নের সেই কথারও উল্লেখ করিয়াছেন—"শুক্লাদিব্যাবৃত্তিনিবন্ধনস্তু নীলাদিব্যবহারঃ শষয়োরিব ব্যবহারো গৌড়ানাং। ভাবত্বেন বেদনমপ্যসিদ্ধমিত্যাদি তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধাবুদয়নঃ।" প্রাচীন কাল হইতেই গৌড় দেশবাসী পণ্ডিতগণেরও শ, ষ, স এই বর্ণত্রয়ের উচ্চারণবৈষম্য না থাকায় মৈথিল উদয়নাচার্য্য গৌড় দেশের উক্তরূপ চিরন্তন উচ্চারণব্যবহারকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক।

পরন্তু অন্ধকার যে, চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ইহা মীমাংসক প্রভৃতিরও স্বীকৃত। সর্পের নেত্রগোলকে ইন্দ্রিয়দ্বয়ের ন্যায় মনুষ্যাদির নেত্রগোলকেও বিজাতীয় অন্য একটী ইন্দ্রিয়ও থাকে, তদ্দ্বারাই তাহাদিগের অন্ধকারের প্রত্যক্ষ হয়, ইহা প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু আলোক ব্যতীতও যে, কোন ভাবপদার্থের লৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহার সর্ব্বসম্মত কোন দৃষ্টান্ত নাই। রাত্রিতে মণিবিশেষের প্রভার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষেও সেই প্রভারূপ আলোকবিশেষই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহকারী হয়। অতএব ভাবপদার্থের লৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে সর্ব্বত্র যে কোন সম্বন্ধে আলোকও যে সহকারী কারণ, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে অন্ধকারকে ভাবপদার্থ বলা যায় না। কিন্তু অন্ধকারের ভাবত্ববাদিগণ যে আলোকাভাবকে অন্ধকারের ব্যঞ্জকরূপে স্বীকার করিয়াছেন, তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে উহা যে, আলোকনিরপেক্ষ চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা হইলে "অয়মন্ধকারো ন ভাব আলোকনিরপেক্ষচক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্যত্বাৎ, আলোকাভাববৎ" এইরূপে অনুমানপ্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, প্রত্যক্ষদৃষ্ট সেই অন্ধকার অভাবপদার্থ। কিন্তু অভাবপদার্থ হইলেও আলোক দর্শনের অভাব অথবা রূপ দর্শনের অভাব অন্ধকার, এই মতদ্বয়ও গ্রহণ করা যায় না। কারণ, জ্ঞানপদার্থ চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হওয়ায় কোন জ্ঞানের অভাবেরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য আলোকবিশেষের অভাবই অন্ধকার ইহাই স্বীকার্য্য।

পরন্তু অন্ধকারনামক অতিরিক্ত জন্য দ্রব্য স্বীকার করিলে সূর্য্যাস্তের পরক্ষণেই আলোকশূন্য অসংখ্য স্থানে কিরূপে অসংখ্য অন্ধকার দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, ইহা বক্তব্য। বিবর্ত্তবাদী বেদান্তাচার্য্য প্রকাশাত্মযতি নিজ মতানুসারে পঞ্চপাদিকাবিবরণে বলিয়াছেন,—"আলোকবিনাশিতস্য চ তমসঃ পুনর্ম্মূলকারণাদেব ঝটিতি মহাবিদ্যুদাদিজন্মবজ্জন্ম সিধ্যতি।" কিন্তু মূল কারণ ব্রহ্ম বা অবিদ্যা হইতেই ঐরূপ অতি শীঘ্র বহুস্থানব্যাপী অন্ধকারদ্রব্যের উৎপত্তি হইলে অন্যান্য দ্রব্যের ঐরূপ উৎপত্তি কেন হয় না, ইহাও বক্তব্য। অবশ্য 'বিবরণ'কারের মতে ইহারও উত্তর আছে। কিন্তু তাঁহার সম্মত বিবর্ত্তবাদ আরম্ভবাদী মীমাংসকসম্প্রদায়েরও সম্মত নহে। মীমাংসক মতে অন্ধকারের দ্রব্যত্ব পক্ষ সমর্থন করিতে বাচস্পতি মিশ্রও ন্যায়কণিকায় (৭৬ পৃঃ) বলিয়াছেন,—"পৃথিব্যাদ্যণূনামিব তমোঽণূনামপ্যনুমানাৎ।" অন্ধকারের দ্রব্যত্ব খণ্ডন করিতে "ন্যায়কন্দলী"কার শ্রীধর ভট্টও বলিয়াছেন,—"এবং তর্হি

তামসাঃ পরমাণবোঽপ্যস্পর্শবন্তঃ কথং তমোদ্রব্যমারভেরন্।" অর্থাৎ স্পর্শশূন্য তামস পরমাণুসমূহও অন্ধকারনামক দ্রব্যের উৎপাদক হইতে পারে না।

অবশ্য 'শ্লোকবার্ত্তিকে' কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন, "মীমাংসকৈশ্চ নাবশ্যমিষ্যন্তে পরমাণবঃ।" (অনু-পঃ ১৮৩)। কিন্তু জন্য দ্রব্যের মূলকারণরূপে তজ্জাতীয় অসংখ্য সূক্ষ্ম দ্রব্য (ত্রসরেণু) মীমাংসক মতেও স্বীকৃত। তাহা হইলে অন্ধকার দ্রব্যের মূল কারণ সেই সমস্ত অতি সূক্ষ্ম দ্রব্য হইতে ক্রমশঃ মহান্ অন্ধকারদ্রব্যের উৎপত্তি যে, বহু সময়সাপেক্ষ, ইহাও স্বীকার্য্য। বস্তুতঃ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মরূপ ভাবপদার্থের যেরূপে উৎপত্তি হয়, সেইরূপে অন্ধকারের উৎপত্তি বলা যায় না। মহর্ষি কণাদও ঐ তাৎপর্য্যেই বলিয়াছেন,—"দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-নিষ্পত্তিবৈধর্ম্ম্যাদ্ভা-ভাবস্তমঃ॥" (৫।২।১৯)।* পরে অন্ধকারে গতিভ্রমের কারণ ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন, "তেজসো দ্রব্যান্তরেণাবরণাচ্চ।" শেষোক্ত সূত্রের দ্বারা ছায়াও যে, আবৃত আলোকবিশেষের অভাব, ইহাও সূচিত হইয়াছে। ফলকথা, অন্ধকারকে দ্রব্যপদার্থ বলিলে অসংখ্য স্থানে অসংখ্য অন্ধকার দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশ-স্বীকারে কার্য্যকারণভাব-কল্পনা এবং অন্ধকারনামক দ্রব্যের মূল উপাদান অসংখ্য দ্রব্যের কল্পনায় মহাগৌরব স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং উক্ত মতে পূর্ব্বোক্তরূপ কল্পনাগৌরবই চরম দোষ বলিয়া কথিত হইয়াছে। উভয় পক্ষে প্রমাণ উপস্থিত হইলে, যে পক্ষে কল্পনার লাঘব হয়, সেই পক্ষই গ্রাহ্য। তাই প্রমাণের সহকারিত্বপ্রযুক্ত কল্পনালাঘবও 'তর্ক' নামে কথিত হইয়াছে। মীমাংসকগণও অন্যত্র বলিয়াছেন,—

কল্পনালাঘবং যত্র তং পক্ষং রোচয়ামহে।
কল্পনাগৌরবং যত্র তং পক্ষং ন সহামহে॥ "(মানমেয়োদয়" দ্রষ্টব্য) ॥৮॥

সূত্র। কালাত্যয়াপদিষ্টঃ কালাতীতঃ॥ ৯॥৫০॥

অনুবাদ—'কালাত্যয়াপদিষ্ট' অর্থাৎ যে হেতুর বিশেষণ প্রকৃত স্থলে

---

* শঙ্কর মিশ্র প্রভৃতি পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাকার এই সূত্রে পরভাগে "অভাবস্তমঃ" এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিলেও "ভাভাবস্তমঃ" এইরূপ পাঠই প্রাচীনসম্মত। 'ন্যায়বার্ত্তিকে' (৩৪৩ পৃঃ) উদ্দ্যোতকরও উক্তরূপ সূত্রই উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"নিরাকৃততেজঃসম্বন্ধীনি দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মাণি তমঃশব্দেনাভিধীয়ন্তে।" কিন্তু ইহা বৌদ্ধসম্প্রদায়ের কোন কথার খণ্ডনার্থ তৎকালে তাঁহার কল্পিত ব্যাখ্যাই মনে হয়। তাঁহার নিজ মতে উক্তরূপ ব্যাখ্যার কোন কারণ নাই। তৃতীয় খণ্ড, ৭ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কালাত্যয়বিশিষ্ট, তাহা 'কালাতীত'। অথবা হেতুপ্রয়োগ বা সাধ্যসংশয়ের কালাত্যয়ে যাহা অপদিষ্ট অর্থাৎ হেতুরূপে প্রযুক্ত হয়, তাহা 'কালাতীত'।

ভাষ্য। কালাত্যয়েন যুক্তো যস্যার্থৈকদেশোঽপদিশ্যমানস্য স কালাত্যয়াপদিষ্টঃ কালাতীত উচ্যতে।

নিদর্শনম্—নিত্যঃ শব্দঃ, সংযোগব্যঙ্গ্যত্বাৎ, রূপবৎ। প্রাগূর্দ্ধঞ্চ ব্যক্তেরবস্থিতং রূপং প্রদীপ-ঘটসংযোগেন ব্যজ্যতে, তথা চ শব্দোঽপ্যবস্থিতো ভেরী-দণ্ডসংযোগেন ব্যজ্যতে দারু-পরশুসংযোগেন বা, তস্মাৎ সংযোগব্যঙ্গ্যত্বান্নিত্যঃ শব্দ ইত্যয়ম-হেতুঃ কালাত্যয়াপদেশাৎ। ব্যঞ্জকস্য সংযোগস্য কালং ন ব্যঙ্গ্যস্য রূপস্য ব্যক্তিরত্যেতি। সতি প্রদীপসংযোগে রূপস্য গ্রহণং ভবতি, নিবৃত্তে সংযোগে রূপং ন গৃহ্যতে। নিবৃত্তে দারুপরশুসংযোগে দূরস্থেন শব্দঃ শ্রূয়তে বিভাগকালে। সেয়ং শব্দস্য ব্যক্তিঃ সংযোগকালমত্যেতীতি ন সংযোগনিমিত্তা* ভবতি। কস্মাৎ? কারণাভাবাদ্ধি কার্য্যাভাব ইতি। এব-মুদাহরণসাধর্ম্ম্যস্যাভাবাদসাধনময়ং হেতুর্হেত্বাভাস ইতি।

অবয়ববিপর্য্যাস-বচনন্তু ন সূত্রার্থঃ। কস্মাৎ? "যস্য যেনার্থসম্বন্ধো দূরস্থস্যাপি তস্য সঃ। অর্থতো হ্যসমর্থা-নামানন্তর্য্যমকারণং" ইত্যেতদ্বচনাদ্বিপর্য্যাসেনোক্তো হেতু-রুদাহরণসাধর্ম্ম্যাত্তথা বৈধর্ম্ম্যাৎ সাধ্য-সাধনং হেতুলক্ষণং ন জহাতি, অজহদ্ধেতুলক্ষণং ন হেত্বাভাসো ভবতীতি। "অবয়ব-

---

* এখানে প্রচলিত মুদ্রিত পুস্তকে "সংযোগনিম্মিতা" এইরূপ পাঠই দেখা যায়। কিন্তু কোন পুস্তকে "সংযোগনিমিত্তা" এইরূপ পাঠ আছে। ধর্ম্মকীর্ত্তির "বাদন্যায়" গ্রন্থের শান্তরক্ষিতকৃত টীকায় এই স্থলীয় যে ভাষ্যপাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা মুদ্রিত পুস্তকে অনেক স্থলে বিকৃত হইলেও তাহাতেও "সংযোগনিমিত্তা" এইরূপ পাঠই দেখা যায় এবং উহাই প্রকৃত পাঠ বলিয়া বুঝা যায়। বৌদ্ধ পণ্ডিত শ্রীরাহুল সাংকৃত্যায়ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত "বাদন্যায়" গ্রন্থের ১৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিপর্য্যাসবচনমপ্রাপ্তকাল”মিতি নিগ্রহস্থানমুক্তং, তদেবেদং পুনরুচ্যত ইত্যতস্তন্ন সূত্রার্থঃ।

অনুবাদ—'অপদিশ্যমান' অর্থাৎ অনুমানের হেতুরূপে প্রযুজ্যমান যে পদার্থের 'অর্থৈকদেশ' অর্থাৎ কোন বিশেষণ কালাত্যয়বিশিষ্ট, 'কালাত্যয়াপদিষ্ট' সেই পদার্থ 'কালাতীত' উক্ত হয় অর্থাৎ তাদৃশ হেতুকে 'কালাতীত' নামক হেত্বাভাস বলে।

উদাহরণ—“নিত্যঃ শব্দঃ, সংযোগব্যঙ্গ্যত্বাৎ, রূপবৎ।” অর্থাৎ শব্দ নিত্য (পূর্ব্বাপরকালস্থায়ী), যেহেতু সংযোগব্যঙ্গ্য, যেমন রূপ। (বিশদার্থ) যেমন ব্যক্তির অর্থাৎ প্রত্যক্ষরূপ অভিব্যক্তির পূর্ব্বে ও পরে অবস্থিত রূপ (ঘটের রূপ) প্রদীপের সহিত ঘটের সংযোগজন্য ব্যক্ত (প্রত্যক্ষ) হয়, তদ্রূপই (শ্রবণের পূর্ব্বে ও পরে) অবস্থিত শব্দ ভেরীদণ্ডসংযোগজন্য অথবা কাষ্ঠকুঠারসংযোগজন্য ব্যক্ত হয়, অতএব সংযোগব্যঙ্গ্যত্বহেতুক শব্দ নিত্য। ইহা অর্থাৎ উক্তরূপ অনুমানের জন্য গৃহীত সংযোগব্যঙ্গ্যত্বরূপ হেতু 'কালাত্যয়াপদেশ'প্রযুক্ত অহেতু অর্থাৎ হেত্বাভাস। (তাৎপর্য্য) ব্যঙ্গ্য অর্থাৎ আলোকসংযোগব্যঙ্গ্য রূপের 'ব্যক্তি' (প্রত্যক্ষ) ব্যঞ্জক সংযোগের অর্থাৎ সেই প্রদীপসংযোগের কালকে অতিক্রম করে না, (কারণ) প্রদীপ-সংযোগ বিদ্যমান থাকিলেই রূপের প্রত্যক্ষ হয়, সংযোগ নিবৃত্ত হইলে রূপ গৃহীত হয় না। (কিন্তু) কাষ্ঠকুঠারসংযোগ নিবৃত্ত হইলেই বিভাগকালে অর্থাৎ কাষ্ঠের সহিত সেই কুঠারের বিভাগকালে দূরস্থ ব্যক্তি কর্ত্তৃক শব্দ শ্রুত হয়। শব্দের সেই এই 'ব্যক্তি' অর্থাৎ অভিব্যক্তি বা শ্রবণ, সংযোগের কালকে অতিক্রম করে,—এ জন্য সংযোগনিমিত্তক হয় না অর্থাৎ সেই অতীত সংযোগ পরজাত শব্দশ্রবণের কারণ হইতে পারে না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু কারণের অভাবপ্রযুক্ত কার্য্যাভাব হয়। এইরূপ হইলে উদাহরণের সাধর্ম্ম্যের অভাবপ্রযুক্ত অসাধন এই হেতু (সংযোগব্যঙ্গ্যত্ব) হেত্বাভাস।

অবয়বের বিপরীতক্রমে বচন কিন্তু সূত্রার্থ নহে অর্থাৎ উদাহরণবাক্যের পরে প্রযুক্ত হেতুই 'কালাতীত', ইহা এই সূত্রের অর্থ নহে। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যে বাক্যের সহিত যে বাক্যের অর্থসম্বন্ধ থাকে, তাহা দূরস্থ সেই বাক্যেরও থাকে। কিন্তু অর্থতঃ অসমর্থ বাক্যসমূহের অর্থাৎ নিরাকাঙ্ক্ষ বাক্য-সমূহের আনন্তর্য্য (সন্নিধান) অকারণ অর্থাৎ তাহা শাব্দবোধের জনক হয়

না—এইরূপ বচনপ্রযুক্ত বিপরীতক্রমে উক্ত হেতুও উদাহরণের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত এবং উদাহরণের বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্য-সাধন হওয়ায় হেতুর লক্ষণ ত্যাগ করে না, হেতুর লক্ষণ ত্যাগ না করায় হেত্বাভাস হয় না। (পরন্তু) "অবয়ববিপর্য্যাস-বচনমপ্রাপ্তকালং" (৫।২।১১শ সূত্র) এই সূত্রের দ্বারা ('অপ্রাপ্তকাল'নামক) 'নিগ্রহস্থান' উক্ত হইয়াছে,—সেই ইহাই পুনরুক্ত হয়, অর্থাৎ এই সূত্রের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ হইলে সেই নিগ্রহস্থানই পুনরুক্ত হয়, অতএব তাহা সূত্রার্থ নহে।

টিপ্পনী—পঞ্চম প্রকার হেত্বাভাসের নাম **কালাতীত**। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পূর্ব্বোক্ত হেত্বাভাসবিভাগসূত্রে 'অতীতকাল' এই পাঠ গ্রহণ করিয়া 'কালাতীত' শব্দকে উহার সমানার্থ বলিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি এই লক্ষণসূত্রে 'কালাতীতঃ' এই পদের দ্বারাই লক্ষ্য নির্দ্দেশ করায় পূর্ব্বোক্ত বিভাগসূত্রেও 'কালাতীত' এই পাঠই প্রকৃত ও সংগত বুঝা যায়। বাচস্পতি মিশ্র **ন্যায়সূচী-নিবন্ধে**ও উভয় সূত্রেই 'কালাতীত' পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন

ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, যে হেতুর কোন বিশেষণ কালাত্যয়বিশিষ্ট, সেই হেতু 'কালাত্যয়াপদিষ্ট' হওয়ায় তাহাকে বলে 'কালাতীত' হেত্বাভাস। ভাষ্যকার ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন,—"নিত্যঃ শব্দঃ, সংযোগব্যঙ্গ্যত্বাৎ, রূপবৎ।" এখানে 'রূপবৎ' এই দৃষ্টান্তবাক্যের দ্বারাই বুঝা যায় যে, শব্দ পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান থাকে, ইহাই বাদীর প্রতিজ্ঞার্থ। উদ্দ্যোতকরও বলিয়াছেন,—"ন ক্রমো নিত্যঃ শব্দ ইতি, অপিতু অবতিষ্ঠতে ইতি প্রতিজ্ঞার্থঃ।" বাদীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে প্রদীপের সহিত ঘটের সংযোগ হইলে সেই ঘটে পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান রূপেরই প্রত্যক্ষ হওয়ায় সেই রূপ সংযোগব্যঙ্গ্য। সংযোগবিশেষ যাহার ব্যঞ্জক অর্থাৎ প্রত্যক্ষের সহকারী কারণ, তাহাকে বলে সংযোগব্যঙ্গ্য। রূপের ন্যায় শব্দও সংযোগব্যঙ্গ্য। কারণ, ভেরী ও দণ্ডের সংযোগবিশেষজন্য অথবা কাষ্ঠ ও কুঠারের সংযোগবিশেষজন্য শব্দবিশেষের প্রত্যক্ষ জন্মে। এইরূপ অন্যান্য শব্দও সংযোগব্যঙ্গ্য। সুতরাং উক্ত 'সংযোগব্যঙ্গ্যত্ব' হেতুর দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, শব্দ পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ অভিনব শব্দের উৎপত্তি হয় না।

কিন্তু ভাষ্যকারের কথা এই যে, শব্দরূপের ন্যায় সংযোগব্যঙ্গ্য নহে। অতএব উক্ত স্থলে শব্দে উদাহরণের (রূপদৃষ্টান্তের) সাধর্ম্ম্য (সংযোগব্যঙ্গ্যত্ব)

না থাকায় উক্ত হেতু শব্দে নিত্যত্বের সাধনই হয় না। সুতরাং উহা হেত্বাভাস। উক্ত **সংযোগব্যঙ্গ্যত্ব**রূপ হেতুর একদেশ বা বিশেষণ যে সংযোগ, তাহা শব্দশ্রবণকাল পর্য্যন্ত না থাকায় কালাত্যয়বিশিষ্ট। অতএব উক্ত হেতু **কালাত্যয়াপদিষ্ট** হওয়ায় উহা **কালাতীত** নামক হেত্বাভাস। ভাষ্যকার ইহাই বুঝাইতে পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—**কালাত্যয়াপদেশাৎ** ইত্যাদি। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, প্রদীপের সহিত ঘটের সংযোগ বিদ্যমান থাকিলেই তৎকালে সেই ঘটরূপের প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং সেই সংযোগ সেই ঘটরূপের ব্যঞ্জক হওয়ায় সেই রূপকে 'সংযোগব্যঙ্গ্য' বলা যায়। কিন্তু ভেরী ও দণ্ড অথবা কাষ্ঠ ও কুঠারের সেই বিলক্ষণ সংযোগ নিবৃত্ত হইলেই দূরস্থ ব্যক্তিকর্ত্তৃক সেই শব্দের শ্রবণরূপ প্রত্যক্ষ হয়। অর্থাৎ রূপের প্রত্যক্ষকালে যেমন তাহার ব্যঞ্জক সংযোগ বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ সেই শব্দশ্রবণকালে কাষ্ঠ-কুঠারাদির সেই সংযোগ বিদ্যমান থাকে না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"সেয়ং শব্দস্য ব্যক্তিঃ······ন সংযোগনিমিত্তা ভবতি।" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ধ্বন্যাত্মক শব্দের যে অভিব্যক্তি বা শ্রবণ, তাহাতে কাষ্ঠকুঠারাদির সেই সংযোগ কারণ হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে সেই শ্রবণরূপ কার্য্যকালে সেই সংযোগ না থাকায় কারণের অভাবে সেই শ্রবণরূপ কার্য্য হইতে পারে না। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—"কারণাভাবাদ্ধি কার্য্যাভাব ইতি।"

ভাষ্যকার পরে এই সূত্রের অন্যরূপ অর্থব্যাখ্যার খণ্ডন করায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁহার ভাষ্যরচনার পূর্ব্বেই কেহ ঐরূপ অপব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। বাচস্পতি মিশ্রও তাহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—"যৎ পুনর্ভদন্তেন কালাতীতস্য ব্যাখ্যানং কৃতং" ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে, কোন বৌদ্ধ নৈয়ায়িক গোতমোক্ত 'কালাতীত'নামক পঞ্চম হেত্বাভাসের খণ্ডনোদ্দেশ্যে এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন যে, বাদী বা প্রতিবাদী যদি প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরেই হেতুবাক্যের প্রয়োগ না করিয়া কালাত্যয়ে অর্থাৎ উদাহরণবাক্যের পরে হেতুবাক্যের প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেই হেতুকে বলে "কালাতীত"। ভাষ্যকার উক্তরূপ ব্যাখ্যার খণ্ডন করিতে "যস্য যেনার্থসম্বন্ধঃ" ইত্যাদি প্রাচীন কারিকা* উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, বিপরীতক্রমে প্রকৃত হেতু কথিত

* "ন্যায়ামৃত" গ্রন্থে (২৭৯ পত্রে) ব্যাসতীর্থ উক্ত কারিকাটী 'বার্ত্তিক' বলিয়া উদ্ধৃত করিলেও সেই 'বার্ত্তিকে'র কোন পরিচয় বলেন নাই। "সাংখ্যকারিকা"র নবপ্রকাশিত টীকা "যুক্তিদীপিকা"য় (১২ পৃঃ) দেখা যায়,—"তথাচোক্তং 'যস্য যেনাভিসম্বন্ধো দূরস্থস্যাপি

হইলেও তাহা হেতুর লক্ষণ ত্যাগ করে না। সুতরাং সেইরূপ স্থলেও সেই হেতু হেতুর লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় তাহাকে কোন হেত্বাভাস বলা যায় না। বিপরীতক্রমে প্রয়োগজন্য কোন প্রকৃত হেতু দুষ্ট হইতে পারে না। পরন্তু মহর্ষি পরে অবয়বের বিপরীতক্রমে বচনকে 'অপ্রাপ্তকাল' নামক নিগ্রহস্থানই বলিয়াছেন। সুতরাং এখানে হেত্বাভাস-প্রকরণে তিনি তাহাই বলিলে পুনরুক্তিদোষ হয়। সুতরাং এই সূত্রের উক্তরূপ অর্থ নহে। এই সূত্রের প্রকৃতার্থ না বুঝিয়া, উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া "কালাতীত" হেত্বাভাসের খণ্ডন করা যায় না।

ভাষ্যকারীয় ব্যাখ্যার প্রতিবাদ ও ব্যাখ্যান্তর

বৌদ্ধাচার্য্য **শান্তরক্ষিত** গোতমোক্ত 'কালাতীত' হেত্বাভাসের খণ্ডন করিতে বাৎস্যায়ন ও উদ্দ্যোতকরের পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যারই উল্লেখ করিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন,—"তদনেন প্রকারেণ সংযোগব্যঙ্গ্যত্বমেব শব্দস্য প্রতিষিধ্যত ইতি নায়মসিদ্ধাদ্ব্যাবর্ত্ততে। (বাদন্যায়-টীকা)। অর্থাৎ উক্ত প্রকারে শব্দে সংযোগ-ব্যঙ্গ্যত্ব হেতুই প্রতিষিদ্ধ হওয়ায় ঐ হেতু 'অসিদ্ধ' হেত্বাভাস হইতে পৃথক্ নহে। পরে "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্টও ঐ কথাই বলিয়া, ভাষ্যকারীয় ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অনুমানের ধর্ম্মীতে প্রত্যক্ষ বা আগমের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মের অভাবনিশ্চয় না হওয়া পর্য্যন্তই সেই সাধ্যধর্ম্মের সাধনের জন্য কোন হেতুর প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু সেই হেতু-প্রয়োগের কালাত্যয়ে অপদিষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা আগমের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মের অভাব নিশ্চয় হইলে প্রযুক্ত হেতুই "কালাতীত" নামক হেত্বাভাস। প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ও আগমবিরুদ্ধ **ন্যায়াভাসস্থলীয়** সমস্ত হেতুই ইহার উদাহরণ। (পূর্ব্ব ৩৩-৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

"তাৎপর্য্যটীকা"কার বাচস্পতি মিশ্রও এখানে ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণ গ্রহণ

তস্য সঃ। অর্থতস্ত্বসমানানামানন্তর্য্যেঽপ্যসম্বন্ধঃ॥" কিন্তু "তাৎপর্য্যটীকা"য় বাচস্পতি মিশ্র "যস্য যেনার্থসম্বন্ধঃ" এইরূপ পাঠই উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"অর্থেন সামর্থ্যেন সম্বন্ধোঽর্থসম্বন্ধঃ।" তাৎপর্য্য এই যে, যে বাক্যের সহিত যে বাক্যের অর্থসম্বন্ধ অর্থাৎ সাকাঙ্ক্ষত্ব থাকে, তাহা দূরস্থ বাক্যেও থাকে। কিন্তু সাকাঙ্ক্ষত্ব না থাকিলে নিকটস্থ বাক্যের সহিত মিলনেও সেই বাক্যদ্বারা শাব্দবোধ জন্মে না। উক্ত সিদ্ধান্তানুসারেই বৌদ্ধসম্প্রদায় 'অপ্রাপ্তকাল'নামক নিগ্রহস্থানও স্বীকার করেন নাই। এ বিষয়ে পঞ্চম খণ্ডে ৩৫০-৫১ পৃষ্ঠায় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি ভাষ্যকারের মতের নির্দ্দোষত্ব রক্ষার্থ প্রথমে এই সূত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন,—"এবং ব্যবস্থিতে ভাষ্যকারঃ সূত্রং স্বপরমতশ্লিষ্টং ব্যাচষ্টে, কালাত্যয়েন সংশয়কালাত্যয়েন যুক্তো যস্যার্থৈকদেশঃ" ইত্যাদি। বাচস্পতি মিশ্রের সমাধান এই যে, উক্ত উদাহরণ ভাষ্যকারের নিজসম্মত নহে। ভাষ্যকার এখানে প্রথমে "কালাত্যয়েন" ইত্যাদি একই সন্দর্ভের দ্বারা নিজমতে ও পরমতে সূত্রার্থ-ব্যাখ্যা করিয়া, পরমতেই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহা হইলে তিনি উক্ত উদাহরণের পূর্ব্বোক্তরূপ দোষ বলেন নাই কেন? এতদুত্তরে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন,—"স্থূলতয়া এষ দোষো ভাষ্যকারেণ নোদ্ভাবিতঃ।" অর্থাৎ উক্ত দোষ না বলিলেও বুঝা যায়, এ জন্য ভাষ্যকার উহা বলেন নাই। তাঁহার নিজমতে প্রথমোক্ত সন্দর্ভের দ্বারা সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে যে, 'অপদিশ্যমান' যে পদার্থের (হেতুর) 'অর্থৈকদেশ' অর্থাৎ যে হেতুর দ্বারা সাধনীয় কোন ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর একদেশ (সেই ধর্ম্মীতে বিশেষণীভূত সাধ্যধর্ম্ম) সংশয়কালাত্যয়যুক্ত হয়, সেই হেতু অর্থাৎ সেই সাধ্যধর্ম্মের সংশয়ের কালাত্যয়ে যে হেতু অপদিষ্ট বা প্রযুক্ত হয়, সেই হেতু 'কালাত্যয়াপদিষ্ট' হওয়ায় তাহাকে বলে "কালাতীত" হেত্বাভাস। তাৎপর্য্য এই যে, অনুমানের ধর্ম্মিরূপে গৃহীত পদার্থে কোন বলবৎ প্রমাণ দ্বারা সেই সাধ্যধর্ম্মের অভাব নিশ্চয় হইলে তখন আর তাহাতে সেই সাধ্যধর্ম্মবিষয়ে সংশয় জন্মিতে পারে না। সুতরাং উক্তরূপ স্থলে প্রযুক্ত যে কোন হেতুই সাধ্যসংশয়ের কালাত্যয়ে প্রযুক্ত হওয়ায় তাহাকে বলে 'কালাতীত' হেত্বাভাস। ভাষ্যকারের উক্তরূপ মতই হইলে তিনি এখানে নিজমতানুসারে উহার উদাহরণ বলেন নাই কেন? এতদুত্তরে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন,—"অত্র চ পূর্ব্বমেবোদাহৃতমিতি পৌনরুক্ত্যান্নোদাহৃতং।"

বাচস্পতি মিশ্রের কল্পনায় বক্তব্য

কিন্তু এখানে ভাষ্যকারের একই সন্দর্ভের দ্বারা নিজমতে ও পরমতে সূত্রার্থ ব্যাখ্যার হেতু কি? ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। বাচস্পতি মিশ্র তাহা বলেন নাই। তিনি অন্যত্রও ভাষ্যকারের ঐরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন নাই। পরন্তু তিনি এখানে 'বার্ত্তিক'ব্যাখ্যায় উদ্দ্যোতকরেরও ঐরূপ তাৎপর্য্য কেন বলেন নাই, ইহাও চিন্তনীয়। আর ভাষ্যকার এখানে পরমতে ব্যাখ্যা করিয়াও পরমতের উক্ত দোষকে স্থূল বুঝিয়া না বলিলে তাঁহার নিজমত কি, তাহা ভ

ব্যক্ত করিয়াই তাঁহার বক্তব্য। নচেৎ কিরূপে তাহা বুঝা যাইবে? বাচস্পতি মিশ্র উক্ত ভাষ্যসন্দর্ভের দ্বারাই যেরূপে ভাষ্যকারের নিজমতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা ত স্থল নহে। পরন্তু কষ্টকল্পনামূলক অতি দুর্ব্বোধ। জয়ন্ত ভট্টও ভাষ্যকারের উক্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝিয়া উক্তরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহার মতের নির্দ্দোষত্ব রক্ষা করেন নাই। পরন্তু ভাষ্যকার পূর্ব্বে প্রথমসূত্রভাষ্যে (২৯শ পৃঃ) প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ও আগমবিরুদ্ধ অনুমানকে ন্যায়াভাস বলিলেও তাহার উদাহরণ বলেন নাই। সুতরাং এখানে তিনি নিজমতে 'কালাতীত' হেত্বাভাসের উদাহরণ বলিলে পুনরুক্তি হইবে কেন, ইহাও ত আমরা বুঝিতে পারি না। অতএব বাচস্পতি মিশ্রের "পৌনরুক্ত্যান্নোদাহৃতং" এই উক্তি কিরূপে সংগত হইবে, ইহাও সুধীগণ বিচার করিবেন।

বস্তুতঃ বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায় পরে উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণও বলবৎ প্রমাণের দ্বারা বাধিত হেতুকেই গোতমোক্ত 'কালাতীত' হেত্বাভাস বলিয়াছেন। 'তার্কিকরক্ষা'কার বরদরাজও বলিয়াছেন,—"কালাতীতো বলবতা প্রমাণেন প্রবাধিতঃ।" পরে "তত্ত্বচিন্তামণি"কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় হেতুর 'বাধ' দোষকে দশবিধ বলিয়া 'প্রত্যক্ষবাধিত', 'অনুমানবাধিত', 'উপমানবাধিত' এবং 'শব্দপ্রমাণবাধিত' হেতু স্থলে উহার উদাহরণ বলিয়াছেন। কিন্তু উক্ত মতানুসারেও ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত স্থলে 'সংযোগব্যঙ্গ্যত্ব'রূপ হেতুকেও বাধিত বলা যায়। কারণ, মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থে (২।১) বিচারপূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন যে, শ্রবণের পূর্ব্বে ও পরে শব্দের অসত্তা বা অভাব প্রত্যক্ষসিদ্ধ। শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারাই তাহার প্রত্যক্ষ জন্মে। পরে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে ভাষ্যকারের শব্দানিত্যত্ব সমর্থনের দ্বারা তাঁহারও উক্তরূপ মত বুঝা যায়। শ্রবণের পূর্ব্বেও শব্দ বিদ্যমান থাকিলে তখন তাহার শ্রবণ হয় না কেন? এতদুত্তরে শব্দনিত্যত্ব-বাদীর কথা এই যে, শব্দ সংযোগব্যঙ্গ্য। শ্রবণের পূর্ব্বে তাহার ব্যঞ্জক সংযোগের অভাবে তখন তাহার শ্রবণ হয় না। কিন্তু শব্দের সংযোগব্যঙ্গ্যত্ব খণ্ডিত হইলে আর ঐ কথা বলা যায় না। ভাষ্যকার উক্তরূপ গূঢ় উদ্দেশ্যেই এখানে শব্দের সংযোগব্যঙ্গ্যত্ব খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি। তাই ভাষ্যকার পরে (২।২।১৮শ সূত্রভাষ্যে) বলিয়াছেন,—"প্রতিষিদ্ধশ্চ সংযোগস্য ব্যঞ্জকত্বং, তস্মাৎ ব্যঞ্জকাভাবাদগ্রহণমপি স্বভাবাদেবেতি।" তাহা হইলে উক্ত স্থলে ভাষ্যকারোক্ত 'সংযোগব্যঙ্গ্যত্বরূপ' হেতু অসিদ্ধ হইলেও উহাকে 'বলবৎ-

প্রমাণবাধিত' বলা যায়। একই হেতু অনেক প্রকার হেত্বাভাসও হইতে পারে। আর কেবলমাত্র 'বাধিত' হেত্বাভাসেরও উদাহরণ আছে। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

হেত্বাভাসের প্রকারভেদে নানা মত ও গৌতম মতের যুক্তি

বৈশেষিক দর্শনে কণাদ বলিয়াছেন,—"অপ্রসিদ্ধোঽনপদেশোঽসন্ সন্দিগ্ধশ্চানপদেশঃ॥" (৩।১।১৫) উক্ত সূত্রে 'অনপদেশ' শব্দের অর্থ অহেতু অর্থাৎ হেত্বাভাস। উহা 'অপ্রসিদ্ধ', 'অসন্' ও 'সন্দিগ্ধ'। 'অপ্রসিদ্ধ' শব্দের দ্বারা বিরুদ্ধ এবং 'অসৎ' শব্দের দ্বারা অসিদ্ধ এবং 'সন্দিগ্ধ' শব্দের দ্বারা 'অনৈকান্তিক' হেত্বাভাস কথিত হইয়াছে। তাই প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য বলিয়া গিয়াছেন,—'বিরুদ্ধাসিদ্ধ-সন্দিগ্ধমলিঙ্গং কাশ্যপোঽব্রবীৎ।' অর্থাৎ কশ্যপ মুনির অপত্য কণাদ মুনি উক্ত ত্রিবিধ অলিঙ্গ হেত্বাভাস বলিয়াছেন। কিন্তু **ব্যোমবতী** বৃত্তিতে (৫৬৫-৬৯ পৃঃ) ব্যোমশিবাচার্য্য কণাদের উক্ত সূত্রে 'চ' শব্দকে অনুক্ত সমুচ্চয়ার্থ বলিয়া গোতমের ন্যায় কণাদের মতেও পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ হেত্বাভাসই সমর্থন করিয়াছেন। আর **সপ্তপদার্থী** গ্রন্থে শিবাদিত্য মিশ্র ভাসর্ব্বজ্ঞের ন্যায় বলিয়াছেন,—"তদাভাসা অসিদ্ধ-বিরুদ্ধানৈকান্তিকানধ্যবসিতকালাত্যয়াপদিষ্ট-প্রকরণসমাঃ।" উক্ত মতে হেত্বাভাস ষট্ প্রকার। কিন্তু সর্ব্বমান্য বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ হেত্বাভাস-বিভাগে 'অসিদ্ধ', 'বিরুদ্ধ', 'সন্দিগ্ধ' ও 'অনধ্যবসিত' নামেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তদনুসারেই **ন্যায়লীলাবতী** গ্রন্থে বৈশেষিকমতের ব্যাখ্যা করিতে বল্লভাচার্য্য স্পষ্ট বলিয়াছেন,—"তদাভাসাশ্চত্বারঃ, অসিদ্ধ-বিরুদ্ধ-সব্যভিচারানধ্যবসিতাঃ।" (৬০৬ পৃঃ)।

অনুমেয় ধর্ম্মিরূপ পক্ষপদার্থের অসাধারণ ধর্ম্মকে অর্থাৎ যাহা সপক্ষে ও বিপক্ষে থাকে না, কিন্তু কেবল পক্ষভূত পদার্থেই থাকে, এমন ধর্ম্মকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে উক্ত মতে তাহাকে বলা হইয়াছে **অনধ্যবসিত** নামক হেত্বাভাস। তাই 'ন্যায়কন্দলী'কার শ্রীধর ভট্ট বলিয়াছেন,—"অনধ্যবসিত ইত্যসাধারণো হেত্বাভাসঃ কথ্যতে।" উদ্দ্যোতকর উক্তরূপ হেতুকে 'সব্যভিচার' হেত্বাভাসেরই দ্বিতীয় প্রকার বলিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে (৪০০ পৃঃ) বলিয়াছি। পরন্তু উদ্দ্যোতকর যে, কণাদের সংশয়সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া কণাদের মতেও অসাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞানজন্যও সংশয় সমর্থন করিয়াছেন, ইহাও পূর্ব্বে (২৬৩ পৃঃ)

বলিয়াছি। কিন্তু প্রশস্তপাদ উক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া উপসংহারে বৈশেষিক সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন,—"তস্মাৎ সামান্যপ্রত্যয়াদেব সংশয় ইতি।" (২৭৬-২৭৭ পৃঃ)। অর্থাৎ সমানধর্ম্ম বা সাধারণধর্ম্মের জ্ঞানজন্যই সংশয় জন্মে। অসাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞান সংশয়ের কারণ নহে। কিন্তু স্থলবিশেষে উহা 'অনধ্যবসায়'নামক জ্ঞানেরই করণ। উদ্দ্যোতকর প্রশস্তপাদের পরবর্ত্তী হইলে তিনি গোতমের সংশয়সূত্র-বার্ত্তিকে বহু মতের সমালোচনা করিলেও উক্ত মতের সমালোচনা করেন নাই কেন, ইহা চিন্তনীয়। পরে বৈশেষিক দর্শনের 'উপস্কারে' (২।২।১৭) শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন,—"সমাতন্ত্রে গৌতমীয়েঽনধ্যবসায়জ্ঞানস্যানভ্যুপগমাদসাধারণো ধর্ম্মঃ সংশয়কারণত্বেনোক্তঃ। আর তিনি বল্লভাচার্য্যের "ন্যায়লীলাবতী"র **কণ্ঠাভরণ** টীকায় (৪৫০ পৃঃ) বলিয়াছেন,—"পনসাদৌ কিংস্বিদিদমিতি জ্ঞানমসাধারণধর্ম্মজ্ঞানজন্যমনধ্যবসায়ঃ। স চ বৈশেষিকমতে সংশয়াদ্ভিন্নঃ।"* বস্তুতঃ প্রশস্তপাদ প্রথমে প্রত্যক্ষবিষয়ে 'অনধ্যবসায়' জ্ঞানের উদাহরণ বলিয়াছেন,—**"যথা বাহীকস্য পনসাদিষু অনধ্যবসায়ো ভবতি।"** তাৎপর্য্য এই যে, বাহীক বা বাহ্লীক দেশে পনস প্রভৃতি কোন কোন বৃক্ষবিশেষ উৎপন্ন না হওয়ায় তদ্দেশবাসী কোনও ব্যক্তি দেশান্তরে আসিয়া প্রথমে তাহার অদৃষ্টপূর্ব্ব পনসাদি বৃক্ষ দর্শন করিলে 'ইহা কি' অর্থাৎ এই বৃক্ষ কোন্ শব্দের বাচ্য, এইরূপ জ্ঞান জন্মে। তাহার সেই বৃক্ষের সংজ্ঞাবিশেষের অনবধারণরূপ যে জ্ঞান, তাহা বিরুদ্ধকোটিদ্বয়বিষয়ক না হওয়ায় সংশয়াত্মক জ্ঞান নহে। কিন্তু 'অনধ্যয়বসায়'নামক পৃথক্ জ্ঞান। বল্লভাচার্য্যও বিচারপূর্ব্বক ইহা সমর্থন করিয়াছেন।—("ন্যায়লীলাবতী", চৌখাম্বা সং, ৪৫০-৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

---

* "সপ্তপদার্থী" গ্রন্থে শিবাদিত্য মিশ্র বলিয়াছেন,—"উহানধ্যবসায়য়োস্তু সংশয় এব।" কিন্তু প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ প্রভৃতির মতে "অনধ্যবসায়" জ্ঞান বিরুদ্ধকোটিদ্বয়-বিষয়ক না হওয়ায় সংশয়লক্ষণাক্রান্ত হয় না। "ন্যায়লীলাবতী"র প্রকাশ টীকায় (৪১৪ পৃঃ) বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ও সংশয়ের স্বরূপ-ব্যাখ্যায় পরে বলিয়াছেন, "যদ্বা বিরোধিনানারূপাবচ্ছিন্ন-বিষয়তাপ্রতিযোগিকং জ্ঞানং সংশয়ঃ" ইত্যাদি। নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কারও সংশয়ের স্বরূপ বিষয়ে নিজ মত সমর্থন করিতে "লীলাবতীপ্রকাশে"র উক্ত সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন। (জাগদীশী, চৌখাম্বা সং, ৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। আর তিনি "তর্কামৃত" গ্রন্থে (১৩ পৃঃ) বলিয়াছেন, "তত্র নৈয়ায়িকমতে স্বপ্নানধ্যবসায়ৌ বিপর্য্যয়মধ্যে প্রবিষ্টৌ। তেন তন্মতে অযথার্থজ্ঞানং দ্বিবিধং, সংশয়ো বিপর্য্যয়শ্চেতি।" কিন্তু প্রশস্তপাদ যেরূপ জ্ঞানকে 'অনধ্যবসায়' বলিয়াছেন, তাহা বিপরীত নিশ্চয়রূপ বিপর্য্যয়ও নহে।

মূলকথা, উক্ত মতে পূর্ব্বোক্ত অসাধারণ ধর্ম্মরূপ হেতুর জ্ঞান সাধ্যধর্ম্ম বিষয়ে সংশয়ের কারণ হয় না। সুতরাং উক্তরূপ হেতুকে কণাদের শেষোক্ত 'সন্দিগ্ধ' অর্থাৎ 'সব্যভিচার' বা 'অনৈকান্তিক' হেত্বাভাসের প্রকারবিশেষ বলা যায় না। তাই প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন,—"অয়মপ্রসিদ্ধোঽনপদেশ ইতি বচনাদবরুদ্ধঃ।" অর্থাৎ উক্ত সূত্রে মহর্ষি কণাদ প্রথমে 'অপ্রসিদ্ধ' শব্দের দ্বারাই পূর্ব্বোক্তরূপ 'অনধ্যবসিত' হেত্বাভাসও বলিয়াছেন। অসাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞান 'অনধ্যবসায়' জ্ঞানেরই কারণ হওয়ায় উক্তরূপ হেত্বাভাসের নাম "অনধ্যবসিত"। তাহা হইলে প্রশস্তপাদের কথার দ্বারাও আমরা বুঝিতে পারি যে, তাঁহার কথিত **অনধ্যবসিত** নামক হেত্বাভাস কণাদোক্ত 'অপ্রসিদ্ধ' হেত্বাভাসেরই দ্বিতীয় প্রকার।*

বস্তুতঃ প্রশস্তপাদের মতেও অনুমানের হেতু ত্রিলক্ষণ। (১) পক্ষে (অনুমেয় ধর্ম্মীতে) সত্তা, (২) সপক্ষে সত্তা এবং (৩) বিপক্ষে অসত্তা, এই লক্ষণত্রয় থাকিলেই তাহা অনুমানের হেতু হয়। উহার মধ্যে কোন এক লক্ষণ বা লক্ষণদ্বয় না থাকিলে তাহা হইবে হেত্বাভাস। তাই কথিত হইয়াছে, **বিপরীতমতো যৎ স্যাদেকেন দ্বিতয়েন বা। বিরুদ্ধাসিদ্ধসন্দিগ্ধমলিঙ্গং কাশ্যপোঽব্রবীৎ॥** সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ অসাধারণ ধর্ম্ম হেতুরূপে কথিত হইলে তাহাতে সপক্ষসত্তারূপ হেতুলক্ষণ না থাকায় তাহাও হেত্বাভাস হয়। (মতান্তরে উহাকে একপ্রকার বিরুদ্ধ হেত্বাভাসও বলা হইয়াছে)। কিন্তু গোতমোক্ত 'প্রকরণসম' ও 'কালাতীত' বা বাধিত হেতু পূর্ব্বোক্ত ত্রিলক্ষণ-বিশিষ্ট হইলে উক্ত মতে হেত্বাভাস হয় না। উক্তরূপ হেতুর প্রয়োগ স্থলে সাধ্যধর্ম্মের অনুমিতির প্রতিবন্ধক নিশ্চয়বশতঃ অনুমিতি সম্ভব না হইলেও সেই হেতু দুষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং প্রশস্তপাদের ব্যাখ্যার দ্বারাও বুঝা যায় যে, উক্তরূপে হেত্বাভাস ত্রিবিধ, ইহাই বৈশেষিকসম্প্রদায়ের প্রাচীন সিদ্ধান্ত।

* ন্যায়সারে ভাসর্ব্বজ্ঞ "অনধ্যবসিত" নামে ষষ্ঠ হেত্বাভাস বলিয়া উহাকে ষট্ প্রকার বলিয়াছেন। তাই "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ বলিয়াছেন,—"অনধ্যবসিতঃ ষষ্ঠো হেত্বাভাস ইতি কেচিৎ।" বরদরাজ পরে ভাসর্ব্বজ্ঞোক্ত লক্ষণেরই উল্লেখপূর্ব্বক উক্ত মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন, "তস্য অসাধারণাদিষু যথাসম্ভবমন্তর্ভাবান্ন পঞ্চভ্যোঽতিরেক ইতি।" বস্তুতঃ গৌতম মতে হেত্বাভাস পঞ্চবিধই। সুতরাং ভাসর্ব্বজ্ঞের উক্ত মতকে নৈয়ায়িক মত বলা যায় না। "তার্কিকরক্ষা"র টীকায় মল্লিনাথও উক্ত মতকে ন্যায়ৈকদেশিমতই বলিয়াছেন। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন,—"ন্যায়ৈকদেশিনো ভূষণীয়াঃ।"

অবশ্য ব্যোমশিবাচার্য্যের সমর্থিত পূর্ব্বোক্ত বৈশেষিক মতও প্রাচীন কালে দেশবিশেষে তাঁহার গুরুসম্প্রদায়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহা বুঝা যায়। তাই তিনি উহা সমর্থন করিতে প্রশস্তপাদের উদ্ধৃত "বিপরীতমতো যৎ স্যাদেকেন দ্বিতয়েন বা" ইত্যাদি প্রাচীন কারিকারও কষ্টকল্পনা করিয়া ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি উহার সরলার্থই গ্রহণ করিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনের উপস্কারে (৩।১।১৭) নব্য বৈশেষিক শঙ্কর মিশ্রও 'বৃত্তিকারস্তু' বলিয়া ব্যোমশিবাচার্য্যের উক্ত মতের উল্লেখ করিয়া, পরে বলিয়াছেন,—"পরন্তু বিরুদ্ধাসিদ্ধসন্দিগ্ধমলিঙ্গং কাশ্যপোঽব্রবীদিত্যাদ্যভিধানাৎ সূত্রকার-স্বরসো হেত্বাভাস-ত্রিত্বে চকারস্তূক্তসমুচ্চয়ার্থ ইতি তত্ত্বম্।"

বৌদ্ধাচার্য্য দিঙ্‌নাগও বলিয়াছেন,—"ত্রিরূপাল্লিঙ্গাদ্‌যদনুমেয়ে জ্ঞানং তদনুমানম্।" ('ন্যায়প্রবেশ')। প্রাচীন আলঙ্কারিক ভামহও কাব্যালঙ্কার গ্রন্থে (৫ম অঃ) বলিয়াছেন, "হেতুস্ত্রিলক্ষণো জ্ঞেয়ো হেত্বাভাসো বিপর্য্যয়াৎ।" ধর্ম্মকীর্ত্তি স্পষ্ট বলিয়াছেন, "অসিদ্ধ-বিরুদ্ধানৈকান্তিকাস্ত্রয়ো হেত্বাভাসাঃ।"* (ন্যায়বিন্দু, ৩য় পঃ)। জৈন বাদিদেব সূরিও ঐ কথাই বলিয়াছেন। (প্রমাণনয়—ষষ্ঠ পঃ, ৪৭ সূঃ)। কিন্তু উক্ত জৈন মতে হেতু ত্রিলক্ষণ নহে, একলক্ষণ। বাদিদেব সূরি পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—"নিশ্চিতান্যথানুপপত্ত্যেকলক্ষণো হেতুঃ॥" "নতু ত্রিলক্ষণাদিঃ॥" (৩য় পঃ, ১১।১২)। অর্থাৎ অন্যথা অনুপপত্তি নিশ্চিত হইলে উহাই হেতুর একমাত্র লক্ষণ। যেমন বহ্নি ব্যতীত অন্যথা ধূমের উপপত্তি বা সত্তা সম্ভব হয় না, ইহা নিশ্চিত হওয়ায় ধূমে সেই অন্যথানুপপত্তিই বহ্নিসাধক হেতুর লক্ষণ। উক্ত গ্রন্থের টীকায় জৈন মহানৈয়ায়িক রত্নপ্রভাচার্য্য মতান্তর খণ্ডনপূর্ব্বক উক্ত মত সমর্থন করিতে যেরূপ সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন এবং ত্রিবিধ হেত্বাভাসের বহু অবান্তর প্রকারভেদের যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন,

---

* বৌদ্ধাচার্য্য দিঙ্‌নাগ পূর্ব্বোক্ত 'বিরুদ্ধাব্যভিচারী'কেও সংশয়প্রযোজক বলিলেও ধর্ম্মকীর্ত্তি উহাকে হেত্বাভাস বলেন নাই কেন? এতদুত্তরে তিনি পরে বলিয়াছেন,—"অনুমান-বিষয়েঽসম্ভবাৎ।" (ন্যায়বিন্দু) অর্থাৎ অনুমান স্থলে 'বিরুদ্ধাব্যভিচারী' হেতু সম্ভবই হয় না। ধর্ম্মকীর্ত্তি পরে তাঁহার যুক্তি বলিয়াছেন এবং তাঁহার "প্রমাণবিনিশ্চয়"নামক গ্রন্থে গোতমোক্ত 'প্রকরণসম' হেত্বাভাসের খণ্ডন করিতে অনেক কথা বলিয়াছেন। তাঁহার "বাদন্যায়" গ্রন্থের টীকায় শান্তরক্ষিতও 'ভাবিবিক্ত'নামক কোন ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যারও উল্লেখপূর্ব্বক প্রতিবাদ করিয়াছেন। 'বাদন্যায়', ১১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাহাও অবশ্য দ্রষ্টব্য। কিন্তু উক্ত মতেও "অসিদ্ধবিরুদ্ধানৈকান্তিকাস্ত্রয়ো হেত্বাভাসাঃ।" *

মীমাংসক প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায়ও উক্ত ত্রিবিধ হেত্বাভাসই স্বীকার করিয়াছেন। অনেকে গোতমোক্ত 'প্রকরণসমে'র খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, অনুমান স্থলে তুল্যবল বিরোধী হেতুদ্বয় সম্ভবই হইতে পারে না। কারণ, সেই উভয় হেতুর মধ্যে কোন হেতুর দুর্ব্বলত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। নচেৎ সেই স্থলে সেই সাধ্যধর্ম্ম বিষয়ে কোন দিনই সেই সংশয়-নিবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব উক্তরূপ 'প্রকরণসমে'র কোন উদাহরণই নাই। কিন্তু কুমারিল ভট্টের মতানুসারী পার্থসারথি মিশ্র 'শাস্ত্রদীপিকা'র তর্কপাদে প্রভাকরসম্প্রদায়ের উক্তরূপ যুক্তির খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, অনুমান স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর সপ্রতিপক্ষ হেতুদ্বয় অসম্ভব হইতে পারে না। তন্মধ্যে একতর হেতু বস্তুতঃ দুর্ব্বল হইলেও যে কাল পর্য্যন্ত মধ্যস্থগণের সেই হেতুর দুর্ব্বলত্বনিশ্চয় না জন্মে, তৎকাল পর্য্যন্ত সেই উভয় হেতুরই তুল্যবলত্ব স্বীকার্য্য হওয়ায় তৎকালে সেই উভয় হেতুই 'সপ্রতিপক্ষ' হইয়া দুষ্ট, ইহা স্বীকার্য্য। অর্থাৎ উক্তরূপ হেতুদ্বয়ের অনিশ্চিতবলাবলত্বই তুল্যবলত্ব। যে কাল পর্য্যন্ত একতর হেতুর দুর্ব্বলত্ব নিশ্চয় না জন্মে, তৎকাল পর্য্যন্তই সেই হেতুদ্বয় দুষ্ট হওয়ায় ঐ দোষ অনিত্য দোষ। †

কিন্তু মীমাংসক পার্থসারথি মিশ্র উক্তরূপ সপ্রতিপক্ষ হেতুদ্বয়কে পৃথক্ হেত্বাভাস বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—"অনৈকান্তিকং দ্বিবিধং সব্যভিচারং

* দিগম্বর জৈনসম্প্রদায় "অকিঞ্চিৎকর" নামে চতুর্থ প্রকার হেত্বাভাসও স্বীকার করিয়াছেন। "হেত্বাভাসা অসিদ্ধবিরুদ্ধানৈকান্তিকাকিঞ্চিৎকরাঃ।" (পরীক্ষামুখসূত্র)। যে পদার্থ পূর্ব্বসিদ্ধ, অথবা প্রত্যক্ষপ্রমাণবাধিত, তাহার সাধনের জন্য কোন হেতুর প্রয়োগ করিলে সেই হেতু 'অকিঞ্চিৎকর'নামক হেত্বাভাস। কিন্তু রত্নপ্রভাচার্য্য উক্ত জৈন মতেরও খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, উক্তরূপ স্থলে অতিরিক্ত হেত্বাভাস স্বীকার করা অনাবশ্যক। আর যাহা পক্ষদোষ, তাহাকে হেতুর দোষ বলা যায় না।

† প্রাচীন নৈয়ায়িক সম্প্রদায়েরও ইহাই মত। "তত্ত্বচিন্তামণি"কার নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের কথার দ্বারাও সরলভাবে ইহা বুঝা যায়। অবশ্য পরে "দীধিতি"কার রঘুনাথ শিরোমণি গঙ্গেশের সন্দর্ভের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া যুক্তির দ্বারা সৎপ্রতিপক্ষত্ব-দোষেরও নিত্যদোষত্বই সমর্থন করিয়াছেন এবং প্রাচীন মতে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পরে বলিয়াছেন, 'নির্যুক্তিকস্তু প্রবাদো ন শ্রদ্ধেয়ঃ।' কিন্তু পরে ন্যায়সূত্রবৃত্তিকার নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথও গোতমোক্ত 'প্রকরণসম' হেত্বাভাসের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, "অয়ঞ্চ দশাবিশেষে দোষ ইত্যতঃ সদ্ধেতোরপি বিরোধিপরামর্শকালে দুষ্টত্বমিষ্টমেবেত্যবধেয়ং।"

সপ্রতিসাধনঞ্চ।" বস্তুতঃ উদ্দ্যোতকরও উক্ত মতান্তরের উল্লেখ করায় উহাও প্রাচীন মত। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতির মতে 'প্রকরণসম' হেতুদ্বয় সব্যভিচারের ন্যায় পরে সাধ্যধর্ম্মের সংশয়প্রযোজক না হওয়ায় উহাকে 'অনৈকান্তিক' হেত্বাভাসের প্রকারবিশেষ বলা যায় না। আর মতান্তরে 'প্রকরণসম' হেতুদ্বয়ের প্রয়োগ স্থলে তৎপ্রযুক্ত পরে সেই 'প্রকরণ'দ্বয় বিষয়ে সংশয় অথবা সংশয়াকার অনুমিতি জন্মিলেও উহা 'অনৈকান্তিক' হেত্বাভাস হইতে ভিন্ন। কারণ, 'অনৈকান্তিক' স্থলে একই হেতু এবং সেই হেতুই দুষ্ট। কিন্তু 'প্রকরণসম' স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর সেই উভয় হেতুই দুষ্ট। অনৈকান্তিক স্থলে উক্তরূপ হেতুদ্বয়ের প্রয়োগ হয় না। সুতরাং মহর্ষি গোতম 'প্রকরণসম' নামে পৃথক্ হেত্বাভাসই বলিয়াছেন।

মহর্ষি গোতমের যুক্তি বুঝা যায় যে, উক্তরূপ হেতুদ্বয়ের পরামর্শ জন্মিলে তজ্জন্য মধ্যস্থগণের কোন পক্ষেরই অনুমিতিরূপ নির্ণয় জন্মে না। সুতরাং তন্মধ্যে কোন্ হেতু সমীচীন বা প্রকৃত হেতু, এইরূপ জিজ্ঞাসা জন্মে। কিন্তু সেই উভয় হেতুকেই প্রকৃত হেতু বলিয়া বুঝিলে তাঁহাদিগের ঐরূপ জিজ্ঞাসা জন্মিতে পারে না। পরন্তু যখন উক্তরূপ হেতুদ্বয়ের প্রয়োগ হইলে পরস্পর প্রতিবন্ধবশতঃ কোন হেতুর দ্বারাই অনুমিতি জন্মে না, তখন তৎকালে উক্তরূপ উভয় হেতুকেই দুষ্ট বলিয়া স্বীকার্য্য। কারণ, যাহা প্রকৃত হেতু নহে, তাহাকে নির্দ্দোষ বলা যায় না। যে স্থলে যে হেতুর পরামর্শ তাহার সাধ্য বিষয়ে যথার্থ অনুমিতির যোগ্য, সেই স্থলে তাদৃশ হেতুই প্রকৃত হেতু এবং তাহাই 'হেত্বাভাস' শব্দের অন্তর্গত 'হেতু' শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে। সুতরাং 'সৎপ্রতিপক্ষ' হেতুদ্বয়ে যে, প্রকৃত হেতুর কোন এক লক্ষণ নাই, ইহা স্বীকার্য্য হওয়ায় অসৎপ্রতিপক্ষত্বই সেই লক্ষণ, ইহাই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে সেই লক্ষণের অভাবেই উক্তরূপ হেতুদ্বয় অহেতু বা হেত্বাভাস, ইহা স্বীকার্য্য। সৎপ্রতিপক্ষত্বই উক্তরূপ হেতুদ্বয়ের দোষ।

এইরূপ পূর্ব্বোক্ত 'বাধিত' হেতুতে বাধদোষ স্বীকার করিয়া 'কালাতীত' বা 'বাধিত' নামে পঞ্চম হেত্বাভাসও স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বৈশেষিকাদি মতে উক্তরূপ স্থলে পক্ষদোষ বা প্রতিজ্ঞার দোষই স্বীকৃত হওয়ায় নানারূপ প্রতিজ্ঞাভাসই কথিত হইয়াছে। যদিও 'ব্যোমবতী বৃত্তি'তে (৫৬৫ পৃঃ) ব্যোমশিবাচার্য্য, কণাদের মতেও 'কালাতীত' হেত্বাভাস সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু প্রশস্তপাদ যে, উক্তরূপ স্থলে প্রতিজ্ঞাভাসই বলিয়াছেন, ইহাই স্পষ্ট বুঝা

যায় (পূর্ব্ব ২৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। দিঙ্‌নাগ প্রভৃতিও অনেক প্রকার 'প্রতিজ্ঞাভাস' বলিয়াছেন।* উদ্দ্যোতকর পূর্ব্বে প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ন্যায়াভাসের ব্যাখ্যা করিতে দিঙ্‌নাগোক্ত যে উদাহরণের খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে (৩৪ পৃ:) লিখিত হইয়াছে। উদ্দ্যোতকর পরে গোতমের প্রতিজ্ঞাসূত্রের বার্ত্তিকেও দিঙ্‌নাগোক্ত প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ 'প্রতিজ্ঞাভাসে'র উদাহরণের খণ্ডন করিতে সেই পূর্ব্বকথাই বলিয়াছেন। পরে বলিয়াছেন,—"প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধস্তু ন বুধ্যামহে" ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে, কেহ যদি **অচন্দ্রঃ শশী** অর্থাৎ শশী চন্দ্র শব্দের বাচ্য নহে, এরূপ প্রতিজ্ঞা বলেন, তাহা হইলে উহাকে বলা হইয়াছে,— **প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস।** উদ্দ্যোতকর ইহার প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে যে প্রমাণ দ্বারা শশীর চন্দ্রশব্দবাচ্যত্ব লোকপ্রসিদ্ধ হইয়াছে, সেই প্রমাণবিরুদ্ধত্বপ্রযুক্তই উহা প্রতিজ্ঞাভাস হওয়ায় উহাকে প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ বলা যায় না এবং উক্ত নামে পৃথক্ কোন প্রতিজ্ঞাভাস বলাও অনাবশ্যক। বস্তুতঃ সর্ব্বত্র বলবৎ প্রমাণবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাই 'প্রতিজ্ঞাভাস'। সেই প্রমাণের বলবত্তাও বিচার দ্বারা সিদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু নানারূপে সেই 'প্রতিজ্ঞাভাসে'র উদাহরণ-প্রদর্শনের জন্যই প্রাচীন কালে "প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ" নামে একপ্রকার 'প্রতিজ্ঞাভাস'ও কথিত হইয়াছে। উদ্দ্যোতকর উহার প্রতিবাদ করিলেও তাঁহার পরে কুমারিল ভট্টও সাম্প্রদায়িক মতানুসারে বলিয়াছেন,— "চন্দ্রশব্দাভিধেয়ত্বং শশিনো যো নিষেধতি। স সর্ব্বলোকসিদ্ধেন চন্দ্রজ্ঞানেন বাধ্যতে॥"—(শ্লোকবার্ত্তিক, অনু-প:, ৬৪)। পরে জয়ন্ত ভট্টও বলিয়াছেন,— "ন চন্দ্রঃ শশীতি লোকপ্রসিদ্ধিবিরুদ্ধঃ।"—('ন্যায়মঞ্জরী', ৫৭২ পৃ:)।

এইরূপ 'দৃষ্টান্তভাস'ও নানাপ্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অনুমান স্থলে দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত পদার্থে সাধ্যধর্ম্ম অথবা হেতু না থাকিলে অথবা ঐ উভয়ই না থাকিলে অথবা অন্য কোনরূপ দৃষ্টান্তদোষ থাকিলে সেই পদার্থকে বলে **দৃষ্টান্তাভাস।** প্রশস্তপাদ ও ভাসর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি নানাপ্রকার 'দৃষ্টান্তাভাসের'ও বর্ণন করিয়াছেন। **ন্যায়প্রবেশে** বৌদ্ধাচার্য্য দিঙ্‌নাগও দশবিধ 'দৃষ্টান্তাভাস' বলিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি গোতম 'দৃষ্টান্তাভাসে'র উল্লেখ করেন নাই কেন? এতদুত্তরে বরদরাজ বলিয়াছেন,—"অন্তর্ভাবো যতস্তেষাং হেত্বাভাসেষু পঞ্চসু।"

---

* যথা—'প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ', 'অনুমানবিরুদ্ধ', 'সাধারণমতবিরুদ্ধ', 'স্বসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ', 'স্ববচনবিরুদ্ধ', 'অপ্রসিদ্ধপক্ষ', 'অপ্রসিদ্ধসাধ্য', 'উভয়াপ্রসিদ্ধ', 'প্রসিদ্ধবিরুদ্ধ' ইত্যাদি। 'ন্যায়মঞ্জরী'—(৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বপ্রকার 'দৃষ্টান্তাভাস' স্থলেই সেই হেতু গোতমোক্ত পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের অন্তর্গত কোন হেত্বাভাস অবশ্যই হইবে। সুতরাং সেই সমস্ত স্থলে সেই হেতুই দুষ্ট হওয়ায় হেত্বাভাসই বক্তব্য। বরদরাজ পরে কয়েকপ্রকার দৃষ্টান্তাভাসের উদাহরণে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

এইরূপ পূর্ব্বোক্ত 'প্রতিভাস' স্থলেও অর্থাৎ যে সমস্ত স্থলে অনুমানের ধর্ম্মিরূপে গৃহীত পদার্থে কোন বলবৎ প্রমাণের দ্বারা সেই সাধ্য ধর্ম্মের অভাব নিশ্চিত, সেই সমস্ত স্থলে কোন হেতুর দ্বারাই সেই সাধ্য ধর্ম্মের অনুমিতি সম্ভব না হওয়ায় সমস্ত হেতুই দুষ্ট, ইহাও স্বীকার্য্য। যেমন 'অগ্নিরনুষ্ণো দ্রব্যত্বাৎ জলবৎ', এইরূপ প্রয়োগে দ্রব্যত্ব হেতু দুষ্ট অর্থাৎ উহা প্রকৃত হেতু নহে, কিন্তু হেত্বাভাস। যদিও উক্ত হেতুতে ব্যভিচার দোষপ্রযুক্তই উহাকে দুষ্ট বলা যায়, কিন্তু উহাতে 'বাধ'দোষও স্বীকার্য্য এবং উহাই প্রধান দোষ। কারণ, পূর্ব্বেই অগ্নিতে প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা অনুষ্ণত্বরূপ সাধ্যধর্ম্মের অভাব (উষ্ণত্ব) সিদ্ধ হওয়ায় অনুষ্ণত্ববিশিষ্ট অগ্নিরূপ পক্ষ সম্ভাবিতই নহে। সম্ভাবিত পক্ষই কোন হেতুর দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে। নচেৎ কোন হেতুর দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। তাই কথিত হইয়াছে,—**সম্ভাবিতঃ প্রতিজ্ঞায়াং পক্ষঃ সাধ্যেত হেতুনা। ন তত্র হেতুভিস্ত্রাণমুৎপতন্নেব যো হতঃ॥** সুতরাং উক্তরূপ স্থলে কোন হেতুই প্রকৃত হেতু হইতে পারে না। উক্তরূপ স্থলে প্রথমেই অনুমানের ধর্ম্মীতে সেই সাধ্য ধর্ম্মের অভাব নিশ্চয়রূপ বাধনিশ্চয় অনুমিতির বাধক হওয়ায় সেই হেতু যে, উক্তরূপে 'বাধিত', ইহাই নিশ্চিত হয়। সুতরাং উহা যে, সেই স্থলে প্রকৃত হেতু হইতে পারে না. ইহা প্রথমে সেই বাধদোষপ্রযুক্তই বুঝা যায়। তাই 'অবাধিতত্ব'ও হেতুর লক্ষণমধ্যে গ্রহণ করিয়া, সেই পঞ্চম লক্ষণের অভাবপ্রযুক্ত উক্তরূপ হেতুকে 'কালাতীত' বা বাধিত নামে পঞ্চম হেত্বাভাস বলা হইয়াছে।

পরন্তু ব্যভিচারাদি দোষশূন্য কেবল বাধিত হেতুরও প্রয়োগ হইতে পারে। যেমন 'শিখরাবচ্ছিন্নঃ পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ', এইরূপ প্রয়োগ করিলে উক্ত স্থলে ধূম হেতুতে ব্যভিচারাদি অন্য কোন দোষ না থাকায় উহাকে অন্য কোন প্রকার হেত্বাভাস বলা যায় না। কিন্তু উক্ত স্থলে ধূম হেতুর দ্বারা শিখরাবচ্ছিন্ন পর্ব্বতে বহ্নির যথার্থ অনুমিতি সম্ভব হয় না। কারণ, পর্ব্বতের উচ্চ শিখরে

বহ্নির অভাব পূর্ব্বেই প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় শিখরাবচ্ছিন্ন পর্ব্বত যে বহ্নিশূন্য, ইহা পূর্ব্বেই নিশ্চিত। সুতরাং উক্ত স্থলে ব্যভিচারাদি দোষশূন্য ধূমহেতুও প্রকৃত হেতু হয় না। অতএব উহা যে বাধিত নামে পঞ্চম প্রকার হেত্বাভাস, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। ব্যোমশিবাচার্য্য সমস্ত 'প্রতিজ্ঞাভাস' স্থলেই প্রতিজ্ঞার দোষ স্বীকার করিয়াও হেতুর দোষও সমর্থন করিতে অন্য ভাবে বহু সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন। কিন্তু গৌতমমত-ব্যাখ্যাতা জয়ন্ত ভট্ট অন্য সম্প্রদায়ের কথিত সমস্ত পক্ষদোষ ও দৃষ্টান্তদোষকে বস্তুতঃ সেই স্থলে হেতুর দোষই বলিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন—"অতএব চ শাস্ত্রেঽস্মিন্ মুনিনা তত্ত্বদর্শিনা। পক্ষাভাসাদয়োনোক্তা হেত্বাভাসাস্তু দর্শিতাঃ॥"

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, মহর্ষি গোতমক্ত পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের অবান্তর প্রকারভেদে হেত্বাভাস অসংখ্য প্রকার হইতে পারে। 'ন্যায়বার্ত্তিকে' উদ্দ্যোতকর তাহার বহু বর্ণন করিয়াছেন। উদাহরণের সহিত সংক্ষেপে তাহার ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। সুতরাং অতিবাহুল্যভয়ে এবারও তাহার ব্যাখ্যা করা সম্ভব হইল না। কিন্তু উদ্দ্যোতকরের মতেও সেই সমস্ত হেত্বাভাসই গোতমোক্ত পঞ্চবিধ হেত্বাভাসেরই অন্তর্গত। তাই তিনিও পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—"বিভাগোদ্দেশো নিয়মার্থ ইত্যুক্তম্।" যাঁহারা গৌতম মতেও 'সিদ্ধসাধন' এবং 'অপ্রযোজক' নামে পৃথক্ হেত্বাভাসই স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের উক্ত মতের খণ্ডন করিতে 'কুসুমাঞ্জলি'র তৃতীয় স্তবকে উদয়নাচার্য্যও বলিয়াছেন,—"তদসৎ, বিভাগস্য ন্যূনাধিকসংখ্যাব্যবচ্ছেদফলত্বাৎ। ক তর্হি দ্বয়োরন্তর্নিবেশঃ? অসিদ্ধ এব" ইত্যাদি তাৎপর্য্য এই যে, মহর্ষি গোতমের হেত্বাভাসবিভাগসূত্রের দ্বারা তাঁহার মতে হেত্বাভাসের সংখ্যা উহা হইতে ন্যূনও নহে, অধিকও নহে, ইহাই সূচিত হইয়াছে। নচেৎ ঐ সূত্র ব্যর্থ হয়। অতএব তাঁহার মতে উক্ত 'সিদ্ধসাধন' ও 'অপ্রযোজক' পৃথক্ হেত্বাভাস নহে, ইহা স্বীকার্য্য। উদয়নাচার্য্যের মতে 'সিদ্ধসাধন' ও 'অপ্রযোজক' যে, গোতমোক্ত 'সাধ্যসম' বা 'অসিদ্ধ' হেত্বাভাসেরই প্রকারবিশেষ, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ফলকথা, মহর্ষি গোতমের মতে হেত্বাভাস পঞ্চবিধই। তাই তিনি প্রথমে হেত্বাভাসের বিভাগসূত্র বলিয়াছেন,—**সব্যভিচার-বিরুদ্ধ-প্রকরণসম-সাধ্যসম-কালাতীতা হেত্বাভাসাঃ॥ ৯॥**

হেত্বাভাসলক্ষণপ্রকরণ সমাপ্ত॥

ভাষ্য। অথ ছলম্—

সূত্র। বচনবিঘাতোঽর্থবিকল্পোপপত্ত্যা ছলং ॥ ১০ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—অতঃপর 'ছল' (নিরূপিত হইয়াছে)। 'অর্থবিকল্প'—অর্থাৎ বাদীর অভিমত অর্থের বিরুদ্ধার্থ-কল্পনারূপ উপপত্তির দ্বারা (বাদীর) বচনের বিঘাত 'ছল'।

ভাষ্য। ন সামান্যলক্ষণে ছলং শক্যমুদাহর্ত্তুং, বিভাগে তূদাহরণানি।

অনুবাদ—সামান্য লক্ষণে ছলের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পারা যায় না। কিন্তু বিভাগে অর্থাৎ বিশেষ লক্ষণে উদারহণত্রয় বক্তব্য।

ভাষ্য। বিভাগশ্চ—

সূত্র। তৎ ত্রিবিধং—বাক্‌ছলং সামান্যচ্ছলমুপচারচ্ছলঞ্চ ॥ ১১ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—'বিভাগ' অর্থাৎ ছলের বিভাগসূত্র (বলিতেছেন)। সেই ছল ত্রিবিধ—(১) 'বাক্‌ছল', (২) 'সামান্যছল' ও (৩) 'উপচারছল'।

টিপ্পনী—মহর্ষি 'হেত্বাভাস' পদার্থের লক্ষণের পরে ক্রমানুসারে পৃথক্ প্রকরণের দ্বারা 'ছল'পদার্থের নিরূপণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার ইহাই ব্যক্ত করিতে প্রথমে বলিয়াছেন, **অথ ছলম্**। মহর্ষি প্রথম সূত্রের দ্বারা 'ছল'পদার্থের সামান্য লক্ষণ বলিয়া দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা উহার বিভাগ করিয়াছেন। ভাষ্যকার পূর্ব্বেই (৮০-৮১ পৃঃ) ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু সরলার্থ বুঝিযা এখানে উক্ত সূত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যা করেন নাই। বাচস্পতি মিশ্র প্রথম সূত্রে **অর্থবিকল্পোপপত্ত্যা** এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"যথা বক্তুরভিমতোঽর্থস্ততো বিরুদ্ধোঽর্থস্তস্য বিকল্পঃ কল্পনা, সৈবোপপত্তিস্তয়া।" অর্থাৎ বক্তার অভিমত বা বিবক্ষিত যে শব্দার্থ অথবা বাক্যার্থ, তাহার বিরুদ্ধ অর্থই এই সূত্রে **অর্থ** শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে এবং **বিকল্প** শব্দের অর্থ কল্পনা। তাহা হইলে বুঝা যায়, বক্তার অভিমত অর্থের বিরুদ্ধার্থের কল্পনাই সূত্রোক্ত **অর্থবিকল্প**। সেই অর্থবিকল্পরূপ **উপপত্তির** দ্বারা বক্তার বচনের বিঘাতই ছল, ইহাই সূত্রার্থ। অর্থাৎ যেরূপেই হউক, বাদীর বাক্যের অন্যরূপ তাৎপর্য্য কল্পনা করিয়া, তদ্দারা

প্রতিবাদীর যে প্রতিষেধ অর্থাৎ বাদীর প্রযুক্ত হেতু অথবা সেই বাক্যের কোন দোষপ্রদর্শক যে অসদুত্তর, তাহাই 'ছল'পদার্থ।

'ছলে'র উক্তরূপ সামান্য লক্ষণে ইহার কোন উদাহরণ প্রদর্শন করা যায় না। উদাহরণ প্রদর্শন করিতে হইলে কোন বিশেষ 'ছল'ই গ্রহণ করিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার প্রথমোক্ত সামান্যলক্ষণসূত্র-ভাষ্যে বলিয়াছেন, ... **বিভাগে তূদাহরণানি**। বাচস্পতি মিশ্র এখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"বিভজ্যত ইতি বিভাগো বিশেষলক্ষণং, তস্মিন্নুদাহরণানি।" এখানে ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত 'বিভাগ' শব্দ যে সমানার্থ, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র পরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"ন্যূনাধিক-সংখ্যাব্যবচ্ছেদার্থং বিভাগমবতারয়তি বিভাগশ্চেতি। বিভজ্যতেঽনেনেতি বিভাগঃ সূত্রমুচ্যতে।" অর্থাৎ উক্তরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে শেষোক্ত **বিভাগ** শব্দের অর্থ বিভাগসূত্র। 'ছল'পদার্থ বহু প্রকারে বহু হইলেও সমস্ত ছলই উক্ত ত্রিবিধ ছলেরই অন্তর্গত, এইরূপ নিয়মার্থ ই মহর্ষি পরে "তৎ ত্রিবিধং" ইত্যাদি বিভাগসূত্রটি বলিয়াছেন। কোন কোন পুস্তকে এই সূত্রের শেষে 'ইতি' শব্দ আছে। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি 'ইতি'শব্দান্ত সূত্রপাঠ গ্রহণ করেন নাই॥ ১০-১১ ॥

ভাষ্য। তেষাং—

সূত্র। অবিশেষাভিহিতেঽর্থে বক্তুরভিপ্রায়াদর্থান্তরকল্পনা বাক্‌চ্ছলম্ ॥১২॥৫৩॥

অনুবাদ—সেই ত্রিবিধ ছলের মধ্যে অবিশেষে উক্ত হইলে অর্থাৎ দ্বিবিধ অর্থের বোধক সমান শব্দ প্রয়োগ করিলে অর্থ বিষয়ে বক্তার অভিপ্রেত অর্থ হইতে ভিন্ন অর্থের কল্পনা অর্থাৎ ঐরূপ অর্থান্তরকল্পনার দ্বারা যে দোষপ্রদর্শন, তাহা বাক্‌ছল।

ভাষ্য। নবকম্বলোঽয়ং মাণবক ইতি প্রয়োগঃ। অত্র নবঃ কম্বলোঽস্যেতি বক্তুরভিপ্রায়ঃ। বিগ্রহে তু বিশেষো ন সমাসে। তত্রায়ং ছলবাদী বক্তুরভিপ্রায়াদবিবক্ষিতমন্যমর্থং নব কম্বলা অস্যেতি তাবদভিহিতং ভবতেতি কল্পয়তি। কল্পয়িত্বা চাসম্ভবেন

প্রতিষেধতি, একোঽস্য কম্বলঃ কুতো নব কম্বলা ইতি। তদিদং সামান্যশব্দে বাচি ছলং বাক্‌ছলমিতি।

অস্য প্রত্যবস্থানং—সামান্যশব্দস্যানেকার্থত্বেঽন্যতরাভিধানকল্পনায়াং বিশেষবচনং। নবকম্বল ইত্যনেকার্থস্যাভিধানং, নবঃ কম্বলোঽস্য নব কম্বলা অস্যেতি। এতস্মিন্ প্রযুক্তে যেয়ং কল্পনা, নব কম্বলা অস্যেত্যেতদ্‌ভবতাঽভিহিতং, তচ্চ ন সম্ভবতীতি। এতস্যামন্যতরাভিধানকল্পনায়াং বিশেষো বক্তব্যঃ, যস্মাদ্‌বিশেষো বিজ্ঞায়তেঽয়মর্থোঽনেনাভিহিত ইতি। স চ বিশেষো নাস্তি, তস্মান্মিথ্যাভিযোগমাত্রমেতদিতি।

প্রসিদ্ধশ্চ লোকে শব্দার্থসম্বন্ধোঽভিধানাভিধেয়নিয়মনিয়োগঃ,। অস্যাভিধানস্যায়মর্থোঽভিধেয় ইতি সমানঃ সামান্যশব্দস্য, বিশেষো বিশিষ্টশব্দস্য। প্রযুক্তপূর্ব্বাশ্চেমে শব্দা অর্থে প্রযুজ্যন্তে, নাপ্রযুক্তপূর্ব্বাঃ। প্রয়োগশ্চার্থসম্প্রত্যয়ার্থঃ, অর্থপ্রত্যয়াচ্চ ব্যবহার ইতি। তত্রৈবমর্থগত্যর্থে শব্দপ্রয়োগে সামর্থ্যাৎ সামান্যশব্দস্য প্রয়োগনিয়মঃ। অজাং গ্রামং নয়, সর্পিরাহর, ব্রাহ্মণং ভোজয়েতি সামান্যশব্দাঃ সন্তোঽর্থাবয়বেষু প্রযুজ্যন্তে সামর্থ্যাৎ, যত্রার্থক্রিয়াদেশনা সম্ভবতি, তত্র প্রবর্ত্তন্তে নার্থসামান্যে, ক্রিয়াদেশনাঽসম্ভবাৎ। এবময়ং সামান্যশব্দো নবকম্বল ইতি, যোঽর্থঃ সম্ভবতি নবঃ কম্বলোঽস্যেতি, তত্র প্রবর্ত্ততে, যস্তু ন সম্ভবতি নব কম্বলা অস্যেতি, তত্র ন প্রবর্ত্ততে। সোঽয়মনুপপদ্যমানার্থ কল্পনয়া পরবাক্যোপালম্ভো ন কল্পত ইতি।

অনুবাদ—"নবকম্বলোঽয়ং মাণবকঃ," এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। এই স্থলে এই বালকের নূতন কম্বল, ইহাই বক্তার অভিপ্রেত। বিগ্রহেই অর্থাৎ 'নবকম্বল' এই পদের ব্যাসবাক্যেই বিশেষ আছে, সমাসে বিশেষ নাই।

সেই স্থলে এই ছলবাদী 'এই বালকের নবসংখ্যক কম্বল, ইহা আপনি বলিয়াছেন', এইরূপে বক্তার অভিপ্রেত অর্থ হইতে অবিবক্ষিত অন্য অর্থ কল্পনা করিলেন, কল্পনা করিয়া অসম্ভবপ্রযুক্ত প্রতিষেধক করিলেন, (যথা) 'এই বালকের একই কম্বল, নবসংখ্যক কম্বল কোথায়?' সেই এই সামান্য শব্দরূপ বাক্যনিমিত্তক ছল 'বাক্‌ছল'।

এই 'বাক্‌ছলে'র 'প্রত্যবস্থান' অর্থাৎ খণ্ডন (বলিতেছি)। সামান্য শব্দের অনেকার্থত্বপ্রযুক্ত একতর অর্থের অভিধান-কল্পনায় বিশেষবচন কর্ত্তব্য। (বিশদার্থ) 'নবকম্বল' এই শব্দের দ্বারা অনেক অর্থের অভিধান হয়, (যথা) ইহার নূতন কম্বল আছে এবং ইহার নবসংখ্যক কম্বল আছে অর্থাৎ উক্তরূপ অর্থে বহুব্রীহি সমাসে 'নবকম্বল' এই শব্দটি দ্ব্যর্থ। এই শব্দ প্রযুক্ত হইলে "ইহার নবসংখ্যক কম্বল, ইহা আপনা কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে," এইরূপ যে কল্পনা, তাহা কিন্তু সম্ভব হয় না, (কারণ) এই একতর অর্থবিশেষের অভিধান-কল্পনায় বিশেষ বক্তব্য, যে বিশেষপ্রযুক্ত 'ইহা কর্ত্তৃক এই অর্থই কথিত হইয়াছে,' এইরূপে বিশেষ অর্থ বুঝা যায়। কিন্তু সেই বিশেষ নাই। অতএব ইহা মিথ্যা অভিযোগ মাত্র।

পরন্তু অভিধান ও অভিধেয়ের (বাচক শব্দ ও তাহার বাচ্য অর্থের) 'নিয়মনিয়োগ' অর্থাৎ অর্থবিশেষে শব্দবিশেষের সংকেতরূপ শব্দার্থসম্বন্ধ লোকে প্রসিদ্ধই আছে। (বিশদার্থ) এই শব্দের এই অর্থ বাচ্য, এইরূপ সম্বন্ধ অর্থাৎ সেই অর্থ ও শব্দের বাচ্যবাচকভাব সম্বন্ধ সামান্য শব্দের পক্ষে সমান, বিশিষ্ট শব্দের পক্ষে বিশেষ। প্রযুক্তপূর্ব্বই অর্থাৎ পূর্ব্বকাল হইতেই প্রযুক্ত এই সমস্ত শব্দ অর্থবিশেষে প্রযুক্ত হইতেছে, অপ্রযুক্তপূর্ব্ব নহে। প্রয়োগও অর্থবোধার্থ, অর্থাৎ শব্দের অর্থ বোধের নিমিত্তই প্রয়োগ হয় এবং অর্থবোধ জন্যই ব্যবহার হয়। তাহা হইলে এইরূপ 'অর্থগত্যর্থ' অর্থাৎ অর্থের গতি বা জ্ঞান যাহার অর্থ বা প্রয়োজন, এমন শব্দ প্রয়োগে সামর্থ্যবশতঃ অর্থাৎ যোগ্যতাবশতঃই সামান্য শব্দের প্রয়োগ-নিয়ম আছে। যথা—'অজাং গ্রামং নয়', 'সর্পিরাহর', 'ব্রাহ্মণং ভোজয়', এই সমস্ত প্রয়োগে (অজা, সর্পিষ্‌ ও ব্রাহ্মণ শব্দ) সামান্য শব্দ হইয়াও সামর্থ্যবশতঃ অর্থবিশেষেই প্রবৃত্ত হয়, (অর্থাৎ) যে অর্থে অর্থক্রিয়ার 'দেশনা' (উপদেশ) সম্ভব হয়, সেই অর্থেই প্রবৃত্ত হয়, অর্থসামান্যে প্রবৃত্ত হয় না। কারণ, অর্থক্রিয়ার উপদেশ সম্ভব হয় না। [অর্থাৎ সমস্ত ছাগীকে গ্রামে লওয়া এবং সমস্ত ঘৃতের আহরণ এবং সমস্ত ব্রাহ্মণের ভোজনরূপ

অর্থক্রিয়ার উপদেশ সম্ভব না হওয়ায় উক্ত প্রয়োগত্রয়ে 'অজা', 'সর্পিষ্' ও 'ব্রাহ্মণ' শব্দের দ্বারা ছাগীবিশেষ, ঘৃতবিশেষ ও ব্রাহ্মণবিশেষেরই বোধ হইয়া থাকে।] এইরূপ 'নবকম্বল' ইহা সামান্য শব্দ অর্থাৎ সামান্যতঃ পূর্ব্বোক্ত অর্থদ্বয়ের বোধক শব্দ। ইহার নূতন কম্বল, এইরূপ যে অর্থ সম্ভব হয়, সেই অর্থেই প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ইহার নবসংখ্যক কম্বল, এই যে অর্থ সম্ভব হয় না, সেই অর্থে প্রবৃত্ত হয় না। অর্থাৎ উক্ত স্থলে 'নবকম্বল' শব্দ উক্তরূপ অসম্ভব অর্থের বোধক হইতে পারে না। অতএব সেই এই অনুপপদ্যমান অর্থের কল্পনার দ্বারা পরবাক্যের উপালম্ভ অর্থাৎ প্রতিষেধরূপ বিঘাত সম্ভব হইতে পারে না।

টিপ্পনী—সূত্রে **অবিশেষাভিহিতে** এই পদের দ্বারা অবিশেষে উক্ত শব্দবিশেষ অর্থাৎ অনেকার্থবোধক সামান্য শব্দই গৃহীত হইয়াছে। পরে **অর্থে** এই পদের দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে যে, সেই সামান্য শব্দে অর্থান্তর কল্পনা 'বাক্‌ছল' নহে, কিন্তু সেই শব্দ প্রযুক্ত হইলে তাহার প্রকৃতার্থে যে **অর্থান্তরকল্পনা** অর্থাৎ তদ্দ্বারা প্রতিষেধ, তাহাই **বাক্‌ছল**। বক্তার অভিপ্রেত অর্থ হইতে ভিন্ন অর্থই সেই অর্থান্তর। মহর্ষি ইহাই ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন, **বক্তু্রভিপ্রায়াৎ**। 'অভিপ্রেয়তে' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'অভিপ্রায়' শব্দের দ্বারা এখানে অভিপ্রেত অর্থও বুঝা যায়। ভাষ্যকার উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারাই সূত্রোক্ত বাক্‌ছলের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—**নবকম্বলোহয়ং মাণবক ইতি প্রয়োগঃ** ইত্যাদি। ভাষ্যকারের কথা এই যে, "নবঃ কম্বলোহস্য" এবং "নব কম্বলা অস্য" এইরূপ বিগ্রহবাক্যানুসারে বহুব্রীহি সমাসে **নবকম্বল** শব্দের দ্বারা যথাক্রমে নূতন কম্বলবিশিষ্ট এবং নবসংখ্যক কম্বলবিশিষ্ট, এই উভয় অর্থই বুঝা যায়। সুতরাং উক্ত 'নবকম্বল' শব্দের বিগ্রহবাক্যেই বিশেষ আছে, কিন্তু সমাসে বিশেষ নাই। অর্থাৎ একই বহুব্রীহি সমাসে উক্ত 'নবকম্বল' শব্দটি পূর্ব্বোক্ত উভয় অর্থের বোধক সামান্য শব্দ। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত "নবকম্বলোহয়ং মাণবকঃ" এই বাক্যে 'নবকম্বল' শব্দের 'নবঃ কম্বলোহস্য' এইরূপ বিগ্রহ-বাক্যানুসারে নূতনকম্বলবিশিষ্ট, এই অর্থই বক্তার অভিপ্রেত বা বিবক্ষিত। কিন্তু প্রতিবাদী সেই বক্তার অভিপ্রায় বুঝিয়াই হউক বা না বুঝিয়াই হউক, উক্ত বাক্যে 'নবকম্বল' শব্দের দ্বিতীয় অর্থের কল্পনা করিয়া বলিলেন,—**নব কম্বলা অস্যেতি তাবদভিহিতং ভবতা** অর্থাৎ এই মাণবকের নবসংখ্যক কম্বল, ইহা আপনি বলিয়াছেন, কিন্তু **একোহস্য কম্বলঃ, কুতো নব কম্বলাঃ**। প্রতিবাদীর উক্তরূপ প্রতিষেধ উক্ত স্থলে **বাক্‌ছল**। 'নবকম্বল'

এই সামান্য শব্দই উহার নিমিত্ত। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—"তদিদং সামান্যশব্দে বাচি ছলং বাক্‌ছলমিতি।" সামান্য শব্দই উক্ত বাচ্ শব্দের অর্থ। 'বাচি' এই পদে সপ্তমী বিভক্তির অর্থ নিমিত্তত্ব। বাচস্পতি মিশ্রও ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"বাচি নিমিত্তে ছলং বাক্‌ছলমিতি। নবকম্বল ইতি উভয়ত্রাপি সমানায়াং বাচি নিমিত্তভূতায়ামিত্যর্থঃ।"*

ভাষ্যকার পরে উক্ত 'বাক্‌ছলে'র খণ্ডন করিয়া, উহার অসদুত্তরত্ব বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, সামান্য শব্দের অনেকার্থত্বপ্রযুক্ত একতর অর্থবিশেষের অভিধান কল্পনায় কোন বিশেষ বক্তব্য,—যদ্দারা সেই অর্থই বক্তার বিবক্ষিত, ইহা প্রতিপন্ন হয়। পূর্ব্বোক্ত বাক্যে 'নবকম্বল' ইহা অনেক অর্থের অভিধান অর্থাৎ উক্তরূপ দ্ব্যর্থবোধক শব্দ। কিন্তু কোন বাদী ঐ শব্দের প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি কল্পনা করিয়া বলেন যে, 'ইহার নবসংখ্যক কম্বল, ইহা আপনি বলিয়াছেন,' তাহা হইলে তাঁহার ঐ কল্পনার মূল কোন বিশেষ তাঁহার বক্তব্য, যে বিশেষপ্রযুক্ত বাদী যে, উক্ত অর্থেই 'নবকম্বল' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু উক্ত স্থলে সেই বিশেষ হেতু কিছুই না থাকায় উক্তরূপ কল্পনা অযুক্ত। অতএব উহা প্রতিবাদীর মিথ্যা অভিযোগমাত্র। অর্থাৎ উক্তরূপ অমূলক কল্পনার দ্বারা বাদীর উক্ত বাক্যের বিঘাত হইতে পারে না। কারণ, বাদীর বিবক্ষিত প্রকৃতার্থে উক্তরূপ দোষ সম্ভবই হয় না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, বাদী কেন ঐরূপ দ্ব্যর্থ শব্দের প্রয়োগ করেন? তিনি "নূতনকম্বলোহয়ং মাণবকঃ" এইরূপ স্পষ্টার্থ বাক্য প্রয়োগ করেন না কেন? তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—**প্রসিদ্ধশ্চ লোকে** ইত্যাদি। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, উক্তরূপ প্রয়োগজন্য বাদীর কোন অপরাধ বলা যায় না। কারণ, 'অভিধান' ও 'অভিধেয়ে'র (বর্ণাত্মক শব্দ ও তাহার অর্থের) যে নিয়মনিয়োগ অর্থাৎ এই শব্দ হইতে এই অর্থ বুঝিতে হইবে, এইরূপ সংকেতবিশেষ, তাহাই শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ এবং উহা লোকে প্রসিদ্ধই আছে।

* এই বাক্‌ছলের বহু উদাহরণ সম্ভব হয়। অনুমান ভিন্ন অন্য স্থলেও ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু কোন অনুমানে নবকম্বলবত্ত্বকে হেতু বলিলে ঐ হেতুর অসিদ্ধি দোষ প্রদর্শনের জন্য উক্তরূপে প্রতিবাদীর ছলই ইহার প্রসিদ্ধ উদাহরণ। তাই 'ন্যায়পরিশিষ্টপ্রকাশে' বর্দ্ধমান উপাধ্যায় উক্ত উদাহরণ গ্রহণ করিয়াই বলিয়াছেন,—"নেপালাদাগতোহয়ং নবকম্বলবত্ত্বাদিত্যুক্তে কুতোহস্য নবকম্বলা এক এবাস্য কম্বলো যত ইতিবৎ" ইত্যাদি। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও উক্ত উদাহরণই বলিয়াছেন। উক্ত বাক্‌ছলের স্বরূপ ও উদাহরণ বিষয়ে উদয়নাচার্য্যের ব্যাখ্যাত বিশেষ মত 'ন্যায়পরিশিষ্ট-গ্রন্থে' (কলিকাতা সংস্কৃতসিরিজ, ৫৮, ৫৯ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ শব্দার্থবোদ্ধা ব্যক্তিগণ উহা জানেন। ঐ শব্দার্থসম্বন্ধ সামান্য শব্দের পক্ষে সমান এবং বিশিষ্ট শব্দের পক্ষে বিশেষ সম্বন্ধ। পরন্তু সুচিরকাল হইতেই ঐ সমস্ত শব্দ সেই সেই অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে, ঐ সমস্ত শব্দ অপ্রযুক্তপূর্ব্ব নহে। কারণ, অর্থ বোধের নিমিত্তই শব্দের প্রয়োগ হয় এবং সেই অর্থবোধজন্যই ব্যবহার হয়। সুতরাং ঐ সমস্ত শব্দের সেই সেই অর্থে প্রয়োগ না হইলে সুচিরকাল হইতে শব্দমূলক লোকব্যবহার চলিতে পারে না। অতএব ঐ সমস্ত শব্দার্থসম্বন্ধ যে, লোকসিদ্ধ, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে অর্থবোধার্থ যে শব্দ প্রয়োগ হইতেছে, তাহাতে সামান্য শব্দের অর্থাৎ অনেকার্থ শব্দের অর্থবিশেষে সামর্থ্য বা যোগ্যতাবশতঃ প্রয়োগের নিয়ম স্বীকার্য্য। ভাষ্যকার পরে ইহা সমর্থন করিতে উদাহরণ প্রদর্শনের জন্য বলিয়াছেন,—**অজাং গ্রামং নয়** ইত্যাদি।

ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, "অজাং গ্রামং নয়" ইত্যাদি বাক্যত্রয়ে যে 'অজা' শব্দ, 'সর্পিষ্' শব্দ ও 'ব্রাহ্মণ' শব্দের প্রয়োগ হয়, তাহা সামান্য শব্দ অর্থাৎ যথাক্রমে ছাগীমাত্র, ঘৃতমাত্র ও ব্রাহ্মণমাত্রের বোধক শব্দ। কিন্তু সামর্থ্য বা যোগ্যতাবশতঃ উক্ত স্থলে 'অজা' শব্দের দ্বারা ছাগীবিশেষ এবং 'সর্পিষ্' শব্দের দ্বারা ঘৃতবিশেষ এবং 'ব্রাহ্মণ' শব্দের দ্বারা ব্রাহ্মণবিশেষেরই বোধ হয়। কারণ, সমস্ত ছাগীকে গ্রামে লওয়া এবং সমস্ত ঘৃতের আহরণ এবং সমস্ত ব্রাহ্মণের ভোজনরূপ অর্থক্রিয়া সম্ভবই না হওয়ায় তাহার **দেশনা** অর্থাৎ আদেশ বা উপদেশ সম্ভব হয় না। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঐরূপ অর্থক্রিয়ার উপদেশ করিতে পারেন না। সুতরাং উক্ত স্থলে বক্তার তাৎপর্য্যবশতঃ ঐ 'অজা' প্রভৃতি সামান্য শব্দের দ্বারাও যথাসম্ভব বিশেষ অর্থই বুঝা যায়।*

---

* যেমন 'ঘটেন জলমানয়' এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে বক্তার তাৎপর্য্যবশতঃ 'ঘট' শব্দের দ্বারা ঘটত্বরূপে অচ্ছিদ্র ঘটবিশেষেরই বোধ হয়। উহা 'ঘট' শব্দের লাক্ষণিক অর্থ নহে। 'কুসুমাঞ্জলি'র পঞ্চম স্তবকের দ্বাদশ কারিকার বিবরণের ব্যাখ্যায় 'প্রকাশ' টীকাকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ও উক্ত বিষয়ে বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন,—"নহি ছিদ্রবাধানন্তরং ঘটপদেন ছিদ্রেতরত্বেনঘটজ্ঞানং জন্যতে, কিন্তু যোগ্যতয়া ছিদ্রং বিহায় যদ্ বস্তুগত্যা ছিদ্রেতরৎ, তস্য ঘটত্বেন জ্ঞানং"।......"নচ লক্ষণাপি, সাহি জহৎস্বার্থা অজহৎস্বার্থা বা, নাদ্যঃ, ঘটনানমুভবপ্রসঙ্গাৎ। নান্ত্যঃ, শক্যলক্ষ্যসাধারণৈকরূপাভাবাৎ। এবং সর্ব্বত্র সামান্যশব্দস্য বিশেষপরত্বে দ্রষ্টব্যং।" 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকা' গ্রন্থে দ্বিগু সমাসের লক্ষণ ব্যাখ্যায় জগদীশ তর্কালঙ্কারও বলিয়াছেন,—"পঞ্চমূলীত্যাদৌ তু মূলপঞ্চকত্বেনৈব মূলবিশেষেষু তাৎপর্য্যং, ন তু বিশেষরূপেণাপি।"

এইরূপ 'নবকম্বল' এই সামান্য শব্দের দ্বারাও যে স্থলে যে অর্থ সম্ভব বা যোগ্য হয়, সেই অর্থই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে নূতন কম্বলবিশিষ্ট, এই অর্থই সম্ভব হওয়ায় তাহাই গ্রাহ্য। সুতরাং উক্ত স্থলে নবসংখ্যক কম্বলবিশিষ্ট, এইরূপ অনুপপদ্যমান অর্থের কল্পনার দ্বারা বাদীর বচনবিঘাতরূপ প্রতিষেধ হইতে পারে না। অতএব উক্তরূপ **বাক্‌ছল** অসদুত্তর ॥ ১২ ॥

সূত্র। সম্ভবতোঽর্থস্যাতিসামান্যযোগাদ-
সম্ভূতার্থকল্পনা সামান্যচ্ছলম্ ॥১৩॥৫৪॥

অনুবাদ—সম্ভাব্যমান পদার্থের সম্বন্ধে অতি সামান্য ধর্ম্মের যোগবশতঃ অর্থাৎ যে সামান্য ধর্ম্মটি বক্তার বিবক্ষিত পদার্থকে অতিক্রম করিয়া অন্যত্রও থাকে, সেইরূপ সামান্য ধর্ম্মের সম্বন্ধবশতঃ অসম্ভব অর্থের যে কল্পনা অর্থাৎ সেই কল্পনার দ্বারা যে প্রতিষেধ, তাহা 'সামান্যছল'।

ভাষ্য। 'অহো খল্বসৌ ব্রাহ্মণো বিদ্যাচরণসম্পন্ন' ইত্যুক্তে কশ্চিদাহ, 'সম্ভবতি ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্প'দিতি। অস্য বচনস্য বিঘাতোঽর্থবিকল্পোপপত্ত্যাঽসম্ভূতার্থকল্পনয়া ক্রিয়তে। যদি ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ সম্ভবতি, ব্রাত্যেঽপি সম্ভবেৎ, ব্রাত্যোঽপি ব্রাহ্মণঃ, সোঽপ্যস্তু বিদ্যাচরণসম্পন্ন ইতি। যদ্‌বিবক্ষিতমর্থমাপ্নোতি চাত্যেতি চ তদতিসামান্যম্। যথা ব্রাহ্মণত্বং বিদ্যাচরণসম্পদং ক্বচিদাপ্নোতি, ক্বচিদত্যেতি। সামান্যনিমিত্তং ছলং সামান্যচ্ছলমিতি।

অস্য চ প্রত্যবস্থানং। অবিবক্ষিতহেতুকস্য বিষয়ানুবাদঃ, প্রশংসার্থত্বাদ্‌বাক্যস্য, তদত্রাসম্ভূতার্থকল্পনানুপপত্তিঃ। যথা সম্ভবন্ত্যস্মিন্ ক্ষেত্রে শালয় ইতি। অনিরাকৃতমবিবক্ষিতঞ্চ বীজজন্ম, প্রবৃত্তিবিষয়স্তু ক্ষেত্রং প্রশংস্যতে। সোঽয়ং ক্ষেত্রানুবাদো নাস্মিন্ শালয়ো বিধীয়ন্ত ইতি। বীজাত্তু শালিনির্ব্বৃত্তিঃ সতী ন বিবক্ষিতা। এবং সম্ভবতি ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পদিতি, সম্পদ্বিষয়ো ব্রাহ্মণত্বং ন সম্পদ্ধেতুঃ, ন চাত্র হেতুর্ব্বিবক্ষিতঃ,—

বিষয়ানুবাদস্ত্বয়ং, প্রশংসার্থত্বাদ্‌বাক্যস্য। সতি ব্রাহ্মণত্বে সম্পদ্ধেতুঃ সমর্থ ইতি। বিষয়ঞ্চ প্রশংসতা বাক্যেন যথাহেতুতঃ ফলনির্বৃত্তির্ন প্রত্যাখ্যায়তে, তদেবং সতি বচনবিঘাতোঽ-সম্ভূতার্থকল্পনয়া নোপপদ্যত ইতি।

অনুবাদ—'অহো খল্বসৌ ব্রাহ্মণো বিদ্যাচরণসম্পন্নঃ' এই বাক্য উক্ত হইলে অর্থাৎ কেহ কোন ব্রাহ্মণকে দেখিয়া 'এই ব্রাহ্মণ বিদ্যার আচরণসম্পন্ন' এই কথা বলিলে, কোন ব্যক্তি বলিলেন,—"সম্ভবতি ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ সম্ভব হয়। অসম্ভূত অর্থের কল্পনারূপ 'অর্থ-বিকল্পোপপত্তি'র দ্বারা এই বাক্যের বিঘাত করা হয়। (সে কিরূপ, তাহা বলিতেছেন) যদি ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ সম্ভব হয়, তাহা হইলে ব্রাত্যেও সম্ভব হউক ? ব্রাত্যও ব্রাহ্মণ, তিনিও বিদ্যাচরণসম্পন্ন হউন ? যাহা বিবক্ষিত পদার্থকে প্রাপ্ত হয় এবং অতিক্রমও করে, তাহা 'অতিসামান্য' অর্থাৎ তাদৃশ সামান্য ধর্ম্মই এই সূত্রোক্ত 'অতিসামান্য'। যেমন ব্রাহ্মণত্ব কোনও ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎকে প্রাপ্ত হয়, কোনও ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎকে অতিক্রম করে অর্থাৎ ব্রাহ্মণমাত্রের সামান্য ধর্ম্ম ব্রাহ্মণত্ব বিদ্যাচরণসম্পদের পক্ষে অতি সামান্য ধর্ম্ম। সামান্যধর্ম্মনিমিত্তক ছল 'সামান্যছল'।

এই 'সামান্যছলে'র খণ্ডন (বলিতেছি)। 'অবিবক্ষিতহেতুক' ব্যক্তির অর্থাৎ যিনি ব্রাহ্মণত্বকে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুরূপে বিবক্ষা করেন নাই, তৎ-কর্তৃক বিষয়ের অনুবাদ হইয়াছে, যেহেতু বাক্য অর্থাৎ উক্ত স্থলে দ্বিতীয় ব্যক্তির ঐ বাক্যটি প্রশংসার্থ অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্বের প্রশংসাই উহার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন। অতএব এই স্থলে অসম্ভূত অর্থের অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্বধর্ম্মে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুত্ব-রূপ অসম্ভব পদার্থের কল্পনার উপপত্তি হয় না।

যেমন "সম্ভবন্ত্যস্মিন্ ক্ষেত্রে শালয়ঃ"—এই বাক্য দ্বারা (সেই ক্ষেত্রে) 'বীজ-জন্ম' অর্থাৎ বীজ হইতে শালির উৎপত্তি নিরাকৃত হয় না, বিবক্ষিতও হয় না, কিন্তু প্রবৃত্তির বিষয় ক্ষেত্র প্রশংসিত হয়। সেই ইহা ক্ষেত্রের অনুবাদ, ইহাতে শালি বিহিত হয় না, বীজ হইতে যে শালির উৎপত্তি হয়, তাহা কিন্তু বিবক্ষিত নহে অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে বীজ রোপণ করিয়া শালি উৎপন্ন করিবে, ইহা উক্ত বাক্য দ্বারা বিবক্ষিত নহে। এইরূপ "সম্ভবতি ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ" এই বাক্য প্রয়োগ স্থলে ব্রাহ্মণত্ব সম্পদের বিষয়, সম্পদের

হেতু নহে। এই স্থলে হেতু বিবক্ষিতও নহে, কিন্তু ইহা বিষয়ের অনুবাদ, যেহেতু ঐ বাক্য প্রশংসার্থ, (অর্থাৎ) ব্রাহ্মণত্ব থাকিলে বিদ্যাচরণ-সম্পদের হেতু সমর্থ (সফল) হয়। বিষয়ের প্রশংসাকারী বাক্যের দ্বারা, যথা—হেতু হইতে অর্থাৎ যেরূপ কারণ যে কার্য্যের উৎপাদক, তাহা হইতে ফলোৎপত্তি নিরাকৃত হয় না অর্থাৎ সেই সমস্ত কারণ ব্যতীতও সেই ফলের উৎপত্তি হয়, ইহা বলা হয় না। অতএব এইরূপ হইলে অসদ্ভূত অর্থের কল্পনার দ্বারা বচনবিঘাত উপপন্ন হয় না।

টিপ্পনী—সামান্যধর্ম্মনিমিত্তক 'ছল', এই অর্থে দ্বিতীয় প্রকার 'ছলে'র নাম **সামান্যছল**। অতি সামান্য ধর্ম্মই উহার নিমিত্ত। তাই মহর্ষি উক্ত 'সামান্যছলে'র লক্ষণার্থ এই সূত্রে বলিয়াছেন,—**অতিসামান্যযোগাৎ**। অতিব্যাপক সামান্য ধর্ম্মই 'অতিসামান্য'। ভাষ্যকার ইহা ব্যক্ত করিতে পরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে ধর্ম্মটি বিবক্ষিত পদার্থকে প্রাপ্ত হয় এবং তাহাকে অতিক্রমও করে অর্থাৎ তাহার আধারে থাকিয়া অন্যত্রও থাকে, এমন ধর্ম্মকে 'অতিসামান্য' বলে। বক্তার বিবক্ষিত সম্ভাব্যমান পদার্থকেই মহর্ষি বলিয়াছেন, 'সম্ভবৎ' পদার্থ। তাহার সম্বন্ধে অতি সামান্য ধর্ম্মের সত্তাবশতঃ যে 'অসদ্ভূত' অর্থের অর্থাৎ অসম্ভব বাক্যার্থের কল্পনা অর্থাৎ তদ্দ্বারা প্রতিষেধ, তাহা 'সামান্যছল'। ভাষ্যকার উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারাই ইহার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন, **অহো খল্বসৌ** ইত্যাদি।

ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, কেহ কোন ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সানন্দে এই ব্রাহ্মণ বিদ্যাচরণসম্পন্ন, এই কথা বলিলে দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণত্বের প্রশংসার জন্য বলিলেন যে, ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণ-সম্পন্নতা সম্ভব হয়। পরে তৃতীয় ব্যক্তি উক্ত বচনের বিঘাতের উদ্দেশ্যে বলিলেন যে, যদি ব্রাহ্মণ হইলেই বিদ্যাচরণসম্পদ্ সম্ভব হয়, তাহা হইলে ব্রাত্যব্রাহ্মণও বিদ্যাচরণসম্পন্ন হউন? কারণ তাহাতেও ব্রাহ্মণত্ব জাতি আছে।* তৃতীয় বক্তার উক্তরূপ বাক্যই উক্ত স্থলে 'সামান্যছল'। ব্রাহ্মণত্বকে

* উপনয়নকাল অতীত হইলেও অনুপনীত ব্রাহ্মণকে ব্রাত্য ব্রাহ্মণ বলে। "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ" ইত্যাদি বচন অমূলক কল্পিত। অত্রিসংহিতায় "জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে। বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব চ।" (১৪০) এইরূপ বচনই আছে। আর পরে দশবিধ ব্রাহ্মণের লক্ষণও কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ মনু বলিয়াছেন,—"শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্ যাবদ্ বেদে ন জায়তে।" অনুপনীত ব্রাহ্মণসন্তান প্রথমে জন্মতঃ শূদ্রই হইলে মনু

বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুরূপে কল্পনা করিয়া, তাহাতে ব্যভিচার প্রদর্শনই উক্ত 'ছল'বাদীর মূল উদ্দেশ্য। বস্তুত উপনয়নসংস্কারবিশিষ্ট বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের বিদ্যাচরণসম্পন্নতাই সম্ভবৎ পদার্থ এবং উহাই দ্বিতীয় বক্তার বিবক্ষিত। অনুপনীত বা অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণেও ব্রাহ্মণত্ব জাতি থাকায় উহা ঐ বিদ্যাচরণ-সম্পদের পক্ষে অতিসামান্য ধর্ম্ম। সুতরাং উহা বিদ্যাচরণসম্পদের সাধক হেতু হইতে পারে না। অতএব ব্রাহ্মণত্বে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুত্ব অসদ্ভূত অর্থ। পূর্ব্বে ছলের সামান্যলক্ষণসূত্রে যে 'অর্থবিকল্প' কথিত হইয়াছে, তাহা কেবল কোন শব্দের অন্যার্থকল্পনা নহে ; কিন্তু বক্তার অবিবক্ষিত বাক্যার্থের কল্পনাও 'অর্থবিকল্প'। উক্ত স্থলে ব্রাহ্মণত্বে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুত্ব বক্তার বাক্যার্থ নহে। কারণ, তাহা অসম্ভব। উক্তরূপ অসম্ভব অর্থের কল্পনারূপ উপপত্তিই উক্ত স্থলে 'অর্থবিকল্পোপপত্তি'। ভাষ্যকার ইহাই ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,— "অস্য বচনস্য বিঘাতোঽর্থবিকল্পোপপত্ত্যাঽসদ্ভূতার্থকল্পনয়া ক্রিয়তে।"

ভাষ্যকার পরে উক্ত 'সামান্যছলে'র প্রত্যবস্থান (খণ্ডন) বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে ব্রাহ্মণত্ব বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু, ইহা দ্বিতীয় বক্তার বিবক্ষিত নহে। কিন্তু তাঁহার উক্ত বাক্যটি ব্রাহ্মণত্বরূপ বিষয়ের অনুবাদ। কোন উদ্দেশ্যে সিদ্ধ পদার্থের কথনকে 'অনুবাদ' বলে। ব্রাহ্মণত্বের প্রশংসার উদ্দেশ্যেই দ্বিতীয় বক্তা বলিয়াছেন, 'সম্ভবতি ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ।' কিন্তু ব্রাহ্মণত্বই যে, বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইলেই বিদ্বান্ হইবে, ইহা ঐ বক্তার তাৎপর্য্য নহে। কারণ, তাহা অসম্ভব। অতএব উক্ত স্থলে ব্রাহ্মণত্বে বিদ্যাচরণ-সম্পদের হেতুত্বরূপ অসম্ভব অর্থের কল্পনা করা যায় না। ভাষ্যকার পরে ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, যেমন কোন ব্যক্তি কোন উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র দেখিয়া বলিলেন, "সম্ভবন্ত্যস্মিন্ ক্ষেত্রে শালয়ঃ।" অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে শালি সম্ভব হয়। কিন্তু উক্ত বাক্য দ্বারা সেই ক্ষেত্রে শালি উৎপন্ন করিবে, এইরূপ বিধি ঐ বক্তার বিবক্ষিত নহে। বীজ ব্যতীতই সেই ক্ষেত্রে শালি জন্মে, ইহাও তাঁহার বিবক্ষিত নহে। কারণ, তাহা অসম্ভব। কিন্তু প্রবৃত্তির বিষয়

তাহাকে শূদ্রসম বলিয়াছেন কেন, ইহা বুঝা আবশ্যক। আর বহু শাস্ত্রবচনে শূদ্রতুল্য অর্থেই 'শূদ্র' শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে, ইহাও বুঝা আবশ্যক। পরন্তু দেখা আবশ্যক যে, 'মনুসংহিতা'র প্রথম অধ্যায়েই "বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ। ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ ॥" (৯৬।৯৭) ইত্যাদি বচনে অনুপনীত অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণসন্তানকেও ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। নচেৎ উক্ত বচনে "ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসঃ" এইরূপ উক্তি উপপন্ন হয় না।

সেই ক্ষেত্রের প্রশংসার উদ্দেশ্যেই ঐ বাক্য কথিত হওয়ায় উহা সেই ক্ষেত্ররূপ বিষয়ের অনুবাদ। এইরূপ ব্রাহ্মণত্ব বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু নহে এবং উক্ত স্থলে দ্বিতীয় বক্তার তাহা বিবক্ষিতও নহে। কিন্তু উহা বিদ্যাচরণসম্পদের বিষয়। ব্রাহ্মণত্ব থাকিলে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু (অধ্যয়নাদি) সমর্থ বা শীঘ্র সফল হয়, ইহা ব্রাহ্মণত্বের প্রশংসা। সেই প্রশংসার উদ্দেশ্যেই উক্ত বাক্য কথিত হওয়ায় উহা ব্রাহ্মণত্বরূপ বিষয়ের অনুবাদ। উক্ত বাক্যের দ্বারা বিদ্যাচরণসম্পদের যথোপযুক্ত কারণের প্রত্যাখ্যান হয় না। অতএব ব্রাহ্মণত্বে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুত্বরূপ অসম্ভব অর্থের কল্পনার দ্বারা উক্ত দ্বিতীয় বক্তার ঐ বাক্যের বিঘাত উপপন্ন হয় না ॥ ১৩ ॥

সূত্র। ধর্ম্মবিকল্প-নির্দ্দেশেহর্থ-সদ্‌ভাব-প্রতিষেধ উপচারচ্ছলম্ ॥ ১৪ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—ধর্ম্মবিকল্পের নির্দ্দেশ হইলে অর্থাৎ কোন শব্দের লাক্ষণিক বা গৌণ অর্থে প্রয়োগ হইলে অর্থসদ্‌ভাবের দ্বারা যে প্রতিষেধ, অর্থাৎ তাহার মুখ্যার্থ অবলম্বন করিয়া যে দোষ প্রদর্শন, তাহা 'উপচারছল'।

ভাষ্য। অভিধানস্য ধর্ম্মো যথার্থপ্রয়োগঃ। ধর্ম্মবিকল্পোঽন্যত্র দৃষ্টস্যান্যত্র প্রয়োগঃ। তস্য নির্দ্দেশে "ধর্ম্মবিকল্পনির্দ্দেশে"। যথা—মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতি অর্থসদ্ভাবেন প্রতিষেধঃ, মঞ্চস্থাঃ পুরুষাঃ ক্রোশন্তি, নতু মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি। কা পুনরত্রার্থবিকল্পোপপত্তিঃ ? অন্যথা প্রযুক্তস্যান্যথাঽর্থকল্পনং, ভক্ত্যা প্রয়োগে প্রাধান্যেন কল্পনং। উপচারবিষয়ং ছলমুপচারছলং। উপচারো নীতার্থঃ সহচরণাদিনিমিত্তেনাতদ্‌ভাবে তদ্বদভিধানমুপচার ইতি।

অত্র সমাধিঃ, প্রসিদ্ধে প্রয়োগে বক্তুর্যথাভিপ্রায়ং শব্দার্থয়োরনুজ্ঞা প্রতিষেধো বা ন ছন্দতঃ। প্রধানভূতস্য শব্দস্য ভাক্তস্য চ গুণভূতস্য প্রয়োগ উভয়োর্লোকসিদ্ধঃ। সিদ্ধপ্রয়োগে যথা বক্তুরভিপ্রায়স্তথা শব্দার্থাবনুজ্ঞেয়ৌ,

প্রতিষেধ্যো বা, ন ছন্দতঃ। যদি বক্তা প্রধানশব্দং প্রযুঙ্‌ক্তে, যথাভূতস্যাভ্যনুজ্ঞা প্রতিষেধো বা ন ছন্দতঃ, অথ গুণভূতং তদা গুণভূতস্য। যত্র তু বক্তা গুণভূতং শব্দং প্রযুঙ্‌ক্তে, প্রধানভূতমভিপ্রেত্য পরঃ প্রতিষেধতি, স্বমনীষয়া প্রতিষেধোঽসৌ ভবতি, ন পরোপালম্ভ ইতি।

অনুবাদ—'অভিধানে'র (শব্দের) ধর্ম্ম যথার্থ প্রয়োগ অর্থাৎ স্ব স্ব অর্থে প্রয়োগ। অন্য অর্থে দৃষ্ট শব্দের অন্য অর্থে প্রয়োগ অর্থাৎ লাক্ষণিক অর্থে প্রয়োগ 'ধর্ম্মবিকল্প'। তাহার নির্দ্দেশে 'ধর্ম্মবিকল্পনির্দ্দেশে'। অর্থাৎ সূত্রে উক্ত প্রথম পদের দ্বারা বুঝিতে হইবে, কোন শব্দের লাক্ষণিক অর্থে নির্দ্দেশ বা প্রয়োগ হইলে। যেমন "মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি" এই বাক্যের প্রয়োগ হইলে অর্থসদ্ভাবের দ্বারা অর্থাৎ উক্ত বাক্যে 'মঞ্চ' শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিষেধ করা হয় (যথা) মঞ্চস্থ পুরুষগণই ক্রোশন (আহ্বান) করে, কিন্তু মঞ্চ (উচ্চস্থ কাষ্ঠসংঘাত) ক্রোশন করে না। অর্থাৎ উক্তরূপ প্রতিষেধ উক্ত স্থলে 'উপচারছল'। (প্রশ্ন) এই স্থলে 'অর্থবিকল্পোপপত্তি' কি? (উত্তর) অন্যথাপ্রযুক্ত শব্দের অন্যথা অর্থের কল্পনা (অর্থাৎ) লক্ষণার দ্বারা প্রয়োগ হইলে প্রধানরূপে কল্পনা। [অর্থাৎ পূর্ব্বে ছলের সামান্যলক্ষণসূত্রে যে 'অর্থবিকল্পোপপত্তি' কথিত হইয়াছে, তাহা 'উপচারছলে' লাক্ষণিক অর্থে প্রযুক্ত শব্দের মুখ্যার্থ কল্পনারূপ উপপত্তি] উপচারবিষয়ক ছল উপচারছল। 'সহচরণ' প্রভৃতি নিমিত্তবশতঃ 'নীতার্থ' অর্থাৎ যেরূপ সম্বন্ধপ্রযুক্ত কোন শব্দ অন্য অর্থ নীত বা প্রাপিত হয়, সেই সম্বন্ধবিশেষই 'উপচার'। 'অতদ্ভাবে তদ্বৎ অভিধান উপচার।' অর্থাৎ মহর্ষি নিজেই পরে (২।২।৬২ম সূত্রে) ইহা বলিয়াছেন।

এই স্থলে সমাধান অর্থাৎ 'উপচারছলে'র খণ্ডন (বলিতেছি)। প্রসিদ্ধ প্রয়োগে বক্তার অভিপ্রায় বা তাৎপর্য্যানুসারেই শব্দ ও অর্থের স্বীকার অথবা প্রতিষেধ কর্ত্তব্য, স্বেচ্ছানুসারে কর্ত্তব্য নহে। (বিশদার্থ) প্রধানভূত শব্দের এবং 'ভাক্ত' (অর্থাৎ), গুণভূত (অপ্রধানভূত) শব্দের প্রয়োগ উভয় মতে লোকসিদ্ধ। লোকসিদ্ধ প্রয়োগে বক্তার অভিপ্রায় বা তাৎপর্য্যানুসারেই শব্দ ও অর্থ স্বীকার্য্য অথবা প্রতিষেধ্য, স্বেচ্ছানুসারে স্বীকার্য্য বা প্রতিষেধ্য নহে। (তাৎপর্য্য) যদি বক্তা প্রধানভূত শব্দকে অর্থাৎ মুখ্য শব্দকে প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে যথাভূত শব্দেরই স্বীকার অথবা প্রতিষেধ কর্ত্তব্য, স্বেচ্ছানুসারে কর্ত্তব্য নহে।

আর যদি বক্তা গুণভূত অর্থাৎ অপ্রধান শব্দকে প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে গুণভূত শব্দেরই স্বীকার অথবা প্রতিষেধ কর্ত্তব্য। কিন্তু যে স্থলে বক্তা গুণভূত শব্দকে প্রয়োগ করেন, সেই স্থলে অপর ব্যক্তি প্রধানভূত শব্দকে অভিপ্রায় করিয়া অর্থাৎ সেই গুণভূত শব্দকে প্রধান শব্দরূপে গ্রহণ করিয়া প্রতিষেধ করেন, তাহা হইলে এই প্রতিষেধ নিজবুদ্ধিমাত্রমূলক হয়, ইহা 'পরোপালম্ভ' অর্থাৎ সেই বাক্য-বক্তার বচনের বিঘাতরূপ প্রতিষেধ হয় না।

টিপ্পনী—তৃতীয় প্রকার 'ছলে'র নাম 'উপচারছল'। লোকসিদ্ধ গৌণ বা লাক্ষণিক অর্থে প্রযুক্ত কোন শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া যে প্রতিষেধ তাহাই ভাষ্যকার প্রভৃতির মতে 'উপচারছল'। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ তুল্যভাবে মুখ্য অর্থে প্রযুক্ত শব্দের গৌণ বা লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রতিষেধকও 'উপচারছল' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু উহা প্রাচীনসম্মত নহে। বস্তুতঃ শব্দের মুখ্য অর্থে প্রয়োগকেই **ঔৎসর্গিক** প্রয়োগ বলে। গৌণ বা লাক্ষণিক অর্থে প্রয়োগকে **ভাক্ত** প্রয়োগ বলে। মুখ্য অর্থই প্রথমে বুদ্ধির বিষয় হয় এবং কোন বাধক না থাকিলে 'মুখ্যে শব্দস্বরসঃ' এই ন্যায়ানুসারে মুখ্য অর্থই গ্রাহ্য। সুতরাং মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া যে প্রতিষেধ, তাহাই 'উপচারছল', এইরূপ ব্যাখ্যাই সঙ্গত। সূত্রে মহর্ষির **অর্থ-সদ্ভাবপ্রতিষেধঃ** এই পদের দ্বারাও তাঁহার উক্তরূপ তাৎপর্য্যই বুঝা যায়। মুখ্য ও গৌণ দ্বিবিধ অর্থের মধ্যে মুখ্য অর্থই সৎ অর্থাৎ প্রশস্ত। সুতরাং অর্থের সদ্ভাব বা প্রশস্ততার দ্বারা অর্থাৎ মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা যে প্রতিষেধ, তাহাই 'অর্থসদ্ভাব-প্রতিষেধ'। জয়ন্ত ভট্টও ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"অর্থসদ্ভাবপ্রতিষেধো মুখ্যার্থ-নিষেধঃ"। কিন্তু কোন মুখ্য অর্থে প্রযুক্ত শব্দের অপর মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া যে প্রতিষেধ, তাহা 'উপচারছল' নহে। তাই মহর্ষি 'উপচারছলে'র লক্ষণার্থ এই সূত্রে প্রথমে বলিয়াছেন,—**ধর্ম্মবিকল্প-নির্দ্দেশে**।

ভাষ্যকার উক্ত প্রথম পদের ব্যাখ্যা করিতে প্রথমোক্ত 'ধর্ম্ম' শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, শব্দের যথার্থ প্রয়োগ। অর্থাৎ সার্থক শব্দসমূহের স্ব স্ব অর্থে প্রয়োগরূপ ধর্ম্মই উক্ত 'ধর্ম্ম' শব্দের দ্বারা মহর্ষির বিবক্ষিত। সেই প্রয়োগরূপ ধর্ম্মের 'বিকল্প' অর্থাৎ বিবিধ কল্প বা প্রকারভেদই 'ধর্ম্মবিকল্প'। ভাষ্যকার উহার ফলিতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—**অন্যত্র দৃষ্টস্যান্যত্র প্রয়োগঃ।** বাচস্পতি মিশ্র ইহা ব্যক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"শব্দস্য ধর্ম্মঃ প্রয়োগঃ। তস্য বিকল্পো দ্বৈবিধ্যং, তস্যচ দ্বিবিধঃ প্রয়োগঃ প্রধানো ভাক্তশ্চ। তত্রাপি

প্রধান ঔৎসর্গিকঃ, তস্য তু কচিদপবাদাদ্ভাক্তো ভবতি। উৎসর্গস্য তু কুতশ্চিদ-পবাদাদন্যত্র দৃষ্টস্যান্যত্র প্রয়োগঃ।"* তাৎপর্য্য এই যে, সামান্যকে **উৎসর্গ** বলে এবং তাহার বাধককে **অপবাদ** বলে। অপবাদ কর্তৃক উৎসর্গ বাধিত হয়, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। কুমারসম্ভবের দ্বিতীয় সর্গে কালিদাসও বলিয়াছেন,—"অপবাদৈরিবোৎসর্গাঃ কৃতব্যাবৃত্তয়ঃ পরৈঃ।" শব্দ প্রয়োগ স্থলেও 'উৎসর্গ' ও 'অপবাদ' বুঝিতে হইবে। শব্দদ্বারা উৎসর্গতঃ মুখ্য অর্থেরই বোধ হওয়ায় সেই বোধকে বলে **ঔৎসর্গিক বোধ** এবং মুখ্য অর্থে শব্দপ্রয়োগকে বলে **ঔৎসর্গিক প্রয়োগ**। কিন্তু উৎসর্গের বাধকরূপ অপবাদ-প্রযুক্ত সেই শব্দের যে অন্য অর্থে প্রয়োগ, তাহাকে বলে **ভাক্ত প্রয়োগ** এবং সেই শব্দকেও 'ভাক্ত' শব্দ বলে। এই সূত্রে **ধর্ম্মবিকল্প-নির্দ্দেশে** এই পদের দ্বারা উক্তরূপ যে কোন ভাক্ত প্রয়োগই মহর্ষির বিবক্ষিত। তাহা হইলে সূত্রের দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন বাক্যে কোন শব্দের ভাক্ত প্রয়োগ হইলে তাহার মুখ্য অর্থের কল্পনার দ্বারা যে প্রতিষেধ, তাহা **উপচারছল**।

ভাষ্যকার ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পরে বলিয়াছেন,—**যথা মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতি**। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, উচ্চস্থ কাষ্ঠসংঘাতরূপ আসন-বিশেষই **মঞ্চ** শব্দের মুখ্য অর্থ। কিন্তু তাহাতে ক্রোশন বা আহ্বানের কর্ত্তৃত্ব সম্ভব না হওয়ায় উক্ত বাক্যে 'মঞ্চ' শব্দের দ্বারা সেই মঞ্চস্থ পুরুষই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ উক্ত বাক্যে 'মঞ্চ' শব্দ মঞ্চস্থ পুরুষ অর্থে **ভাক্ত**।† সুতরাং

---

* পরে 'তস্য নির্দ্দেশে ধর্ম্মবিকল্পনির্দ্দেশে" এইরূপ ভাষ্যপাঠই পরিদৃষ্ট সমস্ত পুস্তকে দেখা যায়। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"ধর্ম্মবিকল্পেন নির্দ্দেশে বাক্যে নির্দ্দিশ্যতেঽনেনেতিব্যুৎপত্ত্যা।" অর্থাৎ সূত্রোক্ত নির্দ্দেশ শব্দের অর্থ বাক্য। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মবিকল্পপ্রযুক্ত বাক্যই ধর্ম্মবিকল্প-নির্দ্দেশ। জয়ন্ত ভট্টও উক্ত পদে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস গ্রহণ করিয়া অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন "অভিধানস্য ধর্ম্মোঽনেকপ্রকারো মুখ্যয়া বৃত্ত্যা গৌণ্যা বা লাক্ষণিক্যা বা যদর্থে প্রত্যায়নং, তদনেন বিকল্পমানেন ধর্ম্মেণ গৌণেন লাক্ষণিকেন বা নির্দ্দেশে প্রয়োগে কৃতে যোঽর্থসদ্ভাব-প্রতিষেধো মুখ্যার্থানষেধঃ স উপচারনিমিত্তং ছলমুপচারছলং।"

† 'ভক্ত্যা প্রযুক্তঃ' এই অর্থে 'ভক্তি' শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয়ে উক্ত 'ভাক্ত' শব্দ নিষ্পন্ন। পরে ন্যায়সূত্রেও (২।২।১৫) 'ভক্তি' শব্দনিষ্পন্ন 'ভাক্ত' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায় যে, শব্দের সর্ব্বপ্রকার লক্ষণারই প্রাচীন সংজ্ঞা 'ভক্তি'। সাদৃশ্যসম্বন্ধরূপ গৌণীবৃত্তিও লক্ষণাবিশেষ। পরে 'ন্যায়বার্ত্তিকে' (২।১।৩৬) উদ্দ্যোতকর "উভয়েন ভজ্যতে" এইরূপ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া উভয়াশ্রিত অর্থাৎ পদার্থদ্বয়গত সাদৃশ্যবিশেষকেই 'ভক্তি' বলিয়া 'গৌর্বাহীকঃ' এই প্রসিদ্ধ প্রয়োগেই ভাক্ত প্রত্যয়ের উদাহরণ বলিয়াছেন। কিন্তু এখানে তিনিও বলিয়াছেন,—'কাষ্ঠসংঘাতেষু প্রধানং মঞ্চশব্দঃ ক্রোশনক্রিয়ায়া অসম্ভবমীক্ষিত্বা স্থানিষু পুরুষেষু ভাক্তঃ।"

উক্তরূপ প্রয়োগকে ভাক্ত প্রয়োগ বলে। কিন্তু কোন বাদী 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি' এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি উক্ত 'মঞ্চ' শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রতিষেধ করেন যে, "মঞ্চস্থাঃ পুরুষাঃ ক্রোশন্তি, নতু মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি'', তাহা হইলে উহাকে বলে **উপচারছল।** উক্ত স্থলে উক্ত 'মঞ্চ' শব্দের যে মুখ্য অর্থের কল্পনা, তাহাই 'অর্থবিকল্প'। ভাষ্যকার ইহা ব্যক্ত করিতে পরে বলিয়াছেন,—"ভক্ত্যা প্রয়োগে প্রাধান্যেন কল্পনং।" তাৎপর্য্য এই যে. কোন লাক্ষণিক শব্দের প্রয়োগ হইলে তাহাকে প্রধান শব্দরূপে কল্পনা করিয়া, তাহার মুখ্য অর্থের কল্পনারূপ যে উপপত্তি, তাহাই 'উপচারছলে' পূর্ব্বোক্ত সামান্যলক্ষণসূত্রোক্ত **অর্থবিকল্পোপপত্তি।** উপচারই উক্তরূপ ছলের বিষয় অর্থাৎ আশ্রয়রূপ নিমিত্ত, এ জন্য উহার নাম **উপচারছল।** জয়ন্ত ভট্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"উপচারনিমিত্তং ছলমুপাচারছলং।"

আপত্তি হইতে পারে যে, 'মঞ্চ' শব্দের উক্তরূপ ভাক্ত প্রয়োগের দ্বারাই উক্ত বাক্যের উপপত্তি হইলে সমস্ত শব্দেরই যে কোন অর্থে ভাক্ত প্রয়োগ বলিয়া সমস্ত বাক্যেরই উপপত্তি হইতে পারে। তাহা হইলে কাহারও কোন বাক্যকেই অযোগ্য বলা যায় না। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—**উপচারো নীতার্থঃ** ইত্যাদি। বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"নীতার্থঃ প্রাপিতার্থঃ সহচরণাদিনা নিমিত্তেনেতি। অন্যত্র দৃষ্টস্যান্যত্র প্রয়োগঃ সম্বন্ধাদেব ভবতীতি নাতিপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ।" তাৎপর্য্য এই যে, মুখ্য অর্থের সম্বন্ধবিশেষই শব্দের লক্ষণাবৃত্তি।* সেই সম্বন্ধবিশেষপ্রযুক্তই অন্য অর্থে শব্দের

* বৈয়াকরণ সম্প্রদায় উক্তরূপ লক্ষণাবৃত্তি স্বীকার করেন নাই। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বলিয়াছেন, —"সর্ব্বে সর্ব্বার্থবাচকাঃ।" তদনুসারে 'পরমলঘুমঞ্জুষা' গ্রন্থে নাগেশ ভট্ট সংক্ষেপে উক্ত মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বক্তার তাৎপর্য্য থাকিলে সমস্ত শব্দই সমস্ত অর্থের বাচক হয় অর্থাৎ সমস্ত অর্থেই সমস্ত শব্দের শক্তি আছে। শক্তি দ্বিবিধ, প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ। যাহাকে লক্ষণা বলা হয়, তাহাই অপ্রসিদ্ধ শক্তি। অনেকে ন্যায়দর্শনে মহর্ষি গৌতমের 'সহচরণস্থান' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারাও উক্তরূপ মতেরই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। 'তর্কসংগ্রহদীপিকা'র নীলকণ্ঠী টীকার 'ভাস্করোদয়া' ব্যাখ্যায় (শব্দখণ্ডে শক্তি ও লক্ষণার নিরূপণে। উক্ত মতের ব্যাখ্যাপূর্ব্বক খণ্ডন দ্রষ্টব্য। কিন্তু নাগেশ ভট্টও লক্ষণাবিষয়ে নৈয়ায়িক মতের ব্যাখ্যা করিতে ঐরূপ কথা বলেন নাই। তিনিও বলিয়াছেন,—'সাচ লক্ষণা তাৎস্থ্যাদিনিমিত্তিকা। তদাহ, "তাৎস্থ্যাত্তথৈব তাদ্ধর্ম্ম্যাৎ তৎসামীপ্যাত্তথৈব চ। তৎসাহচর্য্যাত্তাদর্থ্যাজ্জ্ঞেয়া বৈ লক্ষণা বুধৈরিতি॥ তাৎস্থ্যাদ্ যথা, মঞ্চা হসন্তি" ইত্যাদি। পরমলঘুমঞ্জুষা।

প্রয়োগ হয় এবং তাহাকেই বলে ভাক্ত প্রয়োগ বা লাক্ষণিক প্রয়োগ। সুতরাং সেই সম্বন্ধবিশেষ ব্যতীত যে কোন অর্থে শব্দের ভাক্ত প্রয়োগ হইতে পারে না। যেরূপ সম্বন্ধপ্রযুক্ত কোন শব্দ অন্য অর্থ নীত অর্থাৎ প্রাপিত হয়, তাহা মহর্ষি পরে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে **সহচরণস্থান** ইত্যাদি (৬২) সূত্রের দ্বারা প্রকাশ করিয়া, উক্ত সূত্র-শেষে বলিয়াছেন,— **অতদ্ভাবেঽপি তদ্বদভিধানমুপচারঃ।** ভাষ্যকার পরে এখানে 'উপাচারে'র ব্যাখ্যা করিতে মহর্ষির ঐ কথাই পরে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বস্তুতঃ পরে মহর্ষির কথিত সহচরণাদিনিমিত্তক সম্বন্ধবিশেষই 'উপচার'। পূর্ব্বোক্ত স্থলে মঞ্চস্থ পুরুষগণের মঞ্চেই স্থান অর্থাৎ স্থিতিপ্রযুক্ত মঞ্চ ও সেই পুরুষগণের অধারাধেয়ভাবরূপ সম্বন্ধই স্থাননিমিত্তিক **উপচার**। মহর্ষির কথিত উপচারের ব্যাখ্যা ও সমস্ত উদাহরণ দ্বিতীয় খণ্ডে (১০৫-৬ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যকার পরে উক্ত 'উপচারছলে'র খণ্ডনার্থ উক্ত স্থলে সমাধান বলিয়াছেন যে, লোকসিদ্ধ প্রয়োগে বক্তার অভিপ্রেত শব্দ ও অর্থই গ্রাহ্য এবং প্রতিষেধ সম্ভব হইলে সেই শব্দ ও অর্থেরই প্রতিষেধ কর্ত্তব্য। 'ছন্দতঃ' অর্থাৎ ছল করিয়া অথবা স্বেচ্ছানুসারে কোন শব্দ ও অর্থ গ্রহণ বা তাহার প্রতিষেধ করা যায় না। বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"ন ছন্দতঃ ন ছদ্মনেত্যর্থঃ।" 'ছন্দ' শব্দের ইচ্ছা অর্থেও প্রয়োগ হয়। তাহা হইলে 'ন ছন্দতঃ, ন স্বেচ্ছামাত্রাৎ' এইরূপ ব্যাখ্যাও করা যায়। ভাষ্যকার পরে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কথার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের মতেই প্রধানভূত (মুখ্যার্থবোধক) শব্দের এবং গুণভূত অর্থাৎ অপ্রধানভূত (লক্ষ্যার্থবোধক) ভাক্ত শব্দের প্রয়োগ সুচিরকাল হইতেই লোকসিদ্ধ আছে। সুতরাং লোকসিদ্ধ প্রয়োগে ভাক্ত শব্দের প্রয়োগজন্য বাদীর কোন অপরাধ বলা যায় না। কিন্তু সেই সমস্ত লোকসিদ্ধ প্রয়োগে বাদী কিরূপ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাই প্রথমে বুঝিতে হইবে। বাদী মুখ্য শব্দের প্রয়োগ করিলে সেই শব্দ ও তাহার সেই মুখ্য অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে এবং সম্ভব হইলে তাহারই প্রতিষেধ করিতে হইবে। আর বাদী ভাক্ত শব্দের প্রয়োগ করিলে সেই শব্দ ও তাহার লাক্ষণিক অর্থবিশেষই গ্রহণ করিতে হইবে এবং সম্ভব হইলে তাহারই প্রতিষেধ করিতে হইবে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি' এই বাক্যেও বক্তা ভাক্ত 'মঞ্চ' শব্দের প্রয়োগ করায় সেই ভাক্ত শব্দই গ্রহণ করিয়া, উহার লাক্ষণিক অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু প্রতিবাদী তাহা

না করিয়া, স্বেচ্ছানুসারে উক্ত 'মঞ্চ' শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা উক্তরূপ প্রতিষেধ করিলে উহা তাঁহার নিজবুদ্ধিমূলক অনুচিত প্রতিষেধ হওয়ায় 'পরোপালম্ভ' অর্থাৎ বাদীর পক্ষদূষণ হয় না। কারণ, উহা সেই বাদীর অভিপ্রেত প্রকৃতার্থের প্রতিষেধ নহে। এইরূপ সর্ব্বত্রই বাদীর তাৎপর্য্য বুঝিয়া অথবা না বুঝিয়া জিগীষু প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্ত যে কোন প্রকার ছল করিলে সেই সমস্তই অসদুত্তর। উদ্দ্যোতকরও বলিয়াছেন,—"উভয়থা দোষো বুদ্ধাঽবুদ্ধা বেতি॥" ১৪॥

সূত্র। বাক্‌চ্ছলমেবোপচারচ্ছলং তদ্‌বিশেষাৎ ॥ ১৫ ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—(পূর্ব্বপক্ষ) 'উপচারছল' বাক্‌ছলই, যেহেতু তাহারও অর্থান্তরকল্পনা হইতে বিশেষ নাই।

ভাষ্য। ন বাক্‌চ্ছলাদুপচারচ্ছলং ভিদ্যতে, তস্যাপ্যর্থান্তরকল্পনায়া অবিশেষাৎ। ইহাপি স্থান্যর্থো গুণশব্দঃ প্রধানশব্দঃ স্থানার্থ ইতি কল্পয়িত্বা প্রতিষিধ্যত ইতি।

অনুবাদ—বাক্‌ছল হইতে উপচারছল ভিন্ন নহে। যেহেতু তাহারও অর্থান্তরকল্পনা হইতে বিশেষ নাই। (তাৎপর্য্য) এই উপচারছলেও অর্থাৎ পূর্ব্বপ্রদর্শিত উদাহরণেও স্থান্যর্থ গুণশব্দ (মঞ্চস্থ পুরুষবোধক ভাক্ত 'মঞ্চ' শব্দ) স্থানার্থ প্রধান শব্দ অর্থাৎ মঞ্চনামক স্থানের বোধক মুখ্য শব্দ, ইহা কল্পনা করিয়া প্রতিষেধ করা হয়।

সূত্র। ন তদর্থান্তরভাবাৎ ॥ ১৬ ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—(উত্তর) না, অর্থাৎ উপচারছল বাক্‌ছলই নহে। যেহেতু সেই অর্থসদ্ভাব-প্রতিষেধের (অর্থান্তরকল্পনা হইতে) ভেদ আছে।

ভাষ্য ন বাক্‌চ্ছলমেবোপচারচ্ছলং, তস্যার্থসদ্‌ভাবপ্রতিষেধস্যার্থান্তরভাবাৎ। কুতঃ ? অর্থান্তরকল্পনাৎ। অন্যা হ্যর্থান্তরকল্পনা, অন্যো হ্যর্থসদ্‌ভাবপ্রতিষেধ ইতি।

অনুবাদ—উপচারছল বাক্‌ছলই নহে। যেহেতু সেই অর্থসদ্ভাব-

প্রতিষেধের 'অর্থান্তরভাব' অর্থাৎ ভেদ আছে। (প্রশ্ন) কি হইতে? (উত্তর) অর্থান্তরকল্পনা হইতে। (তাৎপর্য্য) যেহেতু অর্থান্তরকল্পনা অন্য, অর্থসদ্ভাব-প্রতিষেধ অন্য। অর্থাৎ উপচারছলে অর্থসদ্ভাব প্রতিষেধ হওয়ায় এবং বাক্-ছলে তাহা না হওয়ায় বাক্‌ছল হইতে উপচারছল ভিন্নপ্রকার।

সূত্র। অবিশেষ বা কিঞ্চিৎসাধর্ম্ম্যাদেকচ্ছল-প্রসঙ্গঃ ॥ ১৭ ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—আর অবিশেষ হইলে অর্থাৎ উক্ত উভয় ছলেই শব্দের অর্থান্তরকল্পনা হওয়ায় ঐ উভয়ের অভেদ হইলে কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত একছলের আপত্তি হয়। অর্থাৎ তাহা হইলে ছল দ্বিবিধ, ইহাও বলা যায় না।

ভাষ্য। ছলস্য দ্বিত্বমভ্যনুজ্ঞায় ত্রিত্বং প্রতিষিধ্যতে কিঞ্চিৎ-সাধর্ম্ম্যাৎ। যথা চায়ং হেতুস্ত্রিত্বং প্রতিষেধতি, তথা দ্বিত্বমপ্য-ভ্যনুজ্ঞাতং প্রতিষেধতি, বিদ্যতে হি কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যং দ্বয়োরপীতি। অথ দ্বিত্বং কিঞ্চিৎসাধর্ম্ম্যান্ন নিবর্ত্ততে, ত্রিত্বমপি ন নিবর্ৎস্যতি।

অনুবাদ—ছলের দ্বিত্ব স্বীকার করিয়া কিঞ্চিৎসাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত দ্বিত্ব প্রতিষিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু যেমন এই হেতু অর্থাৎ কিঞ্চিৎসাধর্ম্ম্যরূপ হেতু (ছলের) ত্রিত্বকে প্রতিষেধ করে, তদ্রূপ স্বীকৃত দ্বিত্বকেও প্রতিষেধ করে অর্থাৎ ছলে দ্বিত্বাভাবেরও সাধক হয়। যেহেতু দুই ছলেও অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষ-বাদীর স্বীকৃত 'বাক্‌ছল' ও 'সামান্যছলে'ও কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্য আছে। আর যদি কিঞ্চিৎসাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত (ছলের) দ্বিত্ব নিবৃত্ত না হয় অর্থাৎ দ্বিত্বাভাব সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে ত্রিত্বও নিবৃত্ত হইবে না। অর্থাৎ উক্ত কিঞ্চিৎসাধর্ম্ম্যরূপ হেতু ছলের দ্বিত্বাভাবের সাধক না হইলে ত্রিত্বাভাবেরও সাধক হইতে পারে না।

টিপ্পনী—মহর্ষি তাঁহার উদ্দিষ্ট ছলপদার্থের সামান্যলক্ষণ বিভাগ ও বিশেষ লক্ষণের পরে প্রসঙ্গতঃ এখানে 'ছলে'র পরীক্ষা করিয়াছেন। কারণ, 'ছল'-পদার্থ দ্বিবিধ, কি ত্রিবিধ, এইরূপ সংশয় হওয়ায় পরীক্ষার দ্বারা তাহার নিরাস করা আবশ্যক। তাই সেই পরীক্ষার্থ মহর্ষি প্রথম সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, বাক্‌ছল হইতে উপচারছল ভিন্নপ্রকার নহে। কারণ, বাক্‌ছলের ন্যায় 'উপচারছলে'ও এক অর্থে প্রযুক্ত শব্দের অন্য অর্থের কল্পনা করিয়া প্রতিষেধ করা হয়। ভাষ্যকার ইহা ব্যক্ত করিতে তাঁহার পূর্ব্বপ্রদর্শিত

উদাহরণ গ্রহণ করিয়াই পরে বলিয়াছেন, 'ইহাপি' ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে, মঞ্চস্থ পুরুষগণের স্থান বা আসন 'মঞ্চ'। সুতরাং সেই মঞ্চস্থ পুরুষগণ 'স্থানী'। মঞ্চ শব্দ 'স্থান্যর্থ' হইলে অর্থাৎ মঞ্চস্থ পুরুষ অর্থে প্রযুক্ত হইলে তখন উহা 'গুণশব্দ' অর্থাৎ অপ্রধান শব্দ (ভাষ্যে অপ্রধান অর্থেই 'গুণ' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে)। কিন্তু 'মঞ্চ' শব্দ 'স্থানার্থ' হইলে অর্থাৎ মঞ্চনামক স্থান অর্থে প্রযুক্ত হইলে তখন উহা মুখ্য অর্থের বোধক হওয়ায় প্রধান শব্দ। পূর্ব্বোক্ত 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি' এই বাক্যে মঞ্চস্থ পুরুষ অর্থেই মঞ্চ শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় উহা গুণশব্দ বা অপ্রধান শব্দ। কিন্তু প্রতিবাদী উহাকে স্থানার্থ প্রধান শব্দরূপে কল্পনা করিয়া অর্থাৎ উহার মুখ্য অর্থরূপ অর্থান্তরের কল্পনা করিয়াই পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিষেধ করেন। সুতরাং 'উপচারছলে'ও শব্দের অর্থান্তর কল্পনা হওয়ায় উহা 'বাক্‌ছল'মধ্যেই গণ্য। অতএব ছলপদার্থ ত্রিবিধ নহে, কিন্তু দ্বিবিধ, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ।*

মহর্ষি পরে উক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে সিদ্ধান্তসূত্র বলিয়াছেন,— **ন তদর্থান্তরভাবাৎ**। ভাষ্যকার এই সূত্রে 'তদ্' শব্দের দ্বারা 'উপচারছলে' যে অর্থসদ্ভাবপ্রতিষেধ হয়, তাহারই গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অর্থান্তরকল্পনা হইতে অর্থসদ্ভাব প্রতিষেধের অর্থান্তরভাব অর্থাৎ ভেদ আছে। শব্দের অর্থান্তরকল্পনা ও অর্থসদ্ভাব-প্রতিষেধ ভিন্ন পদার্থ। উদ্দ্যোতকর মহর্ষির অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—"অবিশেষাদিত্যস্য হেতোরনেন সূত্রেণাসিদ্ধতামুদ্ভাবয়তি।" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সূত্রে 'অবিশেষাৎ' এই পদের দ্বারা কথিত হেতু যে অসিদ্ধ, ইহাই এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি বলিয়াছেন। কারণ, 'বাক্‌ছল' হইতে উপচারছলের বিশেষ আছে। উদ্দ্যোতকর ইহা বুঝাইতে পরে বলিয়াছেন যে, "মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি" এই বাক্য প্রয়োগ করিলে

* 'চরকসংহিতা'র বিমানস্থানে (অষ্টম অঃ) কথিত হইয়াছে,—"তদ্ দ্বিবিধং বাক্‌ছলং সামান্যচ্ছলঞ্চ।" মহর্ষি গৌতম উক্ত মতই পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া, উহার খণ্ডন করায় চরকোক্ত ঐ মতই উক্ত বিষয়ে প্রাচীন মত, ইহাই বুঝা যায়। প্রচলিত 'চরকসংহিতা'র পরে ন্যায়সূত্রে উক্ত মতের খণ্ডন হইলে ঐরূপ আরও অনেক মতের খণ্ডন কেন হয় নাই, ইহা চিন্তা করা আবশ্যক। 'চরকসংহিতা'র দ্বিবিধ ছলপদার্থের নিরূপণের পরেই 'প্রকরণসম', 'বর্ণ্যসম' ও 'অবর্ণ্যসম' নামে ত্রিবিধ 'অহেতু'র (হেত্বাভাসের) নিরূপণ হইয়াছে। কিন্তু গৌতম মতের সহিত উহার সামঞ্জস্য নাই। পরন্তু 'চরকসংহিতা'তেও বিচারপূর্ব্বক গৌতম মতের খণ্ডন দেখা যায় না। অতএব বুঝা যায়, 'বিমানস্থানে' অনেক বিষয়ে পূর্ব্বপ্রচলিত প্রাচীন চরকমতই বর্ণিত হইয়াছে।

ছলবাদী পূর্ব্বোক্তরূপে মঞ্চনামক স্থানে ক্রোশনকর্তৃত্বরূপ অর্থ বা বস্তুর সত্তারই প্রতিষেধ করেন। উহাকে বলে অর্থসদ্ভাবপ্রতিষেধ। কিন্তু 'নবকম্বলোহয়ং মাণবকঃ' এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে ছলবাদী সেই বালকে কম্বলের সত্তার প্রতিষেধ করেন না, কিন্তু তাহাতে কম্বলের সত্তা স্বীকার করিয়াই সেই কম্বলে অনেকত্বরূপ অর্থাৎ নবসংখ্যকত্বরূপ ধর্ম্মেরই প্রতিষেধ করেন। উক্তরূপ 'বাক্ছলে' বিধেয় বস্তুর ধর্ম্মবিশেষেরই প্রতিষেধ হয়। কিন্তু 'উপাচারছলে' বিধেয় বস্তুরূপ ধর্ম্মীরই প্রতিষেধ হয়। অতএব 'বাক্ছল' হইতে উপচারছলের মহান্ বিশেষ আছে। বাচস্পতি মিশ্র উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে 'উপচারছলে' অর্থসদ্ভাব-প্রতিষেধের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—বিধেয় বস্তুর সত্তার প্রতিষেধ এবং এখানে উদ্দ্যোতকরের ব্যাখ্যানুসারেই তিনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—"বার্ত্তিকমতে ত্বর্থসদ্ভাবস্যৈব প্রতিষেধ ইতি ব্যাখ্যেয়ং।"

কিন্তু স্মরণ করা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার পূর্ব্বে 'উপচারছলে'র লক্ষণসূত্র-ভাষ্যে বলিয়াছেন,—"মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতি অর্থসদ্ভাবেন প্রতিষেধঃ।" জয়ন্ত ভট্টও পূর্ব্বে উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—"অর্থসদ্ভাবপ্রতিষেধো মুখ্যার্থনিষেধঃ।" সুতরাং ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে বুঝা যায় যে, 'উপচারছলে' লাক্ষণিক অর্থে প্রযুক্ত শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়াই প্রতিষেধ হয়। উহাকেই বলে অর্থসদ্ভাবের দ্বারা প্রতিষেধ। কিন্তু 'বাক্ছলে'র সমস্ত উদাহরণেই মুখ্য অর্থেই শব্দ প্রয়োগ হয় এবং সেই শব্দ অথবা শব্দান্তরের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়াই প্রতিষেধ হয়। যেমন পূর্ব্বোক্ত 'নবকম্বলোহয়ং মাণবকঃ' এই বাক্যে বক্তা মুখ্যার্থ নব শব্দের প্রয়োগ করেন এবং প্রতিবাদী 'নবন্' শব্দ ও তাহার মুখ্যার্থ গ্রহণ করিয়াই প্রতিষেধ করেন। কিন্তু উপচারছলের সমস্ত উদাহরণেই বক্তা লাক্ষণিক অর্থেই কোন লোকসিদ্ধ ভাক্ত শব্দের প্রয়োগ করেন। সুতরাং 'বাক্ছল' হইতে উপচারছলের উক্তরূপ বিশেষ আছে।*

---

* জয়ন্ত ভট্টও এই সূত্রের ব্যাখ্যায় প্রথমে উক্তরূপ বিশেষই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু পরে তিনি বলিয়াছেন,—"বাক্ছলে চার্থসত্তৈব নিষিধ্যতে কুতোহস্য নব কম্বলা ইতি, ইহ তু সতো মঞ্চস্য ক্রোশনশক্তি নিষিধ্যতে।" জয়ন্ত ভট্ট পূর্ব্বোক্ত বাক্ছলে যে অর্থসত্তার প্রতিষেধ বলিয়াছেন, তাহা কিন্তু উপচারছলের লক্ষণসূত্রোক্ত 'অর্থসদ্ভাবপ্রতিষেধ' নহে। নবসংখ্যক কম্বলরূপ অর্থের সত্তার প্রতিষেধই উক্ত স্থলে অর্থসত্তার প্রতিষেধ। কিন্তু শেষোক্ত 'উপচারছলে' 'মঞ্চ' শব্দের কোন অর্থেরই সত্তার প্রতিষেধ হয় না, ইহাই জয়ন্ত ভট্টের শেষ কথার তাৎপর্য্য বুঝা যায়।

মহর্ষি পরে 'অবিশেষে বা' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, 'বাক্‌ছল' হইতে 'উপচারছলে'র উক্তরূপ বিশেষ গ্রহণ না করিয়া, অবিশেষই বলিলে কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত ছলের একত্বাপত্তি হয়। অর্থাৎ 'বাক্‌ছল' নামে ছল একই প্রকার, ইহা স্বীকার করিতে হয়। তাৎপর্য্য এই যে, উপচারছলেও বাক্‌ছলের ন্যায় অর্থান্তরকল্পনার অবিশেষ গ্রহণ করিয়া উহাকে বাক্‌ছলই বলিলে দ্বিতীয় 'সামান্যছল'কেও বাক্‌ছলই বলা যায়। কারণ, তাহাও বাক্যনিমিত্তক ছল। আর ছলের সামান্যলক্ষণসূত্রে যে 'অর্থবিকল্প' কথিত হইয়াছে, তাহা সামান্যছলেও থাকে। নচেৎ কোনরূপ ছলই হয় না। এইরূপ 'সামান্যছলে' বাক্‌ছলের অন্য সাধর্ম্ম্যও আছে। সুতরাং কিঞ্চিৎসাধর্ম্ম্যরূপ হেতুর দ্বারা ছলে ত্রিবিধত্বের অভাব সিদ্ধ হইলে দ্বিবিধত্বের অভাবও সিদ্ধ হইবে, নচেৎ ত্রিবিধত্বের অভাবও সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত হেতুর দ্বারা সামান্যছলও বাক্‌ছল, ইহা সিদ্ধ হইলে একমাত্র বাক্‌ছলই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদী তাহাও স্বীকার করেন না। কারণ, 'ছল'পদার্থের দ্বিবিধত্বই তাঁহার অনুজ্ঞাত বা স্বীকৃত। সুতরাং যেমন তাঁহার মতে বাক্‌ছল হইতে সামান্যছলের কোন বিশেষ থাকায় উহা দ্বিতীয় প্রকার ছল বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তদ্রূপ উপচারছলেও পূর্ব্বোক্তরূপ বিশেষ থাকায় সেই বিশেষ গ্রহণ করিয়া উহা তৃতীয়প্রকার ছল বলিয়াই স্বীকার্য্য। উক্তরূপে কিঞ্চিৎ বিশেষ-প্রযুক্তও পদার্থের প্রকারভেদ কথিত হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ছলপদার্থ দ্বিবিধ নহে, কিন্তু ত্রিবিধ, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ১৫-১৭ ॥

ছললক্ষণ প্রকরণ ॥ ৩ ॥

ভাষ্য। ছল-লক্ষণাদূর্দ্ধং—

অনুবাদ—'ছলে'র লক্ষণের অনন্তর ('জাতি'র লক্ষণ কথিত হইয়াছে)

সূত্র। সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ ॥ ॥১৮॥৫৯॥

অনুবাদ—সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের দ্বারা অর্থাৎ কেবল কোন সাধর্ম্ম্য অথবা কোন বৈধর্ম্ম্য গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা 'প্রত্যবস্থান' (প্রতিষেধ) 'জাতি'।

ভাষ্য। প্রযুক্তে হি হেতৌ যঃ প্রসঙ্গো জায়তে স জাতিঃ। স চ প্রসঙ্গঃ সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানমুপালম্ভঃ প্রতিষেধ

ইতি। 'উদাহরণ-সাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতু'রিত্যস্যোদাহরণ-বৈধর্ম্ম্যেণ প্রত্যবস্থানম্। 'উদাহরণ-বৈধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতু'রিত্যস্যোদাহরণ-সাধর্ম্ম্যেণ প্রত্যবস্থানং, প্রত্যনীকভাবাৎ। জায়মানোঽর্থো জাতিরিতি।

অনুবাদ—হেতু প্রযুক্ত হইলে যে প্রসঙ্গ জন্মে, তাহা 'জাতি'। অর্থাৎ প্রথমে বাদী কোন সাধ্যসাধনের জন্য কোন হেতু বা হেত্বাভাসের প্রয়োগ করিলে, পরে প্রতিবাদীর যে প্রসঙ্গ জন্মে, তাহা 'জাতি'নামক পঞ্চদশ পদার্থ। সেই প্রসঙ্গ কিন্তু সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্যের দ্বারা 'প্রত্যবস্থান' (অর্থাৎ) উপালম্ভ প্রতিষেধ। উদাহরণের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্যসাধন হেতু, ইহার অর্থাৎ উক্তরূপ লক্ষণাক্রান্ত সাধর্ম্ম্য হেতুর সম্বন্ধে উদাহরণের বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান হয়। উদাহরণের বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্যসাধন হেতু, ইহার অর্থাৎ উক্তরূপ লক্ষণাক্রান্ত বৈধর্ম্ম্য হেতুর সম্বন্ধে উদাহরণের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান হয়। কারণ, 'প্রত্যনীকভাব' আছে অর্থাৎ উক্তরূপ প্রতিষেধে বাদীর মতের প্রত্যনীকত্ব বা প্রতিকূলত্ব থাকায় উহাকে 'প্রত্যবস্থান' বলে। জায়মান পদার্থ জাতি অর্থাৎ উক্তরূপ প্রতিকূল ভাবে প্রতিবাদীর যে প্রতিষেধ জন্মে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে উহার নাম 'জাতি'।

টিপ্পনী—'ছল'পদার্থের লক্ষণের পরে ক্রমপ্রাপ্ত 'জাতি'পদার্থের লক্ষণই বক্তব্য হওয়ায় মহর্ষি পরে এই সূত্রের দ্বারা তাহাই বলিয়াছেন। যদিও পূর্ব্বপ্রকরণে মহর্ষি পরে প্রসঙ্গতঃ ছলের পরীক্ষাও করিয়াছেন, কিন্তু ছলের সামান্যলক্ষণ ও বিশেষলক্ষণই পূর্ব্বপ্রকরণের প্রতিপাদ্য। তাই ভাষ্যকার এই সূত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—'ছললক্ষণাদূর্দ্ধং।' অর্থাৎ 'ছল'পদার্থের লক্ষণের পরে পঞ্চদশ পদার্থ 'জাতি কি ?' এইরূপ শিষ্যজিজ্ঞাসানুসারেই মহর্ষি বলিয়াছেন,—"সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ।" ভাষ্যকার পরে "জায়মানোঽর্থো জাতিরিতি" এই বাক্যের দ্বারা উক্ত 'জাতি' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ 'জায়তে' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে জন ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্য ক্তিচ্ প্রত্যয়ে উক্ত 'জাতি' শব্দ সিদ্ধ হয়। উহার দ্বারা বুঝা যায় যে, যাহা জন্মে, তাহা 'জাতি'। কিন্তু উহা উক্ত 'জাতি' শব্দের ব্যুৎপত্তিমাত্র। বস্তুতঃ উক্ত 'জাতি' শব্দটি পারিভাষিক। জল্প ও বিতণ্ডায় সময়বিশেষে পরাজয়ভয়ে প্রতিবাদীর যে অসদুত্তরবিশেষ জন্মে,

তাহারই নাম জাতি। উহা প্রতিবাদীর 'প্রত্যবস্থান'। "প্রতীপমবস্থানং প্রত্যবস্থানং" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে বাদীর প্রতিকূল ভাবে প্রতিবাদীর অবস্থানই 'প্রত্যবস্থান' শব্দের অর্থ। ভাষ্যকার উহার ফলিতার্থ বলিয়াছেন,—"উপালম্ভঃ প্রতিষেধঃ।" অর্থাৎ বাদীকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিবাদী যে, উপালম্ভ বা প্রতিষেধ করেন, তাহাই এই সূত্রে 'প্রত্যবস্থান' শব্দের অর্থ। 'প্রত্যবস্থানং জাতিঃ' এই মাত্র সূত্র বলিলে পূর্ব্বোক্ত 'ছল' এবং সমস্ত সম্যক্ প্রতিষেধ বা সদুত্তরও 'জাতি'র লক্ষণাক্রান্ত হয়। তাই মহর্ষি প্রথমে বলিয়াছেন,—"সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং।" ছল প্রভৃতি আর কোন প্রতিষেধ কেবল সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্যের দ্বারা হয় না।

বস্তুতঃ মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা 'জাতি'পদার্থের স্বরূপসূচনাই করিয়াছেন। ইহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সমস্ত 'জাতি'র এক সামান্য লক্ষণ ব্যক্ত হয় নাই। সুতরাং ব্যাখ্যার দ্বারাই তাহা বুঝিতে হইবে। জয়ন্ত ভট্টও এখানে মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—"দিক্প্রদর্শনমস্য সূচনাৎ।" বৃত্তিকার বিশ্বনাথও মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার দ্বারা পরে বলিয়াছেন,—"তেন চ সন্দর্ভেণ দূষণাসমর্থত্বং স্বব্যাঘাতকত্বং বা দর্শিতং। তথাচ ছলাদিভিন্নদূষণাসমর্থমুত্তরং স্বব্যাঘাতকমুত্তরং বা জাতিরিতি সূচিতম্।" বস্তুতঃ জাতিমাত্রই স্বব্যাঘাতক উত্তর। কারণ, প্রতিবাদী কোন জাত্যুত্তর করিলে তুল্যভাবে ঐরূপ জাত্যুত্তরের দ্বারাই তাহা ব্যাহত হয়। সুতরাং ঐ ভাবে জাত্যুত্তর মাত্রই নিজের ব্যাঘাতক হওয়ায় উহা দুষ্ট উত্তর বা অসদুত্তর, ইহা স্বীকার্য্য। তাই স্বব্যাঘাতকত্বই জাতিমাত্রের সাধারণ দুষ্টত্বমূল। 'প্রবোধসিদ্ধি' বা ন্যায়পরিশিষ্ট গ্রন্থে (৬।৭ পৃঃ) উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন,—"তথাচ স্বাত্ম-ব্যাঘাতকত্বং নাম সর্ব্বসাধারণং দুষ্টত্বমূলমস্য সূচিতং ভবতি।" উদয়নাচার্য্য উক্ত গ্রন্থের সর্ব্বশেষে "লক্ষ্যং লক্ষণমুত্থিতিঃ স্থিতিপদং মূলং ফলং পা(শা)তনং" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা সমস্ত 'জাতি'র যে সপ্তাঙ্গ বলিয়াছেন, তন্মধ্যে মূল বলিতে দুষ্টত্বের মূল। এ সকল কথার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা পঞ্চম খণ্ডে 'জাতি' নিরূপণের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। ফলকথা, উদয়নাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে তাঁহার মতে স্বব্যাঘাতক উত্তরত্বই 'জাতি' মাত্রের সামান্য লক্ষণ।

ভাষ্যকার এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—**প্রযুক্তে হি হেতৌ** ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে, 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা'য় বাদী প্রথমে নিজপক্ষ স্থাপন করিতে কোন হেতু অথবা হেত্বাভাসের প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদীর যে

'প্রসঙ্গ' জন্মে, তাহা 'জাতি'। 'প্রসঙ্গ' শব্দের অর্থ এখানে সাম্যের প্রসঞ্জন বা আপাদন। উহাই এই সূত্রোক্ত সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের দ্বারা প্রত্যবস্থান। ভাষ্যকার পরেই উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—**স চ প্রসঙ্গঃ** ইত্যাদি। ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, উদাহরণের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্য সাধন হেতুর সম্বন্ধে অর্থাৎ সাধর্ম্ম্য হেতুর প্রয়োগ হইলে উদাহরণের বৈধর্ম্ম্য দ্বারা প্রত্যবস্থান হয়। আর উদাহরণের বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্যসাধন হেতুর সম্বন্ধে অর্থাৎ বৈধর্ম্ম্য হেতুর প্রয়োগ হইলে উদাহরণের সাধর্ম্ম্য দ্বারাও প্রত্যবস্থান হয়। 'প্রত্যনীকভাব' অর্থাৎ প্রতিকূলভাবপ্রযুক্ত উহাকে 'প্রত্যবস্থান' বলে। ভাষ্যকার পরে পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয়সূত্রভাষ্যে উক্তরূপ প্রত্যবস্থানেরও উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্যান্য প্রকার 'জাতি'র উদাহরণও পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের ভাষ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্রই বাদীর কথিত দৃষ্টান্তপদার্থের সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্যের দ্বারা প্রতিবাদীর প্রত্যবস্থানই 'জাতি' নহে। দৃষ্টান্ত ভিন্ন যে কোন পদার্থের সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্যের দ্বারা প্রত্যবস্থানও 'জাতি' হয়। তাই মহর্ষি এই 'জাতি'লক্ষণসূত্রে দৃষ্টান্তবোধক 'উদাহরণ' শব্দের প্রয়োগ না করিয়া, কেবল 'সাধর্ম্ম্য' ও 'বৈধর্ম্ম্য' শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং বুঝা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে পরে 'উদাহরণ-সাধর্ম্ম্যাৎ' ইত্যাদি সন্দর্ভ বলেন নাই। কিন্তু প্রত্যবস্থানরূপ জাতির উদাহরণ-বিশেষ জ্ঞাপনের জন্যই উক্ত সন্দর্ভ বলিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরও ইহা ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—"সূত্রার্থস্তু যথাশ্রুতি, ন পুনরুদাহরণসাধর্ম্ম্যেণ, উদাহরণবৈধর্ম্ম্যেণ বেতি।" "ভাষ্যে উদাহরণসাধর্ম্ম্যমুদাহরণবৈধর্ম্ম্যঞ্চোদাহরণার্থমিতি, যথা চোদাহরণেন এবমনুদাহরণেনাপীতি।" ১৮॥

সূত্র। বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানম্ ॥ ১৯ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞান এবং কুৎসিৎ জ্ঞান এবং অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ অজ্ঞতাবিশেষ নিগ্রহস্থান। অর্থাৎ যাহার দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তি অথবা অপ্রতিপত্তি বুঝা যায়, তাহাকে "নিগ্রহস্থান" বলে।

ভাষ্য। **বিপরীতা বা কুৎসিতা বা প্রতিপত্তির্ব্বিপ্রতিপত্তিঃ।**

বিপ্রতিপদ্যমানঃ পরাজয়ং প্রাপ্নোতি। নিগ্রহস্থানং খলু পরাজয়প্রাপ্তিঃ। অপ্রতিপত্তিস্ত্বারম্ভবিষয়ে অনারম্ভঃ। পরেণ স্থাপিতং বা ন প্রতিষেধতি, প্রতিষেধং বা নোদ্ধরতি। অসমাসাচ্চ নৈতে এব নিগ্রহস্থানে ইতি।

অনুবাদ—বিপরীত প্রতিপত্তি (জ্ঞান) এবং কুৎসিত প্রতিপত্তিও 'বিপ্রতিপত্তি'। বিপ্রতিপত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি (বাদী বা প্রতিবাদী) পরাজয় প্রাপ্ত হন। পরাজয় প্রাপ্তিই অর্থাৎ যদ্দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর পরাজয় লাভ হয়, তাহাই নিগ্রহস্থান। 'অপ্রতিপত্তি' কিন্তু আরম্ভ বিষয়ে অনারম্ভ অর্থাৎ নিজ কর্ত্তব্যের অকরণ। পরকর্ত্তৃক স্থাপিত পক্ষকে প্রতিষেধ করেন না, অথবা প্রতিষেধকে উদ্ধার করেন না [অর্থাৎ যেরূপ অজ্ঞাতবশতঃ বাদী বা প্রতিবাদী নিজ কর্ত্তব্য করিতে সক্ষম না হওয়ায় পরাজয় প্রাপ্ত হন, তাদৃশ অজ্ঞতাই এই সূত্রে 'অপ্রতিপত্তি' শব্দের অর্থ] অসমাসপ্রযুক্তই অর্থাৎ মহর্ষি এই সূত্রে 'বিপ্রতিপত্ত্যপ্রতিপত্তী' এইরূপ সমাস প্রয়োগ না করায় এই উভয়ই নিগ্রহ-স্থান নহে।

টিপ্পনী—প্রথম সূত্রে উদ্দিষ্ট প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে শেষোক্ত পদার্থের নাম **নিগ্রহস্থান**। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা সেই 'নিগ্রহস্থান' নামক চরম পদার্থের লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। পূর্ব্বসূত্রের ন্যায় এই সূত্রেরও ব্যাখ্যার দ্বারাই 'নিগ্রহস্থানে'র সামান্য লক্ষণ বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে সূত্রোক্ত 'বিপ্রতিপত্তি' শব্দের অর্থ বলিয়াছেন,—বিপরীত জ্ঞান ও কুৎসিত জ্ঞান। বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"সূক্ষ্ম-বিষয়া প্রতিপত্তির্বিপরীতা, স্থূলবিষয়া চ কুৎসিতা।" অর্থাৎ ভাষ্যকার সূক্ষ্ম বিষয়ে বিপরীত নিশ্চয়রূপ ভ্রমকে বিপরীত প্রতিপত্তি এবং স্থূল বিষয়ে ঐরূপ ভ্রমকে কুৎসিত প্রতিপত্তি বলিয়া উক্ত দ্বিবিধ বিপ্রতিপত্তিকেই এই সূত্রোক্ত 'বিপ্রতিপত্তি' বলিয়াছেন। কিন্তু উহা 'নিগ্রহস্থান' হইবে কেন? তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—**বিপ্রতিপদ্যমানঃ পরাজয়ং প্রাপ্নোতি।** তাৎপর্য্য এই যে, 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা'য় বাদী ও প্রতিবাদীর পরাজয়রূপ **নিগ্রহের কারণকে নিগ্রহস্থান** বলে।* বাদী ও প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তিবশতঃ

* 'ন্যায়মঞ্জরী'কার জয়ন্ত ভট্ট বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"নিগ্রহঃ পরাজয়স্তস্য স্থানমাশ্রয়ঃ কারণমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ পরাজয়নিমিত্তং? বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ। বিপরীতা কুৎসিতা

যেমন 'প্রতিজ্ঞাহানি' প্রভৃতি অনেক নিগ্রহস্থান হয়, তদ্রূপ অপ্রতিপত্তিবশতঃও অনেক নিগ্রহস্থান হয়। 'অপ্রতিপত্তি' বলিতে প্রকৃত বিষয়ে প্রতিপত্তি বা জ্ঞানবিশেষের অভাব। সেই 'অপ্রতিপত্তি'বশতঃ বাদী ও প্রতিবাদী পরকর্তৃক স্থাপিত পক্ষের খণ্ডন করিতে এবং প্রতিবাদীর কথিত দোষের উদ্ধার করিতে সমর্থ না হইয়া পরাজয় লাভ করেন। তাই ভাষ্যকার সূত্রোক্ত 'অপ্রতিপত্তি' শব্দের ফলিতার্থ বলিয়াছেন, আরম্ভ বিষয়ে অনারম্ভ অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর নিজ কর্ত্তব্যের অকরণ।

ফলকথা, বাদী ও প্রতিবাদীর যেরূপ বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি পরাজয় লাভের মূল কারণ হয়, তাহাই এই সূত্রে গৃহীত হইয়াছে। যে স্থলে যাহা পরাজয় লাভের প্রকৃত কারণ নহে, তাহা সেখানে নিগ্রহস্থান নহে।* ভাষ্যকার ইহাই ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—"নিগ্রহস্থানং খলু পরাজয়প্রাপ্তিঃ।" বস্তুতঃ পরাজয় লাভই নিগ্রহস্থান নহে, কিন্তু উহা নিগ্রহস্থানের চরম ফল, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন, **অসমাসাচ্চ** ইত্যাদি। বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, মহর্ষি এই সূত্রে 'বিপ্রতিপত্ত্যপ্রতিপত্তী' এইরূপ স্বল্পাক্ষরসমাস পদের প্রয়োগ না করিয়া 'বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ' এইরূপ অসমাস বাক্য প্রয়োগ করিয়া সূচনা করিয়াছেন যে, কেবল বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তিই নিগ্রহস্থান নহে। অন্যরূপ

বিগর্হণীয়া প্রতিপত্তির্ব্বিপ্রতিপত্তিঃ, সাধনাভাসে সাধনবুদ্ধির্দ্দূষণাভাসে দূষণবুদ্ধিঃ। অপ্রতিপত্তিস্ত্বারম্ভবিষয়েঽনারম্ভঃ। আরম্ভস্য বিষয়ঃ, সাধনে দূষণং দূষণে চোদ্ধারঃ, তয়োরকরণমপ্রতিপত্তিঃ। দ্বিধা হি বাদী পরাজীয়তে, যথা কর্ত্তব্যমনারভমাণো বিপরীতং বা প্রতিপদ্যমানঃ।" 'প্রবোধসিদ্ধি' গ্রন্থে (৭৯ পৃঃ) উদয়নাচার্য্য 'নিগ্রহে'র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"কথায়ামখণ্ডিতাহঙ্কারেণ পরস্যাহঙ্কারখণ্ডনমিহ পরাজয়ো নিগ্রহঃ।"

* এখানে বলা আবশ্যক যে, 'বাদকথা'য় পরাজয়রূপ নিগ্রহ সম্ভবই নহে। সুতরাং 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা'স্থলেই 'নিগ্রহস্থানে'র উক্তরূপ ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে। কিন্তু বাদকথায় যে নিগ্রহ হয়, তাহার প্রাচীন নাম 'খলীকার'। ন্যায়দর্শনের প্রথমসূত্রবার্ত্তিকে (২০ পৃঃ) উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন,—"কঃ পুনঃ শিষ্যাচার্য্যয়োর্নিগ্রহঃ? বিবক্ষিতার্থাপ্রতিপাদকত্বম্।" অর্থাৎ বাদকথায় তৎকালে গুরু বা শিষ্যের বিবক্ষিত পদার্থ প্রতিপাদন করিতে অক্ষমতাই নিগ্রহ। বাচস্পতি মিশ্র উহাকেই বলিয়াছেন 'খলীকার'। উদ্দ্যোতকরও পরে (৫।২।১৭ সূত্রবার্ত্তিকে) "খলীকার" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। তদনুসারে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "নিগ্রহস্য খলীকারস্য স্থানং, তচ্চ বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ।" কিন্তু ইহাও বলা আবশ্যক যে, 'খলীকার' নামে কোন নিগ্রহস্থান কথিত হয় নাই।

নিগ্রহস্থানও কথিত হইয়াছে। যেমন **পুনরুক্ত** ও **অধিক**নামক নিগ্রহস্থান। **কিন্তু** পরবর্ত্তী সূত্রভাষ্যে ভাষ্যকার যে, বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি, এই দ্বিবিধ নিগ্রহস্থানই বলিয়াছেন, ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক। জয়ন্ত ভট্টও পরে 'পুনরুক্ত' ও 'অধিক'নামক নিগ্রহস্থানকে বিপ্রতিপত্তি নিগ্রহস্থানের মধ্যেই গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, উহাও বিপ্রতিপত্তিমূলক। বস্তুতঃ বাদী ও প্রতিবাদীর আত্মগত বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তিই **নিগ্রহস্থান**পদার্থ নহে। কারণ, তাহার উদ্ভাবন করা যায় না। কিন্তু সেই বিপ্রতিপত্তি বা অপ্রতিপত্তির অনুমাপক 'প্রতিজ্ঞাহানি' প্রভৃতিই নিগ্রহস্থান পদার্থ। মহর্ষি এই সূত্রে উক্তরূপ সমাস পদের প্রয়োগ না করিয়া ইহাই সূচনা করিয়াছেন, এইরূপ তাৎপর্য্যও আমরা বুঝিতে পারি। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে এখানে বলিয়াছেন,—"বিপ্রতিপত্ত্যপ্রতিপত্ত্যন্যতরোন্নায়কধর্ম্মবত্ত্বং তদর্থঃ।" অর্থাৎ উহাই সমস্ত নিগ্রহস্থানের সামান্য লক্ষণ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্য। কিং পুনর্দৃষ্টান্তবজ্জাতিনিগ্রহস্থানয়োরভেদোঽথ সিদ্ধান্তবদ্ভেদ ইত্যত আহ।

অনুবাদ—(প্রশ্ন) জাতি ও নিগ্রহস্থানের কি দৃষ্টান্তপদার্থের ন্যায় অভেদ? অথবা সিদ্ধান্তপদার্থের ন্যায় ভেদ আছে? এই জন্য বলিয়াছেন—

সূত্র। তদ্বিকল্পাজ্জাতি-নিগ্রহস্থান-বহুত্বম্ ॥ ২০॥৬১॥

অনুবাদ—সেই সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থানের বিকল্প (বিবিধ কল্প) এবং বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তির বিকল্পবশতঃ জাতি ও নিগ্রহস্থানের বহুত্ব। অর্থাৎ জাতিও বহুপ্রকার, নিগ্রহস্থানও বহুপ্রকার।

ভাষ্য। তস্য সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানস্য বিকল্পাজ্জাতি বহুত্বং, তয়োশ্চ বিপ্রতিপত্ত্যপ্রতিপত্ত্যোর্ব্বিকল্পান্নিগ্রহস্থানবহুত্বম্। নানাকল্পো বিকল্পঃ, বিবিধো বা কল্পো বিকল্পঃ। তত্রাননুভাষণমজ্ঞানমপ্রতিভা বিক্ষেপো মতানুজ্ঞা পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণমিত্যপ্রতিপত্তির্নিগ্রহস্থানং, শেষস্তু বিপ্রতিপত্তিরিতি।

ইমে প্রমাণাদয়ঃ পদার্থা উদ্দিষ্টা যথোদ্দেশং লক্ষিতা

যথালক্ষণং পরীক্ষিষ্যন্ত ইতি ত্রিবিধাঽস্য শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তির্বেদিতব্যেতি।

ইতি বাৎস্যায়নীয়ে ন্যায়ভাষ্যে প্রথমোঽধ্যায়।

অনুবাদ—সেই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য দ্বারা প্রত্যবস্থানের (প্রতিষেধের) বিকল্পবশতঃ 'জাতি'পদার্থের বহুত্ব এবং সেই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তির বিকল্পবশতঃ নিগ্রহস্থানপদার্থের বহুত্ব। নানা কল্প বিকল্প অথবা বিবিধ কল্প 'বিকল্প'।

তন্মধ্যে অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ দ্বাবিংশতিপ্রকার নিগ্রহস্থানের মধ্যে (১) 'অননুভাষণ', (২) 'অজ্ঞান', (৩) 'অপ্রতিভা', (৪) 'বিক্ষেপ', (৫) 'মতানুজ্ঞা', (৬) 'পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ' অর্থাৎ উক্ত ষট্প্রকার নিগ্রহস্থান অপ্রতিপত্তি নিগ্রহস্থান। কিন্তু অবশিষ্ট অর্থাৎ 'প্রতিজ্ঞাহানি' প্রভৃতি ষোড়শ প্রকার নিগ্রহস্থান বিপ্রতিপত্তি নিগ্রহস্থান।

এই সমস্ত প্রমাণাদি পদার্থ উদ্দিষ্ট হইয়া উদ্দেশানুসারে লক্ষিত হইয়াছে। লক্ষণানুসারে পরীক্ষিত হইবে, এই জন্য এই শাস্ত্রের (ন্যায়দর্শনের) ত্রিবিধ প্রবৃত্তি (উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা) বুঝা যায়।

বাৎস্যায়নপ্রণীত ন্যায়ভাষ্যে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥

টিপ্পনী—প্রশ্ন হয় যে, মহর্ষি তাঁহার সর্ব্বপ্রথম সূত্রে উদ্দিষ্ট 'নিগ্রহস্থান' পর্য্যন্ত ষোড়শ পদার্থের লক্ষণ বলিয়া, শেষে আবার এই সূত্রটী বলিয়াছেন কেন? তাই ভাষ্যকার এই সূত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, **জাতি** ও **নিগ্রহস্থান** পদার্থের কি দৃষ্টান্তপদার্থের ন্যায় অভেদ?* অথবা সিদ্ধান্তপদার্থের ন্যায় ভেদ আছে, এ জন্য অর্থাৎ শিষ্যগণের উক্তরূপ জিজ্ঞাসানিবৃত্তির জন্য মহর্ষি পরে এই সূত্রটি বলিয়াছেন। মহর্ষি বলিয়াছেন যে, 'জাতি' ও 'নিগ্রহস্থানে'র বহুত্ব অর্থাৎ ভেদ আছে। ইহার হেতু প্রকাশ করিতে পূর্ব্বে বলিয়াছেন **তদ্বিকল্পাৎ**। 'তস্য (সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানস্য) বিকল্পাৎ', এবং 'তয়োঃ (বিপ্রতিপত্ত্যপ্রতিপত্ত্যোঃ) বিকল্পাৎ'—এইরূপ

* যদিও 'সাধর্ম্ম্যদৃষ্টান্ত' ও 'বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্ত' নামে দৃষ্টান্তপদার্থেরও প্রকারভেদ আছে, কিন্তু মহর্ষি পূর্ব্বে একই সূত্রের দ্বারা দৃষ্টান্তপদার্থের একই লক্ষণ বলায় সেই লক্ষণের অভেদ গ্রহণ করিয়াই ভাষ্যকার এখানে দৃষ্টান্তপদার্থের ন্যায় অভেদ বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রও এখানে উক্তরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিয়াছেন, "তথাপি লক্ষণাভেদাভিপ্রায়েণাভেদ উক্তঃ।"—তাৎপর্যটীকা।

ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত জাতিলক্ষণসূত্রোক্ত 'প্রত্যবস্থানে'র এবং 'নিগ্রহস্থান'লক্ষণসূত্রোক্ত 'বিপ্রতিপত্তি' ও 'অপ্রতিপত্তি'র 'বিকল্প' থাকায় 'জাতি' ও 'নিগ্রহস্থান' বহু। ভাষ্যকার পরে সূত্রোক্ত **বিকল্প** শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, নানা কল্প ও বিবিধ কল্প। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন,—"নানাকল্প ইতি স্বরূপতঃ। বিবিধ ইতি প্রকারতঃ।" অর্থাৎ সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের দ্বারা যে প্রত্যবস্থান হয় এবং বাদী ও প্রতিবাদীর যে 'বিপ্রতিপত্তি' ও অপ্রতিপত্তি', তাহার স্বরূপগত ভেদ গ্রহণ করিয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন, **নানা কল্প** এবং প্রকারগত ভেদ গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন, **বিবিধ কল্প**। তাহা হইলে ভাষ্যে উক্ত স্থলে **বা** শব্দটি সমুচ্চয়ার্থ, ইহাই বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার এখানে পরে মহর্ষির বক্ষ্যমাণ **প্রতিজ্ঞাহানি** প্রভৃতি নামক দ্বাবিংশতিপ্রকার নিগ্রহস্থানের মধ্যে **অননুভাষণ** প্রভৃতি নামক ষট্‌প্রকার নিগ্রহস্থানকে অপ্রতিপত্তি **নিগ্রহস্থান** বলিয়া অবশিষ্ট ষোড়শ প্রকার নিগ্রহস্থানকে বিপ্রতিপত্তি নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন। কারণ, উক্ত 'অননুভাষণ' প্রভৃতি ষট্‌প্রকার নিগ্রহস্থান বাদী বা প্রতিবাদীর অপ্রতিপত্তিমূলক। আর অবশিষ্ট সমস্ত নিগ্রহস্থান বিপ্রতি-পত্তিমূলক। পরে পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে দ্বাবিংশতিপ্রকার নিগ্রহস্থানের ব্যাখ্যার দ্বারা ভাষ্যকার ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি উক্ত বিষয়ে বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণের প্রতিবাদের উল্লেখ না করায় বুঝা যায়, তিনি তাঁহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী। পরে **বসুবন্ধু** প্রভৃতি বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ গোতমোক্ত অনেক 'জাতি' ও অনেক 'নিগ্রহস্থান' অস্বীকার করিয়া গৌতম মতের প্রতিবাদ করেন। পরে **ভারদ্বাজ উদ্দ্যোতকর** ন্যায়বার্ত্তিকে বিচারপূর্ব্বক তাহার খণ্ডন করেন। উক্ত বিষয়ে উদ্দ্যোতকরের বিশেষ কথা ও পরবর্ত্তী ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রতিবাদের খণ্ডনে জয়ন্ত ভট্টের কথা পরে যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ধীমান্ ধর্ম্মকীর্ত্তির সমস্ত কথা জানিতে হইলে তাঁহার **বাদন্যায়** গ্রন্থ সম্যক্ পাঠ করা অত্যাবশ্যক। তিনি উক্ত গ্রন্থের প্রারম্ভে সংক্ষেপে নিজমত ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—

অসাধনাঙ্গবচনমদোষোদ্ভাবনং দ্বয়োঃ।
নিগ্রহস্থানমন্যত্তু ন যুক্তমিতি নেষ্যতে ॥*

---

* "অসাধনাঙ্গবচনমদোষোদ্ভাবনঞ্চ দ্বয়োর্ব্বাদিপ্রতিবাদিনোর্যথাক্রমং নিগ্রহস্থানং পরাজয়াধিকরণং। অন্যত্তু এতদ্ব্যতিরিক্তমক্ষপাদপরিকল্পিতং প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাসাদিকং বক্ষ্যমাণং নিগ্রহস্থানং ন যুক্তমিতি কৃত্বা নেষ্যতে।" (শান্তরক্ষিত কৃত টীকা)। 'ন্যায়মঞ্জরী'

ভাষ্যকার উপসংহারে বলিয়াছেন যে, এই প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণাদি নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত ষোড়শ পদার্থ উদ্দিষ্ট হইয়া, সেই উদ্দেশক্রমানুসারে লক্ষিত হইয়াছে। অতঃপর দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে যথোক্ত লক্ষণানুসারে পরীক্ষিত হইবে। অতএব এই ন্যায়শাস্ত্রের উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা, এই ত্রিবিধ প্রবৃত্তি বুঝা যায়। ভাষ্যকার পূর্ব্বেও (৬৯ পৃঃ) ইহা বলিয়া, পরে সেখানে উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষার ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। এখানে ভাষ্যকারের ঐ শেষ কথার দ্বারা ইহাও ব্যক্ত হইয়াছে যে, পরীক্ষাই এই শাস্ত্রের চরম প্রবৃত্তি বা ব্যাপার। কারণ, পরীক্ষা ব্যতীত কেবল উদ্দেশ ও লক্ষণের দ্বারা পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হয় না। সুতরাং শিষ্যগণের সে বিষয়েই বলবতী জিজ্ঞাসা বুঝিয়া মহর্ষি তদনুসারেই অতঃপর দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত অনেক পদার্থের পরীক্ষাই করিয়াছেন। তিনি 'জাতি' ও 'নিগ্রহস্থানে'র সামান্যলক্ষণ বলিয়াও অতঃপর উহাদিগের বিভাগপূর্ব্বক বিশেষ লক্ষণ বলেন নাই। কারণ, তাহা বলিলে প্রমাণাদি পদার্থ পরীক্ষার বহু বিলম্ব হয়। তাই তিনি পরে চরম পঞ্চম অধ্যায়েই 'জাতি' ও 'নিগ্রহস্থানে'র বিশেষ নিরূপণ করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ের পরে 'জাতি' ও 'নিগ্রহস্থানে'র বিশেষ নিরূপণে কোন সংগতি নাই, অতএব ন্যায়সূত্রকার তাহা করেন নাই, এইরূপ মন্তব্য অজ্ঞতামূলক। কারণ, **অবসরও** সংগতিবিশেষ (পূর্ব্ব ১৫: পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

গ্রন্থে (৬৩৯ পৃঃ) জয়ন্ত ভট্ট ধর্ম্মকীর্ত্তির উক্ত কারিকা উদ্ধৃত করিয়া, প্রথমে তাঁহার মতে অসাধনাঙ্গের বচন এবং অদোষের দোষত্বরূপে উদ্ভাবন নিগ্রহস্থান, এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মকীর্ত্তি নিজে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "ইষ্টস্যার্থস্য সিদ্ধিঃ সাধনং, তস্য নির্ব্বর্ত্তকমঙ্গং তস্য অবচনং তস্য অঙ্গস্য অনুচ্চারণং বাদিনোনিগ্রহাধিকরণং।" "ত্রিবিধমেবহি লিঙ্গমপ্রত্যক্ষস্য সিদ্ধেরঙ্গং, স্বভাবঃ কার্য্যমনুপলম্ভশ্চ।" মনে হয়, জয়ন্ত ভট্ট ধর্ম্মকীর্ত্তির 'বাদন্যায়' গ্রন্থের সর্ব্বাংশ দেখিতে পান নাই। আর বহু বিজ্ঞ উদয়নাচার্য্যও 'ন্যায়পরিশিষ্ট' গ্রন্থে ধর্ম্মকীর্ত্তির কোন কোন কথার প্রতিবাদ করিলেও পরে গোতমোক্ত সমস্ত 'নিগ্রহস্থানে'র ব্যাখ্যা করিতে ধর্ম্মকীর্ত্তির উক্ত কারিকার উল্লেখ ও 'ন্যায়মতখণ্ডনে'র প্রতিবাদ করেন নাই কেন, ইহা বিশেষ চিন্তনীয়। পূর্ব্বে পঞ্চম খণ্ডে (৪১৩ পৃঃ) উক্ত কারিকা উদ্ধৃত করিয়া সসন্দেহে ধর্ম্মকীর্ত্তির 'প্রমাণবিনিশ্চয়' গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি। পরে রাহুল সাংকৃত্যায়নকর্ত্তৃক প্রকাশিত সটীক 'বাদন্যায়' গ্রন্থ পাইয়াছি। উহার প্রথম ভাগে 'নিগ্রহস্থানলক্ষণ' ও পরভাগে 'ন্যায়মতখণ্ডন' দেখা যায়। জয়ন্ত ভট্টের খণ্ডন ও ন্যায়মতসংস্থাপন এই গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের শেষভাগে নিগ্রহস্থানের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

তাই মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য ন্যায়দর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা করিতে 'প্রবোধসিদ্ধি' বা **ন্যায়পরিশিষ্ট** গ্রন্থের প্রারম্ভে বলিয়াছেন, "অথাবসরতঃ কথকাশক্তিলিঙ্গবিশেষলক্ষণং।"* অর্থাৎ অতঃপর অবসরসংগতি অনুসারে পঞ্চম অধ্যায়ে মহর্ষি কথকগণের (জল্প ও বিতণ্ডানামক কথাকারী বাদী ও প্রতিবাদীর) অশক্তির যে সমস্ত লিঙ্গ বা অনুমাপক, অর্থাৎ সমস্ত 'জাতি' ও 'নিগ্রহস্থান', তাহার বিশেষ লক্ষণ বলিয়াছেন। 'প্রকাশ'টীকাকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "কথাকারণসম্যগ্‌জ্ঞানাভাবোঽশক্তিঃ, তল্লিঙ্গানি জাতিনিগ্রহস্থানানি, তেষাং বিশেষলক্ষণম্।" বস্তুতঃ সদুত্তরকরণে অশক্তিবশতঃই বাদী বা প্রতিবাদী 'জাতি'নামক কোন অসদুত্তর করেন এবং নিগ্রহস্থানের দ্বারাও তাহাদিগের অশক্তি বুঝা যায়। সুতরাং পঞ্চম অধ্যায়ে কথিত **সাধর্ম্ম্যসমা** প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতিপ্রকার জাতি এবং **প্রতিজ্ঞাহানি** প্রভৃতি দ্বাবিংশতিপ্রকার নিগ্রহস্থান কথক পুরুষের অশক্তির লিঙ্গ বা অনুমাপক হয়। মহর্ষি এই অধ্যায়ের শেষ প্রকরণে সেই 'জাতি' ও 'নিগ্রহস্থান'রূপ দোষের সামান্য লক্ষণ মাত্র সূচনা করিয়াছেন। তাই পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যেই এই প্রকরণটি **পুরুষাশক্তিলিঙ্গদোষসামান্যলক্ষণপ্রকরণ** নামে কথিত হইয়াছে।

মহর্ষি এই অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা ন্যায়শাস্ত্রের অভিধেয়, প্রয়োজন ও ঐ উভয়ের সম্বন্ধ প্রকাশ করায় উক্ত দুই সূত্র (১) "অভিধেয়-প্রয়োজনসম্বন্ধপ্রকরণ" নামে কথিত হইয়াছে। পরে ৬ সূত্রে প্রমাণপদার্থের বিভাগপূর্ব্বক লক্ষণ কথিত হওয়ায় উহার নাম (২) "প্রমাণলক্ষণপ্রকরণ।" পরে ১৪ সূত্রে প্রমেয় পদার্থের বিভাগপূর্ব্বক লক্ষণ কথিত হওয়ায় উহার নাম (৩) "প্রমেয়লক্ষণপ্রকরণ।" পরে ৩ সূত্রে যথাক্রমে ন্যায়ের পূর্ব্বাঙ্গ সংশয়, প্রয়োজন ও দৃষ্টান্তপদার্থের লক্ষণ কথিত হওয়ায় উহার নাম (৪) "ন্যায়পূর্ব্বাঙ্গ-

---

* উক্ত স্থলে 'প্রকাশ' টীকাকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় 'অবসর'সংগতির ব্যাখ্যা করিতে অনেক বিচার করিয়া সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন, "অথবা অবশ্যবক্তব্যানাং বিশেষলক্ষণানাংসামান্য লক্ষণান্তরমভিধানে প্রাপ্তে 'তদ্বিকল্পাজ্জাতি-নিগ্রহস্থান-বহুত্ব'মিতিসূত্রেণ বহুত্বং কীর্ত্তয়তঃ সূত্রকৃতোঽস্য অন্তরঙ্গ-প্রমাণাদিপরীক্ষাসমাপ্ত্যনন্তরং তদ্বিশেষলক্ষণানি বক্ষ্যামীত্যভিপ্রায়োন্নয়নায় অন্তরা তদ্বিশেষলক্ষণ-জিজ্ঞাসা, নবা তয়া ফলমিতি পরীক্ষাসমাপ্ত্যনন্তরসময় এব অবসরঃ, তজ্জ্ঞানাদ্বিশেষ-লক্ষণজিজ্ঞাসয়া তদভিধানং। বক্তব্যান্তরসমাপ্তৌ সত্যামবশ্যবক্তব্যতৈবাবসরঃ। তজ্জ্ঞানাদ্- বিশেষলক্ষণানি।" 'অবসর'সংগতির অন্যরূপ ব্যাখ্যা পূর্ব্বে (১৩১ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

লক্ষণপ্রকরণ।" পরে ৬ সূত্রে সিদ্ধান্তপদার্থের সামান্য লক্ষণ ও বিভাগপূর্ব্বক বিশেষ লক্ষণ কথিত হওয়ায় উহার নাম (৫) "ন্যায়াশ্রয় সিদ্ধান্তলক্ষণপ্রকরণ"। পরে ৮ সূত্রে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ ন্যায়ের নিরূপণ হওয়ায় উহার নাম (৬) 'ন্যায়প্রকরণ'। পরে ২ সূত্রে যথাক্রমে ন্যায়ের উত্তরাঙ্গ 'তর্ক' ও 'নির্ণয়'পদার্থের লক্ষণ কথিত হওয়ায় উহার নাম (৭) "ন্যায়োত্তরাঙ্গলক্ষণপ্রকরণ।" এই ৭ প্রকরণে ৪১ সূত্রে প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।

পরে দ্বিতীয় আহ্নিকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্রের দ্বারা যথাক্রমে 'বাদ', 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা'নামক 'কথা'র লক্ষণ কথিত হওয়ায় উহার নাম (১) "কথালক্ষণপ্রকরণ।" পরে ৬ সূত্রে হেত্বাভাসের বিভাগপূর্ব্বক লক্ষণ কথিত হওয়ায় উহার নাম (২) "হেত্বাভাসলক্ষণপ্রকরণ।" পরে ৮ সূত্রে 'ছল'পদার্থের সামান্য লক্ষণ ও বিভাগপূর্ব্বক বিশেষ লক্ষণ কথিত হওয়ায় উহার নাম (৩) "ছললক্ষণপ্রকরণ।" পরে ৩ সূত্র (৪) "পুরুষাশক্তিলিঙ্গদোষসামান্য-লক্ষণপ্রকরণ।" এই ৪ প্রকরণে ২০ সূত্রে দ্বিতীয় আহ্নিক সমাপ্ত।

দুই আহ্নিকে ১১ প্রকরণে ৬১ সূত্রে

ন্যায়দর্শনের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

———

টিপ্পনী ও পাদটীকায় উল্লিখিত
গ্রন্থসমূহের সূচী

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পৃষ্ঠাঙ্ক

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	৯	পরস্পরাপেক্ষা	পরস্পরাপেক্ষা
৮	১৭	বুৎপত্তি	ব্যুৎপত্তি
৮	২৫	তসি প্রত্যয়ের	তসি প্রয়োগের
১০	২৩	প্রামাণ-জন্য	প্রমাণজন্য
২৬	১৪	ইহলে	হইলে
২৯	৩	যদ্দৃরা	যদ্দ্বারা
৩১	২৬	নী ধাতুর উত্তর	নি পূর্ব্বক ইণ্ ধাতুর উত্তর
৩৫	২৪	বলিতেছেন	বলিতেন
৪১	৩	তিনি স্বীকার করিতে	তিনি তাহা স্বীকার করিতে
৪৫	২৯	হুরিদাস	হরিদাস
৪৬	১১	প্রমাণ পদার্থের মধ্যে	প্রমেয় পদার্থের মধ্যে
৪৭	৯	পরীক্ষকানাং	পরীক্ষকাণাং
৪৭	২৯	শব্দপ্র্ মাণও	শব্দ প্রমাণ
৫০	৩০	শব্দেরা	শব্দের
৫১	২৩	প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং	প্রমাণৈরর্থ-পরীক্ষণং
৫২	২৫	তর্কেনানুগৃহ্যস্তে	তর্কেণানুগৃহ্যন্তে
৫৪	২৫	তত্ত্বজ্ঞানমাত্রাকে	তত্ত্বজ্ঞানমাত্রকে
৬০	৮	পদার্থৈর্ব্বিভজ্যমানা	পদার্থৈর্ব্বিভজ্যমানা
৬০	১০	সর্ব্ব ধর্ম্মাণাং	সর্ব্বধর্ম্মাণাং
৬৪	১৫	উদ্দ্যোতকার	উদ্দ্যোতকর
৭১	৪	জন্মপৈতি	জন্মাপৈতি
৭৩	১২	বিষযে	বিষয়ে
৭৯	৮	নিষ্কলঙ্কমুপদেশনং	নিষ্কলঙ্কমুপদেশনং
৮৪	২৭	"তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি"	"তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি"
৮৮	৬	২৯৮ পৃঃ	১৯৮ পৃঃ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯০	১০	বিশেষন	বিশেষণ
৯৫	২২	ইন্দ্রিসন্নিকর্ষকে	ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষকে
৯৮	৯	প্রতক্ষ্যপরা	প্রত্যক্ষপরা
১০৩	২৩	অতিপাদ্য	প্রতিপাদ্য
১০৪	১২	কারণাবধারণ-মেতাবৎপ্রত্যক্ষে	কারণাবধারণমেতাবৎ প্রত্যক্ষে
১১৪ পাদটীকা	৩	পদার্থস্তরং	পদার্থান্তরং
১২০ পাদটীকা	৪	স্থানানামতিঘাতশ্চ	স্থানানামভিঘাতশ্চ
১২০ পাদটীকা	৫	আলোচন…ব্যপদেশা পদেন সূচিতমিতি	ব্যপদেশ্যপদেন সূচিতমিতি
১২৩	৭	'আচার্য্য"	আচার্য্য
১২৯	১০	ভ্রমপ্রতক্ষ্য	ভ্রমপ্রত্যক্ষ
১৪৫ পাদটীকা	২	ধর্ম্মভষণ	ধর্ম্মভূষণ
১৪৫	৪	যোগীদিগের	যোগীদিগেরও
১৫৫	৬	ব্যাপ্তির অঙ্গ	অনুমানের অঙ্গ
১৬০	২৩	উদ্যোতকরের	উদ্দ্যোতকরের
১৯১	১২	চিখ্যাপরিষয়া	চিখ্যাপয়িষয়া
২০৯ পাদটীকা	২	সুখহেতুরিত্যনুমায়া-দাতুবিচ্ছতি	সুখহেতুরিত্যনুমায়া-দাতুমিচ্ছতি
২১৯	১৩	ইক্রিয়গ্রাহ্য	ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য
২২২	১৭	শব্দবোধ	শাব্দবোধ
২২৩	৭	সন্নিকর্ষসমূহ	সন্নিকর্ষসমূহ
২২৬	১৯	অধর্মজনক	অধর্ম্মজনক
২৩১	১৩	প্রেত্যভাব	প্রেত্যভাবের
২৩১	১৩	মূখ্য	মুখ্য
২৩২	৩	পর্য্যন্ত	পর্য্যন্ত
২৩২ পাদটীকা	৫	প্রশ্নকাৎস্নোঘথো	প্রশ্নকার্ৎস্ন্যেঘথো
২৩৫	২২	অমৃত্যুপদ	অমৃত্যুপদ
২৩৭	৬	পূর্ব্বককথিত	পূর্ব্বকথিত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৫২	১৫	সমান…ব্বিশেষা	সমানধর্ম্মোপ-পত্তেব্বিশেষাপেক্ষো
২৫৪	৩০	"বির্শেষং	বিশেষং
২৬৩	২	বৈশিষিক	বৈশেষিক
২৬৬	১৭	ত্ত্বদ্বিপীরতগণ	তদ্বিপরীতগণ
২৬৯	১৯	"অর্থ সিদ্ধান্তঃ	"অথ সিদ্ধান্তঃ
২৬৯	২৩	জিজ্ঞাসায়ঞ্চ	জিজ্ঞাসায়াঞ্চ
২৮৭ পাদটীকা	১	যমর্থ …হেতুকং বাদ	যমর্থ…হেতুকং বা;বাদ….
২৮৮	৩০	অর্থ সেই	অর্থাৎ সেই
২৯০	১৫	'দশাববয়ববাদ'	'দশাবয়ববাদ'
২৯০ পাদটীকা	৫	'উচিতানুপূর্ব্বীক-প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চক-সমুদায়ত্বং	'উচিতানুপূর্ব্বীকপ্রতিজ্ঞাদি-পঞ্চকসমুদায়ত্বং
৩০৭	৪	জিজ্ঞাসাধিষ্ঠানাং	জিজ্ঞাসাধিষ্ঠানং
৩০৭	১৫	ধর্ম্মিবিশিষ্ট ধর্ম্মী	ধর্ম্মিবিশিষ্ট ধর্ম্ম
৩০৮	৬	দৃষ্টামিতি	দৃষ্টমিতি
৩১০	২৭	পরিবর্ত্তী	পরবর্ত্তী
৩১৩	৪	উদ্মহরণম্	উদাহরণম্
৩১৩	২৮	রূপং'	রূপপ্"
৩১৬ পাদটীকা	১	তথাপাত্র	তথাপ্যত্র
৩২৭	১২	সাধ্যেঽন্	সাধ্যেঽনুপংহৃত
৩৩২	১৬	'তথা' শব্দকে	'যথা' শব্দকে
৩৩৩	৯	পূর্ব্বে	পূর্ব্ব
৩৪১	২২	তাক্ষ্ণবুদ্ধি	তীক্ষ্ণবুদ্ধি
৩৪৫	৩	পূর্ব্বাঙ্গ	উত্তরাঙ্গ
৩৪৮	১৩	উৎপত্তি	উপপত্তি
৩৫৫	১৬	ব্যাপ্তগ্রাহক	ব্যাপ্তিগ্রাহক
৩৭১	২	সিদ্ধান্তাবিরদ্ধ	সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ
৩৯৭	৯	তদব্যভিচারী	তদ্ব্যভিচারী

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪১৬	২৮	(দি	(যদি
৪৪১	৬	প্রতিভাস	প্রতিজ্ঞাভাস
৪৫৭	৬	মুপচরা	মুপচার
৪৬১	১৪	দ্বিত্ব প্রতিষিদ্ধ	ত্রিত্ব প্রতিষিদ্ধ